ভৌতিক গল্পসমগ্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ভৌতিক গল্পসমগ্র

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ২৩৫৪ ০৪৬২
ই-মেল ঃ patrabha@vsnl.net

সূচিপত্র

কাটিহারের গঙ্গারাম ৯
আজমগড়ের অশরীরী ১৫
খুলি যদি বদলে যায় ২৩
হরির হোটেল ৩১
ভূতে-মানুষে ৩৮
তিন-আঙুলে দাদা ৪৯
সেই সব ভূত ৫৫
ডনের ভূত ৬৩
রাতের মানুষ ৬৯
চোর বনাম ভূত ৭৫
রাতদুপুরে অন্ধকারে ৮৪
আম কুড়োতে সাবধান ৮৯
সত্যি ভূত মিথ্যে ভূত ৯৪
ছুটির ঘণ্টা ৯৯
ভুতুড়ে ফুটবল ১০৩
ম্যাজিশিয়ান-মামা ১০৭
ভৌতিক বাদুড় বৃত্তান্ত ১১১
তুতানখামেনের গুপ্তধন ১১৫
মুরারিবাবুর মোটরগাড়ি ১২৭
ভুতুড়ে বেড়াল ১৪৪
ঝড়ে-জলে-অন্ধকারে ১৫৩
কেংকেলাস ১৫৯
মুরারিবাবুর টেবিলঘড়ি ১৬৮
স্টেশনের নাম ঘুমঘুমি ১৭৬

কালো ছড়ি ১৮৫

ভূত নয় অদ্ভুত ১৯২

অদ্ভুত যত ভূত ২০১

মুরারিবাবুর আলমারি ২০৮

শ্যামখুড়োর কুটির ২১৩

বাঁচা-মরা ২২০

অন্ধকারে রাতবিরেতে ২২৫

কেকরাডিহির দণ্ডীবাবা ২২৯

অদলবদল ২৩৫

জটায়ুর পালক ২৩৯

অলৌকিক আধুলি রহস্য ২৪৩

চোরাবালির চোর ২৪৭

পি-থ্রি বুড়ো ২৫১

নিঝুম রাতের আতঙ্ক ২৫৫

ডাকিনীতলার বুড়ো যখ ২৬৩

আসল ভূতের গল্প ২৬৭

বকুলগাছের লোকটা ২৭১

ঘুঘুডাঙার ব্রহ্মদৈত্য ২৭৭

ছক্কামিয়ার টমটম ২৯৪

হাওয়া-বাতাস ৩০১

মানুষ-ভূতের গল্প ৩০৬

গেছোবাবার বৃত্তান্ত ৩১৩

শনি-সন্ধ্যার পঞ্চভূত ৩২১

জ্যোৎস্নায় মৃত্যুর ঘ্রাণ ৩২৮

তিন নম্বর ভূত ৩৩৭

জ্যোৎস্নারাতে আপদ-বিপদ ৩৪২

চোর-পুলিশ ৩৪৯

ভুতুড়ে চশমা ৩৫৪

রাতের আলাপ ৩৬৫

শর্মার বকলমে ৩৬৮

বৃষ্টিরাতের আপদ-বিপদ ৩৭২

তেরো ভূতের গল্প ৩৭৬

দারোগা, ভূত ও চোর ৩৮২

দুই বন্ধু ৩৮৬

ভূতের চেয়ে সাংঘাতিক ৩৯২

বাঁটুবাবুর টাট্টু ৪০৬

বিবেকবধের পালা ৪১৪

রাত-বিরেতে ৪১৯

আধি ভৌতিক ৪২৩

যার যা খাদ্য ৪২৮

কালো ঘোড়া ৪৩১

মাছ ধরার আপদ-বিপদ ৪৩৬

ভয়ভুতুড়ে ৪৪১

কৃতান্তবাবুর কাঁকুলে যাত্রা ৪৪৪

বোতল যখন কোকিল হয় ৪৫৯

কালো বেড়াল ৪৬৬

বহুপ্রকার ভূত ৪৭১

মুরগিখেকো মামদো ৪৭৬

দাড়িবাবাদের কবলে ৪৮২

মুরারিবাবুর দেখা লোকটা ৪৯০

কাটিহারের গঙ্গারাম

ছোটমামার সঙ্গে রাতবিরেতে বাইরে কোথাও গেলেই কী সব বিদঘুটে কাণ্ড বেধে যায়। তাই ছোটমামা সাধাসাধি করলেও সন্ধ্যার পর তাঁর সঙ্গে কোথাও যেতুম না। সে কলকাতায় যাত্রা দেখতেই হোক, কী মেলা দেখতেই হোক। অবশ্য সব সময় দোষটা যে ছোটমামারই, এমন কিন্তু নয়। কোথাও দিনদুপুরে গিয়ে কোনও কারণে ফিরতে সন্ধ্যা বা রাত্রি তো হতেই পারে। তখন কী আর করা যাবে?

তেমনই একটা রাতের বিদঘুটে কাণ্ডের কথা মনে পড়ে গেল। সেটা গোড়া থেকেই বলা যাক।

ঠাকুরদা সপ্তাহে তিনদিন দাড়ি কামাতেন। আর তাঁর দাড়ি কামাতে আসত ভোলারাম নরসুন্দর। ভোলারামকে নাপিত বললেই জিভ কেটে সে বলত,—ছি-ছি! নাপিত বলতে নেই। নাপিত বললে কী হবে জানো খোকাবাবু? এই বয়সেই বড়বাবুর মতো তোমার গোঁফদাড়ি গজিয়ে যাবে। আমাকে বলবে নরসুন্দর। কেমন?

এই ভোলারামের অভ্যাস ছিল দাড়ি কামাতে-কামাতে গাঁয়ের সবরকম খবর বলা। গাঁয়ের খবর ফুরিয়ে গেলে তখন সে অন্য গাঁয়ের নানারকম খবর বলা শুরু করত। ঠাকুরদা আরামে চোখ বুজে থাকতেন আর হুঁ দিয়ে যেতেন।

সেবার শরৎকালে এক রোববারের সকালে ভোলারাম ঠাকুরদার দাড়ি কামাতে এসেছে। উঠোনে পেয়ারাতলায় চেয়ারে বসে ঠাকুরদা পা ছড়িয়ে চোখ বুজে আছেন। ভোলারাম অভ্যাসমতো ঠাকুরদার গালে সাবান মাখাতে-মাখাতে বকবক করে চলেছে। দাড়ি কামানো হয়ে গেলে সে ঠাকুরদার গোঁফ ছাঁটতে কাঁচি বের করল। তার খবরের এইখানটায় ছিল সিঙ্গিমশাইয়ের ঠাকরুনদিঘির মাছ। জেলেরা জালে একটা দশ কেজি মাছ তুলেছিল। মাছটার লেজের কাছে নাকি সিঙ্গিমশায়ের নাম লেখা। গাঁসুদ্ধু লোক ভিড় করে দেখতে গিয়েছিল।

এবার মাছের কথায় আরও কত খবর এসে গেল। গোঁফ ছাঁটা হয়ে গেলে আয়নায় গোঁফ দেখতে-দেখতে ঠাকুরদা বললেন,—হ্যাঁ হে ভোলারাম! এতরকম মাছের খবর তো দিচ্ছ। কিন্তু আজকাল আগের মতো বড়-বড় খয়রা মাছ দেখি না কেন? বড় খয়রা কেন, ছোট খয়রারও পাত্তা নেই।

ভোলারাম বলল,—কী যে বলেন বড়বাবু? খয়রার পাত্তা থাকবে না কেন? আর ছোট খয়রা কী বলছেন, এই হাতের মতো বড়-বড় জ্যান্ত খয়রা বিক্রি হচ্ছে দোমোহানির হাটে। বিলভাসানো জল টেনে নিচ্ছে মৌরি নদী। আর নদীর মুখে জাল

পেতে বসে আছে জেলেরা। পেল্লায় সাইজের খয়রা জালে উঠছে। দেখলে চোখ জুলে যাবে বড়বাবু!

ঠাকুরদা চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন,—বলো কী হে! শুনেছি দোমোহানিতে হাট বসে বিকেলবেলায়। তিন মাইল মেঠো রাস্তায় পায়ে হেঁটে তোমার পেল্লায় সাইজের খয়রা আনতে যাবে কে?

ছোটমামা সবে তখন বাড়ি ঢুকছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে ভোলারাম বলল,—ওই তো! নান্টুবাবুকে পাঠিয়ে দিলেই হল। দুপুরে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যাবেন। পড়ন্ত বেলায় বিল থেকে মাছ আসতে শুরু করবে। সস্তার তিন অবস্থা বলে কথা আছে না? দশ টাকা কেজি দর হাঁকতে-হাঁকতে মেছুনিমাসিরা শেষ অবধি পাঁচ টাকায় দর নামাবে। অত খদ্দের কোথা?

ছোটমামার ডাকনাম নান্টু আর আমার ডাকনাম পুঁটু। ঠাকুরদার হুকুম না মেনে উপায় নেই। ছোটমামা মুখ ব্যাজার করে ঘরে ঢুকলেন। বিকেলে স্কুলের মাঠে ক্রিকেটের টুর্নামেন্ট! আমিও মনমরা হয়ে গেলুম। একা-একা কি খেলা দেখতে ভালো লাগে?

ভোলারাম নরসুন্দর ছুরি-কাঁচি-নরুন গুটিয়ে ছোট্ট বাকসোতে ভরে আমার দিকে তাকাল। চোখ নাচিয়ে সে বললে,—পুঁটুবাবু! তুমিও মামার সঙ্গে যেও। দোমোহানির হাটতলায় ম্যাজিকবাজির তাঁবু বসেছে। কাটা মুন্ডুর খেলা দেখলে তুমি একেবারে অবাক হয়ে যাবে। হ্যাঁ গো পুঁটুবাবু! দু-চোখের দিব্যি। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি, কাটামুন্ডু কথা বলছে।

ঠাকুরদা সায় দিয়ে বললেন,—বাঃ! এখন তো পুজোর ছুটি। পুঁটু! নান্টুর সঙ্গে দোমোহানি গিয়ে ম্যাজিক দেখে এসো। আমি বাড়তি টাকা দেব।...

পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের পায়ে হাঁটার অভ্যাস তখনও ছিল। এদিকের লোকে দূরত্ব মাপতে কিলোমিটার বলত না। কিলোগ্রাম বা কেজি অবশ্য চালু হয়েছিল। কিন্তু মাইল বা ক্রোশ কথাটা চালু ছিল। তিন মাইল মানে দেড় ক্রোশ।

মাটির রাস্তা শরৎকালে মোটামুটি শুকিয়ে খটখটে হয়েছে। তবে কোথাও-কোথাও একটু কাদা আছে। দুধারে আদিগন্ত ধানক্ষেত। কখনও গাছপালার জটলা বা ঝোপঝাড়। দোমোহানির হাটতলায় পৌঁছে দেখি সত্যি ম্যাজিকের তাঁবু বসেছে। একটু পরেই মাইকে গানবাজনা শুরু হয়ে গেল। মনটা নেচে উঠল। খয়রা মাছ কিনেই ম্যাজিকের টিকিট কাটতে বললুম ছোটমামাকে।

ছোটমামা যেখানে মাছ বিক্রি হচ্ছিল, সেখানে গেলেন। হাটে বড্ড ভিড়। ছোটমামার কোমরের কাছে শার্টটা আঁকড়ে ধরেছিলুম, পাছে হারিয়ে যাই।

একটু পরে দেখলুম, ভোলারাম মিথ্যা বলেনি। খয়রা মাছগুলো তার হাতের মতো বড় না হলেও আমার হাতের সাইজ। দরাদরি করে ছোটমামা সাত টাকায় এক কেজি খয়রা কিনে থলেয় ভরলেন। তারপর ভিড়ের বাইরে গিয়ে তিনি বললেন,—বুঝলি পুঁটু, দর আরও কমবে। কিন্তু আমারও যে কাটামুন্ডুর খেলা দেখতে ইচ্ছে করছে। ওই শোন! কী বলছে ম্যাজিশিয়ান।

কালো প্যান্ট-কোট, শার্ট আর মাথায় টুপিপরা একটা লোক গেটের পাশে অঙ্গভঙ্গি করে চ্যাঁচাচ্ছিল,—আড়ম্ভ! আড়ম্ভ! একখুনি আড়ম্ভ হয়ে যাবে। আ—ড়—ম—ভো—ও—ও—ও!

'আরম্ভ'-কে আড়ম্ভ বলায় খুব মজা পাচ্ছিলুম। বললুম,—চলুন ছোটমামা। এখনই টিকিট কিনে সামনের সিটে বসে পড়ি। দেরি করলে পিছনে বসতে হবে।

ঠিক বলেছিস পুঁটু! —বলে ছোটমামা মাছের থলেটা সাবধানে একটু গুটিয়ে নিয়ে দুটো টিকিট কাটলেন। তারপর আমাকে এক হাতে টেনে তাঁবুতে ঢুকলেন।

ভিতরে ঢুকে নিরাশ হলুম। কোনও চেয়ার-বেঞ্চ নেই। মেঝেয় শতরঞ্চি পাতা আছে, কিন্তু ততক্ষণে সামনের দিকটা লোকেরা ঠাসাঠাসি করে বসেছে। ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন,—কোনও মানে হয়? তোর না হয় হাফপেন্টুল। আমার যে ফুলপ্যান্ট! শোন! এই পিছনেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাটামুন্ডুর খেলা দেখব।

বাইরে সেই লোকটা, যাকে ম্যাজিশিয়ান ভেবেছিলুম, সে এবার চ্যাঁচাচ্ছে,—কাটামুন্ডু! কাটামুন্ডু কথা বলবে,—এ—এ! আড়মভো—ও—ও—ও!

ভিড় ক্রমশ বাড়ছিল। ছোটমামা আর আমার পিঠ তখন তাঁবুর কাপড়ে ঠেকেছে। এতক্ষণে স্টেজের পরদা উঠল। তারপর দেখি, আমি ম্যাজিশিয়ানকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলুম। সে কোন পথে স্টেজে এসে দাঁড়িয়েছে ভেবে পেলুম না। সে বলল,—আমি প্রফেসর বংকারাম হাটি। আমি বাগে পেলেই লোকের মাথা কাটি।

সবাই হেসে উঠল। সে বেশ মিল দিয়ে কথা বলছিল। আমিও হেসে অস্থির হচ্ছিলুম; দেখলুম, ছোটমামাও খুব হাসছেন।

প্রথমে কয়েকটা আশ্চর্য ম্যাজিক দেখানোর পর ম্যাজিশিয়ান বলল,—এবার আমি সেরা খেলাটা দেখাব। কাটামুন্ডুর খেলা। কাটামুন্ডুর গলায় দেখবেন চাপ-চাপ রক্ত। খোকাখুকুরা ভয় পেলে চোখ বুজে থেকো। ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করলেই খেলা পণ্ড হয়ে যাবে।

এবার দুটো লোক একটা টেবিলের মতো জিনিস স্টেজে আনল। জিনিসটার চারদিকে কালো কাপড়ে ঘেরা। ম্যাজিশিয়ান বলল,—তাহলে কাটামুন্ডুর খেলা শুরু করি। ওয়ান টু থ্রি!

অমনি দেখি, ওপরের অংশে কালো কাপড় পরদার মতো গুটিয়ে গেল। তারপর যা দেখলুম, আঁতকে উঠে ছোটমামাকে আঁকড়ে ধরলুম।

টেবিলের ওপর একটা মানুষের মুন্ডু। গলার কাছে চাপ-চাপ রক্ত। কিন্তু মুন্ডুটা দিব্যি হাসছে। চোখ নাচাচ্ছে। এ তো ভারি অদ্ভুত!

ম্যাজিশিয়ান বলল,—অ্যাই কাটামুন্ডু! তোর নাম কী?

কাটামুন্ডু বিদঘুটে গলায় বলল,—ঘংঘাড়াম।

—ভালো করে বল!

—বললুম তো। ঘংঘাড়াম!

ম্যাজিশিয়ান হাসতে-হাসতে বলল,—গলাকাটা তো? তাই বোঝা যাচ্ছে না। ওর নাম গঙ্গারাম। আচ্ছা বাবা গঙ্গারাম! তোর বাড়ি কোথায়?

—কাটিহাঁড়!

ম্যাজিশিয়ান লাফ দিয়ে সরে বলল,—ওরে বাবা। এ যে বলছে কাটি হাড়। মানে হাড় কাটবে। অ্যাই গঙ্গারাম! ঠিক করে বল!

—কাঁটিহাড়! কাঁটিহাড়!

ম্যাজিশিয়ান কান পেতে শোনার ভঙ্গি করার পর হাসল,—কাটিহার বলছে। বিহারে কাটিহার আছে না? সেই কাটিহার। তা বাবা কাটিহারের গঙ্গারাম, তোর মুণ্ডু কাটল কে?

কাটামুণ্ডু ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,—বংকারাম!

ম্যাজিশিয়ান লাফিয়ে উঠল,—ওরে বাবা! বংকারাম বলছে যে! আমিই তো বংকারাম! এক্ষুনি আমাকে পুলিশে ধরবে। ওরে! তোরা কাটামুণ্ডুকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখ!

আবার কালো পরদাটা টেবিলের ওপর ঘিরে ফেলল। সেই লোকদুটো পরদাঘেরা টেবিলটা স্টেজের পিছনে নিয়ে গেল।

দর্শকরা হাততালি দিল। ম্যাজিশিয়ান হাতে জাদুদণ্ড নিয়ে একটু ঝুঁকে দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করল।...

ম্যাজিক শেষ হওয়ার পর বেরিয়ে দেখি, হাট প্রায় শেষ হয়ে গেছে। মেছো-মেছুনিরা পিদিম জ্বেলে তখনও মাছ নিয়ে বসে আছে। গ্যাসবাতি জ্বেলে বসে আছে কিছু পশারি। ম্যাজিক-দেখা লোকগুলো ছড়িয়ে পড়ল কে কোথায় কে জানে। তবে মেছো-মেছুনিদের দিকে আবার ভিড় দেখলুম। ছোটমামা বললেন,—একটু ভুল হয়ে গেছে, বুঝলি পুঁটু?

—কী ভুল ছোটমামা?

—এখন খয়রা মাছ কিনলে সস্তায় পেতুম। যাক গে। যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন আর ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই! কিন্তু—বলেই ছোটমামা থমকে দাঁড়ালেন।

জিগ্যেস করলুম,—কী হল ছোটমামা?

—আরেকটা ভুল করে বসে আছি রে পুঁটু! টর্চ আনিনি যে!

এতক্ষণে আমিও একটু ভাবনায় পড়ে গেলুম। ছোটমামার সঙ্গে রাতবিরেতে গেলেই কী সব বিদঘুটে কাণ্ড হয়। এতক্ষণ মনে ছিল না।

ছোটমামা বললেন,—চাঁদ উঠতে দেরি আছে। অতক্ষণ অপেক্ষা করলে তোর ঠাকুরদার পাতে রাত্রিবেলা এই খয়রা মাছ পড়বে না। বরং এক কাজ করা যাক। হাটে দেখছিলুম, একটা লোক বেতের ছড়ি বিক্রি করছে। আয় তো দেখি। একটা ছড়ি-টড়ি সঙ্গে থাকলে সাহস বাড়ে। বুঝলি পুঁটু?

মাত্র দুটাকায় একটা বেতের ছড়ি পাওয়া গেল। ছাতার বাঁটের মতো বাঁকানো হাতল আছে। ছড়িটা বগলদাবা করে মাছভর্তি থলে ঝুলিয়ে ছোটমামা হাঁটতে থাকলেন। আমি তাঁর কাছ ঘেঁষে হাঁটছিলুম। কিছুক্ষণ চলার পর অন্ধকার স্বচ্ছ মনে হল। শরৎকালের আকাশে নক্ষত্ররা উজ্জ্বল হয়।•

ছোটমামা একটু হেসে বললেন,—বুঝলি পুঁটু! ঠিক এমনি একটি ছড়ি সিঙ্গিমশাইয়ের আছে। দেখিসনি তুই?

বললুম,—সিঙ্গিমশাই সবসময় ছড়ি হাতে নিয়ে হাঁটেন কেন ছোটমামা?

—ওটা স্টাইল! বুঝলি পুঁটু! সব মানুষ বুড়ো হলেই ছড়ি নিয়ে হাঁটে না। তোর ঠাকুরদা তো বুড়োমানুষ। তাঁর হাতে ছড়ি দেখেছিস?

—না ছোটমামা!

—তাহলেই বুঝে দ্যাখ পুঁটু! সিঙ্গিমশাইয়ের ছড়ি হাতে হাঁটাটা আসলে স্টাইল! আমিও সেইরকম স্টাইলে হাঁটছি, দ্যাখ!

বলে ছোটমামা বাঁ-হাতে মাছের থলে নিয়ে ডানহাতে ছড়ির হাতল ধরে অবিকল সিঙ্গিমশাইয়ের মতো মাটিতে ছড়ির ডগা ঠেকালেন। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন।

একটু পরে দেখি, ছোটমামা মাটির রাস্তায় জোরে হাঁটতে শুরু করেছেন। আমি দৌড়ে তাঁর নাগাল পাচ্ছি না। রাগ করে চেঁচিয়ে বললুম,—ছোটমামা! অত জোরে হাঁটছেন কেন?

ছোটমামা সামনের দিক থেকে কেন যেন কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন,—আমি কি জোরে হাঁটছি রে পুঁটু? ছড়িটা আমাকে হাঁটাচ্ছে। মানে, ছড়িটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে! এই! এই ছড়ি! আস্তে! আস্তে!

আমি যথাসাধ্য দৌড়ে গিয়ে বললুম,—ছোটমামা! ছোটমামা! আমি দৌড়ুতে পারছিনে।

—ওরে পুঁটু! ছড়িটা—সর্বনাশ! এই! এই ব্যাটাচ্ছেলে! রাস্তা ছেড়ে এদিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?

বলে ছোটমামা চ্যাঁচাতে থাকলেন,—পুঁটু! পুঁটু! আমাকে ছড়িটা ধানক্ষেতের আলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রে!

ততক্ষণে পিছনে চাঁদ উঁকি দিয়েছে আবছা, জ্যোৎস্নায় দেখলুম, ছোটমামা বাঁ-দিকে ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। চেঁচিয়ে বললুম,—ছোটমামা! ছড়িটা ফেলে দিচ্ছেন না কেন? এক্ষুনি ছড়িটা ফেলে দিন!

ছোটমামার করুণ চিৎকার শোনা গেল,—ওরে পুঁটু! ছড়ির হাতল থেকে হাত ছাড়াতে পারছি না যে!

আতঙ্কে, দুর্ভাবনায় আমি এবার চেঁচিয়ে বললুম,—ছোটমামা! গঙ্গারামের কাটামুণ্ডুকে ডাকুন!

কথাটা আমার মাথায় কেমন করে এসেছিল কে জানে! আমার কথাটা শুনেই বাঁ-দিকে খানিকটা দূরে ধানক্ষেতের মধ্যে ছোটমামা এবার হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,—ওরে গঙ্গারাম! গঙ্গারাম তোর কাটামুণ্ডুটা নিয়ে আয় তো! ছড়ি ব্যাটাচ্ছেলের মুণ্ডু কেটে তোর মতো করে ফেলবি গঙ্গারাম! ওরে কাটিহারের গঙ্গারাম! শিগগির আয় রে!

তারপরই ছোটমামার হাসি শুনতে পেলুম। আবছা জ্যোৎস্নায় ছোটমামাকে

হাসতে-হাসতে ফিরে আসতে দেখলুম। তিনি বলছিলেন—কেমন জব্দ? অ্যাঁ? গঙ্গারামের কাটামুন্ডুকে ডাকতে ছড়িটা আমার হাত থেকে খসে ডিগবাজি খেতে-খেতে পালিয়ে গেল!

ছোটমামার প্যান্টের নিচের দিকটা শিশিরে আর ঘাসের কুটোয় নোংরা হয়ে গেছে। ভিজে জবজব করছে। তিনি আমার কাছে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন,—ওঃ, কী সর্বনেশে ছড়ির পাল্লায় পড়েছিলুম রে পুঁটু! ভাগ্যিস, তুই বুদ্ধি করে গঙ্গারামের কাটামুন্ডুর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলি।

বললুম,—ছোটমামা! কিন্তু গঙ্গারামের কাটামুন্ডুকে ছড়ির ভূত অত ভয় পেল কেন?

ছোটমামা বললেন,—বুঝতে পারিসনি পুঁটু? ছড়ির ভূত নিশ্চয় ম্যাজিকের তাঁবুতে গঙ্গারামের কাটামুন্ডু দেখেছিল।

এরপর ছোটমামা আমাকে মাছের থলে দিয়ে জুতোদুটো খুললেন তারপর প্যান্ট গুটিয়ে জুতো বাঁ-হাতে নিয়ে হাঁটতে থাকলেন। ততক্ষণে জ্যোৎস্না উজ্জ্বল হয়েছে। জিগ্যেস করলুম,—ছড়িটা অমন করে আপনাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কেন?

ছোটমামা বললেন,—সেটাই তো বুঝতে পারছি না রে পুঁটু! ভূত কি ছড়ি হতে পারে? আমার মনে হচ্ছে, ওটা কোনও ভূতের ছড়ি! বুঝলি? ছড়িওয়ালা কোনও মরা মানুষের ছড়ি সস্তায় কিনে আমাকে বেচেছিল।

কথাটা বলেই ছোটমামা থমকে দাঁড়ালেন। জিগ্যেস করলুম,—কী হল ছোটমামা?

—ওই দ্যাখ! দেখতে পাচ্ছিস? ছড়ি ব্যাটাচ্ছেলে আমাদের আগে-আগে খুটখুট শব্দ করে হেঁটে চলেছে।

ভয় পেয়ে বললুম,—ছোটমামা! ছড়ি হাঁটছে না! ভূত ছড়ি হাতে নিয়ে হাঁটছে!

এবার ছোটমামা হুংকার দিয়ে বললেন,—আয় তো পুঁটু! দেখি ব্যাটাচ্ছেলেকে। এখনও এত সাহস!

ছোটমামা বোকামিই করে ফেলতেন, কারণ ছড়িটা ডিগবাজি খেতে-খেতে তাঁর দিকে আসছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম,—গঙ্গারাম! গঙ্গারাম! তোমার কাটামুন্ডু নিয়ে এসো শিগগির!

অমনি দেখলুম ছড়িটা পাশের ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে উধাও হয়ে গেল। ছোটমামা বললেন,—ধ্যাত্তেরি! কথাটা আমার কিছুতেই মনে থাকছে না। পুঁটু! আমরা দুজনে এবার গঙ্গারামের কাটামুন্ডুর জয় দিতে-দিতে হাঁটি!

বলেই ছোটমামা স্লোগানের সুরে হাঁকলেন,—গঙ্গারামের কাটামুন্ডু কী?

আমি চেঁচিয়ে বললুম,—জয়!

—গঙ্গারামের কাটামুন্ডু!

এমন স্লোগান ওই বয়সে কত শুনতুম, তাই চেঁচিয়ে বললুম,—অমর রহে! অমর রহে।

—গঙ্গারামের কাটামুন্ডু!

—জিতা রহে! জিতা রহে!

—কাটিহারের গঙ্গারাম কী?

—জয়!

বাড়ি ঢোকার মুখে ছোটমামা মুচকি হেসে বলেছিলেন,—ভাগ্যিস ছড়ির ভূতটা প্রফেসর বংকারামের ম্যাজিক দেখতে ঢুকেছিল। নইলে তোর ঠাকুরদার খয়রা মাছ আর খাওয়া হতো না। কাটামুন্ডু দেখে ভূতটাও ভয় পেয়েছিল।

কিন্তু ম্যাজিক দেখতে আমরা না ঢুকলে আমাদের দুজনের অবস্থাটা কী হতো, সেটা আর ছোটমামাকে বলিনি।

আজমগড়ের অশরীরী

তখন আমি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহিবিদ্রোহ নিয়ে গবেষণা করছিলুম। সেই কাজে আমাকে আজমগড়ে যেতে হয়েছিল।

আজমগড় উত্তরপ্রদেশে গঙ্গার ধারে একটা ছোট্ট শহর। সেখানে একটা কেল্লার ধ্বংসাবশেষ আছে। তবে ওটা দেখবার জন্য পর্যটকদের বিশেষ উৎসাহ নেই। ওখানে বিশাল গঙ্গার বুকে একটা চরে পক্ষীনিবাস আছে। পাখি দেখবার জন্যই শীতকালে পর্যটকদের ভিড় হয়। ধ্বংসস্তূপ দেখে কে-ই বা আনন্দ পায়?

আমি গিয়েছিলুম মার্চের গোড়ার দিকে। তখন আর তত শীত ছিল না। পর্যটকদের ভিড়ও ছিল না। ভাঙাচোরা নবাবি প্রাসাদের পাশে গঙ্গার তীরে প্যালেস হোটেলে উঠেছিলুম। পর্যটন মরশুমের শেষে এই দোতলা থ্রি-স্টারমার্কা হোটেলে তখন ঘরভাড়াও কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হোটেলের ম্যানেজার সুখলাল ঠাকুর খুব অমায়িক মানুষ। আমি সিপাহিবিদ্রোহ সম্পর্কে গবেষণা করছি জেনে খুব খাতির করেছিলেন। সিপাহিবিদ্রোহের অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন। এসব গল্প নিছক গল্পই। আমার গবেষণায় তা কাজে লাগবে না। তবে ওঁর এ কথাটি অবশ্যই খাঁটি। এই আজমগড়ে সিপাহিদের সঙ্গে এককাট্টা হয়ে অনেক হিন্দু-মুসলিম সাধারণ মানুষও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

মিঃ ঠাকুর শুধু একটা ব্যাপারে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। সূর্যাস্তের পর আমি যেন কেল্লাবাড়ি এলাকায় না থাকি। তাঁকে প্রশ্ন করে কোনও যুক্তিসঙ্গত উত্তর পাইনি। তিনি মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটিয়ে শুধু বলেছিলেন,—সূর্যাস্তের পর ওই এলাকায় থাকলে বিপদ হতে পারে।

—কী বিপদ?

প্যালেস হোটেলের ম্যানেজার কিছু বলতে যাচ্ছেন, এমনসময় ক'জন সায়েব-মেম দলবেঁধে হোটেলের লাউঞ্জে ঢুকলেন। তিনি তাঁদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সেদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমি ক্যামেরায় কেল্লাবাড়ি আর গঙ্গার ছবি তুলে বেড়ালুম। কোথাও-কোথাও ধ্বংসাবশেষে ঝোপজঙ্গল আছে। গঙ্গার তীরে একস্থানে খাড়া পাথরের পাঁচিল নেমে গেছে জলের তলায়। কোথাও ভাঙাচোরা পাথরের ঘাট শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম সেই ফাঁসির মঞ্চটিকে, যেখানে ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ জন হকটন বিদ্রোহীদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মেরেছিলেন। সেই বিদ্রোহীদের দলে ছিলেন নবাব আজম খানের কন্যা রেশমা বেগম। দিল্লির জাতীয় মহাফেজখানার কাগজপত্রে এই পিতা-পুত্রীর নাম খুঁজে পেয়েছিলুম। আর পেয়েছিলুম একটা স্কেচম্যাপ। সেটা এঁকেছিলেন এক আইরিশ শিল্পী—টমাস পিট। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সেই শিল্পী এ অঞ্চলে বেড়াতে এসেছিলেন। স্কেচম্যাপে কেল্লাবাড়ির সীমানা ছাড়াও খুঁটিনাটি অনেকগুলি স্থান চিহ্নিত করা ছিল। ফাঁসির মঞ্চ, বিদ্রোহীদের কবরখানা, রেশমা বেগমের গোপন অস্ত্রাগার—এরকম অনেককিছুই ছিল ওতে। আমি জীর্ণ ম্যাপ থেকে কপি করে এনেছিলুম।

সেই কপি থেকে স্থানগুলি খুঁজে বের করা দেখলুম অসম্ভব ব্যাপার। তবে একটা দৃশ্য আমার কাছে অদ্ভুতই মনে হচ্ছিল। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই ধ্বংসস্তূপগুলিতে শুধু লাল রঙের ফুলের সমারোহ চোখে পড়ে। আমি প্রকৃতিপ্রেমিক নই। ইতিহাসের একজন গবেষক মাত্র। জীবনে কত ঐতিহাসিক স্থানে আমাকে যেতে হয়েছে। কিন্তু কোথাও এমন উজ্জ্বল লালরঙের ফুল চোখে পড়েনি। নানা আকৃতির এইসব ফুলের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, ওগুলি কি ফুল, না চাপ-চাপ রক্ত? এখানে কি অন্যরঙের ফুল ফোটে না?

অবশ্য এখন বসন্তকাল। ফুল ফোটে। পাখিরা গান করে। কিন্তু এখানে পাখিরা কেন চুপ করে আছে?

পাখির কথা ভাবতেই গঙ্গার ধারে পক্ষীনিবাসের কথা মনে পড়ল। তখন ধরে নিলুম, এলাকার সব পাখি সেখানে গিয়েই জুটেছে। কোথায় সেই চর তা জেনে আসিনি। গঙ্গা এখানে প্রশস্ত। উত্তাল বাতাসে বড়-বড় ঢেউ উঠে কেল্লার পাথুরে পাঁচিলে অদ্ভুত শব্দ করছে। চোখ বন্ধ করলে মনে হচ্ছে হাজার-হাজার মানুষের কোলাহল। ওপারে দূ-রে ঘন নীল পাহাড়গুলি দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি জেলেনৌকা ভেসে বেড়াচ্ছে।

অন্যমনস্কভাবে গঙ্গার ধারে জীর্ণ শ্যাওলাধরা ঘাটের মাথায় একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। এই সময় আমার ডানদিকে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে একজন ফকির বেরিয়ে এলেন।

ফকিরের মাথায় জটা, মুখে লম্বা দাড়ি। পরনে পা পর্যন্ত লম্বা কালো আলখাল্লা। গলায় মোটা-মোটা রঙবেরঙের পাথরের মালা। তাঁর এক হাতে প্রকাণ্ড চিমটে।

চিমটেটার গোড়া রুপো আর তামার তারে বাঁধানো। ফকির ঘাটের কাছে এসে আমার দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে বললেন,—কৌন হ্যায় তুম?

আমি যথাসাধ্য হিন্দিতে নিজের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলুম। তারপর বললুম,—রেশমা বেগমের ফাঁসির জায়গা আর তাঁর কবর কোথায় তা কি আপনি জানেন? দেখিয়ে দিলে আপনাকে কিছু বখশিস দেব।

ফকির কিন্তু চটে গেলেন। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বললেন,—কে চায় তোমার বখশিস? শিগগির এখান থেকে চলে যাও। না গেলে তোমার বিপদ হবে।

তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলুম, আমি সিপাহিবিদ্রোহের প্রকৃত ইতিহাস লিখতে চাই। কিন্তু ফকির আমাকে পাত্তা দিলেন না। মস্ত বড় চিমটেটা তুলে তেড়ে এলেন। চিমটের ডগা সূক্ষ্ম এবং ধারালো। বেগতিক দেখে আমি সরে এলুম।

একটু পরে দূর থেকে দেখলুম, ফকির আলখাল্লা খুলে রেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ওখানে জল খুব গভীর। ফকির সেই জলে সাঁতার কাটছেন দেখে অবাক লাগল। একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করছিলুম। কিছুক্ষণ পরে ফকির জল থেকে উঠে ভিজে গায়েই কালো আলখাল্লা পরে নিয়ে চিমটেসহ এগিয়ে গেলেন। তারপর ধ্বংসস্তূপের আড়ালে অদৃশ্য হলেন।

ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল। ওঁকে অনুসরণের সাহস হল না। শুধু জায়গাটা চিনে রাখলুম। তারপর প্যালেস হোটেলে ফিরে গেলুম।

স্নান করার পর নিচের ডাইনিং হলে খেতে গেলুম। ডাইনিং হলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে লাঞ্চ খাচ্ছিলেন জনাচারেক বোর্ডার। ম্যানেজারের কাছে শুনেছিলুম, তাঁরা নানা জায়গা থেকে এসেছেন এবং বিত্তবান ব্যবসায়ী। সায়েব-মেমদের দলটি তখনও বাইরে থেকে ফেরেননি। পরিচারক আসলাম খান আমাকে সেলাম দিয়ে খাদ্য পরিবেশন করল। সেই সুযোগে তাকে কেল্লাবাড়ির সেই ফকিরের কথা বললুম। আসলাম খান একটু হেসে বলল,—ও তো পাগলাবাবা স্যার। ওখানে পিরের দরগা আছে। সেখানে থাকে। একেবারে পাগল। খিদে পেলে তখন কিন্তু বেরিয়ে আসে। শহরের রাস্তায় বসে শাপ দেয়, তাকে কেউ খেতে না দিলে তার বিপদ হবে। আবার খেতে দিলেও শাপ-শাপান্ত করে। ওকে কখনও ভয় করবেন না। শুধু বলবেন, সঙ্গে পিস্তল আছে। গুলি করে মারব। দেখবেন, তখন কীভাবে দৌড়ে পালায়। একেবারে শেয়ালের মতো কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে লুকিয়ে যাবে।...

আসলামের কাছে এ কথা শুনে আশ্বস্ত হয়েছিলুম। তাই খাওয়ার পর ঘণ্টাটাক বিশ্রাম করে আবার কেল্লাবাড়িতে গেলুম। ফকির যেখানে ধ্বংসস্তূপের ফাঁকে উধাও হয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে সংকীর্ণ একফালি পায়ে-চলা পথ খুঁজে পেলুম। দুধারে ঝোপঝাড় আর পাথর। আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার মতো পথে হাঁটতে-হাঁটতে একসময় থমকে দাঁড়ালুম। সামনে একটা কাঠের বেড়া। বেড়াতে একটা ফলক আঁটা আছে। তাতে ইংরেজিতে লেখা আছে, 'নিষিদ্ধ এলাকা'। তার নিচে একটা মড়ার খুলি এবং খুলির তলায় আড়াআড়িভাবে দুটো হাড় আঁকা। এই চিহ্নের অর্থ—সাংঘাতিক।

নিষেধাজ্ঞার তলায় ছোট অক্ষরে লেখা আছে, 'কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ। ভারত সরকার।'

বুঝতে পারছিলুম না কেন সরকারি পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই বিপদজ্ঞাপক নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছেন।

বেড়ার ফাঁকে পা দিয়ে উঠে উঁকি মেরে ওদিকটা দেখতে পেলুম। খানিকটা ফাঁকা জমির পর নিচে গঙ্গার বুকে বালির চড়া। চড়াটা বহুদূর অবধি বিস্তৃত। বিকেলের রোদে চড়ার শেষপ্রান্তে কাঁটাতারের বেড়া চোখে পড়ল। এবার বুঝতে পারলুম, ওই চড়ায় চোরাবালি আছে। তাই এই সতর্কতা।

কাঠের বেড়া থেকে নেমে যে পথে এসেছি, সেই পথে ফিরে চললুম। একটু পরে দেখি, ডানদিকে একটা সংকীর্ণ রাস্তা চড়াইয়ে উঠে গেছে। রাস্তাটা লাল ধুলোয় ভরা। এটা কেন চোখে পড়েনি তখন?

আসলে লাল রাস্তাটা ঝোপের আড়ালে থাকায় লক্ষ করিনি। তা ছাড়া একটা প্রকাণ্ড চৌকো কালো পাথর রাস্তাটাকে আড়াল করেছিল। পাথরটাতে নকশার মতো আঁকা লিপি দেখে বুঝলুম আরবি হরফে কিছু লেখা আছে। তখনই ক্যামেরায় কালো পাথরটার কয়েকটা ছবি তুললুম।

তারপর পাথরের একপাশ দিয়ে এগিয়ে লাল রাস্তায় পৌঁছলুম। কিন্তু সংকীর্ণ রাস্তাটার লাল ধুলোয় জুতো প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। প্যান্ট একটু গুটিয়ে নিতে হল। সাবধানে পা ফেলে একটুখানি এগিয়েছি, হঠাৎ চমকে উঠলুম। আমার প্রায় ফুটছয়েক দূরে চোখের সামনে এইমাত্র কার জুতোর ছাপ ফুটে উঠেছে। প্রথমে ভাবলুম চোখের ভুল। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, আমি আবার পা ফেলে এগোতেই আমার সামনে একই দূরত্বে বারবার আগে-পিছে জুতোর ছাপ ফুটে উঠছে। বুকের ভেতরটা ঠান্ডা হিম হয়ে গেল।

কোনও এক অশরীরী আমার সামনে হেঁটে চলেছে, এতে কোনও ভুল নেই। তার জুতোর ছাপগুলি আমার জুতোর ছাপের তুলনায় ছোট। কিন্তু কে সে?

চোখের ভুল কি না জানার জন্য দুঃসাহসী হয়ে আবার কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। আবার আমার সামনে একই দূরত্বে সেই অশরীরীর জুতোর স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠল।

এবার আমার সব সাহস উবে গেল। শেষবেলার রোদে এই অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখে আমার বোধবুদ্ধি গুলিয়ে গেল। আমি দ্রুত পিছু ফিরে লাল ধুলোয় টলতে-টলতে কালো পাথরটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলুম। তারপর বিভ্রান্তভাবে ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে দৌড়ুতে থাকলুম। একটু পরে গঙ্গার ধারে খোলা জায়গায় পৌঁছে পিছু ফিরে দেখে নিলুম কেউ আমাকে অনুসরণ করছে কি না।

এরপর কী করে যে হোটেলে ফিরেছিলুম, মনে পড়ে না।...

জীবনে বহু ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপ এবং দুর্গম স্থানে গেছি। কিন্তু এমন অদ্ভুত ঘটনা কোথাও ঘটতে দেখিনি। হোটেলের লাউঞ্জে বসে ইশারায় একজন ওয়েটারকে ডেকে কফি আনতে বললুম।

সে কফি এনে দিল। কফি খেতে-খেতে ঘটনাটা ঠান্ডা মাথায় বোঝবার চেষ্টা করছিলুম। এমন সময় দেখি, লাউঞ্জের অন্যপ্রান্তে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে জিনস এবং টি-শার্ট। মুখে গোঁফ। বেশ বলিষ্ঠ গড়ন। গায়ের রং শ্যামবর্ণ হয়েও নয়, ভদ্রলোকের মুখে যেন একটা একটা বিরক্তির ছাপ এবং চোখদুটোও কুতকুতে। এরকম চেহারার মানুষ দেখলে অস্বস্তি জাগে।

ভদ্রলোক সম্ভবত প্যালেস হোটেলের লাউঞ্জে এসে কারও জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে না পেয়ে হয়তো বিরক্ত এবং অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

আমার চোখে চোখ পড়লে তিনি এগিয়ে এলেন। তারপর বাংলায় বলে উঠলেন,—আপনি কি বাঙালি?

বললুম,—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক অমায়িক হেসে আমার মুখোমুখি বসে পড়লেন। বললেন,—মশাই! বাঙালির চেহারা দেখলেই চেনা যায়। আমার ঠাকুরদা ওকালতি করতে আজমগড়ে এসেছিলেন। তারপর আর দেশে ফেরেননি। বাবাও ওকালতি করতেন। আমি কিন্তু ব্যবসা করি। আমার নাম অশোক রায়। আপনার পরিচয় পেলে খুশি হব।

অশোকবাবুকে প্রথমে দেখে যা ভেবেছিলুম, তাঁর অমায়িক হাবভাব এবং কথাবার্তা শুনে সেই ধারণা কেটে গেল। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন,—কেল্লাবাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কোথায় কী ছিল, তা আমার নখদর্পণে। আমার ছেলেবেলায় সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়নি।

ওয়েটারকে আবার ডেকে ওঁর জন্য কফি আনতে বললুম। তারপর অশোকবাবু আজমগড়ের পুরনো ঐতিহাসিক কাহিনি বলতে শুরু করলেন। ম্যানেজারের কাছে এসব গল্প শুনেছি। ওয়েটার কফি দিয়ে গিয়েছিল। কফি খেতে-খেতে অশোকবাবু বললেন,—আজ বিকেলে কলকাতা থেকে আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধুর আসার কথা। তার জন্য অপেক্ষা করে অস্থির। ছ'টা বেজে এল। সে এল না। কাজেই ধরে নিচ্ছি, আর সে আসবে না। না আসুক। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে কী যে আনন্দ পেলুম, বোঝাতে পারব না। তা আপনি হোটেলে থাকবেন কে? খামোকা একগাদা টাকা খরচ! বরং আমার অতিথি হোন। আপনাকে দেখলে আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়েরাও খুব খুশি হবে।

এত অন্তরঙ্গতার পর বিকেলে কেল্লাবাড়ির ভেতরে সংকীর্ণ লাল রাস্তায় যে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে দেখেছি, তা অশোকবাবুকে না বলে থাকতে পারলুম না।

অশোকবাবু ঘটনাটা হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন,—আপনি ঐতিহাসিক পণ্ডিত। ইতিহাসের ভেতর ডুবে থাকেন। বাস্তব জগতে ভুলভাল দেখা আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। দেখুন মশাই! আমি কত রাতদুপুরে ওই এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি। কখনও কিচ্ছু দেখিনি। হ্যাঁ—ওখানে এক পাগলা ফকির থাকে। আমাকে দেখলেই সে লেজ তুলে পালিয়ে যায়। তাকে নিশ্চয় দেখতে পেয়েছেন?

বললুম,—হ্যাঁ। দুপুরে ফকিরকে গঙ্গায় স্নান করতে দেখেছি। আমাকে সে ভয় দেখাচ্ছিল।

অশোকবাবু হেসে উঠলেন। বললেন,—পরশু দোলপূর্ণিমা গেছে। আজ কিছুক্ষণ পরে চাঁদ উঠবে। কোনও ভয়ের কারণ নেই। আমার সঙ্গে কেল্লাবাড়িতে চলুন। দেখবেন, কোনও অলৌকিক ব্যাপার ঘটছে না। আর পাগলা ফকিরের ডেরাতেও আপনাকে নিয়ে যাব। দেখবেন, আমাকে দেখে ব্যাটাচ্ছেলে কী করে।

এতক্ষণে সায়েব-মেমদের দলটি এসে পড়ল। অন্যান্য বোর্ডাররাও ততক্ষণে এসে গেছে। কেউ লাউঞ্জে, কেউ ডাইনিং হলে ঢুকে চা-কফি খাচ্ছে। অশোকবাবু বললেন,—চলুন! জ্যোৎস্নারাতে আজমগড়ের গঙ্গার ধারে বসে গল্প করা যাবে। তারপর সেই লাল রাস্তায় যাব। আমার কাছে টর্চ আছে। আপনাকে আমি রেশমা বেগমের কবরও দেখিয়ে দেব। উঠে পড়ুন।

একটু অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে অশোকবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেলুম। তারপর মনে হল, ইনি বাঙালি এবং এখানেই বড় হয়েছেন। তা ছাড়া, তাঁর বলিষ্ঠ গড়ন দেখেও শেষপর্যন্ত ভয়টুকু ঘুচে গেল...

কেল্লাবাড়ি এলাকায় ঢুকে গঙ্গার ধারে একটা পাথরের ওপর পাশাপাশি দুজনে বসলুম। অশোকবাবু কলকাতার সাম্প্রতিক খবরাখবর জেনে নিচ্ছিলেন। বহুবছর তাঁর কলকাতা যাওয়া হয়নি।

কিছুক্ষণ পরেই চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় গাছপালা, ঝোপঝাড় আর ধ্বংসস্তূপ রহস্যময় মনে হচ্ছিল। অশোকবাবু বললেন,—আপনি যে লাল রাস্তাটা দেখেছিলেন, ওর পাশেই নাকি ইংরেজরা বিদ্রোহীদের ফাঁসি দিয়েছিল। তবে আপনি যে অশরীরী জুতোর ছাপ দেখার কথা বললেন, ওটা চোখের ভুল। ওই রাস্তা দিয়ে পাগলা ফকির যাতায়াত করে। আপনাকে আড়াল থেকে ভয় দেখানোর জন্য ব্যাটা নিশ্চয় কোনও কারচুপি করেছিল। এও হতে পারে পুরু ধুলোর তলায় লম্বা কোনও জিনিস লুকিয়ে রেখেছিল। তার ওপর আপনি পা ফেললেই সামনের দিকটা উঁচু হয়ে ধুলো ঠেলে তুলবে। স্রেফ ম্যাজিক। চলুন। পরীক্ষা করা যাক।

অশোকবাবু আমার হাত ধরে ওঠালেন। একটু দ্বিধার সঙ্গে বললুম,—কিন্তু আমি সত্যি জুতোর ছাপ দেখেছিলুম!

আরে মশাই! আমি তো সঙ্গে আছি আসুন না। —বলে অশোকবাবু হাঁটতে শুরু করলেন। আমার কাঁধে তাঁর হাত চেপে বসল।

জ্যোৎস্নার জন্য ধ্বংসস্তূপের চকরাবকরা ছায়ার ভেতর দিয়ে আমাকে তিনি নিয়ে চললেন। একটু পরে দেখলুম, সেই আরবি লিপি খোদাই করা কালো পাথরটার কাছে এসে গেছি! অশোকবাবু টর্চের আলো ফেলে বললেন,—চলে আসুন। দেখা যাক কী হয়।

সংকীর্ণ চড়াই রাস্তায় কিছুটা উঠে টর্চের আলো ফেলে অশোকবাবু বললেন, —কই? কোনও ভুতুড়ে জুতোর ছাপ দেখতে পাচ্ছেন?

বললুম,—এখন পাচ্ছি না। কিন্তু—

আমার কথা থেমে গেল। এরপর যা ঘটল তা কল্পনাও করিনি। হঠাৎ টর্চ

নিভিয়ে অশোকবাবু আমার কানের নিচে শক্ত এবং ঠান্ডা কী একটা জিনিস ঠেকিয়ে চাপা গর্জন করে বললেন,—টুঁ শব্দটি নয়। ট্রিগারে আঙুল আছে। একটু চাপ দিলেই তোমার মুন্ডু উড়ে যাবে। আগে ক্যামেরাটা দাও। হ্যাঁ—তারপর রিস্টওয়াচ। আর মানিব্যাগটা বের করো।

মুহূর্তে আমি টের পেয়ে গেছি, এক ভদ্রবেশী গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছি। হোটেলের ম্যানজার মিঃ ঠাকুর আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন কেন, এতক্ষণে তার মর্ম বুঝতে পারলুম। সেই ফকিরও হয়তো আমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই। ক্যামেরাটা গলা থেকে ঝুলছিল। সেটা হাতে ধরে কাঁপতে-কাঁপতে বললুম,—দয়া করে এটা নেবেন না। মানিব্যাগে হাজারখানেক টাকা আছে। তা নিন। ঘড়িটাও নিন। কিন্তু ক্যামেরায় লোড করা ফিল্মে অনেক ছবি আছে। দয়া করে অন্তত ফিল্মের রোলটা বের করে নিতে দিন আগে।

অশোকবাবুরূপী দুর্বৃত্ত আগ্নেয়াস্ত্রের নল আমার কানের নিচে আরও চেপে হিসহিস করে বলে উঠল,—চুপ! শিগগির! আর একটা কথা বললে তোমার লাশ পড়বে। আর সেই লাশের কথা কেউ জানতেও পারবে না। কারণ তোমার লাশ আমি চোরাবালিতে ফেলে দিয়ে আসব। চোরাবালিতে তোমার মতো কত লাশ আমি ফেলে দিয়ে এসেছি। সব তলিয়ে গেছে।

বলেই সে ধমক দিল,—আবে জলদি কর!

এতক্ষণে মনে হল, লোকটার মাতৃভাষা বাংলা নয়। তার বাংলা কথাবার্তায় কেমন যেন একটু হিন্দির টান ছিল। কিন্তু এবার ডান কানের নিচে ব্যথা পেয়ে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছিলুম। তারপরই আবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। আচমকা শপাং করে একটা প্রচণ্ড শব্দ হল। তারপর দেখলুম, দুর্বৃত্তটার হাতের অস্ত্র ছিটকে পড়ল এবং সে আর্তনাদ করে পড়ে গেল।

তারপর আবার শপাং করে প্রচণ্ড শব্দ হল। গুণ্ডাটা লাল ধুলোয় গড়াতে শুরু করল। এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। কোনও অশরীরী অদৃশ্য চাবুক মেরে চলেছে তাকে। সে একবার কাত হচ্ছে। একবার উপুড় হচ্ছে। হাঁটু মুড়ে ওঠার চেষ্টা করছে। তারপরই সেই প্রচণ্ড শব্দ এবং তার মুহুর্মুহু আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখছি, লোকটার গায়ের টি-শার্ট ফালাফালা হয়ে কালো-কালো ক্ষতরেখা ফুটে উঠছে।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। লাল ধুলোভরা রাস্তায় লোকটা ক্রমাগত গড়াচ্ছে এবং তার গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে শুধু। অশরীরীর চাবুকের শব্দ ক্রমশ প্রচণ্ডতর হয়ে উঠছে।

লাল ধুলোর ঝড় বয়ে যাচ্ছে এবার। তার আড়ালে চাবুকের ক্রমাগত শব্দ আর গোঙানি শুনতে-শুনতে একসময় আমার চেতনা ফিরে এল। তখনই দৌড়ে নেমে এসে কালো পাথরটার পাশ দিয়ে বেরোলুম। তারপর ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে খোলা জায়গায় ছুটে চললুম।

কেল্লাবাড়ির ভাঙা ফটকের কাছে গিয়ে প্যান্ট-শার্ট থেকে ধুলো ঝেড়ে হোটেলে ফিরে চললুম। না, কাউকে এসব অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা বলা উচিত হবে না।...

রাতে ডিনার খাইনি। ম্যানেজার খবর নিতে এসেছিলেন আমার রুমে। বলেছিলুম,—ঘুরে-ঘুরে খুব ক্লান্ত। খিদে নেই।

সারারাত যতবার ঘুম এসেছে, চমকে উঠেছি। আবার বুঝি কোনও অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে। ভোর ছটায় আসলাম খান বেড-টি আনল। তারপর গম্ভীরমুখে বলল,—খবর আছে স্যার! সুখবর। তাই বলা উচিত মনে হল।

বললুম,—কী সুখবর আসলাম?

সে বলল,—আজমগড়ে একজন সাংঘাতিক গুণ্ডা ছিল। তার নাম কাল্লু। সে আমাদের হোটেলে এসেও ম্যানেজারসায়েবের কাছে টাকা দাবি করত। কাল সন্ধ্যার আগে সে নাকি আপনার সঙ্গে কথা বলছিল। ওয়েটার রমেশ দেখেছে। কিন্তু আপনাকে সাবধান করার সুযোগ পায়নি।

—কিন্তু সুখবরটা কী?

—কাল্লু গুণ্ডাকে কে বা কারা রাত্রে মেরে কেল্লাবাড়ির ভেতরে লাশ ফেলে এসেছে। পাগলা ফকির খুব ভোরে সেই লাশ দেখে থানায় খবর দিয়েছিল। আশ্চর্য ঘটনা স্যার, তার পিস্তল আর টর্চটা সেখানেই পড়ে ছিল।

—আচ্ছা আসলাম! কাল্লু কি বাঙালি ছিল?

—না স্যার। তবে সে উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা সব ভাষাতেই কথা বলতে পারত। কলকাতাতে নাকি তার ছোটবেলা কেটেছিল। স্কুলেও পড়েছিল। তাই বাংলাও বলতে পারত। আজমগড়ে বাঙালি আছে। তারা তো কাল্লুকে বাঙালি বলেই মনে করত। কাল্লু কখন কোন রূপ ধরত, চেনা কঠিন হতো।

—কাল্লুর লাশ কি পুলিশ নিয়ে গেছে?

—শুনলুম একটু আগে মর্গে নিয়ে গেছে। কাল্লুর সারা শরীর নাকি রক্তে লাল।

ব্রেকফাস্টের পর সাড়ে নটায় আমি এবার সাহস করে কেল্লাবাড়িতে গেলুম। আমার মনে হচ্ছিল, কাল বিকেলে যে অশরীরীর জুতোর ছাপ আমার সামনে রাঙা ধুলোয় ফুটতে উঠতে দেখেছি, সেই ছদ্মবেশী অশোক রায় নামধারী দুর্বৃত্ত কাল্লুর হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে। মনে-মনে তার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানালুম।

এবার নির্ভয়ে সেই কালো পাথরের পাশ দিয়ে সংকীর্ণ লাল ধুলোভরা রাস্তায় পৌঁছলুম। চড়াই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আর সেই জুতোর ছাপ সামনে ফুটে উঠল না। কিছুটা যাওয়ার পর রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। নিচে নেমেই ঘন গাছপালার ভেতর সার-সার কয়েকটা কবর দেখলুম। তারপর লাল পাথরের একটা কবর দেখে এগিয়ে গেলুম। সেই কবরের শিয়রে একটা রক্তকরবীর গাছ। কবরে লাল ফুল ঝরে পড়েছে। আমি বহুকাল আরবি লিপির ফলক দেখে-দেখে লিপি বিষয়ে সামান্য জ্ঞান অর্জন করেছিলুম। আরবিতে তিনটি হরফ চেনামাত্র বুঝতে পারলুম

এটাই সেই সিপাহিবিদ্রাহীদের নেত্রী শাহজাদি রেশমা বেগমের কবর, যাঁর ডাকে হাজার-হাজার হিন্দু-মুসলিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

হঠাৎ আমার মাথায় কথাটা এসে গেল। তা হলে কি রেশমা বেগমের অতৃপ্ত আত্মাই আমাকে কাল বিকেলে পথ দেখিয়ে তার কবরের কাছে আনতে চেষ্টা করেছিল? সেই রেশমা বেগমের আত্মাই কি দুর্বৃত্ত কাল্লুকে চাবুক মেরে রক্তাক্ত করেছিল?

শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে পড়ল। পাশের একটা লাল ফুলের গুচ্ছ ডাল থেকে ভেঙে বিদ্রোহিনীর কবরে রেখে মাথা ঠেকালুম। সেই মুহূর্তে স্নিগ্ধ একটা হাওয়া ভেসে এল। সেই হাওয়ায় যেন পুরোনো ইতিহাসের সুঘ্রাণ টের পেলুম। মনে-মনে বললুম,—প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়িকা বীরাঙ্গনা তুমি! তোমার জীবনকাহিনি আমাকে লিখতেই হবে।

এই সময় পাগলা ফকির এসে গেল। অট্টহাসি হেসে সে বলল,—বাবুজি! আপকা উপ্পর রেশমা বেটি বহত খুশ হ্যায়! তো আব আপ তুরন্ত হিঁয়াসে চলা যাইয়ে। রেশমা বেটিকো একেলা রহনে দিজিয়ে। বেটি জিন্দেগিমে বহত দুখ পায়ি। বহত দুখসে মর গেয়ি বেটিয়া!

তখনই নিঝুম কবরখানা থেকে চলে এলুম। ইতিহাসে এইসব আশ্চর্য ঘটনা লেখা যাবে না। সেগুলো আমার ব্যক্তিগত জীবনেই থেকে যাক।

হ্যাঁ—সেই অদ্ভুত ঘটনা এতদিন কাকেও বলিনি। এখন আমি বৃদ্ধ। মৃত্যুর আগে ঘটনাগুলি লিখে যাওয়া উচিত মনে করেই লিখে ফেললুম। এর সত্য-মিথ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুললে আমি নিরুত্তর থাকব।...

খুলি যদি বদলে যায়

এই অদ্ভুত ঘটনাটা আমার ছোটবেলায় ঘটেছিল। তখন আমার বয়স মোটে দশ বছর। আমাদের গ্রামের হাইস্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ি।

আমাদের গ্রামে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে খুব ধুমধাম হতো। ঠাকরুনতলার খোলামেলা বিশাল চত্বরে মেলা বসত। আশেপাশের সব গ্রাম থেকে মানুষজন এসে ভিড় জমাত।

সেবার রথের মেলার সময় দিদিমা এসেছিলেন। তিনি রথের মেলা দেখতে যাবেন শুনে মায়ের প্রচণ্ড আপত্তি। —না, না! মেলায় বড় ভিড় হয়। এদিকে বিষ্টিবাদলায় ঠাকরুনতলার চত্বরে বিচ্ছিরি কাদা। তা ছাড়া তোমার রোগা শরীর। দৈবাৎ পা পিছলে আছাড় খেলে কী হবে ভেবেছ?

দিদিমা মায়ের আপত্তি গ্রাহ্য করলেন না। আমার কাঁধে হাত রেখে হাসিমুখে বললেন,—এই পুঁটুদাদা আমার সঙ্গী হবে। তুমি কিচ্ছু ভেব না।

বেগতিক দেখে মা ডাকলেন,—ছোটকু! ও ছোটকু!

ছোটকু মানে আমার ছোটমামা। ছোটমামা আমাদের বাড়িতে থেকে মহকুমাশহরের কলেজে পড়তে যেতেন। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে রেললাইন গেছে। স্টেশনও আছে। ছোটমামা ট্রেনে চেপে কলেজ যেত।

মায়ের ডাকাডাকিতে ছোটমামার সাড়া পাওয়া গেল না। যাবে কী করে? ছোটমামাকে দুপুরে খাওয়ার পর সেজেগুজে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলুম। মাকে কথাটা জানিয়ে দিলুম। মা খাপ্পা হয়ে বললেন,—আসুক ছোটকু। দেখাচ্ছি মজা। ও থাকলে তোমাকে নিয়ে যেত।

দিদিমা বললেন,—আমার পুঁটুদাদামণিই যথেষ্ট। চলো ভাই!

মা আমার দিকে চোখ কটমটিয়ে বললেন,—দিদার সঙ্গী হয়ে তুমি যেন ভিড়ে হারিয়ে যেও না। দিদার একটা হাত শক্ত করে ধরে থাকবে।

আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আমার মায়ের সাড়া পেলুম। দিদিমার কাছে এসে তিনি বললেন,—এই ছাতিটা নিয়ে যাও মা! বৃষ্টিতে ভিজলে রোগা শরীরে আবার কী রোগ বাধিয়ে বসবে।

এবার দিদিমা চটে গেলেন। —রথযাত্রার মেলায় ছাতি মাথায় যাব? তুই জানিস? রথের পরবে বিষ্টিতে ভিজলে পুণ্যি হয়!

মা গম্ভীরমুখে বাড়ি ঢুকে গেলেন। দিদিমার একটা হাত ধরে আমি বললুম,— তুমি ঠিক বলেছ দিদা। বিষ্টিতে ভিজতে আমার খুব ভালো লাগে।

শর্টকাটে ঠাকরুনতলা আমাদের বাড়ি থেকে তত কিছু দূর নয়। সিঙ্গিমশাইয়ের আমবাগানের পাশ দিয়ে একটা ঘাসে ঢাকা পোড়ো জমি পেরিয়ে আমরা শিগগির রথের মেলায় পৌঁছে গেলুম। তারপরই পাঁপড়ভাজার গন্ধে জিভে জল এসে গেল। বললুম,—ও দিদা! আগে পাঁপড়ভাজা খাব।

দিদিমা বললেন,—খাবে বইকী। তুমি-আমি দুজনেই খাব। আগে রথদর্শন করি। তারপর অন্য কিছু।

এই মেলায় রথদর্শন ও প্রণাম ছিল মূল আকর্ষণ। জমিদারবাড়িতে একটা পেতলের রথ ছিল। সেটা রথযাত্রার দিন টেনে এনে ঠাকুরতলার শেষপ্রান্তে রাখা হতো। মাথায় লাল-কাপড়ের ফেট্টিবাঁধা পাইকরা লাঠি উঁচিয়ে সেই রথ পাহারা দিত। ভক্ত মানুষজন দূর থেকে প্রণাম করত।

কিন্তু সেই রথের দিকে দিদিমা এগোতেই পারলেন না। মা যেমন বলেছিলেন, —বিচ্ছিরি কাদা! বড্ড বেশি ভিড়!

অগত্যা দিদিমা বললেন,—আয় পুঁটুদাদা! ভিড় কমুক। তখন রথদর্শন করব।

আমি জেদ ধরলুম। —তাহলে ততক্ষণ পাঁপড়ভাজা খাওয়াও দিদা! নইলে আমি তোমাকে একা রেখে দৌড়ে বাড়ি চলে যাব।'

দিদিমা তখন আর কী করেন! ভিড় এড়িয়ে একটা পাঁপড়ভাজার দোকানে গেলেন। আমাকে একখানা পাঁপড়ভাজা কিনে দিয়ে সম্ভবত লোভ সম্বরণ করতে

পারলেন না। নিজেও একখানা পাঁপড়ভাজা কিনে ফেললেন। আর সেই সময় টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ মেলার মানুষজন সেই বৃষ্টিকে পাত্তা দেয়নি। ক্রমে বৃষ্টি বাড়তে থাকলে হইহট্টগোল শুরু হয়ে গেল। দিদিমা আমার হাত ধরে টানতে-টানতে ভাগ্যিস মেলার একপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। তা না হলে দুজনেই ভিড়ের চাপে দলা পাকিয়ে কাদায় পড়ে থাকতুম।

বৃষ্টি যত বাড়ছিল, তত মেঘ গর্জে উঠছিল। বিদ্যুতের ঝিলিক এবং মুহুর্মুহু কানে তালাধারানো মেঘগর্জন। এদিকে দুজনেই ভিজে কাকভেজা হয়ে যাচ্ছি। দিদিমা ব্যস্তভাবে বললেন,—ও পুঁটু! বাড়ি ফিরে চলো।

আবার সিঙ্গিমশাইয়ের বাগানের পাশ গিয়ে দুজনে ফিরে আসছিলুম। হঠাৎ দিদিমা বললেন,—এখানে গাছতলায় একটুখানি দাঁড়াও পুঁটু! আমি যে আর হাঁটতে পারছিনে।

বলে তিনি বসে পড়লেন। ততক্ষণে চারদিক কালো হয়ে এসেছে। একটু দূরে মেলার আলোগুলো জুগজুগ করছে। আমার অবস্থা তখন ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠার মতো। বললুম,—দিদা! এবার ওঠো!

দিদিমা কান্নাজড়ানো গলায় বললেন,—ও পুঁটু! আমি যে উঠতে পারছিনে। কোমরের পেছনে কে যেন কামড়ে ধরেছে।

শুনেই আমি প্রচণ্ড ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম,—ছোটমামা! ও ছোটমামা!

ছোটমামা কোথায় আছেন, তা জানতুম না। কিন্তু আমার গলা দিয়ে ওই কথাই বেরিয়ে গেল। দিদিমা যতবার ব্যথায় ককিয়ে উঠছিলেন, ততবার আমি ছোটমামাকে ডাকছিলুম।...

এরপর কীভাবে দিদিমা আর আমি বাড়ি ফিরেছিলুম, তা সবিস্তারে বলছি না। আমাদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে মা ছোটমামা আর বাবাকে ঠাকরুনতলায় পাঠিয়েছিলেন। মেলায় আমাদের খুঁজে না পেয়ে তাঁরা শর্টকাটে সিঙ্গিমশাইয়ের বাগানের পাশ দিয়ে আসছিলেন। তারপর টর্চের আলোয় আমাদের দেখতে পান।

বাড়ি ফিরে ছোটমামা হাসতে-হাসতে মাকে বলেছিলেন,—জানো দিদি? টর্চের আলো ফেলে দেখি, পুঁটু তখনও পাঁপড়ভাজা খাচ্ছে আর আমাকে ডাকাডাকি করছে। এদিকে মা-ও কিন্তু হাত থেকে পাঁপড়ভাজা ফেলে দেয়নি।

এই নিয়ে সে-রাত্রে বাড়িতে খুব হাসিতামাশা হল। কিন্তু পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি, দিদিমা যে ঘরে শুয়েছিলেন, সেই ঘরের দরজার সামনে পাড়ার মহিলাদের ভিড়। বাবা গম্ভীরমুখে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। দিদিমার ঘর থেকে চাপা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। বাবাকে কিছু জিগ্যেস করতে সাহস হল না।

একটু পরে ছোটমামার সঙ্গে আমাদের গ্রামের ডাক্তার নাড়ুবাবু বাড়ি ঢুকলেন। ছোটমামার হাতে তাঁর ডাক্তারি বাকসো। নাড়ুবাবুকে দেখে পাড়ার মহিলারা দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন। সেই সুযোগে আমি গিয়ে দরজায় উঁকি দিলুম। দেখলুম, দিদিমা

বিছানায় শুয়ে আছেন এবং মাঝে-মাঝে আর্তস্বরে বলছেন,—উহুহুহু! ও ঠাকুর! এ কী হল? কে আমার কোমরে কামড়ে দিল?

নাড়ুডাক্তার দিদিমাকে পরীক্ষা করে দেখে বললেন,—পুরোনো বাত। সারতে একটু দেরি হবে।....

যাই হোক, দিদিমা সেই যে শয্যাশায়িনী হলেন তো হলেন। নাড়ুডাক্তারের মোক্ষম সব ইঞ্জেকশন আর ওষুধে কাজ হল না। এরপর শহরের ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন বাবা। তিনিও দিদিমাকে বিছানা থেকে ওঠাতে পারলেন না। কোমরের যন্ত্রণাও কমল না। শেষে এলাকার নামকরা কবিরাজমশাইকে আনা হল। লোকে তাঁকে 'সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী' বলত। কিন্তু তাঁর ওষুধেও কাজ হল না। আমার মনে পড়ে, প্রতিদিন ভোরবেলা হামানদিস্তার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যেত। দেখতুম, মা বারান্দায় বসে ছোট্ট গোলাকার লোহার পাত্রে একটা ছোট্ট লোহার ডাণ্ডা দিয়ে কিছু পিষছেন। ছোটমামার কাছে শুনেছিলুম, 'ধন্বন্তরী' কবিরাজমশাইয়ের দেওয়া ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে। সেই ওষুধ দিদিমার কোমরে প্রলেপ দেওয়া হবে।

কিছুদিন পরে এক রবিবার সিঙ্গিবাড়ির কাকিমা দিদিমাকে দেখতে এলেন। তিনিই মাকে পরামর্শ দিলেন,—সবরকম চিকিৎসা তো করা হল। কিন্তু কাজ হল না। এবার টোটকা ওষুধ বা তুকতাক, মন্তরতন্তরে যদি বাত সারে, চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?

মা বললেন,—আমিও তা-ই ভাবছিলুম। কিন্তু তেমন কাকেও পাচ্ছি কোথায়?

সিঙ্গিবাড়ির কাকিমা বললেন,—কেন? তেমন লোক তো হাতের কাছেই আছে। কথায় বলে, গেঁয়ো যোগী ভিক্ষে পায় না।

—কে সে?

—মোনা-ওঝা। আবার কে? ওই যে তোমার মা বারবার বলেন, কোমরে কে কামড়ে ধরে আছে, তাতেই তো আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল। তোমরা কী ভাববে বলে কথাটা বলিনি। আমাদের আমবাগানে একটা গাছ আছে। সেই গাছের তলায় বৃষ্টির সময় তোমার মা—থাকগে ওসব কথা। মোনাকেই ডাকো!

কথাটা শুনে আমি আঁতকে উঠেছিলুম। আমার মনে পড়েছিল, সিঙ্গিমশাইয়ের আমবাগানে দুলেপাড়ার একটা মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কী ভুল! কী ভুল! রথের মেলায় যাওয়ার দিন সেই কথাটা একেবারে মনে ছিল না! নির্ঘাত আমরা সেই গাছটারই তলায় বৃষ্টির সময় আশ্রয় নিয়েছিলুম।

ছোটমামা বিকেলে মোনা-ওঝাকে ডেকে নিয়ে এলে ওর প্রমাণ মিলল। মোনা-ওঝার মাথায় জটা, মুখে গোঁফদাড়ি। কপালে লাল ত্রিপুণ্ড্রক আঁকা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কাঁধের তাপ্পিমারা গেরুয়া রঙের ঝোলা থেকে সে একটা মড়ার খুলি বের করে দিদিমার ঘরে ঢুকল। তারপর মেঝেয় বসে মড়ার খুলিটা রেখে সে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ডাকল,—ওগো মা! ও জননী! বলুন তো আপনার কোথায় ব্যথা?

দিদিমা ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে বললেন,—কোমরের পেছনে।

—ব্যথাটা কীরকম বলুন তো মা?

দিদিমা একটু ককিয়ে উঠে বললেন,—কে যেন কামড়ে ধরে আছে।

মোনা-ওঝা হি-হি করে হেসে বলল,—বুঝেছি! বুঝেছি! এবার বলুন তো মা জননী, কবে কখন ব্যথাটা শুরু হয়েছিল?

মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মোনা তাঁকে চোখের ইশারায় চুপ করাল। দিদিমা অতিকষ্টে বললেন,—পুঁটুর সঙ্গে রথের মেলায় গিয়েছিলুম। হঠাৎ বিষ্টি এল। আমরা সিঙ্গিমশাইয়ের আমবাগানে এসে—

মোনা-ওঝা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল,—থাক, থাক। আর বলতে হবে না। বলে সে মড়ার খুলিটার দিকে রাঙা চোখে তাকাল। —শুনলি তো বাবা মা-জননীর কথাটা? এবার তুই আমার কানে-কানে বলে দে, কী করে ওই হতচ্ছাড়ি পেতনিটাকে তাড়ানো যায়?

সে মড়ার খুলিটা কানের কাছে কিছুক্ষণ ধরে ফোঁস করে সশব্দে শ্বাস ছাড়ল। তারপর বলল,—হুঁ। গলায় দড়ি দিয়ে মরা আত্মা। পেতনি হয়ে গেছে। মা-জননীর কোমর কামড়ে ধরে জ্যান্ত মানুষদের ওপর রাগ দেখাচ্ছে।

বলে মোনা-ওঝা মায়ের দিকে তাকাল,—দিদি! খুলেই বলছি। এ পেতনিকে তাড়ানো আমার কম্ম নয়। কালিকাপুরে বাবা কন্ধকাটার থান আছে। সেই থানের খানিকটা মাটি তুলে এনে মা-জননীর কোমরে মাখিয়ে দিলেই পেতনিটা পালিয়ে যাবে।

ছোটমামা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বললেন,—কালিকাপুর আমি চিনি। গতবার ফুটবল খেলতে গিয়ে একটা রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখেছিলুম। জায়গাটা একেবারে জঙ্গল হয়ে আছে।

মোনা-ওঝা উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—বাবা কন্ধকাটার থান সেই জঙ্গলের মধ্যিখানে। একটা ভাঙা দেউড়ি এখনও উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে একটা বটগাছ। বটগাছের তলায় বাবা কন্ধকাটার থান।

ছোটমামা বললেন,—কুছ পরোয়া নেই। এখনই বেরিয়ে পড়ছি। সওয়া চারটের ট্রেনটা পেয়ে যাব। মোটে তিনটে স্টেশন।

মোনা জিভ কেটে বলল,—উঁ হুঁ হুঁ হুঁ! কন্ধকাটা কথাটা দাদাবাবু কি বুঝতে পেরেছেন? মুন্ডু নেই। বুকের দুপাশে দুটো চোখ। সাংঘাতিক ব্যাপার! আপনাকে থানে দেখতে পেলেই সর্বনাশ। তিনি বটগাছে লুকিয়ে থাকেন।

মা করুণমুখে বললেন,—তা হলে তুমি নিজেই সেই থানের মাটি এনে দাও না মোনা!

মোনা হাসল। —ওরে বাবা! আমাকে থানের ত্রিসীমানায় দেখলে বাবা কন্ধকাটা রে-রে করে তেড়ে আসবেন। তবে তাঁর থানের মাটি আনার সহজ উপায় আছে। বাবা কন্ধকাটা ছোটদের খুব ভালোবাসেন। এই খোকাবাবু থানে গিয়ে এক খাবলা মাটি তুলে রুমালে বেঁধে আনে, বাবা মোটেও রাগ করবেন না।

কথাটা শুনে আমি আঁতকে উঠে বললুম,—আমি একা ওখানে যেতে পারব না।

ছোটমামা বললেন,—কী বোকার মতো কথা বলছিস পুঁটু? আমি তোর সঙ্গে যাব। তারপর আমি ঝোপের আড়ালে বসে থাকব। তুই থানের মাটি নিয়ে আসবি। কিচ্ছু ভাবিস নে! কন্ধকাটা হোক, আর যে ব্যাটাচ্ছেলেই হোক, আমার সামনে এলে অ্যায়সা একখানা ঝাড়ব না—কথা শেষ না করে ছোটমামা ফুটবলে কিক করার ভঙ্গিতে শূন্যে লাথি ছুড়লেন।

তারপর ছোটমামা আমার একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বারান্দায় গেলেন। বললেন,—এক মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নে। আমি রেডি হয়েই আছি। চারটে বাজে। স্টেশনে পৌঁছতে এখনও প্রচুর সময় আছে। এই ট্রেনটা দৈবাৎ লেট করলে তো ভালোই হবে।...

তখনকার দিনে ট্রেনে বা বাসে মোটেও ভিড় হতো না। লোকেরা পায়ে হেঁটেই যাতায়াত পছন্দ করত। ট্রেনে যে কামরায় আমরা উঠেছিলুম, তাতে মোটে জনাতিনেক যাত্রী। তারা পরস্পর দূরে জানালার কাছে বসে ছিল। ছোটমামা নিজে একটা জানালার ধারে বসে বললেন,—তুই আমার পাশে বোস পুঁটু! জানালার ধারে বসলে কয়লার গুঁড়ো এসে চোখে ঢুকে যাবে।

একটু তফাতে এক ভদ্রলোক জানালার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিলেন। তাঁর মাথায় সিঁথিকরা লম্বা ঘাড় ছুঁই-ছুঁই কাঁচাপাকা চুল। পরনে ধুতি আর ছাইরঙা পাঞ্জাবি। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর নাকের পাশে মোটা একটা জড়ুল। কাঁধের ব্যাগটা পাশে সিটের ওপর রেখে তিনি চিবুকে একটা হাত এবং মাথায় একটা হাত চেপে মাথাটা নড়িয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা ছোটমামারও চোখে পড়েছিল। ফিসফিস করে বললেন,—পাগল নাকি রে?

আশ্চর্য ব্যাপার! ট্রেনের তুলকালাম শব্দের মধ্যেও কথাটা কি ভদ্রলোকের কানে গেল? তিনি একটু হেসে বললেন,—পাগল হইনি এখনও! তবে পাগল হতে বেশি দেরি নেই!

ছোটমামা বললেন,—কিছু মনে করবেন না। আপনি নিজের মুন্ডুটা ধরে অমন করে নাড়ানাড়ি করছেন কিনা? তাই মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক এবার দুটো হাত দুই গালে চেপে মাথাটা কিছুক্ষণ নাড়ানাড়ি করে বললেন,—এই এক বিপদ হয়েছে আমার। মুন্ডুটা কিছুতেই ঘাড়ের সঙ্গে ফিট করছে না।

ছোটমামা জিগ্যেস করল,—আপনার ঘাড়ে কি বাত হয়েছে?

—কেন? কেন?

—মানে—আমার মায়ের কোমরে বাত হয়েছে তো! সাংঘাতিক বাত। মা দিদিকে বলেন, তাঁর কোমর ধরে আপনার মতো নাড়ানাড়ি করো। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। তাই আমরা যাচ্ছি কালিকাপুরে বাবা কন্ধকাটার থানে।

ভদ্রলোক এবার খিকখিক করে হেসে বললেন,—আরে! আমিও তো সেখানেই যাচ্ছি।

ছোটমামা গম্ভীরমুখে বললেন,—বাবা কন্ধকাটা তাঁর থানে বড়দের দেখতে পেলেই রে-রে করে তেড়ে আসেন। তাই এই যে দেখছেন ভাগনে পুঁটু। একে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। বাবা কন্ধকাটা ছোটদের খুব ভালোবাসেন।

—তাই বুঝি? তা তোমার ভাগ্নে সেখানে গিয়ে কী করবে?

—থানের মাটি খাবলে তুলবে। রুমালে বেঁধে নিয়ে আসবে। সেই মাটি গুলে মায়ের কোমরে মাখিয়ে রাখলে বাত সেরে যাবে, বুঝলেন?

ভদ্রলোক আবার দু-হাত দিয়ে তাঁর মুন্ডুটা নাড়ানাড়ি শুরু করলেন। তারপর বললেন,—উঃ! বড্ড জ্বালায় পড়া গেল দেখছি। মনে হচ্ছে যেন আমার মুন্ডুটা ঘাড় থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

ছোটমামা বললেন,—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। বাবা কন্ধকাটার থানে যাওয়া পর্যন্ত মুন্ডুটাকে চেপে ঘাড়ে বসিয়ে রাখুন। তারপর আপনি আর আমি ঝোপের আড়ালে বসে থাকব। আর পুঁটু আপনার জন্যও খানিকটা মাটি এনে দেবে। ওখানে একটা ঝিল আছে দেখেছি। আপনি মাটিগুলো তুলে কাদা করে মুন্ডুর পেছনদিকে ঘাড় অব্দি মাখিয়ে রাখবেন। ব্যস!

ভদ্রলোক শুধু বললেন,—দেখা যাক।...

কালিকাপুর স্টেশনে নামবার পর একদল বরযাত্রী বর-কনে নিয়ে হইহই করে ট্রেনে উঠছিল। সেই ভিড়ে ভদ্রলোককে আর দেখতে পেলুম না।

কথাটা ছোটমামাকে বললুম। ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন,—ছেড়ে দে তো পাগলের কথা। দেখেই বুঝেছিলুম বদ্ধপাগল। পা চালিয়ে চল। সাড়ে ছ'টার ট্রেনে আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে ছোটমামা হাঁটার গতি কমালেন। সামনেই ধ্বংসস্তূপ আর ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতরে উঁচু ভাঙা পাঁচিল দেখা যাচ্ছিল। সেটা লক্ষ করে দুজনে জঙ্গলে ঢুকলুম। তারপর বটগাছটাও চোখে পড়ল। ছোটমামা একটা ঝোপের আড়ালে বসে ফিসফিস করে বললেন,—কুইক পুঁটু! মাটিটা বৃষ্টিতে নরম হয়ে আছে। এই রুমালটা নে। যতটা পারবি, খাবলে মাটি তুলে নিবি। চলে যা।

ভয়ে-ভয়ে এগিয়ে গেলুম। উঁচু ভাঙা পাঁচিলের পাশে বটগাছটার কাছে গিয়ে দেখলুম, গুঁড়ির নিচে একটা প্রকাণ্ড ইটের চাঙড়। তার ওপর একটা মড়ার খুলি।

খুলিটা দেখামাত্র আঁতকে উঠে কয়েক-পা পিছিয়ে এলুম। কিন্তু দিদিমার বাতের কষ্টের কথা মনে পড়ল। তখন সেখানেই গুঁড়ি মেরে বসে রুমাল বিছিয়ে কয়েক খাবলা মাটি তুলে নিলুম। তারপর মাটিগুলো রুমালে বেঁধে সবে উঠে দাঁড়িয়েছি, তখনই দেখলুম ট্রেনের সেই ভদ্রলোক পাঁচিলের পাশ দিয়ে চুপিচুপি আসছেন। তাঁর দৃষ্টিটা মড়ার খুলির দিকে।

তারপর দেখলুম, ভদ্রলোক তাঁর কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা মড়ার খুলি বের

করলেন এবং ইটের চাঙড়ে সেই খুলিটা রেখে থানের মড়ার খুলিটা তুলে নিয়ে পাঁচিলের আড়ালে উধাও হয়ে গেলেন।

ছোটমামা ঝোপের আড়ালে থেকে ব্যাপারটা দেখছিলেন। এবার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন,—আয় তো পুঁটু! ব্যাপারটা দেখি।

ছোটমামা তখন বেপরোয়া। বাবা কন্ধকাটার কথা ভুলে ভাঙা পাঁচিলের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেলেন। আমিও ছোটমামাকে অনুসরণ করলুম। কিছুটা দৌড়ে গিয়েই ভদ্রলোককে দেখা গেল। তিনি সামনের দিকে হনহন করে এগিয়ে চলেছেন। ছোটমামা চেঁচিয়ে উঠলেন,—ও মশাই! ও মশাই! শুনুন! শুনুন!

ভদ্রলোক মুখটা ঘোরালেন। দেখে চমকে উঠলুম। এ মুখ তো সেই মুখ নয়। লম্বা চুল নেই। প্রকাণ্ড গোঁফ আছে। ট্রেনের তিনি ছিলেন ফরসা। ইনি কুচকুচে কালো। অথচ সেই ছাইরঙা পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি।

ছোটমামার একরোখা জেদি স্বভাব আমার জানা। দৌড়ে তাঁর কাছাকাছি গিয়ে আবার যেই বলেছেন,—ও মশাই। ব্যাপারটা কী? অমনি ভদ্রলোক আবার মুখ ঘোরালেন। বিকেলের রোদ পড়েছিল সেখানে। আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে দেখলুম, এবার আর মানুষের মুখ নয়। আস্ত মড়ার খুলি।

ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। আর তারপরই ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। আমার পাশ দিয়ে কী একটা ছুটে গেল। আমি আতঙ্কে প্রায় কেঁদে উঠে ডাকলুম,—ছোটমামা! ছোটমামা!

ছোটমামাও যেন হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার ডাক শুনে দৌড়ে চলে এলেন। তারপর দেখলুম, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সেই কঙ্কালের সঙ্গে গেরুয়া খাটো লুঙ্গিপরা আর একটা কঙ্কালের ঘুষোঘুষি চলেছে। ছোটমামা হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, —কী বিচ্ছিরি ব্যাপার! ছ্যা-ছ্যা! মরে গিয়েও কি মারামারি করা উচিত? বল তো পুঁটু!

কান্নাজড়ানো গলায় বললুম,—ছোটমামা! আমরা পালিয়ে যাই।

ছোটমামা আমার হাত থেকে রুমালে বাঁধা মাটিগুলো নিয়ে বললেন,—পালাব কেন রে? আস্তেসুস্থে যাব। মরুক ব্যাটাচ্ছেলেরা মারামারি করে! ছ্যা-ছ্যা! এ কি ভদ্রলোকের কাজ? বাবা কন্ধকাটা হয়তো মজা দেখছেন।

চলে আসবার আগে দেখলুম, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কঙ্কাল আর গেরুয়া খাটো লুঙ্গিপরা কঙ্কাল পরস্পরকে জাপটে ধরে একটা ঝোপের মধ্যে প্রচণ্ড লড়ে যাচ্ছে। আর ঝোপটা খুব নড়ছে।...

এসবের চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার, বাবা কন্ধকাটার থানের মাটি দিদিমার কোমরে মাখিয়ে রাখার পরদিনই তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পেরেছিলেন। মোনা-ওঝা এসে ছোটমামার মুখে সব ঘটনা শুনে বলেছিল,—লড়াইটা খুলি বদলের। বুঝলেন ছোটবাবু? গত বছর অনেক জায়গায় খুব বানবন্যা হয়েছিল। অনেক মানুষ জলে ডুবে মারা পড়েছিল। সে-ও তো অপঘাতে মরণ। আর অপঘাতে মরলেই মানুষ ভূত হয়ে যায়।

কিন্তু ভূত হলে কী হবে? দেহের ওপর মায়া কি সহজে যায়? কিন্তু দেহ তো তখন কঙ্কাল! আমার মনে হচ্ছে, ওই দুই ভূতের মধ্যে খুলি বদল হয়ে গিয়ে গণ্ডগোল বেধেছিল।

ছোটমামা বলেছিলেন,—ঠিক বলেছ মোনাদা! একজন ছিলেন সাদাসিধে ভদ্রলোক। অন্যজন ছিলেন কোনও সাধুবাবা।

দিদিমা বলেছিলেন,—তা না হয় বুঝলুম। কিন্তু যে যার নিজের খুলি ফেরত পেয়ে মারামারি বাধাল কেন?

ছোটমামার অমনি জবাব,—মনে হচ্ছে, সাধুবাবার ভূতের জন্য সেই ভূত ভদ্রলোক যে খুলিটা থানে রেখেছিলেন, সেটা সাধুবাবার খুলিই নয়। মাথায় ফিট করেনি বলেই দৌড়ে গিয়ে সাধুবাবা খটাখট ঘুষি মারছিল ভূত-ভদ্রলোককে।

মোনা-ওঝা খিকখিক করে হেসে বলেছিল,—ওসব কথা থাক। মা-জননীর কোমর থেকে পেতনিটা পালিয়ে গেছে। তবে জোরে কামড়ে ধরেছিল তো? তাই ব্যথা পুরোপুরি সারতে আর দিনতিনেক লাগবে।

হ্যাঁ। মোনা ঠিকই বলেছিল। তিনদিন পরে দিদিমা দিব্যি হাঁটাচলা করতে পেরেছিলেন।...

হরির হোটেল

স্টেশনে ট্রেন থামতে-না-থামতেই যাত্রীদের মধ্যে হুলস্থুল বেধে গিয়েছিল। ভিড়ে ঠাসা কামরা। পিছন থেকে প্রচণ্ড চাপ আর গুঁতো টের পাচ্ছিলুম। তারপর দেখলুম, কেউ-কেউ আমার কাঁধের ওপর দিয়ে কসরত দেখিয়ে সামনে চলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে চ্যাঁচামেচি চলেছে। অবশেষে ঠেলা খেতে-খেতে যখন প্ল্যাটফর্মে পড়লুম, তখন আমার ওপর দিয়ে অসংখ্য জুতো-পরা পা ছুটে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টার পর উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, অন্য সব কামরা থেকেও পিলপিল করে মানুষ বেরিয়ে স্টেশনের গেটের দিকে ছুটে চলেছে।

রাগ করে লাভ নেই। কার ওপরই বা রাগ করব! নিমেষে প্ল্যাটফর্ম নির্জন নিঝুম হয়ে গেল। কাঁধের ব্যাগ আর পোশাক ঝেড়েঝুড়ে রুমালে মুখ মুছলুম। ট্রেনটা হুইসল বাজিয়ে আস্তেসুস্থে চলে গেল। সেই সময় হঠাৎ মাথায় এল, ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছিল সম্ভবত। তাই অত সব যাত্রী প্রাণভয়ে ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে গেল!

এতক্ষণে ভয় পেলুম। রাত আটটা বাজে। প্ল্যাটফর্মে আর স্টেশনঘরে আলো জ্বলছে। গেটে মানুষজন নেই। সেখানে গিয়ে একটু দাঁড়ালুম। ডাকাতরা ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনঘরে ঢুকে হামলা করেছে কি না দেখবার জন্য উঁকি মারলুম।

নাঃ। স্টেশনঘরে উর্দিপরা এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছেন। তাঁকে বললুম,—একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি?

তিনি চোখ না খুলেই বললেন,—পারেন। তবে আপনার বরাতে হরির হোটেল আছে।

অবাক হয়ে বললুম,—হরির হোটেল মানে?

—হুঁ। এ তল্লাটে নতুন এসেছেন। যাবেন কোথায়?

—কাঞ্চনপুর।

—সেখানে কার বাড়ি যাবেন?

একটু বিরক্ত হয়ে বললুম,—সেখানে আমার বন্ধুর বাড়ি।

রেলকোট পরা ভদ্রলোক এবার চোখ খুলে একটু হেসে বললেন,—হুঁ। আপনার বন্ধু আপনাকে এখানকার হালহদিশ কিছুই জানাননি দেখছি। তা কী আর করবেন? হরির হোটেল এখন আপনার ভবিতব্য।

কথা না বাড়িয়ে বললুম,—গেটে টিকিট নেওয়ার লোক নেই। টিকিটটা নেবেন কি?

—টিকিট কেটেছেন? তা এ তল্লাটে নতুন প্যাসেঞ্জার। টিকিট কাটবেন বইকী। ইচ্ছে হলে দিন। না হলে দেবেন না।

বুঝলুম, এই ভদ্রলোকই স্টেশনমাস্টার। মাথায় হয়তো ছিট আছে। টিকিটটা ওঁর সামনে টেবিলে রেখে বললুম,—আচ্ছা, এবার বলুন তো, অতসব যাত্রী ট্রেন থেকে ওভাবে মরিয়া হয়ে নেমে দৌড়ে পালাল কেন?

—আজ যে শনিবার। তাতে ট্রেন চার ঘণ্টা লেট।

—বুঝলুম না।

—বুঝতে পারবেন। গেট পেরিয়ে নিচের চত্বরে যান।

গেট পেরিয়ে গিয়ে দেখি, কয়েক ধাপ সিঁড়ির নিচে একটা খোলামেলা জায়গা। একপ্রান্তে কিছু দোকানপাট। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় লক্ষ করলুম, চত্বর একেবারে জনহীন। আমার সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নির্মল বলেছিল, স্টেশন থেকে নামলেই বাস, সাইকেলরিকশো বা এক্কা ঘোড়ার গাড়ি একটা কিছু পেয়ে যাব। কিন্তু কোথায় তারা?

একটা চায়ের দোকানে আলো জ্বলছিল। সেখানে গিয়ে বেঞ্চে বসে বললুম,—পরের বাস কটায় দাদা?

চা-ওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল,—বাবুমশাইয়ের আসা হচ্ছে কোত্থেকে?

—কলকাতা।

—ঠিক, ঠিক। তা যাওয়া হবে কোথায়?

—কাঞ্চনপুর। পরের বাস কখন আসবে?

—বাবুমশাই! এ রাত্তিরে আর বাস আসবে না। আসবে সেই ভোরবেলা। কেননা রাত্তিরে তো এই স্টেশনে আর কোনও ট্রেন থামে না।

—সাইকেলরিকশো বা একাগাড়ি?

চা-ওয়ালা হাসল। —আজ্ঞে না। খামোকা কেন রাত্তিরবেলা ওরা আসবে? বাবুমশাই! আপনি বড্ড ভুল করেছেন। আসবার সময় দেখেননি সোনাগড় জংশনে হঠাৎ ট্রেনের কামরায় বেজায় ভিড় হয়েছিল?

মনে পড়ে গেল। বললুম,—তুমি ঠিক বলেছ। কামরা একেবারে ফাঁকা ছিল। হঠাৎ ওই জংশনে ভিড়ের চাপে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলুম।

—ব্যাপারটা হল, এ তল্লাটের অসংখ্য লোক সোনাগড়ে কলকারখানায় চাকরি করে। তারা প্রতি শনিবারে বাড়ি ফেরে। রোববারটা কাটিয়ে আবার সোমবার সোনাগড় যায়। আপনি যদি ট্রেন থেকে নেমেই ওদের সঙ্গে দৌড়ে আসতেন, তা হলে হয়তো বাসে বা সাইকেলরিকশো, নয়তো একাগাড়িতে ঢুকে যেতে পারতেন। হ্যাঁ—সহজে পারতেন না। একটু কসরত করতে হতো, এই যা!

এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। নির্মলের ওপর রাগ হল। এই ব্যাপারটা আমাকে তার খুলে বলা উচিত ছিল।

কিন্তু আর রাগ করে লাভ নেই। তাছাড়া নির্মলের মেয়ের অন্নপ্রাশন কাল রবিবার। আমি কবে যাব, নির্দিষ্ট করে তাকে তো বলিনি! শুধু বলেছিলুম,—নিশ্চয় যাব। শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করিস।

বললুম,—এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করা যায় না দাদা?

চা-ওয়ালা গম্ভীরমুখে মাথা নাড়ল,—না বাবুমশাই! উনুনে আমার রাতের রান্না শেষ করে জল ঢেলে দিয়েছি। আর চা করার কোনও উপায় নেই।

—আচ্ছা, এখানে হরির হোটেলটা কোথায়?

লোকটা যেন চমকে উঠল।—হরির হোটেল? এর আগে কখনও হরির হোটেলে খেয়েছিলেন নাকি?

—না। আমি এই প্রথম এখানে আসছি। হরির হোটেলের কথা স্টেশনমাস্টারের মুখে শুনলুম।

—ও। হরির হোটেলে যখন যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে, চলে যান। তবে একটু দেখেশুনে যাবেন।

বলে চা-ওয়ালা আমার মুখের সামনেই দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিল। এখানে দেখছি সবই অদ্ভুত। লোকজনও অদ্ভুত! হরির হোটেলে যেতে দেখেশুনে যাব কেন? কিছু বোঝা গেল না।

এতক্ষণে চাঁদ আরও উজ্জ্বল হয়েছে। সব দোকানপাট বন্ধ। শুধু শেষদিকটায় আলো জ্বলছে। সেখানে গিয়ে দেখলুম, একটা ঘর খোলা আছে। দরজার কাছে টেবিলের সামনে একজন রোগাটে গড়নের কালো রঙের লোক বসে আছে। পরনে ধুতি আর হাতকাটা ফতুয়া। ভেতরে দু-সারি লম্বা বেঞ্চের সঙ্গে উঁচু ডেস্ক আঁটা। দেখেই বোঝা যায় এটা একটা হোটেল।

এই তা হলে হরির হোটেল? লোকটি আমাকে দেখেই কেন যেন সবিনয়ে

করজোড়ে নমস্কার করল। আমিও নমস্কার করে বললুম,—এটাই কি হরিবাবুর হোটেল?

সে জিভ কেটে মাথা নেড়ে বলল,—আজ্ঞে স্যার, দয়া করে আমাকে বাবু বলবেন না। আমি একজন সামান্য লোক। বাইরে টাঙানো সাইনবোর্ড দেখুন! লেখা আছে অন্নপূর্ণা হোটেল। কিন্তু এ তল্লাটে সবাই বলে হরির হোটেল।

ঠিক এই সময় আমার মনে পড়ে গেল, আজ বেলা এগারোটায় খেয়েছি। তারপর ট্রেনে বার তিনেক বিস্বাদ চা। আর একই সময়ে ডাল-ভাত-মাছের ঝোলমিশ্রিত লোভনীয় খাদ্যের তীব্র ঘ্রাণ আমার বাঙালি পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধার উদ্রেক করল।

সটান হোটেলে ঢুকে কাছের বেঞ্চে বসলুম। ব্যাগটা একপাশে রেখে বললুম, —আমার খুব খিদে পেয়েছে। শিগগির ব্যবস্থা করুন হরিবাবু। ডাল-ভাত যা হোক—

হরি ডাকল,—খ্যাঁদা! ও খেঁদু! ঘুমোলি নাকি?

ভেতর থেকে ঢোলা হাফপ্যান্ট পরা একটা নাদুসনুদুস গোলগাল গড়নের যুবক এসে একগাল হেসে বলল,—তখন তোমাকে বলেছিলুম না হরিদা, দু-মুঠো চাল বেশি করে নিই? আর তরকারি তো অনেক আছে।

হরি বলল,—তা হলে স্যারকে একখানা পুরো মিল দে!

কিছুক্ষণের মধ্যে গোগ্রাসে এক থালা ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ পরম তৃপ্তিতে খেয়ে ঢেঁকুর উঠল। হাতমুখ ধুয়ে এবং মুছে বললুম,—অপূর্ব! খাসা আপনার হোটেলের রান্না! খেয়ে এমন তৃপ্তি জীবনে পাইনি!

হরি বলল,—অথচ ব্যাটাচ্ছেলেরা আমার হোটেলের বদনাম রটায়! কী আর বলব স্যার? আমার নামে থানায় পুলিশের কাছে নালিশ পর্যন্ত করেছিল। যাকগে সে-সব কথা। আপনি আমার অতিথি। আপনার কাছে দাম নেব না।

কিছুতেই হরি মিলের দাম নিল না। অবশেষে বললুম,—ঠিক আছে। তাহলে আমাকে রাত্রে থাকার জন্য একটা ঘর ভাড়া দিন।

হরি জিভ কেটে বলল,—ঘর তো নেই স্যার! আমার হোটেল শুধু খাওয়ার হোটেল। এখানে থাকার ব্যবস্থা নেই। আমি আর খ্যাঁদা ওপরের ঘরে রাত্তির কাটাই। নিচে কি থাকবার জো আছে? নানা উপদ্রবের চোটে অস্থির হতে হবে।

—কী উপদ্রব? হরিবাবু! আমি এই বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটাতে পারব। কোনও উপদ্রব গ্রাহ্য করব না।

হরি হাসল। —আপনার মাথা খারাপ? কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমারও খিদে পেয়েছে। তা আপনি যাবেন কোথায়?

—কাঞ্চনপুর।

—দিব্যি জ্যোৎস্না-রাত্তির! মোটে তো তিন কিলোমিটার রাস্তা। হাঁটতে-হাঁটতে চলে যান। কোনও ভয় করবেন না। আমাদের এ তল্লাটে আর যা কিছু থাক, চোর-ছিনতাইবাজ-ডাকাত নেই। মনের আনন্দে গান গাইতে-গাইতে চলে যান।

অগত্যা হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছি, হরি হঠাৎ ব্যস্তভাবে ডাকল,—স্যার! শুনুন স্যার!

ঘুরে দাঁড়ালুম। সে আমাকে অবাক করে ছ'টা অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট আমার হাতে গুঁজে দিল। বললুম,—অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট কী হবে?

হরি মুচকি হেসে বলল,—বাইরের মানুষ! হরির হোটেলে খেয়েছেন। যদি দৈবাৎ অম্বল হয়-টয়! আপনি আমার এ রাত্তিরের একমাত্র খদ্দের স্যার! আপনি আমার সার্টিফিকেটও বটে।

বলে সে হোটেলে ফিরে গেল। আমি এতক্ষণে একটু চিন্তায় পড়লুম। খেতে তো সবই সুস্বাদু মনে হচ্ছিল। তাই খেয়েছিও প্রচুর। প্যান্টের বেল্ট ঢিলে করতে হয়েছে। কিন্তু অ্যান্টাসিড কেন?

দুধারে মাঠ। নির্জন পিচরাস্তায় গুনগুন করে সত্যিই মনের আনন্দে গান গাইতে-গাইতে হাঁটছিলুম। জ্যোৎস্নায় চারদিক বেশ স্পষ্ট। কিছুদুর চলার পর মনে হল পেট বেজায় ওজনদার হয়ে উঠছে। তখন দুটো অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট মুখে পুরে চুষতে থাকলুম।

আরও কিছুদূর হাঁটার পর পেটের ওজন কমেছে মনে হল। সেইসময় নেহাত খেয়ালবশে একবার পিছু ফিরে দেখি, আমার পিছনে কেউ হেঁটে আসছে। একজন সঙ্গী পাওয়া গেল ভেবে দাঁড়িয়ে গেলুম। অমনি সেই লোকটাও দাঁড়িয়ে গেল। বললুম,—কে?

কোনও সাড়া এল না। একটু ভয় পেলুম। ছিনতাইবাজ বা ডাকাত নয় তো? চলার গতি বাড়ালুম। তারপর এক অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ করলুম। যতবার পিছনে তাকাচ্ছি, দেখছি জ্যোৎস্নায় কালো রঙের মূর্তির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশের মাঠ থেকে একজন-দুজন করে আরও লোক এসে সেই ছায়ামিছিলকে বাড়িয়ে তুলছে। অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচামেচি করে বললুম,—তোমরা যেই হও, আমার কাছে ডাকাতি করার মতো মালকড়ি নেই। বন্ধুর মেয়ের অন্নপ্রাশনে উপহার দিতে কিছু পুতুল আর জামা কিনেছি। নগদ টাকাকড়ি যা আছে, তা তোমরা কেড়ে নিয়ে ভাগাভাগি করলে প্রত্যেকে একটা আধুলির বেশি পাবে না। কাজেই তোমরা কেটে পড়ো।

আশ্চর্য ব্যাপার, কালো-কালো মানুষের দল স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আবার কিছুটা হেঁটে গিয়ে ঘুরে দেখি, তারা সমান দূরত্বে আমাকে অনুসরণ করছে। এরা কারা? অজানা ত্রাসে শিউরে উঠলুম। সাহস দেখিয়ে খুব চেঁচিয়ে বললুম,—সাবধান। আমার কাছে রিভলভার আছে। আমি কিন্তু পুলিশের লোক। গুলি করে মুন্ডু উড়িয়ে দেব।

কিন্তু এই হুমকিতেও কাজ হল না। আমি যত দ্রুত হাঁটছি, তারা একই দূরত্বে নিঃশব্দে হেঁটে আসছে। আমি থমকে দাঁড়ালে তারাও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

এই অদ্ভুত ছায়াকালো মিছিল পিছনে নিয়ে হেঁটে চলা সহজ ছিল না। আমার

গলা তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে। সঙ্গে জলের বোতল নেই। এমনকী একটা টর্চও আনিনি। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আমি দৌড়ুতে শুরু করলুম। দৌড়তে-দৌড়তে যতবার পিছু ফিরে তাকাচ্ছি, সেই বিভীষিকার আমাকে অনুসরণ করছে।

কিছুক্ষণ পরে সামনে ঘন কালো গাছপালার ফাঁকে রাস্তার ধারে একটা মন্দির দেখতে পেলুম। মন্দিরের উঁচু খোলা চত্বরে কারা বসে কথা বলছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে সেখানে দাঁড়াতেই লোকগুলো হইচই করে উঠল। —কে? কে?

হাঁপাতে-হাঁপাতে বললুম,—আমি।

কেউ ধমকে বলল,—আমি কে?

—আজ্ঞে আমি কলকাতা থেকে আসছি। যাব কাঞ্চনপুর। বাস ফেল করে বড় বিপদে পড়েছি।

একজন বলল,—তাই বলুন। তা বিপদটা কী?

—একদল কালো-কালো লোক আমাকে ফলো করে আসছে।

—সর্বনাশ! আপনি কি হরির হোটেলে খেয়েছেন?

—খেয়েছি। বড্ড খিদে পেয়েছিল।

অমনি আবার হইচই পড়ে গেল। —ওরে! এ হরির হোটেলে খেয়েছে রে। কী সর্বনাশ! আবার একা নয়, সঙ্গে হরির হোটেলে খাওয়া পুরো দলটাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের গাঁয়ে এসেছে।

এইসব বলতে-বলতে লোকগুলো মন্দিরের পিছনে উধাও হয়ে গেল। তারপর গ্রামের কুকুরগুলো ডাকতে লাগল। আমি এবার কী করব ভাবছি, সেইসময় দেখলুম উঁচু চত্বরের পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বললুম,—দেখুন তো মশাই, কী অদ্ভুত ব্যাপার? বিপদে পড়ে এখানে ছুটে এলুম। অথচ ওঁরা অমন করে পালিয়ে গেলেন!

লোকটি খিকখিক করে হেসে বলল,—পালাবারই কথা। আপনি হরির হোটেলে খেয়েছেন কিনা!

করুণ স্বরে বললুম,—কেন? হরির হোটেলে খেলে কী হয়?

—যে খায়, সে ভেদবমি করে টেঁসে যায়।

—আমি কিন্তু টেঁসে যাইনি। হরিবাবু আমাকে অ্যান্টাসিড দিয়েছিলেন। দুটো খেয়েছি।

—দুটোতে কাজ হয় না মশাই! এখনও আপনার পেটে হরির হোটেলের ভাত আছে তো। তারই গন্ধে যত গণ্ডগোল বেধেছে। কারা আপনাকে ফলো করেছে বলছিলেন যেন?

—হ্যাঁ। একজন-দুজন করে অন্তত তিরিশ-চল্লিশ জন হবে। জ্যোৎস্নায় সব কালো-কালো মূর্তি।

—তারা হরির হোটেলে খেয়ে টেঁসে গেছে। কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে। হরির রান্নাটা যে সুস্বাদু! সেই লোভে পড়ে পেট পুরে খেলেই কেলেঙ্কারি। ওরা

ভেদবমি করে টেঁসে গিয়েছে বটে, কিন্তু লোভটা যায়নি। আপনার পেট থেকে হরির সুস্বাদু রান্নার গন্ধ টের পেয়েই ওরা আপনার পিছু নিয়েছে। বুঝলেন তো?

—বুঝলুম। কিন্তু আপনি দয়া করে আমাকে কাঞ্চনপুরে পৌঁছে দিন।

—কাঞ্চনপুর আরও প্রায় এক কিলোমিটার। সেখানে কাদের বাড়ি যাবেন?

—নির্মল সিংহের বাড়ি।

—ও! সিঙ্গিমশাইদের বাড়ি? চলুন। আমার বাড়িও ওই গ্রামে। তবে সাবধান, আপনি আগে-আগে চলুন। আমি যাব পেছনে!

—কেন? আমাকে কি আপনি ভয় পাচ্ছেন?

—কিচ্ছু বলা যায় না! হরির হোটেলে এ পর্যন্ত যারা খেয়েছে তারা সবাই টেঁসে গেছে।

—আহা! বলছি তো আমার কিছু হয়নি!

লোকটি খিকখিক করে হেসে বলল,—টাটকা টেঁসে যাওয়া বডি তো! তাই প্রথম-প্রথম কিছু টের পাওয়া যায় না। মনে হয়, এই তো দিব্যি আমার বডিখানা আস্ত আছে! কিন্তু আত্মার ভ্রম। আসলে বডি কখন চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

—কী অদ্ভুত!

—মোটেও না। এমন হতে পারে আপনার বডির স্মৃতি আপনাকে এখনও আস্ত রেখেছে। যাক গে। চলুন। পিছনে তাকাবেন না। আমিও তাকাব না।

কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর বললুম,—দেখুন! আপনার যেমন আমাকে ভয় করছে, তেমনি আমারও আপনাকে ভয় করছে! কখন পিছন থেকে আপনি কী করে বসবেন!

—ঘাড় মটকে দেব বলতে চান?

—যা অবস্থা, তাতে এবার ওটুকুই যা বাকি।

—বাজে কথা বলবেন না! আপনি বড্ড অকৃতজ্ঞ মানুষ তো!

—আমাকে মানুষ বললেন যখন, তখন আর আমাকে ভয় কেন? বরং আপনার ভয় পাওয়া উচিত যারা আমাকে ফলো করে আসছিল, তাদের।

লোকটি থমকে দাঁড়াল। —এই রে! একেবারে ভুলে গেছি। আমার জামার পাশপকেটে টর্চ আছে। বের করা যাক। আগে আপনাকে টর্চের আলোয় দেখে নিই। তারপর এখনও কেউ পিছনে ফলো করছে কি না দেখা যাক।

বলে সে টর্চ জেলে আমাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে টর্চের আলো ফেলল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সেই আলোয় দেখলুম, একদঙ্গল আস্ত কঙ্কাল ছিটকে দুধারে গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

আর লোকটাও সেই দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমার সৌভাগ্য, তার হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চটা ছিটকে পড়েছিল। সেটা আমি কুড়িয়ে নিয়ে এবার নির্ভয়ে হেঁটে চললুম।

মাঝে-মাঝে পিছু ফিরে টর্চের আলো ফেলছিলুম। কিন্তু আর কেউ আমাকে অনুসরণ করছিল না। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর রাস্তার বাঁকের মুখে মোটরসাইকেলের

উজ্জ্বল আলো দেখা গেল। তারপর মোটর সাইকেলটা আমার কাছে এসে থেমে গেল। নির্মলের সাড়া পেলুম। —যা ভেবেছিলুম! এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, আজ তো শনিবার। পুঁটু কি অত ভিড়ের মধ্যে বাসে উঠতে পারবে? হ্যাঁ রে! হেঁটে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো? আয়! ব্যাকসিটে বোস! দোষটা আমারই। বুঝলি?

মোটরসাইকেলের ব্যাকসিটে চুপচাপ উঠে বসলুম। যা ধকল গেছে, এখন আর কোনও কথা নয়।

নাঃ। পরেও আর কোনও কথা নয়। এমনকী হরির হোটেলে খাওয়ার কথাও চেপে যাব। হরির দেওয়া অ্যান্টাসিডের ট্যাবলেট দেখিয়ে বলব,—রাতে কিছু খাব না! পেটের অবস্থা ভালো না।

তাছাড়া আমি হরির হোটেলে খেয়ে এসেছি শুনলে নির্মল নির্ঘাত আমাকে ফেলে পালানোর চেষ্টা করবে। তার মানে, মোটরসাইকেলের অ্যাকসিডেন্ট এবং আমি নিজেই ভূত হয়ে যাব। সর্বনাশ!

শুধু একটাই ভাবনা, হরির হোটেলের ভাত যতক্ষণ না পুরো হজম হচ্ছে, ততক্ষণ কি নির্মলের বাড়ির আনাচে-কানাচে সেই ছায়াকালো-কালো মিছিলের মূর্তিগুলো গন্ধ শুঁকতে ঘুরঘুর করে বেড়াবে? দেখা যাক।...

ভূতে-মানুষে

একালের লেখকদের এই এক ঝামেলা। পুজোসংখ্যা পত্র-পত্রিকা বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই সম্পাদকমশাইদের তাগিদ শুরু হয়ে যায়, পরের বছর পুজোসংখ্যার জন্য জানুয়ারির মধ্যেই লেখা চাই। সেবার জানুয়ারি পেরিয়ে মার্চ মাস এসে গেল। কিন্তু আমার কলম যেন অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করে বসল। আসলে মগজ একেবারে খালি। লেখা বেরুতে চায় না। প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু গোদের ওপর বিষফোড়া। মার্চের মাঝামাঝি হঠাৎ আমার এক বন্ধু সন্দীপ এসে সোল্লাসে বলল,—কেল্লা মার দিয়া!

বললম,—কী ব্যাপার?

—তোকে আমি বলেছিলুম না আগামী পুজোয় একটা পত্রিকা বের করব? টাকার জোগাড় হয়ে গেছে। এবার আর আমাকে রোখে কে? পত্রিকার নামও ঠিক করে ফেলেছি। বুঝলি?

সন্দীপ কবে পত্রিকা বের করবে বলেছিল মনে পড়ল না। বললুম,— ভালো। খুব ভালো খবর। পত্রিকার কী নাম ঠিক করলি?

সন্দীপ একগাল হেসে বলল,—'ভূতভুতুম'।

অবাক হয়ে বললুম,—ভূতভুতুম? তার মানে, ভূতের গল্পের পত্রিকা করবি নাকি?

—হ্যাঁ। তবে শুধু গল্প নয়। প্রবন্ধ থাকবে। পদ্য থাকবে। উপন্যাস থাকবে। আর সেই উপন্যাস তোকেই লিখতে হবে। টাকার কথা ভাবিস না। লেখকদের আমরা উপযুক্ত দক্ষিণাই দেব।

ওর কথা শুনেই আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করছিল। সন্দীপ যেমন জেদি, তেমনই গোঁয়ার-গোবিন্দ। করুণমুখে বলনুম,—সন্দীপ। তোর পত্রিকায় লিখে কি টাকা নিতে পারি? কিন্তু কথাটা কী জানিস? ভূতের আর একটুও চাহিদা নেই। সেই মান্ধাতার আমল থেকে ভূত নিয়ে এত লেখা হয়ে গেছে যে, পাঠক ভূতকে আর একটুও ভয় পায় না। তাছাড়া স্বনামধন্য ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভূতের সার কথা লিখে গেছেন। এদিকে নতুন ভূত হলেও কথা ছিল। পুরোনো ভূতেরা বাসি হয়ে পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। কাজেই—

সন্দীপ আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল,—কী যে বলিস তুই! আমার আইডিয়াটাই তো তাই অন্যরকম। তুই নতুন ভূতের কথা বললি। সেই আনকোরা নতুন ভূত নিয়েই শারদীয়া ভূতভুতুম পত্রিকা বের করতে চাই। তুই অ্যাদ্দিন অনেকরকম ভূতের গল্প লিখেছিস। এবার নতুনরকমের ভূত নিয়ে একখানা উপন্যাস তোকে লিখতেই হবে। তুই একালের ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় হয়ে যাবি।

হতাশ হয়ে বললুম,—ভাই সন্দীপ! তোকে খুলেই বলি। এবার মানুষ নিয়েই কোনও লেখা আসছে না, তো ভূত।

—আহা, নতুন ভূত।

—কিন্তু নতুন ভূত পাচ্ছি কোথায়? আমার মগজ একেবারে খালি। কল্পনার যন্ত্রটা মগজের মধ্যে থাকে। সেটাই বিগড়ে গেছে। কল্পনা ছাড়া কি লেখা হয়?

সন্দীপ একটু চুপ করে থাকার পর গম্ভীর হয়ে বলল,—বুঝেছি। কলকাতায় তোর এই ঘরে বইপত্তরের আবর্জনার মধ্যে বসে কি আর লেখা আসে? তোর প্রবলেম আমি বুঝেছি। এক কাজ কর। বীরভূম জেলার ঘুমঘুমিতলায় আমার ঠাকুরদার পৈতৃক একটা বাড়ি আছে। নিরিবিলিতে দোতলা বাড়ি। পিছনে পুকুর আছে। এই বসন্তকালে প্রকৃতি-পরিবেশ—আর পাখি-টাখির ডাক—মানে, ওয়াণ্ডারফুল জায়গা! বিশেষ করে লেখকদের লেখার জন্য অত সুন্দর জায়গা আর কোথাও নেই। বাড়িটার কেয়ারটেকারের নাম কালাচাঁদ। আমরা যখন ওখানে বেড়াতে যাই, তাকে কালাচাঁদ-খুড়ো বলে ডাকি। ডানপিটে লোক। খুড়ো বললে খুব খুশি হয়। তুই আজই ওখানে চলে যা। একমাস-দেড়মাস যদ্দিন খুশি থাকবি। লিখবি। তার চেয়ে বড় কথা, নতুন ধরনের ভূত দেখতে পাওয়ার চান্স ওখানে নাইন্টি নাইন পারসেন্ট!

সন্দীপের কথা আমার মনে ধরল। ওর পত্রিকার জন্য ভূতের উপন্যাস না লেখা হোক, স্থানবদলের দরুণ আমার মগজে কল্পনাশক্তিটা ফিরে আসবার সম্ভাবনা প্রচুর। তাই রাজি হয়ে গেলুম। সন্দীপ এস. টি. ডি. ফোনে ঘুমঘুমিতলায় তার বাবার

বন্ধু এক ডাক্তারবাবুকে জানিয়ে দেবে এবং তিনি কালাচাঁদকে আমার যাওয়ার খবরটা দিয়ে রাখবেন।

হাওড়া স্টেশনে বারোটা পাঁচের ট্রেনে চেপে আমাকে নামতে হবে হিংলাডিহি স্টেশনে। সেখান থেকে বাসে চেপে ঘুমঘুমিতলা পৌঁছুব। স্টেশন থেকে আঠারো কিলোমিটার দূরত্ব। বাসস্টপে কালাচাঁদ থাকবে।

সন্দীপ চলে যাওয়ার সময় আবার বলে গেল,—প্রথমে কিন্তু আমার পত্রিকার জন্য উপন্যাস লিখতে বসবি।

পরে বুঝতে পেরেছিলুম, সন্দীপ 'ভূতভুতুম' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার জন্য আমার উপন্যাস সর্বাগ্রে পেতে চায়। তাই আমাকে সে তার গাড়িতে চাপিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল এবং ট্রেনেও তুলে দিয়েছিল।

যে ট্রেনের হিংলাডিহিতে সাড়ে তিনটে নাগাদ পৌঁছুনোর কথা, সেই ট্রেন গদাইলস্করি চালে চলতে-চলতে পৌঁছুল সওয়া চারটেতে। বেরিয়ে গিয়ে বাসস্ট্যান্ডে ঘুমঘুমিতলার বাস খোঁজ করলুম। সেখানে প্রচণ্ড ভিড়। কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে আছে এবং সবগুলোই ভিড়ে ততক্ষণে ঠাসা হয়ে গেছে। আরও লোক গিয়ে বাদুড়ঝোলা হয়ে ঝুলছে। অবস্থা দেখে দমে গেলুম। ঘুমঘুমিতলার বাসের খোঁজ যার কাছে নিচ্ছি, সে-ই বলছে,—ওপাশে দেখুন।

আমার কাঁধে প্রকাণ্ড ব্যাগ আর হাতে ব্রিফকেস। আমার বাসটারও যদি ওইরকম অবস্থা হয়, কেমন করে আমি তাতে চাপব বুঝতে পারছিলুম না। সেইসময় বেঁটে গোলগাল চেহারার ধুতি-পাঞ্জাবিপরা এক ভদ্রলোককে দেখতে পেলুম। তাঁর কাঁধে একটা কাপড়ের নকশাকাটা ব্যাগ। তিনি একপ্রান্তে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাথায় টাক। মুখে কেমন একটা হাসি। তাঁর কাছে গিয়ে খোঁজ করতেই তিনি সহাস্যে বললেন,—একটু অপেক্ষা করুন। খবর নিয়েছি। যন্তর বিগড়ে জয় মা তারা এখন মানুবাবুর গ্যারাজে আছে। মিস্তিরিরা হাত লাগিয়েছে। বুঝলেন না? একটা ট্রিপ ফেল করলে মালিকের হেভি লস!

বুঝলুম, বাসটার নাম 'জয় মা তারা'। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করলুম। —আপনি কোথায় যাবেন?

ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন,—আপনি যেখানে যাবেন। তা মশাইয়ের আসা হচ্ছে কোত্থেকে?

—কলকাতা থেকে।

—ঘুমঘুমিতলায় কাদের বাড়ি যাওয়া হবে?

—চাটুজ্যেমশাইদের বাড়ি। বাড়িটার নাম 'গিরিবালা ভবন'।

—তাই বলুন! অবনী চাটুজ্যে এখন কলকাতায় চলে গেছে। অবনী স্কুলে আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। তা—মশাই কি অবনীর আত্মীয়?

—না। অবনীবাবুর ছেলে সন্দীপ আমার বন্ধু।

—সন্দীপ, মানে সানু আপনার সঙ্গে আসেনি?

—সে এখন ব্যস্ত। আমি একা এসেছি।

ভদ্রলোক কেন কে জানে মুচকি হাসলেন। —তা ভালো। কালাচাঁদ আছে। গণ্ডগোল পড়লে সে একাই একশো।

একটু চমকে উঠেছিলুম। —গণ্ডগোল মানে? কীসের গণ্ডগোল?

ও কিছু না। —বলে ভদ্রলোক রাস্তার দিকে তাকালেন, রেডি হোন! জয় মা তারা আসছে মনে হচ্ছে।

—প্লিজ আমাকে বাসে উঠতে আপনি যদি একটু সাহায্য করেন—

—আলবাত করব। আমার বাল্যবন্ধুর ছেলের বন্ধু আপনি। এক কাজ করবেন। আপনি আমার পেছনে আঠার মতো সেঁটে থাকবেন। ছেড়ে গেলেই বিপদ। সেঁটে থাকলে দেখবেন, ঠিক বাসের মধ্যিখানে পৌঁছে গেছেন। আগে থেকে সাবধান করে দিলুম।

একটা খালি বাস হর্ন দিতে-দিতে এসে দাঁড়ানোমাত্র আমি সত্যিই খালি বাঁ-হাত দিয়ে ভদ্রলোকের পেটের দিকটায় জড়িয়ে ধরেছিলুম। তারপর যেন ঝড় প্লাবন মহাপ্রলয়ের মধ্যে দিয়ে অসহায় হয়ে প্রায় ভেসেই চললুম। এরপর কী ঘটল বুঝলুম না। একসময় দেখলুম, আমি সেই ভদ্রলোকের পাশে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে বসে আছি।

নাঃ! কাঁধের প্রকাণ্ড ব্যাগটা ঠিকই আছে। তবে ভদ্রলোকের পেটের ওপর আছে, এই যা। হাতের ব্রিফকেস দু-পায়ের ফাঁকে কখন ঢুকে গেছে। ভদ্রলোক শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলে উঠলেন,—জয় মা তারা!

আমিও মনে-মনে বললুম,—জয় মা তারা!

বাসটার মধ্যে মানুষ আর জিনিস ঠেসে প্রায় দলা পাকিয়ে আছে। পিঠে খোঁচা খেয়ে অতিকষ্টে মুখ ঘুরিয়ে দেখলুম, বাইরে বাদুড়ঝোলা হয়ে লোকেরা ঝুলছে। ভেতরের লোকেরা চ্যাঁচাচ্ছে,—বাস চালাও! বাস চালাও!

বাসের ছোকরা অ্যাসিস্ট্যান্ট বাসের গায়ে থাপ্পড় মেরে হাঁক দিচ্ছে,—ছেড়ে গেল! ছেড়ে গেল! বেলতলা! তেলতলা! ঝুমঝুমিতলা! ঘুমঘুমিতলা!

যাত্রীদের চ্যাঁচামেচিতে অবশেষে বাসের চাকা গড়াল। কিন্তু এ যে দেখছি ভূমিকম্প হচ্ছে যেন! প্রচণ্ড ঝাঁকুনি আর মাঝে-মাঝে কেমন গোঁগোঁ গরর-গরর বিদঘুটে শব্দ। জানালার বাইরে মানুষের মাথা। বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে সঙ্গী ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলুম,—পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?

তিনি হাই তুলে বললেন,—রাস্তার বেহাল অবস্থা। দু-ঘণ্টাও লাগতে পারে। তিন ঘণ্টাও লাগতে পারে। চিন্তা করবেন না। জয় মা তারা!

বলে তিনি চোখ বুজলেন এবং তাঁর চিবুকটা বুকে বসে গেল। ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

খানাখন্দে পড়ে বাসের চাকা অদ্ভুত শব্দ করছে। বাসের গতি মন্থর। তারপর লক্ষ করলুম, সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট চিৎকার করে উঠছে। শুধু 'তলা' শব্দটাই বুঝতে পারছি। আর বাসটা থেমে যাচ্ছে। ভাবছি, এই বুঝি বাস খালি হল। কিন্তু যতজন

নামছে, তার বেশি উঠছে। জোর ধস্তাধস্তি ধাক্কাধাক্কি ঝগড়া চলেছে দু-পক্ষের মধ্যে। অবশেষে আমার চোখও বুজে এল। কী আর করা যাবে? লেখার স্বার্থে এই কষ্টটা না করে উপায় নেই। কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে?...

একসময় সঙ্গী ভদ্রলোকের খোঁচা খেয়ে চোখ খুলতে হল। তিনি আমার ব্যাগটা আমার কোলে ঠেলে দিয়ে 'জয় মা তারা' বলে উঠে দাঁড়ালেন। বাসে তখনও যথেষ্ট ভিড়। আমিও ভদ্রলোকের দেখাদেখি উঠে পড়লুম এবং জনাতিনেক লোক আমাদের সিটে তখনই সশব্দে বসে পড়ল। তারপর ঠেলাঠেলি করে ভদ্রলোকের পিঠে আগের মতো সেঁটে থেকে দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম।

এতক্ষণে দেখতে পেলুম, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে কন্ডাক্টার টিকিটের পয়সা নিচ্ছে। ভদ্রলোককে তিন টাকা দিতে দেখে আমিও তা-ই দিলুম। অ্যাসিস্ট্যান্ট 'তলা-তলা' বলে চ্যাচাচ্ছিল। কোন তলা তা বোঝা যাচ্ছিল না। অবশেষে বাস থামল। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমিও নেমে গেলুম। কিন্তু আর কোনও যাত্রী নামল না। বাসটা চলে গেল।

গাছের নিচে আবছা আঁধারে দাঁড়িয়ে দেখি, ভদ্রলোক এগিয়ে যাচ্ছেন। কাছে গিয়ে বললুম,—ওঃ! একটা সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হল বটে! তবে আপনি না থাকলে—

ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে খ্যাঁক শব্দে হেসে বললেন,—আরে কী কাণ্ড! আপনিও এই স্টপে নেমে পড়েছেন দেখছি।

অবাক হয়ে বললুম,—কেন? আপনিও তো ঘুমঘুমিতলায় নামবেন বলছিলেন!

—কী বিপদ! এটা তো ঝুমঝুমিতলা স্টপ! আপনি শোনেননি 'ঝুমঝুমিতলা' বলে চ্যাচাচ্ছিল?

—সে কী! এটা ঝুমঝুমিতলা?

—হ্যাঁ, মশাই! এই আক্রাগণ্ডার বাজারে খামোকা বাড়তি পঞ্চাশ পয়সা খরচ করতে যাব কেন? ঘুমঘুমিতলা এই স্টপ থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার। ওই দেখুন! চাঁদমামা উঠেছে। জ্যোৎস্নায় এটুকু পথ হাঁটতে-হাঁটতে পদ্য রচনা করব। আমি একজন কবি। বুঝলেন তো?

এ কোন পাগলের পাল্লায় পড়লুম? কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে। তাই বললুম,—দেড় কিলোমিটার জ্যোৎস্নায় হাঁটতে-হাঁটতে কল্পনাশক্তি জাগারই কথা। তা আপনি কবি?

—বলতে পারেন বইকী! স্কুলের ম্যাগাজিনে পদ্য ছাপা হতো। এখন মফস্বল শহরের পত্রিকাতেও ছাপা হয়। খানকতক পদ্য দিতেই তো হিংলাডিহি গিয়েছিলুম।

—এবার আপনার নামটা জানতে পারি?

—আমার নাম তারাচরণ যশ। আপনার বন্ধু সানু আমার পদ্য শুনে বলেছিল, যদি কখনও পত্রিকা করি, আপনার পদ্য সবার আগে ছাপব যশকাকা!

দেড় কিলোমিটার পথ হাঁটতে কথা বলাই ক্লান্তি থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায়। তাই বললুম,—আমিও তাহলে আপনাকে যশকাকা বলব!

—বলুন! ইচ্ছে যখন হয়েছে, তখন বলুন।

—আচ্ছা যশকাকা, সানুদের বাড়িতে কী গণ্ডগোলের কথা বলছিলেন?

—এখন এই নিরিবিলি রাস্তায় রাত্রিকালে ওকথা বলা উচিত না।

—ভূতপ্রেতের গণ্ডগোল নয় তো?

তারাচরণ যশ থমকে দাঁড়ালেন।—রাম! রাম! রাম! পেছনে ঝুমঝুমিতলা। একটা বটগাছ আছে ওখানে। রাতবিরেতে পেতনি ঝুমঝুম শব্দে নূপুর বাজিয়ে নাচে। কাজেই রাম রাম রাম।

তিনি আবার পা বাড়ালেন। বললুম,—ঠিক আছে। আপনার একটা পদ্য শোনান বরং।

যশবাবু হাসলেন। —কদিন থেকে একটা পদ্য লিখছি। তবে শেষ লাইনটা কিছুতেই মেলাতে পারছি না। বড্ড সমস্যায় পড়েছি। আপনি তো কলকাতায় থাকেন। শিক্ষিত মানুষ। একটু সাহায্য করতে নিশ্চয় পারবেন।

ঝোঁকের বশে বলে ফেললুম,—আমি আগে পদ্যই লিখতুম। এখন অবশ্য গদ্য লিখি। শারদীয়া সংখ্যা পত্র-পত্রিকায় লেখার জন্যই নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিলুম। সন্দীপ ওদের গ্রামের বাড়ির কথা বলল। তাই চলে এলুম।

যশবাবু যেন লাফিয়ে উঠলেন। —বলেন কী? মশাইয়ের নাম?

নামটা বানিয়ে বলতে হল। —আমার নাম কল্লোল গুপ্ত।

—বাঃ! অপূর্ব নাম! শুনেছি-শুনেছি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ—আপনার লেখাও পড়েছি মনে হচ্ছে।

—আপনি না বলে তুমি বললেই খুশি হব যশকাকা।

যশবাবু খুশি হয়ে বললেন,—তাই বলছি। তা—তুমি যখন পদ্য লিখতে একসময়, তখন তুমিই আমার অসমাপ্ত পদ্যটার একটা হিল্লে করতে পারবে। তাহলে বলি পদ্যটা?

—বলুন!

যশবাবু গলা ঝেড়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে সুর ধরে বললেন,—

পাতুবাবু ছাতু খান অতি আহ্লাদে
জল্লাদ ধরে নিয়ে যায় প্রহ্লাদে
রামবাবু রেগে লাল
সন্দেশে কেন ঝাল...

এবার যশবাবু থেমে গেলেন। শ্বাস ছেড়ে বললেন,—শেষ লাইনটা মেলাতে হবে প্রথম লাইনের সঙ্গে। কিন্তু আহ্লাদে, প্রহ্লাদের সঙ্গে মিলবে এমন কোনও শব্দই খুঁজে পাচ্ছি না।

একটু ভেবে নিয়ে বললুম,—

পাতুবাবু ছাতু খান অতি আহ্লাদে
জল্লাদ ধরে নিয়ে যায় প্রহ্লাদে

রামবাবু রেগে লাল
সন্দেশে কেন ঝাল
ঝাল মেপে দেখি ওরে দাঁড়িপাল্লা দে।।

যশবাবু এবার সত্যিই লাফিয়ে উঠলেন। —বাঃ! ঝাল মেপে দেখি ওরে দাঁড়িপাল্লা দে! অপূর্ব! ঝাল মেপে দেখি ওরে দাঁড়িপাল্লা দে! মুখস্থ করি। ঝাল মেপে দেখি ওরে দাঁড়িপাল্লা দে! এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে লিখে ফেলতে হবে। নইলে ভুলে যাব। ঝাল মেপে দেখি ওরে দাঁড়িপাল্লা দে। ঝাল মেপে দেখি ওরে দাঁড়িপাল্লা দে! ঝাল মেপে দেখি ওরে—শর্টকাটে যাইরে! দাঁড়িপাল্লা দে।

সুর ধরে বলতে-বলতে তারাচরণবাবু বাঁ-দিকে ঘন কালো রঙের মধ্যে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। একটু পরে বুঝতে পারলুম, ওটা একটা আমবাগান। শর্টকাটে আমবাগানের ভেতর দিয়ে উনি বাড়ি গিয়ে এখনই লাইনটা লিখে ফেলবেন। কিন্তু কেন যে সন্দীপের 'ভূতভুতুম' পত্রিকার কথাটা বলিনি! বললে উনি আমাকে গিরিবালা ভবনে পৌঁছে দিতেন।

নিজের বোকামিতে রাগ হচ্ছিল। ঘুমঘুমিতলায় কালাচাঁদ-খুড়োর থাকার কথা। এখনও সেটা কতদূরে কে জানে!

কয়েক পা এগিয়েছি, হঠাৎ পাশের একটা গাছের ছায়া থেকে কেউ রাস্তায় এসে করজোড়ে প্রণাম করে বলল,—মশাই কি কলকাতা থেকে আসছেন? মশাই কি সানুবাবুর বন্ধু?

বললুম,—হ্যাঁ। তুমি কি কালাচাঁদ-খুড়ো?

জ্যোৎস্নায় লোকটাকে ছায়ামূর্তি বলে মনে হচ্ছিল। সে বলল,—আজ্ঞে না। আমি কালাচাঁদ না। গোরাচাঁদ। কালাচাঁদের মাসতুতো ভাই। কই দিন আপনার মালপত্তর। আমি বয়ে নিয়ে যাই। আপনি আরামে হেঁটে আসুন।

গোরাচাঁদকে আমার কাঁধের ব্যাগ দিলুম। হাতের ব্রিফকেসটা সে প্রায় ছিনিয়ে নিল। কিন্তু সে এমনভাবে হাঁটতে থাকল যে আমি তার সঙ্গ ধরতে হাঁপিয়ে উঠছিলুম। তাই বললুম,—ও গোরাচাঁদ-খুড়ো! একটু আস্তে হাঁটো। এই খানাখন্দে ভরা রাস্তায় আছাড় খাব যে!

গোরাচাঁদ গতি কমিয়ে মুখ ঘুরিয়ে হাসল। জ্যোৎস্নায় মানুষের দাঁত কি অত চকচক করে? সে সহাস্যে বলল,—আমাকেও খুড়ো বলছেন? বাঃ! আপনি খুব ভালো লোক। কালাচাঁদকে গ্রামের সব্বাই খুড়ো বলে। আমাকে কেউ খুড়ো বলেনি।

—আচ্ছা গোরাচাঁদ-খুড়ো, তারাচরণ যশমশাইকে তো তুমি চেনো।

—খুব চিনি। চিনি বলেই তো গাছপালার ছায়ার আড়ালে চুপিচুপি হাঁটছিলুম।

—কেন?

—আজ্ঞে ওঁর পদ্য শোনার ভয়ে। গত আশ্বিন মাসে এক রাত্তিরে একশো একখানা পদ্য শুনিয়ে ছেড়েছিলেন। অগত্যা কী করব? আমিও ওঁকে—হুঁ-হুঁ বাবা! নামটি আমার গোরাচাঁদ!

রসিকতা করে বললুম,—পাতব শেয়াল ধরার ফাঁদ। কাঁদবে শেয়াল হুক্কাহুয়া। যশমশাই ধরবে ধুয়া, ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া?

গোরাচাঁদ থমকে দাঁড়িয়ে তেমনই চকচকে দাঁতে হাসল। —ওরে বাবা। আপনি যে যশমশাইয়ের কত্তাবাবা দেখছি! বাঃ। আমি এবার যশমশাইকে ছড়াটা শুনিয়ে ছাড়ব। এখনও উনি বাড়ি পৌঁছুতে পারেননি।

বলে সে সুর ধরে আওড়াল ঃ

নামটি আমার গোরাচাঁদ
পাতব শেয়াল ধরার ফাঁদ
কাঁদবে শেয়াল হুক্কা হুয়া
যশমশাই ধরবে ধুয়া
ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া।।

তারপর আমাকে হতবাক করে সে এই ছড়াটা সুর ধরে বলতে-বলতে রাস্তার বাঁ-দিকে গাছপালার ভেতর উধাও হয়ে গেল। সম্বিত ফিরে পেয়ে চিৎকার করে ডাকলুম,—গোরাচাঁদ-খুড়ো! গোরাচাঁদ-খুড়ো!

তখনও তার ছড়াটা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু কেমন যেন খ্যানখেনে গলার স্বর। এবার আমার মনে হল, সর্বনাশ! লোকটা ছিনতাইবাজ! চালাকি করে আমার ব্যাগ আর ব্রিফকেস হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল!

সে যেদিকে গেছে, সেদিকে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলুম। একটু পরে সামনে টর্চের আলো জ্বলে উঠল। তারপর আলোটা আমার ওপর এসে পড়ল। এবার বোধহয় ডাকাত আসছে। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলুম,—কালাচাঁদ-খুড়ো! কালাচাঁদ-খুড়ো!

ভারী গলায় লোকটা বলে উঠল,—মশাই কি সানুবাবুর বন্ধু? মশাই কি কলকাতা থেকে আসছেন?

এ-ও যে গোরাচাঁদের ভঙ্গিতে কথা বলছে। বললুম,—হ্যাঁ। তুমি কে?

টর্চ নিভিয়ে লোকটা করজোড়ে প্রণাম করে বলল,—আজ্ঞে আমিই কালাচাঁদ। বাসস্টপে আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলুম। বাস চলে গেল। আপনি নামলেন না। তারপর আমার মনে হল, বাবুমশাই তো এ তল্লাটে নতুন আসছেন। ভুল করে ঝুমঝুমিতলায় নেমে পড়েননি তো? তাই দেখতে আসছিলুম। হঠাৎ কানে এল কেউ গোরাচাঁদ-খুড়ো বলে চ্যাঁচাচ্ছে।

বললুম,—আমিই চ্যাঁচাচ্ছিলুম কালাচাঁদ-খুড়ো! গোরাচাঁদ আমাকে বলল, সে তোমার মাসতুতো ভাই। তুমিই তাকে আমার খোঁজে পাঠিয়েছ।

—কী বিপদ! তা আপনার মালপত্তর কই?

—গোরাচাঁদ-খুড়ো নিয়ে পালিয়ে গেল!

কালাচাঁদ ক্রুদ্ধস্বরে বলল,—ওরে হতচ্ছাড়া! দেখাচ্ছি মজা। কথায় বলে না? স্বভাব যায় না মলে। স্বভাব বাবুমশাই!

—স্বভাব যায় না মলে মানে?

—এখন ওসব কথা থাক। চলুন। সানুদের বাড়ি এখান থেকে কাছে। আমার সঙ্গে আসুন।

সে পায়ের কাছে টর্চের আলো ফেলে হাঁটতে থাকল। বাঁ-দিকে একটা অনাবাদি মাঠের পথে আমরা হেঁটে যাচ্ছিলুম। যেতে-যেতে এতক্ষণে দেখলুম, কালাচাঁদের একহাতে লাঠি আছে। আবার ভয় পেলুম। লাঠির ঘায়ে আমাকে মেরে মানিব্যাগ হাতিয়ে নেবে না তো? এ কি সত্যি সন্দীপদের বাড়ির কেয়ারটেকার কালাচাঁদ? নাকি কোনও ডাকাত? নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে গিয়ে লাঠি তুলবে। আমি তৈরি হয়ে হাঁটছিলুম। কিছুক্ষণ পরে একটা পুকুরের পাড়ে উঠে সে বলল,—এই পুকুরটা সানুদের। ওই দেখুন ওদের বাড়ি।

দোতলা বাড়িটাতে বিদ্যুতের আলো জ্বলছে দেখে সাহস ফিরে পেলুম। বললুম,—ঘুমঘুমিতলায় ইলেকট্রিসিটি আছে দেখছি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বছর তিনেক হল ইলেকটিরি এসেছে।

জোরে শ্বাস ছেড়ে বললুম,—কিন্তু আমার ব্যাগ আর ব্রিফকেসের কী হবে খুড়ো?

কালাচাঁদ হাসল। —আজ্ঞে ও নিয়ে ভাববেন না। গোরাচাঁদ আমাকে খুব ভয় করে। বলে সে চেঁচিয়ে উঠল,—অ্যাই হতচ্ছাড়া! বাবুমশাইয়ের মালপত্তর দোতলার ঘরে রেখে তবে যে চুলোয় যাবি যা! নইলে এক্ষুনি মোনা-ওঝাকে ডেকে আনব। সেদিনের মতো তোকে সে তালগাছের ডগায় দাঁড়কাক করে বসিয়ে রাখবে।

গোরাচাঁদকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না। পুকুরের পাড়ে অজস্র তালগাছ। পশ্চিমপাড় দিয়ে ঘুরে গিরিবালা ভবনের গেটে পৌঁছেছি, হঠাৎ দেখলুম একটা ছায়ামূর্তি বাড়ির পূর্বদিকে উধাও হয়ে গেল। কালাচাঁদ গেটের তালা খুলে বলল,—এ গ্রামে চোর-ডাকাত নেই বাবুমশাই! গোরাচাঁদেরও চুরি-ডাকাতি করা স্বভাব ছিল না। স্বভাব বলতে শুধু একটা। জোছনা-রাত্তিরে টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো। আর তালগাছের ডগায়—

কথা শেষ না করে সে আমাকে দোতলায় পূর্বের একটা ঘরে নিয়ে গেল। তারপর জানালাগুলো খুলে দিয়ে বলল,—উত্তরে পুকুর। জোছনায় পুকুরের জল কেমন ঝিলমিল করছে দেখুন। পুকুরে মাছ আছে। কাল জেলে ডেকে এনে মাছ ধরাব।

উঁকি মেরে দেখে ভালো লাগল। তারপরই চোখে পড়ল আমার পাশেই টেবিলের ওপরে আমার ব্যাগ আর ব্রিফকেস রাখা আছে। ঘর তো তালাবন্ধ ছিল! ব্যাপারটা যে দেখছি একেবারে ভুতুড়ে!

কালাচাঁদ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ফের,—অ্যাই হনুমান! তালগাছের ডগায় আবার চড়েছিস?

আবার উঁকি মেরে কিছু দেখতে পেলুম না। কিন্তু তারপরই পুকুরের জলে ঝপাং করে কেউ ঝাঁপ দিল। বললুম,—কেউ যেন জলে ঝাঁপ দিল কালাচাঁদ-খুড়ো! গোরাচাঁদ নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে! —বলে কালাচাঁদ আমার দিকে ঘুরল। —বাবুমশাই! আপনি বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধোন। ওই দেখুন বাথরুম। আমি আপনার জন্য চায়ের ব্যবস্থা করি।

সে রাতে আর কোনও গণ্ডগোল ঘটেনি। তবে শুয়ে পড়ার পর পুকুরের জলে কিছুক্ষণ অন্তর বারদুয়েক ঝপাং করে কার ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ শুনেছি। কেউ তালগাছের ডগা থেকে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল তা ঠিক। গোরাচাঁদ নাকি?

ভোরে কালাচাঁদের ডাকে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে কথামতো বেড-টি এনেছিল। চা খেতে-খেতে ওকে গোরাচাঁদের ব্যাপারটা জিগ্যেস করেছিলুম। কালাচাঁদ হাসতে-হাসতে বলেছিল,—ওকে নিয়ে চিন্তার কারণ নেই বাবুমশাই। মোনা-ওঝার নাম করেছি। আর হতচ্ছাড়া আপনার কাছে ঘেঁষবে না। বরং একটুখানি বাইরে ঘুরে জায়গাটা দেখে আসুন। ভালো লাগবে। আমি বাজারে যাই। খুঁজে পেলে মোনা-ওঝাকেও ডেকে আনব। চিন্তা করবেন না।

সত্যি ঘুমঘুমিতলার প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর। গিরিবালা ভবনের কাছাকাছি কোনও বাড়ি নেই। ঝোপঝাড়, জঙ্গলে লাল ফুলের শোভা আর পাখির ডাক শুনে আমার মগজের কল্পনাযন্ত্রটি চালু হয়ে গেল। বাড়ি ফিরেই লিখতে বসলুম। কালাচাঁদ তখনও ফেরেনি।

কয়েক লাইন লিখেছি, নিচে কার হাঁকডাক শোনা গেল। —কালাচাঁদ! ও কালাচাঁদ-খুড়ো! আমাদের মহামান্য লেখকমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলুম। যা বাবা! গেল কোথায় কালাচাঁদ! ও কল্লোলবাবু!

বিরক্ত হয়ে কাগজ-কলম রেখে বারান্দায় গেলুম। তারাচরণ যশমশাইকে দেখতে পেলুম। তাঁর হাতে একটা সুটকেস।

একটু পরে তারাচরণ যশ উঠে এসে সুটকেস হাতেই নমস্কার করে সহাস্যে বললেন,—আপনি আমার কী যে উপকার করেছেন! পদ্যটা যে শুনছে, সেই বলছে খাসা পদ্য।

বলে তিনি বারান্দার মেঝেতেই বসে পড়লেন। বললুম,—আহা! ওখানে কেন? ঘরে চলুন।

না মশাই! ঘরে বসে পদ্য জমবে না। —বলে তিনি সুটকেস খুলে একগাদা কাগজ বের করলেন। —আপনাকে শোনাব বলে এনেছি। ভুল থাকলে শুধরে দেবেন। আপনি বরং ওই চেয়ারে বসুন। আমি শুরু করি।

সর্বনাশ! এ তো ভুতুড়ে উৎপাত নয়। মানুষের উৎপাত। এ উৎপাত ভূতের চেয়ে সাংঘাতিক। অতগুলো পদ্য শুনতে হলে সারাটা দিন কেটে যাবে। সন্দীপ কেন এসব লোকের কথা আমাকে বলেনি?

যশমশাই কাগজের সাজানো স্তূপ মেঝেয় রেখে মুচকি হেসে বললেন,—বলতে ভুলে গেছি। গতকাল সন্ধ্যায় সে এক কাণ্ড। হঠাৎ হতচ্ছাড়া গোরাচাঁদ গিয়ে আমার পথ আটকে বলল, এবার তার পদ্য শুনতে হবে। বেগতিক দেখে মোনা-ওঝার নাম

করে শাসালুম। তখন কেটে পড়ল। গোরাচাঁদ ওই পুকুরের ধারে বেঁকে থাকা একটা তালগাছের ডগায় চেপেছিল। বুঝলেন? এই তো গত মাসের কথা। ওর মাথায় ছিট হল। তারপর কী করে তালগাছের ডগা থেকে পুকুরের ঠান্ডা জলে পড়ে অক্কা। অক্কা বোঝেন তো? পৌষমাসে এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে। পুকুরের ঠান্ডা জলে পড়ে—ব্যস! গোরাচাঁদকে যখন তোলা হল, তখন সে মড়া। পেটে জলভরা ঢোল মড়া! যাকগে ও কথা। শুরু করি।

এ বিপদের মুহূর্তে চোখ বুজে মনে-মনে যশমশাইয়ের মতো বললুম,—জয় মা তারা! কিন্তু তাতেও কাজ হল না। যশমশাই সগর্জনে পদ্য—আসলে ছড়াপাঠ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মাথামুন্ডু বোঝা যাচ্ছিল না। এই উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্য শেষে মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—গোরাচাঁদ-খুড়ো! বাঁচাও!

অমনি এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। দক্ষিণ থেকে একটা জোরালো ঘূর্ণিহাওয়া এসে যশমশাইয়ের কাগজগুলো উড়িয়ে নিয়ে চলল। যশমশাই আর্তনাদ করলেন,—হায়! হায়! এ কী হল, মা গো!

ততক্ষণে কাগজগুলো শূন্যে ঘুরপাক খেতে-খেতে পূর্বদিক ঘুরে উত্তরে পুকুরের জলে গিয়ে পড়ছিল। অবশ্য পরে তা দেখেছিলুম। এদিকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তারাচরণ যশ বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে তাঁর পদ্যের কাগজ ধরতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে টেনে ধরেছিলুম। তা না হলে উনি দোতলা থেকে নিচে পড়ে নির্ঘাত মারা যেতেন!

বাধা পেয়ে তিনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলুম। কালাচাঁদ তখনও ফেরেনি। যশবাবুর সঙ্গে খিড়কির দরজা দিয়ে পুকুরের ঘাটে গেলুম। দেখলুম, তাঁর পদ্যলেখা কাগজগুলো সবই ছেঁড়া পাতার মতো জলে ভাসছে। ঘূর্ণি হাওয়াটা তখনও জলকে তোলপাড় করছে। তাই কাগজগুলো উল্টেপাল্টে ভিজে গিয়ে ডুবে যাচ্ছে।

যশমশাই জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দু-হাতে চেপে ধরে বললুম,—বরং মোনা-ওঝাকে ডাকুন যশমশাই!

উনি এবার চেঁচিয়ে উঠলেন,—মোনা-ওঝা কোথায় আছিস রে? ওরে মোনা, শিগগির আয় রে!

পেছনে কালাচাঁদের ডাক শোনা গেল। —যশমশাই। কী হয়েছে?

—আমার সর্বনাশ করেছে গোরাচাঁদ ব্যাটাচ্ছেলে! দেখে যা কালাচাঁদ!

কালাচাঁদ ঘাটে এল। তার সঙ্গে একজন জটাজুটধারী লোক। তার হাতে ত্রিশূল। কপাল সিঁদুরে লাল। কালাচাঁদ বলল,—বাজার করে মোনাকে ডেকে নিয়ে এলুম। কেননা হতচ্ছাড়া হনুমান গোরাচাঁদ কলকাতার বাবুমশাইকে জ্বালাতন করতে পারে। মোনা। শীগগির ওকে সেদিনকার মতো দাঁড়কাক করে দাও।

মোনা-ওঝা লাল চোখে ওপারের তালগাছের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে

যন্ত্র পড়তে থাকল। তারপর কী অদ্ভুত ব্যাপার, সত্যিই একটা দাঁড়কাক একটা তালগাছের ডগায় উড়ে এসে বসল। তারপর কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল—খ্র্যা! খ্র্যা! খ্র্যাক! খ্র্যাক! গ্র্যা! গ্র্যা! গ্র্যাক! গ্র্যাক!

মোনা ত্রিশূল তুলে গর্জন করল,—চো-ও-প! মুখ খুললেই আবার অক্কা হয়ে যাবি।

এবার দাঁড়কাকটা স্থির হয়ে বসে রইল। বললুম,—যশমশাই! বাড়ি গিয়ে আবার পদ্য লিখতে বসুন। অন্তত মাস দেড়েক ধরে লিখতে থাকুন। তারপর আমার কাছে নিয়ে আসবেন। শুধরে দেব। আমি এখানে দুটো মাস থাকব।

তারাচরণ যশ খালি সুটকেস হাতে চুপচাপ চলে গেলেন। আমি দোতলার ঘরে গিয়ে এবার নিশ্চিন্ত মনে লিখতে বসলুম। তবে হ্যাঁ—সন্দীপ নতুনরকমের ভূতের কথা বলেছিল। মিলে গেল। ওকে বরং এই ভূত নিয়ে একটা বড় গল্প লিখে দেব। ভূত নিয়ে উপন্যাস লেখা কি সম্ভব আমার পক্ষে? সেটা পেরেছিলেন একমাত্র ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।...

তিন-আঙুলে দাদা

বেচারাম এসে ঠাকুমাকে গড় করে বলল,—এবার একটা কিছু করুন দিদিঠাকরুন। ব্যাটাচ্ছেলে বড্ড বেশি জ্বালাচ্ছে। আমি যে এর পর ফতুর হয়ে যাব।

আমি বারান্দায় শতরঞ্চিতে বসে ভস্তুমাস্টারের ধমক খাচ্ছিলাম। ঠাকুমা কাছাকাছি থাকলেই দেখেছি ওঁর তর্জনগর্জন বেড়ে যায়। কিন্তু এই সাতসকালে বিস্কুটওয়ালা বেচারামের হঠাৎ মুখ চুন করে এসে ঠাকুমাকে গড় এবং ওই নালিশ! ভস্তুমাস্টার আমাকে ভুলে গিয়ে চোখ টেরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঠাকুমা ফুল-বাগানের সেবাযত্ন করছিলেন। হাতে একটা খুরপি। বললেন,—নাক-কাটা না তিন-আঙুলে?

বেচারাম করুণমুখে বলল,—আজ্ঞে তিন-আঙুলে। নাক-কাটা তো মানুষজনের সাড়া পেলেই লজ্জায় লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু তিন-আঙুলে মহা ধড়িবাজ। গাছের ডালে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। তলা দিয়ে কেউ গেলেই হয় চুল টেনে দেয়, নয়তো কানে খিমচি কাটে। মিস্তিরিমশাইয়ের জামাইয়ের কানে—

ঠাকুমা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—কখানা বিস্কুট নিয়েছে তা-ই বল।

তিনখানা খাস্তা, একখানা কিরিমকেক, আড়াইখানা নিমকি। —বেচারাম ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে ফের বলল,—এখনও পুরো হিসেব করে দেখিনি। মাথার ঝাঁকায় পেলাস্টিক মোড়া ছিল। সেই পেলাস্টিক তুলে, কীরকম হাতসাফাই ভাবুন!

ঠাকুমা গম্ভীরমুখে বললেন,—প্লাস্টিক তুললেই তো শব্দ হবে। তোর ভুল হচ্ছে না তো বেচু?

বেচারাম জোরে মাথা নেড়ে বলল,—তিন-আঙুলে কে ছিল মনে নেই দিদিঠাকরুণ?

—হুঁ। শুনেছি পকেটমার ছিল। বাবুগঞ্জের হাটে ধরা পড়ে নাকি ওই অবস্থা।

ভন্তুমাস্টার বলে উঠলেন,—আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম মাসিমা। মারের চোটে একখানা হাত ভেঙে গিয়েছিল। অন্য হাতের আঙুলের দুটো হাড় গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে সেই হাতখানা আর অন্য হাতের দুটো আঙুল কেটে বাদ দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবুরা। সেইজন্যই তো তিন-আঙুলে নাম হয়েছিল।

ঠাকুমা চোখ কটমটিয়ে বললেন, —ভন্তু, পুঁটুকে আঁক কষাও। হাফইয়ারলিতে আঁকে গোল্লা পেয়েছে।

ভন্তুমাস্টার ঘুরে গর্জন করলেন। —একটা বানর ছয় ফুট উচ্চ খুঁটিতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। মিনিটে ছয় ইঞ্চি উঠিয়া দুই ইঞ্চি নামিয়া যাইতেছে। এইরূপে ছয় ফুট উঠিতে তাহার কতক্ষণ সময় লাগিবে?

আমার কান ঠাকুমা এবং বেচারামের দিকে। বেচারাম বলল,—মাথার ঝাঁকায় যে টান পড়েছিল দিদিঠাকরুন!

ঠাকুমা বললেন,—তুই ওকে দেখতে পেলি?

—নাহ্। ঘুরঘুটে আঁধার। তার ওপর টিপটিপিয়ে বিষ্টি। ষষ্ঠীতলা কেমন জায়গা তা তো জানেন।

তুই এখন আয় বেচু। আমি দেখছি কী করা যায়। —বলে ঠাকুমা একটা ফুলগাছের মাটিতে খুরপির কোপ বসালেন। বেচারাম তুম্বোমুখে চলে গেল।

বানরটাকে খুঁটির ডগায় ভন্তুমাস্টার চড়াতে পারলেও আমি পারলাম না। ষষ্ঠীতলার পর একটা খাল আছে। খালের ওপর কাঠের সাঁকো। ওই পথেই আমাকে রোজ স্কুল যেতে-আসতে হয়। ছুটির পর স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরতে আঁধার ঘনিয়ে আসে। খালটা গ্রামের শেষদিকটায়। এ পাড়ায় আমার স্কুলের সঙ্গী বলতে কেতো আর টোটো। টোটো ব্যাকে খেলে। কেতো গোলে। আমি কোনও-কোনওদিন হাফব্যাকে চান্স পাই। কিন্তু টোটো যতই গোঁয়ার হোক, ওর ওপর ভরসা রাখা কঠিন। খুব দৌড়বাজ যে! বেগতিক দেখলেই উধাও হয়ে যায়।

আর কেতোর স্বভাব হল ভয় পেলেই আমাকে জাপটে ধরা। ভাবনায় পড়ে গেলাম।

আমাদের গাঁয়ে অনেকরকম ভূত আছে জানতাম। কিন্তু কখনও তাদের সামনাসামনি দেখতে পাইনি। একজনের নাম ছিল 'কাঁদুনে'। সে নাকি খালের ধারে কেঁদে-কেঁদে বেড়ায়। একজনের নাম 'হাসুনে'। সে রাতবিরেতে খালি হেসে বেড়ায় হিহি করে। 'কাতুকুতু' নামে এক বেজায় দুষ্টু ভূত ছিল। সে একলা-দোকলা মানুষজন পেলেই তাকে কাতুকুতু দিয়ে অস্থির করত। 'হেঁচো ভূত' আমাদের বাগানে এসে

নাকি খুব হাঁচত। আর রামবাবুদের বাঁশবনে ছিল এক 'বেহালা-বাজিয়ে' ভূত। দিনদুপুরেও তার বাজনা শোনা যেত। একবার কেতোর সঙ্গে কঞ্চি কাটতে ঢুকে তার বেহালা শুনে ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। তার বাজনার সুর বড় বিচ্ছিরি।

কিন্তু 'নাক-কাটা' আর 'তিন-আঙুলে'-র কথা সেই প্রথম শুনলাম।

বোঝা গেল এক পকেটমার মরে তিন-আঙুলে হয়েছে। কিন্তু নাক-কাটাটা কে? ভস্তুমাস্টার চলে যাওয়ার পর ঠাকুমার কাছে জেনে নেব ভাবছি, এমন সময় বেচারামের দাদা কেনারাম এসে গড় করল। ঠাকুমা বললেন,—তোর আবার কী হল রে কিনু? দুধে জল মিশিয়ে সিঙ্গিমশাইয়ের চাঁটি খেয়েছিস নাকি?

কেনারাম কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল,—না দিদিঠাকরুন! সর্বনাশ হয়ে গেছে। নাক-কাটা আমার এক হাঁড়ি দুধ নাক দিয়ে টেনে নিয়েছে। কাল সন্ধেবেলা দুধটা জ্বাল দিয়ে রেখেছিলাম। সকালে দেখি একটি ফোঁটাও নেই।

—তুই কী করে জানলি নাক-কাটাই দুধ খেয়েছে?

আজ্ঞে, আমার মেয়ে ইমলি দেখেছে। আমি গিয়েছিলাম রামবাবুদের গরু দুইতে। ইমলির মা পুকুরঘাটে বাসন মাজতে গিয়েছিল। ইমলি একা ছিল। বলল কী, একটা রোগাটে কালো কুচকুচে লোক পাঁচিল ডিঙিয়ে এসেছিল। তার নাক নেই। ইমলি তাই দেখে তো ভয়ে কাঠ। লোকটা দুধের হাঁড়িতে মুখ ঢুকিয়ে চোঁ-চোঁ করে সব শুষে নিয়ে পালিয়ে গেল।

ঠাকুমা গুম হয়ে বললেন,—হুঁ। দেখছি।

কেনারাম কাকুতিমিনতি করে বলল,—দেখছি নয় দিদিঠাকরুন। এর একটা পিতিকার আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না। শুনলাম কাল সন্ধেবেলা বেচুরও সর্বনাশ হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না দিদিঠাকরুন, নাক-কাটা আর তিন-আঙুলে সবাইকে ছেড়ে আমাদের দু-ভাইয়ের পেছনে লাগল কেন? আমরা ওদের কী করেছি?

ঠাকুমা একটু ভেবে বললেন,—হ্যাঁ রে কিনু, পাঁচুকে তুই তো দেখেছিস?

কেনারাম ভুরু কুঁচকে বলল,—পাঁচু, মানে ঝাপুইহাটির সেই পাঁচু-চোর?

—আবার কে? ঠাকুমা একটু কষ্টমাখা হাসি ফোটালেন মুখে। —পঞ্চগ্রামী বিচারে পাঁচুর নাক কেটে দিয়েছিল। তা পাঁচুর বিরুদ্ধে তুই সাক্ষী দিসনি তো?

কেনারাম প্রথমে হকচকিয়ে গেল। তারপর আস্তে বলল,—সে তো অনেকদিনের কথা। সাক্ষী দিইনি, তবে পঞ্চগেরামির সময় বারোয়ারিতলায় ছিলাম বটে। সবাই পাঁচুর নাক কাটার বিচারে হইচই করে সায় দিল। তখন আমিও দিয়ে থাকব। কিন্তু কথা হচ্ছে, নাক কেটেছিল তো নোলে। তার কোনও ক্ষতি আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে তো শুনিনি দিদিঠাকরুন!

ঠাকুমা কেমন রহস্যময় হাসলেন এবার। —হবে কী করে? হলেও বা জানবি কী করে? নোলেও তো কবে মরে গেছে শুনেছি!

কেনারাম আবার ঠাকুমাকে প্রতিকারের নালিশ জানিয়ে চলে গেল। আমার এতক্ষণে অবাক লাগল। আজ বেচারাম-কেনারাম ঠাকুমার কাছে নালিশ জানাতে এল।

সেদিন মিত্তিরমশাই তাঁর জামাইয়ের কানে কে চিমটি কেটেছে বলতে এসেছিলেন। কাল ভেঁটুবাবুও ক্রাচে ভর করে ঠাকুমার কাছে কী যেন বলতে এসেছিলেন। সারারাত নাকি ঘুম হয়নি এবং 'হাঁচি' কথাটাও কানে এসেছিল। কিন্তু সবাই ঠাকুমার কাছে ভূতের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে আসছে কেন?

না বলে পারলাম না,—ঠাকুমা, তুমি বুঝি ভূত জব্দ করতে পারো?

ঠাকুমা চোখ কটমটিয়ে বললেন,—স্কুলের সময় হয়ে এল। চান করতে যাও।

সেদিনই স্কুলের ছুটির পর ফুটবল খেলে কেতো আর টোটোর সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে কেনারাম-বেচারামের গল্প শোনাচ্ছিলাম। খালের সাঁকোর কাছে এসে টোটো বলল,—আজ এসপার-ওসপার করে তবে বাড়ি যাব। পুঁটু, আমার বই-খাতা ধর। কেতো, সেদিনকার মতো পুঁটুকে জাপটে ধরবিনে বলে দিচ্ছি। এক কিকে তোকে মাঠে ফেরত পাঠাব, হ্যাঁ!

কেতো ভয়ে-ভয়ে বলল,—তোর প্ল্যানটা কী?

টোটো চাপা গলায় বলল,—তোরা ওই শিবমন্দিরের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকবি। আমি ষষ্ঠীতলার গাছে উঠে ওত পাতব। মনে হচ্ছে, তিন-আঙুলে বেচুদার বিস্কুটের লোভে ওই গাছে উঠবে। বেচুদা তো ওখান দিয়েই যাবে। ক্লিয়ার?

কেতো বলল,—টোটো, তিন-আঙুলে যদি তোকে গাছ থেকে ঠেলে ফেলে দেয়?

টোটো ঘুসি দেখিয়ে বলল,—একখানা আপারকাট অ্যায়সা মারব যে, তিন-আঙুলে এসে খালের জলে পড়বে।

বেলা পড়ে এসেছে। নিরিবিলি খালের দুধারে গাছপালা কালো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। পাখিদের হল্লা কমে যাচ্ছে। ভাঙা শিবমন্দিরের আড়ালে কেতোর সঙ্গে চলে গেলাম। ষষ্ঠীতলায় একটা ঝাঁকড়া বটগাছ। টোটো গাছে উঠে গেল। তারপর আর সময় কাটতে চায় না। আঁধারে সব অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বুক ঢিপঢিপ করছে অজানা ভয়ে। গোঁয়ার টোটোর পাল্লায় পড়ে কী বিপদ কোনদিক থেকে এসে যাবে, কে জানে! পোকামাকড়ের ডাক বেড়ে গেল এতক্ষণে। জোনাকি জ্বলতে দেখছিলাম এখানে-ওখানে। কেতো ফিসফিস করে বলল,—পুঁটু, বেচুদা এখনও ফিরতে না কেন রে?

সেই সময় ষষ্ঠীতলার গাছের ওপর টোটোর চেঁচানি শোনা গেল। —অ্যাই! কী হচ্ছে? হি হি হি হি...আবার?...হি হি হি হি...আরে, মরে যাব!...হি হি হি...ওরে বাবা! হি হি হি হি...

তারপর ধপাস শব্দ। চেঁচিয়ে উঠলাম,—টোটো! টোটো!

—হি হি হি হি...মরে যাব! সত্যি! হি হি হি হি...ওরে বাবা! হি হি হি হি...

বললাম,—কেতো! আয় তো দেখি!

কেতো পাছে আমাকে জাপটে ধরে, তার সঙ্গে দূরত্ব রেখে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি, টোটো হি হি হি হি করে হাসতে-হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেতো বলল, —সর্বনাশ! টোটো কাতুকুতুর পাল্লায় পড়েছে। পালিয়ে আয় পুঁটু!

কেতো পালানোর আগেই গাছ থেকে পাতা খসে পড়ার মতো কেউ পড়ল এবং কেমন বিচ্ছিরি গলায় বলে উঠল,—চোখ গেলে দেব! কান মলে দেব। ছাড় হতভাগা!

টোটোর হাসি থেমে গেল। সে ফোঁস-ফোঁস করে হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল। তারপর সটান উধাও হয়ে গেল। কেতো আমাকে জাপটে ধরে বলল—পুটু, এবার কী হবে?

গাছ থেকে সদ্য লাফিয়ে পড়া ছায়ামূর্তি তেমনই বিদঘুটে গলায় বলল,—তিন-আঙুলে থাকতে ভয় কী খোকাবাবুরা? কাতুকুতু ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে দেখেই পিঠটান দিয়েছে।

কেতো কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল,—তু-তুমি তি-তিন-আঙুলে?

ছায়ামূর্তি একটা হাত তুলল। আঁধারে স্পষ্ট দেখলাম তার হাতে মোটে তিনটে আঙুল। সে সেই তিনটে আঙুল নেড়ে বলল,—শিগগির কেটে পড়ো তোমরা, বেচারাম আসছে। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

খালের দিকে টর্চের আলোর ঝলক। কেতো বলল,—পুঁটু, চলে আয়। বেচুদা জব্দ হোক। ও বিস্কুটের ডবল দাম নেয়, তা জানিস? তিন-আঙুলে দাদা, আজ ওর ঝাঁকাসুদ্ধু তুলে নিয়ো।

তা আর বলতে? —বলে তিন-আঙুলে তড়াক করে গাছে উঠে গেল।

আমরা হনহন করে হাঁটতে থাকলাম। বাড়ির আশেপাশে কাতুকুতু গিয়ে লুকিয়ে থাকলে কী করব, সে একটা ভাবনা। তবে সে কাতুকুতু দিলেই ঠাকুমাকে চেঁচিয়ে ডাকব। নয়তো তিন-আঙুলে দাদা তো আছেই।

কেতো চাপা গলায় বলল,—তিন-আঙুলে দাদা কিন্তু খুব ভালো। তাই না রে? টোটোকে কাতুকুতুর হাত থেকে না বাঁচালে কী হতো বল?

সায় দিতে যাচ্ছি, কাছাকাছি কেউ হ্যাঁচ্চো করে হেঁচে উঠল। তারপর আর সেই হাঁচি থামতে চায় না। চেঁচিয়ে ডাকলাম,—ঠাকুমা, ঠাকুমা!

অমনি হাঁচি থেমে গেল। ঠাকুমাকে ওরা এত ভয় পায় কেন?

পরদিন সকালে পড়তে বসেছি, এমন সময় দেখি, কেনারাম-বেচারাম দুই ভাই এক আলখাল্লাধারী ফকিরকে সঙ্গে নিয়ে হাজির। ঠাকুমা হাসিমুখে ডাকলেন,—এসো! বাবা এসো! তোমার জন্য কতদিন থেকে পথ চেয়ে বসে আছি। আসছ না দেখে কিনু আর বেচুকে পাঠিয়েছিলাম।

বেচারাম বলল,—তিন-আঙুলে কাল সন্ধ্যায় আমার ঝাঁকাসুদ্ধু তুলে নিয়েছে। আগে ওই ব্যাটাচ্ছেলেকে জব্দ করুন ফকিরবাবা!

কেনারাম বলল,—না। আগে নাক-কাটাকে।

ফকিরবাবা বিড়বিড় করে মন্তর আওড়াতে-আওড়াতে বাগানের মাটিতে বসলেন। তারপর একটু হেসে ঠাকুমাকে বললেন,—বেটি, সেবার তোকে বলেছিলাম শয়তানদের এই ঝুলিতে ভরে পদ্মার ওপারে ফেলে দিয়ে আসি। তুই বললি, না,

না, গঙ্গা পার করে দিলেই যথেষ্ট। এখন দ্যাখ বেটি, ওরা গঙ্গা পেরিয়ে আবার ফিরে এসেছে। পদ্মাপারে দেশের বর্ডার। বর্ডার পেরনোর ঝক্কি আছে। বুঝলি কিছু? পাসপোর্ট-ভিসার হাঙ্গামা আছে না?

ঠাকুমা হাসলেন। —বুঝেছি বাবা, খুব বুঝেছি। এবার তুমি ওদের পদ্মাপার করেই দিয়ে এসো।

মুচকি হেসে ফকিরবাবা বললেন,—আগে দই-চিঁড়ে-কলা দে বেটি! ফলার করি। তারপর হচ্ছে।

ভন্তুমাস্টার বললেন,—কিন্তু ফকিরবাবা, শুনেছি বর্ডারে ঘুষ দিলে নাকি পেরনো যায়।

ঠাকুমা চোখ পাকিয়ে বললেন,—ভন্তু, পুঁটুকে আঁক কষাও।

ভন্তুমাস্টার গর্জন করলেন,—একটি চৌবাচ্চায় দশ গ্যালন জল ধরে। সেই চৌবাচ্চায় একটি ছিদ্র আছে। ছিদ্র দিয়া—

ফকিরবাবার খবর ততক্ষণে রটে গেছে। একজন-দুজন করে লোকের ভিড় জমতে শুরু করেছে। কলার পাতায় ফলার সেরে ফরিবাবা যখন ভূত ধরতে বেরোলেন, তখন তাঁর পেছনে বিশাল মিছিল। ভন্তুমাস্টারকে খুঁজে পেলাম না আর । সেই ফাঁকে আমিও দৌড়ে গিয়ে মিছিলে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম কেতো আর টোটোও এসে গেছে কখন।

ষষ্ঠীতলার কিছু আগে, রাস্তায় ফকিরবাবা তাঁর প্রকাণ্ড লোহার চিমটে দিয়ে দাগ এঁকে বললেন,—খবরদার, খবরদার, এই দাগ পেরিয়ে কেউ যেন আসবে না। দাগ পেরিয়েছ কী মরেছ। খবরদার, খবরদার!

ফকিরবাবা ষষ্ঠীতলার পেছনের জঙ্গলে উধাও হয়ে গেলেন। সবাই চুপ করে আছে। শুনলাম, মিত্তিরমশাই মুচকি হেসে চুপিচুপি ভেঁটুবাবুকে বলছেন,—রামবাবুর বাঁশবনের বেহালাদারকে পেলে হয়। মহা ধূর্ত। খাল পেরিয়ে হয়তো সিঙ্গিমশাইয়ের বাঁশবনে গিয়ে ঢুকে পড়েছে।

সিঙ্গিমশাই পেছনেই ছিলেন। বলে উঠলেন,—বাজে কথা বোলো না মিত্তির! আমার বাঁশবনে কে আছে তা জানো?

তর্কাতর্কি বেধে গেল। অন্যেরা চুপ! চুপ! বলে থামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সিঙ্গিমশাইকে থামানো শক্ত। শেষপর্যন্ত ফকিরবাবাকে ষষ্ঠীতলায় ফিরতে দেখে তর্কাতর্কি থেমে গেল। ফকিরবাবার কাঁধের তাপ্পিমারা রংবেরঙের ঝুলিটি এখন প্রায় পুঁটুলি হয়ে উঠেছে। সামনে এসে তিনি বললেন,—চললাম এবার পদ্মাপারে। ফিরে এসে আবার ফলার খাব।

মুখে ঝলমলে হাসি। প্রকাণ্ড পুঁটুলি হয়ে ওঠা ঝুলিটি খুব নড়ছিল। মিছিল করে গাঁয়ের লোকেরা ওঁর পেছন-পেছন চলল। গাঁয়ের শেষে মল্লিকদের আমবাগানের ধারে পিচরাস্তা। ফকিরবাবা পিচরাস্তায় উঠলে আমার চোখে পড়ল, ওঁর পিঠের দিকে তাপ্পিমারা ঝুলি ফুঁড়ে কালো কুচকুচে তিনটে আঙুল বেরিয়ে আছে। খুব নড়ছে আঙুল তিনটে। 'টা-টা বাই-বাই' করছে কি তিন-আঙুলে দাদা?

দেখে কষ্ট হল। বেশ তো ছিল তিন-আঙুলে। বেচারামকে জব্দ করেছিল। কাতুকুতুকে জব্দ করেছিল। ঠাকুমা কী যে করেন! ভ্যাট!

কিছুদিন পরে এক সকালে ভন্তুমাস্টার আমাকে আঁক কষাচ্ছেন। ঠাকুমা ফুলগাছের সেবাযত্ন করছেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন,—অ্যাই হতচ্ছাড়া! ভালো হবে না বলছি! রেখে যা। রেখে যা।

ভন্তুমাস্টার বললেন,—কী হল মাসিমা?

ঠাকুমা বাগানের বেড়ার দিকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। —অ্যাই বাঁদর! খুরপি দিয়ে যা। নইলে আবার ফকিরবাবাকে খবর পাঠাব।

ভন্তুমাস্টার আবার বললেন,—কী হল মাসিমা?

ঠাকুমা ঘুরে প্রায় আর্তনাদ করে বললেন,—ও ভন্তু, ও পুঁটে, আমার খুরপি নিয়ে পালাচ্ছে। ধরো, ধরো!

—কে খুরপি নিয়ে পালাচ্ছে মাসিমা?

—তিন-আঙুলে। শিগগির ওকে ধরো।

ভন্তুমাস্টার দৌড়ে গেলেন। আমিও দৌড়লাম। বাগানের বাইরে খুরপিটা পড়ে থাকতে দেখা গেল। ভন্তুমাস্টার খুরপিটা কুড়োতে গিয়েই 'উঁহু হু হু' করে পিছিয়ে এলেন। তারপর কানে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন,—উঁহু হু হু, বড্ড জ্বালা করছে যে। ও পুঁটু, আমার কানটা আছে না নেই দ্যাখ তো বাবা!

হাসি চেপে বললাম,—আছে মাস্টারমশাই!

ভন্তুমাস্টার কানে হাত চাপা দিয়ে বললেন,—কোবরেজমশাইয়ের কাছে মলম লাগিয়ে আনি। উঁহু হু হু! তারপর টাট্টুঘোড়ার মতো উধাও হয়ে গেলেন।

তিন-আঙুলে ফকিরবাবার ঝুলি ফুঁড়ে পালিয়ে এসেছে জেনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। বললাম,—তিন-আঙুলে দাদা! ঠাকুমার খুরপিটা আমি কুড়োচ্ছি। আমার কান মুলে দেবে না তো?

না। তিন-আঙুলে আমার কান মলে দিল না। খুরপিটা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঠাকুমাকে দিলাম। ঠাকুমা খুশি হয়ে বললেন,—তিন-আঙুলে ফিরে এসেছে যখন, তখন থাক। গাঁ-গেরামে দু-একটা ভূত না থাকলে চলে? তবে নাক-কাটাটা বড্ড বোকা। সেও পালিয়ে আসতে পারত। তাই না পুঁটু?

সেই সব ভূত

আমাদের গাঁয়ে একসময় প্রচুর ভূত ছিল। শুধু রাতবিরেতে নয়, দিনদুপুরেও তারা একলা-দোকলা মানুষকে বাগে পেলে ভয় দেখিয়ে দুষ্টুমি করত। দুষ্টুমিই বলা উচিত। কারণ কখনও তারা কারুর ঘাড় মটকেছে বা ঠ্যাং ভেঙেছে

বলে শুনিনি। তবে ভয়ের চোটে কেউ ভিরমি খেয়ে মারা পড়লে কিংবা দৌড়ে পালাতে গিয়ে কারুর ঠ্যাং ভাঙলে সেজন্য তো আর ভূতকে দায়ী করা চলে না। যার যা কাজ! ভূতের কাজটাই হল মানুষকে ভয় দেখানো। যে ভূত ভয় দেখায় না, সে আবার কীসের ভূত?

কথাটা বলতেন আমার বড়মামা।

বড়মামা রেলে চাকরি করতেন। ছুটিছাটায় আমাদের বাড়ি আসতেন। সাংঘাতিক সব ভূতের গল্প বলে আমাদের রক্ত জল করে ফেলতেন। গল্প শোনার পর আমরা যারা ছোট তাদের অবস্থা তখন শোচনীয়! কিন্তু তারপরই বড়মামা হো-হো করে হেসে বলতেন,—ওরে! ভূতকে কখনও ভয় পাবি না। কারণ কী জানিস? মানুষ যেমন ভূতকে ভয় পায়, ভূতও মানুষকে খুব ভয় পায়। ভূত যদি ভয় দেখায়, তোরাও তাকে ভয় দেখাবি। দেখবি, ব্যাটাচ্ছেলে তক্ষুনি কেটে পড়েছে।

সে-কথা শুনেও যে খুব একটা সাহস পেতাম, তা নয়। আমার তো খালি ভাবনা হতো, ভূত বড়দের ভয় পেতেও পারে, কিন্তু আমাদের মতো ছোটদের কি আর ভয় পাবে?

আমাদের বাড়ির পিছন দিকটায় ছিল একটা বাগান! তার ওধারে একটা ঝিল। ঝিলের ওধারে ছিল ঘন জঙ্গল। ঠাকুমা বলতেন,—ঝিলের জঙ্গলে থাকে এক কন্ধকাটা। আর ঝিলের ধারে থাকে এক শাঁকচুন্নি। শাঁকচুন্নিটা রোজ রাত্তিরে আলো জ্বেলে ঝিলের ধারে কী যেন খুঁজে বেড়ায়। কন্ধকাটা আলো সইতে পারে না। তাই সে এসে শাঁকচুন্নির সঙ্গে খুব ঝগড়া বাধায়। ঝগড়ার চোটে সারারাত্তির ঘুমোতে পারিনে।

ঠাকুমা থাকতেন বাড়ির পিছনের ঘরে। কখনও-কখনও রূপকথা শোনার লোভে আমি ঠাকুমার কাছে শুতে যেতাম। রূপকথা বলতে-বলতে ঠাকুমা হঠাৎ থেমে গেলে বলতাম,—তারপর কী হল বলো না?

ঠাকুমা আস্তে বলতেন,—ওই আবার বেধেছে।

—কী বেধেছে?

—কন্ধকাটার সঙ্গে শাঁকচুন্নির ঝগড়া। শুনতে পাচ্ছিস না তুই?

—কই না তো!

জ্বালাতন!—বলে ঠাকুমা উঠে গিয়ে ওদিকের জানালাটা বন্ধ করে দিতেন। তারপর বলতেন,—এর একটা বিহিত করা দরকার। কালই মোনা-ওঝাকে ডেকে পাঠাতে হবে।

মোনা ছিল ভূতের ওঝা। ভূতগুলোর সঙ্গে নাকি বেজায় ভাব। তারা তাকে খুব সমীহ করে। একবার হল কী, সিঙ্গিমশাই রাত নটার বাসে শহর থেকে ফিরছেন। হাতে ছিল একভাঁড় রসমালাই। ঠাকরুনতলার বটগাছের কাছে যেই এসেছেন, অমনি গাছ থেকে ঝুপ-ঝুপ করে কয়েকটা ছায়ামূর্তি লাফিয়ে পড়ে তাঁকে ঘিরে ধরেছে। রসমালাইয়ের ওপর ভূতদের লোভ হতেই পারে। 'দেঁ-দেঁ' করে তারা চেঁচাচ্ছিল।

এসব ক্ষেত্রে নিয়ম হল, 'দেব-দিচ্ছি' করে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সিঙ্গিমশাই নিয়মটা ভুলে গিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালালেন। পালাতে গিয়ে পড়লেন একটা গর্তে। আর একটা ঠ্যাং-ও গেল ভেঙে। রসমালাইয়ের ভাঁড়টা হাত থেকে ছিটকে পড়েছিল। ভূতেরা আহ্লাদ করে রসমালাই সাবাড় করল। সিঙ্গিমশাই যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে সবই দেখলেন। কিন্তু কী আর করা যাবে?

তাঁর কাতরানি রামুধোপা শুনতে পেয়েছিল। সে বেরিয়েছিল তার গাধাটাকে খুঁজতে। গাধাটার ছিল বিচ্ছিরি স্বভাব। প্রায় রাত্তিরেই দড়ি ছিঁড়ে খেলার মাঠে চলে যেত এবং পছন্দসই কোনও ভূতকে পিঠে চাপিয়ে ছুটোছুটি করত। আসলে রামুর গাধার সঙ্গে ভূতদের ছিল বেজায় গলাগলি, বন্ধুত্ব।

তো রামু সিঙ্গিমশাইকে কাঁধে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। তারপর শহরের হাসপাতালে কয়েকমাস কাটিয়ে সিঙ্গিমশাই ফিরে এলেন বটে, কিন্তু একটি ঠ্যাং হাঁটুর ওপর থেকে বাদ। ক্রাচে ভর করে হাঁটতেন এবং নতুন নাম পেয়েছিলেন 'খোঁড়াসিঙ্গি'।

খোঁড়াসিঙ্গি ভূতের ওপর খাপ্পা হয়ে মোনা-ওঝাকে তলব করেছিলেন। বলেছিলেন,—শুধু ঠাকরুনতলার নয়, গাঁয়ের সব ভূতকে গঙ্গার ওপারে তাড়িয়ে দিয়ে আয় তো মোনা। যা চাস, পাবি।

মোনা-ওঝা বলল,—তাড়িয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে সিঙ্গিমশাই? কাউকে ভিটেছাড়া করা যে মহাপাপ। তা ছাড়া, ওদের সঙ্গে আমার কতকালের সম্পর্ক। যা বলি তাই শোনে। এ কাজ আমি পারব না সিঙ্গিমশাই।

খোঁড়াসিঙ্গি তর্জনগর্জন করে বললেন,—তাহলে তোকেই ভিটেছাড়া করব বলে দিচ্ছি। বেশ বুঝেছি, তুই-ই যত নষ্টের গোড়া। তোরই আস্কারা পেয়ে হারামজাদাগুলোর এত বাড় বেড়েছে। দাঁড়া! কালই পঞ্চগেরামি করে তোর বিচারের ব্যবস্থা করছি।

সে আমলে 'পঞ্চগেরামি' অর্থাৎ পঞ্চগ্রামী মানে পাঁচ গাঁয়ের মাতব্বর লোকদের ডেকে বিচারসভার আয়োজন। সেই বিচারসভা বসল চণ্ডীমণ্ডপে । মোনাকে ডেকে আনা হল। মোনা-ওঝা কিন্তু একটুও দমে যায়নি। সে মুচকি হেসে বলল,—বাবুমশাইরা! ওপরে দেবতা, নিচে মা বসুমতী। ন্যায্য বিচার করে বলুন দিকি দোষটা কার? সিঙ্গিমশাইয়ের ঠ্যাং কি ভূতগুলো ভেঙেছে, নাকি নিজেই গর্তে আছাড় খেয়ে নিজেই ভেঙেছেন? জিগ্যেস করুন তো সিঙ্গিমশাইকে।

সবাই একমত হলেন যে, ভূতগুলো সিঙ্গিমশাইয়ের ঠ্যাং-এ আঘাত করেনি, এটা সত্যি। কিন্তু পাশের গাঁয়ের চক্কোত্তিমশাই বললেন,—মানছি,—ওরা সিঙ্গি মশাইয়ের ঠ্যাং ভাঙেনি। তবে এ-ও তো ঠিক যে ভূতগুলো ওঁকে ভয় না দেখালে উনি দৌড়ে পালাতেন না এবং গর্তেও পড়তেন না। ঠ্যাং-ও ভাঙত না।

মোনা-ওঝা হাত নেড়ে বলল,—ভুল! একেবারে ভুল। ভূতগুলো ওঁকে কক্ষনও ভয় দেখায়নি। মা চণ্ডীর দিব্যি করে বলুন উনি।

মাতব্বররা সিঙ্গিমশাইকে জিগ্যেস করলেন কথাটা। সিঙ্গিমশাই গাঁইগুঁই করে বললেন,—না-মানে, ঠিক ভয় দেখায়নি। তবে আমার হাতে রসমালাইয়ের ভাঁড় ছিল। সেটা কেড়ে নিতে এসেছিল।

মোনা-ওঝা বলল,—আবার ভুল হল বাবুমশাইরা! কেড়ে নিতে এসেছিল, নাকি চেয়েছিল? মা-চণ্ডীর দিব্যি, সত্যি কথাটা বলুন।

আমাদের গাঁয়ের মা-চণ্ডী জাগ্রত দেবী। তাঁর ভয়ে খোঁড়াসিঙ্গিকে স্বীকার করতে হল, রসমালাইগুলো কেড়ে নেবে বলে মনে হচ্ছিল বটে, তবে ওরা 'দেঁ-দেঁ' করে চেঁচাচ্ছিল সেটা মিথ্যা নয়।

তাহলে? —মোনা-ওঝা একগাল হেসে বলল,—এবার বলুন দোষটা কার? হাতে রসমালাই দেখলে কেউ চাইতেই পারে। আপনি ইচ্ছে হলে দেবেন, নয়তো দেবেন না, আপনি বলতেন পারতেন, দেব না। তা না করে আপনি দৌড়ে পালালেন। গর্তে পড়ে ঠ্যাংটি ভাঙলেন। আর দোষটা দিচ্ছেন অন্যকে?

মামলা ভেস্তে যাচ্ছে দেখে খোঁড়াসিঙ্গি বললেন,—কিন্তু আমার নালিশ তো এই মোনার বিরুদ্ধে। মোনার আস্কারাতেই এ গাঁয়ের ভূতগুলোর বড্ড বাড় বেড়েছে।

মোনা-ওঝা বলল, —প্রমাণ?

মাতব্বররাও বলে উঠলেন,—হ্যাঁ। প্রমাণ চাই। সাক্ষী চাই, সিঙ্গিমশাই, কই আপনার সাক্ষীদের ডাকুন।

সাক্ষী পাওয়া গেল না। আমাদের গাঁয়ের লোকেরা বলল,—ভূতগুলো বাড়াবাড়ি করলে বরং মোনা-ওঝাই এসে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়। কাজেই মোনা তাদের আস্কারা দেয় বলা চলে না। তা ছাড়া আজ অব্দি মোনা-ওঝা কারুর পেছনে ভূতকে লেলিয়ে দিয়েছে বলেও জানা নেই।

'পঞ্চগেরামি' বিচারসভায় মোনা-ওঝা বিলকুল খালাস পেয়ে গেল।

কিন্তু খোঁড়াসিঙ্গির রাগ পড়েনি। কিছুদিন পরে উনি কোত্থেকে এক সাধুবাবাকে নিয়ে এলেন। সাধুবাবা ঠাকরুনতলায় ত্রিশূল পুঁতে মড়ার খুলির সামনে ধুনি জ্বেলে ধ্যানে বসলেন। গাঁ-সুদ্ধু ছোট-বড় সবাই ভিড় জমাল সেখানে। আমরা, ছোটরাও ব্যাপারটা দেখতে গেলাম।

সাধুবাবা একসময় ধ্যান ভেঙে লালচোখে চারদিকে দেখে নিয়ে মড়ার খুলিটা তুলে নিলেন। মন্তর আওড়ে গর্জন করলেন,—আয়-আয়! যে যেখানে আছিস, চলে আয়। এই খুলির মধ্যে ঢুকে পড় সবাই। বেম্মদত্যি, কন্ধকাটা, শাঁকচুন্নি, মামদো, পেঁচো গোদানো, হাঁদা, নুলো, ভুলো, কেলো, ক্যাংলা-খ্যাংলা দুই ভাই, জট-জটি, পিশাচ, গলায় দড়ে, যখবুড়ো সব্বাই আয়! সব্বাই এসে ঢুকে পড় এই খুলির ভেতর।

এই বলে সাধুবাবা মড়ার খুলিটা দু-হাতে চেপে ধরে ঝুলিতে ঢোকালেন। ত্রিশূল তুলে হুঙ্কার দিতে-দিতে এগিয়ে গেলেন ঝিলের দিকে। ঝিলের জলে মড়ার খুলিটা বের করে ছুড়ে ফেলে বললেন,—থাক তোরা জলের তলায়। আর বলে দিচ্ছি, যে এই খুলি তুলবে, তার মুখে রক্ত উঠে মারা পড়বে।...

এরপর বেশ কিছুদিন আমাদের গাঁয়ে আর ভূতের সাড়াশব্দ ছিল না। মোনা-ওঝা নাকি মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াত। লোকেরা রাত-বিরেতে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করত। মাঝে-মাঝে দেখতাম, রামুধোপার গাধাটা ঝিলের ধরে ঘাস খেতে-খেতে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাত! ওর দৃষ্টিটা খুব করুণ মনে হতো। তার খেলার সঙ্গীরা জলের তলায় খুলির ভেতর বন্দি। বেচারার দুঃখ হতেই পারে।

হঠাৎ একদিন হইচই পড়ে গেল।

রামুধোপা গিয়েছিল ঝিলের জলে কাপড় কাচতে। সে দেখেছে সেই মড়ার খুলিটা ঝিলের ধারে পড়ে আছে। জল থেকে নিশ্চয় কেউ ভূতবোঝাই খুলিটা তুলেছে।

সারা গাঁ ভেঙে পড়ল ব্যাপারটা দেখতে। খোঁড়াসিঙ্গিও ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে সেখানে হাজির হলেন। আমারও দেখার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু বড়রা কিছুতেই ছোটদের যেতে দিলেন না। জলের তলার খুলি থেকে খালাস পাওয়া ভূতগুলো খাপ্পা হয়েই আছে। কাজেই অবোধ আর দুর্বল ছোটদের ওপর তাদের নজর পড়ার সম্ভাবনা আছে।

পরে শুনলাম, দায়টা চেপেছে মোনা-ওঝারই কাঁধে। মোনাও তন্ত্রমন্ত্র জানে। কাজেই সাধুবাবার ফেলে দেওয়া খুলি সে ছাড়া জল থেকে তুলবে সাধ্য কার? তা ছাড়া মোনা নিশ্চয় কোনও বড় ওঝার কাছে নতুন বিদ্যে রপ্ত করে এসেছে। তবে শেষপর্যন্ত এতে মোনা-ওঝারাই জয়-জয়কার পড়ে গেল। মুখে রক্ত উঠে সে মারা পড়েনি। তার মানে, আমাদের গাঁয়ের এই ওঝা সেই সাধুবাবার চেয়ে এখন আরও ক্ষমতাশালী। সিঙ্গিমশাই কেঁচো হয়ে ঘরে ঢুকলেন। কদাচিৎ বাইরে বেরুতেন তিনি। বেরুলেই দিনদুপুর ছাড়া নয়। মোনা-ওঝার এতে দাপট বেড়ে গেল।

এদিকে আবার ভূতের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল সেদিন থেকেই। পণ্ডিতমশাই পাঠশালার ছুটির পর বাড়ি ফিরছেন। হঠাৎ গাছ থেকে টুপ-টাপ করে ঢিল পড়ল। পণ্ডিতমশাইয়ের বেলায় এ কোনও নতুন ঘটনা নয়। বরং ঢিল পড়া বন্ধ হওয়াতে তাঁর খারাপ লাগত। আবার ঢিল পড়ায় খুশি হয়েছিলেন। বললেন,—কীরে তোরা সব কেমন আছিস?

গদাই মোড়ল সন্ধেবেলা মাঠ থেকে ফিরছেন। একটা কালো বেড়াল তাঁর সঙ্গ নিল। মোড়ল খুব খুশি হয়ে বললেন,—ভালো আছিস তো বাবা? জলবন্দি হয়ে নাকি খুব কষ্টে ছিলিস?

এইসব ঘটনা সন্ধেবেলায় ছোটকাকা খুব জমিয়ে বর্ণনা করতেন। আমি কিন্তু তখনও ভূত দেখিনি বা সে-রকম কোনও সাড়াশব্দও পাইনি। বড়রা বলতেন,—ভূত আছে। আমরা ছোটরাও মেনে নিতাম, ভূত আছে। তাছাড়া বড়মামা এসে ভূতের স্বভাবচরিত্র, কীর্তিকলাপ শুনিয়ে ভূতের ব্যাপারটাকে আরও পাকাপোক্ত করে ফেলতেন।

তো অমন একটা ঘটনার কিছুদিন পরে ঠাকুমার মুখে ঝিলের ধারের শাঁকচুন্নি

আর জঙ্গলের কন্ধকাটার ঝগড়ার কথা শুনেছিলাম। বলেছিলেন,—মোনা-ওঝাকে ডাকতে হবে। মোনা ছাড়া এর বিহিত হবে না।

মোনা-ওঝা পরদিন এসেছিল। ঠাকুমার মুখে সব শুনে সে বলল,—বড় সমিস্যে দিদিঠাকরুন। ওদের ঝগড়াঝাটির কথা আমার অজানা নয়। অনেক চেষ্টা করেও মিটমাট করাতে পারিনি। আসলে শাঁকচুন্নিটা আলো ছাড়া এক পা হাঁটতে পারে না। মেয়েটা রাতকানা। ওদিকে কন্ধকাটার চোখে ঘা। আলো লাগলেই জ্বালা করে। কাকে দোষ দেব বলুন?

—তুই কন্ধকাটাকে বরং অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে বল মোনা!

—যাবে-বা কোথায়? সব জায়গাই তো দখল হয়ে আছে।

—খুঁজলে নিশ্চয় কোথাও পাওয়া যাবে। তুই খুঁজে দ্যাখ না।

মোনা-ওঝা একটু ভেবে নিয়ে বলল,—মুসলমানপাড়ার গোরস্থানে একটা শ্যাওড়া গাছ আছে। গাছটাতে একটা মামদো থাকত দেখেছি। কাল রাত্তিরে গিয়ে তাকে ডাকলাম, চাচা আছো নাকি? কোনও সাড়া পেলাম না। আমার সন্দেহ হচ্ছে, মামদোচাচা ডেরা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। প্রায়ই বলত, গাছটা পছন্দ হচ্ছে না রে। হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায় না! বড্ড বেশি ডালপালা। হাওয়া-বাতাস ঢোকে না।

ঠাকুমা খুব উৎসাহ দেখিয়ে বললেন,—তাহলে তুই কন্ধকাটাকে গিয়ে কথাটা বল মোনা। ওদের ঝগড়ার জ্বালায় সারারাত্তির ঘুমোতে পারিনে।

মোনা-ওঝা কিন্তু-কিন্তু করে বলল,—দেখি, বলেকয়ে। তবে গোরস্থানে কন্ধকাটা যেতে রাজি হবে বলে মনে হয় না।

—কেন? রাজি হবে বলে মনে হয় না?

—বুঝলেন না? কন্ধকাটা হল গিয়ে হিন্দু। মুসলমানদের গোরস্থানে যেতে চাইবে কি?

ঠাকুমা ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন,—ধুর পাগল! ভূতের আবার হিন্দু-মুসলমান কী রে? ভূত হল ভূত। মানুষের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান আছে। ভূতের মধ্যে নেই। তুই কন্ধকাটাকে একবার বলেই দ্যাখ গে না। বলবি, গোরস্থানের তল্লাটে একেবারে শুনশান অন্ধকার। আরামে থাকবে।...

কদিন পরে মোনা-ওঝা এসে বলল,—কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে দিদিঠাকরুন! কন্ধকাটাকে বলেকয়ে রাজি করিয়েছিলাম। কাল সন্ধেবেলায় সে গোরস্থানের শ্যাওড়াগাছে ডেরা বাঁধতে গিয়েছিল। কিন্তু মামদোচাচা আবার ফিরে এসেছে। তাড়া খেয়ে কন্ধকাটা পালিয়ে এল।

ঠাকুমা নিরাশ হয়ে বললেন,—মুখপোড়া মামদোটা ফিরে এল কেন জানিস?

বলতে গেলে সে অনেক কথা! —মোনা-ওঝা শ্বাস ছেড়ে বলল। —বেঁচে থাকতে এক কাবুলিওয়ালার কাছে দেনা করেছিল। এদিকে কাবুলিওয়ালাও যে মরে

ভূত হয়েছে আর মোদিপুরের গোরস্থানের কাছে বাজপড়া তালগাছের ডগায় ডেরা খুঁজে নিয়েছে, মামদোচাচা জানত না। ওকে দেখেই কাবুলিওয়ালা লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল। তাড়া খেয়ে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক ঘুরে মামদোচাচা বাড়ি ফিরেছে।

হ্যাঁরে মোনা, তাহলে এক কাজ কর না তুই। —ঠাকুমা মিটিমিটি হেসে বললেন,—ঘটকালিতে লেগে যা। শাঁকচুন্নির সঙ্গে কন্ধকাটার বিয়ে দিয়ে দে। তাহলেই মিটমাট হয়ে যাবে।

মোনা-ওঝা ফিক করে হাসল। —সেই চেষ্টাই তো করছি দিদিঠাকরুন। শুধু একটাই সমিস্যে! কন্ধকাটার চোখের ঘা সারিয়ে দেওয়া দরকার। তাহলে শাঁকচুন্নির পিদিমের আলো ওর চোখের ঘায়ে খোঁচা দেব না। দেখি, তেমন বদ্যি-কোবরেজ কোথাও পাই নাকি!

মোনা চলে গেলে বললাম,—আচ্ছা ঠাকুমা, কন্ধকাটাদের তো মুন্ডু নেই শুনেছি। ছোটকাকা বলছিলেন। ওদের চোখ কোথায় থাকে তাহলে?

ঠাকুমা বললেন,—ধুর বোকা! চোখ থাকে ওদের বুকের ওপর।

কন্ধকাটার বুকে চোখের কথা শুনে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর থেকে দিনদুপুরেও আর ঝিলের জঙ্গলের দিকে তাকাতে সাহস পেতাম না। বড়মামা বলতেন বটে, ভূতকে কক্ষনও ভয় পাবি না। কিন্তু কন্ধকাটার একে তো মুন্ডু নেই, তার ওপর বুকে দুটো চোখ। মুখোমুখি দেখা তো দূরের কথা, কল্পনা করতেই যে রক্ত হিম হয়ে যায়!

তো শেষপর্যন্ত মোনা-ওঝা ভূতের কোবরেজ খুঁজে পেয়েছিল। সেই কোবরেজের মলমে নাকি কন্ধকাটার চোখের ঘা সেরে যাচ্ছিল। আগামী কালীপূজার অমাবস্যার রাত্তিরেই কন্ধকাটার সঙ্গে শাঁকচুন্নির বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল। মোনা রোজই এসব খবর দিয়ে যেত। বিয়েতে খরচাপাতির ব্যাপার আছে। ঠাকুমা সবই দিতে রাজি হয়েছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ এক অঘটন ঘটে গেল।

হঠাৎই বলা চলে। কারণ ইতিমধ্যে আমাদের গাঁয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা হয়েছে এবং খুটি পোঁতার কাজও শেষ, কিন্তু বিদ্যুতের পাত্তা ছিল না। লোকেরা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। এতদিনে খবর পাওয়া গেল, সামনের দুর্গাপুজোয় বিদ্যুৎ আসছে। উদ্বোধন করতে আসছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। সাজো-সাজো রব পড়ে গেল খবর শুনে। শহর থেকে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আসার হিড়িক পড়ল সঙ্গে-সঙ্গে। ছোটকাকা আমাদের বাড়িতে মিস্ত্রি এনে বিপুল উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন। বাগানের দিকে আলোর ব্যবস্থা করা হল। তারপর ষষ্ঠীর দিন সন্ধেবেলায় খেলার মাঠে জনসভা হল, বিদ্যুৎমন্ত্রী এসে সুইচ টিপে উদ্বোধন করলেন। চারদিকে উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল।

সে রাত্তিরে আমরা প্রায় জেগেই কাটালাম। এত আলো, এমন উজ্জ্বল আলো ছেড়ে কি ঘুমোতে ইচ্ছে করে?

শুধু ঠাকুমার মুখ গম্ভীর। কেন গম্ভীর, তা সকালবেলায় জানতে পারলাম। বাগানের কোণায় একটা বেলগাছ ছিল, সেই গাছে থাকত এক বেম্মদত্যি। সকালে দেখি, ঠাকমা বেলতলায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি ঝিলের দিকে।

ঠাকুমার কাছে গেছি, সেই সময় মোনা-ওঝা ঝিলের দিক থেকে হন্তদন্ত এসে ধপাস করে বসে পড়ল। ঠাকুমা বললেন,—খুঁজে পেলি?

মোনা-ওঝা ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলল,—নাহ্। সব পালিয়েছে। কেউ নেই।

ঠাকুমা বেলগাছের ডগার দিকে মুখ তুলে বললেন,—এ বুড়োও পালিয়ে গেছে। কাল রাত্তিরে স্পষ্ট দেখলাম, যেই ওই আলোটা জ্বলেছে, অমনি বুড়ো গাছ থেকে নেমে পালিয়ে গেল। ওই দ্যাখ, হাত থেকে হুঁকোটা পড়ে গেছে। কল্কেটাও পড়ে আছে দেখতে পাচ্ছিস?

মোনা উদাসচোখে হুঁকোটার দিকে তাকিয়ে বলল,—দিদিঠাকরুন যদি হুকুম দেন, বাবা বেম্মদত্যির হুঁকোকল্কে আমিই নিয়ে যাই।

নিয়ে যা। —ঠাকুমা করুণমুখে বললেন। —তবে এঁটো করিসনে যেন। বামুনবুড়ো জানতে পারলে কষ্ট পাবে। রোজ রাত্তিরে বুড়ো হুঁকো খেত আর খকখক করে কাশত। আহা, কোথায় ভিটেছাড়া হয়ে চলে গেল সব?

মোনা-ওঝা হুঁকোকল্কে কুড়িয়ে নিয়ে বলল,—আমার সবচেয়ে দুঃখুটা কী জানেন দিদিঠাকরুন? শাঁকচুন্নি আর কন্ধকাটার বিয়েটা ভন্ডুল হয়ে গেল। এ আলো কি যেমন-তেমন আলো? ইলেকটিরি বলে কথা। আমি যে মানুষ, আমারও চোখ জ্বালা করে। তবে দেখবেন দিদিঠাকরুন, এ পাপ সইবে না। আমি বরাবর বলে আসছি, কাউকে ভিটেছাড়া করার মতো পাপ আর নেই। এই মহাপাপ কি ভগবান সইবেন ভাবছেন? কক্ষনও না।...

ঠিক তা-ই।

মোনা-ওঝার কথা ফলেছে বলা চলে। এখন বড় হয়েছি। কলকাতায় থাকি। খবর পাই, আমাদের গাঁয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন বিদ্যুৎ থাকে না। মোনার ভগবান নাকি লোডশেডিং নামে এক সাংঘাতিক দানো পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে ভিটেছাড়া ভূতগুলোকে ফিরিয়ে এনেছে। তাছাড়া চোখে সইয়ে-সইয়ে বিদ্যুতের আলো দিয়ে ভূতগুলোকে সে চাঙ্গা করে তুলেছে। সেইসব ভূতই নাকি তার কাটে। ট্রান্সফরমার চুরি করে। কত উপদ্রব বাধায়। ঠাকুমা বেঁচে নেই। মোনাও বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে শাঁকচুন্নি আর কন্ধকাটার বিয়েটা লোডশেডিংয়ের দৌলতে ঘটা করেই ওঁরা দিতেন।

বললে তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না। গত পুজোয় গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। রাত্তিরে হঠাৎ লোডশেডিং। অভ্যাসমতো ঠাকুমার সেই ঘরে শুয়েছিলাম। রাতদুপুরে বাগানে হঠাৎ খকখক করে কাশির শব্দ শুনে জানলায় উঁকি মেরে দেখি, সেই বেলগাছে হুঁকোর আগুন জুগজুগ করছে।

খুব খুশি হলাম। মানুষের জীবনে ভূতটুত না থাকলে কি চলে? জীবনটাই যে নীরস হয়ে যাবে, যদি না থাকে ভূতপেতনি, যদি না থাকে অন্ধকার।...

ডনের ভূত

সেদিন সকালে চোখ বুজে একটা রোমাঞ্চকর গল্পের প্লট ভাবছি এবং টেবিলে কাগজ-কলমও তৈরি, হঠাৎ পিঠে চিমটি কাটল কেউ। 'উঃ' বলে আর্তনাদ করে পিছনে ঘুরে দেখি, ডন দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ধূর্ত এবং ক্রূর হাসির ছাপ। খাপ্পা হয়ে বললুম,—হতভাগা ছেলে! দিলি তো মুডটা নষ্ট করে?

ডন আমার ভাগনে। মহা ধড়িবাজ বিচ্ছু ছেলে! তার মাথায় একটা কিছু খেয়াল চাপলেই হল। তাই নিয়ে উঠে পড়ে লাগবে।

তা লাগুক আপত্তি নেই। কিন্তু প্রতিটি খেয়ালের সঙ্গে আমাকেও যে জড়াবে, এটাই হল সমস্যা। ওইরকম নিঃশব্দ হাসিটি হেসে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললুম,—বুঝেছি। টাকা চাই। কিন্তু এবার কী কিনবি? রামুর গাধা, না সোঁদরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার?

ডন ফিক করে হেসে অমায়িক ভদ্রলোক হল। বলল,—না মামা! ভূত কিনব।

অবাক হয়ে বললুম,—ভূত কিনবি? কোথায় পাবি ভূত? কে বেচবে?

ডন কাছে ঘেঁষে এল। টেবিলের কলমটা খপ করে তুলে নিয়ে বলল,—মোটে তিন টাকা দাম, মামা! যদি এক্ষুনি তিনটে টাকা না দাও, কী হবে বুঝতে পারছ?

বিপদ ঘনিয়েছে দেখে ঝটপট বললুম,—বুঝেছি, বুঝেছি। লক্ষ্মী ছেলের মতো আগে আমার কথার জবাব দে। ঠিক-ঠিক জবাব হলে তিনটে টাকাই পাবি।

—শিগগির বলো মামা! দেরি হলে গোগো ভূতটা কিনে ফেলবে।

—ভূত কার কাছে কিনবি?

—মোনাদার কাছে।

—মোনাদা মানে সেই মোনা-বুজরুক? মোনা ভূত কোথায় পেল?

—ঝিলের ধারে বাঁশের জঙ্গলে ফাঁদ পেতে ধরেছে।

—তুই দেখে এলি?

—হুঁ। শিশির ভেতর ভরে রেখেছে। —মোনাদা বলল,—শিশির দাম পঞ্চাশ পয়সা আর ভূতটার দাম দু-টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ইজ ইকোয়্যাল টু তিন টাকা।

হাসতে-হাসতে বললাম,—বাঃ! অ্যাদ্দিনে অঙ্কে তোর মাথা খুলেছে দেখছি। তো ভূতটা দেখতে কী রকম?

ডন চটে গেল। —ভূত কি চোখে দেখা যায়? কই শিগগির টাকা দাও। —বলে সে কলমটা টেবিলে ঠোকার ভঙ্গি করল।

দামি কলম। তাই বেগতিক দেখে তিনটে টাকা দিলুম। টাকা পেয়ে কলমটা রেখে ডন গুলতির বেগে উধাও হয়ে গেল।

গল্পের মুডটা চটে গেল। মনে-মনে মোনার মুন্ডুপাত করতে থাকলুম। মোনা থাকে ঝিলের ধারে পুরোনো শিবমন্দিরের কাছে।

মোনার মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে একফালি গেরুয়া কাপড়,

কপালে লাল তিলক আঁকা। সে নাকি তন্ত্রসাধনা করে। কারও কিছু চুরি গেলে মোনা নাকি মন্ত্রের জোরে চোর ধরিয়ে দেয়। অসুখ-বিসুখের চিকিৎসাও করে। তবে কথাটা হল, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। কাজেই যারা ওকে বিশ্বাস করে, তারা বলে মোনা-ওঝা এবং যারা করে না, তারা বলে মোনা-বুজরুক। তবে লোকটাকে যত ভয়ঙ্কর দেখাক, ওপর পার্টির দুটো দাঁত নেই বলে যখনই হাসে, তাকে ভালোমানুষ মনে হয়। কিন্তু মোনা বুজরুক ডনকে ঠকাবে এবং ডন একটা ছোট ছেলে। এতেই মোনার ওপর খাপ্পা হয়েছিলুম। বড়রা বোকামি করে ঠকে। ছোটদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকানো ভারি অন্যায়। ভাবলুম, মোনাকে গিয়ে খুব বকে দিয়ে আসি।

কিন্তু ডন তক্ষুনি ফিরে এল। তার হাতে একটা ছোট্ট শিশি। শিশিটা দেখিয়ে সে খুশি-খুশি মনে বলল,—গোগো টাকা নিয়ে গিছল মামা! মোনাদা ওকে দিল না। বলল, আগে আমি কিনব বলেছিলুম, তাই আমাকেই সে বেচবে।

সে টেবিলে শিশিটা রাখল। শিশিটার ভেতর কিচ্ছু নেই। বললাম,—হ্যাঁরে, এর ভেতর যে ভূত আছে, কী করে বুঝলি?

ডন বলল, —আছে মামা! মোনাদা বলল, সন্ধ্যা হলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

—ঠিক আছে। তা এই যে তুই ভূত পুষবি, ভূতকে কিছু খেতে দিতে হবে না?

—হবে বইকী। ভূতেরা দুধ আর মাছ খায়। তাই খাওয়াব।

—কিন্তু খাওয়াতে গেলে যদি ভূতটা পালিয়ে যায়?

মোনাদা বলল,—আবার ফাঁদ পেতে ধরে দেবে।

—ডন চাপা গলায় বলল,—আমি একটু দুধ নিয়ে আসি মামা! তুমি যেন ছিপি খুলো না।

ডন দুধ আনতে গেল। আমি সেই সুযোগে শিশির ছিপি খুলে ব্যাপারটা পরীক্ষা করার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। ছিপিটা খুলতেই বোঁটকা গন্ধ টের পেলুম। তারপর দেখি, জানলা গলিয়ে একটা বেড়াল লাফ দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

ব্যাপারটা এমন আকস্মিক যে, চমকে উঠেছিলুম। কালো বেড়াল তো এঘরে দেখিনি। বাড়িতেও কোনও কালো বেড়াল নেই। ওটা এল কোত্থেকে? কখন এ ঘরে ঢুকল? ছিপি খোলার পরই বা জানালা গলিয়ে পালাল কেন?

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম একেবারে। সেই সময় ডনের আবির্ভাব হল। তার হাতে দুধের বাটি। সে দেখতে পেল আমি ছিপি খুলেছি। অমনি চিক্কুর ছাড়ল,—মামা! মামা! ছিপি খুললে কেন? তারপরই তার চোখ গেল জানালার ওধারে পাঁচিলের দিকে। পাঁচিলে কালো বেড়ালটা বসে কেমন জুলজুলে চোখে এদিকে তাকিয়ে আছে।

ডন দুধের বাটি রেখে আমার হাত থেকে শিশি আর ছিপি ছিনিয়ে নিয়ে বেরুল। পাঁচিলের কাছে যেতেই বেড়ালটা লাফ দিয়ে ওধারে নামল। ডনকেও বেরিয়েও যেতে দেখলুম।

এবার জানি কী-কী ঘটবে। আমার কাগজ ছিঁড়ে কুচিকুচি হবে। কলমটা গুঁড়ো হয়ে যাবে। আমিও প্রচুর চিমটি খাব। ডনের নখ যা ধারালো!

কাগজ-কমল সামলে রেখে আমিও পালানো ভূতটা ধরার ছল করে বেরিয়ে গেলুম। রাস্তার দাঁড়িয়ে ডন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সে কিছু বলার আগেই বললুম,—চল! আবার মোনা-বুজরুকের কাছে যাই। সে ফাঁদ পেতে পালিয়ে যাওয়া ভূতটাকে ধরুক। টাকা যা লাগে, দেব।

ডন কাঁদো-কাঁদো মুখে এগোল! খেলার মাঠ পেরিয়ে ঝিল। ঝিলের ধারে শিবমন্দিরের ওখানে ঘন জঙ্গল। সেখানে পৌঁছে ডাকলুম,—মোনা আছো নাকি! ও মোনা!

সাড়া এল জঙ্গলের দিক থেকে,—কে ডাকে গো?

মোনার গলার স্বর কেমন অদ্ভুতুড়ে। বললুম,—শিগগির একবার এসো তো এদিকে। একটা কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে।

জঙ্গলের ভেতর থেকে মোনার জবাব এল। —আমিও এক কেলেঙ্কারিতে পড়েছি। জায়গা ছেড়ে নড়ি কী করে?

অগত্যা মন্দিরের পেছনে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকলুম। বললুম,—তুমি আছোটা কোথায়?

—শ্যাওড়া গাছের ভেতরে।

শ্যাওড়া গাছটা দেখা যাচ্ছিল। সেখানে গিয়ে দেখলুম, মোনা গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে ডালপালার ভেতরে। আমাদের দেখে সে ফিক করে হাসল। ওপর পাটির দুটো দাঁত নেই। তাই তার হাসিটা বেশ অমায়িক দেখাল। বললুম,—ওখানে বসে তুমি কী করছ মোনা?

মোনা বলল,—ফাঁদে একটা পেতনি পড়েছে। শিশিতে ঢোকাতে পারছি না। বলেই সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,—ওই যাঃ! পালিয়ে গেল।

সে শ্যাওড়া গাছ থেকে নেমে এল। হাতে একই সাইজের একটা শিশি। হাসি চেপে বললুম,—ফাঁদ থেকে পেতনি পালিয়ে গেল। আর ডনের শিশি থেকে ভূতটা পালিয়ে গেছে। শিগগির একটা জোগাড় করো।

মোনা বলে উঠল,—এঃ হে হে হে! সর্বনাশ! সর্বনাশ! খোকাবাবুকে অমন পইপই করে বলেছিলুম, সাবধান!

ডন কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল,—মামা শিশির ছিপি খুলেছিল।

মোনা বলল,—ছোটবাবু! কাজটা ঠিক করেননি। খোকাবাবুকে যে ভূতটা বেচেছিলুম, সে খুব ঘোড়েল ভূত। সে কে জানেন! পাঁচু। সেই পাঁচু-চোর।

পাঁচু নামে একটা চোর ছিল আমার ছেলেবেলায়। পাকা সিঁদেলচোর। কত বাঘা-বাঘা দারোগাবাবুকে সে নাকাল করে ছাড়ত। বুড়ো হয়ে সে মারা পড়েছিল অসুখ-বিসুখে। যাই হোক ডনের সামনে মোনার সঙ্গে ভূত নিয়ে তর্ক করা ঠিক নয়। বললুম,—যাই হোক, পাঁচুকে আবার ফাঁদ পেতে ধরে দাও।

ডন বলল,—মোনাদা! পাঁচু কালো বেড়াল সেজে পালিয়ে গেছে।

কালো বেড়াল? —মোনা ভুরু কুঁচকে বলল,—হুঁ। তাহলে তো বড় কেলেঙ্কারি হল। ঠিক আছে, দেখছি। ইঁদুর ধরে ফাঁদে আটকাতে হবে ওকে। এখন ইঁদুর পাই কোথা দেখি। কই, খোকাবাবু। শিশিটা দাও।

শিশিটা নিয়ে সে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল। গেল তো গেলই। আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। একসময় হঠাৎ 'ম্যাঁও' শব্দ শুনে দেখি, ঝোপের ভেতর থেকে সেই কালো বেড়ালটা মুখ বের করছে। দেখামাত্র ডন তাকে তাড়া করে গেল। তারপর আর তাকেও দেখতে পেলুম না। কিছুক্ষণ তাকে ডাকাডাকি করে মন্দিরের পেছনে বটতলায় গিয়ে বসে পড়লুম।

সেই সময় দেখলুম, একটু দূরে বাঁশবনের ভেতর গুঁড়ি মেরে মোনা বাঘের মতো চুপিচুপি হাঁটছে। তারপর সে লাফ দিয়ে যেন কিছু ধরল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল,—এবার? এবার বাছাধন যাবে কোথায়? খোকাবাবু! ছোটবাবু! চলে আসুন।

সাড়া দিয়ে বললুম,—এই যে এখানে আছি।

মোনা আমাকে দেখতে পেয়ে অদ্ভুত শব্দে হাসতে-হাসতে চলে এল। ছিপি-আঁটা শিশিটা আমাকে দিয়ে বলল,—এবার কিন্তু সাবধান। তা খোকাবাবু কোথায় গেল?'

বললুম,—কালো বেড়ালটা দেখতে পেয়ে ছুটে গেছে। তুমি খুঁজে দেখো তো ওকে।

মোনা বলল,—সর্বনাশ! আপনি খোকাবাবুকে যেতে দিলেন? পেতনিটার পাল্লায় পড়লে বিপদ হবে যে!

সে হন্তদন্ত হয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। একটু পরে সে ডনকে নিয়ে ফিরে এল। বলল,—আর একটু হলেই পেতনি খোকাবাবুকে ধরে ফেলত। পেতনিদের স্বভাব জানেন তো? ছেলেপুলে দেখলেই কুড়মুড় করে মুন্ডু চিবিয়ে খায়। আপনারা শিগগির চলে যান। আর একটা কথা, পাঁচুকে তেরাত্তির উপোস করিয়ে রাখবেন।

ডন এসেই আমার হাত থেকে শিশিটা ছিনিয়ে নিল।...

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলে ভালো হতো। কিন্তু তা হল না।

রাত্তিরে ডন আমার কাছে শোয়! শিশিটা বালিশের পাশে রেখে সে ঘুমোচ্ছিল। আমি ঘুমুতে পারছিলুম না। সেই বেড়ালটার কথা ভাবছিলুম। আরও ভাবছিলুম পাঁচু-চোরের কথা। পাঁচুকে একটু-একটু মনে পড়ে! লম্বা সিড়িঙে চেহারার লোক ছিল সে। মাথার চুল খুঁটিয়ে ছাঁটা। কেউ যাতে চুল ধরে তাকে বেকায়দায় না ফেলে, সেইজন্য ওইরকম করে চুল ছাঁটত। শুনেছি, দুঁদে দারোগা বঙ্কুবিহারী ধাড়া তাকে শায়েস্তা করেছিলেন। কিন্তু কথাটা হল, পাঁচু মরে কালো বেড়াল সেজে বেড়ায় কেন?

হুঁ, ওই যে কথায় বলে—স্বভাব যায় না মলে। মরার পরেও পাঁচু বেড়াল সেজে দুধ-মাছ-মাংস চুরি করে বেড়াচ্ছে না তো? তবে তার আগে দেখা দরকার, সত্যি ডনের শিশি থেকে কালো বেড়াল বেরোয় কি না। রাত্তিরটা ছিল জ্যোৎস্নার। জানলার বাইরে ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় চুপিচুপি বালিশের পাশ থেকে শিশিটা নিয়ে ছিপি খুলে দিলুম।

অমনি দেখলুম, ফের একটা কালো বেড়াল জানালা গলিয়ে পালিয়ে গেল। এবার আমার শরীর শিউরে উঠল। তক্ষুণি ছিপি এঁটে শিশিটা যথাস্থানে রেখে জানালায় উঁকি দিলুম। বেড়ালটা পাঁচিলে বসে নীল জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তক্ষুণি জানলা থেকে সরে এসে শুয়ে পড়লুম। নাহ! সত্যি তাহলে ভূত আছে।

সকালে উঠে শুনি, রান্নাঘরে চোর ঢুকেছিল। সকালের চায়ের দুধ রাখা ছিল। এক ফোঁটা নেই। ন'টার আগে গয়লা দুধ দিতে আসে না। জামাইবাবু—ডনের বাবা খুব বকাবকি করলেন দিদিকে। দিদি নাকি রান্নাঘরের দরজা-জানালা আটকাতে ভুলে গিয়েছিল। শুধু দুধ নয়, ফ্রিজ থেকে মাছ-মাংস সব নিপাত্তা হয়ে গেছে।

ডন ছোটছেলে। সে এ নিয়ে মাথা ঘামাল না। কারণ শিশির ভেতর বন্দি পাঁচুকে তেরাত্তির উপোস রাখতে হবে। কাজেই সে ছিপি খোলেনি। সে তো জানে না, আমি ছিপি খুলে এই কেলেঙ্কারিটি বাধিয়েছি। ডন ভেবেছে পাঁচু শিশির ভেতর রয়ে গেছে।

চুপিচুপি মোনার ডেরায় চলে গেলুম।

মোনা আজ তার ডেরাতে বসে চোখ বুজে তপজপ করছিল। ডেরা মানে মন্দিরের লাগোয়া একটা পুরোনো জরাজীর্ণ একতলা ঘর। জপ শেষ হলে সে চোখ খুলে আমাকে দেখে বলল,—পাঁচু পালায়নি তো ছোটবাবু?

হ্যাঁ। পালিয়েছে। আসলে আমারই বোকামি। মোনা, ডন এখনও জানে না আমি ফের ছিপি খুলেছিলুম।—বলে যা ঘটেছে, তার মোটামুটি একটা বিবরণ দিলুম।

মোনা গুম হয়ে গেল। একটু পরে বলল,—ঠিক আছে। তিনটে টাকা ছাড়ুন ছোটবাবু। আমি পেতনিটাকে শিশিতে ভরেছি। আপনি বরং এই শিশিটা আপনার ভাগনেবাবাজির শিশির সঙ্গে পাল্টে ফেলুন। খালি শিশিটা আমাকে ফেরত দিন। আর হ্যাঁ, পেত্নি কিন্তু দুধ-মাছ-মাংস খায় না! একটু শুকনো গোবর আর হাড়গোড় এর খাদ্য।

তিনটে টাকা গচ্চা গেল। কী আর করা যাবে? বাড়ি ফিরে এক সুযোগে ডনের শিশিটা নিয়ে এই শিশিটা রেখে দিলুম ডনের পড়ার টেবিলে। ডন তখন স্কুলে।

মোনাকে খালি শিশিটা ফেরত দিয়ে এলুম। মোনা আমাকে সাবধান করে দিল।

সে-রাত্তিরে আবার আমার মনে হল, সত্যি এই শিশির ভেতর পেতনি আছে কিনা পরীক্ষা করা দরকার। ডন যথারীতি বালিশের পাশে শিশি রেখে ঘুমোচ্ছিল। শিশিটা চুপিচুপি তুলে নিয়ে জানালার গ্রিলের ফাঁকে রেখে ছিপি খুলে দিলুম।

তারপর যা দেখলুম, ভয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

জ্যোৎস্নায় একটা সাদা কাপড়পরা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

সাহস করে টর্চ বের করলুম। টর্চ জ্বালাতেই মূর্তিটা আর দেখতে পেলুম না। চুপিচুপি দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, সাদা মূর্তিটা বাগানের একটা আম গাছে উঠে গেল। একটু পরে আম গাছের ডগায় তাকে দেখা গেল। সেখান থেকে উঁচু একটা বাজপড়া ন্যাড়া তাল গাছের মাথায় গিয়ে বসল। তারপর প্যাঁচার ডাক শুনলুম ক্র্যাঁও। ক্র্যাঁও!

টর্চের আলো ফেললুম। কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পেলুম না। আমার চোখের ভুল নয় তো? টর্চ নেভালে সাদা কাপড়পরা পেতনিকে দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আলো জ্বালিয়ে পাচ্ছি না। ব্যাপারটা ভালোভাবে পরীক্ষা করা দরকার।

বাজপড়া তালগাছটার কাছে গিয়ে ফের টর্চ জ্বাললুম। কিন্তু জ্বলল না। সুইচ বিগড়ে গেল নাকি? টর্চ নাড়া দিয়ে এবং ব্যাটারি বের করে আবার ঢুকিয়ে অনেক চেষ্টা করলুম, টর্চ আর জ্বলল না। পেতনিটা বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছে।

একটু পরে শুনি, গুনগুন করে মেয়েলিগলায় গান গাইছে সে।

'এমন চাঁদের আলো
মরি যদি সে-ও ভালো
সে-মরণ স্বরগ সমান।'

এবার আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হল না। চুপিচুপি ঘরের দিকে পা বাড়ালুম তারপর এক কাণ্ড ঘটল। ভীষণ ঠান্ডা কী একটা জিনিস আমার মাথার পেছনে চাঁটি মারল। মাথা যেন বরফ হয়ে গেল।

তারপর ঘরের দিকে যত এগোচ্ছি, বারবার তত চাঁটি খাচ্ছি। টলতে-টলতে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলুম। শুতে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল মাথায় পেছনদিকে কী একটা আটকে যাচ্ছে। আঁতকে উঠে হাত দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে নিলুম। পেতনির হাত ভেবে সেটা মুঠোয় ধরে ঘরের আলো জ্বেলে দিলুম।

কী কাণ্ড! একটা চামচিকে।

চামচিকেটা জানালার বাইরে ছুড়ে ফেললুম। কিন্তু এটা না হয় চামচিকে। সাদা কাপড়পড়া মূর্তিটা তো পেত্নি।

নাকি পেতনিটাই চামচিকেটাকে হুকুম দিয়েছে আমার মাথায় চাঁটি মারতে?

কে জানে বাবা! আর ঝুঁকি নিয়ে কাজ নেই। ডন খালি শিশিতে পাঁচুর ভূত আছে ভেবে কিছুদিন শান্ত থাকবে। খামখেয়ালি ছেলে। তারপর এসব ভুলে যাবে। কাজেই আর এ নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই।...

যা ভেবেছিলুম হলও তা-ই। পরদিন বিকেলে ডন এসে আমার পিঠে চিমটি কাটল। বললুম,—আবার কী চাই?

ডন গম্ভীরমুখে বলল,—পাঁচুর ভূতটা গোগোকে বেচে দিলুম।

—ভালো করেছিস।

—মামা, দুটো টাকা দাও।

—আবার কী কিনবি?

ডন ফিক করে হেসে বলল,—ঘুড়ি প্লাস লাটাই প্লাস সুতো। তোমার দুই প্লাস গোগোর তিন। ইজ ইকোয়াল টু পাঁচ।

দুটো টাকা দিলুম। বললুম,—হ্যাঁ ঘুড়ি কেনো। সেটা ভালো। কিন্তু আর যেন ভূত কিনতে যেও না।

ডন গুলতির বেগে উধাও হয়ে গেল।...

রাতের মানুষ

ঝুলনপূর্ণিমার রাতে গঞ্জের মেলায় ছোটমামার সঙ্গে কলকাতায় যাত্রা দেখতে গিয়েছিলাম। সন্ধের দিকে বৃষ্টি পড়ছিল। ফেরার সময় দেখি আকাশ ফাঁকা। ঝলমলে চাঁদ কাত হয়ে বাদবাকি জ্যোৎস্না ঢেলে নিজেকে খালি করে দিচ্ছে। রাস্তা শুনশান ফাঁকা। মানুষজন মেলায় রাত কাটাতেই আসে। কিন্তু ছোটমামা খুঁতখুঁতে মানুষ। —ঘুম পাচ্ছে বলেই যেখানে-সেখানে শুয়ে পড়তে হবে নাকি? মোটে তো পাঁচ কিমি রাস্তা। চলে আয় পুঁটু।

ঘুম-ঘুম চোখে রাস্তা হাঁটা কষ্টকর। তা ছাড়া ছোটমামার চেয়ে আমার পাদুটো বড্ড বেশি ছোট। বারবার পিছিয়ে পড়ছি, আর ধমক খাচ্ছি।

হঠাৎ রাস্তার বাঁকের মুখে গঞ্জের শেষদিকটায় একটা সাইকেলরিকশ দেখা গেল। রিকশটা দাঁড়িয়েই ছিল। তবু ছোটমামা চেঁচিয়ে উঠলেন,—রোখকে! রোখকে!

রিকশওয়ালা হেসে অস্থির। —রুখেই তো আছি বাবুমশাই! যাওয়া হবে কোথায়?

আমারও হাসি পাচ্ছিল। ছোটমামার সবকিছুই অদ্ভুত। তো আমরা ঝাঁপুইহাটি যাব শুনে রিকশওয়ালা খুশি হল। বলল,—চলুন! আমি কাছাকাছি থাকি। ওদিককার প্যাসেঞ্জারের জন্য অপেক্ষা করছিলাম! খালি-খালি রিকশ নিয়ে বাড়ি ফেরা পোষায় না।

রিকশতে উঠে বসলে ঘুমটা আমাকে বাগে পেয়েছিল। কিন্তু ছোটমামার বারবার ধমক এবং 'পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার' হুমকি ক্রমশ ঘুমটাকে এলোমেলো করে দিচ্ছিল। কিছুদুর চলার পর রিকশওয়ালা থামাল। ছোটমামা বললেন,—কী হল? চেন খুলে গেল নাকি?

রিকশওয়ালা সিট থেকে নেমে বলল,—আজ্ঞে না। চক্কোত্তিমশাই হজমিগুলি আনতে দিয়েছিলেন। দিয়ে আসি।

ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন,—এখানে কোথায় তোমার চক্কোত্তিমশাই?

রিকশওয়ালা কান করল না। রাস্তার ধারে ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় গিয়ে ডাকল,—চক্কোত্তিমশাই! ঘুমোচ্ছেন নাকি?

গাছের ভেতর থেকে খ্যানখেনে গলায় কেউ বলল,—ঘুমোব কী রে বাবা! পেট আইঢাই। এত দেরি করলি কেনরে?

—প্যাসেঞ্জার পেলে তো আসব। এই নিন হজমিগুলি।

—এনেছিস? কই দে-দে। শিগগিরি দে।

রিকশওয়ালা তাকে হজমিগুলি দিয়ে এসে সিটে উঠল। প্যাডেলে চাপ দিল। রিকশর চাকা গড়াল। ছোটমামা বললে,—ব্যাপার কী হে রিকশওয়ালা? তোমার চক্কোত্তিমশাই কি গাছে থাকেন নাকি?

—আজ্ঞে।

—অ্যাঁ? গাছ থাকেন কেন?

—ওটাই তো তেনার ডেরা।

—তার মানে?

—মানে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি বাবুমশাই? ঝাঁপুইহাটি যাবেন। পৌঁছে দেব। ব্যস।

ছোটমামা রেগে গেলেন।

—অদ্ভুত তো তোমার কথাবার্তা! রাতবিরেতে গাছের ওপর—

রিকশওয়ালা ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল,—চুপ! চুপ! চক্কোত্তিমশাইয়ের কানে গেলেই কেলেঙ্কারি। আমার কাছ থেকে ততক্ষণে ঘুমটা কেটে পড়েছে। বারবার দেখে আসছি, ছোটমামার সঙ্গে কোথাও রাতবিরেতে বেরোলেই গোলমেলে সব ঘটনা ঘটে। বুঝতে পারি না, রাত এলেই কেন পৃথিবীটা অন্যরকম হয়ে যায়? না কি ছোটমামার ভুলেই রাতটা গোলমেলে হয়ে যায়? কিন্তু তারপর তো ছোটমামা 'চলে আয় পুঁটু' বলে শেষপর্যন্ত উধাও হয়ে যান। ধাক্কাটা সামলাতে হয় আমাকেই। এবার কতদূর গড়াবে কে জানে! বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল।

একটু পরে আবার রিকশ দাঁড়াল এবং রিকশওয়ালা তড়াক করে নেমে গিয়ে ডাক দিল,—ঠাকরুনদিদি! অ ঠাকরুনদিদি!

একটা শুকনো গাছের ডাল থেকে নেমে সাদা কাপড় পরা কেউ এগিয়ে এগিয়ে এল। —ভুতু এলি? কখন থেকে পথের দিকে তাকিয়ে চোখে ব্যথা ধরে গেল। দোক্তা এনেছিস তো?

—না আনলে ডাকছি কেন? এই নিন।

দোক্তা নিয়ে ঠাকরুনদিদি ন্যাড়া গাছটার দিকে চলে গেল। ছোটমামা গুম হয়ে বসে ছিলেন। বললেন,—কোনও মানে হয়?

রিকশওয়ালা আবার চুপচাপ রিকশ চালাতে শুরু করল। কিছুদূর গেছি, হঠাৎ কোত্থেকে কেউ হেঁড়ে গলায় ডাকল,—ভুতু! অ ভুতু! অ্যাই ভুতো!

ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন,—থেমো না, যে-ই ডাকুক!

একটা কালো বেঁটে লোক ধমক দিল,—অ্যাই ব্যাটাচ্ছেলে! কথা কানে যায় না?

রিকশওয়ালা বলল,—রোজ-রোজ বাকিতে জিনিস দেবে নাকি?

—দেবে না মানে? ওর বাপ দেবে। এখনও তেষট্টি টাকা সাতষট্টি পয়সা জমা আছে খাতায়!

—সে আপনি মামলা করে আদায় করুন গে!

লোকটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। —বাজে কথা বলিসনে। আসলে তুই যাসনি দত্তর দোকানে।

কী ঝামেলা করছেন বাবু? গাড়িতে প্যাসেঞ্জার আছে দেখছেন না?

লোকটা প্রায় কেঁদে ফেলল।—এখন আমি ঘুমোব কি করে? একগুলি আফিং আমাকে এত রাত্তিরে কে দেবে?

রিকশওয়ালা পরামর্শ দিল,—শ্মশানতলায় চলে যান। দারোগাবাবুর কাছে একগুলি পেতেও পারেন।

—ওরে বাবা! মৌতাত ভাঙলে লকআপে ঢোকাবে।

—তা হলে বরঞ্চ পাঁচুর কাছে যান।

—সে ব্যাটা তো চোর।

—চোর বলেই বলছি। দারোগাবাবুর কৌটো থেকে দু-একটা গুলি সে-ই হাতাতে পারবে।

লোকটা কিন্তু-কিন্তু করে বলল,—তা পাঁচুকে পাচ্ছি কোথায়? ও তো ফেরারি আসামী।

রিকশওয়ালা চাপাস্বরে বলল,—সন্ধেবেলা পাঁচুকে একপলক দেখেছি। মোড়লমশাইয়ের তালগাছের কাছে দাঁড়িয়েছিল। মোড়লমশাই গঞ্জের মেলায় গেছেন। কাজেই পাঁচু নিশ্চয় তেনার ডেরায় ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

বেঁটে কালো ছায়ামূর্তিটি তখনই উধাও হয়ে গেল। রিকশওয়ালা প্যাডেলে চাপ দিয়ে বলল,—রোজ রাত্তিরে আসার এই এক জ্বালা বাবুমশাই! রাজ্যের লোকের হাজার ফরমাশ।

ছোটমামা গুম হয়ে বসে আছেন। আমি ভাবছি, হঠাৎ আমাকে ফেলে পালিয়ে না যান। বড্ড বেশি গোলমেলে ঘটনা ঘটছে। কিছু দূর যাওয়ার পর রাস্তা বাঁক নিল। এবার দুধারে ঘন জঙ্গল। রাস্তায় চকরাবকরা জ্যোৎস্না পড়েছে।

রিকশওয়ালা বলল,—আর এক জায়গায় একটুখানি থামতে হবে। সিঙ্গি মশাইয়ের নস্যির কৌটোটা দিয়েই আমার ছুটি।

একখানে জঙ্গলটা কিছু ফাঁকা। রিকশ সেখানে থামল। রিকশওয়ালা সিট থেকে নেনে রাস্তার ধারে গিয়ে চেঁচাতে থাকল,—সিঙ্গিমশাই! সিঙ্গিমশাই।

তারপর সাড়া না পেয়ে এগিয়ে গেল। আর তাকে দেখতে পেলাম না। ভয়ে-ভয়ে ডাকলাম,—ছোটমামা!

ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন,—চুপচাপ বসে থাক। আমাদের বাড়ি পৌঁছনো নিয়ে কথা।

এইসময় কাছাকাছি একটা গাছ থেকে কেউ বলল,—কারা এখানে?

ছোটমামা ভারিক্কি চালে বললেন,—আমরা।

—আমরা মানে? নাম কী? বাড়ি কোথায়?

ছোটমামা রেগেই ছিলেন। বললেন,—তা জেনে তোমার কাজ কী? কে তুমি? গাছে কী করছ?

—অ্যাঁ! বলে কী। গাছে কী করছি! হি হি হি হি! ন্যাকা!

—খবররদার! বাজে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।

—এটা বাজে কথা হল? জানো না গাছে কী করছি?

ছোটমামা খাপ্পা হয়ে বললেন,—না। জানি না। আমরা মানুষ। আমরা তোমার মতো রাত-বিরেতে গাছে কাটাই না।

—হি হি হি! প্রথম-প্রথম এই ভুলটা হয়।

—কী ভুল হয়?

—মানুষ-মানুষ ভুল।

—কী অদ্ভুত।

—অদ্ভুত তো বটেই। অদটুকু বাদ যেতে কয়েকটা দিন দেরি, এই যা। তা তোমরা কি ডেরা খুঁজে বেড়াচ্ছ? বোকা আর কাকে বলে? ভুতোর রিকশতে চেপে— হি হি হি! ভুতোটা এক নম্বর ধড়িবাজ। সাবধান করে দিচ্ছি কিন্তু!

ছোটমামা রিকশ থেকে নেমে ঘুষি পাকিয়ে দাঁড়ালেন। —কে হে তুমি! গাছ থেকে নেমে এসো তো দেখি।

আমিও নামতে দেরি করলাম না। ছোটমামার মারামারি করার অভ্যাস আছে। কিন্তু রাতবিরেতে গাছের লোকটার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন কি না আমার সন্দেহ। রিকশওয়ালাও আসছে না। মারামারি বাধলে থামাবে কে, এটাই আমার ভাবনা।

ছোটমামা ঘুষি বাগিয়ে এবার হুঙ্কার দিলেন,—কাম অন! কাম অন!

গাছের লোকটা বিদ্ঘুটে হাসল।—হি হি হি হি! ইংরেজির কী ছিরি! কাম অন কী হে ছোকরা? গেট ডাউন! কিন্তু গেট ডাউন করি কী করে? একটা ঠ্যাং-ই যে নেই। থাকলে পরে এতক্ষণ নেমে কানটি ধরে স্ট্যান্ড আপ অন দা বেঞ্চ করিয়ে দিতাম।

পাশের একটা গাছ থেকে কেউ বলল,—কী হে পণ্ডিতমশাই? ছাত্র জোটাতে পারলেন নাকি?

—নাহ। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না।

ছোটমামা আর সহ্য করতে পারলেন না। রাস্তার ধারে পাথরকুচির স্তূপ থেকে পাথর কুড়িয়ে ছুড়তে শুরু করলেন। আমাকেও বললেন,—হাত লাগা পুঁটু। আমাকে গাধা বলছে! আমাকে ইংরেজি শেখাচ্ছে পাঠশালার পণ্ডিত!

ওদিকে পণ্ডিতমশাইয়ের চেঁচামেচিতে চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে। হইহই-রইরই করতে-করতে কালো-কালো কারা সব গাছ থেকে ঝুপঝাপ করে নেমে দৌড়ে আসছিল। আমি ভয়ে প্রায় কেঁদে ফেললাম,—ছোটমামা! এবার ছোটমামার চোখে পড়ল ব্যাপারটা। তারপর যা ভেবেছিলাম এবং বরাবর যা ঘটে আসছে তাই হল। ছোটমামা 'চলে আয় পুঁটু'—বলে রিকশওয়ালা যেদিকে গিয়েছিল, সেই দিকে দৌড়লেন। আমিও দৌড়লাম।

কিন্তু ভাগ্যিস ছোটমামা হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, তাই সঙ্গ পাওয়া

গেল। জ্যোৎস্নায় একটা ভাঙাচোরা দালানবাড়ি দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির দরজায় ছোটমামা ধাক্কা দিতে লাগলেন। একটু পরে ভেতর থেকে সাড়া এল,—কে?

ছোটমামা ব্যস্তভাবে বললেন,—আমরা খুব বিপদে পড়েছি। দয়া করে দরজা খুলুন।

—কী বিপদ?

—কারা আমাদের তাড়া করেছে।

—তারা কারা?

—গাছে-গাছে যারা থাকে।

—গাছে থাকে ভূত বনে থাকে বাঘ।

জলে থাকে মাছ মনে থাকে রাগ।

—কী বিপদ! আপনি পদ্য বলছেন নাকি?

—ঠিক ধরেছ। কেমন হয়েছে পদ্যটা বলো?

—খুব ভালো। দয়া করে এবার দরজা খুলুন। ওরা আসছে।

ঘোড়ার যদি পাড়ে ডিম
জলে যদি জ্বলে পিদিম
বলো তবে অতঃ কিম?

ছোটমামার পদ্য লেখার বাতিক ছিল। বলে দিলেন,—জাম গাছে ফলবে শিম।

—খাসা! খাসা! স্বাগত! সুস্বাগত!

দরজা খুলে গেল। ছোটমামা বললেন,—আলো নেই কেন? আলো জ্বালুন।

যতবড় কবি তুই হোস না
যদি না বাসিস ভালো জোসনা
থেকে যাবে কত আফসোস না!
তাই বলি চুপ করে বোস না।

ভদ্রলোক বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। জানালা গলিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুকেছিল। আবছা দেখা যাচ্ছিল—ওঁকে। ঢ্যাঙা, বড়-বড় চুল, পরনে পাঞ্জাবি-পাজামা। হাতে একটা বই বা মোটা খাতা। পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন। তারপর বললেন,—এই পদ্যটা আরও ভালো।

—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল
সারস পাখি লম্বা ঠোঁটে হাড় তুলিয়া দিল
পুরস্কার চাইলে পরে বাঘ রাগিয়া কহে,
মুন্ডুখানা ফেরত পেলি তা-ই যথেষ্ট নহে?

পাশের ঘর থেকে কেউ বিটকেল গলায় ডাকল,—ঘোতনা! অ্যাই ঘোতনা! কাকে পদ্য শোনাচ্ছিস?

—মানুষকে।

—কয় জন মানুষ?

—দেড়জন।

—ধুস! পোষাবে না।

ছোটমামা বললেন,—কে উনি?

কবি ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন,—আমার দাদার ওই এক স্বভাব। খালি খাই-খাই।

—খাই-খাই মানে?

—দাদার খুব খিদে আর কী! যাক গে। এই পদ্যটা পড়ি।...।

সেই সময় বাইরে ডাকাডাকি শোনা গেল,—ছোটবাবু! ছোটবাবু! ছোটবাবু! কবি খাপ্পা হয়ে দরজা খুলে বললেন,—কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছিস কেন রে ভুতো?

—আমার প্যাসেঞ্জার হারিয়ে গেছে। খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—কয় জন?

—আজ্ঞে দেড়জন।

ছোটমামা আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন। —চলে আয় পুঁটু!

রিকশওয়ালা আমাদের দেখেই বলে উঠল,—সর্বনাশ! কোথায় ঢুকেছিলেন আপনারা! চলে আসুন! চলে আসুন! এ বাড়ির বড়বাবুর বেজায় খিদে।

আমরা তিনজনে দৌড়চ্ছি। পেছনে কবির করুণ আর্তনাদ কানে আসছে,—অত ভালো পদ্যখানা শুনে গেল না! আমার যে আবার মরতে ইচ্ছে করছে গো! ও হো হো হো...

ছোটমামা রাস্তার কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন,—ওহে রিকশওয়ালা! ওরা সব নেই তো?

রিকশওয়ালা হাসল। —নাহ্! ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। শুনতে পাচ্ছেন না?

ছোটমামা কান ধরে শুনে বললে,—হুঁ!

আমি তেমন কোনও শব্দ পেলুম না। তবে বাতাসে গাছপালা খুব নড়ছে। নানারকম শব্দও হচ্ছে বটে। কিন্তু ভোঁস-ভোঁস নয়। শোঁ শোঁ শন শন সর সর খড় খড়। কে জানে বাবা কী।...

এবার আর কোনও গণ্ডগোল হল না। আমাদের গাঁয়ের মোড়ে পৌঁছে দিয়ে রিকশওয়ালা ভাড়া মিটিয়ে নিল!

ছোটমামা জিগ্যেস করলেন,—তুমি কোন গাছে থাকো হে?

রিকশওয়ালা বেজায় হেসে বলল,—আমি কেন গাছে থাকতে যাব বাবুমশাই? আমার কি ঘরদোর নেই? নামটাই না হয় ভুতো। রাতবিরেতে রিকশ চালাই বলেই তেনাদের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছে।

ছোটমামার সন্দিগ্ধস্বরে বললেন,—তুমি মানুষ?

আজ্ঞে ষোলো আনা মানুষ। —বলে সে শেষরাতের জ্যোৎস্নায় রিকশ চালিয়ে কালো হতে-হতে দূরে মিলিয়ে গেল।

চোর বনাম ভূত

আগের দিনে চোরেরা ছিল বেজায় ভিতু। যেমন আমাদের গ্রামের পাঁচু-চোর। সে নাকি চুরি করতে গিয়ে নিজের পায়ের শব্দে নিজেই ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়ে পালাত। দাদুর কাছে শুনেছি, একবার সে আমাদের বাড়ি চুরি করতে এসেছিল। পাঁচিল ডিঙিয়ে উঠোনে নামবার সময় হঠাৎ তার পা পিছলে যায়। তারপর সে ধপাস করে পড়েছে এবং তাতেই যা একটু শব্দ হয়েছে। সেই শব্দেই দিশেহারা পাঁচু উঠোনের কোণে তালগাছের ডগায় তরতর করে উঠে গেছে।

উঠে তো গেছে। কিন্তু নামতে সাহস পাচ্ছে না। নামতে গিয়ে যদি আবার পা পিছলে পড়ে যায়!

এদিকে রাত পুইয়ে ভোর হতে চলেছে। দিনের আলোয় কেউ-না-কেউ তাকে দেখতে পাবে। তখন তার কী অবস্থা হবে ভেবে পাঁচু-চোর ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে, কান্না শুনে দাদু টর্চ হাতে বেরিয়ে আসেন। তালগাছের ডগা থেকে কান্না। ভূতপ্রেত নাকি?

তখনকার দিনে পাড়াগাঁয়ের আনাচে-কানাচে ভূতেরাও ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু দাদু ছিলেন সাহসী মানুষ। তালগাছের ডগায় টর্চের আলো ফেলে তিনি অবাক হয়ে যান। জিগ্যেস করেন,—তুই কে রে?

পাঁচু-চোর করুণ স্বরে বলে,—আজ্ঞে আমি পাঁচু।

—তা তুই তালগাছের ডগায় কী চুরি করতে উঠেছিস? এখন তো আর একটা তালও নেই। নেমে আয় হতভাগা!

—আজ্ঞে বড্ড ভয় করছে।

দাদু বলেন,—তোকে মারব না। পুলিশেও ধরিয়ে দেব না। নেমে আয়। তারপর খুলে বল, তালগাছের ডগায় কেন চড়েছিস?

পাঁচু অনেক কষ্টে নেমে আসে এবং সবকথা খুলে বলে। তারপর দাদুর পা ছুঁয়ে বলে,—আর কক্ষনও আপনার বাড়িতে চুরি করতে ঢুকব না।...

দাদু গল্পটা খুব জমিয়ে বলতেন। শুনে আমরা ছোটরা হেসে অস্থির হতাম। তো সত্যিই আর পাঁচু কখনও আমাদের বাড়িতে চুরি করতে আসেনি। কিন্তু তার কপাল মন্দ। সেবার থানায় এসেছেন এক দুঁদে দারোগা বঙ্কুবিহারী ধাড়া। কনস্টেবলরা এতকাল রাতবিরেতে টহল দিতে বেরুত না। চৌকিদার বড়জোর লণ্ঠন আর লাঠি হাতে এক চক্কর ঘুরে ঘরে গিয়ে নাক ডাকাত। বঙ্কুবাবুর তাড়ায় টহলদারি জোরালো হল।

তার ফলে পাঁচুর অবস্থা হল শোচনীয়। দিনদুপুরে তো আর চুরি করা যায় না। তার ওপর রাত্তিরে গিয়ে কনস্টেবলরা, আবার কখনও চৌকিদার হাঁকডাক করে

জেনে নেয় পাঁচু ঘরে আছে কি না। না থাকলেই তার বিপদ। অন্য কেউ কোথাও সে রাতে চুরি করলে দোষটা পড়বে পাঁচুরই ঘাড়ে। পাঁচু এক দাগি চোর।

এক রাত্তিরে মরিয়া হয়ে পাঁচু বেরুল। যে বাড়িতে সে চুরি করার ফন্দি এঁটেছে, সেই বাড়ির পেছনে ছিল কয়েকটা গাছ। তলায় শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। পা ফেলতেই সেইসব শুকনো পাতা মচমচ-খড়খড় শব্দ করেছে এবং পাঁচুও যথারীতি ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়ে দৌড়েছে।

সেদিন বঙ্কুবাবু নিজে টহলদারিতে বেরিয়েছেন। পাঁচু গিয়ে পড়বি তো পড় একেবারে বঙ্কুবাবুর বুকে। আচমকা রাতবিরেতে দারোগাবাবুর বুকে কে এসে সেঁটে গেছে, এটা বিরক্তিকর ব্যাপার। অন্য কেউ হলে টাল সামলাতে পারত না। কিন্তু তিনি দশাসই বিশাল এক মানুষ। তবে এভাবে কী একটা জিনিস তাঁর গায়ে সেঁটে যাবে, এটা চূড়ান্ত রকমের বেয়াদপিও বটে। বাঁ-হাতে এক ঝটকায় জিনিসটাকে ছাড়িয়ে টর্চ জ্বেলে দেখেন, এটা একটা মানুষ।

সেই সঙ্গে কনস্টেবলরা চেঁচিয়ে উঠেছে,—পাঁচু! পাঁচু!

পাঁচু-চোর ধরা পড়ে গেল। তখনকার দিনে আইনকানুন ছিল কড়া। পাঁচুর নামে অনেকগুলো চুরির নালিশ ছিল পুলিশের খাতায়। আদালতে তার ছমাসের জেল হল।...

এসব গল্প দাদুর মুখেই শোনা। তখন আমি পাঠশালার পড়ুয়া। পাঁচু-চোরকে দেখতে ইচ্ছে করত খুব। কিন্তু তাকে পাচ্ছিটা কোথায়?

পরে আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ছি, তখন একদিন দৈবাৎ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। যদিও সেই দেখা হওয়াটা মোটেও সুখের হয়নি।

পুজোর ছুটিতে স্কুল বন্ধ। প্রতি বছর পুজোর সময় বড়মামা আমাদের বাড়িতে আসতেন। সেদিনই বিকেলে তিনি এসেছেন। বড়মামা ছিলেন ভবঘুরে ধরনের মানুষ। দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানোর বাতিক ছিল তাঁর। পুজোর সময় এসে ভাগনে-ভাগনিদের সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শোনাতেন। তা যেমন অদ্ভুত, তেমনই রোমাঞ্চকর। এসেই তিনি ঘোষণা করতেন কোন-কোন দেশে গিয়েছিলেন। তারপর সন্ধেবেলায় তাঁর গল্পের আসর বসত। এবার এসে বড়মামা বলেছিলেন, খুব রহস্যজনক একটা দেশ থেকে তিনি আসছেন। তবে না—আগেভাগে কিছু ফাঁস করবেন না। সন্ধেবেলায় সবিস্তারে সেই দেশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন। তখন যদি কেউ ভয় পেয়ে ভিরমি খায়, তাঁর দোষ নেই কিন্তু।

ছোটরা ভয় পেতে তো ভালোই বাসে। আমরা কখন সূর্য ডুববে, সেই প্রতীক্ষায় চঞ্চল। এমন সময় বড়মামা হঠাৎ আমাকে বললেন,—পুঁটু! তোদের এখানকার ছানাবড়া খুব বিখ্যাত। এই নে টাকা। পাঁচ টাকার ছানাবড়া নিয়ে আয় শিগগির!

মা বললেন,—হারুর দোকানে যা। আজকাল হারুর মতো ছানাবড়া তৈরি করতে কেউ পারে না।

আমাদের গ্রামের শেষে পিচরাস্তার ধারে ছোট একটা বাজার ছিল। পাশে ছিল

হাটতলা। সপ্তাহে দুদিন হাট বসত। বিকেলের দিকে ওখানটা বেশ ভিড়ভাট্টা হতো। হারু-ময়রার দোকান ছিল সেই বাজারে।

হারুই বড্ড দেরি করিয়ে দিল। অবশ্য ওর দোষ ছিল না। পুজোর সময় তার দোকানে খদ্দেরের খুব ভিড় হয়। তখনকার দিনে পাঁচ টাকা অনেক টাকা। টাকায় চারটে করে মোটাসোটা ছানাবড়া। মাটির হাঁড়িতে কুড়িটা ছানাবড়া আমার পক্ষে বেশ ভারী। হাঁড়ির মুখে শালপাতা চাপানো এবং মিশি পাটের দড়ি দিয়ে আঁটো করে বাঁধা। দু-হাতে দড়ি আঁকড়ে ধরে কুঁজো হয়ে হাঁটলাম। টাল খেয়ে পড়লে হাঁড়ি ফেটে যাবে। এদিকে আঙুলও যেন কেটে যাচ্ছে মিহি দড়িতে।

অগত্যা শর্টকাট করার জন্য সিঙ্গিমশাইদের আমবাগানে ঢুকলাম। বাগান পেরুলেই ষষ্ঠীতলা। একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। তারপর কাঁচারাস্তায় একটুখানি হাঁটলে আমাদের বাড়ি।

ষষ্ঠীতলায় গেছি, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা রোগা-ভোগা লোক। বটগাছের একটা ঝুরির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ছেঁড়া খাকি হাফ-প্যান্ট, খালি গা, মাথার চুল খুঁটিয়ে ছাঁটা। কেমন জুলজুলে চাউনি লোকটার। মুখে কিন্তু মিষ্টি হাসি। তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। সে কাছে এসে মিষ্টি-মিষ্টি হেসে বলল,—ওতে কী আছে খোকাবাবু? রসগোল্লা নাকি?

বললাম,—না। ছানাবড়া।

—বাঃ ছানাবড়া রসগোল্লার চেয়ে ভালো। কার দোকান থেকে কিনলে?

—হারু-ময়রার।

—বাড়িতে কেউ এসেছে বুঝি?

—হ্যাঁ। বড়মামা এসেছেন।

—বলো কী! খুব ভালো! তা তুমি যে দেখছি হাঁড়িটা বইতে পারছ না। কষ্ট হচ্ছে। দেখো দিকি। এতটুকু ছেলে। আহা রে!

লোকটার কথাবার্তা ও হাবভাব অমায়িক। শুধু চাউনিটা কেমন যেন—

তো সে আমার হাত থেকে হাঁড়িটা সাবধানে ধরে বলল,—চলো! আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। এতটুকু ছেলে এত ভারী জিনিস বইতে পারে?

লোকটাকে বাধা দিতে পারলাম না। কিংবা সে পৌঁছে দিলে কষ্টটা থেকে বেঁচে যাই। যে কারণেই হোক, হাঁড়িটা আমার হাতছাড়া হল এবং সে নিমেষে বটগাছের অন্য পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হতভম্ব হয়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকার পর ভ্যাঁ করে কেঁদে বাড়ির দিকে দৌড়লাম।

পরে বাড়ির সবাই আমার মুখে লোকটার চেহারার বর্ণনা শুনে সাব্যস্ত করেছিলেন তাহলে এটা পাঁচুরই কাজ।...

বছর দুই পরের কথা। আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে বইকী!

তা না হলে কেমন করে বুঝব, আমি কী বোকাই না ছিলাম। অমন নিরিবিলি জায়গায় সন্ধ্যার মুখে অচেনা লোককে ছানাবড়ার হাঁড়ি বইতে দেয় কেউ?

তবে পাঁচু চোর ছিল বটে, কিন্তু নেহাত ছিঁচকে চোর। সে কোনও বাড়িতে সিঁদ কেটে চুরি করেছে বলে শুনিনি। দাদু আরও বুড়ো হয়েছেন তখন। লাঠি হাতে কষ্টেসৃষ্টে হাঁটাচলা করেন। সেই বছর হঠাৎ আমাদের গ্রামে শুধু নয়, এলাকা জুড়ে সিঁদ কেটে চুরি শুরু হল। দাদুর মতে, এ কক্ষনও পাঁচুর কাজ নয়। পাঁচু যা ভিতু সিঁদকাঠি দিয়ে ঘরের দেয়াল ফুটো করতে গেলে যেটুকু শব্দ হবে, তাতেই সে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যাবে। পাঁচু রাতবিরেতে এতটুকু শব্দ হলেই ভয় পায়।

একদিন বাবা বাইরে থেকে এসে বললেন,—সিঁদেল চোরের খোঁজ পাওয়া গেছে। দারোগাবাবুর মুখে শুনে এলাম, লোকটার নাম কিনু। ঝাঁপুইহাটির দাগি চোর। সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেছে।

দাদু বললেন,—ঝাঁপুইহাটির কিনু?

—চেনেন নাকি তাকে?

চিনি বইকী।—দাদু ফোকলা মুখে খুব হাসলেন।—একেই বলে চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই। আমাদের গ্রামের পাঁচুর মাসির ছেলে হল কিনু। কাজেই পাঁচুর মাসতুতো ভাই। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে, পাঁচুকে কিনু ট্রেনিং দিয়ে তার চেলা করেনি তো?

পরদিন সকালে লালু-গয়লা দুধ দিতে এসে বলল,—গত রাত্তিরে সিঙ্গি মশাইয়ের বাড়িতে সিঁদ কাটছিল কিনু। সিঙ্গিমশাই জেগেই ছিলেন। জানালা দিয়ে টর্চের আলো ফেলে কিনুকে পালাতে দেখেছেন। তবে কিনুর সঙ্গে কে ছিল জানেন? হতচ্ছাড়া পাঁচু।

দাদু বললেন,—তাহলে যা বলেছিলাম, মিলে গেল।

লালু বলল,—বঙ্কুদারোগা থাকলে এক্ষুনি এর বিহিত হতো। শুনেছি উনি মন্তর-তন্তর জানতেন। রাতবিরেতে বেরিয়ে মন্তর পড়লেই চোরেরা এসে শেয়ালের মতো ফাঁদে পড়ত।

দাদু বললেন,—আচ্ছা লালু, তুমি তো ঝিলের ওদিকে গোরু-মোষের পাল চরাতে যাও। পাঁচুর সঙ্গে দেখা হয় না?

—আজ্ঞে, রোজই যাই। কিন্তু পাঁচুকে আর দেখতে পাইনে। আগে কখনও-সখনও দেখা হতো। তবে সেটা নেহাত চোখের দেখা। আপনি তো জানেন কর্তাবাবু, পাঁচু যা ভিতু! চোখে চোখ পড়তেই হাওয়া হয়ে যেত।

—পাঁচুর বাড়িটার কী অবস্থা এখন?

লালু হাসল।—বাড়ি মানে তো একটা কুঁড়েঘর ছিল। কবে ওটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। জঙ্গল গজিয়েছে।

—বলো কী! তাহলে পাঁচু এখন থাকে কোথায়?

লালু গম্ভীর হয়ে চাপাগলায় বলল,—গত রাত্তিরে সিঙ্গিমশাই ওকে কিনুর সঙ্গে দেখেছেন। কাজেই পাঁচু ঝাঁপুইহাটিতে কিনুর বাড়িতে থাকে।

হুঁ। চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই। —বলে দাদু আবার একচোট হাসলেন।

লালু-গয়লা চলে যাওয়ার পর বাবা বললেন,—কিনু পাঁচুকে তাহলে সত্যি ট্রেনিং দিয়েছে। তা না হলে সিঙ্গিমশাইয়ের বাড়ির আনাচে-কানাচে পা বাড়ানোর সাহস ছিল না পাঁচুর। সিঙ্গিমশাইয়ের বন্দুক আছে না? লালু শুনতে পায়নি। কাল রাত্তিরে আমি কিন্তু বন্দুকের গুলির শব্দ শুনেছিলাম। ট্রেনিং না পেলে পাঁচু গুলির শব্দ শুনে কোথাও ভিরমি খেয়ে পড়ে থাকত।

দাদু সায় দিয়ে বললেন,—ঠিক বলেছ। তবে আমাদের চিন্তার কারণ নেই। পাঁচু আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কক্ষনও আমাদের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকবে না। বলেছিলাম না সেই যে তালগাছের ডগায় চড়ার ঘটনাটা! মনে পড়ছে?

বাবা চুপ করে গেলেন। আমরা ছোটরা দাদুকে হইহই করে ঘিরে ধরলাম। বলুন না দাদু আবার সেই গল্পটা!

সেবার পুজোর সময় যথারীতি বড়মামা এলেন। এসেই ঘোষণা করলেন, সদ্য এমন একটা দেশ থেকে আসছেন, যেখানে খালি ভূত আর ভূত। রাজা মন্ত্রী সেনাপতি সব্বাই ভূত। সৈন্যেরাও ভূত। প্রজারাও ভূত। পণ্ডিতমশাইরা ভূত। ছাত্ররাও ভূত। দোকানদাররাও ভূত। খদ্দেররাও ভূত। অর্থাৎ ভূতে-ভূতে ছয়লাপ। তবে সেটা যে ভূতের দেশ, তা এমনিতে বোঝা যায় না। কিছুদিন থাকার পর ক্রমে-ক্রমে টের পাওয়া যায়।

সন্ধ্যার পর বারান্দায় বড়মামার গল্পের আসর বসল। মা সকাল-সকাল রান্না সেরে আসরে এলেন। বাবা এ আসরে যোগ দিতেন না। কারণ নবমীর রাত্তিরে ক্লাবের থিয়েটার। তাই রিহার্সালের তাড়া থাকত। আমাদের বাড়ির কাজের লোক হারাধন বড়মামার গল্পের আসর শেষ হলে তবেই লণ্ঠন হাতে বাড়ি ফিরত। এমনকী কাজের মেয়ে সৌদামিনী, যার ডাকনাম ছিল সোদু, সে-ও আসরের একপাশে বসে অবাক চোখে তাকিয়ে গল্প শুনত। আসর ভাঙলে সে হারাধনকে কাকুতি-মিনতি করত তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। কারণ বড়মামার সব গল্পই ছিল সাংঘাতিক এবং গা-ছমছম করা।

ওই সময়টা দাদু তাঁর ঘরে বসে লণ্ঠনের আলোয় ধর্মকর্মের বই পড়তেন।

তো বড়মামা সেই আজব দেশে গিয়ে কীভাবে টের পেলেন এটা ভূতেরই দেশ, সেই ঘটনা সবে শুরু করেছেন, এমন সময় দাদু চাপাগলায় ডাক দিলেন,—হারাধন! হারু!

হারাধন সাড়া দিল,—আজ্ঞে!

দাদু তেমন চাপাগলায় বললেন,—দেখে আয় তো! কোথায় যেন কেমন একটা শব্দ হচ্ছে।

হারাধন বলল,—ও কিছু না। বাতাসের শব্দ কর্তামশাই!

দাদু ধমক দিলেন। —বাড়ির পেছনটা দেখে আয় না একবার।

গল্পে বাধা পড়ায় আমরা বিরক্ত। মা বললেন,—বেড়াল-টেড়াল হবে।

বড়মামা মুচকি হেসে বললেন,—আমাকে ফলো করে সেই ভূতরাজ্যের কোনও গুপ্তচর এসেছে হয়তো। ওদের নিন্দে না প্রশংসা করছি, তার খোঁজ নিতে রাজামশাই চর পাঠিয়ে থাকবেন।

কিন্তু দাদুর ধমক খেয়ে অগত্যা হারাধনকে বেরুতেই হল। সে খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়েছিল। ওদিকটায় একটা ছোট্ট পুকুর আর তিনপাড়ে ফুলফল সবজির বাগান।

হঠাৎ হারাধনের চিৎকার শোনা গেল,—চোর! চোর! চোর!

তারপরই অদ্ভুত ঝনঝন ঠনঠন সব শব্দ। বড়মামা বেরিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে টর্চ ছিল। তাঁরও হেঁড়ে গলায় গর্জন শোনা গেল,—ধর! ধর! মার! মার! পালাচ্ছে! পালাচ্ছে!

এক মিনিটেই হুলুস্থুল কাণ্ড। প্রতিবেশীরাও টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়ল। সিঙ্গি মশাইয়ের বাড়ির দিক থেকে বন্দুকের গুলির শব্দ হল বার দুয়েক। ওই সময়টাতে সিঁদ কেটে চুরির উপদ্রব চলছিল। তাই এত শোরগোল।

অবশেষে দেখা গেল, পুকুরপাড়ে বাগানের মধ্যে একটা বস্তাভর্তি বাসনকোসন পড়ে আছে। আর আমাদের একটা ঘরের পেছনদিকে দেয়ালে সিঁদ কেটেছে চোর। নোনায় ধরা ইটগুলো নিচে পড়ে আছে।

আমাদের বাড়িটা ছিল একতলা এবং খুবই পুরোনো। পেছনদিকটায় এখানে-ওখানে পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে তলার দিকটা নোনাধরা। শ্যাওলা জমে সবুজ হয়ে গিয়েছিল। বাবা ছিলেন অলস প্রকৃতির মানুষ। মেরামত করব, করছি এই ধরনের ভাব দেখাতন।

তো সবাই একবাক্যে রায় দিলেন,—পাঁচু-কিনু দুই মাসতুতো ভাইয়েরই কীর্তি। বড়মামা বললেন,—দুই স্যাঙাত আমার গলা শুনে চুরির জিনিস ফেলে পালিয়েছে। রোসো, দেখাচ্ছি মজা! থানা-পুলিশ করে কাজ হবে না। এর মোক্ষম দাওয়াই শিগগির নিয়ে আসছি।

বড়মামা পরদিন ভোরে কোথায় চলে গেলেন কে জানে! বাবা এতদিনে বাড়ি মেরামতে মন দিলেন। দাদু খুব মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন। মাঝে-মাঝে ক্ষুব্ধভাবে বলতেন,—পাঁচু হতচ্ছাড়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করল? ওর কপালে এবার অশেষ দুঃখ আছে। কিনুর পাল্লায় পড়েই ওর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

বড়মামা ফিরলেন পুজো শেষ হওয়ার বেশ কিছুদিন পরে। বরাবর যেমন বিকেলের বাসে আসেন তেমনিই এলেন। মুখে রহস্যময় মিটিমিটি হাসি। বললেন, —আজ সন্ধ্যায় আর গল্পের আসর নয়। কিছু গোপন কাজকর্মে বেরুব। শুধু পুঁটুকে সঙ্গে নেব। পুঁটু! ভয় পাবিনে তো?

কথাটা শুনেই গা ছমছম করল। বললাম,—কোথায় যাবেন বড়মামা?

—চুপ। জিগ্যেস করবিনে। যাবি কি না, বল!

একটু দোনামনা করার পর বললাম,—যাব।

কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজোর পর কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়েছে। চাঁদ উঠতে দেরি

আছে। বড়মামা চুপিচুপি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন। গা ছমছম করা অন্ধকার। বড়মামার কাছ ঘেঁষে পা ফেলছি। তখন আমার হয়েছে পাঁচু-চোরেরই অবস্থা। একটু শব্দে চমকে উঠছি।

কিছুক্ষণ চলার পর ফিসফিস করে জিগ্যেস করলাম,—আমরা কোথায় যাচ্ছি বড়মামা?

বড়মামা তেমনই ফিসফিস করে বললেন,—চুপ।

তারপর টের পেলাম, আমরা ঝিলের ধারে এসে পড়েছি। ঝিলের জলে আকাশভরা তারার প্রতিবিম্ব ঝিকমিক করছে। কিন্তু এখানেই তো শ্মশান। শ্মশানে বড়মামা কেন এলেন বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বড়মামা বসে পড়লেন। তারপর আমার হাতে তাঁর টর্চ গুঁজে দিয়ে কানে-কানে বললেন,—তুই এখানে অপেক্ষা কর পুঁটু। আমি আসছি। আমার কাশি শুনতে পেলে টর্চ জ্বেলে আলো দেখাবি। নইলে ভুল করে শেয়াকুল কাঁটার জঙ্গলে ঢুকে পড়লেই গেছি। রক্তারক্তি হয়ে যাবে।

বড়মামা গুঁড়ি মেরে অন্ধকারে অদৃশ্য হলেন। শ্মশানে এক জায়গায় একা আমি টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একটা প্যাঁচা ক্র্যাঁও-ক্র্যাঁও করে চেঁচিয়ে উঠতেই আমার বুক ধড়াস করে উঠল। সেই সঙ্গে কাছাকাছি কোথাও একদল শেয়াল ডাকতে শুরু করল। ভয়ে আমি 'বড়মামা' বলে ডাকবার উপক্রম করেছি, সেইসময় পেছন থেকে কে বলে উঠল,—কে ওখানে?

চমকে উঠে বললাম,—আমি পুঁটু।

—তা এখানে কী করা হচ্ছে শুনি?

—বড়মামার জন্য অপেক্ষা করছি।

—তোমার বড়মামা কোথায় গেছেন?

—জানি না। ওই দিকে কোথায় যেন গেলেন।

যে কথা বলছিল, তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আমার কথাটা শুনেই সে বলে উঠল,—সর্বনাশ! তারপর মনে হল, অন্ধকারে কে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

ব্যাপারটা রহস্যময়। কী করব ভাবছি, সেই সময় বড়মামার কাশির শব্দ কানে এল। অমনি টর্চের আলো জ্বাললাম। দেখলাম, বড়মামা হন্তদন্ত হেঁটে আসছেন।

কাছে এসে বললেন,—ব্যস! কাজ শেষ। এবার বাড়ি ফেরা যাক।

ফেরার পথে সেই লোকটার কথা বললাম। বড়মামা হাসতে-হাসতে বললেন,—দুই স্যাঙাতের যে-কোনও একজন হবে। হয় পাঁচু, নয় তো কিনু।

—সর্বনাশ কেন বলল বড়মামা?

—বলবে না? ওদের গোপন ডেরায় একজনকে রেখে এলাম যে!

—কাকে রেখে এলেন?

বড়মামা কানে-কানে বললেন,—আড়িপাতা ভূতকে। সেই ভূতের দেশে গিয়ে রাজার কাছে একজন ঝানু আড়িপাতা ভূত চেয়ে এনেছিলাম। বুঝলি? শিশিতে ভরে

দিয়েছিলেন রাজামশাই। শিশিটা রেখে দিলাম। পরে দেখাব তোকে। পাঁচু-কিনু জব্দ হলে আড়িপাতা ভূতকে লোভ দেখিয়ে ফের শিশিতে ঢুকিয়ে ছিপি এঁটে ফেরত দিয়ে আসতে হবে।

অবাক হয়ে বললাম,—আড়িপাতা ভূত পাঁচু-কিনুকে কীভাবে জব্দ করবে?

—দেখবি'খন। চোরের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়ার চেয়ে ভূত লেলিয়ে দিলে কী হয়...

শিশিটা পরে দেখিয়েছিলেন বড়মামা। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ছোট্ট শিশির মতো দেখতে। কিন্তু আড়িপাতা ভূতের কাণ্ডকারখানা ক্রমশ বুঝতে পারলাম।

পাঁচু-কিনুর গোপন ডেরার খবর বড়মামা নাকি লালু-গয়লার কাছে পেয়েছিলেন। তবে পাঁচু আর কিনু এই দুই চোর তাদের গোপন ডেরা বদলালে কী হবে? যেখানেই চুপিচুপি পরামর্শ করত, আজ রাতে তার বাড়িতে সিঁদ কেটে চুরি করতে যাবে, আড়িপাতা ভূত তা শুনে ফেলত। তারপর ঠিক সময়ে সেই বাড়ির কর্তাকে জানিয়ে দিত। বাড়ির কর্তা আলো জ্বেলে লোকজন নিয়ে তৈরি থাকতেন। দুই চোর সেই বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারত না।

আড়িপাতা ভূত তার কাজটা কীভাবে করত, তা জানা গিয়েছিল পরে। যেমন, ওরা এক রাত্তিরে মল্লিকবাড়িতে সিঁদ কাটার পরামর্শ করেছে। সেদিন সন্ধ্যায় মল্লিকমশাই ক্লাবে তাস খেলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কাছ ঘেঁষে যাওয়া এক ছায়ামূর্তি ফিসফিস করে বলে গেল,—সাবধান মল্লিকমশাই! আজ রাতে আপনার বাড়িতে সিঁদ কাটতে চোর আসবে।

শোনামাত্র মল্লিকমশাই বাড়ি ফিরে পাড়ার লোকজন ডেকে হ্যাজাক জ্বালিয়ে তৈরি হলেন। পাঁচু-কিনু বেজার হয়ে ফিরে গেল।

কেউ-কেউ থানায় খবর দিয়ে পুলিশও মোতায়েন করতেন। কিন্তু পাঁচু-কিনু তা ঠিকই টের পেত। তারপর থেকে আমাদের গ্রামে নয়, সারা এলাকায় দুই চোরের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে বড়মামা মাসখানেক কোথায় ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে সব শুনে খুশি হয়ে বললেন,—যাক। তাহলে ওরা খুব জব্দ হয়েছে। আর এ তল্লাটে পা বাড়াবে না। এবার আড়িপাতা-ভূতকে শিশিতে ভরে ফেরত দিয়ে আসতে হবে। পুঁটু, সন্ধ্যাবেলা দুজনে বেরুব। তার আগে একটুখানি মধু চাই যে। একফোঁটাই যথেষ্ট।

দাদু রাত্তিরে মধু খেতেন। তাই বাড়িতে মধু রাখতেই হতো। শিশিটাতে একফোঁটা মধু ভরে বড়মামা সন্ধ্যার পর আমাকে নিয়ে বেরুলেন।

আগের মতো ঝিলের ধারে শ্মশানের কাছে আমাকে টর্চ হাতে বসিয়ে রেখে বড়মামা অন্ধকারে অদৃশ্য হলেন। তারপর সে-রাতের মতোই ক্র্যাঁও করে পেঁচা ডাকল। শেয়ালেরা ডাকতে শুরু করল। আমি বসে আছি তো আছিই। বড়মামার পাত্তা নেই। মাঝে-মাঝে পিছু ফিরে দেখছি, সে-রাতের মতো পাঁচু বা কিনু এসে পড়বে নাকি। কিছু বলা তো যায় না।

বড়মামার ফিরতে বড্ড দেরি হচ্ছে। এদিকে এখন বেশ ঠান্ডা পড়েছে। শীত করছে। ঝিলের জল ছুঁয়ে আসা ঠান্ডা বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

মরিয়া হয়ে বড়মামাকে ডাকব ভেবেছি, সে সময় সে-রাতের মতো পিছন থেকে কে বলে উঠল,—কে ওখানে?

ভয়ে-ভয়ে বললাম,—আমি পুঁটু!

—এখানে কী করা হচ্ছে শুনি?

—বড়মামার জন্য অপেক্ষা করছি।

—কোথায় গেছেন তোমার বড়মামা?

—আড়িপাতা-ভূতটাকে শিশিতে ভরতে গেছেন।

তখনই সে 'সর্বনাশ' বলে পালিয়ে গেল। তবে না—তার পায়ের ধুপধাপ শব্দ শুনতে পেলাম না। একটা অদ্ভুত বাতাসের শব্দের মতো শনশন কিংবা ওইরকম কিছু কানে এল। সেই সঙ্গে কেমন একটা বিদঘুটে গন্ধও ভেসে এল।

আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। ডাকলাম,—বড়মামা! বড়মামা!

দূর থেকে তাঁর কথা শোনা গেল,—কী হয়েছে পুঁটু? চ্যাঁচাচ্চিস কেন?

—শিগগির আসুন। আমার ভয় করছে। বলে টর্চের আলো জ্বাললাম। তারপর বড়মামাকে দেখতে পেলাম। রেগে খাপ্পা হয়ে গেছেন। কাছে এসে বললেন,—ব্যাটাচ্ছেলেকে শিশিতে যে ভরব তা আর হল না। ডাকাডাকি না হয় করলি, কিন্তু আলো জ্বাললে ভূতেরা কি আর সে তল্লাটে থাকে?

—বড়মামা! সে রাতের মতো কে এসে আমাকে জিগ্যেস করছিল—

বড়মামা আমার কথার ওপর বললেন,—তুই কী বললি তাকে?

—বললাম বড়মামা আড়িপাতা-ভূতটাকে শিশিতে ভরতে গেছেন। তাই শুনে সে সর্বনাশ বলে পালিয়ে গেল।

বড়মামা হতাশ হয়ে বললেন,—পুঁটু! মনে হচ্ছে, ব্যাটাচ্ছেলে সেই আড়িপাতা ভূতটাই বটে। নাহ। পাঁচু বা কিনু নয়। এতক্ষণ তাদের সঙ্গেই তো কথা হচ্ছিল। আমাকে দেখেই দুজনে এসে কাকুতিমিনতি করতে লাগল। আড়িপাতা ভূতটার জন্য ওরা না খেয়ে মারা পড়তে বসেছে। তো আমার কথা শুনে ওরা আমাকে সাহায্য করবে বলল। আর সেই সময় তুই ডাকাডাকি শুরু করলি!

বললাম,—বড়মামা! পাঁচু-কিনু ফিরে এসেছে?

—আসবে না? হাজার হলেও নিজের এরিয়া। তাছাড়া বাইরের এরিয়ার চোরেরা এদের বরদাস্ত করবে কেন? চুরির ভাগে কম পড়বে না?

বড়মামা হাঁটতে-হাঁটতে ফের বললেন,—কিন্তু আড়িপাতা ব্যাটাচ্ছেলেকে যে ফেরত দিতেই হবে। ওদের রাজামশাইকে কথা দিয়ে এসেছি। বড় গণ্ডগোলে পড়া গেল দেখছি।

বাড়ি ফিরে ক্লান্ত বড়মামা মাকে চায়ের হুকুম দিলেন। মা বললেন,—দাদা জানো কী হয়েছে? একটু আগে সিঙ্গিমশাই এসে বলে গেলেন, গতকাল পাঁচু আর কিনু মেদিগঞ্জে ওঁর জামাইয়ের বাড়িতে সিঁদ কাটতে গিয়েছিল। তাড়া খেয়ে দুজনে

বিলের জলে ঝাঁপ দেয়। আর সঙ্গে-সঙ্গে হাজার-হাজার জোঁক ওদের গায়ে সেঁটে যায়। রক্ত চুষে জোঁকগুলো বেচারাদের মেরে ফেলে। সিঙ্গিমশাই আজ সকালে ওদের মড়াদুটো দেখে এসেছেন।

বড়মামা হাঁ করে শুনছিলেন। বললেন,—সে কী! আমি তাহলে শ্মশানে কাদের সঙ্গে—

বলেই থেমে গেলেন বড়মামা। আমিও হতভম্ব হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দাদু তাঁর ঘর থেকে একটু কেশে বললেন,—কিনুটা ফিচেল আর বদমাশ ছিল, ওর জন্য দুঃখ হয় না। তবে হতভাগা পাঁচুটার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে। কিনুর পাল্লায় পড়েই ওর এই সর্বনাশ হল।...

বড়মামা অনেক চেষ্টাও করেও আড়িপাতা-ভূতটাকে ধরতে পারেননি এবং তার ফলটাও শেষপর্যন্ত ভালো হয়নি। আমার সেই ছোটবেলার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আড়িপাতা-ভূতটা ওর কথা তাকে, তার কথা ওকে লাগিয়ে-ভাঙিয়ে গ্রামে বড্ড ঝগড়াঝাঁটি বাধাত। মামলা-মোকদ্দমাও বেড়ে গিয়েছিল। ওইরকম লাগানি-ভাঙানি চলতে থাকলে গ্রামে দলাদলি না হয়ে পারে?

হ্যাঁ—এখনও হতচ্ছাড়া বজ্জাতটা আমাদের গ্রাম ছেড়ে পালায়নি। তাই এখনও সেই দলাদলি-হাঙ্গামা লেগেই আছে। ভয়ে আমি আর গ্রামে যেতে পারিনে। বলা যায় না, আড়িপাতা-ভূত ব্যাটাচ্ছেলে কী শুনতে কী শুনে আমার বিরুদ্ধে কার কান ভারী করবে, আর মাঝখান থেকে আমি পড়ব বিপদে। বড়মামা কাজটা ঠিক করেননি।...

রাতদুপুরে অন্ধকারে

কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তারপর টের পেলাম সারা পাড়াজুড়ে লোডশেডিং। কারণ, জানলা খোলা আছে, অথচ ঘরের ভেতর ঘুরঘুট্টে অন্ধকার আর ভ্যাপসা গরম।

কিন্তু শব্দটা অস্বস্তিকর এবং সেটা হচ্ছে আমার খাটেরই তলায়। সেখানে থাকার মধ্যে আছে কিছু পুরোনো খবরের কাগজ। একটা সুটকেস। তার মধ্যে কেউ যেন নড়াচড়া করছে। সেই সঙ্গে অদ্ভুত ফোঁস-ফোঁস শব্দ।

প্রথমে ভাবলাম, সাপ নয় তো? পরে মনে হল, তিনতলার এই ঘরে সাপ কোথা থেকে আসবে? ধেড়ে ইঁদুর বা ছুঁচো হলেও হতে পারে। কিন্তু ওরা কি ফোঁস-ফোঁস শব্দ করে? নড়াচড়াটাও যেন কোনও ওজনদার প্রাণীর। প্রাণীটা সম্ভবত লম্বাটে গড়নের। নাহ। কখনওই বিড়াল নয়। অস্বস্তি বেড়েই গেল। টেবিলে একটা

দেশলাই আছে। মোমবাতি আছে। হাত বাড়ালেই পেয়ে যাব। কিন্তু সাহস পাচ্ছি না, যদি চোর হয়? আজকাল চোরদের সঙ্গে ছোরা-ভোজালি-পিস্তল থাকে শুনেছি। একটা টর্চ আছে অবশ্য। কিন্তু সেটা বিগড়ে যাওয়ার আর সময় পায়নি, আজ সন্ধ্যাবেলাতেই বিগড়ে গেছে। খুব অসহায় বোধ করলাম। এদিকে নড়াচড়া আর শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো ফোঁস-ফোঁস শব্দটা বেড়েই চলেছে।

কিছুক্ষণ পরে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। মরিয়া হয়ে করুণস্বরে বলে উঠলাম,—দেখুন সার (কেন যে মুখ দিয়ে সার বেরিয়ে গেল কে জানে!) আমার খাটের তলায় সোনাদানা বা টাকাকড়ি কিছু নেই! টেবিলের ড্রয়ারে আমার মানিব্যাগ আছে। তাতেও বেশি টাকাকড়ি নেই। তবে ওটা আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে চলে যেতে পারেন। আমার রিস্ট ওয়াচটা দাবি করলে সেটাও আপনার হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হব। কিন্তু দয়া করে আমাকে যেন মারবেন না সার!

নড়াচড়া আর ফোঁস-ফোঁস থেমে গিয়েছিল। আমার কথা শেষ হওয়ার পর খাটের তলা থেকে কেউ খ্যানখেনে গলায় বলল,—মলোচ্ছাই! এ যে দেখছি আমার চেয়েও ভীতু! এই একটুতেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে যেন। আবার আমাকে সার-সার করা হচ্ছে। খবরদার! আমাকে সার বলবে না বলে দিচ্ছি!

—আজ্ঞে, বলব না। কিন্তু রাতদুপুরে আপনি আমার খাটের তলায় কী করছেন? কে আপনি?

—আমি যে-ই হই, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কীসের? আমি একটা জিনিস খুঁজছি। পাচ্ছি না।

—খাটের তলায় আপনার জিনিস আছে বুঝি?

—থাকার কথা। কিন্তু গেল কোথায়? তুমি ফেলে দিয়েছ নাকি?

—কী জিনিস বলুন তো?

—একটা ছোট্ট শিশি।

—আজ্ঞে আমি তো তেমন কোনও শিশি দেখিনি!

—তুমি কবে থেকে এই ঘর ভাড়া নিয়েছ?

—প্রায় এক মাস হয়ে এল।

—বুঝেছি। তাহলে হারাধনেরই কাজ। বাকিটুকু অন্য কাকেও খাইয়ে দিয়েছে। ব্যাটাচ্ছেলে মহা ধড়িবাজ।

ক্রমে-ক্রমে আমার সাহস বেড়ে যাচ্ছিল। তাই জিগ্যেস করলাম,—হারাধন কে বলুন তো?

—হুঁ। তোমাকে তার পরিচয় দিই আর তুমি তাকে পুলিশে ধরিয়ে দাও। বাহ! আমাকে অত বোকা ভেবো না হে ছোকরা।

—আজ্ঞে, জাস্ট একটা কৌতূহল! তা ঠিক আছে। শিশিতে কী ছিল বলতে আপত্তি আছে?

—নেই। শিশিটা পেয়ে গেলে তোমাকেই একটুখানি খাইয়ে দিতাম। আমার

একজন সঙ্গীর দরকার বলেই তো ওটা খুঁজতে এসেছি। হারাধনকে জিগ্যেস করতে হবে, আর কাকে সাপ্লাই করেছে।

—প্লিজ দাদা! আপনার সঙ্গী হতে আপত্তি নেই। কিন্তু জিনিসটা কী, যা খেলে আপনার সঙ্গী হতে পারতাম?

—বলব! আগে হারাধনটাকে জিগ্যেস করে আসি আর একটু-আধটু ওর কাছে আছে কি না।

এই সময় আমার মাথার দিকে জানালার পাশ থেকে কেউ চাপাগলায় বলে উঠল,—কেষ্টদা আছেন নাকি?

খাটের তলার লোকটি খাপ্পা হয়ে বলল,—তুমি কে হে ছোকরা, আমাকে এখানে ডাকতে এসেছ?

সাবধানে মাথা একটু ঘুরিয়ে দেখলাম, জানালার ওধারে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে বললে ভুল হবে, ভেসে আছে। কারণ এটা তিনতলার একটা ঘর। ওদিকে খাড়া দেয়াল নেমে গেছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল।

ছায়ামূর্তিটা কেমন অদ্ভুত খিখি শব্দে হেসে বলল,—আমি হারাধন কেষ্টাদা!

কেষ্টবাবু বললে,—এই এক্ষুনি তোমার নাম করছিলাম। এসো, কথা আছে।

কেষ্টাদা! আমরা তোমাকে খুঁজে-খুঁজে হন্যে হয়ে শেষে এখানে এলাম। পানুবাবু বললেন, কেষ্টবাবু হয়তো শিশিটার খোঁজে গেছেন!

—পানুবাবু কোথায়?

—ওই চিলকোঠায় ছাদে বসে আছেন।

—তাঁকে ডেকে আনো! তিনজনে বসে একটু আলোচনা করব।

চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম ছায়ামূর্তিটা উধাও হয়ে গেল। এবার ডাকলুম, —কেষ্টাদা!

—মলোচ্ছাই! আগেই কেষ্টাদা বলে ডাকছ কেন হে? ডাকার কাজ করো। তবে তো কেষ্টাদা বলে ডাকবে!

—কী কাজ বলুন তো?

—একটু ওয়েট করো। ওরা দুজনে আসুক। শিশিটার খোঁজখবর নিই। তবে না?

—শিশির ভেতর যা আছে, তা খেলে পরেই আপনি আমার কেষ্টাদা হয়ে যাবেন?

—বাহ্! তোমার মাথা আছে হে ছোকরা!

—কিন্তু শিশিটা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে?

—দেখো ভায়া, যদি সত্যি তুমি আমাদের দলে ভিড়তে চাও, শিশির দরকার অবশ্য হবে না। আরও কত উপায় আছে। তবে শিশির জিনিসটা বেস্ট। তুমি টেরও পাবে না কী ঘটে গেল!

—সে কী দাদা! টেরও পাব না? কিন্তু ঘটবেটা কী?

—চুপ! বকবক কোরো না। খাটের তলায় যা বিচ্ছিরি গরম!

এই সময় মনে হল, এবার দেশলাই জ্বেলে মোমবাতিটা ধরিয়ে ফেলি। লোডশেডিং দু-ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টাও চলতে পারে। কিন্তু টেবিলের দিকে হাত বাড়াতে সাহস হল না।

একটু পরেই আমার মাথার দিকে জানালায় কেউ বলে উঠল,—কেষ্টবাবু! আছেন না কেটে পড়েছেন।

কেষ্টবাবু সাড়া দিলেন—আসুন পানুবাবু! কেটে পড়ার মতো অবস্থা হয়নি এখনও। হারাধন চলে এসো।

—পানুবাবু বললেন,—আরে! এখানে কে শুয়ে আছে দেখছি!

—ওর ব্যাপারেই একটু আলোচনা আছে।

—খাটের তলায় ঢুকে আলোচনা চলে না। বেরিয়ে আসুন।

—বিচ্ছিরি গরম লাগছে বটে, কিন্তু বেরুতে ইচ্ছে করছে না।

—কেন?

—কোথাও এমন নিরুপদ্রব জায়গা নেই মনে হচ্ছে। আজকাল সবখানেই লোকের ভিড়। আপনারা দুজনেও এখানে থাকতে পারেন। পুরোনো জায়গায় পুরোনো কথা মনে পড়ে আনন্দ পাওয়া যাবে।

—ধুর মশাই! একজন জলজ্যান্ত লোক মাথার ওপর শুয়ে থাকবে। অস্বস্তি হবে না বুঝি?

—মোটেও না পানুবাবু! এ ছোকরা খুব নিরীহ আর শান্ত। দেখছেন না কেমন চুপচাপ শুয়ে আছে!

—জেগে নেই, তা-ই।

—নাহ্। দিব্যি জেগে আছে।

—সে কী! ও হারাধন! কেষ্টবাবু কী বলছেন শুনলে?

হারাধন বলল,—কই দেখি, দেখি!

খাটের তলা থেকে কেষ্টবাবু বললেন,—খামোকা ওকে ভয় পাইয়ে দিয়ো না। বরং ওকে আমাদের সঙ্গী করে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। পানুবাবু! আসুন এখানে। হারাধন এসো হে!

পানুবাবু বললেন,—হারাধন যায় তো যাক। আমি যাচ্ছি না! খাটের ছোকরাকে বিশ্বাস করা যায় না। আজকাল ছেলে-ছোকরাদের মতিগতি বোঝা কঠিন।

হারাধন বলল,—ঠিক বলেছেন পানুবাবু!

কেষ্টবাবু চটে গেলেন। —বেশ। আসতে হবে না, কিন্তু শিশিটা কোথায় গেল?

হারাধন বলল,—তুমি খাওয়ার পর যেটুকু ছিল, তার খানিকটা পানুবাবু খেয়েছিলেন। বাকিটুকু কী হল পানুবাবু বলুন।

পানুবাবু বললেন,—আমি চায়ের কাপে একটুখানি মিশিয়ে দিয়ে শিশিটা ছুড়ে

ফেলেছিলাম। পরে দেখেছি, নর্দমার ধারে একটা বেড়াল দাঁত বার করে পড়ে আছে। বাকিটুকু সে-ই সাবাড় করেছিল।

হারাধন বলে উঠল,—কেষ্টাদা! ওই সেই বেড়ালটা!

কেষ্টবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন,—বেড়ালটাকে ধরো হারাধন! আমি এই ছোকরার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখি, কীভাবে একে দলে দেওয়া যায়।

পানুবাবু বললেন,—অত আলাপ-আলোচনার কী আছে? ছোকরা যদি নিরীহ আর শান্ত হয়, ওকে বলুন না! ওই তো একটা সিলিংফ্যান ঝুলছে। চাই শুধু একটা শক্ত দড়ি। ঘরেই পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমার নাইলনের মজবুত দড়িটা এখনও আছে নিশ্চয়। বৃষ্টি-বাদলের দিনে ঘরে ভিজে কাপড় শুকোতে দিতুম। অত ভালো দড়ি কি এই ছোকরা ফেলে দেবে?

এতক্ষণে আর্তনাদ করে উঠলাম,—না না না! ওরে বাবা। আমি ফ্যান থেকে ঝুলতে পারব না!

তারপরই বিদ্যুৎ এসে গেল। টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টিপে দিলাম। অমনি খাটের তলা থেকে আমার মাথার পিছন দিয়ে কালো লম্বাটে একটা ছায়ামূর্তি যেন পিছলে বেরিয়ে গেল। মাথার দিকে ঠান্ডাহিম বাতাসের ঝাপটানি টের পেলাম। এক লাফে উঠে গিয়ে ঘরের টিউবলাইটও জ্বালিয়ে দিলাম।

সেই সময় চোখে পড়ল, একটা কালো বেড়াল পাশের দিকের জানালা থেকে সরে-সরে গেল। ওদিকে একটা আম গাছ আছে। আম গাছে কাকেরা বাসা করে। বেড়ালটাকে ওই গাছের গুঁড়ি বেয়ে একদিন উঠতে দেখেছিলাম না?

কিন্তু এতক্ষণে মনে হল, ব্যাপারটা বুঝে গেছি। তবে আগাগোড়া সবটাই নিছক দুঃস্বপ্ন কি না কে জানে। আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। এক গ্লাস জল খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করলাম। তারপর টেবিলল্যাম্পটা নামিয়ে খাটের তলাটা দেখে নিলাম। খবরের কাগজগুলো এবং সুটকেসটা যথাস্থানে আছে। তবে সুটকেসটা একটু যেন কাত হয়ে গেছে...

কীভাবে সেই রাত্রিটা কাটিয়েছিলাম, সে আমিই জানি। পরদিন সকালে দোতলার ফ্ল্যাটে আমার পরিচিত রামবাবুকে গিয়ে ধরলাম। উনিই তেতলার ওয়ানরুম ফ্ল্যাটটা আমাকে পাইয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ির মালিক তাঁর বন্ধু।

আমার পীড়াপীড়িতে রামবাবু বললেন,—হ্যাঁ। আজকাল ফ্ল্যাটটি খালি পড়ে থাকে। আসলে আপনার একটা মাথাগোঁজার জায়গা দরকার ছিল। তাই ওই ফ্ল্যাটটাই—

বাধা দিয়ে বললাম,—কিন্তু আপনার একটু আভাস দেওয়া উচিত ছিল!

রামবাবু হাসলেন। —আপনাকে যদি বলতাম ওই ফ্ল্যাটে হারাধনবাবু, তারপর পানুবাবু, শেষে কেষ্টবাবু পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন, আপনি কি ওখানে থাকতে রাজি হতেন? তবে দেখুন, ওরা আপনার কোনও ক্ষতি তো করেনি!

—কী বলছেন! লোডশেডিং আর একটু চললে আমাকে ওরা সিলিংফ্যান থেকে ঝুলিয়ে ছাড়ত!

রামবাবু জিভ কেটে বললেন,—না, না! আমি আছি কী করতে? আপনি ওদের কারও সাড়া পেলেই আমার নাম ধরে ডাকবেন। আমার নাম শুনেই ওরা পালিয়ে যাবে। কেন বুঝলেন তো? আমার নামে রাম শব্দটা আছে। রামনাম শুনেই ওরা—বুঝলেন তো?

বুঝলাম এবং সাহসও পেলাম যথেষ্ট। কিন্তু কথা হচ্ছে, খাটের তলায় শিশিটা পেয়ে গেলে ওরা আমাকে জোর করে খাওয়াতই। আর আমি—

বাপস্! —ভাবতেই হৃৎকম্প হচ্ছিল। ভাগ্যিস একটা কালো বেড়ালের ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা গেছে। তবে এখনই গিয়ে লাল রঙের নাইলনের দড়িটা পুড়িয়ে ফেলতেই হবে। কিছু না জেনে পরের জিনিস ব্যবহার করা আমার মোটেই উচিত হয়নি।...

আম কুড়োতে সাবধান

ফুটবলম্যাচ দেখতে যাব বলে সেজেগুজে তৈরি হচ্ছিলুম। হঠাৎ কোত্থেকে এসে বাধা দিল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন অবস্থাটা আরও সাংঘাতিক করে ফেলল। মনমরা হয়ে বসে রইলুম।

সন্ধ্যার দিকে ঝড়বৃষ্টির দাপট যখন কমে গেল, তখন দেখলুম ছোটমামা কাকভেজা হয়ে বাড়ি ফিরছেন। একটু পরে পোশাক বদলে একটা লণ্ঠন জ্বেলে ছোটমামা ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখে বললেন,—এ কী রে পুঁটু? তুই অন্ধকারে ভূতের মতো বসে আছিস যে?

বললুম,—ধুস! ফুটবলম্যাচ পণ্ড হয়ে গেল।

ছোটমামা টেবিলে লণ্ঠন রেখে বললেন,—তাতে কী হয়েছে? যে আমার ঝাঁপুইতলা বনাম কাঁকুড়হাটির খেলা! ও খেলা কি দেখার যোগ্য?

বলে উনি ফিক করে হসলেন। চাপাস্বরে ফের বললেন,—চল। বেরিয়ে পড়ি।

একটু অবাক হয়ে বললুম,—কোথায়?

ছোটমামা আরও চাপাস্বরে বললেন,—ফেরার সময় শর্টকাটে সিঙ্গিমশাইয়ের বাগানের পাশ দিয়ে এলুম। বললে বিশ্বাস করবিনে পুঁটু, ঝড়বৃষ্টির চোটে বাগানের সব আম পড়ে গেছে। এই জষ্টিমাসের আম। বুঝলি তো? সবই গাছপাকা।

—অন্ধকারে কী করে দেখতে পেলেন ছোটমামা?

তুই একটা বোকার বোকা! —ছোটমামা একটু চটে গেলেন। —বিদ্যুতের

ছটায় দেখলুম না? সারা বাগানের তলায় পাকা আম ছড়িয়ে আছে। চল। কুড়িয়ে আনি।

—কিন্তু ছোটমামা, বাগানে ভোলা আছে যে! ভোলা সাংঘাতিক লোক। ভোঁদা বলছিল, সিঙ্গিমশাই ভোলাকে নাকি তাঁর বন্দুকটা দিয়েছেন। দেখতে পেলেই—

আমার কথায় বাধা দিয়ে ছোটমামা বললেন,—ভোঁদা তোর চেয়েও বোকা। সিঙ্গিমশাই বন্দুক দেবেন ভোলাকে? ভোলা বন্দুক ছুড়তে জানে? তা ছাড়া বন্দুকটা বাড়িতে না থাকলে সিঙ্গিমশাইয়ের বাড়িতে ডাকাত পড়বেই পড়বে, তুই জানিস? ওঠ। দেরি করা ঠিক নয়।

দোনামনা করে বললুম,—বন্দুক না পেলেও ভোলা খুব সাংঘাতিক লোক ছোটমামা! ওর গোঁফ আর চোখদুটো দেখলেই ভয় করে।

ছোটমামা আমার কথায় কান দিলেন না। কোত্থেকে একটা চটের থলে আর টর্চ নিয়ে এলেন। বললেন,—ভোলা এতক্ষণ খেতে গেছে। চলে আয়। আর শোন। জুতো খুলে ফ্যাল। খালি পায়ে যাব।

সিঙ্গিমশাইয়ের আমবাগানটা গ্রামের শেষে মাঠের ধারে। বাগানের মধ্যিখানে একটা মাচার ওপর ছোট্ট ছাউনি আছে। ভোলা সেখানে বসে বাগান পাহারা দেয়। সে দারুণ ধূর্ত লোক। বাগানের আনাচে-কানাচে কেউ পা বাড়ালে কী করে সে টের পেয়ে যায় কে জানে! টের পেলেই এমন হাঁক ছাড়ে যে পিলে চমকে যায়। গতমাসে কচি আম কুড়ানোর জন্য ভোঁদার সঙ্গে গিয়ে কী বিপদেই না পড়েছিলুম!

আমি তো দিশেহারা হয়ে পালিয়ে বেঁচেছিলুম। ওদিকে ভোঁদা ওর হাতে ধরা পড়ে সে এক কেলেঙ্কারি! ভোঁদাকে শাস্তিটা অবশ্যি দিয়েছিলেন ভোঁদার বাবা হাবুলবাবু! পাড়াসুদ্ধু লোকের সামনে কান ধরে ওঠবোস করানোর শাস্তি—ছ্যা-ছ্যা! ভোঁদা কিছুদিন বাড়ি থেকে লজ্জায় বেরুতে পারেনি। স্কুলে যাওয়া তো দূরের কথা।

সেই কথা ভেবে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু ছোটমামার অবাধ্য হওয়ার সাহসও আমার নেই। তাছাড়া ছোটমামা না থাকলে কে আমাকে শহরে কিংবা গঞ্জের মেলায় নিয়ে যাবে? পৃথিবীতে সবসময় কোথাও-না-কোথাও কত সুন্দর সব ঘটনা ঘটছে। ছোটমামা না নিয়ে গেলে আমি একা সেসব দেখতেই যে পাব না।

সন্ধ্যার অন্ধকার আজ বেজায় গাঢ়। আকাশের কোণায় দূরে মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক। চারদিকে ব্যাঙ, পোকামাকড় তুলকালাম গান জুড়ে দিয়েছে। সিঙ্গিমশাইয়ের আমবাগানের দিকে যত এগোচ্ছি, তত অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছে। ছোটমামা পায়ের কাছে সাবধানে টর্চের আলো ফেলে হাঁটছেন। তাঁর পেছনে থলে হাতে আমি হাঁটছি। কতক্ষণ পরে ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে চাপাস্বরে বললেন,—ভোলার কুঁড়েঘরটাতে লণ্ঠন জ্বলছে বটে, তবে বাজি রেখে বলতে পারি, ব্যাটাচ্ছেলে নেই।

—কী করে বুঝলেন ছোটমামা?

—দিঘির পাড়ে টর্চের আলো দেখলুম না? ভোলা ওখান দিয়েই তো খেতে যায়।

—ভোলার টর্চ আছে বুঝি?

—থাকবে না? তুই বড্ড বোকা পুঁটু! রাতবিরেতে টর্চ ছাড়া কেউ বাগানে পাহারা দিতে পারে? তবে আর কথা নয়। আয়, তোকে বাগানের শেষ দিকটাতে একখানে বসিয়ে রাখব আর আমি আম কুড়িয়ে আনব। চুপচাপ বসে থাকবি কিন্তু!

ছোটমামা—কথাটা বলতে গিয়ে পারলুম না। ভোঁদা বলেছিল, ওই বাগানের কোন গাছে কবে কে নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। আর ভূতটা এখনও আছে। তবে সে ভোলার ভয়ে বেরুতে পারে না। ভোলা বাগানে না থাকলে তবেই সে বেরিয়ে এসে লোকেদের ভয় দেখায়।

তো ছোটমামা ধমক দিলেন চাপাগলায়। চুপ! খালি ছোটমামা আর ছোটমামা! —বলে এবার আমাকে প্রায় টানতে-টানতে নিয়ে চললেন। জলকাদা জমে আছে ঘাসের ফাঁকে। পা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। প্রতিবারই ধমক খাচ্ছি। টর্চের আলোর দিকে চোখ রেখে হাঁটতে হচ্ছে।

ঠিক কথা। আসলে আমি সেই ভূতটার কথা ভেবে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছিলুম। ভোলা যে এখন বাগানে নেই। কিছুক্ষণ পরে ছোটমামা আমাকে জায়গায় দাঁড় করিয়ে বললেন,—তুই এইখানে বসে থাক। আমি গাছপাকা আম ছাড়া কুড়োব না। ওই দ্যাখ, কত পাকা আম!

টর্চের আলোয় হলদে কয়েকটা আম দেখতে পেয়েই আমি ভূতের ভয়টা ভুলে গেলুম। এইসব আম নাকি সেরা জাতের আম। একটুও আঁশ নেই। একেবারে ক্ষীরের সন্দেশের মতো নাকি স্বাদ।

থলে নিয়ে ভিজে ঘাসে বসে থাকা যায় না। তাই উঠে দাঁড়ালুম। ছোটমামা এদিক-ওদিক টর্চের আলা ফেলে পাকা আম কুড়িয়ে আনছেন। মিঠে গন্ধে আমার মুখে জল আসছে। কিন্তু এখন কি আম খাওয়ার সময়?

থলে প্রায় অর্ধেক ভরে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। ছোটমামা বললেন,—এবার আমি যাচ্ছি বাতাসাভোগ গাছটার কাছে। খাসা আম! বুঝলি পুঁটু? তুই চুপচাপ বসে থাক। তবে কান খাড়া রাখবি কিন্তু! ভোলা বাগানে আসার সময় গান গাইতে-গাইতে আসে। শুনতে পেলেই তুই ডাকবি।

ছোটমামা টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে আমগাছের অজস্র গুঁড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কোনও গাছের মাথায় একটা পাখি ডানার জল ঝাড়ল। সেই শব্দেই আমার বুক ধড়াস করে উঠেছিল। কিন্তু সুস্বাদু আমের মিঠে গন্ধ আমার ভয়টয় ক্রমশ তাড়িয়ে দিচ্ছিল।

কতক্ষণ পরে ধুপধুপ শব্দে ছোটমামা এসে গেলেন। —নাহ্। গাছটা খুঁজে পেলুম না। ওদিকে দিঘির পাড়ে টর্চের আলো দেখলুম, ভোলা আসছে।

—ছোটমামা! বড্ড অন্ধকার যে!

—হুঁ, টর্চ জ্বালি আর ভোলা দেখতে পাক! খালি বোকার মতো কথাবার্তা। থলেটা আমায় দে। আর আমার এই হাতটা ধরে থাক। ছাড়বিনে বলে দিচ্ছি।

ছোটমামা আমভর্তি থলেটা নিলেন, কিন্তু ওঁর একটা হাত ধরেই ছেড়ে দিলুম। উঃ! কী সাংঘাতিক ঠান্ডাহিম হাত!

ছোটমামা বললেন,—কী হল? হাত ছাড়লি কেন?

—আপনার হাত যে বিচ্ছিরি ঠান্ডা!

—ধুর বোকা! জলকাদা ঘেঁটে আম কুড়িয়েছি, হাত ঠান্ডা হবে না? চলে আয় শিগগির!

এই সময় সত্যিই ভোলার হেঁড়েগলার গান শুনতে পেলুম। ছোটমামার বরফের মতো ঠান্ডা হাতটা অগত্যা চেপে ধরে থাকতে হল। ছোটমামা এবার প্রায় হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ুচ্ছেন। আমিও দৌড়ুচ্ছি।

কতক্ষণ দৌড়েছি জানি না। আমি এবার হাঁপিয়ে পড়েছিলুম। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললুম,—ছোটমামা। আমার পা ব্যথা করছে যে!

ছোটমামার মনে দয়া হল, বললেন,—হুঁ। অনেকটা ঘুরপথে আসতে হল। কিন্তু কী আর করা যাবে? এবার আস্তেসুস্থে যাওয়া যাক।

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এখানে-ওখানে ঝাঁকে-ঝাঁকে জোনাকি জ্বলছে। কাছে কোথায় আচমকা শেয়াল ডাকতে থাকল। একটু ভয় পেয়ে বললাম,—আমরা কোথায় এসে পড়েছি ছোটমামা?

—নদীর ধারে। ঝুঝলি না? ভোলার চোখ রাতবিরেতেও দেখতে পায় তাই পুরো গ্রামটার পাশ দিয়ে ঘুরতে হল। —বলে ছোটমামা অদ্ভুত শব্দে হাসলেন। —তা পুঁটু! এবার একটা আম টেস্ট করে দেখি। কী বলিস? সিঙ্গিমশাইয়ের বাগানের আমের এত নামডাক। দেখি, সত্যি কি না।

ছোটমামা সেখানেই বসে পড়লেন। তারপর তেমনি অদ্ভুত শব্দে আম খেতে শুরু করলেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আর ভাবছি, এবার আমাকেও একটা আম খেতে দেবেন ছোটমামা। কিন্তু উনি যেন আমার কথা ভুলেই গেছেন। ক্রমাগত আম খাচ্ছেন আর আঁটিগুলো ছুড়ে ফেলছেন। শব্দ শুনে বুঝতে পারছি, ওগুলো জলেই পড়ছে।

কিছুক্ষণ পরে না বলে পারলুম না,—কেমন আম ছোটমামা?

জিভে একটা শব্দ করে ছোটমামা বললেন,—ফাস্টো কেলাস! তুই খেলে টের পেতিস পুঁটু! কিন্তু কী আর করা যাবে? সবগুলোই যে আমি ঝোঁকের বশে খেয়ে ফেললুম!

প্রায় ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠার মতো বললুম,—স-ব?

—হ্যাঁ। তোর কথা মনেই ছিল না। বরং তার বদলে তোকে একটু আদর করি। —বলে ছোটমামা আমার মাথায় তারপর মুখে হাত বুলোতে থাকলেন। কী অসহ্য ঠান্ডা হাত! আমি চেঁচিয়ে উঠলুম,—আর না ছোটমামা! বড্ড ঠান্ডা লাগছে যে!

—আমের গন্ধ কেমন মিঠে টের পাচ্ছিস বল পুঁটু! এই নে। আমার হাত শোঁক।

ছোটমামার আঙুল আমার নাকে ঢুকতেই আঙুলটা চেপে ধরলুম। তারপরই টের পেলুম আঙুলটা বেজায় শক্তও বটে। আঙুল না হাড়? রাগে-দুঃখে কেঁদে ফেললুম। ছোটমামা আদুরে গলায় বললেন,—কাঁদে না ছোঁড়া? কাল তোমায় আম খাওয়াব। এবার আমি নদীর জলে হাত ধুয়ে আসি।

ছোটমামা যে এমন অদ্ভুত কাণ্ড করবেন, কল্পনাও করিনি। উনি উঠে গেলেন হাত ধুতে, গেলেন তো গেলেনই। আর ফেরার নাম নেই। জলের ওপর এতক্ষণে তারা ঝিলমিল করছে দেখতে পেলুম। আবার একদল শেয়াল ডেকে উঠল। তখন ভয় পেয়ে ডাকলুম,—ছোটমামা! ছোটমামা!

কিন্তু কোনও সাড়া এল না। আমি এবার মরিয়া হয়ে আরও জোরে ওঁকে ডাকতে থাকলুম। কিছুক্ষণ পরে একটু দূরে টর্চের আলো ঝিলিক দিল। তারপর ছোটমামার গলা ভেসে এল,—পুঁটু! পুঁটু!

সাড়া দিলুম। ছোটমামা দৌড়তে-দৌড়তে কাছে এলেন। তারপর টর্চের আলোয় খালি থলে দেখে প্রচণ্ড খাপ্পা হয়ে বললেন,—বিশ্বাসঘাতক! এইটুকু ছেলের হাড়ে-হাড়ে এত বুদ্ধি! নদীর ধারে শ্মশানের কাছে আম নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তারপর—হায়! হায়! সবগুলো আম একা সাবাড় করেছে!

অবাক হয়ে বললুম,—ছোটমামা! আপনিই তো—

উনি থাপ্পড় তুলে বললেন,—আমিই তো মানে? মিথ্যুক কোথাকার!

—না ছোটমামা! আপনিই তো আমাকে এখানে এনে আমগুলো একা খেয়ে তারপর নদীর জলে হাত ধুতে গেলেন।

—শাট আপ! দেখি তোর মুখ শুঁকে!

আমার মুখে আমের গন্ধ পেয়ে ছোটমামা আরও তর্জন-গর্জন জুড়ে দিলেন। ওঁকে কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছিলুম না। একটু পড়ে উনি হতাশ হয়ে ভিজে ঘাসে বসে পড়লেন। —বাতাসাভোগ আমগাছটা খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসে দেখি, তুই নেই। ভাবলুম, ভোলা আসছে টের পেয়ে তুই বাড়ি চলে গেছিস। বাড়িতে তোকে পেলুম না। তারপর তোকে ডেকে-ডেকে—ওঃ! পুঁটু রে! তুই এমন করবি ভাবতেও পারিনি।

—বিশ্বাস করুন ছোটমামা! আমি আম খাইনি। আপনিই খেয়েছেন।

—আবার মিথ্যে কথা? তোর মুখে আমের গন্ধ।

—আপনিই তো আদর করছিলেন এঁটো হাতে। কী সাংঘাতিক ঠান্ডা আপনার হাত!

আমার হাত ঠান্ডা? বাজে কথা বলবিনে! —বলে ছোটমামা ওঁর একটা হাত আমার গলায় ঠেকালেন। —বল এবার! আমার হাত ঠান্ডা না গরম?

কী আশ্চর্য! ছোটমামার হাত তো মোটেই তেমন ঠান্ডা নয়। অমনি বুকটা ধড়াস করে উঠল! তাহলে কে ছোটমামা সেজে আমাকে নদীর ধারে শ্মশানে এনেছিল? তার আঙুলটা নিরেট হাড় কেন?

আর ভাবতে পারলুম না। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললুম,—ছোটমামা! তাহলে সিঙ্গিমশাইয়ের বাগানের সেই গলায়দড়ে ভূতটা আপনি সেজে আমাকে এখানে টেনে এনেছিল।

শাট আপ! —বলে ছোটমামা উঠে দাঁড়ালেন। —খালি বাজে গপ্প! মিথ্যুক! লোভী! বিশ্বাসঘাতক! তোর শাস্তি পাওয়া উচিত। থাক তুই শ্মশানে পড়ে। আমি চললুম।

ছোটমামা দৌড়তে থাকলেন। আমি মরিয়া হয়ে ওঁকে অনুসরণ করলুম। ভাগ্যিস, ওঁকে টর্চ জ্বেলে দৌড়তে হচ্ছিল। তাই ওঁর নাগাল পেতে অসুবিধা হচ্ছিল না।...

যাই হোক, বাড়ি ফিরে দুজনেই ঘটনাটা চেপে গিয়েছিলুম। ছোটমামা বলে দিলে মা ওঁকে খুব বকাবকি করতেন। আমি বললে শুধু মা নন, বাবাও আমাকে মিথ্যুকের চূড়ামণি বা আর পেটুক সাব্যস্ত করে একটা জব্বর শাস্তি দিতেন।

ছোটমামার রাগ পড়তে তিন দিন লেগেছিল। তবে আমার কথা উনি কিছুতেই বিশ্বাস করেননি। আমার মনে এই দুঃখটা আজও থেকে গেছে। তবে ঠকে শিখেছি, আম কুড়োতে গেলে সাবধান থাকাই উচিত। আর হ্যাঁ, ভোঁদাকে ঘটনাটা চুপিচুপি বলতেই সে আমায় চিমটি কেটে বলেছিল,—তুই সত্যি বড্ড বোকা পুঁটু। গলায়দড়ে ব্যাটাচ্ছেলে যখন আম সাবাড় করছিল, তুই রাম বললেই পারতিস! রাম নামে সব ভূত জব্দ। আমের বদলে রাম। মনে রাখিস।

সত্যি ভূত মিথ্যে ভূত

সেদিন সন্ধ্যায় ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি ঝরছে! টেবিলবাতির আলোয় জম্পেশ করে একখানা গল্প লেখার জন্য কলম বাগিয়ে ধরেছি, এমনসময় কলিংবেল বাজল। বাজল বলা ভুল, বাজতে লাগল।

লেখার মুড নষ্ট হলে সব লিখিয়েই খাপ্পা হন। খাপ্পা হয়ে উঠে গেলুম। কলিংবেল একবার বাজানোই যথেষ্ট। অন্তত এই কথাটা বলেও মনের ঝাল ঝাড়ব, আগন্তুক যেই হোক না কেন।

দরজা খুলে দেখি, ঢ্যাঙা কেঠো চেহারার প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। পরনে সাদাসিধে ধুতি-পাঞ্জাবি! মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি-গোঁফ এবং মিটিমিটি হাসি। কিছু বলার আগেই করজোড়ে নমস্কার করলেন। —আপনি কি বিখ্যাত লেখক নকুড়চন্দ্র গুঁই? আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথাবার্তা আছে।

'বিখ্যাত' কথাটায় প্রশংসা ছিল। আর প্রশংসা শুনলে কোন লেখক না খুশি হন! আমিও খুশি হলুম বইকী। অমন করে বেল বাজানোর কৈফিয়ত চাইতেও ভুলে

গেলুম। তাছাড়া 'জরুরি কথাবার্তা' ব্যাপারটাও আশাব্যঞ্জক। ভদ্রলোক নিশ্চয় কোনও প্রকাশক। তাই খাতির করে বললুম,—আসুন, আসুন। ভেতরে এসে বসুন। তারপর কথাবার্তা হবে।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে সোফায় বসলেন। তারপর হাই তুলে বললেন,—আপনি তো ভূতের গল্প লেখেন?

একটু হেসে বললুম,—মাঝে-মাঝে দু-চারটে লিখি। তা আপনি কি—

ভদ্রলোক আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন,—আমার কথা পরে হচ্ছে। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

এবার একটু অবাক হয়ে বললুম,—কী আপনার প্রশ্ন?

—ওই যে বললুম, আপনি ভূতের গল্প লেখেন! কিন্তু কথাটা হল, আপনি যে ভূতের গল্প লেখেন, আপনি কি কখনও ভূত দেখেছেন?

বিরক্তি চেপে বললুম,—লেখকরা যা লেখেন, কল্পনা করেই লেখেন। ভূতের গল্প লিখতে হলে স্বচক্ষে ভূত দেখতেই হবে, এটা কোনও যুক্তি নয়।

—তার মানে আপনি বানিয়ে লেখেন! সুতরাং আপনি মিথ্যা কথা লেখেন। আপনি একজন মিথ্যুক।

খাপ্পা হয়ে বললুম,—কী যা-তা বলছেন আপনি?

ভদ্রলোক বাঁকা হেসে বললেন,—ঠিকই বলছি। আপনি জানেন চীনে-ভূতের গল্প লেখা মানা? লিখলেই জেলে ঢুকিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় জেলে ঢুকিয়ে মেথরের কাজ করিয়ে ছাড়ে।

—চীনে কী হয়, তা নিয়ে আমার মাথাব্যাথা নেই, আর দেখুন, আমার সময়ের দাম আছে। আপনি আসুন।

ভদ্রলোক আমাকে গ্রাহ্য করলেন না। বললেন,—ঢুকে যখন পড়েছি, তখন সহজে বেরুচ্ছিনে—অন্তত একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া যতক্ষণ না হচ্ছে!

গলার স্বর আর কথার ভঙ্গিতে একটু দমে গিয়ে বললুম,—কী মুশকিল! বোঝাপড়াটা কীসের?

—ভূতের ব্যাপারে।

—বুঝলাম না।

—আপনি—মানে আপনার মতো যাঁরা ভূত নিয়ে গল্প লেখেন তাঁরা কেউই ভূত দেখেননি। অথচ ভূত নিয়ে গল্প লেখেন। আপনারা মিথ্যুক। আপনাদের চীনা-শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

—বেশ। গভর্নমেন্টকে বলুন ব্যবস্থা করতে।

গভর্নমেন্টকে বলে কিস্যু হবে না। —ভদ্রলোক পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে নাকে এক টিপ নস্যি গুঁজলেন। তারপর বিকট একখানা হাঁচি হেচে বললেন,—ভূতেদের না দেখে ভূতের গল্প লেখা অন্যায়। কারণ এতে খামোকা ভূতেদের ডিসটার্ব করা হয়। চীনারা এটা বুঝেছে বলেই শাস্তির ব্যবস্থা করেছে।

—ভূত না দেখে ভূতের গল্প লিখলে ভূতেদের ডিসটার্ব করা হয় বলছেন। কথাটা বুঝলুম না।

—খুব সহজ কথা। যাদের স্বচক্ষে দেখেননি, তাদের কথা লিখছেন, তার মানে আপনি তাদের সম্পর্কে ভুলভাল ইনফরমেশন দিচ্ছেন। তারা যা নয়, তাই লিখছেন। তার মানেটা দাঁড়াচ্ছে, আপনি সত্যের অপলাপ করছেন।

—তাহলে আপনি বলছেন সত্যি-সত্যি ভূত আছে?

—আলবত আছে। আপনারা তাদের সম্পর্কে যা লিখছেন, তা কখনও সত্যিকার ভূতের কথা নয়। স্রেফ নকল ভূতের কথা। আপনারা পাঠকদের ঠকিয়ে পয়সা কামাচ্ছেন।

একটু হেসে বললুম,—দেখুন, গল্প মানেই তো তাই। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার—

ভদ্রলোক রেগে গিয়ে বললেন,—কোথায় বাস্তব? বাস্তবরে ব-টুকুও তো দেখেননি!

—আহা, দেখিনি। কিন্তু শুনেছি। সবই যে স্বচক্ষে দেখে লিখতে হবে তার মানে নেই। ধরুন, সম্রাট অশোককে আমি স্বচক্ষে দেখিনি। কিন্তু তাঁকে নিয়ে গল্প লেখা যাবে না?

—সম্রাট অশোক আর ভূত এক জিনিস নয়।

—দেখুন, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছা আমার নেই। আপনি দয়া করে আসুন।

ভদ্রলোক আগের মতো বাঁকা হেসে বললেন,—একবার ঢুকে যখন পড়েছি, হেস্তনেস্ত না করে সহজে বেরুচ্ছিনে।

খাপ্পা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম,—পুলিশকে ফোন করব বলে দিচ্ছি।

করুন। —ভদ্রলোক ফের হাই তুলে বললেন,—তবে আপনাকে একটা সুপরামর্শ দিতেই এসেছি। ভূতের গল্প লিখতে হলে সত্যিকার ভূত আগে দেখা দরকার। তাদের সম্পর্কে রং ইনফরমেশন দিয়ে গুলতানি ঝাড়া অত্যন্ত অন্যায়। এতে ভূতেদের অপমান করা হয়।

চার্জ করার ভঙ্গিতে বললুম,—সত্যিকার ভূত বলে কিছু নেই। ভূতপ্রেত মানুষের সেন্টপার্সেন্ট কল্পনা।

—কল্পনা—সেন্টপার্সেন্ট?

—আলবাত সেন্টপার্সেন্ট।

—সত্যিকার ভূত নেই?

—না। নেই?

—দেখতে চান?

—চাই। দেখান।

—দেখতেই তো পাচ্ছেন।

—তার মানে? কোথায় দেখতে পাচ্ছি?

—আপনার চোখের সামনে।

না হেসে পারা গেল না। বললুম,—তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন যে আপনিই ভূত?

—ঠিক ধরেছেন।

—কিন্তু আপনি যে ভূত, তার প্রমাণ?

—প্রমাণ আছে বইকী। তবে এত সহজে প্রমাণ দিলে কি চলে? আপনাকে যদি কেউ চার্জ করে বসে যে, আপনিই নকুড়চন্দ্র গুঁই, তার প্রমাণ দিন, আপনার আঁতে ঘা লাগবে। প্রেস্টিজ বলে একটা কথা আছে না? যখন-তখন যে কেউ প্রমাণ চাইলেই তো দেওয়া যায় না। ভূতেরও প্রেস্টিজ আছে।

—বোঝা যাচ্ছে, আপনি একনজন বদ্ধপাগল। পুলিশকে খবর না দিয়ে উপায় নেই দেখছি।

রেগেমেগে পাশের ঘরে গিয়ে থানায় রিং করলুম। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর ঘ্যানঘেনে গলায় সাড়া এল। তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললুম,—আমার ঘরে জোর করে একটা লোক ঢুকে পড়েছে। কাইন্ডলি কেউ এসে একটা ব্যবস্থা করুন।

—হাতে অস্ত্রটস্ত্র আছে নাকি?

—না।

—টাকাপয়সা দাবি করছে কি?

—না-না! ব্যাপারটা হল, লোকটা বদ্ধ পাগল।

—তাই বুঝি? তাহলে কোনও মেন্টাল হসপিটালে খবর দিন।

—কী আশ্চর্য!

—আশ্চর্য কীসের? পাগলটাগলের হ্যাপা সামলানো পুলিশের ডিউটির মধ্যে পড়ে না।

—কাইন্ডলি কথাটা শুনুন আগে।

—বলুন।

—লোকটা বলছে সে একজন ভূত।

—তাহলে ভূতের রোজা ডাকুন?

—আপনারা কেউ আসবেন না তাহলে?

—সরি। এটা পুলিশের ডিউটির মধ্যে পড়ে না।

ফোন রাখার শব্দ হল। কী করব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে আমার পরিচিত এক অফিসার আছেন। বরাতজোরে তাঁকে পাওয়া গেল। ব্যাপারটা শুনে প্রথমে একচোট হাসলেন। তারপর বললেন,—এখনই যাচ্ছি, ভাববেন না। ওকে কথাবার্তা বলে-টলে জাস্ট মিনিট পাঁচেক আটকে রাখুন।

বসার ঘরে ফিরে দেখি, ভদ্রলোক চোখ বুজে যেন ঘুমোচ্ছেন। পুলিশ আসছে, অতএব আমি এবার বেপরোয়া। বললুম,—ও মশাই! শুনছেন?

চোখ বুজে যেন ঘুমের মধ্যে বললেন,—শুনেছি।

—লালবাজার থেকে পুলিশ আসছেন। এখনও বলছি, আপনাকে বিপদে ফেলতে চাই নেই। আপনি কেটে পড়ুন।

একই অবস্থায় থেকে বললেন,—কে আসছে বললেন?

—লালবাজারের ক্রাইমব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টার বঙ্কুবিহারী ধাড়া।

ভদ্রলোক চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। মুখে হাসি। —বঙ্কু আসছে বুঝি? বাঃ। খুব ভালো, খুব ভালো।

অবাক হয়ে বললুম,—ভালো মানে? ওঁকে চেনেন আপনি?

—খুব চিনি। বঙ্কু আর আমি ছেলেবেলার বন্ধু।

—চালাকি করবেন না!

চালাকি কী সত্যি, —বলে ভদ্রলোক আবার চোখ বুজলেন এবং আগের মতো সোফায় হেলান দিলেন। ঘুমজড়ানো গলায় স্বগতোক্তি করলেন,—সারারাত সারাদিন মাইকের চোটে ঘুমোতে পারিনি। বড্ড ঘুম আসছে।

মিনিট দুই পরে কলিংবেল বাজল। এত শিগগির এসে পড়লেন মিঃ ধাড়া। খুব খুশি হয়ে দরজা খুললুম। মিঃ ধাড়া সহাস্যে বললেন,—আছে, না পালিয়েছে?

—আছে। ঘুমোচ্ছে।

বঙ্কুবিহারী ধাড়া ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। তারপর প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, —মুরারি না? কী কাণ্ড।

ভদ্রলোক চোখ খুলে হাই তুলে বললেন,—আয়, কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা!

মি. ধাড়া তাঁর পাশে বসে কাঁধে হাত রেখে বললেন,—তুই আছিস কোথায় এখন?

—মধ্যমগ্রামের ওদিকে। আজকাল যা অবস্থা, ডেরা খুঁজে পাওয়াই প্রবলেম।

আমার ডেরায় চলে আয় না। খুব নিরিবিলি জায়গায়। তবে মাঝে-মাঝে মাইকের বড্ড উপদ্রব। পুলিশের চাকরি করে ওটা কানসওয়া হয়ে গেছে। অসুবিধে হবে না। —বলে মিঃ ধাড়া সহাস্যে আমার দিকে ঘুরে ফের বললেন,—মুরারি আমার ছেলেবেলার বন্ধু, বুঝলেন?

বললুম,—তা না হয় বুঝলুম। কিন্তু উনি নিজেকে ভূত বলছিলেন কেন?

মিঃ ধাড়া আরও হেসে বললেন, কী কাণ্ড! ভূত নিজেকে ভূত বলবে না তো কি মানুষ বলবে? —বলে মুরারীবাবুর দিকে ঘুরলেন।

—তবে মুরারি, কাজটা কিন্তু ঠিক করোনি। খামোকা এই নিরীহ লেখক ভদ্রলোককে জ্বালাতে না এলেই পারতে।

মুরারিবাবু চোখ কটমট করে বললেন,—এসেছি কি সাধে? উনি ভূতেদের ব্যাপারে রং ইনফরমেশন দিয়েছেন। স্বচক্ষে ভূত না দেখে ভূতেদের ব্যাপার-স্যাপার

না জেনে একরাশ মিথ্যা কথা। অসহ্য। বঙ্কু, তোমারও উচিত এর একটা বিহিত করা।

বঙ্কুবিহারী ধাড়া উঠে দাঁড়ালেন। —যাকগে মরুকগে! বিহিত করে হবেটা কী? এতদিন স্বচক্ষে ভূত দেখেননি। এবার দেখলেন। ব্যস, এবার থেকে আর বানিয়ে লিখবেন না। নাও, চলো—তোমার ডেরায় যাওয়া যাক। বাপস ডেরা খুঁজে পাওয়া কী যে প্রবলেম হয়েছে আজকাল। কো-অপরেটিভ হাউসিং করলে মন্দ হয় না বরং।

কথা বলতে-বলতে দুজনে বেরিয়ে গেলেন। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলুম মিনিট দুই। তারপর টনক নড়ল। ঝটপট দরজা বন্ধ করে হন্তদন্ত হয়ে পাশের ঘরে গেলুম। ফের থানায় রিং করলুম। তেমনি দেরি করে সাড়া এল। বললুম,—আমি লেখক নকুড়চন্দ্র গুঁই বলছি। একটু আগে একটা লোকের কথা বলছিলুম—

—লোকটা চলে গেছে তো?

—হ্যাঁ। কিন্তু একটা খবর জানতে চাইছি। লালবাজারে ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর বঙ্কুবিহারী—

—কাগজে খবর পড়েননি? ডাকাতাদের সঙ্গে সংঘর্ষে গতরাত্রে উনি মারা গেছেন।

এ পর্যন্ত শুনেই ফোন নামিয়ে রাখলুম। তারপর নাক এবং কান দুটো মলে প্রতিজ্ঞা করলুম, আর কখনও ভূতের গল্প লিখব না—লিখব না—লিখব না...

ছুটির ঘণ্টা

আমাদের ছেলেবেলায় পাড়াগাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলকে বলা হতো পাঠশালা আর ক্লাসকে বলা হতো শ্রেণী। সব পাঠশালায় ক্লাস ফোর পর্যন্ত থাকবে তার মানে নেই। আমি যে পাঠশালায় পড়তুম সেখানে ছিল শিশুশ্রেণী, প্রথম শ্রেণী আর দ্বিতীয় শ্রেণী। শিক্ষক মোটে একজন। তাঁকে বয়স্করা বলতেন নিসিং পণ্ডিত। আমরা বলতুম পণ্ডিতমশাই।

নিসিং পণ্ডিতের এক দাদা ছিলেন। তাঁর নাম গিরিজাবাবু, আড়ালে আমরা বলতুম গিজাংবাবু। মাটির ঘর আর খড়ের চালের পাঠশালার দাওয়ায় তালপাতার চাটাই পেতে শিশু শ্রেণীর বাচ্চারা স্বরে অ, স্বরে আ বলে বেদম চ্যাঁচাত। খুঁটিতে হেলান দিয়ে পিঁড়ির ওপরে বসে নিসিং পণ্ডিত নিমডালের ছিপটা তুলে বলতেন,—আরও জোরে—আরও জোরে। আমরা প্রাণপণে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্ত করতুম। তার পরে এসে পড়তেন গিজাংবাবু। লম্বা ঢ্যাঙা গড়নের মানুষ। খালি গায়ে ছেঁড়াখোড়া নোংরা একটা পৈতে পেঁচানো থাকত। মাথার পেছনে খাড়া এক টিকি। গলায় তুলসি

কাঠের মালা। পায়ে খড়ম আর হাতে হুঁকো। একটু তফাতে বসে ভুড়-ভুড় শব্দে হুঁকো টানতেন। তামাকের গন্ধটা ছিল ভারি মিঠে।

ঘরের ভেতর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেরা পড়ত। সম্ভ্রমের চোখে ভেতরটা দেখে ভাবতুম, কবে ঘরে ঢোকার দিন আসবে আমার? নিসিং পণ্ডিত সেই উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতে ঘরে ঢুকলে তাঁর দাদা গিজাংবাবু দাওয়ার শিশু শ্রেণীর দিকে মুচকি হেসে তাকাতেন। তারপর বলতেন,—ও কী পড়ছিস রে? ওটা কী পড়া হচ্ছে? নে পড়।

স্বরে অ স্বরে আ
বাড়ি গিয়ে মুড়ি খা
হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ
আমি হুঁকো খাচ্ছি
হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ
এর নাম তামাকু...

ঘর থেকে নিসিং পণ্ডিত শুনতে পেয়ে বলতেন,—আবার তুমি গণ্ডগোল বাধাচ্ছ দাদা? ওদের পড়তে দাও তো।

রাগ করে গিজাংবাবু উঠে যেতেন। একটু তফাতে শিবমন্দিরের বটতলায় গিয়ে বসতেন। পাঠশালার চারপাশটা ছিল ভারি নিরিবিলি। নিমগাছের জঙ্গল, আমবাগান, একটা পুকুর—তার পাড়ে এক জরাজীর্ণ মন্দির! মন্দিরের পাশ দিয়ে একফালি রাস্তা ধরে আমি একা বাড়ি ফিরে যেতুম। কারণ ওটাই ছিল আমার শর্টকাট রাস্তা। ফেরার সময় মন্দিরের কাছে কোনওদিন দেখা হয়ে যেত গিজাংবাবুর সঙ্গে। লোকটিকে আমার ভালোই লাগত। ফিক করে হেসে বলতেন,—কী খোকা? কোন শ্রেণীতে পড়ো?

বলতুম,—ছিছু ছেনি (অর্থাৎ শিশু শ্রেণী)।

অমনি হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়তেন গিজাংবাবু। হুঁকোর জলও গড়িয়ে পড়ত। সামলে নিয়ে বলতেন,—ছিছু ছেনি। অ খোকা, বাড়ি গিয়ে মায়ের কোলে বসে দুধু ভাতু খাও গে।

একদিন ফেরার সময় গম্ভীর মুখে বললেন,—অ খোকা! নিসিং শটকে শেখায় না?

শটকে মানে শতকিয়া—এক থেকে একশো পর্যন্ত মুখস্থ করা। বললুম,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কই, বলো শুনি।

—একে চন্দ, দুয়ে পক্ষ। তিনে নেত্ত...

গিজাংবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন,—থাক, থাক! ওই শটকে পড়াচ্ছে বুঝি নিসিং? শোন এমনি করে শটকে পড়বে।

একে চাঁদ মামা/রেতে দ্যায় আলো
দুয়ে দুই পক্ষ/রং সাদা-কালো
তিনে তিন চোখো/শিব জটাধারী

চারে চার বেদ/জানে দর্পহারী
পাঁচে পঞ্চবাণ/বড় ভয়ংকর
ছয়ে ষড়ঋতু/শোভে মনোহর
সাতে সিন্ধু সপ্ত/আটে বসু অষ্ট
নয়ে গ্রহ নব/কুদৃষ্টিতে কষ্ট
দশে দশ দিক/করহ মুখস্থ
বাড়ি যাই দাদা/সূর্য গেল অস্ত...

এখন বুঝতে পারি গিজাংবাবুর পদ্য রচনার ক্ষমতা ছিল। অতটুকুন বয়সে তাঁর ছড়ার সুরে এসব আওড়ানো শুনে ভক্তি জাগত। কোনওদিন ডেকে বলতেন,—অ খোকা। পণ্ডিত তোমায় আকার পড়িয়েছে তো? বলো দিকি কাক বানান কী?

বানান শুনে হেসে বলতেন,—
কাক থাকে গাছে
জলে থাকে মাছ
বনে থাকে বাঘ
মনে থাকে রাগ...

পাঠশালায় ছুটির ঘণ্টা নিসিং পণ্ডিত নিজেই বাজাতেন। ওটা নাকি পোড়া শিবমন্দিরেরই পুজোর ঘণ্টা। চৈত্রের সংক্রান্তিতে মন্দিরে পুজো হতো—বছরের এই একটা দিনের ঘণ্টা। সেদিন ঘণ্টাটার দরকার হতো মন্দিরে। নিসিং পণ্ডিত নিজেই পূজারী। তাই ঘণ্টাটা তাঁর কাছেই থাকত সারা বছর।

গ্রীষ্মের ছুটির পরে একদিন হঠাৎ নিসিং পণ্ডিতের ঘণ্টাটা গেল চুরি। মনমরা হয়ে পণ্ডিতমশাই মুখেই ছুটি ঘোষণা করলেন। কিন্তু সেই পাঠশালা থেকে ছেলেরা হইহই করে বেরিয়েছে, অমনি পুকুরপাড়ে জঙ্গলের ভেতর মন্দিরের ওখানে কোথায় ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল, ঢং, ঢং, ঢং!

নিসিং পণ্ডিত লাফিয়ে উঠে চেঁচালেন,—ধরো, ধরো, পাকড়ো। তারপর মন্দিরের দিকে দৌড়তে শুরু করলেন। পাঠশালার সর্দার পোড়ো মন্দিরের দিকে দৌড়তে শুরু করলেন। পাঠশালার সর্দার পোড়ো ছিল বাবুল নামে একটা ছেলে—সে বয়সেও সব ছেলের বড়। তাকে পণ্ডিতমশায়ের পেছনে-পেছনে ছুটতে দেখে আমরাও দৌড়লুম।

মন্দিরের ওখানে গিয়ে পণ্ডিতমশাই বললেন,—খোঁজ, খুঁজে দ্যাখ! এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

আমরা সবাই জঙ্গল তন্নতন্ন খুঁজে ঘণ্টা-চোর বা ঘণ্টার পাত্তা পেলুম না। শেষে হতাশ মুখে নিসিং পণ্ডিত বললেন,—যাকগে। ওটা আর পাওয়া যাবে না। বরাবর ঘণ্টাটার ওপর লোভ ছিল যে। কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলুম। সর্দার পোড়ো বাবুল ধমক দিয়ে বলল,—শিগগির বাড়ি চলে যা বলছি। আর এখানে থাকবি না...

সেদিনও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। পরদিন কানাকানিতে টের পেলুম,

গিজাংবাবুই নাকি ঘণ্টাটা চুরি করে পালিয়েছেন। তাই আর তাঁকে গ্রীষ্মের ছুটির পর থেকে পাঠশালার আনাচে-কানাচেও দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু মন্দিরের কাছ দিয়ে আসতে-আসতে তামাকের গন্ধ পাই, তাও তো সত্যি। নিশ্চয় তাহলে জঙ্গলে লুকিয়ে তামাক খান গিজাংবাবু।

তারপর প্রতিদিন বিকেলে বেশ মজার কাণ্ড শুরু হল। তখনও ছুটির সময় হয়নি—পড়াশুনো খুব জমে উঠেছে, হঠাৎ কোথাও ঘণ্টাটা বেজে ওঠে ঢং-ঢং করে। অমনি অভ্যাসে পাঠশালা থেকে ছেলেরা হইহই করে বেরিয়ে পড়ে। নিসিং পণ্ডিত আর বাবুল ছপটি তুলে সবাইকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কান ধরে সবাইকে বাকি সময়টা দাঁড়িয়ে শটকে আওড়াতে হয়।

প্রতিদিন এই কাণ্ড। বিকেল চারটে বাজলে ছুটির সময় নিসিং পণ্ডিত পকেট ঘড়ি বের করে আধঘণ্টা আগে থেকে সবাইকে সতর্ক করে দেন। —খবরদার! দু-কানে আঙুল গুঁজে পড়া মুখস্থ করো।

তাই শুনে আমরা সবাই দু-কানে আঙুল ঢুকিয়ে রাখি।

কিন্তু ঘণ্টাটা ঠিকই বাজে। অনেকক্ষণ ধরে বেজে তারপর থেমে যায় যেন হতাশভাবেই।

দিন কতক পরে মন্দিরের পথে বিকেলে বাড়ি ফিরছি একা। হঠাৎ দেখি মন্দিরের একপাশে বসে আছেন গিজাংবাবু। হুঁকো টানছেন, পাশে ঘণ্টাটা রাখা আছে। মুখটা গম্ভীর।

চলে আসব কিংবা ফিরে গিয়ে পণ্ডিতমশাইকে খোঁজ দেব তাই ভাবছি। তখন একটু হেসে বললেন,—কী খোকা? কেমন পড়াশুনো চলছে? কী বানান পড়াচ্ছে নিসিং?

বললুম,—দীর্ঘ ঊকার।

হুঁকো নামিয়ে রেখে গিজাংবাবু বললেন,—হুঁ, কই বলো দিকি ভূত বানান কী?

—ভয়ে দীর্ঘ ঊকার, তো, ভূত।

—কী বললে? ভয়ে দীর্ঘ ঊকার। হুঁ—ভয়েই বটে। ভয়ের সঙ্গে ভূতের সম্পর্ক আছে যে। তা অ খোকা, ভূত কখনও দেখেছ?

বিকেল পড়ে এসেছে। গাছপালার ভেতর পুরোনো মন্দির। গা ছমছম করে। একটু ভয় হল। বললুম,—আজ্ঞে না।

ভয়ে দীর্ঘ ঊকার আছে বটে, ভূতকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। —গিজাংবাবু মিটিমিটি হেসে বললেন,—ভূত মানুষের মতোই দেখতে। হুঁকোও খায়। কথায় বলে না—অভ্যাস যায় না মলে। আমার অভ্যাস যায়নি। হুঁকো এখনও খাই। আর এই ঘণ্টাটার ওপর বড্ড লোভ ছিল। কেন জানো? নিসিংটার কাণ্ড দেখে। একদল বাচ্চা ছেলেকে সারাদিন খোঁয়াড়ে আটকে রেখেছে। এ কি তাদের ভালো লাগে? তাই ইচ্ছে করত, ঘণ্টাটা পেলে আমি ঢং-ঢং করে ছুটি বাজিয়ে দিতুম।

আমি কিছু বুঝতে না পেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলুম।

গিজাংবাবু হাই তুলে বললেন,—বাড়ি যাও খোকা। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

তারপর আমাকে আরও অবাক করে পেছনে বটগাছটায় গিয়ে উঠলেন। ঘণ্টার দড়িটা কোমরে গোঁজা, হাতে হুঁকো। তারপর উঁচু ডালে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজলেন। তারপর নাক ডাকতে বসলেন।

পণ্ডিতমশাইয়ের দাদার এরকম করে গাছে চড়ে ঘুমোনোটা আমার ভালো মনে হল না। ভাবতে-ভাবতে বাড়ি ফিরলুম।

পরদিন পাঠশালায় গিয়ে পণ্ডিতকে বলে ফেললুম ওঁর দাদার কথা। ভাবলুম ঘণ্টাটা উদ্ধারের সূত্র পেয়ে উনি আমাকে পড়া বলতে না পারার শাস্তি কমিয়ে দেবেন।

কিন্তু শোনামাত্র খাপ্পা হয়ে নিসিং পণ্ডিত গর্জালেন,—কান ধর! কান ধরে দাঁড়া হতচ্ছাড়া! অ বাবুল। এই বয়সেই কী জলজ্যান্ত মিথ্যে বলতে শিখেছে শুনছিস।

বাবুল ভেতর থেকে গম্ভীর স্বরে বলল,—দু-ঘা ছিপটি।

আমি আঁতকে উঠে কেঁদে ফেললুম। বললুম,—না পণ্ডিতমশাই! কাল বিকেলে আপনার দাদা...

মাটিতে ছিপটি ঠুকে নিসিং পণ্ডিত বললেন,—চোপরাও! দাদা একমাস আগে সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগে মারা গেছে! তাকে গঙ্গার ধারে দাহ করে এসেছি। আর বাঁদর বলে কি না, তাকে মন্দিরে বসে হুঁকো খেতে দেখেছে। অ বাবুল, এই মিথ্যুকটা বড় হয়ে কী হবে বল দিকি?

বাবুল ভেতর থেকে বলল,—তিন ঘা ছিপটি।

যাই হোক, আর মন্দিরের পথে শর্টকাট করে পাঠশালা যাতায়াত সেই শেষ। তবে মাঝে-মাঝে পড়া মুখস্থ করতে-করতে হঠাৎ তামাকের ভুরভুরে মিঠে গন্ধটা ভেসে আসত মন্দিরের দিক থেকে। আর যেন অবেলায় ঘণ্টাটাও চাপা ঢং করে বাজত। আশ্চর্য ব্যাপার, আমি ছাড়া আর কেউ এসব টের পেত না।

কিন্তু ঘণ্টাটা শেষপর্যন্ত নিসিং পণ্ডিত ফেরত পেয়েছিলেন। শুনেছি গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসার পর একদিন মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টাটা কুড়িয়ে পান। শিবলিঙ্গের পেছনে লুকোনো ছিল। এবং হুঁকোটাও।

কারণ পিণ্ডি পেয়ে মানুষের আত্মা উদ্ধার হয়ে যায় বটে, কাঁসর-ঘণ্টা আর হুঁকোর যে আত্মা নেই। তাই তাদের পৃথিবীতে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

ভুতুড়ে ফুটবল

সেদিন বাড়ির রোয়াকে বসে কজন মিলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নিয়ে রীতিমতো হই-চই বাঁধিয়েছি, হঠাৎ কোত্থেকে একটা ফুটবল এসে দমাস করে মাঝখানে পড়ল। তারপর ফুটবলটা ডিগবাজি খেয়ে লাগল গিয়ে একেবারে ধনাদার গায়ে। ধনাদা সবে সেজেগুজে অফিসে বেরুচ্ছেন। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবিতে একটা

দাগড়া কালো ছোপ ফেলল। তবে সেটাও বড় কথা নয়, ধনাদা ধরাশায়ী হয়ে চেরাগলায় চেঁচিয়ে উঠলেন,—ধর! ধর! ধর ব্যাটাকে।

আমরা হকচকিয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকালাম। কিন্তু খেলোয়াড়দের দেখতে পেলাম না। গলিটা মোটামুটি চওড়া। এমাথা থেকে ওমাথা অবধি পরিষ্কার দেখা যায়। বলটা তাহলে এল কোত্থেকে?

ধনাদা উঠে দাঁড়িয়ে তেড়ে এলেন,—ধরতে পারলিনে বলটা? কী রে তোরা!

আমরা হেসে ফেললাম। মিঠুন বলল,—আপনি বলটা ধরতে বলছিলেন? আমরা ভাবলাম...

কথা কেড়ে ধনাদা দাঁত খিঁচিয়ে বললেন,—ওয়ার্থলেস! তোরা এতগুলো গাঁট্টাগোট্টা ছেলে থাকতে ব্যাটা ফের ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়ল!

আমি বললাম,—কেটে পড়বে কোথায়? দাঁড়ান, খুঁজে দিচ্ছি।

ধনাদাকে ধরাশায়ী করে বলটা আবর্জনার গাদা ভর্তি একটা টিনের টবে পড়েছে দেখেছি। তাই দৌড়ে টবটার কাছে গেলাম। কিন্তু কোথায় বল?

ধনাদা বেজার মুখে বললেন,—নেই ফের হাওয়া হয়ে গেছে। হবেই, সে তো জানা। ঠিক আছে! আমারও নাম ধনপতি শর্মা! একদিন না একদিন খপ করে ব্যাটাকে ধরে ফেলবই। তারপর ফাটিয়ে ছাড়ব। আমার সঙ্গে ফক্কড়ি!

আমরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলাম। ধনাদার কথাবার্তা শুনে কিছু বুঝতে পারছিলাম না। ধনাদা বাড়ি ঢুকে একটু পরে জামা বদলে বেরুলেন এবং গম্ভীরমুখে চলে গেলেন।

নান্তু বললে,—কিছু বোঝা গেল না। আয় তো বলটা খুঁজে দেখি। নিশ্চয় হারাধনের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

হারাধন ধোপার ঘর আবর্জনার টবের ওপাশে। জামাকাপড় ইস্তিরি করছিল। আমাদের কথা শুনে আঁতকে উঠে ইস্তিরি, টেবিলের আশপাশ, তলা তন্নতন্ন করে খুঁজল। ঘরভর্তি ধোয়া কাপড়-চোপড়। ময়লামাখা একটা ফুটবল সেখানে ঢোকা ভালো নয়।

কিন্তু কোথায় বল? পাশের মুদি-দোকান, সন্দেশের দোকান, দর্জির দোকান—সবখানে খুঁজেও পাত্তা মিলল না, আশ্চর্য! ফুটবলটা কি শূন্যে উবে গেল? আমাদের জেদ চড়ে যাচ্ছিল। আশেপাশে প্রত্যেকটা বাড়ি খুঁজে তোলপাড় করলাম। কোথাও বলের হদিশ পাওয়া গেল না। কেউ ওটা লুকিয়ে রেখে আমাদের মিথ্যা কথা বলবে বলে মনে হয় না। পাড়ায় আমাদের এই দলটার ভীষণ দাপট!

শেষে অনি বলল,—ধ্যাৎ! ছেড়ে দে। মনে হচ্ছে, গড়িয়ে গিয়ে যেভাবে হোক, হাইড্রেনের তলায় চলে গেছে।

কথাটা মনে ধরল। ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

দিনকতক পরে দেখি, ধনাদার বাড়ির সামনে একটা টেম্পোতে মালপত্র বোঝাই হচ্ছে। ধনাদা ব্যস্তভাবে তদারক করছেন। কাছে গিয়ে বললাম,—কী ব্যাপার ধনাদা? এসব নিয়ে কোথায় চলছেন?

ধনাদা গম্ভীরমুখে বললেন,—বাসা বদলাচ্ছি।

—সে কী! এ পাড়ায় তো ভালোই ছিলেন।

ধনাদা আরও গম্ভীর হয়ে বললেন,—না রে ভাই! এখানে এসেও রেহাই পেলাম কই? গত বছর নারকেলডাঙা থেকে তোদের পাড়ায় চলে এসে ভাবলাম, যাকগে, এবার স্বস্তিতে থাকা যাবে। কিন্তু হতচ্ছাড়া এখানেও আমার পেছনে লাগল।

অবাক হয়ে বললাম,—কে সে? বলুন না তাকে আমরা টিট করে ছাড়ছি।

ধনাদা হতাশভাবে বললেন,—পারবি না। পারবি কি? কী সাহস দেখলি তো স্বচক্ষে সেদিন। ক্রমশ ব্যাটার স্পর্ধা বেড়ে যাচ্ছে। আগে তো ঘরের ভেতর একা বসে থাকার সময় এসে জ্বালাত—সেও সন্ধ্যার পর। এখন দিনদুপুরে সবার সামনে এসে বেয়াদপি জুড়েছে!

আমরা বললাম,—ব্যাপারটা কী বলুন তো?

ওই ফুটবল। আবার কী। —ধনাদা গলা চেপে বললেন। গতবার নারকেলডাঙা থেকে পিছু নিয়েছে, যখন-তখন কোত্থেকে এসে দমাস করে গায়ে পড়ছে। তারপর হাওয়া!

বিশ্বাস হল না। বললাম,—যাঃ! কী বলছেন! ফুটবল কি মানুষ? খামোকা আপনার পেছনে লাগবে কেন?

ও তোরা বুঝবিনে,—বলে ধনাদা নিজে কাজে মন দিলেন।

আমি মিঠুনের খোঁজে চললাম। ব্যাপারটা ভারি রহস্যজনক। ওদের বলা দরকার।...

ধনাদা বাসা বদলে বেনেপুকুরে গিয়ে উঠেছিলেন। ঠিকানা জোগাড় করে আমি, নান্তু, মিঠুন আর কাজল কদিন পরে এক রবিবারে সেখানে হাজির হলাম। ধনাদাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। বরাবর একা মানুষ। স্বপাক খান। একঘরের ফ্ল্যাট হলেই চলে যায়। বেনেপুকুরে এ বাসাটা একেবারে তিনতলার ছাদে, চিলেকোঠামতো একটা ঘর। মিঠুন দেখেটেখে বলল,—এত ওপরে ফুটবলটা আর উঠতে পারবে না, ধনাদা।

ধনাদা করুণ হাসলেন। —কী বলিস! ব্যাটা স্বর্গে গিয়েও রেহাই দেবে না। বরং তেতলার ওপর উঠে দেখছি আরও ভুল করেছি। এখন প্রায়ই এসে হানা দিচ্ছে। একটু আগে ওখানটায় বসে চা খাচ্ছি, ব্যস! এসে গদাম করে পিঠে পড়ল! এই দ্যাখ না, জামার কী অবস্থা করেছে!

ধনাদার পিঠে জামার ওপর কাদার ছোপ দাগড়া হয়ে গেছে। কাজল মারকুটে ছেলে। গোঁ ধরে বলল,—ঠিক আছে। এবার আসুক! ধরে অ্যায়সা কিক মারব, সোজা ধাপার মাঠে গিয়ে পড়বে বাছাধন।

ওর কথা শেষ হতে না হতে সেই অবাক-ফুটবল বাঁই করে এসে একেবারে ধনাদার মাথায় পড়ল। ধনাদা অঁক শব্দ করে পড়ে গেলেন। বলটা লাফিয়ে উঠতেই কাজল হেড করার ভঙ্গিতে দৌড়ে গেল। কিন্তু বলটা মহা ধড়িবাজ। গুলতির মতো ছুটে নিচে কোথাও গিয়ে পড়ল।

ধনাদাকে ওঠালাম। উঠে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন,—দেখলি? দেখলি তো?

এবার দিনদুপুরেই আমাদের গা ছমছম করতে থাকল। এ নিশ্চয় ভূতে পাওয়া একটা ফুটবলের কীর্তিকলাপ। ভূতের ব্যাপার-স্যাপার যতদূর জানি মরা মানুষ কিংবা জন্তু-জানোয়ার সেজে ফক্কুড়ি করে বা ভয় দেখায়। ফুটবল রূপ ধরে এমন বেয়াড়াপনা করতে তো শোনা যায় না।

একটু পরে ধনাদা হাঁপ সামলে বললেন,—এবার ভাবছি একজন ভূতের রোজা না ডাকলেই নয়।

বললাম,—কিন্তু সব থাকতে একটা ফুটবল-ভূত কেন আপনার পেছনে লাগল বলুন তো?

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে ধনাদা বললেন,—ওই বলের পেছনে যে খেলোয়াড় আছে, তার নাম বললে তোরা চিনবিনে, তোদের তখন জন্মই হয়নি। ওর নাম ছিল গোবর্ধন ঘড়াই—মোহনবাগানের সে আমলে নামকরা সেন্টার ফরোয়ার্ড ছিল গোবর্ধন ঘড়াই। আর আমি ছিলাম তখনকার বিখ্যাত রেফারি। আই. এফ. এ. শিল্ডের খেলা। আমি রেফারি। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ফাইনাল খেলা হচ্ছে। গোবরা শেষ মুহূর্তে একটা গোল করল। কিন্তু আমার ডিসিশন অফসাইড। গোবরা গেল আমার ওপর খেপে। খেলা ড্র হয়ে গেল। মাথার ওপর শিল্ড ঝুলছে।

কাজল বলল,—তারপর? তারপর?

ধনাদা সে কথায় কান না করে বললেন,—গোবরার সারাজীবন এ দুঃখটা ছিল। গতবছর সে মারা গেছে। বয়স হয়েছিল আমার মতন।

নান্তু বলল,—নামটা শোনা। গোবর্ধন ঘড়াই বললেন তো?

হুঁ। —বলে ধনাদা ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। —বোস তোরা। চা-টা খেয়ে যাবি।

ধনাদা ঘরে ঢুকলে কাজল বলল,—রেফারিগিরি করার এই বিপদ!

আমরা তাতে সায় দিলাম।—

এই ঘটনার মাসখানেক পরে এক সকালে যথারীতি রোয়াকে আড্ডা দিচ্ছি, ধনাদা ট্যাক্সি চেপে হাজির। মুখ বাড়িয়ে বললেন,—শিগগির! শিগগির! আমার সঙ্গে চলে আয়।

আমরা দৌড়ে কাছে গেলাম। বললাম,—কী হয়েছে ধনাদা?

ধনাদা চোখ নাচিয়ে ফিক করে হেসে বললেন,—ব্যাটাকে ধরে ফেলেছি আজ। ধরেই না রেশনের থলের মধ্যে পুরে মুখটা আচ্ছাসে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি। দেখবি আয়।

ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম আমরা। ট্যাক্সি ছুটে চলল বেনেপুকুরের দিকে।

উত্তেজনায় আমরা অধীর। ধনাদা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে বললেন,—দরজায় দুটো তালা এঁটেছি। ব্যাটাকে থলেবন্দি করে রেখে দিয়েছি তক্তপোশের তলায়। যাবে কোথায়?

দরজার তালা খুলে তক্তপোশের তলা থেকে থলেটা বের করলেন ধনাদা। কাজল বুদ্ধি করে দরজার মুখে দাঁড়াল। থলের মধ্যে গোলাকার জিনিসটা হাতে টিপে

আমরা আশ্বস্ত হলাম। ধনাদা মিটিমিটি হেসে বললেন,—এখানে বসে কাগজ পড়ছি। আর ব্যাটা সুড়ুৎ করে এসে দু-ঠ্যাঙের ফাঁকে পড়েছে। মানে, কিক করেছে গোবরা—কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল আর কী? খপ করে ধরে ফেলেছি তক্ষুনি। এবার?

বলে ধনাদা দুম করে এক কিল মারলেন থলের ওপর। অমনি থলেটা লাফিয়ে উঠল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম,—পালাবে! পালাবে!

থলেটা ঘরের ভেতর লাফ দিতে শুরু করল। ধনাদার হাত ফস্কে গেল। দরজার কাছে এগোতেই কাজল দরজা বন্ধ করে দিল। নান্তু কিক ঝাড়ল সঙ্গে-সঙ্গে। থলেটা ঘরময় লাফালাফি জুড়ে দিল। আমরা তার ওপর সমানে কিক ঝাড়তে থাকলাম। তারপর ধনাদা ওটার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ধরে ফেললেন এতক্ষণে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন,—চল। ব্যাটাকে ধাপায় পুঁতে রেখে আসি...।

ধাপা অনেকটা পথ। কিন্তু গোবর্ধনবাবুর ফুটবল সারা পথ চুপ করে রইল—বেগতিক দেখেই।

ধাপায় পৌঁছে কাজল একটা ছুরি দিয়ে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। খোঁড়া হলে সে থলেসুদ্ধু ফুটবলটা গর্তে ফেলতে যাচ্ছে দেখে ধনাদা আঁতকে উঠলেন। —আরে করিস কী? করিস কী? এটা আমার রেশন আনবার থলে। আড়াই টাকা দাম। বরং মুখটা ফাঁক করে গলিয়ে দে।

কিন্তু দড়ি খোলার সঙ্গে-সঙ্গে ঘটল আরও উদ্ভট ব্যাপার। কোথায় ফুটবল। একটা কালো বুনো বিড়াল লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল? তারপর বাঁই-বাঁই করে দৌড়ে গিয়ে একটা আবর্জনার ঢিবিতে উঠে থামল এবং আমাদের দিকে ঘুরে-ঘুরে জ্বলজ্বলে হলুদ চোখে তাকিয়ে দাঁত বের করে ধমক দিল, ম্যাঁ-ও-ও। তারপর আর তার পাত্তা পাওয়া গেল না। ধনাদা হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হতাশ-ভঙ্গিতে বললেন, —এবারও ফস্কে গেল!

কাজল ফোঁস করে বললেন,—ধুস! ছিল ফুটবল, হয়ে গেল বেড়াল। কোনও মানে হয়?

ম্যাজিশিয়ান-মামা

টুকাই তার বন্ধু কুট্টুসের কাছ থেকে একটা ভূতের গল্পের বই পড়তে নিয়েছিল। সারা বিকেল খেলার মাঠের শেষ দিকটায় নিরিবিলি ঝিলের ধারে বসে বইটা যখন শেষ করে ফেলল, তখন দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে। খেলুড়েরা কখন চলে গেছে খেলা শেষ করে। ঝিলের ঘাটে যে ধোপা কাপড় কেচে শুকোতে দিয়েছিল, সেও তার গাধাটার পিঠে কাপড়ের বোঁচকা চাপিয়ে চলে যাচ্ছে। টুকাইয়ের এবার গা ছমছম করছিল। সে উঠে পড়ল।

কুট্টুসের কাছে অনেক ভূতের গল্পের বই আছে। টুকাই ভাবল বইটা ফেরত দিয়ে আরেকটা চেয়ে নেবে। কিন্তু এসব বই পড়ে এই সন্ধেবেলা বড্ড ভয় করে যে? কুট্টুসদের বাড়িটা আবার নিরালা জায়গায়, শহরের একটেরে। পেছনে একটা কবরখানাও আছে। সায়েবি আমলের। কুট্টুস সায়েব—ভূতগুলোর কত গল্প না শুনিয়েছে। দোনামনা করে টুকাই এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে খেলার মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছুল। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। লোকজন হাঁটাচলা করছে। টুকাইয়ের ভয়টা চলে গেল তাই দেখে। সে কুট্টুসদের বাড়ির দিকে চলতে লাগল।

কুট্টুসদের বাড়িটা পুরোনো হলেও বেশ সুন্দর। সামনে এক টুকরো ফুলবাগান আছে। গেটের মাথায় বোগনেভিলিয়া ফুলের ঝাঁপি আছে। সন্ধ্যার দিকে কেমন একটা মিঠে গন্ধ মউমউ করে। কিন্তু বাড়ির সামনে গিয়েই টুকাই একটু অবাক হল।

বাড়িতে আলো জ্বলছে না। কুট্টুসরা নেই নাকি? টুকাই গেট দিয়ে উঁকি মেরে আস্তে ডাকল,—কুট্টুস!

অমনি অন্ধকার বারান্দা থেকে কেউ ভারী গলায় বলে উঠল,—কে রে?

তাহলে বাড়িতে লোক আছে। গলাটাও যেন চেনা লাগছে। টুকাই বলল,—আমি।

—আমি? আমি কে হে? আমি কি কারুর নাম হয় নাকি?

টুকাই ধমক খেয়ে হকচকিয়ে বলল,—আমি টুকাই।

—টুকাই? সে আবার কে? কই, সামনে এসো তো দেখি?

টুকাই ভয়ে-ভয়ে গেট খুলে ভেতরে গেল। রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট থেকে টেরচা হয়ে ফিকে হলদে রঙের একটুখানি আলো বারান্দায় গিয়ে পড়েছে। সেই আলোয় টুকাই এতক্ষণে দেখতে পেল, কুট্টুসের সেই ম্যাজিশিয়ান-মামা বেতের চেয়ারে বসে আছেন।

অমনি সে খুশিতে নেচে উঠল। ভয়টুকু আর রইল না। কুট্টুর এই মামা নামকরা ম্যাজিশিয়ান। মাঝে-মাঝে বেড়াতে আসেন এখানে। কুট্টুসের বন্ধুদের কত মজার ম্যাজিক দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেন।

কিন্তু কুট্টুস তো বলেনি ওর ম্যাজিশিয়ান-মামা এসেছেন। টুকাই মনে-মনে কুট্টুসের ওপর রেগে গেল। ম্যাজিশিয়ান-মামা ফের ধমক দিয়ে বললেন,—কী হল? অমন করে দাঁড়িয়ে আছো যে বড়? কাছে এসো, দেখি তুমি কে?

টুকাই হাসিমুখে বারান্দায় উঠে বলল,—আমি টুকাই ম্যাজিশিয়ান-মামা! আমাকে চিনতে পারছেন না? তারপর টিপ করে পায়ে একটা প্রণামও করে ফেলল। ম্যাজিশিয়ান-মামা খুশি হয়ে বললেন,—হুঁ, মনে পড়েছে বটে। তুমি টুকাই।

টুকাই বললে,—কখন এলেন ম্যাজিশিয়ান-মামা? কুট্টুস তো আমাকে বলেনি।

বলবার সময় পেলে তো! —ম্যাজিশিয়ান-মামা বললেন,—আমিও এলুম, ওরাও বাড়িসুদ্ধ গেল কোন বিয়েবাড়ি নেমন্তন্ন খেতে। তাই একা বসে বাড়ি পাহারা দিচ্ছি। তা তোমায় পেয়ে ভালোই হল। কথাবার্তা বলা যাবে।

টুকাই বলল,—ম্যাজিক দেখাতে হবে কিন্তু, ম্যাজিশিয়ান-মামা।

দেখাব, দেখাব। —ম্যাজিশিয়ান-মামা একটু হাসলেন,—তোমাদের ম্যাজিক দেখিয়ে বড় আনন্দ পাই। কিন্তু দেখছ, বাড়িতে কারেন্ট নেই—লোডশেডিং। ওই দেখো, সব বাড়িতে আছে। শুধু এই বাড়িটা বাদে। ভারি অদ্ভুত মনে হচ্ছে না তোমার?

টুকাই দেখে নিয়ে বলল,—হ্যাঁ ম্যাজিশিয়ান-মামা।

—তা যাকগে। অন্ধকার ভালো। বুঝলে? অন্ধকার আমি খুব পছন্দ করি।

টুকাই সায় দিয়ে বলল,—আমিও পছন্দ করি ম্যাজিশিয়ান-মামা।

—করো বুঝি? তুমি খুব ভাল ছেলে। ম্যাজিশিয়ান-মামা বললেন,—তা তোমার হাতে ওটা কী?

—একটা ভূতের গল্পের বই, ম্যাজিশিয়ান-মামা। কুট্টুসকে ফেরত দিতে এলুম।

—অ্যাঁ! ভূতের গল্পের বই? কই, দেখি-দেখি!

ম্যাজিশিয়ান-মামা বইটা টুকাইয়ের হাত থেকে টেনে নিলেন। টুকাই মিটমিট করে হেসে বলল,—অন্ধকারে দেখবেন কী করে?

—আমি অন্ধকারে দেখতে পাই। বুঝলে তো?

টুকাই ভাবল, ম্যাজিশিয়ানরা কত অদ্ভুত-অদ্ভুত ম্যাজিক দেখাতে পারেন। তাছাড়া চোখে রুমাল বেঁধে থটরিডিংয়ের খেলাও যখন দেখান, তখন অন্ধকারে বই পড়াটা কী এমন কঠিন ওঁদের পক্ষে। সে অবাকচোখে ম্যাজিশিয়ান-মামার দিকে তাকিয়ে রইল। এও একটা দারুণ ম্যাজিক বইকী!

ম্যাজিশিয়ান-মামার চেহারা এতক্ষণে আবছা দেখা যাচ্ছে। প্রকাণ্ড মানুষ। মাথায় টাক আছে। পরনে সেই বরাবর দেখা পাঞ্জাবির ওপর নকশাদার কালো জহরকোট। সেই পেল্লায় গোঁফ। উনি বইটা উলটে-পালটে দেখে বললেন,—ভূতের ছবিও আছে দেখছি। কিন্তু দেখো বাপু, যে এই ছবি একেছে, সে কস্মিনকালেও ভূত কেন, ভূতের টিকিও দেখেনি। ছ্যা-ছ্যা! ভূতের চেহারা কি এমন বিচ্ছিরি?

টুকাই হাসতে-হাসতে বলল,—কেমন হয় ম্যাজিশিয়ান-মামা?

—দেখবে নাকি?

—হুঁ-উ।

—কিন্তু এই অন্ধকারে দেখবে কী করে। একটা মোমবাতি চাই যে। চলো, ভেতরে গিয়ে খুঁজে দেখি।

ঘরে ঢুকে ম্যাজিশিয়ান-মামা অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি করে মোমবাতি জোগাড় করলেন। এটা ওঁর পক্ষে কঠিন কাজ নয়, টুকাই জানে। সে বলল,—ম্যাজিশিয়ান-মামা, দেশলাইকাঠি ছাড়া মোমা জ্বালাতে পারেন না ম্যাজিক দিয়ে?

পারি বইকী। —বলে ম্যাজিশিয়ান-মামা ফুঁ দিলেন। আর অবাক কাণ্ড, মোমবাতিটা দপ করে জ্বলে উঠল। টুকাই খুব হাসতে লাগল মজা পেয়ে। ম্যাজিশিয়ান-মামার কত মজার-মজার ম্যাজিক সে দেখেছে, এমন ম্যাজিক দেখেনি তো?

টুকাই মনে করিয়ে দিল,—ম্যাজিশিয়ান-মামা, এবার ভূতের চেহারা দেখব।

—ভূতের চেহারা—তোমায় বললুম না? কখনও এই বইয়ে আঁকা ছবির মতো বিচ্ছিরি হয় না।

—কেমন হয়?

—এই তোমার-আমার মতো।

টুকাই মাথা নেড়ে বলল,—উঁহু। তাহলে সবাই ভূতকে ভয় পায় কেন শুনি?

বোকারাই ভয় পায়। —মোমবাতিটা টেবিলে আটকে দিয়ে ম্যাজিশিয়ান-মামা চেয়ারে বসলেন। —তুমি যদি বোকা হও, তুমিও ভয় পাবে। তুমি কি বোকা?

টুকাই আরও জোরে মাথা নাড়ল।

ম্যাজিশিয়ান-মামা বললেন,—ভূতের চেহারা ভদ্রলোকের মতো, যেমন ধরো, আমি...

কথা কেড়ে টুকাই হাসতে-হাসতে বলল,—যাঃ! আপনি কি ভূত নাকি?

—কে বলতে পারে? এই যে এই সন্ধ্যাবেলা তুমি এই অন্ধকার বাড়িটাতে এলে—কে বলতে পারে তুমি ভূত, না মানুষ।

টুকাই হেসে অস্থির হল। ম্যাজিশিয়ান-মামা খুব আমুদে মানুষ, তা সে বরাবর দেখেছে। বলল,—আচ্ছা ম্যাজিশিয়ান-মামা, ভূতেরা কি ম্যাজিক দেখাতে পারে?

—হুঁ-উ! খুব পারে। তবে ভূতের ম্যাজিক তো। আরও অদ্ভুত। দেখবে নাকি? বলে ম্যাজিশিয়ান-মামা প্যাঁচালো নাট থেকে বল্টু খোলার মতো নিজের প্রকাণ্ড মাথাটা কয়েক পাক ঘুরিয়ে দিলেন। অমনি তাঁর মুন্ডু বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে থাকল। টুকাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল। এতক্ষণে তার গা ছমছম করতে লাগল। চোখদুটো বড় হয়ে উঠল। এ যে বড় সাঙ্ঘাতিক ম্যাজিক।

ম্যাজিশিয়ান-মামার মুন্ডুর ঘূর্ণি থামল। তখন চোখ নাড়িয়ে বললেন,—কেমন ম্যাজিক? এর নাম হল হল মুন্ডুনৃত্য। এবার এইটে দেখো। এ আমার নতুন ম্যাজিক। এর নাম হল জ্বলন্ত মোমবাতি ভক্ষণ।

এবার উনি আস্ত মোমবাতিটা মুখে পুরে কোঁত করে গিলে ফেললেন। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। টুকাই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—ম্যাজিশিয়ান-মামা! ম্যাজিশিয়ান-মামা!

মোমবাতিটা হঠাৎ ম্যাজিশিয়ান-মামার টাক ফুঁড়ে বেরুল। ঘর আলোকিত হল আগের মতো। উনি ফিক করে হেসে বললেন,—ভয় পেয়েছিলে বুঝি? এটা তত কিছু ভয়ের না। তবে এই তিন নম্বর খেলাটা...

টুকাই চেঁচিয়ে উঠল ফের,—আর না। আর না। তারপর সটান দরজা দিয়ে ছিটকে বেরুল এবং বারান্দা থেকে এক লাফে নেমে গেট পেরিয়ে দৌড়-দৌড়! এ কখনও ম্যাজিক নয়। এ যে বড্ড ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা! মুন্ডুনৃত্য, জ্বলন্ত মোমবাতি ভক্ষণ; তারপর তিন নম্বরটা হয়তো টুকাই ভক্ষণ। বাপস!...

পরদিন স্কুলে কুট্টুসের সঙ্গে দেখা। কুট্টুসকে কিছু বলার আগেই সে চোখ

পাকিয়ে তেড়ে এল। —টুকাই আর কখনও তোকে বই দেব না। অমন করে জানলা গলিয়ে বইটা ছুড়ে ফেলে এসেছিস। মলাট ছিঁড়ে কী অবস্থা হয়েছে দেখেছিস?

টুকাই কাঁচুমাচু মুখে বলল,—যাঃ! ছুড়ে দিয়ে আসব কেন? বইটা তো তোর ম্যাজিশিয়ান-মামাকে দিয়ে এসেছিলুম। উনিই দেখতে নিলেন যে!

কুট্টুস আরও খাপ্পা হয়ে বলল,—চালাকির জায়গা পাসনি? ওঁকে কোথায় পেলি? ম্যাজিশিয়ান-মামা তো আমেরিকায় ম্যাজিক দেখাতে গেছেন। এখন সানফ্রান্সিসকোতে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। কাগজে ছবি বেরিয়েছে না?

টুকাই ঢোক গিলে বলল,—তাহলে কাল সন্ধেবেলা তোদের বাড়িতে কাকে দেখলুম রে?

কুট্টুস ঘুষি পাকিয়ে বলল,—ফের চালাকি?

টুকাই চুপচাপ কেটে পড়ল তার সামনে থেকে। হুঁ, খুব বেঁচে গেছে কাল সন্ধেবেলা। তবে দোষ তো কুট্টুসদেরই। কবরখানার কাছে বাড়ি খালি রেখে অমন করে—নেমন্তন্ন খেতে যায় কেউ?...

ভৌতিক বাদুড় বৃত্তান্ত

গুণধর বলল,—একটা কথা বলি দাদাবাবু! বাদুড়কে রাতবিরেতে কক্ষনো বাদুড় বলবেন না। বলবেন রাতপাখি।

অবাক হয়ে বললুম,—কেন বলো তো গুণধর?

গুণধর হাসল।—এ তো সোজা কথা দাদাবাবু। কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বললে রেগে যায়। সাপকে কেউ কি সাপ বলে। বলে, পোকা। বাঘকে বলে, বড়মিয়া। ভূতপ্রেতের নাম ধরে কি কেউ ডাকে? বলে—ওনারা। বাদুড় বড় অমঙ্গুলে জীব দাদাবাবু, কক্ষনও রাতবিরেতে ও নাম মুখে আনবেন না।

—আহা, বাদুড় অমঙ্গুলে কেন?

—প্রথম কথা হল, বাদুড়ের সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। সবাই পা নিচে আর মাথা ওপরে করে দাঁড়ায়। বাদুড় দাঁড়ানো তো দূরের কথা, পা ওপরে মাথা নিচে করে উল্টো হয়ে ঝোলে। দ্বিতীয় কথা হল, বাদুড় উড়তে পারে। কিন্তু দেখুন, যারা ওড়ে তারা ডিম থেকে জন্মায়—অথচ বাদুড় ডিম থেকে জন্মায় না। তার চেয়ে বড় কথা, বাদুড় মায়ের স্তন থেকে দুধ খেয়ে বড় হয়। এসব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড না দাদাবাবু?

কথা হচ্ছিল বাদুড় নিয়ে। কারণ কিছুদিন থেকে দেখছি, খেলার মাঠের ধারে পুরোনো শিবমন্দিরে দেয়াল ফাটিয়ে-ফাটিয়ে যে গাছটা উঠেছে, তার ডালে একটা বাদুড় ঝোলে। ছেলেরা সন্ধ্যার মুখে খেলা শেষ করে চলে গেলে মাঠটা যখন নিরিবিলি

হয়ে ওঠে, তখন বাদুড়টা অদ্ভুত চিৎকার করে আমার দিকে ছুটে আসে এবং আমি সরে বসার আগেই চাঁটি মেরে উড়ে যায়।

কদিন এই জ্বালাতন সহ্য করার পর আমাদের বাড়ির কাজের লোক গুণধরকে (আমরা ওকে চাকর বলি না—বলতে নেই।) ব্যাপারটা বললাম। বাদুড়টাকে তাড়াতেই হবে। এজন্য ওর সাহায্য দরকার। কিন্তু গুণধর ওইসব কথা বলে আমাকে ভড়কে দিল। শেষে বলল,—সন্ধেবেলা একা-দোকা নাইবা গেলেন ওখানে? রাতপাখিটা যখন আপনাকে পছন্দ করছে না তখন না যাওয়াই ভালো।

আমার জেদ চড়ে গেল মাথায়। দিনের বেলা বাদুড় চোখে দেখতে পায় না। সকালবেলা একটা ছোট্ট লাঠি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের বাড়িটা এই মফস্বল শহরের শেষ দিকটায়। খেলার মাঠ পেরিয়ে ভাঙা শিবমন্দিরের কাছে গিয়ে দেখি হতচ্ছাড়া বাদুড়টা ঝুলছে, লাঠিটা জোরে ছুড়ে মারলাম তার দিকে। অমনি বিকট চিৎকার করে নিচে পড়ে গেল। তখন মায়া হল বড্ড। সামান্য একটা কারণে বেচারিকে মেরে ফেললুম?

বাদুড়টা মরেনি কিন্তু। ঘাসের ওপর চিত হয়ে চুপচাপ পড়ে রয়েছে। চকচকে লালচোখে তাকিয়ে আছে। দাঁত বের করা বেজির মতো মুখ। দেখে একটু ভড়কে গেলুম। বাদুড়টাকে বড় ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। ঠোঁটের একপাশে খানিকটা রক্তও জ্বলজ্বল করছিল। মুখে একটু জল দেব ভাবলুম। কিন্তু এমন হিংস্র বিটকিলে মুখের দিকে তাকাতে দিনদুপুরেই গা ছমছম করছে যে। হঠাৎ সেই সময় মন্দিরের পাশ থেকে জটাজুটধারী এক সাধু বেরিয়ে এলেন। তারপর ব্যাপারটা দেখেই গর্জন করে বললেন,—আরে-আরে দুরাচার পাপিষ্ঠ। তুই আমার বাহনকে বধ করেছিস? অভিশাপ লাগবে তোর। তুই উচ্ছন্নে যাবি।

আমি বেগতিক দেখে হন্তদন্ত হয়ে পালিয়ে এলুম মাঠ পেরিয়ে। আর পিছু ফিরে দেখার সাহস ছিল না।

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে খেলার মাঠে আর গেলুম না। ওটা ছিল আমার প্রিয় বেড়ানোর জায়গা। কী জানি, যদি সেই রাগী সাধুর পাল্লায় পড়ি, অভিশাপের ভয়ে না হোক—খামোকা একটা ঝগড়াঝাঁটি বেধে যেতেও পারে। প্রথম দর্শনে ভড়কে ছিলুম বটে। দ্বিতীয়বার আর ভড়কাব না।

অনেক রাতে কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। শরৎকালে বড্ড মশার উপদ্রব। মশারির ভেতর শুয়ে আছি। হঠাৎ মনে হল মশারির ছাদে একজোড়া লাল জ্বলজ্বলে চোখ আমাকে দেখছে তারপর মশারির ছাদটা নেমে এল কিছুটা। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসছিল। লাল জ্বলন্ত ভাঁটার মতো দুটো চোখ আমার মুখ থেকে মাত্র দেড়ফুট ওপরে। ঝটপট বেডসুইচ টিপে দিতেই উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। তারপর ঘরের ভেতর তুমুল ঝটপট শব্দ।

সঙ্গে-সঙ্গে বুঝলাম, ওটা সেই বাদুড়ই বটে। আতঙ্কে শরীর হিম হয়ে গেল! ভয়জড়ানো গলায় ডাকলাম,—গুণধর! গুণধর! গুণধর!

গুণধরের সাড়া পেয়ে সাহস হল। মশারি থেকে মাথা বের করে দেখি কোণার দিকে বাদুড়টা চিত হয়ে রয়েছে। মশারি থেকে বেরিয়ে সাবধানে তার পাশ কাটিয়ে দরজা খুলে দিলুম। গুণধর বলল,—কী হল দাদাবাবু? কু-স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি?

—না, না সেই বাদুড়! ওই দেখো, এবার আমার ঘরে এসে ঢুকেছে।

গুণধর জিভ কেটে বলল,—চুপ, রাতপাখি বলুন, রাতপাখি। সে উঁকি দিয়ে বাদুড়টাকে দেখে দু-পা পিছিয়ে গেল। তারপর আমাকে হাত ধরে টেনে বের করল ঘর থেকে। শেষে দরজা আটকে দিল।

এটা বাইরের ঘর। আমাদের কথাবার্তা শুনে বাড়ির লোকদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বড়দা, মেজদা, সেজদা এবং বউদিরা সদ্য ঘুমভাঙা মুখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারপর ঘরে বাদুড় ঢুকেছে শুনে সবাই হাসতে লাগলেন। বড়দা পরামর্শ দিলেন,—চুপচাপ শুয়ে পড়্‌গে যা। তারপর সবাই চলে গেলেন।

চলে তো গেলেন, আমরা এখন কী করি? গুণধর কাঁপা গলায় বলল,—আপনার ওপর ওর কেন নজর পড়ল কে জানে। এটা মোটেই ভালো ঠেকছে না।

বললাম,—এক কাজ করা যাক। একটা লাঠি আনো। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে ওর। নড়াচড়া করতে পারছে না। তুলে জানালা গলিয়ে ফেলে দেব।

গুণধর নিমরাজি হল। কিন্তু সাবধান দাদাবাবু। —বলে সে একটা লাঠি এনে দিল।

দরজা খুলে কিন্তু আর বাদুড়টার পাত্তা পেলুম না। ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজলুম টর্চ জ্বেলে—সোফা, টেবিল, আলমারির তলা বা পেছন দিক, ফ্যান, কোথাও নেই। গুণধর কিছুতেই ঘরে ঢুকল না। ওর ওপর রাগ করে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লুম। বেডসুইচ টিপে আলো নেভালুম বটে, কেমন একটা অস্বস্তি জেগে উঠেছিল। ঘুম এল না। বারবার মশারির ছাদে চোখ পড়ছিল। পাশে লাঠিটা রেখেছি। জ্বলন্ত চোখদুটো দেখলেই লাঠির গুঁতো মারব—যা থাকে বরাতে।

চুপচাপ শুয়ে আছি। কতক্ষণ পরে জানালার দিক থেকে চাপা শব্দ হল। মশারি থেকে নিঃশব্দে মুখ বের করে সেই জানালার দিকে টর্চের আলো জ্বেলে দিলুম। আঁতকে দেখলুম, জানালার রডের ফাঁকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছেন সেই জটাজুটধারী সাধুবাবা। তাঁর জটা আঁকড়ে কানের পাশে ঝুলছে সেই বীভৎস বাদুড়। সাধুবাবা হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এক সেকেন্ড মাত্র। তারপর টর্চ নিভে গেল, বোতামে আমার আঙুল অবশ হয়ে গিয়েছিল আসলে। ফের যখন বোতাম টিপলুম, দেখি—সাধুবাবা নেই। জানালা ফাঁকা! ঝটপট বেরিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলুম। বাকি জানলাগুলো বন্ধ ছিল।

বাকি রাত আর ঘুম হল না। এমন আতঙ্কের রাত কখনও আসেনি।

সকালে গুণধরকে চুপিচুপি সাধুবাবার কথাটা বলতেই হল। গুণধর আরও ভড়কে গিয়ে বারবার মাথা নেড়ে বলল,—ভালো নয়—মোটে ভালো ঠেকছে না।

কাজটা ভালো করেননি দাদাবাবু! বরং শিবের থানে গিয়ে ওনার কাছে ক্ষমা-ভিক্ষে করে নিন।

সেদিন দুপুরে আমার জ্বর এল কম্প দিয়ে। অফিস থেকে রিকশো করে বাড়ি চলে এলুম। ঋতু পরিবর্তনের ফলে জ্বরজ্বালা হতেই পারে। কিন্তু গুণধর সব ব্যাপার বাড়ির সবাইকে শুনিয়ে দিল—সে এবার আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল।

জ্বরের ঘোরে বারবার সেই কালো রঙের লালচোখো বাদুড়টাকে দেখে গোঁ-গোঁ করছিলুম। মা কান্নাকাটির চূড়ান্ত করলেন। বাড়িতে সবার মুখে আতঙ্কের ছাপ! দুদিন-দুরাত্রি ধরে জ্বরটা থাকল। কিন্তু আমার অবস্থা শোচনীয়। যখনই চোখ বুজি, বীভৎস বাদুড়—কখনও সেই সাধুবাবাকে দেখতে পাই। স্বপ্নেও সাধুবাবার জটায় বাদুড়টা ঝুলিয়ে আমাকে অভিশাপ দেন। ঘুম ভেঙে দেখি, গলা শুকিয়ে গেছে। মা শিয়রে জেগে থাকেন। জল খাইয়ে দেন।

জ্বর ছাড়ার দিন শুনলাম, মা এবং বউদিরা গিয়ে শিবমন্দিরে সাধুবাবাকে খুঁজেছেন। তাঁর দেখা পাননি। অগত্যা মন্দিরে পুজো দিয়ে চলে এসেছেন। মন্দিরের ফাটলে গাছে ওঁরা বাদুড়টাকে দেখতে পাননি শুনে আশ্বস্ত হলাম। মা ভর্ৎসনা করে বললেন,—ছি! এমন বয়সেও ছেলেমানুষি গেল না খোকা! পাখপাখালি মারতে আছে? সেই ছেলেবেলায় মতো দুষ্টুমি এখনও ছাড়তে পারলি না?

আরও তিনটে দিন অসুস্থ হয়েই কাটল। কিন্তু এই কদিনে বাদুড়টা বা সাধুবাবার ভুতুড়ে উৎপাত আর ঘটল না।

গায়ে জোর এলে একদিন বিকেলে—অনেকদিন পরে খেলার মাঠে গিয়ে বসলুম। এক সময় মাঠ নির্জন হয়ে গেল। সন্ধ্যায় ধূসর রঙে ঢেকে গেল চারদিক। একটু দূরে শহরের রাস্তার আলো জ্বলে উঠল। বাদুড়টা যদি উড়ে এসে আমাকে চাঁটি মারে, আজ প্রতিবাদ করব না। বাদুড়ের চাঁটি খেয়ে মারা পড়ে বলে শুনিনি। মারে তো মারুক না কয়েকটা চাঁটি! মশার উপদ্রব শুরু হল এতক্ষণে। শিশিরও জমছে। ফের জ্বরজ্বালা বাধানোর ভয়ে এক সময় উঠে পড়তে হল। আর সেই সময় মন্দিরের দিকে একটা চিৎকার শোনা গেল। সঙ্গে টর্চ ছিল। তক্ষুনি বোতাম টিপলুম। তারপর একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখে পড়ল।

সেই সাধুবাবার গলা কামড়ে ধরে ঝুলছে বীভৎস বাদুড়টা আর সাধুবাবা তাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন। মুখে অদ্ভুত একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে।

আমার দৌড়ে যেতে-যেতে সাধুবাবা সশব্দ পড়ে স্থির হয়ে গেলেন। বাদুড়টা ডানা ঝটপট করে উড়ে অন্ধকার আকাশে মিলিয়ে গেল।

আমার ডাকাডাকিতে, খেলার মাঠের ওপাশের বস্তি থেকে লোকেরা আলো আর লাঠিসোঁটা নিয়ে দৌড়ে এল।

কিন্তু আশ্চর্য, লোকগুলোকে দ্রুত ঘটনা বলার পর ঘুরে দেখি, সাধাবাবু নেই। চারপাশে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে দেখা গেল না। তখন লোকগুলো হাসাহাসি করতে থাকল। একজন বলল,—ওরে দাদাবাবু একলা বেড়াতে এসে ভয় পেয়েছেন!

ওরা চলে গেলে আমি ব্যাপারটা ভাবতে-ভাবতে বাড়ির দিকে চললাম। আগাগোড়া সবটাই আমার চোখের ভুল? বাদুড়ঘটিত ঘটনার এই উপসংহারটুকু আমি গুণধর বা বাড়ির কাউকে আর বললাম না।

তবে এতকাল পরে মনে হয়, আসলে ব্যাপারটা আগাগোড়াই ভৌতিক। দৈবাৎ কীভাবে ভূতদের জীবনে ঢুকে পড়েছিলুম এবং তার ফলে কিছুটা ভুগতেও হয়েছিল। ভূতেরা সত্যি বড় অদ্ভুত।

তুতানখামেনের গুপ্তধন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের বছর। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল। লন্ডন শহর থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে একটি ছোট্ট সুন্দর গ্রাম ব্লুবার্ড। সেখানে ছুটি কাটাচ্ছেন লর্ড কার্নারভন। ইংলন্ডের হাউস অব লর্ডসের একজন সম্মানিত সদস্য তিনি। তাঁর গ্রামের এই বাড়িটির নাম 'ইজিপ্ট'। ইজিপ্ট বা মিশর নামে বাড়ির নাম রাখার কারণ, লর্ড কার্নারভন একজন পুরাতত্ত্ববিদ এবং বিশেষ করে মিশরের প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে খুব মাথা ঘামান। মমি, পিরামিড এবং আরও নানান বিস্ময়কর কীর্তির প্রতি তাঁর কৌতূহলের শেষ নেই।

ইজিপ্টের বারান্দায় বসে সেদিন তিনি খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

সেদিনকার ডাকে একটি পত্রিকা এসেছে। ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ। তার একটা বিশেষ খবর তিনি খুব মন দিয়ে পড়ছিলেন।

ডেভিস নামে একজন খামখেয়ালি দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ আছেন লন্ডনে। প্রায়ই তিনি দুর্গম জায়গায় দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়েন। ক'মাস আগে ডেভিস আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলের গহন অরণ্যে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ঘুরতে-ঘুরতে পরে মিশরে আসেন। মিশরে এসে সম্প্রতি তিনি প্রাচীন কিছু জিনিস দৈবাৎ কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

মিশরের একটা রুক্ষ পাহাড়ি অঞ্চলে মাটির তলা থেকে প্রাচীন রাজা বা ফ্যারাওদের কবর, মমি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। পুরাতাত্ত্বিকরা এই অঞ্চলের নাম দিয়েছেন 'ভ্যালি অব দি কিংস' অর্থাৎ রাজরাজড়ার উপত্যকা।

এই উপত্যকায় ঘুরতে-ঘুরতে ডেভিস হঠাৎ একটা ধ্বসেপড়া টিলার ফাটলে কয়েকটা হাঁড়ি দেখতে পান। হাঁড়িগুলো পোড়ামাটির। গায়ে চমৎকার কারুকার্য আছে। মুখের ঢাকনা সিল করা। সিলমোহরে যাঁদের নাম আছে, তাঁরা কিন্তু ফ্যারাও নন, পুরুতঠাকুর।

প্রাচীন মিশরে দেবদেবীদের পূজারি পুরুতঠাকুররা খুব প্রতাপশালী ছিলেন।

ফ্যারাও তাঁদের পরামর্শেই চলতেন'। ডেভিসের কুড়িয়ে পাওয়া হাঁড়িতে যাঁদের সিলমোহর আছে, তাঁরা তুতানখামেন নামে এক রাজার পুরুত।

এই 'তুতানখামেন' নামটা থাকায় লন্ডনের পণ্ডিতমহলে হইচই পড়ে গেছে। তুতানখামেন ছিলেন বয়সে কিশোর এক ফ্যারাও। সিংহাসনে বসার পর মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই তিনি মারা যান।

পুরোনো আমলের গ্রিক পণ্ডিতদের পুঁথিতে তাঁর কথা জানা গিয়েছিল। তাছাড়া ওই রাজরাজড়ার উপত্যকায় প্রাচীন ফ্যারাও যুগের যেসব ফলক পাওয়া গিয়েছিল, তাতে তাঁর উল্লেখ ছিল।

কিন্তু ওই উপত্যকা তন্নতন্ন করে খুঁজে তাঁর কবর বা মমি পাওয়া যায়নি। অমন তন্নতন্ন করে খোঁজার একটা কারণ ছিল। গ্রিক পণ্ডিতদের লেখায় তো বটেই, সেই পুরোনো ফলকেও স্পষ্ট করে উল্লেখ ছিল, তুতানখামেনের মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ সে-আমলের প্রথা অনুসারে মমি করা হয় এবং মমির সঙ্গে সমাধিকক্ষে অজস্র মণিমুক্তো-হীরাজহরতও রাখা হয়। বলা বাহুল্য, এই গুপ্তধনের লোভেই অত খোঁজাখুঁজি।

শুধু পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা নন, অনেক ধনলোভী দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ, এমনকী, চোর-ডাকাতরাও রাজরাজড়ার উপত্যকা চষে ফেলেছে। কিন্তু তুতানখামেনের কবরের কোনও হদিশ পায়নি কেউ।

শেষে সবাই ধরে নিয়েছিল, তুতানখামেন নামে কোনও ফ্যারাও ছিলেনই না। ওটা স্রেফ বানানো গল্প।

কিন্তু ডেভিসের পাওয়া হাঁড়িতে তুতানখামেনের পুরুতদের সিলমোহর পাওয়া গেল এতদিনে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, সত্যি ওই নামে একজন ফ্যারাও ছিলেন।

তার চেয়ে বড় কথা, হাঁড়িগুলোর সিল ভেঙে ঢাকনা খোলা হয়েছে লন্ডন জাদুঘরে। ডেভিস ওগুলো জাদুঘরে জমা দিয়েছেন। ইংলন্ডের আইনের এই রীতি। পৃথিবীর যেখানেই হোক, কোনও ইংরেজ বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা প্রাচীন কোনও জিনিস কুড়িয়ে পেলে কিংবা উদ্ধার বা আবিষ্কার করলে তা জাদুঘরে জমা দিতেই হবে। নয়তো জেল খাটতে হবে। ডেভিস তাই ওগুলো জমা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

এখন দেখা যাচ্ছে, হাঁড়ির ভেতরে ভাঁজ-করা পোশাক রয়েছে। এই পোশাক পুরুতরা রাজার শবযাত্রার সময় পরতেন।

তার মানে, তুতানখামেনের মৃত্যুর পর তাঁকে কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় পুরুতরা এই পোশাক পরেছিলেন। তারপর প্রথামতো সেগুলো খুলে হাঁড়িতে ভরেছিলেন। মুখে সিল এঁটে দিয়েছিলেন। তাহলে নিশ্চয় তুতানখামেনের কবরও কোথাও আছে।

ডেভিস যেখানে হাঁড়িগুলো পেয়েছেন, তারই কাছাকাছি কোথাও আছে। অথচ ডেভিস তা না খুঁজে হাঁড়িগুলো নিয়েই মিশর থেকে চলে এসেছেন।

কেন চলে এসেছেন?

লন্ডন মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ বলেছেন,—ডেভিস যখন রাতদুপুরে আমার

বাড়িতে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে ওঠাল, তখন আমি ওর চেহারা দেখে অবাক হলাম। কী যেন আতঙ্কে ঠকঠক করে কাঁপছে। আমি প্রশ্ন করে তার মুখে বেশিকিছু জানতে পারলাম না। শুধু কোনওরকমে বলল,—এগুলো ভুতুড়ে জিনিস। এর মধ্যে ভূতপ্রেত আছে।

মিশর থেকে লন্ডন অবধি আনতে তার নার্ভের চূড়ান্ত হয়েছে তাই এ আপদ বিদায় করে বাঁচতে চায়। এই বলে ডেভিস তক্ষুনি চলে গেল। আমি হাঁড়িগুলো সাবধানে একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রাখলাম। পরদিন সকালে শুনি, ডেভিস রাস্তায় মরে পড়ে আছে। তার লাশ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তাররা মৃত্যুর তেমন কোনও কারণ খুঁজে না পেয়ে বলেছেন, হার্টফেল। আমার অবাক লাগে, দৈত্যের মতো বলশালী এবং দুঃসাহসী মানুষ ডেভিস। তার বিচিত্র কীর্তিকলাপের কথা কে না জানেন! অথচ সে হঠাৎ হার্টফেল করে রাতারাতি মারা পড়ল। এবং আমার কাছ থেকে যাওয়ার পরেই! এর কোনও মাথামুণ্ড খুঁজে পাচ্ছি না। ব্যাপারটা রহস্যময়। পুলিশের গোয়েন্দা দফতর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকেরা অবশ্য তদন্ত করে দেখছে।

সাংবাদিকরা অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করেন,—আচ্ছা স্যার, হাঁড়িগুলো আপনার জিম্মায় আসার পর কোনও অদ্ভুত কিছু ঘটেছে কি?

অধ্যক্ষ বলেন,—না। ওগুলো আমি যথারীতি পরদিনই জাদুঘরে নিয়ে গিয়ে রেখেছি। কিন্তু সেখানেও কোনও ভুতুড়ে ব্যাপার ঘটেনি। নানা দেশের সেরা পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের হাঁড়িগুলো এবং পুরুতদের পোশাক-আশাক পরীক্ষা করে দেখতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাঁরা এখন এ কাজে ব্যস্ত।...

লর্ড কার্নারভন ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজের এই বিস্তারিত খবরটা পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

তুতানখামেন সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর কৌতূহল অনেকদিনের। প্রচুর পুঁথিপত্র হাতড়েছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার জাদুঘরে বা পুরাদ্রব্যের সংগ্রহশালায় গিয়ে খোঁজাখুঁজি করেছেন। রোমের প্রখ্যাত আর্কাইভে পুরোনো পুঁথিশালায় পাঁচ বছর ধরে পুঁথি পড়ে এসেছেন—যদি তুতানখামেনের কবরের কোনও খোঁজখবর পান!

কিন্তু পাননি। এতদিন ডেভিস যদি বা একটা ক্ষীণ সূত্র পেল, সে অতর্কিতে মারা পড়ল। ঠিক কোন জায়গায় ওগুলো পাওয়া গেছে, তার মুখেই জানা যেত। কিন্তু সে-রাস্তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

লর্ড কার্নারভন তখনই অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে তাঁর মোটর গাড়িটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। লন্ডনের দিকে প্রচণ্ড গতিতে চলতে থাকল তাঁর গাড়ি।

মাইল দশেক চলার পর হঠাৎ গাড়ির কলকবজা বিগড়ে গেল। ভাগ্যিস একটু তফাতে একটা গ্যারাজ ছিল। গ্যারাজের লোকেরা ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে গেল। গাড়ি সারিয়ে চালু করতে ঘণ্টা তিনেক লেগে গেল।

গ্যারাজের মালিক একটু হেসে বলল,—আজ দিনটা শুভ নয়। মশাই, বেরোবার আগে কি তারিখটা লক্ষ করেননি? আজ অপয়া তেরো। আনলাকি থার্টিন।

লর্ড কার্নারভন রেগে বললেন,—ওসব আমি মানি নে হে, বুঝলে?

লোকটা মুচকি হেসে বলল,—ঠিক আছে। ভালোয়-ভালোয় পৌঁছন, এই ইচ্ছে করতে আপত্তি নেই। তবে কিছু বেগতিক ঘটলে আমাকে যেন শাপ দেবেন না।

লর্ড কার্নারভন আবার স্টিয়ারিং ধরে স্পিড বাড়িয়ে দিলেন গাড়ির।

লন্ডনের আধাআধি পথ এসেছেন, আবার হঠাৎ ঘড়ঘড় করতে-করতে থেমে গেল গাড়ি। আবার গ্যারাজ খুঁজতে বেরোতে হল। সঙ্গে চাকর না নিয়ে এসে ভুল করেছেন। এখন আর পস্তানো বৃথা।

যাই হোক, এইভাবে রাস্তায় দুবার গাড়ি বিগড়ে যাওয়ায় লন্ডন পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল তাঁর।

সন্ধ্যার মুখে কুয়াশা ঘন হয়ে উঠেছে। বাতি জ্বলেছে সদ্য। কিন্তু রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। আজ আর জাদুঘরে ঢোকা যাবে না। কখন বন্ধ হয়ে গেছে। বিরক্তমুখে লর্ড কার্নারভন গাড়ি চালাচ্ছেন।

একসময় হঠাৎ দেখতে পেলেন, সামনে আবছা একটা গাড়ি আসছে। গাড়িটা ঘোড়ার গাড়ি। দেখতে-দেখতে গাড়িটা এসে পড়ল।

কিন্তু আতঙ্কে লর্ড কার্নারভন দেখলেন, ঘোড়ার গাড়িটা তাঁর গাড়ির দিকেই সোজা ছুটে আসছে। জোরে হর্ন বাজালেন। কিন্তু না—এই এসে পড়ল। লর্ড কার্নারভন ব্যস্ত হয়ে গাড়ির মুখ ঘুরিয়েই ব্রেক চাপলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর গাড়ি উল্টে গিয়ে পাশের একটা খানায় পড়ল। প্রচণ্ড আঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন তিনি।

লোকজন দৌড়ে এল চারপাশ থেকে। ততক্ষণে ঘোড়ার গাড়িটা কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেছে। তারা সাংঘাতিক আহত লর্ড কার্নারভনকে হাসপাতালে পৌঁছে দিল।

লর্ড কার্নারভনের জ্ঞান ফিরল তিন দিন পরে।

কিন্তু তারপর তিনি যা বললেন, শুনে তো ডাক্তাররা উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবলেন—এই রে! দুর্ঘটনার ধাক্কায় লর্ডসায়েবের মাথার গোলমাল হয়ে গেছে!

লর্ড বললেন,—ঘোড়ার গাড়িটার ঘোড়াগুলো কালো রঙের। কোচোয়ানের পরনে ছিল প্রাচীন মিশরের পোশাক। আরোহীকে অস্পষ্টভাবে দেখেছি। মনে হয়েছে, তাঁর মাথায় ফ্যারাওয়ের মুকুট ছিল।

হাউস অব লর্ডসের সদস্য বলে কথা। তাঁর চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হবে না। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল মানসিক ব্যাধির ওয়ার্ডে। খ্যাতিমান মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তাররা নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখে বললেন,—নাঃ। লর্ড সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক। তবে সেই ঘোড়ার গাড়ির ব্যাপারটা যেভাবে বর্ণনা করছেন, তাতে বোঝা যায় উনি তখন হ্যালুসিনেশন-এ আচ্ছন্ন ছিলেন অর্থাৎ চোখের ভুল। মিশরসংক্রান্ত খবর পড়ে দ্রুত লন্ডনে ফিরে আসছিলেন এবং সারাপথ মাথায় ওই চিন্তা ছিল। তাই কুয়াশা এবং আবছা অন্ধকারে ঘোড়ার গাড়িটা দেখে ওই ভুল করে ফেলেছেন। ভুলের ফলেই উনি সাত তাড়াতাড়ি ব্রেক চাপেন এবং গাড়ি স্বাভাবিকভাবেই উল্টে

যায়। এমনও হতে পারে, হ্যালুসিনেশন-এর ফলে আতঙ্কে গাড়িটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন খানার দিকে।

লর্ড কার্নারভন সুস্থ হয়ে বাড়ি ঢুকলেন। কিন্তু এবার তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করে দেখে বললেন,—সামনের শীতকালটা আপনার শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই ওই সময় আপনার কোনও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গিয়ে থাকা উচিত।

বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন ভারতে যেতে। কিন্তু লর্ড কার্নারভন আনন্দে নেচে উঠলেন। মিশরও তো গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। তিনি মিশরেই যাবেন।

নিছক বেড়াতে যাবেন না। রথ দেখা কলা বেচার মতো মিশরে গিয়ে পুরাতাত্ত্বিক অভিযানেও নামবেন। সেই রাজরাজড়ার উপত্যকায় তন্নতন্ন অনুসন্ধান চালাবেন। কোথায় ডেভিস হাঁড়িগুলো পেয়েছিল, খুঁজে বের করবেন। মাটি খুঁড়তে তো হবেই। এজন্য লোকজন দরকার। অভিজ্ঞ তদারককারীও চাই।

এজন্য প্রচুর টাকা দরকার। ইংলন্ডের দরবার থেকে অনুমতিও দরকার। লর্ড কার্নারভনের দুটোরই কোনও অসুবিধা ছিল না।

তিনি সদলবলে মিশরের 'ভ্যালি অফ দি কিংস'-এ গিয়ে তাঁবু পাতলেন।...

এদিকে যেদিন লর্ড কার্নারভন দুর্ঘটনায় আহত হন, সেদিনই আরেকটি বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল।

হাওয়ার্ড কার্টার নামে এক যুবক চাকরির খোঁজে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। লেখাপড়া মোটামুটি করেছে। কিন্তু তার ঝোঁক ছবি আঁকাতে। বিশেষ করে ড্রইংয়ে তার হাত বেশ পাকা। তখনকার দিনে কলকারখানার ব্যাপারে ড্রইং জানা লোকের দরকার হতো, এখনও হয়। কিন্তু নিছক ড্রইংয়ে হাত থাকলেই তো চাকরি পাওয়া যায় না। ইঞ্জিনিয়ারিং বা কারিগরি বিদ্যাও পেটে থাকা চাই। কার্টারের সেসব কিছু ছিল না।

১৯১৩ সালের ১৩ই এপ্রিল কার্টার মনমরা হয়ে বসে আছে ভিক্টোরিয়া পার্কে, একটা গাছের তলায়। হতাশায় সে ভেঙে পড়েছে। মনে-মনে সংকল্প করছে, আত্মহত্যা করে বেকারজীবনের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি খুঁজে নেবে।

সে জায়গাটা একেবারে নির্জন। একসময় সে তৈরি হয়ে উঠে দাঁড়ায়। গাছের ডালে মাফলার বেঁধে ফাঁস বানাবে এবং ঝুলে পড়বে।

গাছে চড়তে যাচ্ছে, হঠাৎ কে পিছন থেকে হো-হো করে হেসে উঠল। কার্টার চমকে উঠল। ঘুরে দেখল, একটা পাগলাটে চেহারার বুড়ো ভিখিরিগোছের লোক কখন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে এবং তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

কার্টার ক্ষোভে ও রাগে বলে উঠল,—দাঁত বের করার কী আছে এতে?

বুড়ো বলল,—আছে বইকী। আলবত আছে। এই তাজা জোয়ান বয়সে এমন মরার শখ দেখলে হাসি পাওয়ারই কথা।

কার্টার একটু অবাক হয়ে বলল,—মরতে যাচ্ছি কে বলল তোমাকে?

দেখেই বোঝা যায়। —বুড়ো এসে কার্টারের কাঁধে হাত রেখে বলল,—শোনো বাছা, তোমাকে একটা ভালো খবর দিই। যে জন্যে মরতে যাচ্ছ, তার একটা সুব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমি এক্ষুনি চলে যাও লন্ডন মিউজিয়ামের অধ্যক্ষমশায়ের কাছে। গিয়ে বলো, বেন্নেস আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি ড্রইংয়ের কাজটা ভালোই পারি। ব্যস, দেখবে—তোমার চাকরি তো হয়েই যাবে, উপরন্তু এই থেকে তুমি একদিন পৃথিবীর নামী লোক হয়ে উঠবে। যাও, এক্ষুনি চলে যাও।

কার্টার হাঁ করে তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। এসব কথা শুনে সে তো খুবই অবাক। এই লোকটা কেমন করে তার সব কথা জানল? কে এ?

লোকটার পোশাকের দিকে এতক্ষণে চোখ গেল কার্টারের। এমন অদ্ভুত পোশাকও তো সে কস্মিনকালে দেখেনি। পোশাকটা ছেঁড়াখোড়া এবং নোংরা বটে —কিন্তু একসময় দামিই ছিল। কেমন একটা বিশ্রী দুর্গন্ধও নাকে লাগছে।

কার্টার বলল,—তুমি নিশ্চয় পাগল-টাগল বটে। যাও, বিরক্ত কোরো না।

লোকটা ওঁর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে ফের হো-হো করে হেসে বলল,—ভাগ্যলক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলতে নেই বাছা। যা বললাম, শুনলে বরাত খুলে যাবে। এখন মানা না মানা তোমার ইচ্ছা। —বলে সে হনহন করে চলতে শুরু করল এবং ঝোপঝাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

কার্টার অবাক হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তার মনে হল, দেখা যাক না ওর কথা সত্যি না মিথ্যে।

সে পার্ক থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেল জাদুঘরে। সেখানে কর্মচারীদের কাছে জিগ্যেস করে জানল, সত্যি একজন ভালো ড্রইং-জানা লোক খোঁজা হচ্ছে।

কার্টার অধ্যক্ষমশায়ের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেল।

অধ্যক্ষ বললেন,—কী চাই?

—বেন্নেস নামে এক বুড়ো ভদ্রলোক আপনার কাছে আসতে বললেন, তাই এলাম। আপনারা নাকি ড্রইং-জানা লোক খুঁজছেন। ...কার্টার জানাল।

অধ্যক্ষ ভুরু কুঁচকে বললেন,—কে বললে?

—বেন্নেস।

—বেন্নেস! সে আবার কে? কেমন চেহারা বলো তো?

কার্টার তার চেহারা ও পোশাকের মোটামুটি একটা বর্ণনা দিল। ঘরে অধ্যক্ষ এবং আরও জনাতিন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন। তাঁদের চোখেমুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে।

কার্টার বলল—আপনি কি তাঁকে চেনেন না স্যার?

অধ্যক্ষ একটু হেসে বললেন,—তুমি নিশ্চয় রসিকতা করছ, যুবক। একজন বেন্নেসকে আমি এবং এই ভদ্রমহোদয়রা চেনেন বটে, কিন্তু সে চেনাও মাত্র দিন দুই আগে। তবে...

ঘরের তিনজন ভদ্রলোকই হেসে উঠলেন। অধ্যক্ষকে থামতে দেখে কার্টার জিগ্যেস করল,—তবে কী স্যার?

অধ্যক্ষ হঠাৎ টেবিলের সামনে ঝুঁকে ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন,—এ রসিকতার অর্থ কী?

কার্টার অপ্রস্তুত হয়ে বলল,—আমি রসিকতা করিনি স্যার। সত্যি বলছি, মাত্র কিছুক্ষণ আগে ভিক্টোরিয়া পার্কে ওঁর সঙ্গে দেখা হল। ঈশ্বরের দিব্যি।

ঘরের একজন ভদ্রলোক এবার বললেন,—শোনো ভাই, ব্যাপারটা খুলেই বলি। বেন্নেস নামে একজন পুরুত ছিলেন পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে। তিনি ছিলেন ফ্যারাও তুতানখামেনের পুরুত। সম্প্রতি দুদিন হল, ডেভিস নামে এক অভিযাত্রী মিশর থেকে কিছু জিনিস এনেছেন। তাঁর মধ্যে কয়েকটা মাটির হাঁড়ি আছে। একটা হাঁড়ির ঢাকনায় ওই বেন্নেসের সিলমোহর আছে এবং ভেতরে আছে তাঁর পোশাক। রাজার শবযাত্রায় বেন্নেস সেই পোশাক পরেছিলেন। এবার বুঝতে পারছ তো, কেন অধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ হয়েছেন?

কার্টার শিউরে উঠল। সর্বনাশ! তাহলে কি সেই বেন্নেসের ভূতের সঙ্গে তার পার্কে দেখা হল? কাঁধে হাত রেখেছিল যেখানে, সেখানটায় এতক্ষণ রক্ত জমে গেছে মনে হল। এর পর অতি কষ্টে এবং কাঁপতে-কাঁপতে সে বলল,—দয়া করে আমাকে বেন্নেসের পোশাকটা একবার দেখাবেন?

পোশাক পাশের একটা টেবিলেই ছিল। ওঁরা তিনজনেই পুরাতাত্ত্বিক। পরীক্ষা করছিলেন এতক্ষণ সেগুলো।

কার্টারকে পোশাক দেখিয়ে দিতেই কার্টার অস্ফুট চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ও বইয়ের বিবরণে দেখা যায়, কার্টারকে লন্ডন জাদুঘর কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত ড্রইংয়ের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তার কাজটা ছিল এই—মিশরের 'ভ্যালি অব দি কিংস'-এ পাওয়া অজস্র ফলকের চিত্রলিপি পুরাতাত্ত্বিকেরা পেনসিলের স্কেচে নকল করতেন। কার্টার তাতে কালি বুলিয়ে স্পষ্ট করত। তারপর সেগুলো বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের কাছে পাঠোদ্ধারের জন্য পাঠানো হতো।

কার্টারের মনে মিশরের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে ক্রমশ তীব্র কৌতূহল জেগে উঠেছিল। তখন সে জাদুঘরে বসেই পড়াশোনায় মন দিল। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। চলল ১৯১৮ সাল পর্যন্ত। সেই ডামাডোলের মধ্যে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত চার বছর ধরে ড্রইং বিশারদ কার্টার মেতে রইল পুরোনো বই নিয়ে। প্রাচীন মিশর তাকে পেয়ে বসেছিল। বিশেষ করে পুরুত বেন্নেসের সেই অত্যদ্ভুত আবির্ভাব কার্টারকে রহস্যের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে মারছিল।

১৯১৭ সালে কার্টার আর স্থির থাকতে পারল না। অধ্যক্ষের সঙ্গে ততদিনে তার স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কার্টার বলল,—আমি মিশরে গিয়ে তুতানখামেনের কবর খুঁজে বের করব। আমাকে সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

অনেক সাধাসাধির পর অনুমতি পাওয়া গেল। তবে অধ্যক্ষ বললেন,—দেখো বাবা, তুমি কিন্তু পুরাতাত্ত্বিক হিসেবে পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত নও। তাই তোমাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। বরং অন্য উপায়ে সে-ব্যবস্থা করছি। তুমি আমার চিঠি নিয়ে চলে যাও মিশরে। সেখানে লর্ড কার্নারভন চার বছর ধরে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করো। তাঁর দলে থেকেই তুমি তোমার কাজ করতে পারবে।

কার্টার তাঁর চিঠি নিয়ে চলে এল মিশরে।

'ভ্যালি অব দি কিংস'-এ পাহাড়, মরু ও রুক্ষ অনুর্বর এলাকায় লর্ড কার্নারভনের তাঁবু খুঁজে বের করল। লর্ড খুশি হলেন এই মেধাবী বুদ্ধিমান যুবককে পেয়ে। দ্বিগুণ উদ্যমে তন্নতন্ন করে খোঁজ শুরু হল। যেখানে সন্দেহ হয়, সেখানেই মাটি খোঁড়া চলতে থাকে। কিন্তু তুতানখামেনের কবরের কোনও পাত্তা পাওয়া যায় না।

অথচ কার্টারের বিশ্বাস, ভিক্টোরিয়া পার্কের সেই অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনার মধ্যে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। কার্টারই একদিন না একদিন তুতানখামেনের কবর আবিষ্কার করতে পারবে।

১৯২২ সাল পর্যন্ত খোঁড়াখুড়ির কাজ চলল। কিন্তু সব নিষ্ফল হল।

লর্ড কার্নারভন এতদিনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ন-বছর ধরে পড়ে আছেন এই উপত্যকায়। অজস্র টাকাকড়ি খরচ হয়ে গেছে। লন্ডন জাদুঘরের সাহায্যও প্রচুর পেয়েছেন। কিন্তু সবই জলে গেছে। এবার বললেন,—থাক। স্বদেশে ফিরে যাই। তুতানখামেনের কবর সম্ভবত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কার্টার বলল,—যদি অনুগ্রহ করে আর একটা বছর সময় দেন, আমি কথা দিচ্ছি—তুতানখামেনের কবর আমি আবিষ্কার করবই।

লর্ড কার্নারভন বিরক্ত হয়ে বললেন,—তুমি ফ্যারাওয়ের গুপ্তধনের লোভে পাগল হয়ে উঠেছ দেখছি।

না লর্ড! —কার্টার মিনতি করে বলল,—ধনরত্নের প্রতি একটুও লোভ নেই আমার। আমি একথাও দিচ্ছি, যদি তুতানখামেনের গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারি, তার থেকে এককণাও আমি নেব না। আমাকে বিশ্বাস করুন!

লর্ড কার্নারভন শুনলেন না। পরদিনই চলে যাবেন ঠিক করলেন।

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। ভোরে মোটরগাড়ি, খচ্চর, উট আর ঘোড়ার পিঠে সব নিয়ে অনুসন্ধানী দল রওনা দেবে। রাতে কার্টার মনমরা হয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন তাঁবু ছেড়ে।

জ্যোৎস্না-রাত। আনমনে ঘুরতে-ঘুরতে কার্টার ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিসের কবরের কাছে এসে দাঁড়াল। জনহীন উপত্যকায় ফিকে জ্যোৎস্না পড়ে আছে। হঠাৎ দেখল, একটা অস্পষ্ট মূর্তি রামেসিসের কবরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

কার্টার বলল,—কে ওখানে?

অমনি নির্জন-নিশুতি রাত কাঁপিয়ে একটা অট্টহাসি শোনা গেল। কার্টার চমকে উঠেছিল। কাঁপতে-কাঁপতে বলল,—কে হাসছ এমন করে? কে তুমি?

জবাব এল,—আমি তোমার প্রাণদাতা। হাসছি তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য।

—আমার প্রাণদাতা? তার মানে?

—ভিক্টোরিয়া পার্কে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। মনে পড়ে না?

কার্টার শিউরে ওঠে। কথা জড়িয়ে যায় মুখে। কোনওরকমে বলে,—আপনি বেন্নেস?

—হ্যাঁ, আমি সেই অভিশপ্ত কিশোর ফ্যারাও তুতানখামেনের প্রধান পুরোহিত বেন্নেস। শোনো কার্টার, তুতানখামেন কিশোর বয়সে দুর্বিনীত ছিল বলে তাঁকে দেবতারা অভিশাপ দিয়েছিলেন। তার আত্মা নরকযন্ত্রণায় হাজার-হাজার বছর ধরে কষ্ট পাচ্ছে। তার মুক্তি হতে পারে, যদি কোনও জীবিত মানুষ তাঁর নামে আত্মবলি দেয়। আর শোনো...

এই পর্যন্ত শুনেই কার্টার অজ্ঞান হয়ে গেল।

যখন তার জ্ঞান ফিরল, তখন সকাল হয়ে গেছে। সূর্য উঠেছে। সে উঠে বসল। তারপর মনে পড়ল সবকথা। তখনই সেখান থেকে পালাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। লর্ড কার্নারভনের দল হয়তো রওনা দিয়েছে। কিন্তু সে-মুহূর্তে তার চোখে পড়ল, রামেসিসের কবরের তিন-চার হাত দূরে একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে এবং ফাটলের তলায় শক্ত পাথরের একটা ধাপ। ধাপে একটা মাছের রেখাচিত্র। রেখাচিত্রের মধ্যে একটা সংকেত আছে। সেই সংকেতচিহ্ন ডেভিসের পাওয়া হাঁড়ির গায়ে ছিল। তাহলে কি...

দেখামাত্র কার্টার ছুটে চলল তাঁবুর দিকে।

তখন তাঁবু গুটোনো হয়ে গেছে। লর্ডসায়েব ব্যস্ত হয়ে কার্টারকে খুঁজছেন। তার জন্যই রওনা দিতে দেরি হয়েছে।

কার্টার হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল,—পাওয়া গেছে! তুতানখামেনের কবরের খোঁজ পাওয়া গেছে!

ফ্যারাও রামেসিসের কবরের সেই ফাটলে একটা ধাপ থেকে নিচের দিকে চলে গেছে ষোলোটা ধাপ। শেষ ধাপের সামনে দেখা গেল একটা দরজা। এই সেই তুতানখামেনের সমাধিকক্ষ!

যুগ-যুগ ধরে এই সমাধিকক্ষের গুপ্তধনের কিংবদন্তি প্রচলিত। তুতানখামেনের মৃত্যুর পর নাকি প্রাসাদের সব ধনরত্ন মণিমাণিক্য তাঁর মমির সঙ্গে এখানে এনে রাখা হয়েছিল।

কেন? এর জবাবও পাওয়া যায় একটি ফলকে। দেবতাদের অভিশাপে কিশোর রাজা তুতানখামেন মারা যান। তাই পুরোহিতরা বিধান দিয়েছিলেন, রাজার প্রাসাদের সব ধনরত্নেরও অভিশাপের ছোঁয়া লেগেছে। ওই ধন যে ব্যবহার করবে, তারই

অভিশাপ লাগবে এবং সাংঘাতিক রোগের কবলে পড়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যাবে।

এতদিনে সেই অভিশপ্ত রাজার মমি ও ধনরত্নের কিংবদন্তি সত্য প্রমাণিত হতে চলেছে। লর্ড কার্নারভন এবং কার্টার তো বটেই, দলের প্রতিটি মানুষ আগ্রহে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন।

অবশেষে দরজা কীভাবে খোলা যায়, পরীক্ষা করছিল কার্টার। হঠাৎ সে চমকে উঠে বলল,—লর্ড! এই দরজা মনে হচ্ছে কোনও একসময়ে ভাঙা হয়েছিল যেন।

লর্ড কার্নারভন বিস্মিত হয়ে বললেন,—সে কী!

—হ্যাঁ লর্ড। এই দেখুন, দরজার সিলমোহরগুলো দুভাগ হয়ে আছে এবং কেউ সেই ভাঙা জায়গাটা আবার জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া কপাটের জোড়ের দিকটা লক্ষ করুন। চিড় খেয়ে আছে জায়গায়।

লর্ড কার্নারভন পরীক্ষা করে দেখে বললেন,—তাই মনে হচ্ছে, কার্টার। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে ভেতরে নিশ্চয় আর একতিল সোনাদানা তো নেই-ই, এমনকী মমিটা আছে কি না তাও সন্দেহ।

কার্টার চিন্তিতমুখে বলল,—তাহলে দরজা ভেঙে দেখা যাক কী হয়েছে।

লর্ড কার্নারভন বললেন,—কিন্তু যদি সত্যি ভেতরে কিছু না থাকে, তাহলে শেষপর্যন্ত বিশ্বের পুরাতাত্ত্বিকেরা, এমনকী লন্ডনের জাদুঘর কর্তৃপক্ষও ভাবতে পারেন—আসলে হয়তো আমরাই সব গুপ্তধন মেরে দিয়েছি এবং মিথ্যা করে রটাচ্ছি যে কারা আমাদের আগেই দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিল। তাই না কার্টার?

কার্টার ভেবে দেখে বলল,—হ্যাঁ, তাও তো বটে।

—কার্টার, ব্রিটিশ আইন অনুসারে তুতানখামেনের সবকিছুই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজকীয় সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। অতএব আমাদের মিথ্যা বদনামের ভাগী হওয়া উচিত নয়। বরং আমরা লন্ডন জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে খবর পাঠাই। তাঁদের বিশেষজ্ঞ দলটি এসে আগে দেখুন, সত্যি দরজা অনেক আগে ভাঙা হয়েছিল কি না। তারপর তাঁদের সামনেই আমরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকব এবং কী আছে দেখব। এমনটি হলে কেউ আমাদের চোর বদনাম দিতে পারবে না।

কার্টার সায় দিয়ে বলল,—ঠিক বলেছেন লর্ড। আজই টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা করি।

লোক পাঠানো হল কায়রো শহরে। সেখান থেকে টেলিগ্রাম গেল।

আর তুতানখামেনের সমাধিকক্ষের দরজায় পাহারার ব্যবস্থা হল। লর্ড কার্নারভন এবং কার্টার তো সজাগ রইলেনই। পালাক্রমে রাত জেগে প্রহরীদের দিকেও লক্ষ রাখলেন দুজনে।

চতুর্থ রাত্রে এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল।

শেষ রাত্রে ছিল লর্ড কার্নারভনের পাহারার পালা। কার্টারকে জাগিয়ে দিয়ে তিনি তাঁবুতে শুতে গেলেন।

রামেসিসের কবরের কাছে তাঁবু। লর্ড চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কার্টার যেন একটা আর্তনাদ শুনল কোথাও। একজন প্রহরীকে পাঠাল ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে। একটু পরে সে দৌড়ে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল,—লর্ডসায়েব পড়ে আছেন রামেসিসের কবরের ওপরে।

সেই শেষরাত্রে হইচই পড়ে গেল।

লর্ডসায়েবের শরীরে কোথাও ক্ষতচিহ্ন নেই। কিন্তু তিনি মারা পড়েছেন। মুখের কষায় গেঁজলার সঙ্গে রক্ত আছে। নাকেও কয়েক ফোঁটা টাটকা রক্ত।

লর্ড কার্নারভনের মৃতদেহ কায়রো শহরের মর্গে পাঠানো হয়েছিল। শবব্যবচ্ছেদ করে ডাক্তাররা মৃত্যুর কোনও কারণ খুঁজে পাননি। রিপোর্টে শুধু লিখেছেন, হার্টফেল। সম্ভবত আকস্মিকভাবে ভয় পেয়ে কিংবা উত্তেজিত হয়েই হার্টফেল করে মারা পড়েছেন।

অবশ্য তাঁর বয়স হয়েছিল। তার ওপর দশ বছর ধরে এইরকম একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায় কাটানো। স্নানাহার নিয়মিত ছিল না। নার্ভের ওপর দিনের পর দিন দশ বছর ধরে তীব্র চাপ পড়েছিল। মানসিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য দুই-ই বিচার করে বলা যায়, হার্টফেল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

সাতদিন পরে লন্ডন থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে পড়লেন। সবাই দুঁদে পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিত এবং প্রাচীন জিনিস সম্পর্কে প্রত্যেকেরই অসাধারণ জ্ঞান।

তাঁরা সমাধিকক্ষের দরজা পরীক্ষা করে বললেন,—হ্যাঁ। কয়েকশো বছর আগে কেউ বা কারা এই দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিল। বেরিয়ে এসে আবার দরজা আগের মতো আটকাবার চেষ্টা করেছে। সিলমোহরগুলো জোড়াতাড়া দিয়ে সেঁটে দিয়েছে। ডাকাত ছাড়া কে হতে পারে তারা?

বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নানা দেশের কিছু সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফারও এসেছিলেন। অনেক ছবি তোলা হল দরজার। রেকর্ড হিসেবে এ ছবির দাম আছে।

দরজা ভেঙে ফেলা হল। ভেতর থেকে ভ্যাপসা গন্ধ বেরিয়ে এল প্রথমে। তারপর ক্রমশ একটা মিঠে গন্ধ ছড়াল—বাসি ফুল কিংবা পুরোনো আতরের গন্ধের মতো। ভেতরে ঘন অন্ধকার থমথম করছে দিনদুপুরে।

পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বেলে বিশেষজ্ঞরা ভেতরে ঢুকলেন। তারপর হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে রয়েছে কিছু ডালাভাঙা বাক্স-পেঁটরা, সিন্দুক এবং মেঝের ওপর বহুমূল্য প্রাচীন কাপড়চোপড়, আর কিংবদন্তি-খ্যাত সেই সোনা-হীরা-মণি-মুক্তো! তাছাড়া রয়েছে রত্নখচিত অজস্র দেবতার মূর্তি, কারুকার্যময় পাত্র, প্রচুর ছবিও।

প্রথম ছবিটি তুলল 'ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ' পত্রিকার ফোটোগ্রাফার। সেই ছবি ক'দিন পরে ওই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। আজও তা বিভিন্ন বইপত্তরে দেখতে পাওয়া যায়।

বিস্ময়ের ঘোর কাটলে বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বললেন,—ডাকাতরা সব

ধনরত্ন নিয়ে পালাবার মুখে হঠাৎ কোনও কারণে সব ফেলে পালিয়ে গেছে। এবং বাইরের দরজাটাও আটকে দিতে বাধ্য হয়েছে, এমনকী ভাঙা সিলমোহরও জোড়া দিয়েছে—আমরা তো সেটা দেখেই এসেছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? কেন তারা এমন করে সব ফেলে পালাল?

কার্টার বলল,—আমার ধারণা, ওরা সম্ভবত প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল।

একজন বিশেষজ্ঞ বললেন,—কীসের ভয়?

কার্টার মাথা নেড়ে বলল,—জানি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আতঙ্ক ছাড়া এর কোনও ব্যাখ্যা হতে পারে না। যেন তারা কোনও অশরীরী আত্মার বিভীষিকা দেখে পালিয়ে গিয়েছিল এই ঘর থেকে।

এ ঘরে তুতানখামেনের মমি নেই। সামনে একটা ছোট্ট দরজা দেখা যাচ্ছিল। সেই দরজাটা কিন্তু অক্ষত। তার জোরে তুতানখামেনের সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা সিলমোহর।

ভাঙা হল সেটা। ভেতরে ঘুপচি একটা ঘর। ঘরের মধ্যিখানে কফিন দেখা গেল। কফিনের ভেতর তুতানখামেনের মমি। অভিশপ্ত বালকরাজা ঘুমিয়ে আছেন অনন্ত ঘুমে।

কফিনের ঢাকনাটা সোনার পাতে তৈরি। সে-বাজারে তার দাম হিসেব করা হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড! টাকার হিসেবে সে-যুগেই লক্ষাধিক টাকা।

এই দ্বিতীয় ঘরেও পোড়ামাটির পাত্রে অজস্র মণিমুক্তা ভরা। সিলমোহর ভেঙে সব গুনে তালিকা তৈরি হল।

দুই ঘরে যে ধনরত্ন পাওয়া গেল, কার্টার তার একটা মোটামুটি তালিকা করেছিল। এখনও সেই তালিকা আছে লন্ডন জাদুঘরে। কিন্তু তালিকার ধনরত্ন...

সে কথা পরে বলছি।

তুতানখামেনের মমি এবং গুপ্তধনের আবিষ্কারের খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পাঠানো হল রাজরাজড়ার উপত্যকায় পাহারা দিতে। গুপ্তধন নিয়ে যাওয়া হবে লন্ডনে।

কিন্তু সেসব কাণ্ডের আগে ঘটল বিচিত্র সব ঘটনা।

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পরস্পর তীব্র কলহ বেধে গেল। কী নিয়ে কলহ, আজ আর জানার কোনও উপায় নেই। যদিও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না কিছু।

পরস্পরের মধ্যে কলহের পরিণামে কেউ-কেউ খুনও হয়ে গেলেন। কার্টারকেও মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে উড়োচিঠি আসছিল। তাঁবুর মধ্যে সেইসব চিঠি এনে কে ফেলে রেখে যেত। কার্টার শেষপর্যন্ত ভয় পেয়ে লন্ডনে পালিয়ে গেল।

একটা ব্যাপার আঁচ করা যায়। গুপ্তধনের লোভেই যেন এসব কাণ্ড হচ্ছিল।

কিন্তু এ পর্যন্ত একটা কারণ আমরা আঁচ করতে পারি, পরের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে তা পারি না।

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে খুনোখুনির পর যাঁরা বেঁচে ছিলেন, যে-যার দেশে ফিরে

যান। তারপর অদ্ভুত রোগে ভুগে অল্প সময়েই মারা পড়েন। সমকালীন সংবাদপত্রে লেখা অছে—রহস্যময় মৃত্যু।

আর কার্টার?

এক সকালে তাকেও বিছানায় মৃত দেখা যায়। মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত। শুধু বলা হয়, হার্টফেল।

তার পাশে ডাক্তাররা লিখে রেখেছেন—সম্ভবত ভয় পেয়ে কিংবা আকস্মিক উত্তেজনায়।

কিন্তু তার চেয়েও বিচিত্র ব্যাপার, লন্ডনে শেষপর্যন্ত তুতানখামেনের গুপ্তধন বলে যে ধনরত্ন নিয়ে যাওয়া হয়, কার্টারের বেসরকারি তালিকা অনুসারে তা মাত্র শতকরা দশ ভাগ। বাকি নব্বুই ভাগ কোথায় গেল? তার কোনও পাত্তা আজও মেলেনি।

মুরারিবাবুর মোটরগাড়ি

মুরারিবাবুর গাড়ি কেনার পিছনে একটা জব্বর না হলেও ছোটখাট কারণ ছিল। আজকাল বাসে-ট্রামে ওঠা বড় সহজ কথা নয়। মুরারিবাবুর মতো বয়স্ক লোকের পক্ষে তো নয়ই।

সেদিন কসবা যাবেন মাসতুতো এক দাদার নাতির অন্নপ্রাশনে। নিউ মার্কেট থেকে কয়েকটা খেলনা কিনে এনেছেন। তার মধ্যে আছে একটা রঙিন ইয়া মোটা বল। ফুটবলেরই সাইজ প্রায়। পাতলা রবারের তৈরি। সেই বলটা মাঝে-মাঝে মাথার ওপর তুলে খোকা-খুকুরা যেমন করে তাকিয়ে দেখে, তেমনি করে দেখতে-দেখতে এসেছেন। হেসেছেন প্রচুর। খোকনের খুব পছন্দ হবে এটা। আহা, দোলনার মাথার ওপর এমন রাঙা বল ঝুলিয়ে রাখলে তিনি এখনই খোকা হতে রাজি আছেন।

হায় রে সেকাল! ছ্যা, ছ্যা, তখন এমন সব ছেলেভুলানো সেরা জিনিস ছিল কোথায়? মুরারিবাবু যে-আমলে খোকা, তখন তাঁর মাথার ওপর বড়জোর রঙিন কাগজের ফুল ঝুলিয়ে দেওয়া হতো।

আর কিছু না, কাগজের ফুল! কোনও মানে হয়? খোকা-মুরারিবাবু দৈবাৎ খুদে হাত বাড়িয়ে ওটা ছিঁড়ে নিতে পারতেন কত সহজে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে মুখে পুরে দিতেন নিশ্চয়। তার ফলটা মারাত্মক হতো না? গলায় লেগে দম আটকে ওই বয়সেই মারা পড়তেন। রাস্তার ভিড়ের মধ্যেই তিনি আঁতকে উঠলেন।

এই সুন্দর পৃথিবীর কত কিছু সেরা জিনিস দেখার সুযোগ পেতেন না, যদি ওভাবে দৈবাৎ মারা পড়তেন। তাই মানুষ বুদ্ধি করে এমন রঙিন হালকা বল বানিয়েছে

খোকা-খুকুদের জন্যে। এ তো গেলা যাবে না। কোনও রিস্ক নেই। তোফা! আজকাল মানুষের কত বুদ্ধি!

বিগলিত এবং আনন্দিত মুরারিবাবুর সামনে এই সময় এসে পড়ল একটা বাস। ভিড় ছিল, নাকি ছিল না, অত লক্ষ না করে যেই চাপতে গেছেন, হুড়মুড় করে লোকেরা নেমে এল কিংবা চাপতে গেল, মুরারিবাবু ছিটকে পড়ে রাস্তায় চিৎপাত হলেন এবং হায়, হায়, সেই সুন্দর রঙিন বলের ওপর প্রকাণ্ড একটা ভুঁড়িওলা লোকও মুরারিবাবুর মতো রোগাপটকা লোকের ধাক্কায় সশব্দে পড়ল। ব্যস!

পট-পট-পটাৎ! কিংবা ফট-ফট-ফটাস! এই রকম একটা শব্দ হল। তারপর মুরারিবাবু মাথা তুলে দেখলেন, বাসটা চলে গেছে এবং তাঁর মাথার দু-হাত দূরে পড়ে আছে কয়েক টুকরো রঙিন রবারের ছিবড়ে!

আর্তনাদ করতে গিয়ে করলেন না। শান্ত-মাথায় উঠে জামার ধুলো ঝাড়লেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন আর কখনও বাসে-ট্রামে চাপবেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় আর সেই অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে গেলেন না। ভাগ্নে বীরুকে পাঠিয়ে দিলেন। খোকার জন্যে কেনা বাকি খেলনাগুলো তো পৌঁছে দেওয়া দরকার।

মুরারিবাবুর গাড়ি কেনার কারণ হল এই।...

হ্যাঁ, মুরারিবাবু ঝোঁকের মাথায় তারপর একটা মোটরগাড়িই কিনে ফেললেন। মল্লিকবাজারে পুরোনো মোটরগাড়ি কেনা-বেচার দালালি করেন ভোঁদা মিত্তির। মুরারিবাবুর সহপাঠী ছিলেন কলেজজীবনে। পুরোনো মোটর পার্টসের একটা দোকানও আছে ভোঁদা মিত্তিরের। তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন, নতুন গাড়ি কেনার অনেক হাঙ্গামা আজকাল। পারমিটের জন্য লাইন দিয়ে হাপিত্যেস করতে হয়। তুমি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কেনো। দামও কম পড়বে। পারমিটেরও হাঙ্গামা হবে না।

যে গাড়িটা কিনলেন, সেটা একটা ল্যান্ডমাস্টার, বেশ জব্বর গাড়ি। ড্রাইভার রাখতে হল। তার নাম ছিল মুকুন্দলাল। খুব পাকা ড্রাইভার।

মুরারিবাবু দিনকতক ভাগ্নে বীরু আর রাঁধুনি জটিলকে নিয়ে হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে জি. টি. রোড, কখনও বোম্বে রোড হয়ে ঘোরাঘুরি করতে থাকলেন। মুকুন্দ অবাক হয়ে ভাবল,—বাবুর কি মাথা খারাপ? আপিস নেই, ব্যবসাপাতি নেই অথচ খামোকা তেল খরচ করে সেই বর্ধমান, নয়তো ওদিকে কোলাঘাট অবধি ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন।

কখনও মুরারিবাবু পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীদেরও হাওয়া খেতে নিয়ে যেতেন। প্রতিবেশীরা আর তাঁর আড়ালে নিন্দামন্দ করতেন না। প্রায়ই মুরারিবাবুকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছিলেন। মুরারিবাবুর পাড়াজুড়েও সুনাম। এরপর ক্রমশ পাড়ায় যখন যার গাড়ি দরকার, মুরারিবাবুর কাছে এসে ধরনা দিয়েছে।

কিন্তু পেট্রোলের যা দাম আজকাল! কাঁহাতক আর এ উপকার করা যায়? মুরারিবাবু শেষটায় খুব ব্রিবত বোধ করছিলেন। ড্রাইভারের মাইনে আর তেলের খরচে ব্যাঙ্কে জমানো টাকাকড়ি ফুরিয়ে ফতুর হয়ে যাবেন যে!

তখন একদিন ভাগ্নে বীরু আর রাঁধুনি জটিলকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন। বীরু বলল,—এক কাজ করুন মামা। আমি নিজেই ড্রাইভিং শিখে নিই। তাহলে খামোকা মুকুন্দকে আর রাখার দরকার হবে না। আমিই আপনার ড্রাইভার হব।

মুরারিবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন,—তুই গাড়ি চালাবি? রক্ষে কর বাবা! কবে কোথায় অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে...আঁতকে উঠে কথা বন্ধ করে তিনি আধমিনিট চোখ বুজে বসে সম্ভবত দুর্গানাম জপ করে নিলেন।

জটিল বলল,—বরং এক কাজ করুন বাবুমশাই! আপনিই নিজে গাড়ি চালানো শিখুন। আপনি বিচক্ষণ মানুষ। ঠান্ডা মাথা। আপনি নিজে গাড়ি চালানো শিখলে কোনও বিপদের ভয় থাকবে না।

পরামর্শটা মনঃপূত হল মুরারিবাবুর। বীরু বিরসমুখে চলে গেল নিজের ঘরে। মুরারিবাবু ভাবলেন,—ঠিকই তো। বীরু ছেলেমানুষ। গোঁয়ার্তুমি করাটা ওর পক্ষে স্বাভাবিক। তার চেয়ে আমি প্রবীণ মানুষ। আমি হুঁশিয়ার হয়ে গাড়ি চালাতে পারব।

মুরারিবাবু মুকুন্দের কাছে গাড়ি চালানো শিখতে শুরু করলেন। মুকুন্দ টের পাচ্ছিল, এবার তার চাকরি যাবে। তা যাক। ড্রাইভারের চাকরি পেতে অসুবিধে নেই। তাছাড়া এই বাবুমশাইটি যা খামখেয়ালি! রোজ খামোকা বর্ধমান-কোলাঘাট করে তাকে নাকাল করে ছাড়ছেন। এবার নিজে গাড়ি চালানো শিখে বুঝবেন ঠ্যালাটা। মুকুন্দ নেহাত লজ্জায় চাকরি ছেড়ে যেতে পারছিল না।

রোজ ভোরবেলা গড়ের মাঠে গিয়ে চালানোর তালিম নিতে থাকলেন মুরারিবাবু।

মাস তিনেক পরে রাস্তায় ভিড়েও মুরারিবাবু গাড়ি চালাতে চেষ্টা করেন। তাঁর পাশ ঘেঁষে বসে থাকে মুকুন্দ। দরকার বুঝলে সে হাত লাগাবে।

এই করে শেষপর্যন্ত মুরারিবাবু দিব্যি গাড়ি চালানো শিখে নিলেন। লাইসেন্সও জোগাড় করে ফেললেন। তাঁর ক্রিমরঙের ল্যান্ডমাস্টারের সামনে ইংরেজি হরফে লাল রঙের 'এল' অর্থাৎ নতুন লাইসেন্স মার্কা ঝুলিয়ে পাইকপাড়া থেকে কসবা, কসবা থেকে ক্যানিং করে ঘুরে বেড়ালেন।

তারপর যথারীতি মুকুন্দকে জবাব দিলেন। এবার থেকে একা গাড়ি চালাতে আর কোনও অসুবিধে হল না।

কিন্তু তাঁর বিচক্ষণ ড্রাইভিং-হাত হলে হবে কী? ওই যেসব কল্পিত যমের মতো প্রকাণ্ড লরিগুলো হরদম আনাগোনা করছে রাস্তায়! তাদের সঙ্গে টক্কর বাঁচিয়ে চলা কি সহজ কাজ?

একদিন বাধল টক্কর। হাওড়া ব্রিজের মুখে একটা লরি পেছন থেকে মুরারিবাবুর গাড়িকে ধাক্কা মারল। গাড়ি গিয়ে থামে লাগল। ইঞ্জিন প্রায় হাড়গোড় ভেঙে অক্কা পেল।

কিন্তু মুরারিবাবুর বরাত। ব্রেক কষেছিলেন সঙ্গে-সঙ্গে, কিংবা লরির ড্রাইভারই ব্রেক কষেছিল, অল্পের জন্য মুরারিবাবু রক্ষা পেলেন। কাচের টুকরোয় কপাল ও

কান কেটে গেল। স্টিয়ারিং-এর ধাক্কা বুকে লাগলেও আশ্চর্য, মুরারিবাবুর ফুসফুস আর কলজের জোর আছে বলতে হয়, খুব একটা জখম হলেন না। হাসপাতালে ফার্স্ট এড দিয়েই ছেড়ে দিলেন ডাক্তার! খবর পেয়ে বীরু ছুটে গিয়েছিল। রিকশো চাপিয়ে মামাকে বাড়ি নিয়ে এল।

সবাই ভেবেছিল, মুরারিবাবু আর গাড়ির কাছ মাড়াবেন না। কিন্তু কোথায় কী? একবার অ্যাকসিডেন্ট ঘটে তাঁর সাহস বরং বেড়ে গেল বুঝি। আরে বাবা, গাড়ি থাকলেই অ্যাকসিডেন্ট হয়। ধড় থাকলে যেমন মাথা থাকে। তেমনি।

ভোঁদা মিস্তিরের একটা গ্যারেজও ছিল। ল্যান্ডমাস্টারটা সারাতে গেলে ভোঁদাবাবু বললেন,—শোনো মুরারি, তোমার এই গাড়ির যা অবস্থা হয়েছে, অনেক খরচ পড়ে যাবে। বরং এটা যা হোক দামে ঝেড়ে দাও। তোমাকে আমি আরও সস্তায় এর চেয়ে মজবুত এবং হালকা একটা গাড়ি দিচ্ছি। গাড়িটা পুরোনো মডেলের। আকারেও ছোট। ছোট বলেই সুবিধে। ফাঁক গলিয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা হবে। গলিটলিতেও ঢোকা যাবে।

মুরারিবাবু ভেবেচিন্তে রাজি হলেন।

গাড়িটা কালো রঙের একটা পুরোনো মডেলের ফোর্ড। পাদানি আছে। তেলখরচ কমে। লম্বা-চওড়ায় যা আকার, খেলনা গাড়ি বলে মনে হবে।

তা হোক। অত প্রকাণ্ড ল্যান্ডমাস্টারের চেয়ে এই জিনিসই ভালো। যেমন পক্ষী, তেমন বাসা।

মুরারিবাবু আরও খুশি হলেন ভোঁদা মিস্তির মাত্র সাড়ে তিনহাজার টাকায় গাড়িটা বেচতে চান শুনে।

গাড়িটা গ্যারেজের কোণার দিকে রাখা ছিল। ঝুল জমেছিল আষ্টেপৃষ্ঠে। গ্যারেজের মিস্ত্রিরা ঝেড়ে-পুঁছে চকচকে করে দিল। মুরারিবাবু স্টার্ট দিয়েও দেখে নিলেন.। হ্যাঁ, এ যেন বাঘের বাচ্চা। চাপা গরগর আওয়াজ তুলে গুলতির মতো ছুটতে চায়।

মুরারিবাবু গ্যারেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সস্নেহে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছেন। মিস্ত্রিরা আবার একদফা কলকবজা পরীক্ষা করছে, এমন সময় কালিঝুলি মাখা প্যান্টশার্ট পরা অন্য একজন মিস্ত্রি তাঁর কাছে এল।

সে চাপা গলায় বলল,—বাবু কি ওই গাড়িটা তাহলে কিনছেন?

কিনছি মানে? —মুরারিবাবু অবাক হয়ে বললেন। —কিনে ফেলেছি। কেন বলো তো?

—বাবু, গাড়িটার সব ভালো। কিন্তু একটা দোষ আছে।

—দোষ! কী দোষ?

—মাঝে-মাঝে গাড়িটার মাথায় যেন ভূত চাপে।

মুরারিবাবু চমকে উঠে বললেন,—ভূত চাপে? তার মানে?

সে ফিসফিস করে বলল,—মাঝে-মাঝে দেখেছি, রাতের বেলা গাড়িটা গ্যারেজে

থাকে না। চুপিচুপি বেরিয়ে যায়। তারপর ভোরবেলা ফিরে আসে। আমি এই ঘরটায় থাকি না। ঘুম-টুম বিশেষ হয় না আমার। তাই গরগর চাপা আওয়াজ এলেই সব টের পাই!

মুরারিবাবু সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন,—বলো কী? তাহলে নিশ্চয় কেউ চালিয়ে নিয়ে কোনও কাজে বেরিয়ে যায়।

না বাবু। তা নয়। —বলে মিস্ত্রি জোরে মাথা নাড়ল।

মুরারিবাবু বললেন,—অসম্ভব। নিশ্চয়ই কেউ নিয়ে যায়। আজকাল গাড়ি চুরি করে ডাকাতরা ডাকাতি করতে যায়। তেমনি কোনও ব্যাপার দেখে থাকবে। এক্ষেত্রে ডাকাতরা গাড়িটা ফেরত দিয়ে যায়, এই যা।

মিস্ত্রি বলল,—না বাবু। গেট তো তালাবন্ধ থাকে। তা ছাড়া, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, গাড়িতে ড্রাইভার থাকে না। আর গেটটাও আপনা-আপনি খুলে যায়। গাড়িটা চলে গেলে আবার গেট যেমন ছিল তেমনি বন্ধ।

মুরারিবাবু এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। এই মিস্ত্রিটার নিশ্চয় রাগ আছে মালিক ভোঁদা মিত্তিরের ওপর। হয়তো মাইনেকড়ি বেশি চায়।

কিংবা, নির্ঘাত আফিম বা গাঁজা খায়। নেশার ঘোরে ওই আজগুবি ব্যাপার দেখে।

মিস্ত্রি বলল,—হাসছেন বাবু? পরে কিন্তু কাঁদতে হবে। যাই হোক, মিত্তিরবাবুকে দয়া করে বলবেন না। আপনার ভালোর জন্য বললাম।

তার করুণ মুখ দেখে অগত্যা মুরারিবাবু ঠিক করলেন, কথাটা বলবেন না ভোঁদাবাবুকে। মিস্ত্রিটা নিশ্চয় গরিব। চাকরি খেয়ে লাভ কি? নেশার ঘোরে যা দেখেছে, সরল মনে বলতে এসেছে।

কিছুক্ষণ পরে মুরারিবাবু গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। চমৎকার গাড়ি। মাঝে-মাঝে এর মাথায় ভূত চাপার কোনও লক্ষণই দেখলেন না।

নিচের তলায় একটা গ্যারেজ বানিয়ে দিয়েছিলেন বাড়িওলা। সেই গ্যারেজে গাড়িটা ঢুকিয়ে তালা আটকালেন। সন্ধে হয়ে এসেছে। এখন আর কোথাও বেরিয়ে লাভ নেই। সকাল হোক, তখন বেরুবেন। কল্যাণী অবধি ঘুরে আসা যাবে। বেশ গরম পড়েছে শহরে। তার ওপর ভিড়। কল্যাণীর মাঠে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আসবেন। নিরিবিলি কোথাও একটু বসবেন। ভাবতেও খুশিতে রোমাঞ্চ জাগছিল।

সেই খুশিতে চোখে আর ঘুমই আসে না সে রাতে।

পুবের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে নিচের উঠানমতো জায়গায় একপাশে গ্যারেজটা দেখা যায়। সিঁড়ির মাথায় বাল্‌বটা মোটে চল্লিশ ওয়াটের। আলো সামান্যই। তেরচা হয়ে একটুখানি আবছা আলো গ্যারেজের কিনারা অবধি পৌঁছয়। মাঝে-মাঝে ব্যালকনি থেকে তিনি নিচের গ্যারেজটা দেখছিলেন।

কখন সকাল হবে, সেই প্রতীক্ষায় অস্থির। ঘুম আসতেই চায় না।

রাত বারোটা নাগাদ বিছানায় গড়িয়ে সবে চোখ বুজেছেন, হঠাৎ মনে হল, নিচে চাপা গরগর শব্দ হচ্ছে। তখন চোখ খুলে কান পাতলেন মুরারিবাবু।

ভাবলেন, রাস্তায় কোনও গাড়ি যাচ্ছে, তারই শব্দ।

কিন্তু শব্দটা তো দূরে সরে যাচ্ছে না।

তারপর কঁ্যা অঁ্যা অঁ্যাচ এবং ঘটঘট্টাং...গেট জোরে আচমকা খুললে যেমন শব্দ হয়।

তখন বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন মুরারিবাবু। গাড়িচোর নয় তো? তক্ষুনি ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন।

উঁকি মেরেই অবাক হলেন মুরারিবাবু।

গ্যারেজের গেট খুলে গেছে এবং তাঁর গাড়িটা বেরিয়ে উঠোনে এগিয়েছে এবং পিছিয়ে যাচ্ছে বাড়ির বড় গেটের দিকে। তারপর বড় গেটটা খুলে গেল। ঘট ঘট্টাং...ঘং ঘং ঘং...

গাড়ি সেখানে যাওয়ার পর মুরারিবাবুর মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুল। হেঁড়ে গলায় প্রচণ্ড চেঁচিয়ে উঠলেন,—চোর! চোর! চোর!

দেখতে-দেখতে হুলুস্থূল-হইচই শুরু হয়ে গেছে। বীরু আর জটিল দৌড়ে এসেছে এবং কিছু না বুঝেও মুরারিবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে চ্যাঁচাতে শুরু করেছে,—চোর! চোর! চোর!

মুরারিবাবু ততক্ষণে টের পেয়েছেন, শুধু চোর বলাটা ঠিক হচ্ছে না। অমনি চ্যাঁচাতে থাকলেন,—গাড়িচোর! গাড়িচোর! গাড়িচোর!

জটিল শুনল বাড়িচোর। সে বাজখাঁই আওয়াজে পাড়া মাথায় করে চ্যাঁচাতে শুরু করল,—বাড়িচোর! বাড়ি চুরি করে পালাচ্ছে।

প্রতিবেশীরাও ঘুম ভেঙে যে যার ঘর থেকে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন। জটিলের চিৎকার জোরে শোনা যাচ্ছে এবং বাড়িচোর শুনে তাঁরাও বলছেন,—বাড়িচোর! বাড়ি চুরি করে পালাচ্ছে—এ—এ—এ!

আশেপাশের বাড়ি এবং ক্রমে সারা পাড়া থেকে লোকেরা বেরিয়ে পড়ল। লাঠিসোঁটা কাটারি বঁটি কয়লা ভাঙা হাতুড়ি—যে যা পেরেছে নিয়ে বেরিয়েছে। একজনের হাতে ক্রিকেট ব্যাটও দেখা গেল।

ততক্ষণে সাহস পেয়ে মুরারিবাবু নিচে নেমেছেন। হ্যাঁ, বড় গেট বন্ধ। গ্যারেজের গেটও বন্ধ। তালাও আটকানো আছে। আর গাড়ি?

কী মুশকিল! গাড়িটাও তো আছে। বহাল তবিয়তে আছে। যেমন রেখেছিলেন, তেমনি।

তাহলে কী দেখলেন তখন? স্বপ্ন?

অসম্ভব। মুরারিবাবু দিব্যি জেগে ছিলেন এবং ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

গতিক বুঝে চেপে গেলেন মুরারিবাবু।

সবার প্রশ্নের জবাবে বললেন,—হ্যাঁ, চোর ঢুকেছিল গেট ডিঙিয়ে। ভাগ্যিস আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই ব্যাটা পালাল।

সবাই চোরের কথা আলোচনা করতে-করতে যে যার বাড়িতে ফিরে গেল। সত্যি, পাড়ায় আজকাল মাঝে-মাঝে চুরি তো হচ্ছে।

মুরারিবাবু কিন্তু ব্যাপারটার মাথামুন্ডু খুঁজে পাচ্ছেন না। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবেন কেমন করে?

ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কখন। ঘুম ভাঙল ভোরের দিকে। টেবিলল্যাম্প জ্বেলে অভ্যাসমতো ঘড়ি দেখে নিলেন। চারটে কুড়ি বেজেছে। ঠিক পাঁচটায় বিছানা ছেড়ে ওঠা ইদানীং অভ্যেস। আর চল্লিশটে মিনিট চোখ বুজে কাটাবেন ভাবলেন।

কিন্তু সেই সময় আবার নিচে গরগর শব্দ।

গেট খোলার ক্যাঁ...অ্যাঁ...চ! ঘট...ঘট...ঘটাং! ঘঙ ঘঙ!

লাফিয়ে উঠে ব্যালকনিতে গেলেন মুরারিবাবু। তারপর সবিস্ময়ে দেখলেন, বড় গেট আপনা-আপনি খুলেছিল, সদ্য বন্ধ হচ্ছে এবং তাঁর কালো খুদে ফোর্ড গাড়িটা পিছু হটে গ্যারেজে ঢুকছে। গ্যারেজের গেটও খুলে রয়েছে। গাড়িটা পিছু হটে ভেতরে ঢুকতেই গেট আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি, না সত্যি জেগে আছি? মুরারিবাবু এই ভেবে নিজের চুল টানলেন। না, দিব্যি ব্যথা করছে।

তারপর কান টেনে দেখলেন, হুঁ, কানও ব্যথা করছে।

নিজেকে কাতুকুতু দিলেন। কাতুকুতু এমন জিনিস, না হেসে পার নেই। তাই খিকখিক করে হেসে উঠলেন।

তারপর গম্ভীর হলেন। হাসির কথা নয়। নির্ঘাত তাঁর কোনও গুরুতর অসুখ-বিসুখ হয়েছে। মানসিক ব্যাধি যাকে বলে। কোনও সাইক্রিয়াট্রিস্ট বা মনোচিকিৎসকের কাছে যাওয়া দরকার। 'হ্যালুখিনেশান' বা ভ্রমদর্শন নামে একরকম উৎকট ব্যাধি আছে নাকি। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে মানুষ বিস্তর ভুলভাল দেখতে পায়।

অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে উঠলেন মুরারিবাবু।

কিন্তু সকালের উজ্জ্বল আলোয় সেই অস্বস্তিটা নিমেষে চলে গেছে মুরারিবাবুর। রাতের ভুতুড়ে ব্যাপারটা দিনের আলোয় স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে। স্বপ্নটা বেয়াড়া, এই যা। ডাক্তার-টাক্তার দেখাতে গেলেই আজকাল হাঙ্গামা। কাঁড়ি-কাঁড়ি ওষুধ গিলতে হবে। হয়তো বলবেন,—হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে মুরারিবাবু!

তাও সাধারণ হাসপাতাল হলে কথা ছিল। মানসিক হাসপাতাল যে কী সাংঘাতিক, তা কি তিনি জানেন না? ওরে বাবা, সেখানে যত রাজ্যের পাগল থাকে।

মুরারি ব্রেকফাস্ট খেয়ে গ্যারেজে গেলেন। বীরু ও জটিলকে বলে গেলেন,—কল্যাণী যাচ্ছি। কল্যাণীতে রাধাকান্তর বাড়িও একবার যেতে পারি। বুঝলি বীরু? অনেকদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। যদি দেখিস, সন্ধ্যা নাগাদ ফিরলাম না, তোরা জানবি রাত্তিরে রাধাকান্তর ওখানেই আছি।

গ্যারেজে কালো গাড়িটার মধ্যে এতটুকু ভৌতিক ব্যাপার নেই। খাঁটি একটি মোটরগাড়ি বলতে যা বোঝায়, তাই!

দিব্যি স্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল। মানে—মুরারিবাবুই চালাচ্ছেন। নিজে থেকে চলবে কোন আক্কেলে? ও তো যন্ত্র মাত্র। যেদিকে চালানো যাবে চলবে। দাঁড় করালে দাঁড়াবে। মানুষের হাতে তার যত জারিজুরি। মানুষ নইলে সে একেবারে অচল জড়বস্তু মাত্র।

মুরারিবাবু মনের সুখে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কল্যাণী পৌঁছতে ঘণ্টা দেড়েকও লাগল না।

প্রথমে কিছুক্ষণ বিশাল এলাকায় অজস্র রাস্তা দিয়ে চক্কর মেরে বেড়ালেন। কখনও কোনও গাছতলায় থেমে উদাসমনে দিগন্ত দেখতে থাকলেন। গুনগুন করে গান গাইতেও ছাড়লেন না।

দুপুর নাগাদ খিদে পেলে তখন রাধাকান্তবাবুর বাড়ি চললেন।

বাড়িটা তাঁর চেনা। পিছনে ফাঁকা বিশাল মাঠের ওপাশে গঙ্গা! একটেরে ভারি সুন্দর জায়গায় বাড়ি করেছেন রাধাকান্তবাবু। মুরারিবাবুর অফিসের সহকর্মী ছিলেন ভদ্রলোক। একই সঙ্গে অবসর নিয়েছেন চাকরি থেকে। গোলমাল হইচই পছন্দ করেন না বলে এবং কম দামে জমি পেয়ে এতদূরে বাড়ি করেছেন।

দুই বন্ধুতে প্রচুর সুখদুঃখের কথা হল। আহারাদিও হল ভালোরকমের। তারপর বিকেলে গাড়ি চাপিয়ে রাধাকান্তবাবু এবং তাঁর বাড়ির সবাইকে সারা এলাকা ঘোরালেন।

রাধাকান্তাবাবু তাঁকে রাতে থেকে যেতে বলবেন, সে তো জানা। কিন্তু মুরারিবাবু খেয়ালি এবং গোঁ-ধরা মানুষ বরাবর।

হঠাৎ মাথায় ঝোঁক চেপে গেল, কলকাতা ফিরবেন।

তখন সন্ধে হয়ে আসছে। সাড়ে ছটা বাজে। রাধাকান্তবাবু পথে ডাকাতের ভয় দেখিয়েও কাবু করতে পারলেন না মুরারিবাবুকে।

মুরারিবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

কাঁচরাপাড়া পৌঁছতে বড়জোর আধঘণ্টা লাগার কথা। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন, সম্ভবত রাস্তা ভুল করে ফেলেছেন। দু-ধারে বিরাট সব গাছ! ফাঁকা মাঠের মধ্যে দূরে-দূরে কোনও বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী?

আন্দাজ করে এগিয়ে এক জায়গায় বাঁ-দিকে মোড় নিলেন।

কিন্তু চলেছেন তো চলেছেন। সেই দুধারে বড়-বড় গাছ, ফাঁকা মাঠ এবং আলোজ্বলা বাড়িগুলো এবার অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে।

আবার ডাইনে ঘুরলেন। এ-রাস্তার ধারে কোনও ল্যাম্পপোস্টই নেই। ঘন অন্ধকার জমেছে ততক্ষণে। হেডলাইটের আলোয় শুধু ঝোপঝাড় আর মাঝে-মাঝে ইটখোলা ভেসে উঠছে। কিন্তু কোথাও জনপ্রাণীর দেখা নেই। ঘড়ি দেখলেন, আটটা বাজছে।

এবার একটু অস্বস্তি হল মুরারিবাবুর। দূরে একটা আলো-জ্বলা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। সেদিকেই এগিয়ে চললেন। বাড়িটা ওই রাস্তার ধারে বলেই মনে হচ্ছিল।

কিন্তু যত যাচ্ছেন, বাড়িটার দূরত্ব যেন একই থেকে যাচ্ছে। স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছেন গাড়ির। মনে হচ্ছে, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলেরও বেশি গতি, এ গাড়ির পক্ষে এই গতিই চরম। ইঞ্জিন গরম হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে গেলে বিপদে পড়তে পারেন। তাই একটু সংযত হলেন মুরারিবাবু।

তারপর হঠাৎ একসময় একটা ব্যাপার তিনি টের পেয়ে শিউরে উঠলেন।

গাড়িটা আর যেন তাঁর আয়ত্তে নেই। আপনা-আপনি চলছে। স্পিড কমাতে গিয়ে টের পেলেন, কমল না।

ব্রেক কষলেন ভয় পেয়ে। আশ্চর্য, ব্রেক কষা গেল না!

স্টিয়ারিংটাও যেন অন্য কেউ ধরে আছে। কারণ, সামনে বাঁক দেখে তিনি ঘোরাবার জন্য তৈরি হতে-না হতে স্টিয়ারিং নিজে থেকে ঘুরতে শুরু করল। তখন আঁতকে উঠে হাত সরিয়ে নিলেন।

আশ্চর্য এবং আশ্চর্য! পরমাশ্চর্য! স্টিয়ারিং যেখানে যেমন ঘোরার ঘুরছে। কোথাও গাড়িটা ধাক্কা খাচ্ছে না।

তারপরই ঘটল আরও অদ্ভুত ব্যাপার। আচমকা একটা ব্রিজের আগে ভাঙাচোরা জায়গায় গাড়িটার ব্রেক আপনা-আপনি শব্দ তুলে গতি সামলানো হল এবং জায়গাটা পেরিয়ে ব্রিজে ওঠার পর ঘ্যাঁচ করে গিয়ার টানার শব্দ উঠল। মুরারিবাবু গিয়ারেও হাতটা ঠেকাননি। অথচ...

মুরারিবাবুর শরীর হিম হয়ে গেল।

তবু মাথা ঠান্ডা রেখে বসে রইলেন। স্টিয়ারিং, ব্রেক, গিয়ার আয়ত্তে আনার শেষ চেষ্টা করলেন। পারলেন না। যেন কোনও অদৃশ্য ড্রাইভার তাঁরই জায়গায় বসে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এমনি ভয় পেয়ে বাঁদিকে সরে গিয়ে বসলেন। ড্রাইভারের জায়গা ফাঁকা রইল।

আর অশরীরী সেই ড্রাইভার স্টিয়ারিং দরকারমতো ঘুরিয়ে এবং গিয়ারে মাঝে-মাঝে শব্দ তুলে গাড়িটাকে নিয়ে চলল কোথায়?

মুরারিবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছিল। হঠাৎ দেখলেন, সামনে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা যাচ্ছে এতক্ষণে। তারপর দেখলেন, ওটা একটা লরি। প্রচণ্ড বেগে আসছে। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় তার আলোয় মুরারিবাবু দেখতে পেলেন, স্পষ্ট দেখলেন—স্টিয়ারিংয়ের সামনে তাঁর পাশে মাত্র এক ফুট তফাতে কে যেন বসে আছে। তার মুখে দাড়িগোঁফ আছে যেন। আর পোশাকটা বিলিতি বলেই মনে হল। মুখটা লালচে রঙের। এবং সেই অশরীরী ড্রাইভার যে একজন সায়েব, তাতে কোনও ভুল নেই।

মুরারিবাবুর আর মাথার ঠিক রইল না। গোঁ-গোঁ করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

মুরারিবাবু যখন চোখ মেলে তাকালেন, তখন সকাল হয়েছে। অভ্যাসমতো তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বসলেন।

তারপর অবাক হয়ে গেলেন। ভেবেছিলেন, নিজের ঘরেই ঘুমোচ্ছিলেন আজ উঠতে বেলা হয়ে গেছে, এই যা। ঘুম থেকে তুলে দেয়নি বলে জটিলকে একচোট নেবেন ভেবে পা বাড়াতেও যাচ্ছিলেন।

কিন্তু, ও হরি! এ তো তাঁর নিজের ঘর নয়। জানলা দিয়ে বাইরের যতখানি নজরে আসছে, মনে হচ্ছে খুব জঙ্গুলে জায়গা। পাখপাখালি ডাকছে। গাছপালাও দেখা যাচ্ছে খুব ঘন। আর ঘরের ভেতর কেমন একটা পুরোনো-পুরোনো ভাব। প্রকাণ্ড লোহার খাটের ওপর পুরু নারকেল ছোবড়ার গদি, তার ওপর ছেঁড়াখোড়া তোশক এবং তার ওপর পাতা চাদরটাও ময়লা। মুরারিবাবু উল্টে-পাল্টে দেখে নিলেন। বিকৃত মুখে বসে রইলেন। ছ্যা-ছ্যা!

ঘরের কোণায় একটা আয়না বসানো টেবিল। একটা সেকেলে ঢাউস আরামকেদারা, রেল স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে যেমন থাকে।

আর দেয়ালে একটা মস্ত ঘড়ি। ঘড়ির দোলকটা টকটক শব্দ করে দুলছে। বাজছে সাড়ে সাতটা।

এবার সব মনে পড়ল মুরারিবাবুর। রাতের সেই অত্যদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনা স্পষ্ট ভেসে উঠল চোখের সামনে। কিন্তু এখন উজ্জ্বল রোদে ভরা সকালের পৃথিবীতে তিনি অনেক সাহসী হয়ে উঠেছেন। তাই গটগট করে হেঁটে দরজা খুলে বেরোলেন। আশ্চর্য ব্যাপার এই দরজাটা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল। কে বন্ধ করেছিল?

বেরিয়ে বুঝলেন, রীতিমতো জঙ্গলের মধ্যিখানে এটা একটা ডাকবাংলো। একটা কাঠের ফলকে লেখা আছে—মোহনপুর ফরেস্ট বাংলো।

সর্বনাশ! মোহনপুর ফরেস্ট! কোথায় কলকাতা, কোথায় কল্যাণী, আর কোথায় তাঁকে আনা হয়েছে? এ একেবারে কেষ্টনগর এলাকায় এসে পড়েছেন, বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি বললেও চলে।

মোহনপুর ফরেস্টের কথা কতবার শুনেছেন মুরারিবাবু। এটা নাকি সরকারি অভয়ারণ্য। হরিণ-টরিণও আছে। হরিণ থাকলে বাঘ থাকবে না, তা কি হয়? আর বাঘ যদি থাকে, ভাল্লুকই বা থাকবে না কেন? কথায় বলে না বাঘ-ভাল্লুক?

তবে মুরারিবাবু এবার তাঁর ভুতুড়ে কালো রঙের খুদে ফোর্ড গাড়িটাও দেখতে পেয়েছেন। ঘাস আর আগাছায় ভরা লনের কোণায় একটা গাছের তলায় গাড়িটা রয়েছে। দেখেই হনহন করে এগিয়ে গেলেন কাছে।

গাড়িটা দিনের আলোয় দিব্যি ভালোমানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কোনও দুষ্টুমি বা ভূতে পাওয়া বদমাইশির বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই।

যেন ছুঁলেই ফোসকা পড়বে, এমন সাবধানি ভঙ্গিতে মুরারিবাবু তার গায়ে হাত ঠেকালেন। বুঝে নিলেন, স্বপ্ন না সত্যি।

জ্বলজ্যান্ত সত্যি। হ্যাঁ—দিনের বেলা গাড়িটার ভুতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার থাকে না। অতএব চালিয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না।

মুরারিবাবু উঠে বসে স্টার্ট দিতে চেষ্টা করলেন। স্টার্ট নিল না। কয়েকবার চেষ্টার পর তেলের কাঁটার দিকে চোখ পড়তেই চমকালেন। একফোঁটা তেল নেই গাড়িতে। তাহলে উপায়? তাঁকে এই জঙ্গল থেকে পায়ে হেঁটে বেরুতে হবে ভেবে ভাবনায় পড়ে গেলেন। মনে-মনে সেই অশরীরী ড্রাইভারকে গালমন্দ করতে থাকলেন। সবটুকু তেল পুড়িয়ে খামোকা এই জঙ্গলে বাংলোয় তাঁকে নিয়ে আসার কোনও মানে হয়? আরে বাবা, এতই যদি গাড়ি চালানোর শখ, তাহলে সোজা কলকাতা নিয়ে গিয়ে তুললি নে কেন?

পরক্ষণে মনে পড়ে গেল, অশরীরী ড্রাইভারটা যে রীতিমতো সায়েব! তখন মুরারিবাবু মুখ ফুটে তার উদ্দেশে ইংরিজিতে বলে উঠলেন,—গো টু হেল! ইউ স্টুপিড ঘোস্ট!

অমনি বাংলোর বারান্দা থেকে আওয়াজ এল,—হ্যাল্লো ব্যাবু! গুড মর্নিং। হাউ ডু য়ু ডু?

তারপর মুরারিবাবু ছানাবড়া চোখে দেখলেন, এক বুড়ো লালমুখো সায়েব বগলে টুপি আর হাতে ছড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন।

মুরারিবাবুর সব সাহস পিদিমের মতো ফস করে নিভে গেল। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন,—গুড মর্নিং স্যা-স্যার।

—আর য়ু অলরাইট ব্যাবু?

—ই-ইয়েস স্যা-স্যার।

—দেন প্লিজ কাম। দা ব্রেকফাস্ট ইজ রেডি। য়ু আর মাই অনারেবল গেস্ট।

বলে কী! আমি ওর সম্মানিত অতিথি! সকালের খানা খেতে ডাকছে যে! মুরারিবাবু ভাবনায় পড়ে গেলেন। ওই সায়েবই যে রাতের সেই অশরীরী ড্রাইভার, তাতে কোনও ভুল নেই। তার মানে এখন মুরারিবাবু দিনদুপুরে একটি জলজ্যান্ত সায়েব ভূতকে দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর ইংরেজিতে বাক্যালাপও হচ্ছে। কিন্তু ভূতের সঙ্গে এক টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট খাওয়া? ওরে বাবা!

কে জানে কী খাওয়ার আয়োজন করেছে। সায়েব হোক, আর দিশি হোক, ভূত ইজ ভূত। ভূতরা ভুতুড়ে খাবারই খাবে। তাদের হজম হবে বা সুস্বাদু লাগবে বলে মানুষেরও হজম হবে বা সুস্বাদু লাগবে—এমন কথা নেই। পেটের গণ্ডগোল হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাদটাও বিচ্ছিরি না হয়ে পারে না।

তাঁর দেরি হচ্ছে দেখে সায়েব হাত নেড়ে ফের ডাকলেন—কাম ব্যাবু, কাম! প্লিজ ডোন্ট হেজিটেট।

তার মানে, চলে এসো সটান, দ্বিধা কোরো না। এভাবে যখন ডাকছেন, তখন যাওয়া যাক না। খিদেও তো পেয়েছে। সেই কাল বেলা দুটোয় রাধাকান্তবাবুর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। প্রায় সতেরো ঘণ্টা যাবৎ পেটে দানাপানি পড়েনি।

আর ভয়টা কীসের? কাল রাতে নির্জন রাস্তায় ইচ্ছে করলেই তো সায়েব-

ভূত ঘাড় মটকাতে পারত। মটকায়নি। এই দিনের বেলা আর ঘাড় মটকাবার সাহস কি হবে ওর? অতএব যাওয়া যাক। ভূতের খাবার চেখেও দেখা যাক। এ বরং এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে জীবনে।

মুরারিবাবু গটগট করেই হেঁটে গেলেন হাসিমুখে। বারান্দায় উঠে হাত বাড়িয়ে দিলেন হ্যান্ডশেক করার জন্যে!

সায়েব কিন্তু তার ছড়িধরা বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। তখন মুরারিবাবু দেখলেন, ওঁর ডান হাতটা কাটা। কোটের শূন্য হাতাটা ঝুলছে কাঁধ থেকে। কিন্তু অদ্ভুত কায়দায় ওই হাত দিয়েই টুপিটা বগলদাবা করে রেখেছেন।

এবার ছড়িটা বগলদাবা করে হ্যান্ডশেক করলেন। মুরারিবাবুর মনে হল প্রচণ্ড ঠান্ডা এক টুকরো বরফ তাকে কিংবা তিনিই বরফের টুকরোটাকে আঁকড়ে ধরেছেন।

হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে কিছুক্ষণ মুরারিবাবুর হাত নিঃসাড় হয়ে রইল। ঠান্ডায় রক্ত যেন জমে গেছে।

নাকি সায়েবরা শীতপ্রধান বরফ পড়া দেশের লোক বলেই তাদের শরীর এমন ঠান্ডা হয়? মুরারিবাবু জীবনে কোনও সায়েবের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেননি।

সায়েবের পিছু-পিছু বাংলোর অন্য ঘরটায় ঢুকে দেখেন, টেবিলে পুরোনো ছেঁড়া একটা ঢাকনা। তার ওপর চমৎকার লোভনীয় খাবার সাজানো আছে। স্যান্ডউইচ, ডিমের অমলেট, কলা, আপেল, আঙুর পর্যন্ত! একটা প্লেটে সন্দেশ দেখে অবাক হলেন মুরারিবাবু। তাহলে সায়েবরাও সন্দেশ খায়! পটে সম্ভবত কফি রয়েছে। আঃ, মুরারিবাবুর নোলায় জল এসে গেল।

নাঃ, সায়েব ভূত হতে পারে এবং হোক না ভূত, কী ক্ষতি। কিন্তু খাবারগুলো মোটেও ভুতুড়ে নয়। রীতিমতো সুস্বাদু। জটিলের হাতের সেঁকা আর পচা মাখন মাখানো টোস্ট, বাদুড়চোষা কলা আর কুকুরের কানের মতো শক্ত অমলেট খেয়ে মুরারিবাবুর ঘেন্না ধরে গেছে। আর আঙুর, এমন মিঠে রসে টইটম্বুর আঙুর খেতে পাওয়া কি সহজ কথা?

হুঁ, কফিই বটে। তারিয়ে-তারিয়ে খাচ্ছেন মুরারিবাবু। আর যতটা সাধ্য, ইংরিজিতে দেশের হালচাল নিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। সায়েব কিন্তু কোনও জবাবই দিচ্ছেন না। শুধু ঠোঁটের কোণায় হাসি রয়েছে, এই যা!

একসময় মুরারিবাবু বললেন,—স্যার! আই থিংক, দ্যাট কার ইজ ইওর্স?

সায়েব মাথাটা দুলিয়ে বললেন,—ও, ইয়েস ব্যাবু।

এবার মুরারিবাবু গাড়িটা কীভাবে ভোঁদা মিত্তিরের কাছে কিনেছেন, কীভাবে ওটার যত্নআত্যি করেন—তা বললেন। তারপর ফের জানতে চাইলেন, রোজ রাতে গাড়ি চেপে সায়েব কোথায় যান এবং ফিরে আসেন?

সায়েব একটু হেসে জবাব দিলেন,—আই কাম হিয়ার এভরি নাইট।

—হোয়াই স্যার?

—ও ব্যাবু, দ্যাটস এ লং স্টোরি।

লম্বা কাহিনি! ঠিক আছে। মুরারিবাবু না শুনে ছাড়বেন না। সাগ্রহে বললেন,—প্লিজ টেল মি, স্যার।

এরপর সায়েব বা সায়েব-ভূত যা বললেন, তা সংক্ষিপ্তভাবে এই রকম,—

সায়েবের নাম রবার্ট বেলিংটন। এই বাংলোটা ছিল তাঁরই। পিছনে নদী আছে। আজ থেকে ষাট বছর আগে এর চেয়ে বেশি জঙ্গল ছিল এখানে। কেউ আসতে সাহস করত না এই এলাকায়। শিকার করার নেশা ছিল বেলিংটন সায়েবের। তাই এখানে বাংলোটা বানিয়েছিলেন। মাঝে-মাঝে এসে থাকতেন। বিয়ে-টিয়ে করেননি। ওই ফোর্ড গাড়িটা চেপেই আসতেন বাংলোয়। একবার কলকাতা ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। রাস্তা কাঁচা ছিল তখন। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। চাকা পিছলে গাড়িটা পাশের খাদে কাত হয়ে পড়ে। সায়েব বেঁচে যান। কিন্তু ডান হাতটা কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। সুস্থ হওয়ার পর বাঁ-হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাতেন। কোনও অসুবিধে হতো না। বাংলোয় এসে রাত কাটাতেন আগের মতো।

একবার হল কী, অভ্যাসমতো কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন বেলিংটন। অন্ধকার রাত। কেষ্টনগরের কাছাকাছি এসে চাঁদ উঠল। সেই চাঁদের আলোই গণ্ডগোলটা বাধিয়ে ফেলল। চকচকে রাস্তা ভেবে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছেন জোরে—আর ব্যস! ফের পড়েছেন গভীর খাদে। কিন্তু এবার আর শুধু একটা হাতের ওপর দিয়ে গেল না। পুরো শরীরের ওপর দিয়েই গেল।

তার মানে? তার মানে বেলিংটন মারা পড়লেন।

হ্যাঁ, মারা না পড়লে ভূত হলেন কেমন করে? মুরারিবাবু এবার কিছু প্রশ্ন ইংরিজিতে জিগ্যেস না করে পারলেন না। তাঁর প্রশ্ন এবং সায়েবের জবাব বাংলায় এই রকম,—

—আচ্ছা স্যার, ভূত তো হলেন। কিন্তু কেমন লাগে-টাগে একটু বলবেন?

—কেমন লাগে মানে? দারুণ ভালো লাগে। যা খুশি খেতে ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়। বাবু, খাওয়ার মতো সুখ কি পৃথিবীতে আছে? যদি ইচ্ছে করে, এখনই তাজিকিস্তানের আঙুরকুঞ্জের টাটকা আঙুর খাব, সঙ্গে-সঙ্গে এসে যাবে। দেখবে নাকি?

বলে বেলিংটন চোখ বুজে কী বিড়বিড় করলেন, অমনি সবিস্ময়ে মুরারিবাবু দেখলেন টেবিলে ঝুপ করে সদ্য ডালভাঙা একগুচ্ছ আঙুর এসে পড়ল। সায়েব টুক-টুক করে ভেঙে খেতে-খেতে বললেন,—ইট ব্যাবু, ইট। খাও বাবু, খাও।

সাহস করে হাত বাড়িয়ে মুরারিবাবুও গালে পুরতে থাকলেন। আহা! কী অপূর্ব স্বাদ! চাঁদনি বা নিউ মার্কেটের আঙুর তো খেয়ে দেখেছেন। টক ভাবটা থাকবেই, সে তুমি যত দাম দিয়ে কেনো আর এ আঙুর কী মিঠে, কী রসালো!

আঙুর খেতে-খেতে সায়েব বললেন,—দেখলে তো, মরে ভূত হওয়ার কত সুখ?

মুরারিবাবু তারিফ করে বললেন,—আচ্ছা স্যার, যদি বাগবাজারের রসগোল্লা খেতে চাই?

—তুমি চাইলে তো হবে না বাবু। তুমি জ্যান্ত মানুষ। আমি চাইলেই পেয়ে যাব। ইচ্ছে করলেই হল।

নোলায় জল নিয়ে মুরারিবাবু বললেন,—ইচ্ছে করুন না স্যার।

সায়েব চোখ বুজে ফের বিড়বিড় করা মাত্র কে যেন অদৃশ্যহাতে মুখে শালপাতা আঁটা একটা মাটির সরা সাবধানে টেবিলে রাখল। মুরারিবাবু শালপাতা ছিঁড়ে ফেলতে দেরি করলেন না। আঃ, অপূর্ব! খাসা! ডাগর-ডাগর শ্বেতশুভ্র রসালো রসগোল্লা ভরা রয়েছে সরাটায়। সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে মুরারিবাবু বললেন,—খাব স্যার?

—আলবত খাবে। খেলে তবেই তো বুঝবে মরে ভূত হওয়ার কী আনন্দ!

মুরারিবাবু গালে পুরলেন। মহানন্দে মুখ নেড়ে চিবুতে থাকলেন। মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল। এবার সায়েবকে বলেকয়ে বর্ধমানের সীতাভোগ আর মিহিদানা আনাতে পারলে জীবন ধন্য হয়। বললেন,—সত্যি বটে স্যার। স্বীকার করছি, মরে ভূত হওয়ার বড় আনন্দ। কোনও দায় নেই, ঝক্কি নেই, আপিস দৌড়াদৌড়ি, ট্রাম-বাসে ঝুলোঝুলি ঠেলাঠেলি-গুঁতোগুঁতি নেই, রোজগারের ধান্দায় মুখ চুন করে ঘুরে বেড়ানো নেই—শুধু খাও আর খাও। খেয়েদেয়ে ঘুমোও। আবার উঠে খাও। খেয়ে বেড়াতে বেরোও।

বেলিংটন বললেন,—আর বেড়াতেও অসুবিধে নেই। মোটরগাড়ি চাও? তাও পাচ্ছ। তবে মোটরগাড়িটিরও মরে ভূত হওয়া চাই। বুঝেছ তো? আমার ওই ফোর্ড গাড়িটা ভাগ্যিস সেই দুর্ঘটনায় আমার সঙ্গেই মারা পড়েছিল। তাই ওটা পেতে অসুবিধে হয়নি।

রসগোল্লার সরা সাবাড় করতে-করতে মুরারিবাবু বললেন,—কিন্তু স্যার, গাড়িটা ভোঁদা মিস্তিরের গ্যারেজে গেল কীভাবে?

—আরে, সে এক কাণ্ড! গাড়ির ভাঙাচোরা যন্তর আর বডিটা কুড়িয়ে মল্লিকবাজারে কারা বেচে দিয়ে এসেছিল। তোমাদের ভোদা মিস্তির তাকে মাত্র পঁচিশ টাকায় কিনে জোড়াতাড়া দিয়ে আগের মতো গড়ে ফেলেছিল। লোকটার প্রশংসা করতে হয়। অবিকল আগের চেহারা ফিরিয়ে দিল।

মুরারিবাবুর রসগোল্লা খাওয়া শেষ। এবার বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানার কথাটা তুলবেন। কাঁচুমাচু মুখে বললেন,—স্যার, এবার...

তাঁকে বাধা দিয়ে বেলিংটন বললেন,—সব হবে, সব হবে। কিন্তু এবারে তাহলে স্বীকার করেছ তো বাবু, মরে ভূত হওয়ার মতো আনন্দ আর নেই?

মুরারিবাবু উৎসাহে সায় দিয়ে বললেন,—আলবত স্যার! তা আর বলতে? বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না!

অমনি সায়েব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—তাহলে এসো।

অবাক হয়ে মুরারিবাবু বললেন,—কোথায় স্যার?

—কেন? মরতে!

মরতে! —মুরারিবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন।

—হ্যাঁ, না মরলে ভূত হবে কী করে? চলে এসো বাবু। দেরি কোরো না। আরে, শুনতে যতটা লাগে, তত কিছু নয়। টেরই পাবে না। এসো, উঠে এসো।

অ্যাঁ! —মুরারিবাবু আঁতকে উঠলেন। এবার বুঝতে পেরেছেন, ঝোঁকের বশে কী বলে ফেলেছেন! হায়, হায়, খাওয়ার লোভেই এই বিপদ!

বেলিংটন টেবিলের ওপর দিয়ে বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে খপ করে মুরারিবাবুর একটা হাত ধরে ফেললেন। তারপর হ্যাঁচকা টান মেরে ওঠালেন তাঁকে। চেয়ারগুলো দুমদাম ছিটকে পড়ল।

বেলিংটন প্রচণ্ড ঠান্ডা একটা হাতে তাঁকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বাংলো থেকে বেরোলেন।

এবার মুরারিবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন,—ওরে বাবা রে! মেরে ফেললে রে! বাঁচাও, বাঁচাও!

কিন্তু বেলিংটন তখন নিজমূর্তি ধরেছেন। কোটপ্যান্ট পরা আস্ত কঙ্কাল হয়ে উঠেছেন। কঙ্কালটার একটা হাত নেই, এই যা।

এবং সেই কঙ্কালের মুন্ডুটা দাঁত কিড়মিড় করে হাসছে আর বরফের চেয়ে ঠান্ডা হাড়ের আঙুলে মুরারিবাবুর লিকলিকে কবজি ধরে আছে। টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে।

এই বিজন অরণ্যে কেই বা তাঁকে বাঁচাবার জন্য আসবে? একেই তো বলে অরণ্যে রোদন। মুরারিবাবুর গলা ভেঙে গেল চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে। তখন চুপ করলেন।

বেলিংটন তাঁকে সেই ফোর্ড গাড়িতে ঢুকিয়ে কঙ্কালিহাস্য হেসে বললেন,—এত ভয় পাচ্ছ কেন বাবু? টেরই পাবে না কিছু। মরার চেয়ে সোজা কাজ আর নেই। তবে তোমার মারা পড়াটা যাতে আরও ঝটপট হয়, সেই ব্যবস্থা করতেই তোমায় গাড়িতে ওঠালাম। চুপ করে বসে থাকো।

বাঁ-হাত মানে হাড়ের হাত কোটের হাতায় ঢাকা রয়েছে এবং হাতের আঙুলগুলো এবার মুরারিবাবুর পিঠ বেড় দিয়ে স্টিয়ারিং ধরেছে। অর্থাৎ মুরারিবাবু বেলিংটনের শরীরের তলায় বন্দি। গাড়ি চলতে শুরু করল।

জঙ্গলের মধ্যে এবড়ো-খেবড়ো কাঁচারাস্তায় ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলেছে। মুরারিবাবু প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে অগত্যা চুপচাপ বসে আছেন কুঁজো হয়ে। বড্ড বেকায়দায় বসে থাকা। দম আটকে যাওয়ার দশা।

কিছুদূর চলার পর জঙ্গল শেষ হল। একটা নদীর ব্রিজ দেখা গেল। কিন্তু কোথাও কোনও লোক নেই। মুরারিবাবু রাগে, দুঃখে ভাবছেন, জেলেরাই বা নদীতে মাছ ধরতে আসেনি কেন আজ? নদীতে কি মাছের অভাব আছে? ওরা এলে মুরারিবাবু চেঁচিয়ে ডাকতেন!

জেলেদের মুন্ডুপাত করতে থাকলেন মুরারিবাবু।

এবারে দুধারে ধু-ধু ফাঁকা মাঠ। কোনও রাখালও গরু-টরু চরাচ্ছে না। মুরারিবাবু এবার রাখালদেরও মনে-মনে গালমন্দ করলেন।

এ যেন রূপকথার সেই তেপান্তর। সেকেলে কালো ফোর্ড গাড়িটা চলেছে তো চলেছে। ধুলোর মেঘ জমেছে দুপাশে। ঠা-ঠা রোদ্দুর তেপান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে উজ্জ্বল সোনার মতো। নাকি কাঁসর-ঘণ্টার মতো। যেন ছুঁলেই ঢং করে বেজে উঠবে। নীল আকাশটা দেখাচ্ছে তপ্ত কড়ার মতো গনগনে।

হঠাৎ মুরারিবাবু দেখলেন, কখন দুপাশের পাদানিতে কারা এসে দাঁড়িয়েছে। ওরে বাবা! এরাও যে কঙ্কাল! কিন্তু বেলিংটনের মতো পোশাক পরা নয়। তার মানে এরা দিশি ভূত। পাদানিতে দাঁড়িয়ে দিব্যি গাড়ি চড়ার সুখ মিটিয়ে নিচ্ছে বুঝি! নির্ঘাত এরা কলকাতার ট্রাম-বাসে চড়ে আপিস যেত ইহকালে। তারা জানালায় মুন্ডু বাড়িয়ে হিঁ-হিঁ করে হাসছে আর মুরারিবাবুকে দেখছে। মুরারিবাবু কাঠ হয়ে বসে আছেন। দিনদুপুরে এ কী দুঃসাহস ব্যাটাদের!

দিশি ভূতের কঙ্কালগুলো এবার সায়েবকে বলতে শুরু করল,—এঁ কেঁ স্যাঁর? কাঁকে নিঁয়ে যাঁচ্ছেন স্যাঁর?

বেলিংটন হেসে ভাঙা বাংলায় জবাব দিলেন,—ব্যাবু টোমাডের একজন সঙ্গী হোবে। আইস, টোমরাও আইস। মজ্জা ডেকিবে।

এই শুনে ওরা আরও হিঁ হিঁ করে হাসতে থাকল। কেউ-কেউ বলল,—খুঁব ভাঁলো হঁবে! খুঁব ভাঁলো হঁবে!

একজন বলল,—দেঁরি কঁরছেন কেঁন স্যাঁর?

আরেকজন বলল,—ওঁকে কোঁথায় নিঁয়ে গিঁয়ে ঘাঁড় মঁটকাবেন স্যাঁর?

বেলিংটন বললেন,—সবুর, সবুর। এট্টো টাড়া কেন আসে? (এত তাড়া কেন আছে?) হামি ব্যাবুকে হামার কোবোরে নিয়ে যাসসে। সেখানে নিয়ে যাবে। টারপর ইহার গোলা টিপে মারবে।

এক কঙ্কাল বলল,—নাঁ স্যাঁর! ওঁর ঘাঁড় মঁটকাবেন। নাঁ পাঁরেন তোঁ আঁমাদের হাঁতে ছেঁড়ে দেঁবেন। এঁ কাঁজটা আঁমরা ভাঁলো পাঁরি।

বেলিংটন হাসতে-হাসতে বললেন,—হাঁ! টোমরা নেটিভ (দিশি) আসে। টোমরা ওভাবে মারটে পারে। হামরা ইংলিশ আসে, হামরা অন্যভাবে মারবে।

তার মানে, ঘাড় মটকানোটা দিশি ভূতের ব্যাপার। বিলিতি ভূত যখন, তখন তার ব্যাপারটা অন্যরকম হবেই। কিন্তু বেলিংটন মুরারিবাবুকে তাঁর কবরে নিয়ে যাচ্ছেন বললেন। তাহলে কি কেষ্টনগরে যে সায়েবদের কবরখানা আছে, সেখানেই তাঁর কবর? মুরারিবাবু এসব কথা ভেবে একটু সাহস পেলেন। কেষ্টনগরের ধারে-কাছে যেতে পারলে বাঁচার একটা উপায় মিলতে পারে। লোকজন তো সেখানে প্রচুর আছে, শহর জায়গা। রোসো সায়েব, তোমায় মজা দেখিয়ে ছাড়ব। আজকালকার দিশি মানুষগুলোকে তো চেনো না। ভাবছ, তোমাদের সেই ব্রিটিশ আমলের জিনিস। সায়েব দেখলেই ভয় পাবে? তখন একটা-দুটো ক্ষুদিরাম ছিল। এখন অজস্র ক্ষুদিরাম। একালের ছেলেরা কী ডানপিটে, তা টের পাওনি কিনা!

কিন্তু বেলিংটনের কথা শুনে দিশি ভূতগুলো তখন নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি

করে ইশারায় যেন কী পরামর্শ করে নিল। তারপর একজন বলে উঠল,—স্যাঁর, আঁমাদের এঁকটা কঁথা আঁছে।

—কী কোঠা আসে?

—আঁমরা আঁমাদের দেঁশের লোঁককে নিঁজের হাঁতে মাঁরব। আঁপনাকে মাঁরতে দেঁব নাঁ।

বেলিংটন হেসে বললেন,—ও! প্যাট্রিয়টিজম (দেশাত্মবোধ)?

সেই সময় দুধারে মাঠ থেকে দলে-দলে আরও কঙ্কালকে দৌড়ে আসতে দেখলেন মুরারিবাবু। তারা চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে আসছিল,—কীঁ রেঁ? কীঁ, কীঁ কীঁ?

তারপর তারা এসে কেউ বনেটে কেউ ছাদের ওপর বসে পড়ল। গাড়ির ওপরে কঙ্কাল, দুই পাদানিতে কঙ্কাল, ইঞ্জিনের ওপর কঙ্কাল। মুরারিবাবু এবার একটু সাহস পেয়েছেন। হাজার হলেও এরা তাঁর দিশি ভাই। ভারতীয় ভূত। এই বিধর্মী সায়েব-ভূতের কবল থেকে এরা কি তাঁকে বাঁচাবে না?

অন্তত বেলিংটনের হাত থেকে উদ্ধার হতে পারলে এই দিশি ভাই-বন্ধুদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা করার একটা আশা জেগে উঠল মুরারিবাবুর মনে। ভাবলেন, গতিক বুঝলে বরং একখানা গরম-গরম বক্তৃতা দেবেন। তাতে দেশপ্রেমের কথা প্রচুর থাকবে।

হ্যাঁ, বিবেকানন্দের সেই প্রখ্যাত উক্তি জুড়ে দেবেন বক্তৃতায়। চণ্ডাল ভারতবাসী, মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই...

আচমকা সেই সময় একটা তুমুল হুলুস্থুল ঘটে গেল।

মুরারিবাবুকে কঙ্কালগুলো খামচে ধরে গাড়ি থেকে বের করার জন্যে টানছে—বেলিংটন স্টিয়ারিং সামলাবেন, না বন্দিকে ধরে রাখবেন ঠিক করতে পারছেন না এবং গাড়ি এদিক-ওদিক টলে-টলে চলছে। তুমুল চ্যাঁচামেচিও হচ্ছে। নাকিস্বরে স্লোগান হাঁকতে শুরু করেছে ছাদের ওপর একদল কঙ্কাল—

—বেঁলিংটন! ভাঁরত ছাঁড়ো!

—আঁভি ছোঁড়ো, জঁলদি ছোঁড়ো!

—গঁলা টেঁপা...

—চঁলবে না, চঁলবে না।

—মুঁরারিবাবু!

—জিঁন্দাবাদ, জিঁন্দাবাদ!

সেই তুলকালাম হট্টগোলের মধ্যে গাড়িটা ঘুরে গেল। পাশে গভীর খাদ। এবং মুরারিবাবু ভয়ে চোখ বুজেই টের পেলেন ঠান্ডা-ঠান্ডা হাড়ের হাতে দিশি ভূতেরা তাঁকে গাড়ি থেকে বের করল।

তারপর তাঁকে চ্যাংদোলা করে তুলে মাঠের দিকে দৌড়ে চলেছে ওরা। সেই অবস্থায় একটা প্রচণ্ড আওয়াজে বুঝলেন, বেলিংটনের গাড়ি সেই অতল খাদে পড়েছে।

মুরারিবাবু ভয়ে-ভয়ে চোখ খুললেন। খুলেই বন্ধ করলেন। শুনলেন, কে তাঁকে ডাকছে,—মামা, মামা! ও মামা!

ফের চোখ খুলে দেখলেন—বীরু। ফিসফিস করে বললেন,—আমি কোথায়?

আবার কোথায়? —বীরু বলল। সেবারকার মতো হাসপাতালে।

মুরারিবাবু ওঠার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। পাদুটো যেন বেঁধে রেখেছে। বললেন,—আমার কী হয়েছিল বল তো?

বীরু বলল,—আবার কী হবে? অ্যাকসিডেন্ট করে কল্যাণীর মাঠে পড়েছিলেন। সেখান থেকে লোকেরা হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। ডাক্তার বলছেন, কয়েক জায়গায় হাড় ভেঙে গেছে। প্লাস্টার বেঁধে মাস চারেক পড়ে থাকতে হবে বিছানায়।

মুরারিবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—গাড়িটা?

বীরু জানাল, গাড়িটা চুরমার হয়েছে। ভাগ্যিস মুরারিমামা গতিক বুঝে সঙ্গে-সঙ্গে লাফ দিয়ে পড়েছিলেন। গাড়িটা নয়—গাড়ির হাড়গোড় ট্রাকে চাপিয়ে আনতে গেছেন ভোঁদা মিস্তির।

ভুতুড়ে বেড়াল

আমার ভাগ্নে ডন যেমন বিচ্ছু তেমনি খেয়ালি ছেলে। তার কীর্তিকলাপ নিয়ে এ যাবৎ অনেক গল্প বলেছি। কিন্তু এবার যে গল্পটা বলছি, সেটা ভারি অদ্ভুত আর রহস্যময়। এ যাবৎ আমি নিজেই এই ঘটনার মাথামুন্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারিনি। একটা ব্যাখ্যা অবশ্য করেছিলুম। কিন্তু সেটা নেহাত মনগড়া।

আষাঢ় মাস। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কয়েক পশলা বৃষ্টির পর বিকেলে মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই মফস্বল শহরের রাস্তার অবস্থা হয়ে গেছে শোচনীয়। খানাখন্দে জল জমেছে। তোবড়ানো পিচের সঙ্গে কাদা আর পাথরকুচি এমন মিলেমিশে গেছে যে পা ফেললেই আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা। তার ওপর নানারকম যানবাহনের উৎপাত তো আছেই। আচমকা রাস্তার নোংরা জল পিচকিরির মতো ছিটকে এসে জামাকাপড় বিচ্ছিরি করে ফেলবে।

এ অবস্থায় রোজকার মতো বেড়াতে বেরুনোর ইচ্ছে চেপে রাখতেই হল। বরং তার চেয়ে চুপচাপ বসে গোয়েন্দা উপন্যাস পড়াই ভালো। র‍্যাক থেকে তাই 'কাঠমাণ্ডুতে কাটামুন্ডু' নামে একখানা বই টেনে নিলুম।

সবে বইটার পাতা খুলেছি, হঠাৎ পিঠের দিকে জোরালো চিমটি খেয়ে 'উঃ!' করে উঠলুম। তারপর খাপ্পা হয়ে ঘুরে দেখি শ্রীমান ডন নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রেগেমেগে বললুম,—থাপ্পড় খাবি বলে দিচ্ছি কিন্তু। তোকে বলেছি না, কিছু বলার থাকলে সামনে এসে বলবি। এমনি করে পেছন থেকে কক্ষনও চিমটি কাটবি নে।

ডন আমার হুমকি গ্রাহ্য করল না। তেমনি নির্বিকার মুখে বলল,—রথের মেলা দেখতে যাব!

—যাবি তো যা। আমাকে চিমটি কাটছিস কেন?

—তুমি আমাকে নিয়ে যাবে।

—কালই তো নিয়ে গিয়েছিলুম। রোজ-রোজ মেলায় গিয়ে নতুন আর কী দেখবি?

একটা বেড়াল কিনব।—বলে ডন আমার হাতের বইটা চেপে ধরল।

বুঝলুম এবার 'কাঠমাণ্ডুতে কাটামুন্ডু'-র আর রক্ষে নেই। তাই মুখে হাসি ফুটিয়ে বললুম,—কালই তো তোকে একটা রথ আর একটা বাঘ কিনে দিয়েছি। ছ্যা-ছ্যা! বাঘের পাশে বেড়াল রাখবি তুই?

ডন হাসল না। বই থেকে হাতও সরাল না। নির্বিকার মুখে বলল,—ভোঁদা বলল বেড়াল বাঘের মাসি। মাসিকে না দেখতে পেলে বাঘ রেগে যাবে। মামা! তুমি শিগগির ওঠো। দেরি করলে কী হবে জানো তো?

বইটা আরও জোরে সে আঁকড়ে ধরল। অগত্যা আমাকে উঠে পড়তে হল। বললুম,—ঠিক আছে। চল, যাচ্ছি। এবার লক্ষ্মীছেলের মতো বই থেকে হাত সরিয়ে নে।

—বেড়ালটার দাম দশ টাকা, মামা! মা দিয়েছে তিন টাকা। দিদি দিয়েছে দু-টাকা।

—হুঁ। আমাকে বাকি পাঁচ টাকা দিতে হবে। কিন্তু দশ টাকা দাম, কে বলল তোকে?

—আমি এক্ষুনি রথের মেলা থেকে আসছি না?

—বলিস কী রে? এই জলকাদায় তুই গেলি কী করে? তোর জুতোয় তো একটুও কাদা দেখছি নে!

—ভোঁদাদের আমবাগান দিয়ে বুড়োশিবের মন্দিরতলা দিয়ে—তারপর—

—বুঝেছি, বুঝেছি! এবার বইটা ছাড়!

—আগে তুমি পাঁচটা টাকা দাও।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট ওর হাতে দিলুম। তখন ডন বই থেকে হাত সরিয়ে নিল। তারপর হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল,—তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে যাবে মামা!

—কেন? যেমন একা গিয়েছিলি তেমনি একা চলে যা। বেড়াল কিনে নিয়ে আয়।

ডন চোখ বড় করে বলল,—মেলা থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে না? বুড়োশিবের মন্দিরের কাছে জটাবাবা থাকে। তারপর জানো তো মামা? ভোঁদাদের আমবাগানে কন্ধকাটা থাকে। কন্ধকাটা বাগান পাহারা দেয়। নইলে সব আম চুরি হয়ে যেত। ভোঁদা বলছিল। আর জানো মামা?

কথা বাড়াতে না দিয়ে বললুম,—চল, বেরুনো যাক।

আসলে এমন সুন্দর রোদ্দুরে ঝলমল করা বিকেলটা ঘরে বসে বই পড়ার চেয়ে বাইরে কাটানোর সুযোগ ডনই তো এনে দিয়েছে। তা সে চিমটি কেটেই হোক বা পাঁচটা টাকা নিয়েই হোক। তাই শেষপর্যন্ত ডনের প্রতি খুশি হয়েছিলুম।

বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরুলে একটা ঘাসে ঢাকা পোড়ো-জমি। তারপর ভোঁদাদের সেই আমবাগান। বাগানের পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথটায় একটু-আধটু জলকাদা আছে। তবে কিনারার ঘন ঘাসে পা ফেলে সাবধানে হাঁটলে জলকাদা এড়ানো যায়। ডনের বুদ্ধির প্রশংসা করা উচিত। এভাবে একটু ঘুরপথে গেলে মেলার দূরত্ব অবশ্য বেড়ে যায়। তা যাক। বৃষ্টিধোয়া সবুজ গাছপালা, পাখির ডাক, রংবেরঙের প্রজাপতির খুশি-খুশি নাচানাচি দেখতে-দেখতে রথের মেলায় যাওয়ার চেয়ে 'কাঠমাণ্ডুতে কাটামুন্ডু' বেজায় বিচ্ছিরি ব্যাপার!

বুড়োশিবের মন্দিরের দিকটায় জলকাদার বালাই নেই। বাঁধানো চত্বরের পর খেলার মাঠ। সেই মাঠের একধারে মেলা বসেছে। ভিজে ছপছপে ঘাসের ওপর প্রতিদিনের মতো ছেলেরা ফুটবল খেলছে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। ডন তাড়া দিয়ে বলল, —দেরি হয়ে যাচ্ছে মামা। এখন কি খেলা দেখার সময়?

বললুম,—নারে! যদি ওদের বলটা এসে গায়ে পড়ে? প্যান্টশার্ট নোংরা হয়ে যাবে যে!

ভ্যাট! তুমি কিচ্ছু জানো না! এবার আমরা ঝিলের ধারে ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাব। —ডন আমার হাত ধরে টানল। উৎসাহে হাঁটতে-হাঁটতে সে বলল,— রামুধোপা ঝিলের জলে কাপড় কাচে জানো তো মামা?

—জানি বইকী।

—রামু আর তার গাধাটা হেঁটে-হেঁটে কেমন সুন্দর রাস্তা করেছে দেখবে চলো।

—তুই সেই রাস্তায় গিয়েছিলি বুঝি?

—হ্যাঁ। নইলে আমাকে মাঠে দেখতে পেলেই ভোঁদা জোর করে গোলকিপার করত যে!

ঝোপজঙ্গলের ভেতর ঢুকে লক্ষ করলুম,—রামু ধোপা বিকেলে এই চমৎকার রোদ্দুরটা পেয়ে কাচা কাপড়গুলো শুকিয়ে নিচ্ছে। তার গাধাটা ঝিলের ধারে মনের আনন্দে ঘাস খাচ্ছে।

যাই হোক, জলকাদা বাঁচিয়ে অবশেষে মেলার ভিড়ে পৌঁছলুম। ডন আমাকে একটা দোকানের সামনে নিয়ে গেল। দোকানটা আসলে তেরপল ঢাকা ছোট্ট একটা তাঁবু। ভেতরে নানারকম জন্তুর পুতুল। না—পুতুল বলা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। কারণ খুদে জন্তুগুলো দেখতে অবিকল আসল জন্তুর মতো। খরগোশ, কাঠবেড়ালি, কয়েকরকম পাখি, গিরগিটি, ফণাতোলা সাপ, ব্যাঙ, কুকুরছানা এইসব। সেগুলোর মধ্যে একটা কালো বেড়াল জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে। দেখার মতো গোঁফও আছে। একেবারে আসল বেড়ালের সাইজ।

মাথার সন্ন্যাসীদের মতো চুড়ো করে বাঁধা চুল, মুখে একরাশ গোঁফ-দাড়ি, তেমনি কুচকুচে কালো একটা লোক এই দোকানের মালিক। ডনকে দেখেই সে হাসল,—তাহলে বেড়ালটা দেখছি তোমার খুব পছন্দ হয়েছে খোকাবাবু! কিন্তু দশ টাকার কমে বেচব না।

ডন বুকপকেট থেকে টাকাগুলো বের করে তাকে দিতে যাচ্ছিল। আমি বললুম, —কই, আগে বেড়ালটা দেখি।

সন্ন্যাসী চেহারার দোকানদার বলল,—খোকাবাবু আপনাকে সঙ্গে এনেছে বুঝি? ভালো। আমি কাকেও ঠকাইনে বাবু! এ বেড়াল যেমন-তেমন বেড়াল নয়। জ্যান্ত বললেও ভুল হয় না।

বলে সে কালো বেড়ালটা আমাকে দিল। সত্যি বলতে কী, ওটা হাতে নেওয়ামাত্র মনে হল, যেন আসল জ্যান্ত বেড়াল। তেমনি নরম তুলতুলে শরীর। লেজটাও নড়ছে। চমৎকার বানিয়েছে তো!

ততক্ষণে ডন দশটা টাকা দোকানদারকে দিয়ে ফেলেছে। একটু দরাদরি করার সুযোগ পেলুম না। দোকানদার একগাল হেসে টাকাগুলো কপালে ঠেকিয়ে ফতুয়ার ভেতর ভরল। তারপর বলল,—মাত্র দশ টাকায় বেচে লোকসানই হল বাবু! কিন্তু কী আর করা যাবে? কালো বেড়াল অলক্ষুণে বলে কেউ কিনতে চায় না। এই খোকাবাবুর যেমন চোখ আছে, তেমনি সাহসও আছে বটে। তাই দশ টাকায় বেচতে চেয়েছিলুম। তবে খোকাবাবুকে বলছি, আপনাকেও বলছি, বেড়ালটা একটু চোখে-চোখে রাখবেন।

জিগ্যেস করলুম,—কেন বলো তো?

দোকানদার চাপাগলায় বলল,—মন্তরপড়া বেড়াল। রাতবিরেতে হঠাৎ জ্যান্ত হয়। বুঝলেন তো?

ওর কথা শুনে হেসে ফেললুম। —বলো কী হে! নকল বেড়াল জ্যান্ত হয়। তোমার মন্তরের এত জোর?

সে চোখ টিপে বলল,—হাসবেন না বাবু! খোকাবাবুকে বলবেন, যেন সাবধানে রাখে।

ডন আমার হাত থেকে বেড়ালটা কেড়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। পথে যেতে-যেতে বললুম,—ডন! লোকটা তোকে রামঠকানো ঠকিয়েছে জানিস? আমার মনে হল, ছেঁড়া তোয়ালেতে কালো রং মাখিয়ে ভেতরে স্পঞ্জ ঠেসে বেড়ালটা তৈরি করেছে। গোঁফ আর চোখদুটো প্লাস্টিকের না হয়ে যায় না। মুখে একটু লালচে রং মাখিয়ে দিয়েছে। ব্যস!

ডন আমার কথায় কান দিল না। হঠাৎ আমাকে ফেলে দৌড়ুতে শুরু করল। ওর পিছনে আমাকে দৌড়ুতে দেখলে লোকেরা কী ভেবে হয়তো হইচই বাধাবে। তাই ধীরেসুস্থে হাঁটছিলুম।...

বাড়ি ফিরে দেখি, ডন বেড়ালটাকে দুধ খাওয়াবে বলে রান্নাঘরের দরজায়

প্রায় কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। বললুম,—কী রে? তুই ওটাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য অমন দৌড়ে চলে এলি? বোকা ছেলে! নকল বেড়াল কি দুধ খেতে পারে?

দিদি রেগে গেল আমার ওপর। —তুই যত নষ্টের গোড়া! তোর পাল্লায় পড়ে ও গোল্লায় যেতে বসেছে। না পড়াশুনো, না কিছু। যা বায়না ধরবে, তা মেটানো চাই-ই। যেমন গুণধর মামা, তেমনি গুণধর ভাগ্নে।

বললুম,—যা বাবা! আমি কী করলুম?

—করলুম মানে? বেড়াল কেনার কথা তুই-ই ওর মাথায় ঢুকিয়েছিস।

বেগতিক দেখে বললুম,—ঠিক আছে। তা দাও না একটুখানি দুধ। পাথরের গণেশ যদি দুধ খেতে পারে—

দিদি অমনি কপালে হাত ঠেকিয়ে নমো করে বলল,—এই সন্ধ্যাবেলা দেব-দেবতার নামে যা-তা বলবি নে বলে দিচ্ছি। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছিলুম জানিস?

তারপরই বিচ্চু ছেলের চিমটি খেয়ে 'উঃ!' করে উঠল এবং করুণ মুখে বলল, —লক্ষ্মী সোনা! অমন করে না। ছাড়! ছাড়! উঁহু-হু! দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি!

ডনের দিদি—আমার ভাগ্নি পিঙ্কি তার পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে বলল,—মাথায় দুটো চাঁটি লাগাতে পারছ না মা? যখনই পড়তে বসব, তখনই বাঁদরের বাঁদরামি শুরু হবে।

ডন মাকে ছেড়ে দিয়ে ফিক করে হেসে বলল,—বাঁদর না দিদি, বেড়াল! যেমন-তেমন বেড়াল নয়, সাধুবাবার মন্তরপড়া বেড়াল।

পিঙ্কি চোখ পাকিয়ে বলল,—দাঁড়া! বাবাকে আসতে দে। তারপর দেখাচ্ছি মজা!

ডন বেড়ালটা তার দিকে ছুড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করতেই সে চোখের পলকে ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দিল। পিঙ্কি বেড়ালকে বড্ড ভয় পায়।

দিদি রান্নাঘর থেকে একটা ছোট্ট বাটিতে একটুখানি দুধ নিয়ে বেরুল। বলল,—এই নে। তোর বেড়ালকে দুধ খেতে দিয়ে মামার কাছে পড়তে বোস। তোর বাবা বাড়ি ফিরে যদি দেখেন, এখনও তুই পড়তে বসিসনি, তাহলে তোর বেড়ালের অবস্থা কী হবে বুঝতে পারছিস?

ডন লক্ষ্মীছেলের মতো এক হাতে সেই কালো বেড়াল আর অন্য হাতে দুধের বাটি নিয়ে সোজা আমার ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর বলল,—মামা! আলো জ্বেলে দাও।

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলুম। ডন বেড়ালটাকে মেঝের কোণে বসিয়ে তার মুখের কাছে দুধের বাটিটা রাখল। বললুম,—ঠিক আছে। বেড়ালটার খিদে পেলে দুধ খেয়ে নেবে। আয়! তুই পড়তে বোস।

ডন আমার বিছানায় বসে পড়াশুনো করে। আমি চেয়ার টেনে তার কাছাকাছি বসে তাকে পড়াই। আজ সে এমনভাবে বসল যেন বেড়ালটাকে সে দেখতে পায়। আমাকেও চেয়ারটা একটু সরাতে হল।

বুঝতে পারছিলুম, ডনের মন বেড়ালটার দিকে পড়ে আছে। কিন্তু আমার অবস্থাও তা-ই। যতবার ঘুরে বেড়ালটার দিকে তাকাচ্ছি, কেন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। দোকানদারটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কালো রঙের অবিকল জ্যান্ত চেহারার বেড়ালটার উজ্জ্বল চোখদুটো হিংস্রভাবে যেন আমাকেই দেখছে। মনে হচ্ছে, এখনই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর।

কিছুক্ষণ পরে ডন বলল,—দুধ খেল নাকি দেখে আসি মামা!

বললুম,—খিদে পেলেই খাবে। তুই ও নিয়ে ভাবিসনে।

—না মামা! এতক্ষণে ওর খিদে পেয়েছে। মা একটুখানি দুধ দিল যে! ওইটুকু দুধে কি ওর পেট ভরে?

একটু ঝুঁকে দুধের বাটি দেখে নিয়ে বললুম,—নারে! এখনও খায়নি। বরং এক কাজ করা যাক। ওর মুখটা দুধের বাটিতে গুঁজে দিই। তাহলে লোভের চোটে দুধটুকু খেয়ে ফেলবে।

ডন একটু ভেবে নিয়ে বলল,—উঁহু! তুমি কিচ্ছু জানো না মামা! বেড়াল জিভ দিয়ে চেটে দুধ খায়। ভোঁদার পিসিমার হুলোকে দুধ খেতে দেখিনি বুঝি?

ঠিক এই সময় আচমকা লোডশেডিং হয়ে গেল। ডন ব্যস্তভাবে বলল,—মামা! শিগগির মোম জ্বালো!

টেবিলের ড্রয়ার থেকে মোমবাতি খুঁজে বের করলুম। তারপর দেশলাই জ্বেলে মোমবাতিটা সবে ধরিয়েছি, ডন একলাফে বিছানা থেকে মেঝেয় নেমে চেঁচিয়ে উঠল,—মামা! মামা! আমার বেড়াল কই?

মোমবাতির আবছা আলোতে কালো বেড়ালটা দেখতে পেলুম না। দুধের বাটি যেমনকার তেমনি রাখা আছে। ঝটপট বিছানায় বালিশের পাশে রাখা টর্চ বের করে সুইচ টিপলুম। একপলকের জন্য চোখে পড়ল, এইমাত্র একটা কালো বেড়ালের লেজ দরজার বাইরে অন্ধকারে মিশে গেল।

ততক্ষণে ডন চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। দিদি লণ্ঠনহাতে রান্নাঘরের বারান্দা থেকে জিগ্যেস করছে,—কী হল? কী হল? চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

আমি টর্চ জ্বেলে বারান্দায় গেলুম। তারপর দেখতে পেলুম বেড়ালটাকে। বারান্দায় একটা থামের কাছে বসে আছে। চোখদুটো টর্চের আলোয় আরও হিংস্র দেখাচ্ছে। থমকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকলুম।

ডন কিন্তু একটুও ভয় পেল না। ছুটে গিয়ে বেড়ালটাকে তুলে নিয়ে এল। তারপর তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল,—বুঝলে মামা? ওইটুকু দুধ দেখে রাগ হয়েছে। তাই রাগ করে পালিয়ে যাচ্ছিল।

সে ঘরে ঢুকে দুধের বাটিটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বেড়ালটা তো জ্যান্ত বেড়াল নয় যে অমন করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে! এ তো একটা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ আমি তার লেজের ডগা দেখেছি দরজার বাইরে।

নাকি আমার চোখের ভুল?

ঠিক আছে। কিন্তু বেড়ালটাকে বাইরে নিয়ে গেল কে? লোডশেডিংয়ের সুযোগে এ কাজ কেউ করতেই পারে। কিন্তু কে করবে? পিঙ্কি কালো বেড়ালকে ভীষণ ভয় পায়। দিদি ওদিকে রান্নাঘরে লণ্ঠন জ্বালতে ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া দুরন্ত ছেলে ডনের বেড়াল নিয়ে তার মজা করার সাহসই নেই। ছেলের প্রতি দিদির অবশ্য মায়া-মমতা বেশি। তাই তাকে প্রশ্রয় দেয়। ডনের বাবা খুব রাশভারী মানুষ। এখন তিনি অফিসার্স ক্লাবে আড্ডা দিচ্ছেন। বাড়ি ফিরতে রাত নটা বেজে যাবে। বাড়ির কাজের লোক মন্টু ছুটি নিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে গেছে। কাজেই বাইরের কেউ কক্ষনও বেড়ালটাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যায়নি।

সন্ন্যাসী চেহারার দোকানদার বলেছিল,—মন্তরপড়া বেড়াল। চোখে-চোখে রাখবেন। রাতবিরেতে হঠাৎ জ্যান্ত হয়।

ভ্যাট! ওসব গাঁজাখুরি কথা।

কিন্তু ধাঁধাটা থেকে গেল। সেইসঙ্গে অস্বস্তিও বেড়ে গেল।...

রাত্তিরে ডন শোয় পিঙ্কির কাছে। কিন্তু পিঙ্কি সে-রাতে ডনকে কিছুতেই কালো বেড়াল নিয়ে শুতে দেবে না। অগত্যা দিদি ছেলেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমার ঘরে শুতে পাঠিয়েছিল। ডন আমার পাশে শুয়ে চাপাগলায় বলল,—মা আমার বিড়ালের জন্য অনেকটা দুধ দিয়েছে, মামা! দেখবে, আর ও পালাবে না। রাত্তিরে ওর আরও খিদে পাবে তো? পেট ভরে গেলে তখন ঘুমিয়ে পড়বে। আচ্ছা মামা! ওর একটা সুন্দর নাম বলো না?

বললুম,—কালু রাখতে পারিস। কিংবা কালুয়া। নাকি কাল্লু রাখবি?

—ভ্যাট! ওসব বিচ্ছিরি নাম। একটা ইংরিজি নাম বলো তো মামা?

—ব্ল্যাকি।

—না, না। সুন্দর নাম বলো!

—এখন কিছু মাথায় আসছে না। কাল রাখব'খন। ঘুমিয়ে পড়।

ডন একটু ঘুমকাতুরে ছেলে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু অস্বস্তিতে আমার ঘুম আসছিল না। বারবার মনে হচ্ছিল, বেড়ালটা যদি আবার কিছু করে বসে? যদি চুপি-চুপি মশারির ভেতরের ঢুকে আমার গলায় কামড় বসায়? ডনের দিকে যেন ওর দৃষ্টি নেই। ব্যাটাচ্ছেলের শুধু আমার দিকে চোখ। আর কী হিংস্র ওর চাউনি!

টর্চটা মাথার পাশে রেখে দিয়েছিলুম। একটু শব্দ শুনলেই টর্চ জ্বালব। তারপর যদি -সত্যি ওই হতচ্ছাড়া বেড়ালটা কোনও কাণ্ড বাধায়, ওকে লাঠিপেটা করব। আগেভাগে তাই মন্টুর লাঠিটা এনে এ ঘরে বিছানার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখেছিলুম।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

সেই ঘুম হঠাৎ কেন ভেঙে গেল জানি না। রাস্তার দিকের জানালা বন্ধ ছিল।

শুধু বাড়ির ভেতরের দিকের একটা জানলা খোলা ছিল। ভেতরের বারান্দায় সারারাত একটা চল্লিশ ওয়াটের বালব জ্বলে। মশারির ভেতর থেকে সেই আলোটা আবছা দেখা যায়। কিন্তু ঘুম ভেঙে দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকার। ফ্যানের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তার মানে লোডশেডিং। তারপর কানে এল বৃষ্টির শব্দ। বুঝতে পারলুম, ভ্যাপসা গরমের জন্যই ঘুম ভেঙেছে। তারপরই মনে পড়ে গেল বেড়ালটার কথা। অমনি মশারির একটা পাশ একটুখানি তুলে টর্চ জ্বাললুম। কিন্তু কী আশ্চর্য! বেড়ালটাকে দেখতে পেলুম না। অস্বীকার করছি না, সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠেছিল। এদিকের দুধের বাটিটা তেমনি রাখা আছে।

মাথা বের করে টর্চের আলো ফেলে দেখলুম, বাটিতে একটুও দুধ নেই। দেখামাত্র আতঙ্কে টর্চের সুইচ থেকে আঙুল সরে গেল। আবার ঘন অন্ধকারে ঘর ভরে গেল। বৃষ্টিটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। মশারির ভেতর মাথা ঢুকিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলুম। মন্টুর লাঠিটা কী কাজে লাগাব ভেবেই পেলুম না।

কতক্ষণ নিঃসাড় অবস্থায় শুয়ে থাকার পর হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠে বসলুম। ডনের ঘুম ভাঙানো যাবে না। তাছাড়া ওকে জাগিয়েই বা কী হবে? যদি বা ওকে জাগানো যায়, বেড়াল নেই শুনেই ও চ্যাঁচামেচি শুরু করবে।

সাবধানে মশারি থেকে বেরিয়ে টর্চ জ্বেলে মন্টুর লাঠিটা নিলুম। তারপর ঘরের ভেতরে চেয়ার-টেবিল-খাট এবং বইয়ের র‍্যাকের তলায় আলো ফেলে বেড়ালটা খুঁজে দেখলুম। কোথাও বেড়ালটা লুকিয়ে নেই। তাহলে কি ভুতুড়ে কালো বেড়ালটা রাতদুপুরে সত্যি জ্যান্ত হয়ে দুধ সাবাড় করে পালিয়ে গিয়েছে?

দরজা খুলে বেরুতে সাহস হচ্ছিল না। খোলা জানালাটার কাছে গিয়ে বাইরে টর্চের আলো ফেললুম। বৃষ্টিটা এবার জোরালো হয়েছে। বৃষ্টির ছাটে বারান্দা ভিজে গিয়েছে। জ্যান্ত বেড়াল জলকে বেজায় ভয় পায়। কিন্তু এই বেড়ালটা তো ভুতুড়ে। কাজেই তার কথা আলাদা। এতক্ষণে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। তারপর শুরু হল মেঘের গর্জন। তার কিছু করার নেই। টর্চের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। যদি আচমকা ভুতুড়ে কালো বেড়ালটা পেছন থেকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

কথাটা ভাবামাত্র সব সাহস উবে গেল। ঝটপট মশারির ভেতর ঢুকে পড়লুম। লাঠিটা এবার বিছানায় আমার পাশেই রেখে দিলুম। আতঙ্কে আর ঘুম আসতে চাইছিল না। বৃষ্টির জন্য ভ্যাপসা গরমটা অবশ্য আর ছিল না।...

দিদির ডাকাডাকিতে চোখ খুলে দেখি, ভোর হয়ে গেছে। ডন তখনও বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। সাড়া দিয়ে বললুম,—কী হয়েছে?

জানালার ওধার থেকে দিদি খাপ্পা মেজাজে বলল,—এসব তোরই কীর্তি। ডনের মাথায় যত দুষ্টু বুদ্ধি তুই-ই যোগাচ্ছিস।

মশারি থেকে বেরিয়ে বললুম,—আহা, হয়েছেটা কী বলবে তো?

দিদি বলল,—পিঙ্কি কালো বেড়ালকে ভয় পায়। তাই তোরা মামা-ভাগ্নে মিলে

রাত্তিরে কখন খেলনা-বেড়ালটাকে পিঙ্কির ঘরের দরজার সামনে রেখে এসেছিস। দরজা খুলেই পিঙ্কি ভয় পেয়ে কেঁদে-কেটে অস্থির!

বলে দিদি বাঁ-হাতে সেই কালো বেড়ালটা জানালা গলিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দিল। তারপর গজগজ করতে-করতে চলে গেল।

অবাক হয়ে দেখলুম, সেই বেড়ালটাই বটে। টেবিলের পায়ার কাছে চার ঠ্যাং তুলে আছড়ে পড়েছে। দিদি ওটাকে রাগের চোটে এত জোরে ছুড়েছে যে বেচারার পেট ফেঁসে গিয়েছে এবং ভেতরে ঠাসা কয়েক টুকরো স্পঞ্জ বেরিয়ে পড়েছে।

দিনের বেলায় আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ডন জেগে ওঠার আগেই কালো বেড়ালটাকে তুলে নিয়ে ফাটা জায়গায় স্পঞ্জের টুকরোগুলো ঠেসে ঠিকঠাক করে দিলুম। লক্ষ করলুম পেটটা কালো সুতো দিয়ে সেলাই করা ছিল। সেই সুতো টেনে কোনওরকমে গিঁট দিয়ে রাখলুম। তারপর বেড়ালটাকে দুধের বাটির কাছে আগের মতো বসিয়ে দিলুম।

কিন্তু প্রশ্ন হল, বেড়ালটা এ ঘর থেকে পিঙ্কির ঘরের দরজার সামনে গেল কী করে? আর বাটির দুধই বা কে খেল?

মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। একটু পরে ডনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললুম,—তোর বেড়াল খিদের চোটে সবটুকু দুধ সাবাড় করেছে!

ডন ধড়মড় করে উঠে মশারি থেকে বেরিয়ে এল। তারপর আহ্লাদে আটখানা হয়ে বেড়ালটাকে খুব আদর করতে থাকল। বলল,—মামা! আজই কিন্তু একটা ভালো ইংরেজি নাম চাই। নইলে কী হবে বুঝতে পারছ তো?

আনমনে বললুম,—ডিকশনারি খুঁজে ভালো একটা নাম দেব। তুই ভাবিসনে।

সেদিন ছিল সোমবার। আমি গেলুম অফিসে। ডন গেল স্কুলে। বেড়ালটা আমার ঘরে রেখে গিয়েছিল ডন। বাটিতে যথারীতি দুধও রেখেছিল সে। অফিস থেকে আমার ফিরতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখি, ডন প্রচণ্ড হই-চই বাধিয়েছে। দিদি ছেলেকে সামলাতে পারছে না। ব্যাপার কী?

পিঙ্কি আমাকে দেখে হাসতে-হাসতে বলল,—জানো মামা কী হয়েছে? একটু আগে ভোঁদার পিসিমা এসেছিলেন। ডনের বেড়ালটা নাকি কখন ওঁদের বাড়ি গিয়ে ওঁর হুলোর সঙ্গে ভাব জমাতে চেয়েছিল। আর হুলো অমনি ডনের বেড়ালটাকে কামড়ে ধরে আছাড় মেরেছে। তারপর নখের আঁচড়ে ফালাফালা করে ফেলেছে। ওই দেখো না মামা! উঠোনে পড়ে আছে।

উঠোনের কোণে কালো একটা ন্যাতার মতো জিনিস দেখতে পেলুম। শুধু মুন্ডুটা ঠিকঠাক আছে এইমাত্র।

ডনকে কিছু বলার আগে ঘরে ঢুকে দুধের বাটিটা দেখতে গেলুম। আশ্চর্য ব্যাপার, বাটিতে একফোঁটা দুধ নেই। বাটিটা অবশ্য কাত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু মেঝেতে দুধের কোনও চিহ্ন নেই।

হঠাৎ মনে হল, ভোঁদার পিসিমার হুলো বেড়ালটাই কি কাল সন্ধ্যায় এ ঘরে

এসে দুধ সাবাড় করার পর ডনের বেড়ালটাকে বারান্দায় রেখে গিয়েছিল? হুলোই কি আজ দিনের বেলায় আবার এসে—

নাহ। ভোঁদাদের বাড়ি এ বাড়ি থেকে দুটো বাড়ির পরে। হুলোর গায়ে এত জোর নেই যে একটা খেলনার বেড়াল অতদূরে বয়ে নিয়ে যাবে। তাছাড়া হুলো এ বাড়িতে এসে উৎপাত করত বলে মন্টু একটা ফাঁদ পেতেছিল এবং সেই ফাঁদে হুলোর লেজের ডগা আটকে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত লেজের ডগাটুকু ফেলে হুলো প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে এ বাড়িতে আর তাকে দেখা যায় না।

কাজেই রহস্যটা থেকেই যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে ডনের তাগিদে কালো বেড়ালের সেই ছেঁড়াখোঁড়া মড়াটা নিয়ে আবার রথের মেলায় যেতে হল। কিন্তু সন্ন্যাসী চেহারার সেই দোকানদার তার দোকান গুটিয়ে চলে গেছে। রাগ করে ডন কালো বেড়ালের মড়াটা ঝিলের জলে ছুড়ে ফেলে বলল,—মন্টুটা আসুক! তারপর হুলোকে ফাঁদে আটকে মুন্ডু কেটে বলি দেব।

ওকে আশ্বাস দিয়ে বললুম,—হ্যাঁ। হুলোটাই তোর বেড়ালটাকে মেরে ফেলেছে।

কথাটা বললুম বটে, তবে ধন্দটা মনে থেকে গেল। আজও থেকে গিয়েছে।..

ঝড়ে-জলে-অন্ধকারে

সেবার ঝাঁপুইহাটি গ্রামে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়েছিলুম। উদ্যোক্তা তরুণ সংঘ নামক ক্লাবের ছেলেগুলি খুব ভদ্র। তাই তাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারিনি। কথামতো তারা গাড়ি এনেছিল। কলকাতা থেকে গাড়িতে চেপে ঝাঁপুইহাটি পৌঁছতে ঘণ্টা তিনেক লেগেছিল। সভা শুরু হওয়ার কথা পাঁচটায়। ঠিক সময়েই পৌঁছেছিলুম।

গ্রামটি বনেদি, তা গাছপালার ফাঁকে অনেক পুরোনো একতলা-দোতলা বাড়ি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। নতুন পাকা বাড়িও কম নেই। তবে রবীন্দ্রজয়ন্তীর আয়োজন যেখানে করা হয়েছে, সেটা গ্রামের শেষ দিকটায় একটা ছোট্ট খেলার মাঠ। মাঠের একপ্রান্তে পুরোনো একটা মন্দির। অন্যপ্রান্তে একটা বিশাল বট গাছ। গ্রামের উৎসব পালা পার্বণ উপলক্ষে এখানে মেলাও বসে। ক্লাবের ছেলেরা আমাকে একথা জানিয়েছিল।

সুন্দর রঙিন প্যান্ডেল। সেখানে টেবিল-চেয়ার পাতা ছিল। পেছনে রবীন্দ্রনাথের একটা বড় ছবি। মাইকে এক যুবক ঘন-ঘন ঘোষণা করছিল,—মাইক টেস্টিং! হ্যালো! ওয়ান...টু...থ্রি! প্যান্ডেলের সামনে নিচে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা তুমুল চ্যাঁচামেচি

করছিল। তাদের পেছনে নানা বয়সি লোকের ভিড় জমেছিল। আমাকে প্যান্ডেলের পেছন দিকে চেয়ারে বসিয়ে একটি ছেলে কাঁচুমাচু মুখে বলেছিল,—চা খান স্যার! একটু দেরি হবে। আমাদের এলাকার জননেতা সবার প্রিয় পন্টুদা এলেই সভা শুরু করব।

একটু পরে মাইক্রোফোনে হিন্দি ফিল্মের গান শুরু হয়ে গেল। আমি তো অবাক! এ কী করছে এরা? অনুষ্ঠানের সভাপতি স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টারমশাই। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে বললেন,—দেখছেন কাজ?

বলে তিনি ব্যস্তভাবে একটি ছেলেকে ডাকলেন।—ও অশোক! রবীন্দ্রজয়ন্তীতে এ কী গান বাজছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাতে বলো।

অশোক ছুটে গেল মাইকওয়ালার কাছে। তারপর ফিরে এসে বলল,—মাইকম্যানের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের টেপ নেই স্যার।

হেডমাস্টারমশাই বললেন,—তাহলে থামাতে বলো! ছ্যা-ছ্যা! রবীন্দ্রনাথবে অপমান করা হচ্ছে যে!

অশোক আবার ছুটে গেল। নবীন সংঘের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এল। বলল,—স্যার! মাইক বাজানো বন্ধ করলে লোক জমবে না। একটু ওয়েট করুন স্যার! এক্ষুনি পন্টুদা এসে গেলেই ওসব বন্ধ হয়ে যাবে।

অবশ্য মাঝে-মাঝে গান থামিয়ে এক যুবক ঘোষণা করছিল,—বন্ধুগণ! আজ আমাদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত হয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক হেরম্বকুমার—ইয়ে, মানে—

একটি ছেলে খাপ্পা হয়ে তাকে চাপা গলায় বলে দিল,—হেরম্বকুমার ঘাঁটি।

মাইকে কথাটা শোনা গেল। কিন্তু কী আর করা যাবে? আমার নাম হেমন্তকুমার হাটি। ঝাঁপুইহাটিতে এসে হয়ে গেলুম কি না হেরম্বকুমার ঘাঁটি! যাই হোক, আবার হিন্দি গানের গর্জনে সব চাপা পড়ে গেল। কতক্ষণ পরে আলো জ্বলে উঠল প্যান্ডেলে এবং পেছনদিকের তেরপলে ঘেরা জায়গাতে। ঘড়ি দেখলুম। ছটা বেজে গেছে।

ছটা পনেরো মিনিটে হঠাৎ মাইক্রোফোনের গান থেমে গেল। সেই যুবকটি ঘোষণা করল,—বন্ধুগণ! আমাদের এরিয়ার বিশিষ্ট জননেতা শ্রীপণ—পণ-পঞ্চানন ঢোল মহাশয়— আমাদের সবার প্রিয় নেতা পন্টুদা এইমাত্র এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখনই সভা শুরু হবে। মাননীয় প্রধান অতিথি সুসাহিত্যিক হেরম্বকুমার ঘাঁ-ঘাঁ—ঘাঁটি মহাশয় এবং এই সভার সভাপতি হেডমাস্টার মহাশয় শ্রীঅহিভূষণ চ-চ-চট্টো-সরি—চক্রবর্তীকে প্যান্ডেলে আসার জন্য অনুরোধ করছি।

যাই হোক, প্যান্ডেলে তো গিয়ে বসলুম। প্রথমে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে মাল্যদান ঘোষণা করলে যুবকটিকে সরিয়ে আরেক যুবক ঘোষণা করল,—সবার আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে মাল্যদান করবেন আমাদের সবার প্রিয় পন্টুদা!

পন্টুদা বেঁটে মোটাসোটা মানুষ। গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, পরনে ধুতি। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে মাল্যদান করেই মাইকের সামনে চলে এলেন। করজোড়ে নমস্কার

করে বললেন,—বন্ধুগণ! তরুণ সংঘের প্রিয় তরুণদল! প্রধান অতিথি সাহিত্যিক মহাশয়! সভাপতি মহাশয়! এখনই বাবুগঞ্জের একটি অনুষ্ঠানে আমাকে যেতে হবে। তাই দুঃখের সঙ্গে বিদায় নেওয়ার আগে বিশেষ করে তরুণ সংঘের তরুণ দলের উদ্দেশে দুটো কথা বলে নিই। তোমরা তরুণ! তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ! তাই তো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তোমাদের জন্য লিখেছেন,

'ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল!'

সর্বনাশ! এ যে রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়। এই কবিতা বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত মার্চ সঙ্গীত। কেউ ওঁকে বাধা দিচ্ছে না কেন?

হেডমাস্টারমশাই আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁর দিকে তাকালুম। তারপর হেডমাস্টারমশাই ফিসফিস করে বললেন,—ওঁকে থামাও। ওঁকে থামাও!

কার সাধ্য পন্টুদাকে থামায়? বেঁটে মানুষ। একহাত মুঠো করে ওপরে তুলে গর্জন করে কবিতা বলছেন,—বিশ্বকবি তোমাদের আরও বলেছেন—

'...নব-নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নতুন প্রাণ...'

হ্যাঁ। আমাদের অজ্ঞাতসারে পন্টুদাকে থামানোর আয়োজন চলছিল। বিশ্বকবির জন্মজয়ন্তীতে এই উল্টোপুরাণ সে বরদাস্ত করবে কেন?

আচম্বিতে চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। পরক্ষণে কড়-কড়-কড়াৎ করে কানে তালা ধরানো মেঘ ডাকল। তারপরই প্যান্ডেল মচমচ করে উঠল। আবার বিদ্যুতের ঝিলিক। আবার মেঘ গর্জন। তারপর সব আলো নিভে গেল। কারা চেঁচিয়ে উঠল,—পন্টুদাকে টর্চ দেখাও! টর্চ দেখাও!

তাঁকে কারা টর্চের আলো জ্বেলে ধরাধরি করে প্যান্ডেল থেকে নামাচ্ছে দেখলুম। ততক্ষণে এসে পড়েছে সে। তার নাম কিনা কালবোশেখি। প্যান্ডেলের তেরপল আর কাপড়ের সাজ নৌকোর পালের মতো উড়তে থাকল। প্যান্ডেলের বাঁশগুলো মচমচ শব্দে আর্তনাদ করতে লাগল। ওদিকে ছোট ছেলেমেয়েদের চিৎকার, কান্না, বয়স্কদের হট্টগোল—সব মিলিয়ে সে এক বিভীষিকা!

প্যান্ডেল ভেঙে পড়ার ভয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়েছিলুম। সভাপতি হেডমাস্টারমশাইয়ের আর্তনাদ শুনতে পেলুম,—অশোক ও অশোক! আমি চাপা পড়ব যে!—

তারপর নিরাপদ দূরত্বে যেই পৌঁছেছি, শুরু হয়ে গেল চড়বড় শব্দে বৃষ্টি। কালবোশেখির ঝড়ের সঙ্গে জোরালো বৃষ্টি এসে প্রলয়কাণ্ড বাধাল।

মাথা বাঁচাতে বিদ্যুতের ঝিলিকে বটগাছটাকে দেখামাত্র ছুটে গেলুম। কিন্তু

মুহুর্মুহু মেঘের হাঁকডাক, বিদ্যুতের ছটা আর বৃষ্টির দাপটে সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে ভরসা পেলুম না। বটগাছটার ডাল ভেঙে পড়তে পারে। বাজ পড়তেও পারে বটগাছের মাথায়। প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজছিলুম।

সেই সময় গাছপালার ফাঁকে একটা একতলা বাড়ি বিদ্যুতই দেখিয়ে দিল। ভিজতে-ভিজতে এবং ঝড়ের দাপটে কুঁজো হয়ে সেই বাড়ির দিকে ছুটে চললুম।

বাড়িটার সামনে বারান্দা আছে। কিন্তু বৃষ্টির বাঁকা তিরে সেখানে বিদ্ধ হচ্ছি। হঠাৎ দেখলুম, বারান্দার একপাশে একটা খোলা দরজা। মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়লুম ঘরে। অমনি কেউ খ্যানখেনে গলায় বলে উঠল,—কে? কে?

বললুম,—আজ্ঞে আমি।

—আমি কে? আমি কি মানুষের নাম হয় নাকি?

—আমার নাম হেমন্তকুমার হাটি।

—হাটি? এ পদবি তো আমাদের ঝাঁপুইহাটিতে নেই কারও। বাড়ি কোথায়?

—কলকাতা!

—অ্যাঁ? কলকাতার লোক এখানে কেন?

—আজ্ঞে, আমি এখানে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এসেছিলুম। আমি একজন লেখক।

—লেখক? কী লেখেন?

অন্ধকারে কে কথা বলছে, তাকে দেখছে পাচ্ছি না। বিরক্ত হয়ে বললুম,—গল্প লিখি।

—কীসের গল্প লেখেন, শুনি?

—ভূতের গল্প—

—কী? কী? ভূতের গল্প লেখেন?

একটু হকচকিয়ে গেলুম খ্যানখেনে বিদঘুটে গলার ধমকে। বললুম,—চোরের গল্পও লিখি।

—কী? কী? চোরের গল্পও লেখেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে-সব রকমের গল্পই লিখি।

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে অদ্ভুত হাসল লোকটা। এই বাড়ির কর্তাই হবে নিশ্চয়। সে কয়েকবার হেসে বলল,—তা হেরম্ববাবু—

—আজ্ঞে, আমার নাম হেমন্ত।

—ওই হল! মাইকে তো অ্যানাউন্স করছিল হেরম্বকুমার—কী যেন? ঘাঁটি! যাকগে। তা ঘাঁটিবাবু, আপনি ভূতের গল্প লেখেন। চোরের গল্প লেখেন। কী করে লেখেন? কখনও ভূত দেখেছেন?

—আজ্ঞে না। ভূতে আমার বিশ্বাস নেই। কল্পনা করে লিখি। যেমন ধরুন চোরের গল্প। আমি নিজে কখনও চুরি করিনি। তবু কল্পনার জোরে চোরের গল্প লিখি।

এই সময় বাইরে থেকে কেউ ঘরে ঢুকল। বিদ্যুতের ঝিলিকে এক নিমেষে আবছা একটা লোককে দেখতে পেলুম মাত্র। সে বলল,—খুড়োমশাই! কার সঙ্গে গল্প করছেন?

—কে রে? পাঁচু নাকি? কোথায় ছিলিস এই ঝড়-বাদলায়।

পাঁচু বলল,—শ্মশানতলায় মড়াপোড়ানো দেখছিলুম খুড়োমশাই! ঝড়বৃষ্টিতে লোকগুলো বেচারা আধপোড়া মড়াটাকে ফেলে পালিয়ে গেল। মড়াটা আমাকে দেখতে পেয়ে কাকুতিমিনতি করতে লাগল। একটু কাছে থাকো না দাদা! কথায় বলে, একা না বোকা!

খুড়োমশাই সেই খ্যাঁক-খ্যাঁক হেসে বলল,—তা তুই তাকে ফেলে চলে এলি যে?

—না, না। পালিয়ে আসা যায়? আধপোড়া মড়া। চিতার কাঠ ভিজে গিয়েছিল না? তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছিলুম। হাঁটতে পারে না। ওই সে আসছে এতক্ষণে।

কথাবার্তা শুনে ততক্ষণে প্রচণ্ড আতঙ্কে আমার বৃষ্টিভেজা শরীর অবশ হয়ে গেছে। এরা কারা? তাছাড়া এখনই যে-কোনও সময়ে শ্মশানের চিতা থেকে আধপোড়া একটা মড়া এসে পড়বে! আমি দেয়াল ঘেঁষে একটু-একটু করে দরজার দিকে সরে যাচ্ছিলুম।

পাঁচু বলল,—এই লোকটা কে খুড়োমশাই?

খুড়োমশাই বলল,—কলকাতার এক লেখক। বলে কিনা ভূতের গল্প লেখে। চোরের গল্প লেখে। হেরম্ববাবু! এই দেখুন একজন চোর। এর নাম পাঁচু-চোর। খুব বিখ্যাত চোর ছিল পাঁচু।

বললুম,—ছিল মানে?

—ও পাঁচু! এই বুদ্ধি নিয়ে লেখক হয়েছে। কালজ্ঞান নেই। ছিল যে অতীত কাল, তা-ও বোঝে না! ছ্যা-ছ্যা!

বাইরে কেউ বলে উঠল,—আরে কী আশ্চর্য! বঙ্কুখুড়ো যে! লোকটা তো আমাকে বলল না এই বাড়িতে তুমি আছো?

—কে রে? কিনু নাকি? আয়, আয়। এই পাঁচু! তুই কিনুকে চিনতে পারিসনি? গাধা কোথাকার!

পাঁচু রাগ করে বলল,—খুড়োমশাইয়ের সব ভালো। শুধু এই এক দোষ। গাধা বলা! এইজন্য কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে।

দরজা দিয়ে কিনু ঘরে ঢুকে পড়ল। সে বলল,—পাঁচু আমাকে চিনতে পারবে কী করে? আমিই বা পাঁচুকে চিনতে পারব কী করে? দশ বছর আগে কালুডিহির ঘোঁতনবাবুর ঘরে একসঙ্গে সিঁদ কেটে ছিলুম। তারপর আর দেখাসাক্ষাৎ নেই। ছিলে কোথায় হে পাঁচু?

আমার নাকে এবার সত্যি মড়াপোড়া কটু গন্ধ লাগল। আমি দরজা দিয়ে

পালানোর তালে আছি। কিন্তু আধপোড়া কিনুর মড়া যদি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

খুড়োমশাই এই সময় আবার খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বিদঘুটে হেসে বললেন,—কী হেরম্ববাবু? লেখক হয়েছেন। ভূতের গল্প লেখেন। চোরের গল্প লেখেন। স্বচক্ষে কখনও ভূত আর চোর—মানে চোর আর ভূত একসঙ্গে দেখেছেন?

বললুম,—মনে হচ্ছে, এবার দেখলুম।

কিনু বলে উঠল,—কী সর্বনাশ! বঙ্কুখুড়ো করেছ কী? ঘরে লেখক ঢুকিয়ে বসে আছো? তুমি ছিলে তল্লাটের দুঁদে দারোগাবাবু! তোমার দাপটে চোরে-ভূতে আর ভূতে-চোরে একঘাটে জল খেত। ঘরে লেখক ঢোকালে সব ফাঁস করে লিখে দেবে যে! লিখবে, পুলিশের দারোগা ছিল যে, সে কিনা চোরে-ভূতে আর ভূতে-চোরে একত্র করে আড্ডা দিচ্ছে!

বললুম,—বঙ্কুবাবু! আপনিও তাহলে অতীত কালে?

খুড়োমশাই সগর্জনে বললেন,—আমার নাম বঙ্কুবিহারী ধাড়া। আমাকে নিয়ে গল্প লিখলে দুহাতে হাতকড়ি পরাব। সাবধান!

—আজ্ঞে না লিখব না। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি না। ওরা দুজনে অতীতকাল। আর আপনিও অতীতকাল। কিন্তু ওরা সিঁদেল চোর। আর আপনি পুলিশের দারোগা। এই চোর-পুলিশ একত্র হয় কী করে, একটু বুঝিয়ে দেবেন? তাছাড়া চোরের খুড়োই বা পুলিশ হয় কী করে?

পাঁচু আর কিনু হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করে হেসে উঠল। বঙ্কুখুড়োও খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসতে লাগল। তারপর বলল,—ওহে লেখক! এটুকুও বোঝো না! তবে এই গানটা শোনো। বলে তিনি বিদঘুটে গলায় গান গেয়ে উঠলেন—

—হরি, ওহে দয়াময়!
এ ভব সংসারে চক্ষু মুদিলে
সবই একাকার হয়।।

পাঁচু অরা কিনু ধুয়া ধরল,—হরি, ওহে দয়াময়।

এইবার পালানোর সুসময়। তিনজনে মিলে গান ধরেছে অন্ধকারে। আমি সেই সুযোগে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলুম। একটু দূরে টর্চের আলো জ্বলল। তখনও বৃষ্টি ঝরছে। তবে বাতাস কমেছে। ভিজে জবুথবু হয়ে সেই আলো লক্ষ করে ছুটে গেলুম। আমার ওপর টর্চের আলো পড়তেই কেউ বলে উঠল,—এই তো প্রধান অতিথি।

আরেক জন এগিয়ে এসে বলল,—আরে! এ কী অবস্থা হয়েছে আপনার? ছিলেন কোথায়?

কাঁপতে-কাঁপতে বললুম,—ওই একতলা বাড়িতে।

—কী সর্বনাশ। ওটা তো পোড়োবাড়ি। ওই বাড়িতে নাকি বঙ্কুবিহারী ধাড়া নামে পুলিশের এক দারোগা থাকতেন। রিটায়ার করে মারা যান। তাই ওর ছেলেমেয়েরা এখন কলকাতায় আছে। কোনও ইয়ে-টিয়ে দেখেননি তো? মানে—ভূ-ভূ—

ঝটপট বললুম,—না, না। বড্ড শীত করছে।

তারা ছাতার আড়ালে আমাকে নিয়ে চলল, মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, আর কখনও কোথাও কোনও অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে যাব না। রবীন্দ্রনাথের নামে নজরুল, দারোগা আর চোরের নামে ভূ-ভূ—

নাহ্। কথাটা বলতে নেই। চেপে যাওয়াই ভালো।...

কেংকেলাস

গদাধরবাবু বললেন,—আমার ধানবাদের পিসিমাকে তো তোমরা দেখেছ। পিসিমার খুড়শ্বশুরের নাতির নাম ছিল অশ্বিনী। অশ্বিনীর সম্বন্ধীয় মাসতুতো দাদা হল গিয়ে নগেন। নগেনের মেজকাকার বড় ছেলে নিবারণ। নিবারণের শ্যালক হরেনের ছেলের নাম সত্যেন। সত্যেনের ভগ্নিপতির পিসতুতো ভাইয়ের...

সাতকড়ি গোঁসাই খেপে গিয়ে বললেন,—মলো ছাই! হলটা কী, তা বলবে না। খালি কার পিসি, কার দাদা, কার শ্যালক!

রমণী মুখুয্যে বললেন,—আহা! বলতে দাও, বাধা দিচ্ছ কেন? খোলাখুলি পরিচয় না দিলে বুঝবে কেন তোমরা? বলো হে গদাইভায়া, বলো।

গদাধর কিন্তু গোঁসাইয়ের ওপর চটেছেন বাধা পড়েছে বলে। বাঁকামুখে বললেন,—আর বলব না।

অমনি হইচই উঠল আড্ডায়। রমণীবাবু, বটকুবাবু, বংশীলোচনবাবু একসঙ্গে বলে উঠলেন,— বলো, বলো। আমরা শুনব।

একঘরে হয়ে যাচ্ছেন টের পেয়ে অগত্যা গোঁসাইও মিনমিনে গলায় বললেন,—আহা! গল্পের রস বলে একটা কথা আছে তো! তাই বলছিলাম, শর্টকাটে এলে রসটা জমে ভালো। গদাই, কিছু মনে কোরো না ভায়া। নাও, শুরু করো।

তখন গদাধর তাঁর উল্লেখযোগ্য আরামকেদারায় একটু চিতিয়ে চোখ বুজে হঠাৎ বললেন,—কেংকেলাস!

আড্ডার সবাই থ। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন পরস্পর। তারপর বটুকবাবুই প্রশ্ন করলেন,—কী বললে?

—কেংকেলাস!

রমণীবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন,—তার মানেটা তো বুঝতে পারলাম না গদাই! হঠাৎ কেং কৈলাস-টৈলাস...এর মানে?

গদাধর গম্ভীরমুখে বললেন,—কেংকৈলাস নয়, কেংকেলাস।

গোঁসাই ওঁর দিকে ঝুঁকে বললেন,—কেংকেলাসটা কী শুনি?

গদাধর তেতোমুখে বললেন,—তোমাদের মাথায় তো খালি গোবর পোরা। সহজে কিছু বোঝানো যাবে না। যার কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কেংকেলাসের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তারই মারফত।

বংশীলোচনবাবু রাশভারী মানুষ। জমিদারি ছিল তাঁর বাবার আমলে। এখনও সেই আমলের পাদানিওয়ালা কালো কুচকুচে ফোর্ড গাড়িটা আছে। সেটা হাঁকিয়েই এই আড্ডায় আসেন। তাঁকে সবাই খুব খাতির করেন। তিনি বললেন,—মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। শুরু করো গদাইভায়া।

গদাধর উৎসাহিত হয়ে বললেন,—রহস্যময় মানে? রীতিমতো মিসট্রিয়াস। এই দেখো না! লোমগুলো কেমন সূচের মতো হয়ে গেল! দেখো, দেখো!

গোঁসাই বললেন,—হ্যাঁ, ক্ষান্তপিসি অনায়াসে কাঁথা সেলাই করতে পারবে। বলো, বলে যাও!

গদাধর ফের চটতে গিয়ে হেসে ফেললেন। বললেন,—তুমি তো বরাবর অবিশ্বাসী। ভূত-ভগবান কিস্যু মানো না। তবে কেংকেলাসের পাল্লায় পড়লে ঠ্যালাটা বিলক্ষণ টের পেতে। যাকগে, তোমাকে কিছু বোঝানো বৃথা।

বলে একটিপ নস্যি নিয়ে বিকট একটা হ্যাঁচ্চো করে রুমালে নাক মোছার পর গদাধর বকসী শুরু করলেন।

—হ্যাঁ, কদ্দুর বলেছিলাম যেন? সেই সত্যেনের ভগ্নিপতির পিসতুতো ভাইয়ের নাম ছিল ভূতনাথ। এই ভূতনাথ বড্ড ডানপিটে সাহসী ছেলে ছিল। আর তখন আমারও বয়স কম। আমার গায়েও তখন একটা খুদে পালোয়ানের জোর। দুজনেই ক্লাস টেনের ছাত্র—তখন বলা হতো ফার্স্ট ক্লাস। তো সেবারে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে গেছি ধানবাদ। ভূতনাথ আর আমি দিনরাত টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে-সেখানে। ওদিকে তো খালি খনি আর খনি। মাটির তলায় টন-টন কয়লার চাঙড়। সেইসব কয়লা তোলা হচ্ছে সুড়ঙ্গ কেটে। আমি নতুন গেছি বলে ভূতনাথ ঘুরে-ঘুরে সব দেখাচ্ছে। ওর অনেক আত্মীয় খনিতে চাকরি করেন। তাই একেবারে খনির ভেতরে—মানে পাতালপুরীতে গিয়ে সব দেখছি-টেখছি। এইসময় একদিন হঠাৎ ভূতনাথ বলল,—গদাই, এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে সিন্দ্রির ওদিকে মাঠের মধ্যে একটা পোড়ো-খনি আছে, যাবে সেখানে? আমি উৎসাহে চনমন করে উঠলাম। পোড়ো-বাড়ির মতো পোড়ো-খনিও যে থাকে জানতাম না কিনা। এইসব খনি থেকে খনিজ জিনিস তুলে শেষ করা হয়েছে। তারপর আর সেখানে কেউ যায় না। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ, গুহা আর যেন পাতালপুরী খাঁ-খাঁ করে। অবশ্য সেইসব পোড়ো-খনির মুখ বন্ধ করে দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু ভূতনাথ যেটার কথা বলল, সেটা নাকি বন্ধ করা যায়নি। কেন যায়নি, সেটাই বড় রহস্যময়। যতবার বন্ধ করা হয়েছে, ততবার দেখা গেছে কে বা কারা মাটি-পাথর সরিয়ে ফেলেছে। তো এই খনিটা ছিল অভ্রের।

গোঁসাই বললেন,—অভ্রের?

হ্যাঁ, অভ্রের—বলে গদাধরবাবু চোখ বুজলেন আবার। একটু-একটু দুলতে

থাকলেন। এমন সময় ওঁর নাতি আর নাতনি, মুকুল আর মঞ্জুও এসে জুটল। তাদের সঙ্গে গদাধরের চাকর তিনকড়ি একটা ট্রে সাজিয়ে চা-চানাচুর আনল। সঙ্গে-সঙ্গে খুব জমে উঠল আড্ডা।

মুকুল বলল,—কীসের গল্প দাদু? ভূতের, না রাক্ষসের? আমি ভূতেরটা শুনব।

মঞ্জু বলল,—না, না দাদু। আমি শুনব রাক্ষসের।

গদাধর একটু হেসে বললেন,—তাহলে চুপটি করে বোসো। গল্প নয়—একেবারে সত্যি ঘটনা। ভূতেরও বলতে পারো, রাক্ষসেরও বলতে পারো।

গোঁসাই ফিক করে হেসে বললেন,—তাহলে সন্ধি করে নাও। ভূত্রাক্ষসের গল্প। ভূত্রাক্ষস নিশ্চয় সাংঘাতিক ব্যাপারই হবে।

তুমি থামো তো!—ধমক দিয়ে গদাধর ফের শুরু করলেন। চায়ে চুমুক দিতেও ভুললেন না। ঘরে এখন শুধু চানাচুরের মুচমুচে শব্দ আর চায়ের সুড়ুৎ-সুড়ুৎ! কে জানে কেন, মুকুল আর মঞ্জু দাদু আর তাঁর বন্ধুদের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপিচুপি হাসতে থাকল। কিন্তু সে হাসি মিলিয়ে যেতে দেরি হল না অবশ্য।

গল্পটা আর গদাধরবাবুর মুখের কথায় না সাজিয়ে চলতি কায়দায় বলা যাক।...

তো কিশোর বয়সি গদাধর আর ভূতনাথ একদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বেরিয়ে পড়ল সিন্দ্রির মাঠে। সেই পোড়ো অভ্রখনি দেখতে।

এখন সিন্দ্রিতে সার কারখানা হয়েছে। কত সব ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, লোকজন। বিশাল এলাকা জুড়ে শহর গড়ে উঠেছে। কিন্তু তখন একেবারে খাঁ-খাঁ মাঠ আর কোথাও-কোথাও জঙ্গল। কোথাও আদিবাসীদের বসতিও ছিল।

১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক ইংরেজ ওই অভ্রখনির মালিক ছিলেন। খনির সব অভ্র শেষ হয়ে গেলে দু-বছর পরেই তিনি খনিটা ছেড়ে দেন। সুদূর ভাগলপুরের এক রাজা নাকি ছিলেন ওইসব জমির মালিক। লিজ করা জায়গা আবার ফিরে এসেছিল সেই রাজার হাতে। তাঁর কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে আদিবাসীরা খনির ওপরকার জমিতে চাষবাস করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ফসল কাঁচা থাকতেই শুকিয়ে যেত। সব মেহনত বরবাদ। অগত্যা জমি ছেড়ে দিয়েছিল তারা। জঙ্গল-ঝোপঝাড় গজিয়ে গিয়েছিল আবার। তারই নিচে সুড়ঙ্গ আর পাতালপুরীর মতো পোড়ো-খনিটা রয়েছে।

গদাধর আর ভূতনাথ সেখানে গিয়ে হাজির হল।

ভূতনাথ বলল,—পোড়ো-খনিটার তিনটে মুখ আছে। আমি দুটোর মধ্যে ঢুকে অনেকটা দূর অবধি দেখে এসেছি। ভীষণ অন্ধকার কিন্তু। টর্চ ছাড়া যাওয়া যায় না। সেজন্যেই টর্চ এনেছি। আজ তোমাকে নিয়ে তৃতীয় সুড়ঙ্গটায় ঢুকব চলো।

তৃতীয় মুখটা ঘন ঝোপজঙ্গলের মধ্যে একটা ঝাঁকড়া বটগাছের হাত বিশেক দূরে। মুখটা আন্দাজ হাত পনেরো চওড়া। দুজনে পাথরের খাঁজ আঁকড়ে ধরে অতি কষ্টে নামল।

বর্ষার জল তখন জমে আছে ডোবার মতো। সেই জলের ধার দিয়ে ওরা সুড়ঙ্গের দরজায় পৌঁছল। গদাধরের কেন যেন গা ছমছম করে উঠল। ভেতরটা কী অন্ধকার! টর্চ জ্বেলে আগে ঢুকল ভূতনাথ, পেছনে গদাধর।

সুড়ঙ্গটা বেশ চওড়া আর উঁচু। কিছুটা যেতেই হঠাৎ পোড়া গন্ধ লাগল নাকে। মনে হল ভেতরে কোথাও কে উনুন জ্বেলেছে যেন।

ভূতনাথ ফিসফিস করে বলল,—বুঝেছি। বাছাধনের ওই সুড়ঙ্গ দুটো পছন্দ হয়নি। এই তিন নম্বরে এসে জুটেছে।

গদাধর বলল,—কে? কার কথা বলছ ভুতু?

ভূতনাথ টর্চ নিভিয়ে বলল,—কে জানে! ব্যাটার চেহারা বড্ড বিচ্ছিরি। একেবারে মামদো ভূতের মতো। আধপোড়া মাংস খায়। তবে ওকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর টর্চ জ্বালব না। তুমি আমাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এসো।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। মাঝে-মাঝে মাকড়সার ঝুল জড়িয়ে যাচ্ছে গদাধরের মাথায়। আর কেমন বিচ্ছিরি গন্ধ। পায়ে গুঁতো মেরে কী একটা জন্তু দৌড়ে যেতেই গদাধর চেঁচিয়ে উঠেছিল আর কী! ভূতনাথ বলল,—চুপ, চুপ। স্পিকটি নট।

কিছুটা এগোতেই বোঝা গেল সুড়ঙ্গটা ডাইনে ঘুরেছে। তারপর গদাধর যা দেখল, ভয়ে বিস্ময়ে মুখে কথা সরল না।

একটা মানুষ নাকি, মানুষই নয়—ভুতুড়ে চেহারা, সামনে গনগনে লাল আগুনের অঙ্গার থেকে একটা খেঁকশিয়ালের মতো খুদে জন্তু পুড়িয়ে কড়মড় করে খাচ্ছে। আগুনের ছটায় আবছা তার ভয়ংকর চেহারাটা ফুটে উঠেছে।

দুজনে বসে পড়েছিল চুপচাপ। একটু পরে কে জানে কেন, গদাধরের প্রচণ্ড হাঁচি পেল। কিছুতেই সামলাতে পারল না। হ্যাঁচ্চো করে একখানা জব্বর হাঁচি ঝেড়ে দিল।

অমনি ভুতুড়ে চেহারার সেই পোড়ামাংসখেকোটা এদিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে গর্জে উঠল চেরাগলায়—কেঁ রেঁ?

ওরে বাবা! ভূত নাকি নাকিস্বরে কথা বলে। তাহলে এ ব্যাটা সত্যি ভূত। গদাধর ঠকঠক কাঁপতে শুরু করেছে।

কিন্তু ভূতনাথের গ্রাহ্য নেই। টর্চ জ্বেলে তার মুখের ওপর ফেলে বলল,—ও কী খাচ্ছ মামা? খেঁকশিয়াল, না খরগোশ?

হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ! —সে কী পিলে চমকানো হাসি! ওই হাসি হেসে সে নাকিস্বরে বলল,—কেঁ রেঁ? ভুঁতু নাঁকি? আঁয়, আঁয়!

বলে সে একটা কাঠ গুঁজে দিল আগুনে। হু-হু করে জ্বলে উঠল কাঠটা। তার ফলে আলো হলো প্রচুর। ভূতনাথ গদাধরকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটু তফাতে বসল।

—ওঁটা কেঁ রেঁ?

ভূতনাথ বলল,—আমার বন্ধু গদাই। তোমাকে দেখতে এসেছে, মামা।

আবার হিঁ হিঁ করে হেসে সে বলল,—আঁমাকে দেঁখবি? তঁবে ভাঁলো কঁরে দ্যাঁখ! এঁই দ্যাঁখ!

বলেই সে গদাধরের চোখের সামনে একটা প্রকাণ্ড কালো বাদুড় হয়ে ছাদ আঁকড়ে ধরে দিব্যি দুলতে শুরু করল। গদাধর হাঁ করে তাকিয়ে আছে তো আছে। ভূতনাথের কাঁধ আঁকড়ে ধরেছে নিজের অজান্তে। কাঁপুনি সামলাতে পারছে না। এ কি সম্ভব!

ভূতনাথ হাসতে-হাসতে বলল,—খুব হয়েছে মামা। তোমার খাবার পড়ে রইল যে। এক্ষুনি কেংকেলাস এসে মেরে দেবে!

অমনি বাদুড়বেশী কিম্ভূত সেই প্রাণীটি ধুপ করে পড়ল। পড়ে আবার আগের চেহারা নিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল,—কঁ, কঁ?

—কেংকেলাস এসে তোমার খাবার খেয়ে ফেলবে। ঝটপট শেষ করে নাও।

—ইঁস! কেঁংকেলাসকে তাঁহলে তুঁলে আঁছাড় মাঁরব নাঁ?

—পারবে না মামা। তার গায়ের জোর তোমার চেয়ে ঢের বেশি।

সে কোনও কথা না বলে কড়মড়িয়ে খুদে প্রাণীর রোস্টটা সাবাড় করতে ব্যস্ত হল। মাথাটি চিবিয়ে খাবার পর তৃপ্তিতে একটু ঢেকুর তুলে বলল,—হ্যাঁ রেঁ ভুঁতু!

—বলো মামা।

—কেঁংকেলাস কোঁথায় থাঁকে রেঁ?

—ওপরের বটগাছটায়। সেদিন শুনলে না? কেমন মনের আনন্দে ঠ্যাং ঝুলিয়ে গান গাইছিল!

গদাধরের মনে হল, মামদোটা কেমন মনমরা হয়ে গেল এই শুনে। হওয়ারই কথা। ওরা সুড়ঙ্গের মধ্যে যেখানে বসে আছে, হয়তো তার ছাদের ওপাশেই সেই বটগাছটা।

সে ভূতনাথের কথা শুনে বেজার মুখে বলল,—ভুঁতু! তাঁহলে আঁমি বঁরং অঁন্য কোঁথাও চঁলে যাঁই রেঁ।

তাই যাও মামা।—ভূতনাথ বলল, চাসনালার ওখানে একটা পোড়ো কয়লাখনি আছে। সেখানে মনের সুখে থাকো গে!

নাঁ রেঁ! কঁয়লাখনির ওঁদিকে গেঁলেই আঁমি কাঁলো হঁয়ে যাঁব। —বলে মামদো তার লিকলিকে হাতের চামড়া থেকে ময়লা রগড়াতে থাকল।

ভূতনাথ বলল,—এই সেরেছে। ও মামা, মনে হচ্ছে এই অভ্রখনির আসল বাসিন্দা ভদ্রলোক এসে পড়েছেন, পালাও, পালাও!

দুমদাম পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ক্রমশ শব্দটা এদিকেই আসছে। একবার ঘুরে অন্ধকারটা লক্ষ করেই মামদোটা চোখের পলকে একটা প্রকাণ্ড চামচিকে হয়ে গেল এবং সন-সন করে গদাধরের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে পালিয়ে গেল। কী বিচ্ছিরি গন্ধ তার গায়ের!

গদাধরের গালে একটুখানি ঠেকে গিয়েছিল সেই চামচিকের ডানার ডগাটা। আর তাই থেকেই এখন একটা মস্ত আঁচিল হয়ে গেছে।

তো একটু পরে বেঁটে গোলগাল গাঙফড়িং-এর ডানার মতো সাদা রঙের একটা মানুষ কিংবা মানুষ নয়, এমন এক প্রাণী এসে দাঁড়াল আগুনের কুণ্ডটার পাশে।

তার চুলগুলো খোঁচা-খোঁচা, লাল। গোঁফও তেমনি। কানদুটো প্রকাণ্ড। বড়-বড় গোল চোখ। সে ভারিক্কি গলায় বলল,—কে রে তোরা?

ভূতনাথ গদাধরকে চিমটি কেটে সেলাম ঠুকল। গদাধরও বুঝল, তাকেও সেলাম ঠুকতে হবে। ভূতনাথ বলল,—দাদামশাই, আমি ভুতু। আর এ আমার বন্ধু গদাই।

—আমার ঘরে তোরা কোন মতলবে রে?

ভূতনাথ বিনীতভাবে এবং চাপাগলায় বলল,—দাদামশাই, তোমায় সাবধান করতে এলাম। কেংকেলাস তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অমনি কিম্ভূত প্রাণীটা চাপাগলায় বলে উঠল,—কে, কে?

—কেংকেলাস, দাদামশাই।

এই আজব জীবটি কেংকেলাস শোনামাত্র থপথপ করে দৌড়ে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভূতনাথ হাসতে-হাসতে বলল,—খুব ভয় পেয়ে গেছে।

গদাধর এতক্ষণে জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল,—কেংকেলাস কে। কিন্তু সুযোগই পেল না। খনিমুখের দিকে আবছা চ্যাঁচামেচি শোনা গেল।

তারপর কারা দৌড়ে আসছে মনে হল।

গদাধর হাঁ করে তাকিয়ে দেখল, গোটা পাঁচেক মানুষ কিংবা মানুষ নয় গোছের আজব প্রাণী এসে তাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে আগুনের কুণ্ডটার দিকে ঝুঁকে রইল।

মাথায় তিন ফুট থেকে চার ফুট উঁচু এই জীবগুলো কালো পাঁকাটির মতো। কাঠির ডগার মুন্ডু বসালে যেমন হয়, তেমনি। কিন্তু হাত-পা আছে দস্তুরমতো। চোখগুলো ড্যাবডেবে, লালচে। গোঁফও আছে। তারা চ্যাঁ-চ্যাঁ করে কী বলছে, বোঝা যাচ্ছিল না। মনে হল, সেই মামদোর এঁটো চিবুনো হাড়গুলো খুঁজছে তারা।

তারপর তাদের চোখ পড়ে গেল ভূতনাথদের দিকে। অমনি পাশটিতে দাঁড়িয়ে গেল। একসঙ্গে আঙুল তুলে এদের দিকে শাসানির ভঙ্গিতে বলতে লাগল,—মুন্ডু খাব, ঠ্যাং খাব! ঘিলু খাব, ফুসফুস খাব। কলজে খাব, পিলে খাব। চোখ খাব, নাক খাব।

ভূতনাথ হাসতে-হাসতে বলল,—আর দাঁত? দাঁতগুলো খাবিনে?

সঙ্গে-সঙ্গে তারা আবার একসঙ্গে বলে উঠল,—দাঁত খাব, দাঁত খাব।

ভূতনাথ কী বলতে যাচ্ছে, গদাধর ততক্ষণে ওইসব খাওয়ার শাসানি শুনে রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে বলে ফেলল,—কেংকেলাস আসছে! কেংকেলাস!

ব্যস! কাজ হয়ে গেল। প্রাণীগুলি অমনি চ্যাঁ-চ্যাঁ করতে-করতে যে-যেদিকে পারল, অন্ধকারে পালাতে শুরু করল।

তিন ফুট উঁচু যেটা, সে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ে চ্যাঁ করে কেঁদে উঠেছিল। একজন এসে তাকে টানতে-টানতে নিয়ে পালাল।

ভূতনাথ বলল,—বাঃ গদাই! তাহলে কেংকেলাসের মর্ম পেয়ে গেছ।

গদাধর ততক্ষণে অনেকটা সাহসী হয়েছে। বলল,—না ভাই ভুতু, আন্দাজে কিংবা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কেংকেলাস ব্যাপারটা কী? ওটা শুনেই ওরা পালিয়ে যাচ্ছে কেন?

ভূতনাথ বলল,—যাদের দেখলে, এরা হল গিয়ে পোড়ো-খনির ভূত। কেংকেলাস তাদের থানার দারোগাবাবুর নাম।

গদাধর অবাক হয়ে বলল,—অ্যাঁ! ভূতের আবার দারোগা! থানা-পুলিশ!

ভূতনাথ আগুনের কুণ্ডে একটা শুকনো কাঠ ফেলে বলল,—বাঃ! ওদের বুঝি থানা-পুলিশ থাকতে নেই? না থাকলে চলবে কেন? ভূতদের মধ্যে চোর-ডাকাত নেই বুঝি? চোর-ডাকাত থাকলেই পুলিশ থাকবে। সেই ভৌতিক পুলিশের দারোগাবাবুর নাম কেংকেলাস। খুব জাঁদরেল দারোগা।

গদাধর বলল,—বুঝলাম। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে ভাই ভুতু?

ভূতনাথ হাসতে-হাসতে বলল,—আমার নাম ভূতনাথ ওরফে ভুতু। আমি ভূতের খবর জানব না তো কে জানবে?

গদাধর আগ্রহ দেখিয়ে বলল,—বলো না ভাই, শুনি?

ভূতনাথ বলল,—মুখে শুনে কী হবে? চলো না, তোমার সঙ্গে কেংকেলাসের আলাপ করিয়ে দিই। না, না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অতি সজ্জন, ভদ্র, অমায়িক ভদ্রলোক। অবশ্য চোর-ডাকাতের সামনে কড়া না হলে তো চলে না। কই, ওঠো।

দুজনে টর্চের আলোয় সুড়ঙ্গ দিয়ে বাইরে এল। পাথরের খাঁজ আঁকড়ে ধরে খোলা গর্তের মতো খনিমুখ বেয়ে ওপরে উঠল। তখন বেলা পড়ে এসেছে।

ভূতনাথ বটগাছটা দেখিয়ে বলল,—ওই গাছের মধ্যিখানে আধপোড়া শুকনো ছাল ছাড়ানো ডালটা দেখতে পাচ্ছ? কেংকেলাস ওখানেই থাকে। একটু পরে সন্ধ্যা হবে। তখন সে চোর-ডাকাত ধরতে বেরোয়। এসো—এখন তার থাকার কথা।

গদাধরের গা ছমছম করছিল। তবে ভূতনাথের মতো সঙ্গী থাকতে যে তার এতটুকু ক্ষতি হবে না, টের পেয়ে গেছে ততক্ষণে।

দুজনে গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। অজস্র পাখি বটগাছের ডালে তখন এসে জুটেছে। কানে তালা ধরে যায়। ভূতনাথ ডালপালার ফাঁক দিয়ে সেই বাজপড়া ডালটার দিকে তাকিয়ে ডাকল,—কেংকেলাসবাবু আছেন নাকি? কেংকেলাসবাবু-উ-উ!

এ পর্যন্ত শুনেই সাতকড়ি গোঁসাই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

আচমকা তাল কেটে গিয়ে গদাধরবাবু খেপে গিয়ে বললেন,—হাসবার কী আছে এতে? গোঁসাই, তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। আর যাই করো, কেংকেলাস শুনে হেসো না।

গোসাঁই বললেন,—কেন? হাসব না কেন শুনি? আর কোনও নাম পেল না—সব থাকতে কেংকেলাস।

রমণীবাবু বললেন,—আহা, ওটা যে ভূতপেরেতের নাম।

বংশীলোচন বললেন,—তার চেয়ে বড় কথা, ওটা ভূতপ্রেতের দারোগাবাবুর নাম। অন্য নাম মানানসই হবে কেন?

মঞ্জু বলল,—নাও! দিলে তো সবাই গপ্পটা ভেঙে।

মুকুল বলল,—ও দাদু, কেংকেলাসবাবু কী করলেন বলো এবার।

গদাধর পাশের টেবিলের ড্রয়ার টেনে ছবির একটা অ্যালবাম বের করে বললেন,—গোঁসাই, সেই বটতলায় গত পুজোয় গিয়েছিলাম। এখনও ওটা সিন্দ্রি টাউনশিপের চৌরাস্তার ধারে রয়েছে। ওখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছিলাম। এই দেখো, সেই বাজপড়া ডালটা এখনও আছে। দেখতে পাচ্ছ?

সবাই ঝুঁকে পড়লেন ছবিটার দিকে। হ্যাঁ, ডালটা পরিষ্কার উঠেছে।

বংশীলোচন বললেন,—তুমি নিজেই তুলেছ নাকি গদাই?

গদাধর বললেন,—হ্যাঁ। তুলেছি, তার কারণ আছে। এখন তো জায়গাটা শহর হয়ে গেছে। লোকজন গাড়িঘোড়া চলছে। গতবছর গিয়ে একদিন দুপুরবেলা লোডশেডিং-এর সময় গায়ে হাওয়া দিতে বটতলায় দাঁড়িয়েছিলাম। রাস্তাঘাট তখন প্রায় ফাঁকা। একটা-দুটো গাড়ি বা রিকশো যাচ্ছে। লু হাওয়া উঠেছে। তাই সব দোকানপাটের সামনে তেরপল ঝুলিয়ে রেখেছে। হঠাৎ মনে হল মাথায় কী ঠেকছে। মুখ তুলে দেখি একটা পা।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন,—পা! কীসের পা?

বলছি। —বলে গদাধর চোখ বুজে কয়েক দণ্ড চুপ করে থাকার পর মুখ খুললেন। —তক্ষুনি বোঝা উচিত ছিল, পারিনি। সেই ছেলেবেলায় একবার মাত্র দেখেছিলাম।

—কাকে? কাকে?

—কেংকেলাসবাবুকে। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, এখনও বেঁচে আছেন দারোগা-ভদ্রলোক এবং ওই বটগাছের থানাতেই আছেন। বদলি হননি। মাথায় পা ঠেকতেই ওপর থেকে একটু হেসে বললেন,—কী? চিনতে পারছ তো? তক্ষুনি মনে পড়ে গেল। নমস্কার করে বললাম,—ভালো আছেন স্যার? প্রমোশন হয়নি। নাকি হয়েছে? কেংকেলাসবাবু দুঃখিভাবে বললেন,—না ব্রাদার। সেই পোস্টেই আছি।

অবিশ্বাসী গোঁসাই আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন।

আবার বাধা পড়ে হইচই উঠল। গদাধর আবার খেপে উঠলেন।

এবং তিনকড়ি দ্বিতীয়বার চা আনল।

তারপর মঞ্জু আর মুকুল খেই ধরিয়ে দিল। সেই বটতলায় ভূতনাথ ডাকছিল,—কেংকেলাসবাবু, আছেন নাকি? তারপর?

গদাধর অগত্যা শুরু করলেন।...

খনি অঞ্চলে খুনোখুনি মারদাঙ্গা চুরি-ডাকাতি লেগেই আছে। এখন কথা হচ্ছে, ওইসব দাগি খুনি আর চোর-ডাকাতরা মরে কি স্বর্গে যাবে? তাদের মুক্তি অত সোজা? তাদের ভূতপ্রেত হয়েই থাকতে হয়।

কিন্তু স্বভাব যাবে কোথা? তাই ভূত হয়েও উপদ্রব বাধায় হামেশা। তাই কেংকেলাস দারোগা ছাড়া উপায় নেই।

এসব কথা ভূতনাথের কাছে শোনা। সেদিন তো সেই পড়ন্ত বেলায় সিন্ত্রি মাঠে বটতলায় ভূতনাথ অনেক ডেকে কেংকেলাসের সাড়া পেল।

ওপর থেকে খ্যানখেনে গলায় আওয়াজ এল,—কী, কী, কী?

ভূতনাথ বলল,—আমি ভুতু, স্যার। সঙ্গে আমার বন্ধু গদাই আছে। ও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

—সকালে এলেই পারতে বাবু! শুনছ না? এখন আমি রাগিণী ভাঁজছি! সোজা কথা নয়, পুরিয়াধানেশ্রী।

হ্যাঁ, তাই বটে। উনি বাতাসের সুরে রাগিণী ভাঁজছেন। এতক্ষণে কানে এল। তারপর বটগাছটায় হুলুস্থুলু করে একটা বাতাস এসে পড়ল। পাখিগুলো তুলকালাম চ্যাঁচাতে শুরু করল।

তারপর গদাধর কেংকেলাসকে দেখতে পেল।

তখন দেশে ইংরেজের শাসন চলছে। সে আমলের দারোগাবাবুদের নাম শুনলে চোর-ডাকাতের কলজে শুকিয়ে যেত। আর তখনকার ওনাদের চেহারাই বা কী ছিল? আজকাল তো সব ছেলে-ছোকরা দারোগা হয়ে যাচ্ছে।

কেংকেলাসের ভুঁড়িটা আড়াই বিঘৎ পরিমাণ। প্রকাণ্ড মাথা। পেল্লায় গোঁফ। কিন্তু রাগরাগিণী সেধে গলার অংশটা সরু। আর চোর-ডাকাতের সঙ্গে ছোটাছুটি করে পাদুটোও কাঠি-কাঠি। হ্যাট বগলে নিয়ে আর হোঁতকা মোটা বেটন হাতে ঝুলিয়ে দুম করে সামনে পড়লেন। পাখিগুলো চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে পালিয়ে গেল। গদাধর বলল,—নমস্কার স্যার!

কেংকেলাস দারোগা মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বললেন,—ভালো। খুশি হলাম তোমাকে দেখে। কোন ক্লাস পড়ছ?

গদাধর জবাব দিতে যাচ্ছে, হঠাৎ দূরে সেই খনির গর্তের কাছে কারা চেঁচিয়ে উঠল,—চোর! চোর! চোর! অমনি কেংকেলাস দারোগা ফুটবলের মতো শূন্যে উঠে সেদিকে হাইকিক হয়ে চলে গেলেন।...

আবার বাধা পড়ল। গদাধরবাবু হার্টের রুগি। ডাক্তারবাবু এসে পড়লেন ইঞ্জেকশন দিতে। গদাধর বললেন,—আজকের মতো এই তোমরা এখন এসো ভায়া। মঞ্জু, ঠাক্‌মাকে ডাক।...

সবাই উঠলেন। যেতে-যেতে গোঁসাই বলে গেলেন—হুঁঃ! কেংকেলাসই বটে। কাকে বললেন, কে জানে।

মুরারিবাবুর টেবিলঘড়ি

ক্রিরর র র ং....

মুরারিবাবু তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলেন বিছানা থেকে। তারপর আলো জ্বেলে দিলেন। ভোর চারটেয় অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলেন টেবিলঘড়িতে। ঠিক ছটায় হাওড়া স্টেশনে ট্রেন। প্ল্যাটফর্ম নম্বরও মুখস্থ করে রেখেছেন। রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি পেতে অসুবিধে হবে না। সাড়ে পাঁচটায় বেরুলেই চলবে।

রাঁধুনি-কাম-ভৃত্য জটিলকে এবার ঘুম থেকে ওঠাতে হবে। অন্তত এককাপ চা না খেলে ঘুমের আড়ষ্টতা কাটবে না। তবে জটিলের ঘুমটা পাতলা। সমস্যা হবে ভাগ্নে বীরুকে নিয়ে। সে একটি কুম্ভকর্ণ। হাতের এই দেড়ঘণ্টা সময়ের আধঘণ্টা তাকে ঘুম থেকে ওঠানোর কাজে বরাদ্দ করে রেখেছেন মুরারিমোহন। জিনিসপত্র রাতে শুতে যাওয়ার আগে গোছানো হয়েছে। কাজেই ব্যস্ততার দরকার ছিল না।

কিন্তু মুরারিবাবুর স্বভাব হচ্ছে এই। সব ব্যাপারেই হিসেব করে চলেন, যাতে পরে পস্তাতে না হয়। তাই একটু ব্যস্তবাগীশ হয়ে পড়েন।

অ্যালার্ম থামতে-থামতে তাঁর বাথরুমে ঢোকা হয়ে গেছে। প্রাতঃকৃত্য সেরে সোজা চলে গেলেন কিচেনের সামনেকার খোলা বারান্দায়। খাটিয়া পেতে জটিলেশ্বর ঘুমোচ্ছে। ঘড়র-ঘড়র নাক ডাকছে। মুরারিবাবু ডাকলেন,—জটে! জটিল রে। ওঠ, ওঠ।

জটিলের নাক ডাকা থামল। মুরারিবাবু ফের সস্নেহে ডাকলে সে চোখ বুজে থেকেই জড়ানো গলায় বলল,—দেরি আছে।

মুরারিবাবু বললেন,—দেরি নেই। চারটের অ্যালার্ম বেজে গেছে। উঠে পড় বাবা!

জটিল একইভাবে চোখ বুজে এবং পাশ ফিরে বলল,—দেরি আছে।

মুরারিবাবু রেগে গেলেন। তার গায়ে হাত রেখে একটু ঠেলে বললেন,—কী দেরি আছে বলছিস! ওঠ, ওঠ। চায়ের জল চাপা। আমি বীরুকে ওঠাই!

জটিল শুধু বলল,—ঠিক আছে।

তখন আশ্বস্ত হয়ে মুরারিবাবু পাশের ঘরে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। বীরু বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে। এইবার আধঘণ্টা সময় তার পিছনে জোঁকের মতো লাগতে হবে। আজ তো না লেগেও উপায় নেই। যার ঘুম আটটার আগে ভাঙে না, তাকে ভোর চারটেয় ওঠানো সহজ নয়।

মুরারিবাবু ভাগ্নেকে প্রথমে গুতোগুঁতি, পরে ঠেলাঠেলি, শেষে তার কানে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করলেন। তাতেও বীরুর কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। তখন মুরারিবাবু তার লম্বা চুল টানাটানি করতে থাকলেন। এবার বীরু বলল,—কী করিস মাইরি! ভাল্লাগে না!

মুরারিবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—আমি রে, আমি। ওঠ বাবা। ট্রেন ফেল হয়ে যাবো। উঠে পড়।

বীরুর আর সাড়া নেই।

তখন মুরারিবাবু বিরক্ত হয়ে ওর দু-কাঁধ ধরে টেনে ওঠালেন এবং বিছানায় বসিয়ে দিলেন। চোখ বন্ধ আছে বীরুর। সে বসে এদিক-ওদিক টলতে থাকল। তারপর গড়িয়ে পড়ল ফের।

মুরারি ভাগ্নেকে আবার অমনি করে ওঠালেন। আবার বসে থেকে চোখ বুজে টলতে-টলতে বীরু বিছানায় গড়াল।

আর সহ্য করতে পারলেন না মুরারিবাবু। মেঘের মতো গর্জে ডাকতে শুরু করলেন,—বীরু, অ্যাই বীরে! অ্যাই হতচ্ছাড়া! অ্যাই পাজি! ওরে কুম্ভকর্ণ! ওরে ভূত!

কিন্তু কাঁহাতক ডাকা যায়! আর কী বলেই বা ডাকা যায়? ডাকাডাকির সঙ্গে ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি, সুড়সুড়ি, কাতুকুতু সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। আধঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা আছে। কাজেই মুরারিবাবু নিজের কর্মসূচিই রূপায়িত করছেন বলা যায়।

কতক্ষণ পরে শ্রীমান বীরুর সাড়া পাওয়া গেল। চোখ খুলে পাতা পিটপিট করে বলল,—কী হয়েছে?

—ওঠ। উঠে পড়। কখন চারটে বেজে গেছে। তোর দেখছি সবদিনই সমান ঘুম!

দিন না রাত? —বলে বীরু উঠে বসল। বিরক্তমুখে বলল ফের,—আমি কি দিনে ঘুমোই?

মুরারিবাবু হাসতে-হাসতে কিচেনের অবস্থা দেখতে গেলেন। গিয়েই অবাক হলেন। জটিল তেমনি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

খাপ্পা হয়ে মুরারিবাবু তার কান ধরে গর্জালেন,—জটে! তুলে ফেলে দেব রাস্তায়। হতচ্ছাড়াকে চায়ের জল চাপাতে বললাম! আর কিনা ফের নাক ডাকাতে শুরু করেছে? অ্যাই বাঁদর! ওঠ!

জটিল আগের মতো জড়ানোগলায় বলল,—দেরি আছে।

তখন মুরারিবাবুর রাগ চড়ে গেল মাথায়। ওর খাটিয়াটা খটাখট নাড়া দিয়ে এবং চ্যাঁচামেচি করে হুলুস্থুল বাধিয়ে ফেললেন। ওপরতলায় এবং পাশের ফ্ল্যাটে নড়াচড়া ও কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

একটু পরে ওপরতলার ব্যালকনিতে ঝুঁকে প্রতিবেশী হারাধনবাবু ডাকলেন,—মুরারিভায়া! ও মুরারি! হল কী? এত চ্যাঁচামেচি কীসের?

কলিং বেলও বাজল। অগত্যা মুরারিবাবু গিয়ে দরজা খুললেন। দেখলেন ওপরতলার হারাধনবাবু, পাশের দুটো ফ্ল্যাটের গোবিন্দবাবু মানিকবাবু আর মানিকবাবুর স্ত্রী ঘুমভাঙাচোখে হাজির হয়েছেন। দরজা খুলতেই একসঙ্গে বলে উঠলেন,—কী হয়েছে? এত হইচই হচ্ছে কেন?

এক কথায় মুরারিবাবু বললেন,—রাঁচি যাব।

—রাঁচি। —হারাধনবাবু খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন। হাসবারই কথা। রাঁচিতে পাগলাগারদ আছে। কাজেই 'রাঁচি' যাওয়া মানেই পাগল হয়ে যাওয়া।

গোবিন্দবাবু বললেন,—রাতদুপুরে রাঁচি যাবে মানে? মাথার গোলমাল হল নাকি? সর্বনাশ! অ্যাদ্দিন বলোনি কেন? আমার পিসেমশায়ের ছেলের ছোট খুড় শ্বশুরের জামাই —তার ভাগ্নের কাকা বড় ডাক্তার!

মুরারিবাবু বিরক্ত হয়েছেন প্রতিবেশীদের এমন অবাঞ্ছিত কৌতূহলে। বললেন,— বড়দার মেয়ের বিয়ে। বুঝলে? তাই ছটার ট্রেনে রাঁচি যাব।

তাই বলো! —হারাধন হাসতে-হাসতে বললেন, কিন্তু তার জন্যে এই রাতদুপরে এমন ভূমিকম্প সৃষ্টি করছ কেন ভায়া? সবে শুয়ে ঘুমোব-ঘুমোব করছি, আর তোমার এই ডাকাতপড়া হুলুস্থুল!

—কোনও মানে হয়? গোবিন্দবাবু বললেন। আমরা ভাবলুম, আবার একটা ভুতুড়ে আলমারি এনেছ বুঝি! রাতদুপুরে আবার গণ্ডগোল বাধিয়েছ। হয়তো আবার দেখব, ভিরমি খেয়ে পড়ে আছো। তাই দৌড়ে এলাম।

হ্যাঁ—একবার চীনে পাড়ার দোকান থেকে একটা আলমারি কিনে এনে সে এক হাঙ্গামা হয়েছিল বটে। কিন্তু এঁরা রাতদুপুর—রাতদুপুর করছেন, এতেই মুরারিবাবুর রাগ হয়েছে। বললেন,—রাতদুপুর মানে কী? প্রায় এক ঘণ্টা আগে চারটে বেজে গেছে। এখন প্রায় পাঁচটা বেজে এল!

পাঁচটা!—হারাধনবাবু খুব সময়সচেতন মানুষ। সবসময় হাতে ঘড়িটি বাঁধা থাকে। বিদেশি সওদাগরি আপিসের কেরানি। সায়েবদের সংসর্গে থেকে ঘড়ির কাঁটা ধরে চলেন সব কিছুতে। হাতের ঘড়িটি দেখে নিয়ে বললেন,—তোমার মাথা খারাপ? মোটে বারোটা পঁয়ত্রিশ বাজছে।

মুরারিবাবু বললেন—অসম্ভব! আমার টেবিলঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া ছিল কাঁটায়-কাঁটায় চারটেয়। অ্যালার্ম শুনেই তো ঘুম ভেঙেছে। তারপর ঘণ্টাটাক ওদের ডাকাডাকি করছি।

ইতিমধ্যে অন্যান্য ফ্ল্যাটের কর্তাগিন্নিরাও এসে ভিড় জমিয়েছেন। ব্যাপার জেনে কেউ-কেউ বিরক্ত হয়ে চলেও যাচ্ছেন। কেউ কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গজপতিবাবু একটু হেসে বললেন,—মুরারি, টেবিলঘড়ি কিনেছ বুঝি? হুঁ, বুঝেছি।

মুরারিবাবু বললেন,—কী বুঝেছ শুনি?

ভায়া, টেবিলঘড়ির কথা আর বোলো না। বিশেষ করে অ্যালার্ম ঘড়িগুলো বড্ড গোলমেলে জিনিস,—গজপতি বললেন,—অ্যালার্ম দেবে ন'টায়, বাজবে এগারোটায়। আজ অবধি একটাও অ্যালার্ম ঘড়ি দেখলাম না, যে সঠিক সময়ে বাজে।

সুরসিক হারাধনবাবু বললেন,—বরং নিজে রাঁচি না গিয়ে তোমার ঘড়িটাকেই পাঠিয়ে দাও।

প্রতিবেশীরা হো-হো হি-হি খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসতে থাকলেন।

এই শুনে মুরারিবাবুর এত রাগ হল যে সবার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর সটান নিজের ঘরে চলে এলেন।

এসে টেবিলঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অবাক। যখন অ্যালার্ম বেজেছিল, তখন ঘড়ির দিকে তাকাননি। কে-ই বা তাকায়?

ঘড়িতে বাজছে—সত্যি বাজছে বারোটা ছত্রিশ!

অথচ অ্যালার্মের কাঁটা দেওয়া আছে চারটেয়। তাহলে ঘড়ির অ্যালার্মে গণ্ডগোল আছে। মুরারিবাবু হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। এই ঘড়িটা গতকাল বিকেলে কিনে এনেছেন পার্ক স্ট্রিটের একটা দোকান থেকে। বেশ বড় দোকান। হালফ্যাশানি জিনিস মুরারিবাবুর চক্ষুশূল। আজকাল সবকিছুতেই তো ভেজাল। তাই যে যুগে ভেজাল কেউ দিত না এবং ভেজাল দেওয়া পাপ মনে করত, সেই যুগের তৈরি জিনিস কিনতে মুরারিবাবুর আগ্রহ বেশি।

এই টেবিলঘড়িটা একশো বছর আগের তৈরি বিলিতি জিনিস। শো-কেসে সাজানো ছিল। দোকানদার কিছুতেই বেচবে না। জেদ করে অনেক চড়া দামে কিনে এনেছেন মুরারিবাবু। রাঁচি যাওয়ার জন্য ভোরে ওঠার দরকার ছিল।

কিন্তু বিলিতি অ্যালার্ম ঘড়ি যে এমন অদ্ভুত কাণ্ড করবে ভাবতেও পারেননি।

অবশ্য মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম বলে শাস্ত্রবাক্য আছে। মুনিদেরই ভুল হয়। তো, এ একটা ঘড়ি। অতএব মুরারিবাবু অ্যালার্মের কাঁটা চারটেতে রেখেই অ্যালার্মের চাবি ঘুরিয়ে ভালোমতো দম দিলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন।

পাশের ঘরে বীরু আবার বালিশের দিকে ঠ্যাং করে শুয়ে পড়েছে কখন। অকাতরে ঘুমোচ্ছে। দেরি ছিল মুরারিবাবুর।

সেই ভোরে অ্যালার্ম কিন্তু আর বাজেইনি। মুরারিবাবুর রাঁচি যাওয়া হয়নি ছটার ট্রেনে। গিয়েছিলেন পরের ট্রেনে বিকেলবেলা।

ফিরে এলেন দিন তিনেক পরে। হাওড়া পৌঁছতে রাত নটা বেজে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরতে দশটা হল। ট্রেন জার্নিতে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন এগারোটা নাগাদ। সবে ঘুমের আমেজ এসেছে, আচমকা অ্যালার্ম বেজে উঠল। অ্যালার্মের দম তো দেওয়া ছিল না।

ঘড়িতে তখন ঠিক এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ।

বিরক্ত হলেন মুরারিবাবু। কিন্তু কী আর করবেন তখন? ঘড়ির দোকানে দেখাতে হবে। সকাল হোক।

পরদিন ঘড়ি মেরামতের দোকানে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আনলেন। কিন্তু কোনও ত্রুটি ধরা পড়ল না। যন্তর ঠিক আছে। এতটুকু গণ্ডগোল নেই। বরং ঘড়িটার খুব তারিফই শুনে এলেন মিস্ত্রি ভদ্রলোকের কাছে।

অথচ সেদিনও অ্যালার্মের দম না দেওয়া সত্ত্বেও আবার ঠিক রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশে অ্যালার্ম বাজল।

এবার একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন মুরারিবাবু। ঠিক ঘুম আসার সময় এ কী জ্বালাতন!

পরের রাতেও ঠিক একই ব্যাপার হল এবং তার পরের রাতেও সময় ওই এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

নিশ্চয় কোনও রহস্য আছে এর মধ্যে। মুরারিবাবু ভেবে কূল পেলেন না কিছু। সেই পার্ক স্ট্রিটের দোকানে গিয়ে মালিককে ব্যাপারটা খুলে বললেন। মালিক ভদ্রলোক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। সব শুনে বললেন,—এক কাজ করুন স্যার। অ্যালার্মটা নষ্ট করে দিন। ইচ্ছে করলে আমাদের এখানেও দিতে পারেন। আমরা অ্যালার্ম যন্ত্রটা খুলে দেব। তাহলেই আর ঝামেলা হবে না।

তাই করা হল। মহানন্দে ঘড়ি নিয়ে এলেন মুরারিবাবু। নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন আজ। প্রথম ঘুমটা ভেঙে গেলে ফের ঘুম আসতে চায় না। এবার আর ব্যাঘাত ঘটবে না।

কিন্তু ও হরি, এ কী কাণ্ড! সবে চোখ বুজে এসেছে, অমনি ক্রিররররং—

লাফিয়ে উঠে বসলেন মুরারিবাবু। অ্যালার্ম কাঁটা নেই, অ্যালার্ম যন্ত্র অর্থাৎ ভেতরের ঘণ্টা নেই—বড় কাঁটা ছোট কাঁটার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই, অথচ ঠিক অ্যালার্ম বাজছে সেই এগারোটা পঁয়ত্রিশে।

খুব ভয়ের চোখে ঘড়িটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মুরারিবাবু। আবার কি তাহলে সেই চীনে আলমারির মতো কোনও ভুতুড়ে ঘড়ি কিনে ফেলেছেন?

যাকগে, কিনেছেন তো আর কী করবেন? ঘড়িটাকে রেখে এলেন কিচেনের পাশে স্টোররুমে।

পরদিন রাতে জটিল এল দৌড়ে,—বাবু, বাবু! অ্যালারাম বাজছে কেন?

মুরারিবাবু খিক-খিক করে হেসে বললেন,—বাজুক না, তোর কী? তুই ঘুমো নাক ডাকিয়ে।

ব্যাজার মুখে জটিল বলল,—প্রথমে ঘুমটা চটে গেলে আর কি সহজে ঘুম আসবে বাবু?

তারপর রোজ রাতে এগারোটা পঁয়ত্রিশে অ্যালার্ম বাজে ভাঁড়ার ঘরে এবং বেচারা জটিলের টাটকা ঘুম ভেঙে যায়। আর ঘুম আসতেই চায় না। কয়েক রাত এইভাবে ঘুম ভালো না হওয়ার ফলে জটিলের চোখ গর্তে বসে গেল।

আর তার দুর্ভোগ ভুগতে হল মুরারিমোহনকেই। সে রাঁধতে-রাঁধতে দিনের বেলা ঘুমোয়। ডাল তরকারি ভাত পুড়ে যায়।

বাইরে কোনও জিনিস আনতে গিয়ে বড্ড দেরি করে। ব্যাপার কী? না—ফুটপাতে বা রোয়াকে ঘুমোচ্ছিল।

এরপর মুরারিবাবুর রাগ হল—না, বেচারি জটিলের ওপর নয়, ঘড়িটার ওপর। রাগের মাথায় ঘড়িটাকে এক আছাড় মারলেন।

এক আছাড়েও রাগ মিটল না। পর-পর তিন আছাড় মারলেন। তারপর কানের কাছে রেখে শুনলেন, বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়ি। টিকটিক শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ভাঙা ঘড়িটা জুতোর খালি বাক্সে ভরে পুরোনো জিনিসপত্রের সঙ্গে আলমারির মাথায় রেখে দিলেন।

সেদিন রাতে খুব তৃপ্তির সঙ্গে শুয়ে পড়লেন মুরারিবাবু। হাতঘড়িতে বাজছে তখন সাড়ে দশটা।

চোখের পাতা বুজে এসেছে, কী যেন স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছেন—সেই সময় আচমকা ক্রিররররং!...

লাফিয়ে উঠে বসলেন মুরারিবাবু। হ্যাঁ, আলমারির মাথায় রাখা পুরোনো জিনিসপত্রের ভেতর থেকেই আসছে আওয়াজ।

কিন্তু এ তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তক্ষুনি জুতোর প্যাকেট বের করে ঘড়িটা কানের কাছে রাখলেন। কোনও আওয়াজ নেই।

আওয়াজ নেই। অথচ কাঁটা চলছে। ঘড়িতে বাজছে এগারোটা পঁয়ত্রিশ! ভুতুড়ে ঘড়ি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মুরারিবাবুর হাত কাঁপতে থাকল। বুক টিপটিপ করতে লাগল। ঘড়িটা প্যাকেটে ঢুকিয়ে আবার শক্তভাবে বাঁধাছাদা করে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে।

রাস্তাঘাট তখন জনশূন্য। ল্যাম্পপোস্টের আলো হলদে হয়ে পড়ে আছে। মাঝে-মাঝে দু-একটা গাড়ি যাতায়াত করছে। মুরারিবাবু পাশের বিরাট ডাস্টবিনে ঘড়িটা ফেলবেন ভেবে পা বাড়িয়েছেন, আচমকা তাঁর গায়ে জোরালো আলো পড়ল। অমনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

গাড়িটা পুলিশের। দ্রুত কাছে এসে পড়ল। তারপর ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে একজন পুলিশ অফিসার নেমে বললেন,—কে আপনি?

মুরারিবাবু কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন,—আমি মু-মু-মুরারিমোহন চাকলাদার।

—কোথায় থাকেন?

—ওই যে হলদে বাড়িটা দেখছেন স্যার, ওর দোতলায় স্যার।

—হুম! আপনার হাতে ওটা কী?

—ঘ-ঘ-ঘড়ি স্যার!

ঘড়ি! রাতদুপুরে ঘড়ি নিয়ে এখানে কী করছেন? কই, দেখি!—বলে পুলিশ অফিসার খপ করে ওঁর হাত থেকে প্যাকেটটা কেড়ে নিলেন। তারপর দড়ির বাঁধন খুলতে-খুলতে বললেন,—এমন করে বেঁধে প্যাকেটে ভরেছেন কেন? অ্যাঁ? কী ব্যাপার?

মুরারিবাবু বললেন,—স্যার! এটা একটা ভুতুড়ে ঘড়ি! তাই ফেলে দিচ্ছিলাম ডাস্টবিনে।

ভুতুড়ে ঘড়ি! —পুলিশ অফিসার বাঁকা হেসে বললেন,—হুঁ—কী বলছেন? ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছিলেন! ভালো। গিরিধারী!

একজন কনস্টেবল লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে। তার পেল্লায় চেহারা দেখে মুরারিবাবুর প্রাণ প্রায় খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম। সে এসে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াল।

পুলিশ অফিসার বললেন,—পাকড়ো! কার ঘড়ি চুরি করে পালাচ্ছে ব্যাটা!

গিরিধারী তার বিশাল থাবা মুরারিবাবুর রোগা হাড্ডিসার কাঁধে ফেলতেই তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন।

আসলে মুশকিল করেছে তাঁর চেহারা আর পোশাক। বীরু তো সাধে বলে না,—ও মামা, একটু ফিটফাট সেজেশুনে ভদ্রলোকের মতো থাকলে কী ক্ষতি হয় আপনার?

মুরারিবাবু সাদাসিধে থাকেন।

চেহারাও সুবিধের নয়। তার ওপর মাথায় বিদঘুটে টাক। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, রাতদুপুরে নির্জন পথে এমন করে প্যাকেটে ঘড়ি লুকিয়ে এদিক-ওদিক তাকানো!

থানায় যেতেই হল। তারপর রাতের মতো হাজতেও থাকতে হল। সেখানে না বিছানা, না পাখা। মশার কামড়ে শরীর লাল হল। এক দঙ্গল চোর-ডাকাত-ছিনতাইকারীর সঙ্গে লকআপে কাটাতে মুরারিমোহন চাকলাদার রাতারাতি বুড়িয়ে গেলেন।

বীরু হারাধনবাবু, গোবিন্দবাবুদের থানায় নিয়ে গিয়ে সেবারকার মতো উদ্ধার করেছিল মামাকে। মুরারিবাবু নাক-কান মলে বললেন,—আর অ্যালার্ম ঘড়ি কিনবই না। তাতে যতবার ট্রেন ফেল হয় হোক।

আর সেই ঘড়িটা? থানায় মহাফেজখানায় থেকে গেল অন্যসব আটক করা জিনিসপত্রের সঙ্গে। বলা বাহুল্য, মুরারিবাবু আর ওটা দাবি করেননি।

কদিন পরে হঠাৎ কলিং বেল বাজল সকালবেলা। দরজা খুলে আঁতকে উঠলেন মুরারিবাবু। সেই থানার ও.সি. ভদ্রলোক এসে হাজির। ভয়ে-ভয়ে মুরারিবাবু বললেন,—কী-কী-কী স্যা-স্যা-র?

ও.সি. ভদ্রলোক একগাল হেসে করজোড়ে নমস্কার করে বললেন,—আপনার সঙ্গে কথা আছে মুরারিবাবু। বিরক্ত করলাম বলে অনুগ্রহ করে রাগ করবেন না।

মুরারিবাবু তখন বিগলিত হয়ে ভেতরে এনে বসালেন। ও.সি. ভদ্রলোক বললেন,—আমার নাম ক্ষেত্রমোহন সেনাপতি। আমি পুলিশ হয়ে আসিনি আপনার এখানে। একটা বিশেষ কথা আছে। আপনি আমাকে ক্ষেত্রবাবু বলেই ডাকবেন।

বলুন ক্ষেত্রবাবু! —বলে মুরারিবাবু জটিলকে ডাক দিলেন। চায়ের জোগাড় করতে বললেন ইশারায়।

ক্ষেত্র দারোগা বললেন,—কথা আপনার সেই ঘড়ি সম্পর্কে।

মুরারিবাবু মনে-মনে হেসে বললেন,—হুঁ, বুঝেছি। খুব জ্বালাচ্ছে বুঝি!

জ্বালাচ্ছে মানে?—ক্ষেত্র দারোগা বললেন,—মহাফেজখানা থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম বাসায়। আপনি দাবি করেননি—আর কেউই দাবি করেননি। কাজেই কী করা যায়? নিয়ে গেলাম। সারাতে দেব ভেবে রেখে দিলাম। কিন্তু ও হরি, রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশে—

মুরারিবাবু খিক-খিক করে হেসে বললেন,—অ্যালার্ম বাজছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাজছে। রোজ রাতে বেজে উঠছে। সারাতে দেব কী, ব্যাপারটা যে ভুতুড়ে!

—তা কী করবেন ভাবছেন?

দয়া করে আপনার জিনিস আপনি নিয়ে আমায় নিষ্কৃতি দিন।—বলে ক্ষেত্র-দারোগা একটা কাগজে জড়ানো ঘড়িটা রেখে দিলেন মুরারিবাবুর কোলে। তারপর তক্ষুনি উঠে গট-গট করে বেরিয়ে গেলেন।

বেরিয়ে যাওয়া নয়, যেন কেটে পড়া। চা খেতেও আর বসলেন না। ঘড়িটা হাতে নিয়ে মুরারিবাবু স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

কিন্তু একটা বিহিত তো করতে হবে। সেবার চীনে আলমারিটা দোকানে ফেরত দিয়ে বেঁচেছিলেন। এবারও তাই করা যাক।

অতএব তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লেন। ট্যাক্সি চেপে সোজা পার্ক স্ট্রিটের সেই দোকানে। দোকান খুলতে দেরি ছিল। তাই ফুটপাতে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

কতক্ষণ পরে এক বুড়ো ভদ্রলোক, চেহারায় সায়েব বলে মনে হল, এসে প্যান্টের পকেট থেকে চাবি বের করে দোকান খুললেন। ইনি যে মালিক ভদ্রলোক নন, তা ঠিক। হয়তো কোনও পার্টনারই হবেন।

দোকান খুলে তিনি ঢুকলে মুরারিবাবুও পেছন-পেছন ঢুকলেন। ঘরের ভেতরটা তখন আবছা অন্ধকার। মুরারিবাবু ইংরিজিতে বললেন,—হ্যালো মিস্টার...মিস্টার...

ঘুরে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। চোখ দুটো কী নীল! খাঁটি সায়েব বলেই মনে হচ্ছে। ঠোঁটের কোণায় হাসি। বললেন,—আই অ্যাম মিঃ হেনরি কোলব্রুক! হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ব্যাবু?

মুরারিবাবুর ইংরিজি তেমন আসে না। ভেবেচিন্তে বললেন,—আই ওয়ান্ট টু রিটার্ন দিস অ্যালার্ম ক্লক স্যার!

—হোয়াই ব্যাবু?

—ভেরি ব্যাড ক্লক স্যার! রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশে বাজে স্যার—মানে,...মুরারিবাবু টের পেলেন মাতৃভাষা বেরিয়ে পড়েছে। তখন টাক চুলকে বললেন,—এ হন্টেড ক্লক স্যার!

অদ্ভুত হেসে বুড়ো সায়েব হাত বাড়ালেন,—দ্যাট ওয়াজ মাই অ্যালার্ম ক্লক ব্যাবু। থ্যাংক ইউ!—কিন্তু এ কী! তাঁর হাতটা কোটের হাতা দিয়ে যতটুকু [illegible]ছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে হাড়ের হাত। তার মানে কঙ্কালের!

মুরারিবাবুর হাত থেকে ঘড়িটা পড়ে গেল। তক্ষুনি গোঁ-গোঁ করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।...

জ্ঞান হল যখন, চোখ খুলে মুরারিমোহন অতি কষ্টে বললেন,—আমি কোথায়?

বীরুর গলা পাওয়া গেল,—মামা! আপনি হাসপাতালে।

মুরারিবাবু উঠে বসলেন। হ্যাঁ, হাসপাতালই বটে। বললেন,—কী হয়েছিল রে?

বীরু বলল,—আর কী হবে? পার্ক স্ট্রিটে একটা ঘড়ির দোকানের সামনে ফুটপাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন আপনি। লোকেরা আপনাকে অ্যাম্বুলেন্স ডেবে এখানে পাঠিয়ে দেয়। আপনার পকেটে একটা চিঠি ছিল বড়মামার। আপনার নাম-ঠিকানা পেয়ে এঁরা খবর দিয়েছিলেন।

মুরারিবাবু ফিসফিস করে জিগ্যেস করলেন,—সেই ঘড়িটার কী হল বল তো বাবা?

—ঘড়ি? ঘড়ির কথা তো কেউ বলল না মামা!

—না বলুক। চুলোয় যাক। এতদিনে আপদ গেছে। কিন্তু সেই হেনরি কোলব্রুক কে?

মুরারিবাবু পরে সেই দোকানে গিয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন। কোলব্রুক সায়েব একশো বছর আগে রাত এগোরোটা পঁয়ত্রিশে আত্মহত্যা করে মারা যান। এই দোকানের মালিক ছিলেন তিনি। দুরারোগ্য অসুখে ভুগে প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। খুব যন্ত্রণা হতো। সারাক্ষণ ছটফট করতেন। তার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো ছিল। হ্যাঁ, আত্মহত্যার আগে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলেন এগারোটা পঁয়ত্রিশের ঘরে। বোঝা যায়, হেনরি কোলব্রুক নাটকীয়ভাবে মরতে চেয়েছিলেন।

দোকানদার ভদ্রলোক আরও জানিয়েছিলেন,—ঘড়িটা আমরা এবার সার্কুলার রোডে কবরখানায় ওঁর কবরের কোণা খুঁড়ে পুঁতে দিয়ে এসেছি। আপনার পাশেই কাগজের প্যাকেটে ঘড়িটা পড়েছিল। আর ঘরে ঢোকাইনি। কারণ, আপনাকে নিয়ে এই চোদ্দজন হল—প্রত্যেকে ওটার পাল্লায় পড়ে ভুগেছেন। এবার স্যার, কালীঘাটে গিয়ে পুজো-টুজো দিন।...

স্টেশনের নাম ঘুমঘুমি

ভুল করে অন্য কোথাও নেমে পড়েছি নাকি? ট্রেন চলে গেলে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে চারদিক দেখতে থাকলাম। মানুষ নেই জন নেই, গাছ নেই পালা নেই, এ কেমন জায়গা?

নাঃ, ভুল হয়নি। ওই তো হলুদ বোর্ডে লেখা আছে 'ঘুমঘুমি'। দেখে স্বস্তি পেলাম। তারপর চোখে পড়ল রেলের পোশাকপরা একটা লোক স্টেশনের উঁচু খোলামেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। কোনও যাত্রী নামেনি আমি ছাড়া। টিকিট নেওয়ার জন্যও কেউ নেই মনে হল।

স্টেশনের পিছনে কোয়ার্টারটাও চোখে পড়ল। তখন নিচু প্ল্যাটফর্মে আস্তে-আস্তে হেঁটে স্টেশনঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। বলা বাহুল্য, খুব হতাশ হয়ে গেছি। এমন একটা অখাদ্য নির্জন স্টেশনে অরুণমামা থাকেন, ভাবতেই পারিনি।

চারদিকে ধুধু রুক্ষ মাঠ। কদাচিৎ দূরে একটা গাছ। সেও একেবারে ন্যাড়া। আর এদিকে-ওদিকে ছোটখাট পাহাড় বা টিলা। রেললাইনটা এই মাঠ পেরিয়ে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। কেমন একটা শূন্যতা খাঁ-খাঁ করছে চারপাশে।

রেলের পোশাক-পরা লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মুখে গোঁফদাড়ি দেখে আমি সঙ্গে-সঙ্গে চিনতে পারিনি অরুণমামাকে। বললাম,—আচ্ছা, স্টেশনমাস্টার অরুণ রায় কি আছেন, না বদলি হয়ে গেছেন?

একথা জিগ্যেস করার কারণ, অরুণমামা আমাকে আসতে লিখেছিলেন সেই পুজোর পর। আর এখন বোশেখ মাস। তারপর এতদিন আর কোনও চিঠি লেখালেখি নেই।

তা আমার কথা শুনে ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে বললেন,—বদলি হবেন মানে? তিনি বহাল তবিয়তেই আছেন। তুমি কোত্থেকে আসছ?

—কলকাতা থেকে! অরুণবাবু আমার মামা হন।

অমনি ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে হাসতে-হাসতে বললেন,—সুকু, তুই? ওরে, তুই এত্তো বড়টি হয়েছিস রে! অ্যাঁ? তোকে যে আর চেনাই যাচ্ছে না রে!

আর আমিও দাড়িগোঁফের আড়ালে অনেকদিন আগে দেখা মুখখানা আবিষ্কার করে ফেলেছি তক্ষুনি। বললাম,—ও মামা! আপনাকেও যে চেনা যাচ্ছে না। দাড়িগোঁফ রেখে একেবারে সাধুসন্ন্যেসী হয়ে গেছেন যে।

অরুণমামা আমাকে জাপটে ধরে এগিয়ে গেলেন। স্টেশন-ঘরের দরজায় পয়েন্টসম্যানকে ডেকে বললেন,—ভজুয়া! এ কে এসেছে দেখছিস। আমার ভাগ্নে সুকুমার!

ভজুয়া আমাকে সেলাম দিয়ে হাসল।

অরুণমামা বললেন,—বাবা ভজুয়া! আমি একে কোয়ার্টারে নিয়ে যাই। তুই থাকিস। সন্ধে ছটার ডাউন আসার সময় হয়ে গেল। সিগন্যাল দিয়ে রাখ।

ওকে আরও কিছু নির্দেশ দিয়ে অরুণমামা আমাকে নিয়ে চলতে থাকলেন। গেট পেরিয়ে একটা চটান মতো জায়গায় কুয়ো আছে দেখলাম। কুয়োর কাছে একটি দেহাতি মেয়ে বালতি করে জল তুলছিল। ঘোমটা টানল আমাদের দেখে। অরুণমামা বললেন,—লছমীবউ, বল তো এ কে? বলতে পারলি নে তো? আমার ভাগ্নে রে, ভাগ্নে। কলকাতা থেকে আসছে। তুই জল তুলে একবারটি আসবি। বুঝলি?

একটা মোটে কোয়ার্টার। তার দরজার তালা খুলতে-খুলতে অরুণমামা বললেন,—আমার বন্ধু বল, দেখাশোনার লোক বল, এই ভজুয়া আর তার বউ লছমী। একজন খালাসি ছিল ঝাঁটুয়া নামে। সে ব্যাটা অনেক চেষ্টা করে বদলি নিয়েছে। আর নতুন লোক আজ অবধি এল না। কেউ এই ঘুমঘুমি স্টেশনে আসতে চায় না। বুঝলি?

বললাম,—কেন মামা?

অরুণমামা ঘরে ঢুকে বললেন,—কেন তা বুঝতে পারছিস নে সুকু? এই পাণ্ডববর্জিত নির্জন জায়গায় কি কেউ থাকতে চায়? কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষ এখানে হাঁফিয়ে উঠবে।

—আপনি আছেন যে? তাছাড়া ওই ভজুয়া আর তার বউও তো আছে?

অরুণমামা আমার প্রশ্ন শুনে একটু হেসে বললেন,—এর কোনও স্পষ্ট জবাব দেওয়া সত্যি কঠিন সুকু। শুধু এটুকু বলতে পারি, নির্জন জায়গায় থাকতে কোনও-কোনও মানুষ হয়তো ভালোবাসে। যেমন আমি। প্রথমে কিছুদিন ভালো লেগেছিল। তারপর খারাপ লাগতে শুরু করল। তখন পড়াশুনায় মন দিলাম। রাজ্যের বইপত্তর কিনে আনি জংশন শহর থেকে, আর পড়ি। তারপর সয়ে গেল সব। এখন বরং এ জায়গা থেকে চলে যেতে হলে খুব কষ্ট পাব। যাক গে, তুই আটচল্লিশ ঘণ্টার জার্নিতে ক্লান্ত। বারান্দায় বালতিতে জল আছে। হাত-মুখ ধুয়ে নে। আমি চা-জলখাবারের জোগাড় করি।

অরুণমামা চোখ নাচিয়ে ফের বললেন,—বুঝতেই তো পারছিস, স্বপাক খাই। কিন্তু আমার রান্নার স্বাদ পেলে আর কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছেই করবে না তোর। আজ রাতে কী রান্না করব জানিস? পাঁঠার মাংস।

অবাক হয়ে বললাম,—পাঁঠার মাংস এখানে কোথায় পেলেন মামা?

—মাইল পাঁচেক দূরে চণ্ডিকাদেবীর মন্দির আছে। কাল তোকে নিয়ে যাব সেখানে। মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে আমার খুব খাতির আছে। বলি পড়লেই প্রসাদি মাংস পাঠিয়ে দেন।

বলে অরুণমামা কেরোসিন কুকার ধরাতে ব্যস্ত হলেন। আমি ভেতরের বারান্দায় গিয়ে বালতির ঠান্ডা জলে হাত-মুখ-পা রগড়ে ধুলাম। ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। উঠোনের কোণায় পাঁচিল ঘেঁষে একটা প্রকাণ্ড জবা গাছে বড়-বড় ফুল ফুটেছে। এই রুক্ষ নীরস শ্রীহীন তেপান্তরে ওই ফুলগুলো দেখে কী যে ভালো লাগল!

ফুলগুলো যে সত্যিকার ফুল বিশ্বাস করাই কঠিন। চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে তো বটেই, এমন গোলাপি পাপড়ি এবং হলুদ পরাগের জবা এর আগে কোথাও দেখিনি। তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, জবাফুলে গোলাপের মতো মিঠে ঝাঁজালো গন্ধ কেন?

কাছে গিয়ে খুঁজছিলাম পাশে কোথাও গোলাপ গাছ আছে নাকি। কিন্তু না, আর কোনও ফুলগাছ নেই। শুধু ওই একটাই জবা গাছ—প্রকাণ্ড ঝাড়। তাজ্জব হয়ে ভাবছি, একটা নতুন ব্যাপার দেখলাম তাহলে। জবাফুলে গোলাপের গন্ধ!

ঠিক সেই সময় পাঁচিলের ওপর একটা বছর দশ-বারো বয়সের মেয়ের মাথা দেখা গেল। আমি একটু চমকে উঠেছিলাম। তারপর মেয়েটি পাঁচিলের ওপর ওঠে পা ঝুলিয়ে বসল। তখন সূর্য ডুবে গেছে ঘুমঘুমির মাঠে। ফিকে গোলাপি আলোটাও মুছে গেছে। মেয়েটি হাসিমুখে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তার কোঁকড়ানো চুলগুলো ঈষৎ লালচে। চোখের তারা নীল। মেমসায়েবদের মতো। গায়ের রঙ ধবধবে ফরসা।

বললাম,—কোথায় থাকো খুকুমণি?

ফ্রকপরা খুকুমণিটি হেসে বাইরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

কিন্তু বাইরে তো কোনও বাড়ি দেখিনি কোথাও। হ্যাঁ—একটা ছোট্ট ঘর আছে

বটে, সেখানে সম্ভবত ওই ভজুয়ারা থাকে। তাহলে ভজুয়ারই মেয়ে। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে এবার ফিসফিস করে বলল,—একটা ফুল দাও না!

যেই ফুল ভাঙতে হাত বাড়িয়েছি, পিছনে অরুণমামা বলে উঠলেন,—ও কী করছিস সুকু? ফুল তুলছিস নাকি? উঁহু-হুঁ কক্ষনো ওই কাজটি করবি নে বাবা। ওই ফুলগুলো মানসিক করা। প্রতিদিন সেই চণ্ডিকার মন্দিরের লোক এসে নিয়ে যায়।

অপ্রস্তুত হেসে বললাম,—মামা, ওই মেয়েটা ফুল চাইছিল কিনা, তাই...

অরুণমামা আমার কাছে দৌড়ে এসে বললেন,—মেয়েটা? কোন মেয়েটা?

ওই যে। —বলে আমি পাঁচিলের দিকে মুখ তুলে কিন্তু কাকেও দেখতে পেলাম না। তাহলে নির্ঘাত বেচারি লাফ দিয়ে নেমে পালিয়েছে অরুণমামার ভয়ে।

অরুণমামা পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে শুধু বললেন,—হুঁ!

তারপর আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। ঘরে গিয়ে চাপাগলায় বললেন,—একটা কথা বলি, শোন সুকু। ঘুমঘুমি বড় অদ্ভুত জায়গা। এখানে অনেক কিছু দেখবি। কিন্তু সাবধান, মাথা ঠিক রাখবি।

অবাক হয়ে বললাম,—অনেক কিছু দেখব মানে?

অরুণমামা গম্ভীরমুখে বললেন,—ওই মেয়েটা কে ছিল জানিস? আগেকার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্টেশনমাস্টারের ছোট মেয়ে মঞ্জু। বছর দশেক আগে মঞ্জু ট্রেনে কাটা পড়েছিল। আনমনে লাইনের ওপর খেলা করছিল, ট্রেনের হুইসেল শুনতে পায়নি।

শিউরে উঠেছি সঙ্গে-সঙ্গে। তাহলে কি আমি মঞ্জুর ভূত দেখলাম? অসম্ভব। আমি প্রত্যক্ষ দেখলাম। নিশ্চয় মামা আমার সঙ্গে তামাশা করছেন। মনের তলায় ভয় এসে চুপিচুপি দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু মুখের ভাবে সাহস রেখে হেসে বললাম,—ভূতটুতে আমার বিশ্বাস নেই, মামা!

অরুণমামা হাসলেন না একটুও। আরও গম্ভীর হয়ে বললেন,—তুমি এখন সোমত্ত ছেলেটি হয়ে উঠেছ। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস না থাকারই কথা। বিশেষ করে কলকাতায় থাকো তুমি। সেখানে আলোর দেশ। কিন্তু বাবা সুকু, এ হল অন্ধকারের দেশ। শহর তো দূরের কথা, গ্রাম বলতে ধারে-কাছে কিছু নেই। সবচেয়ে কাছের গ্রামটির দূরত্ব সাত মাইল। অবশ্য দেবী চণ্ডিকার মন্দির আছে মাইল পাচেক দূরে। কিন্তু সেখানে থাকেন শুধু পূজারী আর তাঁর একজন লোক। তাই বলছি, এই ঘুমঘুমি স্টেশনে অনেক বিচিত্র ব্যাপার তুমি দেখতে পাবে।

অরুণমামাকে অবিশ্বাস করাও তো যায় না। আমার মায়ের দূর সম্পর্কের দাদা এই ভদ্রলোককে অবশ্য খুব কমই দেখেছি আমাদের বাসায়। দুবছর অন্তর একবার করে দেখা দিয়ে এসেছেন মাত্র। তারপর আর পাত্তা নেই! গত দুবছর এমনি বেমালুম নিপাত্তা থাকার পর পুজোর ঠিক আগে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। ঠিকানা দিয়ে আসতে লিখেছিলেন। আসার সময় পাইনি। হঠাৎ কদিন আগে মা একটা কী যেন দুঃস্বপ্ন দেখেন। খুলে বলেননি, কিন্তু তারপর থেকেই তাগিদ দিচ্ছিলেন ওই অরুণদার কাছে গিয়ে যেন খবর নিয়ে আসি, কেমন আছেন। তাই এমনি করে আসা।

কিন্তু ওই অল্পস্বল্প পরিচয়েই অরুণমামাকে যতটুকু জেনেছিলাম, মনে হয়েছিল উনি বেশ জেদি, গম্ভীরপ্রকৃতির এবং সাহসী মানুষ। যাকে বলে ডানপিটে। এখনও বিয়ে করেননি। কাছের আত্মীয়স্বজন কেউ কোথাও নেই। একা থাকেন বরাবর। ওঁর মতো মানুষের পক্ষে ঘুমঘুমি আদর্শ জায়গা হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এমন ভুতুড়ে ব্যাপারের মধ্যে উনি পড়ে আছেন জেনে বেশ অবাক হলাম।

ফের হেসে বললাম,—তাহলে মঞ্জুকে আপনি অনেকবার দেখেছেন মামা? খুব জ্বালায় বুঝি?

অরুণমামা মাথা দুলিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। মেয়েটা পাজির পা-ঝাড়া। সারাক্ষণ জ্বালায়। স্টেশনে আপন মনে কাজ করছি, হঠাৎ কাগজপত্র ছড়িয়ে দিয়ে পালায়। খিলখিল করে হাসতে-হাসতে মাঠের দিকে পালিয়ে যায়। ভজুয়াকে জিগ্যেস করে দেখিস না! ওকে কি কম জ্বালায়? ওর টিকি ধরে টানে। হাঁটুর পেছনে আচমকা সুড়সুড়ি দেয়, আর ভজুয়া আছাড় খায়। পাজি মেয়েটার জন্যে বড্ড ঝামেলায় পড়তে হয় মাঝে-মাঝে। একবার তো ট্রেন আসছে, লাইন ক্লিয়ারের.....

বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে অরুণমামা জানালার দিকে তাকিয়ে ধমক দিলেন,—অ্যাই মঞ্জু! যাব নাকি? তবে রে পাজি মেয়ে।

উনি দরজা অবধি তাড়া করে গিয়ে ফিরলেন। কেরোসিন-কুকারের কাছে বসে কেটলির ফুটন্ত জলে চা-পাতা ফেলে বিড়বিড় করে কী যেন মন্ত্র পড়তে থাকলেন। ততক্ষণে আমি বিস্ময়ে ও আতঙ্কে ঘামতে শুরু করেছি। আগে জানলে কক্ষনও এমন জায়গায় আসতাম না। ওরে বাবা, এ যে সারাক্ষণ ভূত-প্রেত নিয়ে থাকা। ভয়ে-ভয়ে জানলার বাইরে তাকাচ্ছিলাম। মঞ্জুকে দেখতে পেলে এবার নিশ্চয় ভিরমি খেতাম সন্দেহ নেই। জানলার বাইরে আকাশে দু-তিনটে নক্ষত্র সবে ফুটে উঠেছে। সেই নক্ষত্র ছাড়া আর কিছু নেই।

একটু পরে দুজনে বসে চা খাচ্ছি, অরুণমামা বললেন,—হ্যাঁ, আর যা বলছিলাম। এই স্টেশনে অনেক ট্রেন বা মালগাড়ি আসতে-যেতে দেখবে। কোনওটা থামবে, কোনও যাত্রীও নামবে। কিন্তু জেনে রাখো, কোনও-কোনও গাড়ি মিথ্যে গাড়ি। তার মানে রেলগাড়িই নয়। স্রেফ ভুতুড়ে ট্রেন কিংবা ভুতুড়ে মালগাড়ি। যার যাত্রী, চেকার, গার্ড, ড্রাইভার, ফায়ারম্যান—সবাই ভূত-প্রেত। যে যাত্রী নামবে, সেও জানবে ভূত ছাড়া মানুষ নয়। তাই তো তখন তোমাকে নামতে দেখে আমি মনে-মনে তৈরি হচ্ছিলাম—ভূত হলে অ্যায়সা থাপ্পড় কষব!...

শুনে আমি আঁতকে উঠে বললাম,—ওরে বাবা!

অরুণমামা সস্নেহে আমার পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলেন,—পাগল! তোকে থাপ্পড় মারতাম নাকি? তুই তো মানুষ। দেখলেই চেনা যায়।

এই প্রথম আমার মনে হল, অরুণমামা আমার পিঠে যে-হাতটা এইমাত্র রেখে তুলে নিলেন, সেটা অস্বাভাবিক ঠান্ডা। জামার তলায় পিঠের সেই অংশটুকু যেন কতক্ষণ জমে নিঃসাড় হয়ে রইল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অরুণমামাকে দেখে নিলাম মাঝে-মাঝে। তারপর খুব সাহসের সঙ্গে মনে-মনে তৈরি হতে থাকলাম। ঘুমঘুমিতে যখন

এসেই পড়েছি, সহজে কাবু হব না। ভূতের সঙ্গে লড়াই করেই বীরের মতো প্রাণ বিসর্জন দেব।

কিন্তু অরুণমামা যে ভূত নন, তার প্রথম অকাট্য প্রমাণ, তিনি মারা তো যাননি। মারা গেলে খবর পেতাম। আত্মীয় বলতে তো যতদূর জানি, একমাত্র আমরাই আছি।

দ্বিতীয় অকাট্য প্রমাণ, ভূত কখনও এমন চমৎকার চা, কিংবা পাঁঠার মাংস রান্না করতে পারে না।

ভূতের রান্না খেয়ে হজম করাও সহজ কথা নয়। অথচ দিব্যি হজম হয়ে গেল। ভূতের পাশে শুয়ে রাত কাটিয়ে সকালে নিজেকে জ্যান্ত আবিষ্কার করাও কি যায়?

মোটেও না। সারারাত গভীর ঘুমে ঘুমিয়েছি। অরুণমামা ভূত হলে ঘাড় মটকাবার এমন সুযোগ কখনও ছাড়তেন না।

অতএব খুশি হলাম যত, সাহসও পেলাম তত। অরুণমামা যখন মানুষ, তখন ভজুয়া ও লছমিও মানুষ ছাড়া ভূত নয়। কিন্তু হায়...থাক। সে কথা পরে।

শুধু আগের স্টেশনমাস্টারের মেয়ে হতভাগিনী মঞ্জুর ব্যাপারটা ধাঁধা থেকে গেল। কতবার উঠোনের জবাফুলের গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম সারাটা সকাল। কিন্তু সে আর ফুল চাইতে এল না। ফ্রকপরা সুন্দর অতটুকু মেয়েটা—বয়স কত আর হবে? দশ-বারো বছরের বেশি নয়। তাকে আবার দেখতে পেলে জিগ্যেস করতাম,—ভূত হওয়াটা সুখের, না দুঃখের? ভূতেরা থাকেই বা কোথায়?

একসময় হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, জবাফুলগুলো তো কালকের মতো আর সুগন্ধ ছড়াচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে গন্ধহীন হয়ে গেছে আবার।

তখন ভীষণ চমক জাগল। তাহলে কি মঞ্জুর আবির্ভাবের সঙ্গে সেই মিষ্টি গোলাপফুলের গন্ধের কোনও সম্পর্ক আছে?

নিশ্চয় আছে। মঞ্জু এসেছিল বলেই জবাফুলের মধুর গন্ধ ছড়াচ্ছিল। এই গন্ধ মঞ্জুই নিয়ে আসে।

পরে কথাটা অরুণমামার কাছে তুললাম। উনি বললেন,—হ্যাঁ। তুমি ঠিকই ধরেছ সুকু। মঞ্জুর বাবা ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। মা বাঙালি মেয়ে। তাই মেয়ের নাম মঞ্জু রেখেছিলেন। ভদ্রমহিলা কিন্তু খ্রিস্টান হয়েও দেবী চণ্ডিকার ভক্ত ছিলেন শুনেছি। ওই জবা গাছটা তাঁরই লাগানো। নিয়মিত পুজোর ফুল দিয়ে আসতেন। পাঁচ মাইল রাস্তা একা যেতেন, একা ফিরে আসতেন। খুব সাহসী মহিলা ছিলেন। মঞ্জু ওইভাবে ট্রেনের চাকায় মারা পড়ার পর উনি নাকি পাগল হয়ে যান। তারপর আর তাঁর পাত্তা পাওয়া যায়নি। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্টেশনমাস্টার অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিলেন। পরে বদলি হয়ে যান আজিমাবাদ জংশনে। শুনেছি আবার বিয়ে করেছেন। ছেলেপুলেও হয়েছে।

এসব কথা শোনার পর মঞ্জুর মায়ের জন্যেও দুঃখ হল। মঞ্জু তো ইচ্ছে করলেই ওর মাকে খুঁজে বের করতে পারে। ভূতপ্রেত পারে না-ই বা কী? মাকে দেখা দিলে মায়ের প্রাণে শান্তি আসে। আচ্ছা, আবার যদি ফুল তুলতে আসে মঞ্জু, তাকে বলব তার মায়ের কথা।

কিন্তু আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়। আর মঞ্জুকে দেখি না। জবাফুলও সুগন্ধ ছড়ায় না। এমনি করে দুটো দিন কেটে গেল।

এই দুদিনে আর কোনও অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল না। তাই সাহস বেড়ে গেল। বিকেলে অনেকটা দূর অবধি রেললাইন ধরে একা বেরিয়ে এলাম। ফিরে এলে অরুণমামা একটু বকাবকি করলেন। তারপর বললেন বেড়াতে গেলে যেন ভজুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাই।

পরদিন বিকেলে মামার কথা মেনে ভজুয়াকে সঙ্গে নিয়েই বেরোলাম।

ভজুয়া চমৎকার বাংলা বলতে পারে। সে এই স্টেশনে দশ বছর ধরে আছে।। অনেক ভুতুড়ে ব্যাপার দেখে-দেখে তার সয়ে গেছে। সেইসব গল্প শুনিয়ে কান ঝালাপালা করে দিল সারা পথ।

আধমাইল যাওয়ার পর দেখি একটা ছোট্ট নদী। জল শুকিয়ে বালির চড়া পড়ে আছে। এখানে-ওখানে ছোট ও বড় পাথর ছড়ানো আছে অজস্র। দূর থেকে মনে হবে, একপাল হাতি দাঁড়িয়ে বা বসে আছে চুপচাপ।

ব্রিজের ওপর দিয়ে লাইনটা চলে গেছে দূরের দিকে। আমরা নদীতে নেমে গেলাম। একটা পাথরে বসে সূর্যাস্ত দেখতে থাকলাম। ভজুয়া লোকটি দেখি মহা গপ্পবাজ। অনবরত কথা বলছে। কান করছি না। একসময় সূর্যাস্তের পর সে হঠাৎ থেমে চাপাগলায় বলে উঠল,—খোকাবাবু! আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা ঠিক নয়। উঠুন, এবার ফিরে যাই।

বললুম,—কেন বলো তো? ভূত আসবে?

ভজুয়া কেমন হাসল। হেসে বলল,—না খোকাবাবু, ভূতের ভয় আর আমি করি না। আমার বউ তো করেই না। আপনার মামাবাবুও না। কেউ আমরা ভয় পাই না ভূত দেখে।

—তাহলে আর থাকা ঠিক নয় বলছ কেন?

ভজুয়া ভয়ার্তচোখে নদীর ধারে একটা টিলা দেখিয়ে বলল,—ভূতের চেয়ে সাংঘাতিক একজন ওখানে থাকে খোকাবাবু। 'চুরাইল' কাকে বলে জানেন?

—চুরাইল? সে আবার কী?

—শাঁকচুন্নি না কী যেন বলে আপনাদের বাংলা মুল্লুকে? কালো কুচকুচে গায়ের রং। মুখটা পেঁচার মতো। লম্বা শরীর। চোখদুটোর পাতা নেই। তাই পলক পড়ে না। মেয়েদের মতো সাদা কাপড় পরে থাকে। আর খোকাবাবু, তার পাদুটো পিঠের দিকে, মানে উল্টো দিকে ঘোরানো। উল্টো পায়ে হেঁটে থির তাকিয়ে সে আপনার দিকে এগিয়ে আসবে। আপনাকে সে মন্তর দিয়ে আটকে ফেললে, আপনি নড়তেও পারবেন না। তারপর এমন একটা বিচ্ছিরি চ্যাঁচানি চেঁচিয়ে উঠবে—তা শুনলে রক্ত ঠান্ডা হয়ে যাবে খোকাবাবু! তাই বলছি, এবার চলে আসুন।

হো-হো করে হেসে বললাম,—ভজুয়া! তুমি ভেবো না। তোমাদের চুরাইল আমার একটুও ক্ষতি করতে পারবে না।

ভজুয়া পাথর থেকে নেমে দাঁড়াল। বলল,—খোকাবাবু, আপনার ভালোর জন্যে বলছি। এখন চুরাইলটার বেরুবার সময় হয়েছে।

জেদ ধরে বললাম,—তুমি যাও ভজুয়া, আমি যাব না।

ভজুয়া আবার কী বলতে যাচ্ছে, আচমকা সেই টিলার দিকে তীব্র চেরা গলার চ্যাঁচানি শোনা গেল। কতকটা এই রকম—আঁ—ইঁ—ইঁ—ইঁ—ইঁ! ইঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁঃ।

ভজুয়া ঠিক বলেছিল। ওই চিৎকার কখনও মানুষের তো নয়ই, কোনও জন্তুরও নয়। পৃথিবীর কোনও শরীরী প্রাণী অমন অমানুষিক চিৎকার করতেই পারে না। ওই চিৎকার শুনলে সত্যি গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডে খিল ধরে। শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতেও মনে থাকে না।

ভজুয়াকে দেখলাম, চোখের পলকে ব্রিজের ওপর পৌঁছে গেছে। আমার পা দুটো আটকে গেছে নদীর বালিতে—পাথর থেকে নেমেছি, কিন্তু পা তোলার ক্ষমতা নেই। সেই অবস্থায় টিলাটার দিকে তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ—একটা আবছা মূর্তি তরতর করে নেমে আসছে আমার দিকে!

ওই তাহলে চুরাইল এবং সত্যি আমি আটকে গেছি। নড়তেও পারছি নে।

কয়েক মুহূর্ত পরে নদীর কিনারায় পৌঁছে গেল চুরাইলটা। তারপর পাথর ডিঙিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। যে পাথরে বসেছিলাম একটু আগে, সেটার ওপর এসে দাঁড়াতেই তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

ভজুয়া ঠিকই বলেছিল। অমন কুৎসিত-ভয়ংকর চেহারা কখনও দেখিনি—কল্পনাও করিনি। এই আবছা অন্ধকারে তার চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে। নিষ্পলক চোখ। তারপর সে বিকট চিৎকার করে উঠল আগের মতো ঃ আঁ-ইঁ—ইঁ—ইঁ! ইঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ! আমার কানে যেন ঠান্ডা বরফের সূচ ঢুকে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।—

যখন জ্ঞান হল, বুঝতে পারলাম না কোথায় আছি। একটু পরে যেন টের পেলাম, শক্ত মাটিতে শুয়ে আছি। এবং কে আমার মুখে জলের ঝাপটা দিল। তখন চোখ খুলে দেখি একটা পিদিম জ্বলছে। বদ্ধ এবং ছোট্ট একটা জায়গায় আমি নগ্ন পাথুরে মেঝেয় শুয়ে আছি।

ধুড়মুড় করে উঠে বসতেই কে হিন্দিতে বলল,—তবিয়ত ঠিক হ্যায় বেটা? শরীর ঠিক আছে তো?

একজন লেংটিপরা জটাজুটধারী সাধুকে দেখতে পেলাম, আমার পিছনে বসে আছেন। তাঁর এক হাতে একটা পিদিম, অন্যহাতে জলের লোটা। এবার লোটাটা এগিয়ে দিয়ে বললেন,—পিও বেটা। জল খাও!

ঢকঢক করে জল খেয়ে মাথা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। বললাম,—আমি কোথায় আছি?

সাধু বললেন,—আমার ডেরায় আছো বাবা। কোনও ভয় নেই।

—কেমন করে এলাম এখানে?

—আমি তুলে নিয়ে এসেছি। নদীর চড়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে। ভাগ্যিস, আমি তখন যাচ্ছিলাম নদীর বালি খুঁড়ে জল আনতে। নয়তো খুব বিপদে পড়ে যেতে। এইসব পাহাড়ে খুব চিতাবাঘের উপদ্রব আছে। মড়া ভেবে তোমাকে খেয়ে ফেলত! ভগবানের দয়ার তুমি জোর বেঁচে গেছো বেটা। —বলে সাধু হাসতে থাকলেন।

বললাম,—তাহলে দেখছি চুরাইলটা আমাকে মেরে ফেলতে পারেনি।

সাধু গম্ভীর হয়ে তাকালেন আমার দিকে। বললেন,—চুরাইল!

—হ্যাঁ সাধুবাবা। আমি একটা চুরাইলকে দেখে আর তার চিৎকার শুনে জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম।

সাধু আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন,—ও, বুঝেছি তুমি কাকে চুরাইল বলছ! বেটা, বোকা লোকেরা তাই রটিয়েছে বটে। ও চুরাইল নয়, তোমার-আমার মতোই মানুষ!

—মানুষ! অবাক হয়ে বললাম।

—হ্যাঁ বেটা। ও এক হতভাগিনী মেয়ে। পাগলি। এই পাহাড়ের একটা গুহায় থাকে। খিদে পেলে দূর-দূরান্তের গ্রামে রাতে গিয়ে খাবার চুরি করে এনে খায়। কারণ ও ভিক্ষে চাইলে কেউ দেয় না। ওর চেহারাটা আগুনে পুড়ে বীভৎস হয়ে গেছে।

—কেন সাধুবাবা?

—ওর একমাত্র মেয়ে ঘুমঘুমি স্টেশনে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যায়। সেই শোকে ও পাগলিনী হয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল। পরে ফিরে এল যদি, কে ওই নির্জন স্টেশনে ওকে খেতে-পরতে দেবে? পেটের জ্বালায় বেচারি গ্রামে ভিক্ষে করতে যেত আর ওর সেই মেয়ের বয়সি কোনও মেয়ে দেখলেই তার দিকে তাকিয়ে থাকত। একবার হল কী, বিহারের এইসব গাঁয়ের অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সব মানুষ ওকে ডাইনি ভেবে আগুনে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করল। দৈবাৎ সে-গ্রামে পুলিশ এসেছিল সেদিন। পুলিশ এসে হতভাগিনীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তারপর ঘা সেরে উঠলে সে পালিয়ে আসে আবার ঘুমঘুমিতে।

সাধুবাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের বললেন,—ওর ওই এক বিদঘুটে স্বভাব বেটা। মানুষকে ভয় দেখিয়ে মজা পায়। কিন্তু মাঝে-মাঝে শুনি অনেক রাতে মেয়ের নাম ধরে কাঁদছে। আমি সন্ন্যাসী মানুষ বেটা, কিন্তু সে কান্না শুনলে আমিও স্থির থাকতে পারিনে।

বললাম,—কিন্তু ওঁর স্বামী তো বেঁচে আছেন শুনলাম। জংশনে না কোথায় যেন আছেন সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক!

সাধুজী বললেন,—সে খোঁজ আমি কি নিইনি? তিনি বছর পাঁচেক আগে চাকরি ছেড়ে সপরিবারে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছেন। সে-ঠিকানা যোগাড় করতে পারিনি। যাকগে, রাত অনেক হয়েছে। এখন এই সামান্য রুটিটুকু খেয়ে ভগবানের নাম করে শুয়ে পড়ো বেটা। বহুত তকলিফ হবে জানি। কিন্তু কী আর করবে? এ তো সাধু-সন্ন্যাসীর গুহা। এখন নির্ভয়ে ঘুমোও। সকালে তোমার পরিচয়, হালহদিশ শুনব। এখন তুমি

অসুস্থ।—বলে সাধুজি একটা কম্বল পেতে দিলেন। কোণা থেকে শালপাতায় একটা রুটি এনে সামনে ধরলেন।

বললাম,—বরং আমায় স্টেশনে পৌঁছে দিন সাধুবাবা। মামা খুব ভাবনায় পড়বেন আমি না ফিরলে।

সাধুজি অবাক হয়ে বললেন,—স্টেশন? কোন স্টেশন? আর তোমার মামাই বা কে?

—কেন? ঘুমঘুমি স্টেশন। আমার মামা সেখানকার স্টেশনমাস্টার।

সাধুজি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—কী বলছ তুমি? ঘুমঘুমি তো কবে থেকে পোড়ো হয়ে আছে! সাইনবোর্ডে আর ভাঙা স্টেশনঘরের গায়ে বড়-বড় ইংরিজি হরফে লেখা আছে ঃ 'অ্যাবাডানড।'

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম,—অসম্ভব। আজ তিন দিন ধরে সেখানে আছি। ঘুমঘুমির টিকিট কেটেই তো সেখানে পৌঁছেছিলাম।

সাধুজি হো-হো করে হেসে উঠলেন আবার,—এ ছেলেটার মাথা গড়বড় হয়ে গেছে। ঘুমঘুমি স্টেশনের নামে টিকিটই নেই। তুমি নিশ্চয় ভুল করছ। হ্যাঁ—ঘুমঘুমির টিকিট চাইলে আজিমাবাদ জংশনের বাবুরা আনাড়ি লোক ভেবে পরের স্টেশনের টিকিট দেন শুনেছি। পরের স্টেশনের নাম কী জানো? ঝুমঝুমি।

টিকিট তো আমার এই প্যান্টের পকেটেই ছিল। তক্ষুনি বের করে অবাক হয়ে দেখি, লেখা আছে—ঝুমঝুমি। আবার অজ্ঞান হয়ে যাব মনে হল।

সাধুবাবার সঙ্গে পরদিন সকালে এক মাইল হেঁটে গিয়ে সত্যি দেখেছিলাম, ওটা একটা 'অ্যাবন্ডানড' বা পরিত্যক্ত স্টেশন। যাত্রী ওঠানামা করে না বলে আজিমাবাদ—নওলগড় ব্রাঞ্চের এই স্টেশনটা কবে বাতিল হয়ে গেছে। আর কলকাতায় ফিরে গিয়ে শুনি, মা চলে গেছেন পাটনা। পাটনা রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে টেলিগ্রাম গিয়েছিল, ঝুমঝুমির স্টেশনমাস্টার অরুণ রায় করোনারি থ্রম্বসিসে মারা গেছেন! হ্যাঁ, ভাঙা স্টেশন কোয়ার্টারে কোনও জবা গাছও ছিল না।

কালো ছড়ি

মুরারিবাবু প্রতিদিনের মতো মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলেন। ডাক্তারের পরামর্শ, এ বয়সে রোজ ভোরবেলা অন্তত একঘণ্টা হাঁটাচলা করলে হার্টের অবস্থা ভালো থাকে। আঁকা-বাঁকা গলিতে হাঁটতে-হাঁটতে বড় রাস্তায়। তারপর কিছুদূর হাঁটলেই একটা পার্ক। বার দুই-তিন পার্কটা চক্কর দিয়ে মুরারিবাবু একটা বেঞ্চে কিছুক্ষণ বসে জিরিয়ে নেন। তারপর ধীরেসুস্থে বাড়ি ফেরেন।

একদিন পার্কে চক্কর দিয়ে তিনি জিরিয়ে নেওয়ার জন্য একটা বেঞ্চে বসলেন। সবদিন অবশ্য বেঞ্চ খালি পাওয়া যায় না। না পেলে মুরারিবাবু পার্কের রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়ান।

আজ পুরো একটা বেঞ্চ খালি। মুরারিবাবু ঘড়ি দেখলেন। ছটা বেজে গেছে। আজ একটু বেশি হাঁটা হয়ে গেছে হয়তো। তাই ক্লান্তিটা যাচ্ছে না যেন। আরও মিনিট দশেক বসা যাক।

একটু পরে এক ভদ্রলোক এসে বেঞ্চটার অন্যপ্রান্তে বসলেন। একমাথা সাদা চুল। পাকানো গোঁফ। পরনে গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি আর ধাক্কাপাড় ধুতি। পায়ে চকচকে পামশু। হাতে একটা কালো ছড়ি। বেশ শৌখিন মনে হচ্ছিল তাঁকে। তাছাড়া মিঠে একটা সুগন্ধও টের পাচ্ছিলেন মুরারিবাবু। এ বয়সে সেন্ট মেখে মর্নিংওয়াক করতে বেরিয়েছেন ভদ্রলোক!

মনে-মনে হাসি এল মুরারিবাবুর। আড়চোখে ভদ্রলোককে লক্ষ করতে থাকলেন। এবার ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করলেন। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার রিং পাকাতে থাকলেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সিগারেটটা জুতোর তলায় ঘষটে নিভিয়ে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন এবং হন্তদন্ত হাঁটতে শুরু করলেন।

মুরারিবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। ভদ্রলোক পার্কের গেট গলিয়ে বড়রাস্তার ফুটপাতে পৌঁছেছেন, সেই সময় মুরারিবাবুর চোখে পড়ল ওঁর কালো ছড়িটা। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ছড়িটা তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন,—ও মশাই! ও মশাই! আপনার ছড়িটা ফেলে গেলেন যে!

ভদ্রলোক যেন শুনতেই পেলেন না। ফুটপাতের ওখানেই বাসস্টপ। প্রায় খালি একটা বাস এসে গেল এবং উনি বাসে উঠে গেলেন। বাসটা তক্ষুনি গর্জন করতে-করতে জোরে চলে গেল। মুরারিবাবু ছড়িটা হাতে নিয়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কালো ছড়িটা ওই ভদ্রলোকের মতোই শৌখিন বলা যায়। হাতলওয়ালা ছড়ি। হাতলে রুপোলি নকশা আছে। বাকি অংশ মসৃণ। তলার দিকটা ইঞ্চিটাক রুপোলি খাপে মোড়া।

মুরারিবাবু অগত্যা ছড়িটা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। কাল মর্নিংওয়াকে গিয়ে যদি ওঁর দেখা পান, ফেরত দেবেন। কাল যদি দেখা না পান, পরশুও ছড়িটা নিয়ে যাবেন। যতদিন না ওঁর দেখা পান, ততদিন এটা সঙ্গে নিয়ে মর্নিংওয়াকে বেরুবেন।...

সেদিন রাত্রে কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মুরারিবাবুর।

তারপর ঝাঁঝালো মিঠে সুগন্ধ টের পেলেন তিনি। প্রথমে ভাবলেন মনের ভুল। পরে বুঝলেন, মনের ভুল নয়। ঘরে সত্যিই সুগন্ধ মউ-মউ করছে। আজ ভোরবেলা পার্কের সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক এই গন্ধটাই তখন টের পেয়েছিলেন মুরারিবাবু।

কিন্তু সেই সুগন্ধ এই ঘরের ভেতর কেন?

চমকে উঠে মুরারিবাবু সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দিলেন। তারপর মশারি থেকে বেরিয়ে সুইচ টিপে টিউবলাইটটাও জ্বাললেন।

ঘরে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় মানুষ নেই। থাকবেই বা কেমন করে? মশার জন্য মাথার দিকের দুটো জানালা সন্ধ্যার আগে বন্ধ করে দেন মুরারিবাবু। পায়ের দিকে অর্থাৎ বাড়ির ভেতর দিকের দুটো জানালার মধ্যে একটা বন্ধ করেন, অন্যটা শুধু খোলা থাকে। পাশের ঘরে যাওয়ার দরজা এবং বারান্দায় যাওয়ার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ আছে। তাহলে সুগন্ধটা কি ভেতরের বারান্দা থেকে আসছে!

সেই খোলা জানালার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, দেয়ালের ব্র্যাকেটে হাতল আটকে সেই কালো ছড়িটা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, সেটা নেই।

অমনি বুক ধড়াস করে উঠল মুরারিবাবুর। ছড়িটা গেল কোথায়?

অবশ্য তত ভিতু মানুষ তিনি নন। রেলের চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর এই পৈতৃক একতলা বাড়িতে বসবাস করছেন মুরারিবাবু। যখন তিনি চাকরি করতেন, তখন তাঁর বিধবা দিদি এই বাড়িতে একমাত্র ছেলে নকুলকে নিয়ে থাকতেন। মুরারিবাবু রিটায়ার করার আগেই নকুলকে রেলে একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন। এতদিনে নকুল কোয়ার্টার পেয়ে তার মাকে নিয়ে গেছে। কাজেই মুরারিবাবু এ বাড়িতে একা থাকেন। স্বপাক খান। বরাবর তিনি স্বাবলম্বী মানুষ। জীবনে কখনও ভূতপ্রেত দেখেননি। ভূতপ্রেত আছে না নেই, তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাননি। অবশেষে এই বয়সে যে এমন একটা ভুতুড়ে ঘটনার মধ্যে তাঁকে পড়তে হবে, কোনওদিন কল্পনাও করেননি।

মাথা ঠান্ডা রেখে মুরারিবাবু ঘটনাটা বুঝতে চাইলেন। এ তো একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ভোরবেলা পার্কে দেখা সেই ভদ্রলোক জলজ্যান্ত মানুষ। রহস্য যেটুকু ছিল, সেটুকু তাঁর আকস্মিক চলে যাওয়া নিয়ে। কিন্তু এখন রহস্যটা রীতিমতো ঘোরালো হয়ে উঠল যে!

একটু পরে মুরারিবাবু টের পেলেন, ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা তাঁর দুপায়ে যথেষ্ট হুল ফোটাচ্ছে। এই তল্লাটে মশার উৎপাত প্রচণ্ড। দেয়ালের সুইচ টিপে টিউবলাইট বন্ধ করে মুরারিবাবু মশারির ভেতর ঢুকে পড়লেন। তিনি এখন মরিয়া। যা ঘটে ঘটুক, তিনি গ্রাহ্য করবেন না। কিছুক্ষণ পরে মশারির ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পের সুইচ অফ করলেন মুরারিবাবু।

মাথার ওপর নতুন সিলিংফ্যান নিঃশব্দে ঘুরছিল। সুগন্ধটা তখনও মউ-মউ করছিল। সেই সুগন্ধে যেন কী মাদকতা আছে। মাদকাচ্ছন্ন অবস্থায় ঘুমে তলিয়ে গেলেন রেলের এক প্রাক্তন গার্ড মুরারিমোহন ধাড়া...

ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া থাকে। ভোর পাঁচটায় সেই অ্যালার্ম বাজলে মুরারিবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। অভ্যাসমতো শশব্যস্তে উঠে পড়লেন তিনি। তারপরই মনে পড়ে গেল রাত্রের সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা। কিন্তু নাহ! এখন ঘরে সেই সুগন্ধ নেই।

আর কী আশ্চর্য, সেই কালো ছড়িটা ব্র্যাকেটেই ঝুলছে। তাহলে কি তিনি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন?

কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না মুরারিবাবু। প্রতিদিনের মতো মশারি খুলে সিলিংফ্যানের সুইচ অফ করে কালো ছড়িটা হাতে নিয়ে মর্নিংওয়াকে বেরুলেন তিনি। যথারীতি দরজায় তালা এঁটেই বেরুলেন।

পার্কে পৌঁছে চারদিকে লক্ষ রেখেছিলেন মুরারিবাবু। কিন্তু কোথাও সেই ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন না।

আজ চারবার চক্কর দিয়ে সেই বেঞ্চটার কাছে এসে দেখলেন, গাদাগাদি তাঁর বয়সি ছ-জন বৃদ্ধ বসে আছেন। মুরারিবাবু পার্কের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। আজ বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি।

তাঁর দৃষ্টি চঞ্চল। চারদিকে তাকিয়ে সেই ভদ্রলোককে খুঁজছিলেন তিনি। কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেন না।

অগত্যা ছড়িটা নিয়ে আজ একটু দেরি করেই বাড়ি ফিরলেন মুরারিবাবু। কালো ছড়িটা দেয়ালে আঁটা ব্র্যাকেটে আগের দিনের মতো ঝুলিয়ে রাখলেন।...

এদিন রাত্রে মুরারিবাবু সতর্কভাবে জেগে ছিলেন। ফ্যানের বাতাসে মশারি দুলছিল। তাই ব্র্যাকেটে ঝোলানো ছড়িটাকে দেখা যাচ্ছিল না। ফ্যান বন্ধ থাকলে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মশারির ভেতর থেকে ওটা চোখে পড়ার কথা।

টেবিল ল্যাম্পটা আজ ইচ্ছে করেই জ্বেলে রেখেছিলেন। ক্রমে পাড়া নিঝুম হয়ে এল। গলিতে রিকশা চলাচলও বন্ধ হয়ে গেল এক সময়। মুরারিবাবুর চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। তবু তিনি কষ্ট করে জেগে থাকলেন। রেলের গার্ড ছিলেন তিনি। ঘুম এলে মনের জোরে তাকে তাড়াতে পারেন। কতক্ষণ পরে হঠাৎ একটা শব্দ হল। গতরাত্রে যেমন হয়েছিল।

আজ জেগে আছেন বলে বুঝতে পারলেন, উঁচু থেকে যেন কোনও হাল্কা জিনিস পড়ে যাওয়ার মতো শব্দটা। খট খট খটাস!

তারপরই আচম্বিতে নাকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মাদকতাময় আশ্চর্য সুগন্ধ!

কয়েক মুহূর্তের জন্য অজানা আতঙ্কে তাঁর শরীর ভারী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ তিনি আরও মরিয়া। মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে মুরারিবাবু চাপা গর্জন করলেন,—তবে রে ব্যাটাচ্ছেলে!

তারপর টিউবলাইট জ্বেলে ব্র্যাকেটের দিকে তাকালেন। অমনি ভীষণ চমকে উঠলেন মুরারিবাবু। কালো ছড়িটা ব্র্যাকেট থেকে নিচে পড়ে গেছে।

তাহলে এই শব্দটাই কাল রাতে তাঁর ঘুম ভাঙিয়েছিল এবং আজ রাতেও একই শব্দ তিনি শুনেছেন।

ব্র্যাকেট থেকে ছড়ি পড়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ফ্যানের বাতাসের ধাক্কায় হয়তো ছড়িটা দুলতে-দুলতে পিছলে পড়ে গেছে।

কিন্তু এই সুগন্ধটা?

মুরারিবাবু ছড়িটা তুলে আবার ব্র্যাকেটে রাখার জন্য পা বাড়িয়েছেন, সেই সময় অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটে গেল।

ছড়িটা মেঝে থেকে সটান সোজা হল। তারপর শূন্যে ভেসে খোলা জানালার গরাদের ফাঁকা দিয়ে ভেতরের বারান্দায় চলে গেল। এবার বারান্দায় চাপা খুটখুট শব্দ হতে থাকল।

মুরারিবাবু স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন। একটু পরে তাঁর মনে হল, কে যেন বারান্দায় ছড়ি ঠুক-ঠুক করে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

সাহস করে জানালায় উঁকি দিলেন তিনি। বারান্দার ওপরে চল্লিশ ওয়াটের একটা বাল্‌ব সারা রাত জ্বলে। এলাকায় ছিঁচকে চোরের উপদ্রব আছে।

হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। উঁকি মেরে মুরারিবাবু কাকেও দেখতে পেলেন না। তবে সেই সুগন্ধটা এখনও ঘরের ভিতর মউমউ করছে। ক্রমশ মাথাটাও যেন ঝিম ঝিম করছে। চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে ঘুমে।

টলতে-টলতে মুরারিবাবু আলো নিভিয়ে গতরাতের মতো মশারিতে ঢুকে গেলেন এবং খুব শিগগির ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোর পাঁচটায় অ্যালার্ম বাজল যথারীতি। মুরারিবাবুও মর্নিংওয়াকের জন্য তৈরি হলেন। আর কী আশ্চর্য! তিনি দেখলেন, কালো ছড়িটা কালকের মতোই ব্র্যাকেট থেকে ঝুলছে। ঘরে কোনও সুগন্ধও নেই।

হ্যাঁ, স্বপ্ন ছাড়া আর কী? মুরারিবাবুর মনে হল, পরপর দু-রাত্রি তিনি একই স্বপ্ন দেখেছেন। আসলে ছড়িটার রং কালো এবং সেই ভদ্রলোক ওইভাবে এটা ফেলে রেখে হন্তদন্ত এগিয়ে গিয়ে বাসে চেপে চলে গেলেন! তাই মনে একটা খটকা বেধেছিল এবং সেই খটকা থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখেছেন।...

এদিনও পার্কে সেই ভদ্রলোককে খুঁজে পাননি মুরারিবাবু। তবে সেই বেঞ্চে তাঁর বসার মতো জায়গা ছিল। জনা চার তাঁর বয়সি প্রবীণ ভদ্রলোক বেঞ্চে বসে ছিলেন। কালো ছড়িটা একপাশে রেখে মুরারিবাবু ভাবছিলেন, পরপর দু-রাত্রি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি দেখেছেন। আজ রাত্রেও যদি ওই স্বপ্ন দেখেন?

অমন বিদঘুটে স্বপ্ন প্রতিরাত্রে দেখতে কি ভালো লাগে? তাছাড়া এভাবে কালো ছড়িটার রহস্য নিয়ে মাথা ঘামালে তিনি সত্যিই যে পাগল হয়ে যাবেন!

তার চেয়ে ছড়িটা এখানে ফেলে রেখে সেই ভদ্রলোকের মতোই কেটে পড়া যাক।

এমন তো হতেই পারে, এই কালো ছড়িটা সেই ভদ্রলোকেরও নয় এবং তিনিও এর পাল্লায় পড়ে ভুতুড়ে স্বপ্নের চোটে নাকাল হয়ে এটা এখানে ফেলে কেটে পড়েছিলেন!

মুরারিবাবু ছড়িটা ফেলে রেখে বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হন্তদন্ত হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু বরাত অন্যরকম।

বেঞ্চের এক ভদ্রলোক ছড়িটা নিয়ে ছুটে এলেন।—ও মশাই! ও মশাই! আপনার ছড়ি! ছড়িটা ফেলে যাচ্ছেন যে!

বেগতিক দেখে মুরারিবাবু জোরে মাথা নেড়ে বললেন,—নাহ। ওটা আমার ছড়ি নয়।

ভদ্রলোক যেন তেড়ে এলেন—আমার নয় মানে? আপনিই এটা হাতে নিয়ে বেঞ্চে বসলেন। আবার বলছেন এটা আমার নয়!

মুরারিবাবু বললেন,—আপনি ভুল দেখেছেন! আমি ছড়িহাতে বেঞ্চে বসিনি। ছড়িটা ওখানেই রাখা ছিল।

এবার তর্ক বেধে গেল। ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ডাকলেন,—অবিনাশদা! রঞ্জনবাবু! আপনারা শিগগির এখানে আসুন তো!

সেই বেঞ্চ থেকে চার প্রবীণ হন্তদন্ত এসে গেলেন। তারপর কথাটা শুনে সব্বাই একবাক্যে বললেন,—পরিতোষবাবু ঠিকই বলছেন। আমরাও দেখেছি আপনি এই কালো ছড়ি হাতে নিয়ে এসে বেঞ্চে বসলেন। এখন বলছেন, ওটা নাকি আপনার নয়। ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো?

সবকথা খুলে বললে হয়তো এঁরা তাঁকে পাগল ভেবে ঠাট্টাতামাশা করবেন। এই ভেবে মুরারিবাবু ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—ঠিক আছে। ছড়িটা দিন।

বলে ছড়িটা নিয়েই তিনি হন্তদন্ত বেরিয়ে এলেন পার্ক থেকে। এঁরা চারজন ততক্ষণে হাসাহাসি করে সত্যিই বলছেন,—পাগল! পাগল! একেবারে বদ্ধপাগল!

মুরারিবাবু মনে-মনে বললেন,—এখনও পাগল হইনি। তবে শিগগির যে পাগলা হয়ে যাব, তা ঠিক। ওঃ! হতচ্ছাড়া ছড়িটা!

গলিতে ঢুকে তিনি ঠিক করলেন, ছড়িটা বরং থানায় জমা দেবেন। শুধু বলবেন, এটা তিনি আজ ভোরবেলা পার্কে কুড়িয়ে পেয়েছেন।...

বাড়ি ফিরে ব্রেকফাস্ট করে এবং তারিয়ে-তারিয়ে এক গেলাস চা খেয়ে মুরারিবাবু ছড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু থানায় গিয়ে আরেক কাণ্ড।

থানার বড়বাবু ছড়িটা দেখেই উত্তেজিতভাবে হাঁক দিলেন,—সমাদ্দারবাবু! সমাদ্দারবাবু! শিগগির আসুন।

একজন পুলিশ অফিসার হন্তদন্ত ঘরে ঢুকে বললেন,— বলুন সার!

বড়বাবু বললেন,—দেখুন তো এটা আঢ্যিবাবুর সেই ছড়িটা কিনা! ওঁর স্ত্রী বলেছিলেন, একটা কালো ছড়ি হাতানোর জন্যই ডাকাতরা আঢ্যিবাবুকে খুন করেছিল। ভদ্রমহিলা ছড়িটার যে ডেসক্রিপশন দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এটা মিলে যাচ্ছে। তাই না?

সমাদ্দারবাবুও ছড়িটা দেখে চমকে উঠেছিলেন। ওটা হাতে নিয়ে হাতলের নিচে রুপোলি অংশটা খুঁটিয়ে দেখার পর তিনি বললেন,—হ্যাঁ সার! এই তো এখানে খোদাই করা আছে এস. কে. আঢ্যি। তার মানে সুশীলকুমার আঢ্যি।

মুরারিবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। বড়বাবু তাঁর দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে বললেন,—দেখুন মশাই! এটা

এক সাংঘাতিক মার্ডার কেস। ছেলেখেলা নয়। সত্যি করে বলুন তো আপনি এটা কোথায় পেয়েছেন?

সমাদ্দারবাবু বললেন,—সার! আগে দেখা যাক, এটার ভেতর হীরেগুলো আছে কি না। যদি না থাকে, তাহলে এই ভদ্রলোককে অ্যারেস্ট করতে হবে।

বলে তিনি ছড়ির হাতলটা ঘোরাতে শুরু করলেন। মুরারিবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, প্যাঁচ খুলে হাতলটা আলাদা হয়ে গেল। তারপর সমাদ্দারবাবু ছড়ির মাথার দিকটা টেবিলে ঠুকতে থাকলেন। কয়েকবার ঠোকার পর খুদে তিন টুকরো উজ্জ্বল কী জিনিস বেরিয়ে এল। জানালা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছিল বড়বাবুর টেবিলে। সেই রোদে তিন টুকরো জিনিস থেকে চোখ ধাঁধানো দীপ্তি ঝলমলিয়ে উঠল। মুরারিবাবু হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

এবার বড়বাবু সহাস্যে বললেন,—আপনি এই ছড়িটা কোথায় পেলেন, বলুন তো মশাই?

মুরারিবাবু গুম হয়ে বললেন,—আজ ভোরবেলা পার্কে কুড়িয়ে পেয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা কী সার?

বললুম না? মার্ডার কেস। —বড়বাবু বললেন,—ক'দিন আগে সুশীলকুমার আঢ্যি নামে এক ভদ্রলোক এই ছড়িহাতে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তারপর একটা গলির মোড়ে তাঁর ডেডবডি পাওয়া যায়।

সমাদ্দারবাবু বললেন,—স্যার! আমার মনে হচ্ছে, যে কোনও কারণেই হোক, খুনিরা এই ছড়িটা হাতাতে পারেনি।

বড়বাবু বললেন,—কারণটা এবার আসামীদুটোর মুখ থেকেই শোনা যাক। ওদের হাজত থেকে এখনই নিয়ে আসুন। ওরা এবার কী বলে শোনা যাক।

সমাদ্দারবাবুর নির্দেশে দুজন কনস্টেবল হাতকড়া এবং কোমরে দড়িবাঁধা দুটো লোককে টানতে-টানতে নিয়ে এল। একজন বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা এবং অন্যজন রোগা। সমাদ্দারবাবু তাদের পেটে বারকতক বেটনের গুঁতো মেরে বললেন,—বল হতচ্ছাড়ারা! এই ছড়ির জন্যই তোরা সুশীলবাবুকে মার্ডার করেছিস। কিন্তু ছড়িটা হাতাতে পারিসনি কেন?

বেটনের গুঁতোর সঙ্গে চুল খামচে বেজায় টানাটানির চোটে অস্থির হয়ে বেঁটে লোকটা বলে উঠল, —আমরা দুজনে সঙ্গে ছিলুম বটে, তবে খুনটা করেছিল বেচুলাল, সার! ছড়িটা সেই হাতিয়েছিল। পরদিন বেচুর কাছে গিয়ে শুনি, ছড়িটা নাকি তার ঘর থেকে নিপাত্তা হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বাস করিনি। ওকে খুব শাসিয়েছিলুম। বেচু মা কালীর দিব্যি কেটে বলেছিল, রাতদুপুরে খুটখুট শব্দ শুনে সে আলো জ্বেলে দেখেছিল, ছড়িটা নাকি জানলা গলিয়ে পালিয়ে গেল। আর ঘরে নাকি ঝাঁঝালো সেন্টের গন্ধ। আপনারা বেচুকে খুঁজে বের করুন সার!

এবার মুরারিবাবু চুপ করে থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন,—একটা কথা জিগ্যেস করি। সুশীলবাবুর মাথার চুল কি সাদা ছিল?

বেঁটে আসামী ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওঁর পরনে কি গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি ছিল?

—আজ্ঞে।

—পরনে ধাক্কাপাড়ের ধুতি আর পায়ে পামশু ছিল?

—আজ্ঞে।

মুরারিবাবু চুপ করে গেলেন। বড়বাবু বললেন,—আপনি সুশীলবাবুকে চিনতেন নাকি মশাই?

আস্তে মাথা নেড়ে মুরারিবাবু বললেন,—এবার কি আমি যেতে পারি সার?

—হ্যাঁ। তবে নাম-ঠিকানা আর একটা স্টেটমেন্ট লিখে দিয়ে যান। সমাদ্দারবাবু! এঁর স্টেটমেন্ট নিন।

কাঁপা-কাঁপা হাতে মুরারিবাবু স্টেটমেন্টের তলায় নাম-ঠিকানা লিখে থানা থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ একটু থেমে গিয়ে ভাবলেন বড়বাবুকে কি বলে আসবেন, খুনি বেচুলাল ঠিক কথাই বলেছিল তার দুই স্যাঙাতকে!

কিন্তু আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পুলিশের আইনে ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই। তাছাড়া আসল ঘটনা খুলে বলতে গিয়ে হয়তো নিজেও এই খুনের কেসে জড়িয়ে যাবেন। পুলিশ ভূতপ্রেতের চেয়ে সাংঘাতিক। তার চেয়ে চুপচাপ কেটে পড়াই নিরাপদ।

তবে হ্যাঁ। একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সুশীলবাবুর আত্মা যেন ঠিক এটাই চেয়েছিলেন। মুরারিবাবুর মতো ভালোমানুষ শেষ অবধি তাঁর ছড়িটা থানাতে জমা না দিয়ে পারবেন না। তাই ছড়িটা ওইভাবে বেঞ্চে তাঁর কাছে ফেলে রেখে সুশীলবাবুর আত্মা উধাও হয়ে গিয়েছিলেন।...

ভূত নয় অদ্ভুত

সেদিন বিকেলে আমার কুকুর জিমকে নিয়ে খেলার মাঠ ঘুরে ঝিলের ধারে যেতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। শুধু অদ্ভুত কেন, অসম্ভবই বলা উচিত। অথচ আমি চর্মচক্ষে দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত—কী আশ্চর্য! কী অবাক।

না, স্বপ্নও বলা যাবে না! কারণ আমি হেঁটে বেড়ানোর সময় ঘুমোব কেমন করে?: এদিকে জিমও ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছে এবং আমার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ঝিলের জলের ওপর মার্চের ভঙ্গিতে হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। মুখে মিটিমিটি হাসি! জয়ের হাসিই বটে। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—অসম্ভব! অসম্ভব!

বিজ্ঞানীপ্রবর ঝিলের জল থেকে কিনারার ঘাসে পা বাড়িয়ে বললেন,—বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করে। এটাই তার কাজ।

এতক্ষণে দৃষ্টি গেল ওঁর পায়ের দিকে। পায়ে গাবদাগোবদা কালো জুতো। বেঢপ গড়নের এমন জুতো কোথাও দেখা যায় না। বললুম,—হুঁ, বুঝতে পেরেছি। আপনার জুতোর ম্যাজিক।

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত হাসতে-হাসতে বললেন,—ম্যাজিক বলতেও পারেন। কারণ সব ম্যাজিকই কোনও না কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। তবে এই জুতোর সঙ্গে কিঞ্চিৎ ব্যালান্সের কসরতও জড়িত। সার্কাসে তারের ওপর হাঁটা নিশ্চয় দেখেছেন। সেইরকম আর কী! জুতো-জোড়া পরে জলে ব্যালান্স রেখে হাঁটা শিখতে আমার দিন সাতেক লেগেছে। আপনি চাইলে দিতে পারি।

ঝটপট বললুম,—কী দরকার? জলে হাঁটার চাইতে মাটিতে হাঁটায় অনেক আরাম।

চন্দ্রকান্ত ঘাসে বসে পা থেকে কিম্ভূত গড়নের জুতোদুটো খুলে ফেললেন। তারপর জিমের দিকে তাকিয়ে বললেন,—বরং ওর জন্য দু-জোড়া জল-জুতো তৈরি করে দেব। দেখবেন, একদিনেই জলের ওপর ছুটোছুটি করতে শিখে গেছে। কারণটা বুঝতে পারছেন তো? ওর শরীরটা আমার-আপনার চেয়ে অনেক হালকা।

জিমের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, সে তার চারটে ঠ্যাঙের জন্য দু-জোড়া জল-জুতো পেলে ধরাকে সরা জ্ঞান তো করবেই, আমাকেও আর পাত্তা দেবে না। সে জল-জুতো দুটো শুঁকতে পা বাড়ালে ধমক দিলুম। তখন সরে এল। ঠ্যাং মুড়ে করুণচোখে তাকিয়ে রইল বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের দিকে।

চন্দ্রকান্ত পাইপে তামাক ভরতে-ভরতে বললেন,—জিম আমার-আপনার বা যে-কোনও মানুষের চেয়ে জল-জুতো পরে হাঁটা অনেক আগে কেন শিখতে পারবে, তার কারণ আছে। মানুষ ছাড়া সব প্রাণীই জন্মের পর খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে শেখে। কিন্তু মানুষের দেরি লাগে। ওই যে বলে হাঁটি-হাঁটি পা-পা!

বললুম,—বুঝলুম। কিন্তু জলের ওপর হেঁটে লাভটা কী? জলের ওপর নৌকোয় চেপে যাওয়ার মতো আনন্দ পাওয়া যাবে কি? কিংবা ধরুন জলে ভাসা অর্থাৎ সাঁতার কাটারও একটা আনন্দ আছে। বিজ্ঞান যদি মানুষের জীবন থেকে এইসব আনন্দ কেড়ে নেয়, সেটা কি উচিত কাজ হবে?

বিজ্ঞানী পাইপে আগুন দিলেন। তারপর একরাশ ধোঁয়ার ভেতর বললেন,—আনন্দ ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক করার মুড নেই। কারণ এখন আমি আনন্দের ভেতর বুঁদ হয়ে আছি। জলে হাঁটার যে কী আনন্দ, যে-মানুষ জলে হাঁটেনি, তাকে বোঝানো কঠিন।

একটু হেসে বললুম,—এরপর কবে দেখব, আপনি পাখির মতো সটান মাটি-ছাড়া হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন!

চন্দ্রকান্ত বললেন,—কী বলছেন মশাই! সে তো সায়েবদের দেশে কবে শুরু

হয়ে গেছে। এমনকী, গ্লাইডারে ওড়াই তো এখন সেকেলে ব্যাপার হয়ে গেছে। না, না। প্যারাশুটের কথা বলছি না। বেলুনের কথাও না। পিঠে রুকস্যাকের মতো চৌকো বোঁচকা বেঁধে সটান পাখির মতো ওড়াউড়ি। বোঁচকাটার ভেতর থাকে ঠাসা হাইড্রোজেন গ্যাস। ইচ্ছেমতো কন্ট্রোল করার অসুবিধে নেই।

পা বাড়িয়ে বললুম,—দরকার নেই মশাই! দিব্যি আছি। ঝুটঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কী?

বিজ্ঞানী মন্তব্য করলেন,—আপনি বড্ড সেকেলে।

ঝিলের ধারে হাঁটতে-হাঁটতে কিছুটা চলার পর ঘুরে দেখি, চন্দ্রকান্ত তাঁর জল-জুতো বগলদাবা করে বাড়ির পথে এগিয়ে চলেছেন। মন তেতো হয়ে গেল। বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা? জল, মাটি, আকাশ এসবের সঙ্গে মানুষের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে, তা দুমদাম ভেঙে ফেলা উচিত হচ্ছে কি? না—মোটরগাড়ি, বিমান, জাহাজের ব্যাপারে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু চন্দ্রকান্ত মাঝে-মাঝে যা-সব করছেন, তা অন্যরকম। একেবারেই আলাদা ধরনের। এই জল-জুতোর ব্যাপারটাই ধরা যাক। এটা যদি বাজারে চালু হয়ে যায়, আর নৌকো, জাহাজ, স্টিমার, লঞ্চ এসব জল-যানের দরকার হবে না। কত শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। কত লোকের মুখের অন্ন যাবে। কোনও মানে হয়?...

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে তারপর থেকে এড়িয়ে চলাই উচিত মনে করেছিলুম। দূর থেকে ওঁকে দেখতে পেলে অন্য দিকে কেটে পড়ছিলুম। কিন্তু জিমের মতি-গতি দেখে সন্দেহ জাগছিল। যখনই সে দূরে কোথাও ওই বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে দেখতে পায় কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওর কান টেনে দিয়ে বলি,—ওরে হতভাগা! বেশ তো চার ঠ্যাঙে নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছিস। বেশি লোভ নয়। তুই যা, তাই থাক। তুই কি জল-মাকড়সা যে তরতর করে জলের ওপর দৌড়োদৌড়ি করবি?

জিম তবু বারবার মুখ ঘুরিয়ে চন্দ্রকান্তকে দেখতে থাকে।

একদিন খেলার মাঠে বসে আছি। জিম আমার বগলদাবা। ছেলেরা ফুটবল খেলছে। হঠাৎ ফুটবলটা জোরালো কিক খেয়ে ঝিলের জলের মধ্যিখানে গিয়ে পড়ল। খেলুড়েরা হইহই করে ঝিলের ধারে গেল। বলটা উদ্ধার না করলে খেলা বরবাদ। কেউ ঢিল ছুড়ে বলটাকে কাছে আনার চেষ্টা করতে থাকল। কেউ জাঙিয়া পরে জলের নামার জন্য তৈরি হল। এমন সময় ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে বিজ্ঞানীপ্রবরের আবির্ভাব ঘটল। ঝোপের ভেতর নিশ্চয় একটা কিছু করছিলেন। মনে হল, সেই গোপন কাজটা ফেলে আসায় একটু বিরক্তও হয়েছেন। বললেন,—কী হল? এত হল্লা করছ কেন তোমরা? খেলা আর হল্লা এক জিনিস নয়, জানো না?

চন্দ্রকান্তকে সবাই খুব সমীহ করে চলে। তার একটা বড় কারণ, গত বছর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এ-শহরে এসে ওঁকে কী যেন একটা পদক-টদক দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন,—এই বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আমাদের দেশের গর্ব। জাতির গর্ব। যাই হোক, তারপর থেকে ভদ্রলোককে ছোট-বড় সব্বাই খাতির করে—প্রচণ্ড খাতিরই বলতে

হবে। এই ফুটবল-খেলুড়েদের বিচ্ছুপনা আমার জানা আছে। তারা যে ইচ্ছে করেই কাদামাখা ফুটবল আমার দিকে পাঠায়, আমি কি বুঝি না? দেখলুম, চন্দ্রকান্তের সামনে সব্বাই নিরীহ কেঁচো বনে গেচে। একজন কাঁচুমাচু মুখে বলল,—জলে বল পড়েছে, স্যার!

শোনামাত্র চন্দ্রকান্ত ফিক করে হাসলেন, তাই বলো,—বলে সেই ঝোপটার ভেতর ঢুকে গেলেন। খেলুড়েরা হল্লা থামিয়ে ফের জলের দিকে ঘুরল! এরপর কী ঘটবে, একমাত্র আমারই জানা! চন্দ্রকান্তকে ফের দেখা গেল। জলের ওপর গটগট করে হেঁটে গিয়ে বলটি তুললেন এবং চমৎকার একটা কিকে সেটিকে মাঠে ফেরত পাঠালেন। ছেলেগুলো ব্যাপারটা দেখে প্রথমে বেজায় ভড়কে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের মন পড়ে আছে বলে। কাজেই বলটার দিকেই দৌড়ে গেল। আবার পুরোদমে খেলা চলতে থাকল। তখন বুঝলুম, চন্দ্রকান্তের অদ্ভুত সব কীর্তিকলাপ দেখে-দেখে সবাই এমনই অভ্যস্ত যে, এসব নিয়ে কেউ কথা ঘামাতে চায় না।

শুধু আমি বাদে। আমিই মাথা ঘামাই। চিন্তিত হই। মনে হয়, এত বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। পৃথিবীটাকে এত ঝটপট অন্যরকম করে ফেলা উচিত হচ্ছে না।

কিন্তু ঝোপের ভেতর কী করছেন চন্দ্রকান্ত? ঝোপগুলো মাঝে-মাঝে নড়ে উঠছে। খুব সন্দেহজনক ব্যাপার। জিমকে বগলদাবা করেই উঠে পড়লুম। ছাড়া পেলে জিম বিজ্ঞানীপ্রবরের ঠ্যাঙের তলায় গিয়ে ঢুকবেই, যা বুঝতে পারছি ওর মতিগতি দেখে এবং একবার ওঁর খপ্পরে পড়লে আর উদ্ধার করাই যাবে না। একটা বশীকরণ ক্যাপসুল খাইয়ে দিলেই হল—কিছু বলা যায় না।

উঁকি মেরেই অবাক। ঝোপের ভেতর রামু-ধোপা তার গাধাটাকে শুইয়ে ওপারে গ্যাঁট মেরে বসে আছে। বেচারাকে নড়তে-চড়তে দিচ্ছে না। আর চন্দ্রকান্ত প্রাণীটার চার ঠ্যাঙে সেই জল-জুতো পরাচ্ছেন।

না হেসে পারা গেল না। আমার হাসি শুনে বিজ্ঞানী মুখ ফেরালেন। বললেন,—এই যে! আসুন, আসুন!

ফাঁকা জায়গায় ঢুকে বললুম,—ব্যাপারটা কী?

রামু একগাল হেসে বলল,—খুবই সুবিধে হবে দাদাবাবু, বুঝলেন?

—সুবিধেটা কীসের?

—আজ্ঞে দাদাবাবু, ঝিলের মধ্যিখানে কত দাম গজিয়ে আছে। এবার থেকে মনের সুখে সেখানে গিয়েও চরতে পারবে।

চন্দ্রকান্ত জল-জুতো পরাতে-পরাতে বললেন,—সেদিন আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়নি। সেটা হল, মানুষের চেয়ে আর সব প্রাণী জন্মের পর দ্রুত হাঁটতে শেখে কেন? না—তাদের চারটে করে ঠ্যাঙ আছে। চার-ঠেঙেদের ব্যালান্স আর দু-ঠেঙেদের ব্যালান্সে তফাত আছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাপারটা আশা করি জানেন?

চুপ করে থাকলুম। গাধাটার চতুর্থ পায়ে জল-জুতো ঢুকিয়ে স্ক্রু আঁটতে-আঁটতে

বিজ্ঞানী ফের বললেন,—বলবেন, পাখিরাও তো মানুষের মতো দু-ঠেঙে। কিন্তু পাখিদের হাড় ফাঁপা। তাই ওজন হালকা। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাদের বাগে পায় না। যত সমস্যা খালি মানুষের।

বলে রামুকে উঠতে ইশারা করলেন। রামু তার গাধার ওপর থেকে সরে যেতেই গাধাটা ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। অমনি চন্দ্রকান্ত তার দুটো কান ধরে ফেললেন। বললেন,—রামু, পেছন থেকে ঠেলে দাও। শিগগির!

রামু ঠেলতে শুরু করল। চন্দ্রকান্ত প্রাণীটাকে জলের ধারে নিয়ে গেলেন। এরপর রীতিমতো একটা লড়াই বেধে গেল। গাধাটা কিছুতেই জলে নামবে না। প্রচণ্ড আপত্তি তার গলা দিয়ে বিকট হয়ে বেরোল। গাধার ডাক কাছ থেকে শোনা। বাপস!

চন্দ্রকান্ত আমার উদ্দেশ্যে বললেন,—ও মশাই! হাঁ করে দেখেছেনটা কী? হাত লাগান! এমন একটা বৈপ্লবিক কাজে সহযোগিতা করবেন না? আসুন, আসুন!

অগত্যা জিমকে নামিয়ে দিয়ে গাধাটার পেছনে যেতে হল। কিন্তু গাধাটা পেছনের ঠ্যাং ছুড়ছে, ব্যাপারটা বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই সাবধানে পাশ থেকে বরং কাতুকুতু দেওয়াই উচিত মনে করলুম এবং তাতে কাজ হল। গাধাটা আমার কাতুকুতুর চোটে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দেওয়ার ভঙ্গিতে জলে নেমে গেল।

না—নেমে গেল বলা ভুল। হেঁটে গেল। হাঁটতে গিয়ে রীতিমতো দৌড়তে শুরু করল। বিজ্ঞানী চেঁচিয়ে উঠলেন,—খাসা! অপূর্ব! তোফা!

রামু একগাল হাসির সঙ্গে চ্যাঁচাতে থাকল,—সোজা চলে যা বাপ! ওই দ্যাখ, কত্ত দাম! মনের সুখে পেট পুরে খা!

গাধাটা আশ্চর্য, এতটুকু অবাক হল না—তুই ব্যাটা স্থলচর প্রাণী হয়েও যে জলে দিব্যি হেঁটে যেতে পারছিস, তাও লক্ষ করছিস না? মনে-মনে বললুম, এ-জন্যই লোকে বলে গাধা!

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত পাইপ ধরাচ্ছিলেন। ঠোঁটের কোণায় গর্বের হাসি। জিম একবার জলচর গাধাটার দিকে, একবার চন্দ্রকান্তের দিকে তাকাচ্ছে। ওর দুচোখে লোভ চনমন করছে। পড়ন্ত বেলায় বিশাল ঝিলের জলে লালচে রোদ্দুর ঝলমল করছে। খেলার মাঠ থেকে খেলুড়েদের আবার একটা হুল্লোড় ভেসে এল। তারপর দেখলুম, ফুটবলটা আবার আকাশ বেয়ে এসে ধপাস করে ঝিলের মধ্যিখানে পড়ল।

হাসতে-হাসতে বললুম,—যান আবার ফুটবল কুড়িয়ে দিন!

চন্দ্রকান্ত বললেন,—ভাববেন না। ওই দেখুন, বলটা যাচ্ছে গাধাটার কাছে। আশা করা যায়, গাধাটা ওটার একটা সদ্গতি করবে।

করলও বটে। বলটা ভাসতে-ভাসতে কাছে যাওয়া মাত্র দামখেকো গাধাটা নিশ্চয় বিরক্ত হয়েই পেছনের ঠ্যাং দিয়ে কিক করল। অমনি বলটা হাইকিকে ফের খেলার মাঠে। আশ্চর্য! এতে খেলুড়েরা অবাক হল না? আবার পুরোদমে খেলতে শুরু করল!

বিজ্ঞানী মৌজ করে পাইপ টানছিলেন। বললেন,—কী মশাই? আপনার কুকুরের জন্য জল-জুতোর প্রস্তাব দিয়েছিলুম। কী সিদ্ধান্ত করলেন, বলুন?

বললুম,—কী দরকার? জিম তো জলজ উদ্ভিদ খায় না রামুর গাধার মতো! কাজেই ব্যাপার অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু আমি খালি একটা কথা ভাবছি।

—বলুন কী ভাবছেন?

—ভাবছি, আজকাল মানুষ অবাক হতে ভুলে গেছে! এটা ঠিক নয়।

—কেন বলুন তো?

—মানুষ অবাক হতে ভুলে গেলে পৃথিবীটা হয়তো আর আনন্দময় ঠেকবে না। সব একঘেয়ে হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানী মুচকি হেসে বললেন,—সেদিন বলেছি, আনন্দ-টানন্দ নিয়ে তর্ক করার মুড আর আমার নেই। কারণ আমি ক্রমশ সদানন্দ হয়ে আছি। কিছু বুঝলেন?

—উঁহু।

—বুঝবেন। কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। আপনাকে আমি একজোড়া ডানা তৈরি করে দেব।

—বলেন কী।

—হুঁ। অসম্ভব সম্ভব হলে মানুষের মনে কী ভাব জাগে, সেটা আপনার টের পাওয়া দরকার। কারণ আমার ধারণা, আনন্দ বলতে ঠিক কী বোঝায়, আপনি জানেনই না!

এই সময় রামু বলে উঠল,—আচ্ছা বাবুমশাই, আমার গাধাটা যদি ওখানে থেকেই যায়—আর যদি বাড়ি না ফেরে?

চন্দ্রকান্ত চোখ কটমটিয়ে বললেন,—কেন এ কথা ভাবছ তুমি?

রামু চিন্তিত-মুখে বলল,—দেখুন না, দাম খাচ্ছে তো খাচ্ছে। ব্যাটাচ্ছেলের খেয়াল নেই, এখনই শুকুতে দেওয়া কাপড়-চোপড়ের বোঁচকা নিয়ে ওকে বাড়ি ফিরতে হবে।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—ভেবো না। বরং আমার জল-জুতো জোড়া পরে জলে হাঁটার প্র্যাকটিস চালিয়ে যাও। নাও, পরো।

রামুকে জল-জুতো পরতে দেখে আমার কেন যেন রাগ হল। ভাবা যায়? রামু জল-জুতো পরে জলে হেঁটে তার গাধাটাকে খেদিয়ে আনবে! এ একটা বিদঘুটে অনাছিস্টি ছাড়া কী? মুখ গোমড়া করে জিমকে তুলে নিয়ে কেটে পড়লুম।

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন,—আর দিনতিনেক অপেক্ষা করুন। আপনার ডানা পেয়ে যাবেন।

দুদিন পরে বিকেলে অভ্যাসমতো জিমকে নিয়ে ঝিলের ধারে বেড়াতে গেছি। দেখি, রামু মুখ চুন করে জলের ধারে বসে আছে। বললুম,—কী রামু, তোমার গাধার খবর কী?

রামু চোখ মুছে বলল,—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদাবাবু! গাধাটা ডুবে মরেছে।

চমকে উঠে বললুম,—সে কী! ওর পায়ে তো জল-জুতো ছিল।

থাকলে কী হবে?—রামু ভাঙা গলায় বলল। —কাঁটা-খোঁচা লেগে কখন ছ্যাঁদা হয়ে গিয়েছিল। সক্কালে ঝিলের মাঝখানে গেছে, অমনি ছ্যাঁদা দিয়ে জল ঢুকে ভড়ভড় করে ডুবে তলিয়ে গেল।

—তোমার তৌ জল-জুতো আছে। দৌড়ে গিয়ে ওকে—

বাধা দিয়ে রামু বলল,—সাহস হল না দাদবাবু! যদি এতেও ছ্যাঁদা হয়ে থাকে? তাছাড়া তেমন পেরাকটিসও তো হয়নি। কসরতের ব্যাপার!

খাপ্পা হয়ে বললুম,—চন্দ্রকান্তবাবুর কাছে তোমার খেসারত দাবি করা উচিত ছিল। গাধার দাম আর জরিমানা!

রামু ফোঁসফোঁস করে নাক ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল,—গিয়েছিলুম তো। গিয়ে দেখি দরজায় তালা ঝুলছে।

হুঁ, বেগতিক দেখে কেটে পড়েছেন বিজ্ঞানী। কিন্তু এর একটা বিহিত করা উচিত। পাড়ার লোকেদের ডেকে একটা মিটিং করতে হবে। তারপর জেলাশাসকের কাছে চন্দ্রকান্তের নামে একটা দরখাস্ত। এই সব উদ্ভুট্টে কাণ্ড করে ভদ্রলোক এরপর আরও কত লোকের ক্ষতি করবেন কে জানে।

ফেরার সময় চন্দ্রকান্তের বাড়ির পাশ দিয়েই গেলুম। রামু ঠিকই দেখেছে। দরজায় প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে গেছি হঠাৎ শনশন শব্দ। গাছপালা তোলপাড়। তারপর ওপর থেকে কী একটা ঝুপ করে পড়ল, একেবারে সামনাসামনি। দেখি, বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত। দু-বাহুতে দুটো ডানা—সত্যিই ডানা। প্রকাণ্ড ডানা। ফিক করে হেসে বললেন,—কী? বলেছিলুম না আপনার জন্য একজোড়া ডানা তৈরি করে দেব। পাখি হয়ে ইচ্ছেমতো ওড়াউড়ি করে বুঝবেন, অসম্ভব সম্ভব হওয়ার আনন্দটা কতখানি!

বললুম,—দেখুন মশাই, এ সব উদ্ভুট্টে ব্যাপারে আমি নেই।

—সে কী! কেন বলুন তো?

—আপনি জানেন রামুর গাধাটা জলে ডুবে মারা পড়েছে?

—কী কাণ্ড। রামু তো বলেনি আমাকে।

—আপনার দেখা পেলে তো বলবে।

চন্দ্রকান্ত দুঃখিত মুখে বললেন,—আপনার এই ডানার কাজে দুদিন ব্যস্ত ছিলুম। যাই হোক, গাধাটার তো ডুবে মরা উচিত ছিল না।

—উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন নয়। জল-জুতোয় ছ্যাঁদা হয়েছিল!

চন্দ্রকান্ত একটু হাসলেন। —বুঝেছি! নেহাত একটা দুর্ঘটনা। ছ্যাঁদার জন্য নৌকো ডোবে কি না বলুন আপনি? দোষ তো নৌকোর বা যে তৈরি করেছে নৌকো, তার নয়—মাঝির। মাঝির এসব ব্যাপারে নজর রাখা উচিত!

—ধুর মশাই! গাধা কেমন করে বুঝবে যে জল-জুতোয় ছ্যাঁদা হয়েছে?

—আহা! রামুর উচিত ছিল জলে হাঁটানোর সময় পরীক্ষা করে দেখা।

—রামু একজন নিরক্ষর লোক। সে কী করে ওসব যন্ত্রের ব্যাপার বুঝবে?

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত জিভে চুকচুক শব্দ তুলে বললেন,—আহা রে, বেচারা! আপনি ঠিকই বলেছেন। রামুকে আমারই শিখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, জল-জুতো ছ্যাঁদা হয়েছে কি না, কীভাবে পরীক্ষা করতে হয়! যাই হোক, ওকে বরং একটা গাধা কেনার টাকা দেবোখন। আসুন, আপনাকে ডানাদুটো পরিয়ে দিই।

ভড়কে গিয়ে বললুম,—না মশাই, পাখি হয়ে দরকার নেই আমার।

চন্দ্রকান্ত হাসতে লাগলেন। —বুঝেছি! ছ্যাঁদা-ট্যাঁদার ভয় হচ্ছে তো? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে তবে না এতক্ষণ ওড়াউড়ি করে বেড়ালুম? ভয় নেই। গ্যারান্টি রইল—আপনি আকাশ থেকে পড়বেন না।

চন্দ্রকান্ত ডানা খুলতে ব্যস্ত হলেন। আমি সেই ফাঁকে কেটে পড়লুম—মানে, প্রায় দৌড়ে পালিয়ে বাঁচলুম।

কিন্তু সেটাই প্রকাণ্ড একটা ভুল হয়ে গেল। পালিয়ে-টালিয়ে আসার সময় মানুষের অবস্থা হয় 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা'র মতো। জিমের কথা মনে ছিল না। ফলে জিম নিশ্চয় সুযোগটা নিল। কারণ বাড়ি ঢুকতে গিয়ে তার কথা যখন মনে পড়ল, দেখি সে নেই। সর্বনাশ!

চেঁচিয়ে ডাকলুম,—জিম! জিম! জিম! কিন্তু তার আর পাত্তা নেই।

হতভাগা বুদ্ধু যদি চন্দ্রকান্তের পাল্লায় পড়ে থাকে, নিশ্চয় তাকে জল-জুতো পরতে হবে এবং তারপর ঠিক রামুর গাধাটার মতোই...

ভাবতে গিয়ে বুক কেঁপে উঠল। তখন মরিয়া হয়ে চন্দ্রকান্তের বাড়ির দিকে ফের হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলুম।

চন্দ্রকান্তের বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেখি, তেমনই তালা বন্ধ। যে-রাস্তায় একটু আগে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেখানেও সব শুনশান, ফাঁকা। বুঝলুম, জিমকে নিয়ে বিজ্ঞানীপ্রবর গা-ঢাকা দিয়েছেন কোথাও। গুজব শুনেছি, চন্দ্রকান্তের একটা ল্যাবরেটরি আছে কোনও এক গোপন জায়গায়। সেখানেই নাকি যত উদ্ভুট্টে জিনিস আবিষ্কার করেন ভদ্রলোক। বাড়িটা নেহাত বসবাসের জন্য এবং নিতান্তই পৈতৃক। এ-বাড়িতে আমি যেমন, তেমনই অন্য কেউই কোনও ল্যাবরেটরি কস্মিনকালে দেখিনি। খুব ভাবনায় পড়ে গেলুম। জিমটা এত বুদ্ধু আর ন্যালা-ভোলা, সেটাই ভাবনার কারণ।

কদিন ধরে বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের খোঁজে সারা শহর, মাঠ-ময়দান, বন-জঙ্গল, এমনকী এলাকার প্রায় সবটাই চষে বেড়িয়েছি। গোয়েন্দার মতো সূত্র খুঁজেছি। মেলেনি! আমাদের এই এলাকাটা অসমতল, এখানে-ওখানে ছোট-বড় টিলাও আছে। এমন একটা জায়গায় কাউকে খুঁজে বের করাও কঠিন। শেষে পুলিশে খবর দেওয়াই ঠিক করলুম।

থানায় যাব বলে তৈরি হচ্ছি সেই সময় রামু-ধোপা এল হাঁপাতে-হাঁপাতে। —দাদাবাবু! শিগগির আসুন!

—কী হয়েছে, রামু?

রামু বলল,—আমার গাধার অবস্থা দাদাবাবু! ঠিকঠাক গাধার অবস্থা।

বিরক্ত হয়ে বললুম,—ভ্যাট! কার গাধার অবস্থা বলবে তো?

—আজ্ঞে দাদাবাবু, আপনার কুকুরটার!

লাফিয়ে উঠলুম। —জিম? কোথায় জিম? ঝিলের জলে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

হুঁ, যা ভেবেছিলুম তাই। দৌঁড়ে বেরিয়ে গেলুম রামুর সঙ্গে। খেলার মাঠ পেরিয়ে ঝিলের ধারে পৌঁছে দেখি, ঝিলের জলের মধ্যিখানে চন্দ্রকান্ত আর জিম লুকোচুরি খেলছে। জলজ দাম আর শোলাগাছের ভেতর একটি দু-ঠেঙে এবং একটি চার-ঠেঙে প্রাণী ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। বিজ্ঞানী মাঝে-মাঝে শোলাঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বলছেন,—জি-মি টু-কি!

তারপর দুজনে বরফে স্কেটিং খেলার মতো জলের ওপর স্কেটিং শুরু করল। চেঁচিয়ে উঠলুম,—জিম! জিম! এই হতভাগা!

চন্দ্রকান্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। রোদ্দুরে তাঁর দাঁত চকচক করতে থাকল। তার মানে, হাসছেন। খাপ্পা হয়ে বললুম,—আপনার নামে পুলিশ-কেস করব বলে দিচ্ছি!

চন্দ্রকান্ত স্কেটিং করে চলে এলেন কাছাকাছি। ভুরু কুঁচকে বললেন,—কী করবেন বললেন যেন?

—পুলিশকে জানাব।

চন্দ্রকান্ত খি-খি করে হেসে বললেন,—তা জানাতে পারেন। তবে এও জানাবেন, এলাকার সব চোর-চোট্টাকে তাহলে আমি জল-জুতো আর ডানা তৈরি করে দেব। পুলিশ তখন তাদের আর পাকড়াও করতেই পারবে না! চোর যদি উভচর হয়, পুলিশের কী অবস্থা হবে, আশা করি, বুঝতেই পারছেন!

ওঁর কথায় কান না দিয়ে ফের ডাকতে থাকলুম,—জিম! জিম! এই নেমকহারাম হতচ্ছাড়া!

এতক্ষণে জিম আমাকে দেখতে পেল। কিন্তু এবার সে জলের ওপর দিয়ে দৌড়ে এল না। হঠাৎ জল-ছাড়া হয়ে পাখির মতো ডানা মেলে আকাশে উড়ল এবং আমার মাথার ওপর বারতিনেক চক্কর দিয়ে ঝুপ করে মাটিতে নামল। লেজ নাড়তে লাগল। অমনি খপ করে তাকে ধরে ফেললুম।

চন্দ্রকান্ত জল থেকে ডাঙায় উঠে জল-জুতো খুলতে-খুলতে বললেন,—আপনার ডানাদুটো কিন্তু রাখা আছে সযত্নে। চাইলে এখনও দিতে পারি। আর যদি শেষপর্যন্ত না-ই নেন, রামুকেই দেব। এই রামু, যাসনে। কথা আছে শোন! ডানা পরে পাখি হবি?

রামু কী বুঝল সেই জানে। সে হন্তদন্ত হয়ে কেটে পড়ল। বিজ্ঞানী বাঁকা হেসে পাইপ বের করে বললেন,—আশ্চর্য! মানুষের ভালো করতে গেলেই গাল খেতে হয় দেখছি। আপনার জিমকে উভচরে পরিণত করলুম—সেজন্য আপনি আমার প্রশংসা করবেন, তা নয়। উল্টে পুলিশের কথা বলে শাসাচ্ছেন!

জিমের চার ঠ্যাং থেকে চারটে জল-জুতো খুলে চন্দ্রকান্তের সামনে ছুড়ে ফেললুম। তারপর ওর দুই কাঁধ থেকে ডানার মতো জিনিস দুটো অনেক টানাটানি করে খুলে ফেললুম। জিম মুখ গোমড়া করে রইল। ডানাদুটোও ফেলে দিয়ে বললুম,

—আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি চন্দ্রকান্তবাবু, আর কখনও আমার কুকুর চুরি করবেন না। নিজে কুকুর পুষে যা ইচ্ছে করুন!

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত পাইপ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—অগত্যা তাই করতে হবে। তবে ডানাদুটো—

আমি পাখি নই, মানুষ। —বলে চলে এলুম। তবে এ কথা ঠিকই, ডানাদুটো পরে একবার পাখির মতো ওড়াউড়ি করে দেখতে লোভ যে হচ্ছিল না, এমন নয়। ভয় শুধু একটাই—যদি ছ্যাঁদা থাকে? তাহলে রামুর গাধা-বেচারার মতো—বাপস! ভাবতেই শরীর ঠান্ডা হিম হয়ে যায়। ঝুটঝামেলায় কী দরকার? বেশ তো আছি দু-ঠেঙে হয়ে।

অদ্ভুত যত ভূত

ছোটমামার সঙ্গে ছিপে মাছ ধরতে যাচ্ছিলুম। ছোটমামার ছিপটা বড় মাছধরা হুইল। আর আমারটা নেহাত পুঁটিধরা কঞ্চির ছিপ। বঁড়শিও খুদে।

ভাদ্র মাসের দুপুরবেলা। কদিন বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। ঝলমলে রোদে গাছপালা-ঝোপঝাড়ে সবুজ রঙের জেল্লা বেড়েছে। আমার মনও খুশিতে চঞ্চল। ছোটমামা বলেছেন,—বুঝলি পুঁটু? আজ থেকে তোর ট্রেনিং শুরু। তোর ডাকনাম পুঁটু। তাই দেখবি, পুঁটিমাছেরা তোর বঁড়শির সঙ্গে ভাব জমাতে ভিড় করবে। ওরা কিন্তু বড্ড চালাক। ফাতনা নড়লেই ছিপে খ্যাঁচ মারবি।

—খ্যাঁচ কী মামা?

—ধুর বোকা! খ্যাঁচ বুঝিস না? ঠিক আছে। তোকে হাতেকলমে শিখিয়ে দেব।

গ্রামের শেষদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সেখানে আদ্যিকালের ভাঙা শিবমন্দির ঘিরে প্রকাণ্ড বটগাছ এবং ঝোপজঙ্গল গজিয়েছে। সেখানেই দেখা হয়ে গেল মোনা-ওঝার সঙ্গে।

মোনার মাথায় জটা। মুখে গোঁফ-দাড়ি। ওপর পাটির একটা দাঁত ভাঙা। তাই গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে দগদগে সিঁদুরের ঘটা সত্ত্বেও হাসলে তাকে খুব অমায়িক ও সরল মানুষ মনে হয়। কিন্তু যখন সে গম্ভীর হয়ে থাকে, তখন তাকে দেখলে বড্ড গা ছমছম করে। তার চোখদুটো যে বেজায় লাল।

মোনা-ওঝা আমাদের দেখে কেন কে জানে ফিক করে হাসল। তারপর বলল,—ছোটবাবু, ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়ে ছিপ ফেলতে বেরিয়েছেন বুঝি? ভালো! তা কোথায় ছিপ ফেলবেন?

ছোটমামা বললেন,—সিঙ্গিমশাইয়ের মাঠপুকুরে।

মোনা বলল,—ওই পুকুরে আর মাছ আছে নাকি? এই তো গত মাসে সিঙ্গিমশাই জেলেদের সব মাছ বিক্রি করে দিয়েছেন। সারাদিন জাল ফেলে-ফেলে জেলেরা মাছের ছানাপোনাসুদ্ধ ছেঁকে তুলে নিয়েছে।

ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন,—সে কী মোনাদা! সিঙ্গিমশাইয়ের কাছে আজ সকালে যখন ছিপ ফেলার জন্য পারমিশন চাইতে গেলুম, উনি বললেন, দুটোর বেশি ধোরো না যেন।

মোনা-ওঝা হেসে কুটিকুটি হল। —মিথ্যে! একেবারে মিথ্যে! বুঝলেন ছোটবাবু? চোরের জ্বালায় মাত্র আড়াইশো-তিনশো গ্রাম ওজন হলেই পোনামাছগুলো বিক্রি করে দেন সিঙ্গিমশাই। তাছাড়া আপনার হুইলে ধরার যোগ্য মাছ কি ওখানে কখনও ছিল? তবে হ্যাঁ। এই খোকাবাবুর ছিপে ধরার মতো পুঁটিমাছ থাকলেও থাকতে পারে।

ছোটমামা খাপ্পা হয়ে বললেন,—মিথ্যুক! হাড়কেপ্পন! আমাকে খামোকা হয়রান করল! টাউন থেকে শখ করে এত দামি হুইল কিনে আনলুম। সকাল থেকে কতরকমের চার আর টোপ তৈরি করলুম!

মোনা বলল,—এক কাজ করুন ছোটবাবু! একটু কষ্ট করে দোমোহানির ঝিলে চলে যান। ঝিলে কিন্তু প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড মাছ আছে। ঝাঁপুইহাটির কালিবাবু এই তো দু-হপ্তা আগে একটা পাঁচ কেজি রুই তুললেন। আমার চোখের সামনে, ছোটবাবু! মা কালীর দিব্যি!

ছোটমামা একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন,—কিন্তু বড্ড দূরে যে!

দূর কী বলছেন? নাক বরাবর ধানক্ষেতের আল ধরে হেঁটে গিয়ে ওই বাঁধে উঠুন। মাত্র আধঘণ্টা হাঁটতে হবে। —বলে মোনা আমার দিকে তাকাল, কি খোকাবাবু? যেতে পারবে না মামার সঙ্গে?

কী আর বলব? মাথাটা একটু কাত করলুম শুধু। পুঁটিমাছ ধরার ইচ্ছেটা চাগিয়ে উঠেছে যে!

ছোটমামা হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বললেন,—আয় পুঁটু! মোনাদা ঠিকই বলেছে, মাছ পাই বা না পাই, একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে যাক না। তাছাড়া তোর ট্রেনিংটা ওইরকম ঝিল-জঙ্গলে শুরু করাই উচিত।

ছোটমামাকে অনুসরণ করলুম। পিছন থেকে মোনা-ওঝা বলল,—তবে একটা কথা ছোটবাবু! সূর্য ডোবার পর আর এখানে কিন্তু থাকবেন না। সঙ্গে খোকাবাবু আছে বলেই সাবধান করে দিলুম।

ছোটমামা বললেন,—ছাড় তো বুজরুকে-কথা। আমরা অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছি। তাই না পুঁটু? ওঁর কথায় অগত্যা সায় দিতেই হল। যদিও মোনা-ওঝার কথাটা শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল।...

বাঁধের নিচে ঝিলটা বাঁকা হয়ে একটু দূরের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু ছিপ ফেলার মতো ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ল না। ঝিলে ঘন দাম, পদ্ম আর শালুক ফুলের

ঝাঁক। কোথাও শোলাগাছ গজিয়েছে দামের ওপর। ছোটমামা অনেক খোঁজাখুঁজি করে ছিপ ফেলার মতো খানিকটা ফাঁকা জায়গা আবিষ্কার করলেন। তারপর বললেন,—বুঝলি পুঁটু? এখানেই ঝাঁপুইহাটির কোন কালীবাবু ছিপ ফেলেছিলেন মনে হচ্ছে। এই দ্যাখ, এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ পড়ে আছে। হুঁ! সিগারেটের ফিল্টারটিপও অজস্র। কালীবাবু খুব সিগারেট খান বোঝা যাচ্ছে।

ঝিলের উত্তর পাড়ে এই জায়গাটা ছায়ায় ঢাকা। কারণ, বাঁধে একটা বটগাছ আছে। তার লম্বা ডালপালা ঝিলের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। ছোটমামা ঝটপট চার ফেলে ছিপ সোজা রাখার জন্য ঝোপ থেকে একটা আঁকশির মতো ডাল ভেঙে আনলেন। এক হাঁটু জলে নেমে সেটা কাদায় পুঁতে বললেন,—তোর ছিপটা ছোট্ট তো! ওটা হাতে ধরে থাকতে পারবি। আমারটা যে হুইল ছিপ। ডগাটা আঁকশির মাথায় রাখলে তবে ছিপটা সোজা থাকবে।

মাঝে-মাঝে শিরশিরে বাতাস বইছিল। রোদে হাঁটার কষ্টটা শিগগির দূর হয়ে গেল। মামা-ভাগ্নে দুজনে দুটো ছিপ ফেলে বসে রইলুম। ঝিলের ওপারে ঘন বাঁশবন। সেখানে একঝাঁক পাখি তুমুল হল্লা করছিল। জল-মাকড়শারা জলের ওপর তরতরিয়ে ছোটাছুটি করছিল। একটা লাল গাঙফড়িং ছোটমামার ছিপের ফাতনা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে খেলা করছিল। হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে একটা জলপিপি পাখি পিঁ-পিঁ করে ডাকতে-ডাকতে দূরে ঝিলের জলে কোথাও বসল।

এতক্ষণে মনে পড়ল, ছোটমামা আমাকে 'খ্যাঁচ মারা' শেখাবেন। কিন্তু কথাটা তুলতেই উনি চাপাস্বরে বললেন,—আমার চারে মাছ এসে গেছে। বুজকুড়ি দেখতে পাচ্ছিস না? মাছটা টোপ খেলেই আমি ছিপটা যেভাবে জোরে তুলব, সেটাই খ্যাঁচ। তুই লক্ষ রাখিস।

আমার ছিপের ফাতনা দুবার কেঁপে আবার স্থির হয়ে গেল। 'খ্যাঁচ মারা' ব্যাপারটা না দেখা পর্যন্ত কী আর করা যাবে!

কিছুক্ষণ পরে দেখি, ছোটমামার ছিপের ফাতনা নড়তে শুরু করেছে। ছোটমামা ছিপের হুইলবাঁধা গোড়ার দিকটা চেপে ধরে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তারপর ফাতনাটা যেই ডুবে গেল, অমনি ছোটমামা জোরে ছিপটা তুলে ফেললেন। সাঁই করে একটা শব্দ হল। কিন্তু কী অবাক! ছোটমামার বঁড়শিতে বিঁধে যে জিনিসটা ছিটকে আমাদের পেছনে গিয়ে পড়ল, সেটা তো মাছ নয়!

ছোটমামা ছিপ ফেলে এক লাফে পেছনে বাঁধের গায়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তারপর ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলে উঠলেন,—কী সর্বনাশ! এটা দেখছি একটা মড়ার খুলি!

কথাটা শুনেই আমি ওঁর কাছে চলে গেলুম। ছোটমামা একটা শুকনো কাঠি দিয়ে বঁড়শি ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন,—কোনও মানে হয়?

খুলিটা দেখেই আমার বুক ধড়াস করে উঠেছিল। তারপর দেখি, খুলিটা লাফাতে-লাফাতে জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছোটমামা গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে

আছেন। আমি তো ভয়ের চোটে এমন ভ্যাবলা হয়ে গেছি, যেন আমার পাদুটো মাটির সঙ্গে আঠা দিয়ে আটকানো।

ছোটমামা বিড়বিড় করছিলেন,—এ কী রে পুঁটু? এ কী রে! এ কী হচ্ছে? অ্যাঁ?

তারপর দেখলুম খুলিটা লাফাতে-লাফাতে গিয়ে জলে পড়ল। জলের ওপর কিছুদূর পর্যন্ত বুজকুড়ি উঠে সেগুলো ভেঙে গেল। ছোটমামা ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বললেন,—এ কী বিচ্ছিরি ব্যাপার বল তো পুঁটু?

বললুম,—ছোটমামা! আমার বড্ড ভয় করছে। চলুন। আমরা এখান থেকে এখুনি চলে যাই।

ছোটমামার এই এক স্বভাব। হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠলেন যেন। বললেন,—ধুস! একটা মড়ার খুলি দেখে ভয় পাব আমরা? কী বলিস পুঁটু? বলেছিলুম না আমরা অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছি?

বলে উনি আবার বঁড়শিতে টোপ গেঁথে ছিপ ফেললেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—দেখলি তো 'খ্যাঁচ মারা' কাকে বলে?

তারপর বসে আছি তো আছি। কিন্তু আর ফাতনা নড়ে না। আমি জলের দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাতে গিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি। কে জানে বাবা! এবার যদি আমার বঁড়শিতে টোপ খেতে আসে খুলিটা!

তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার, মড়ার খুলি একেবারে জ্যান্ত।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আমাদের বাঁদিকে ঝোপঝাড়ের ভেতর কে ভরাট গলায় বলে উঠল,—তারা তারা তারা। তারা তারা তারা! ব্রহ্মময়ী মাগো!

আমরা চমকে উঠে ঘুরে বসেছিলুম। দেখলুম, মোনা-ওঝার মতোই জটাজুটধারী একটা মাথা ঝোপের ওপর দেখা যাচ্ছে। তারপর ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলেন এক সাধুবাবা। পরনে হাঁটু অবধি পরা লাল কাপড়। এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে কমণ্ডলু। তিনি অমায়িক কণ্ঠস্বরে বললেন,—বাড়ি কোথায় গো তোমাদের?

ছোটমামা বললেন,—বাবুগঞ্জ।

—অতদূর থেকে তোমরা এখানে ছিপ ফেলতে এসেছ? ভালো করোনি।

—কেন বলুন তো?

—এটা শ্মশানকালীর এলাকা। ওই দেখছ ঘন গাছপালা। সেখানেই মায়ের মন্দির। তার পাশে শ্মশান। তোমরা এখানে বেশিক্ষণ থেকো না বাবারা!

ছোটমামা হাসতে-হাসতে বললেন,—আপনি যা-ই বলুন সাধুবাবা! একটা মাছ না ধরে এখান থেকে নড়ছি না।

—ওরে পাগল! এ ঝিলে আর মাছ কোথায়? যা দু-চারটে ছিল, কবে মারা পড়েছে।

—মাছ না পাই, মড়ার খুলিই বঁড়শি বিঁধিয়ে তুলব।

সাধুবাবা চমকে উঠে বললেন,—তার মানে? তার মানে?

ছোটমামা বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললেন,—এই তো কিছুক্ষণ আগে একটা জ্যান্ত মড়ার খুলি টোপ খাচ্ছিল। এক খ্যাঁচ মেরে তাকে ডাঙায় তুললুম।

—তারপর? তারপর?

—খুলিটা থেকে বঁড়শি ছাড়িয়ে নিতেই ওটা লাফাতে-লাফাতে জলে গিয়ে পড়ল।

—তোমরা তবু ভয় পেলে না?

ছোটমামা বললেন,—নাহ্। আমরা অ্যাডভেঞ্চারে এসেছি যে সাধুবাবা! আমাদের অত সহজে ভয় পেলে চলে?

সাধুবাবা চাপাস্বরে বললেন,—কিন্তু তোমরা কি জানো ওই খুলিটা কার?

ছোটমামা তাচ্ছিল্য করে বললেন,—তা কেমন করে জানব? জানার দরকারই বা কী?

সাধুবাবা গম্ভীরমুখে বললেন,—দরকার আছে। ওই খুলিটা পাঁচু নামে একজন চোরের। তোমরা তার নাম শোনোনি মনে হচ্ছে। পাঁচু ছিল এই তল্লাটের এক ধূর্ত সিঁধেল চোর। সে অনেকদিন আগেকার কথা। এক রাত্রে পাঁচু গেরস্থবাড়িতে সিঁদ কাটতে বেরিয়েছে। এমনসময় পড়বি তো পড় একেবারে বঙ্কু দারোগার মুখোমুখি।

বঙ্কুবিহারী ধাড়া ছিলেন দুঁদে দারোগা। পাঁচুকে দেখে তিনি টর্চ জ্বেলে 'পাকড়ো-পাকড়ো' বলে তাড়া করলেন। তাঁর সঙ্গে দুজন কনস্টেবল ছিল। তারাও পাঁচু চোরকে তাড়া করল। তারপর ঠিক এইখানে এসে যখন পাঁচুকে তিনজনে তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছেন, অমনি পাঁচু লাফ দিয়ে ঝিলের জলে পড়ল। দারোগা পিস্তলের গুলি ছুড়লেন। তখন পাঁচু জলে ডুব দিল।

ছোটমামার মন ফাতনার দিকে। শুধু বললেন,—হুঁ।

গল্পটা আমি মন দিয়ে শুনছিলুম। তাই বললুম,—তারপর কী হল সাধুবাবা?

সাধুবাবা শ্বাস ছেড়ে বললেন,—পাঁচু ডুব দিল তো দিল। আর মাথা তুলল না। তখন দারোগাবাবু দুই কনস্টেবলকে পাহারায় রেখে থানায় ফিরে গেলেন। রাত পুইয়ে সকাল হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় পাঁচু? আসলে কী হয়েছিল জানো? ঝিলের জলের তলায় ঘন দাম আর শ্যাওলা আছে। বেচারা পাঁচু তাতে আটকে গিয়ে আর মাথা তুলতে পারেনি। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা পড়েছিল।

এবার ছোটমামা বললেন,—তারপর জেলে ডেকে এনে জাল ফেলে পাঁচুর মড়া তোলা হয়েছিল বুঝি?

সাধুবাবা হাসলেন। —ওরে পাগল! দেখতে পাচ্ছ না ঝিলের জলের অবস্থা? কত দাম, শ্যাওলা আর কতরকমের জলজ উদ্ভিদ! জাল ফেললে সেই জাল কি আর তোলা যেত? ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়ে যেত না? তাই কোনও জেলেই জাল ফেলতে রাজি হল না। পাঁচুর মড়া জলের তলায় আটকে রইল। তারপর এতদিনে তার খুলিটা তোমাদের বঁড়শিতে আটকে গিয়েছিল। বুঝলে তো?

ছোটমামা আনমনে আবার বললেন,—হুঁ।

সাধুবাবা বললেন,—তো শোনো বাবারা! আবার যদি পাঁচুর খুলি তোমাদের

ছিপে ওঠে, তাহলে খুলিটা আমাকে দিয়ে যেও। কেমন? ওই যে দেখছ জঙ্গল! ওর মধ্যে আছে শ্মশানকালীর মন্দির। ওখানে আমাকে পেয়ে যাবে। খুলিটার বদলে আমি তোমাদের একটা মন্ত্র শিখিয়ে দেব। সেই মন্ত্র পড়ে বঁড়শিতে ফুঁ দিলেই তোমরা প্রচুর মাছ ধরতে পারবে। যাই হোক, এখন আমি যাই। মায়ের পুজোর সময় হয়ে এল।

বলে সাধুবাবা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে 'তারা তারা তারা' বলতে-বলতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ততক্ষণে দিনের আলো কমে এসেছে। গাছপালায় পাখিদের হল্লা গেছে বেড়ে। ছোটমামাকে বলতে যাচ্ছি, এবার বাড়ি চলুন ছোটমামা—এমন সময় ছোটমামার হুইলে ছিপের ফাতনা আচমকা ডুবে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ছোটমামা খ্যাঁচ মারলেন। আর অবাক হয়ে দেখলুম, আবার সেই মড়ার খুলিটা আমাদের পিছনে ঝোপের ভেতরে ছিটকে পড়ল। ছোটমামা দৌড়ে গিয়ে এবার খুলিটা চেপে ধরলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন,—এবার? এবার কী করে পালাবে বাছাধন?

বললুম,—ছোটমামা! চলুন। খুলিটা সাধুবাবাকে দিয়ে আসবেন।

তাই চল।—বলে ছোটমামা পা বাড়ালেন।

বললুম,—ছিপদুটো পড়ে রইল যে?

—থাক না। ফেরার সময় নিয়ে যাব।

ঝোপঝাড়ের পর উঁচু-উঁচু গাছের ঘন জঙ্গল। এখনই জঙ্গলের ভেতর আবছা আঁধার জমেছে। ছোটমামা বললেন,—পুঁটু! শ্মশানকালীর মন্দির তো দেখতে পাচ্ছি না!

ওই সময় কানে এল কারা চাপাস্বরে কথা বলছে। ছোটমামা সেদিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দেখলুম, খানিকটা খোলামেলা জায়গায় চারজন লোক একটা খাটিয়া নিয়ে বসে আছে। খাটিয়াতে একটা মড়া।

খুলি হাতে নিয়ে ছোটমামা যেই বলেছেন,—এখানে শ্মশানকালীর মন্দিরটা কোথায় বলতে পারেন? অমনি লোকগুলো লাফ দিয়ে উঠে ওরে বাবা! এরা আবার কারা? —বলে দৌড়ে জঙ্গলের ভেতর উধাও হয়ে গেল। ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন,—যা বাবা! ওরা হঠাৎ অমন করে পালিয়ে গেল কেন? এই খুলিটা দেখে ভয় পেল নাকি?

তারপর তিনি মড়ার খাটিয়ার কাছে গেলেন। গলা অবধি চাদর ঢাকা মড়ার মাথাটা বেরিয়ে আছে। ছোটমামা বললেন,—বেশ শৌখিন লোক ছিল মনে হচ্ছে। বুঝলি পুঁটু! চুলগুলোর কেতা দেখছিস? চোখে সোনালি ফ্রেমের দামি চশমা। গোঁফটার কেতাও আছে। দেখে কিন্তু মড়া বলে মনেই হয় না! আমার ধারণা হার্ট অ্যাটাকে মারা পড়েছে। আহা! এমন শৌখিন লোকের মারা যাওয়া উচিত হয়নি!

ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি এটা শ্মশান। এখানে-ওখানে চিতার পোড়া কাঠ আর ছাই। ভাঙা কলসিও পড়ে আছে। এই মড়াটার জন্য কোনও কাঠের পাঁজা দেখতে পেলুম না। খাটিয়ার কয়েক হাত দূরে ঝিলের জল আবছা দেখা যাচ্ছিল। মনে হল, লোকগুলো মড়া পোড়ানোর কাঠের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু একটা খুলি দেখে ওরা অত ভয় পেল কেন?

ছোটমামা মড়াটা দেখতে-দেখতে আনমনে বললেন,—কিন্তু শ্মশানকালীর মন্দিরটা কোথায়?

তারপরই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। ছোটমামার হাত ফসকে খুলিটা ঠকাস করে খাটিয়ার মড়ার নাকের ওপর পড়ল। অমনি মড়াটা আর্তনাদ করে উঠল, উহু হু হু! গেছি রে বাবা! গেছি! —তারপর লাফ দিয়ে উঠে খুলিটা দেখামাত্র জ্যান্ত মানুষের মতো দৌড়ে জঙ্গলের ভেতর উধাও হয়ে গেল। আবছা আলোয় দেখলুম, পরনে ধুতি, গায়ে নকশাদার সিল্কের পাঞ্জাবি। ছোটমামাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললুম,—ছোটমামা! ছোটমামা! আমার বড্ড ভয় করছে।

ছোটমামা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খুলিটা চেপে ধরলেন। কারণ এই সুযোগে খুলিটা আবার পালিয়ে যাচ্ছিল।

এতক্ষণে সেই সাধুবাবার কণ্ঠস্বর কানে এল। —তারা! তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী মা গো!

তারপর একটু তফাতে গাছের ফাঁকে আগুনের আঁচ দেখতে পেলুম।

ছোটমামাকে সেটা দেখিয়ে দিলুম। উনি হন্তদন্ত হয়ে সেদিকে এগিয়ে চললেন। গাছপালার ভেতর একটা জরাজীর্ণ মন্দির দেখা গেল। তার উঁচু চত্বরে ধুনি জ্বেলে বসে আছেন সেই সাধুবাবা।

ছোটমামা বললেন,—সাধুবাবা! সাধুবাবা! এই নিন পাঁচু-চোরের খুলি।

সাধুবাবা ঘুরে খুলিটা দেখে সহাস্যে বললেন,—পেয়েছিস ব্যাটাচ্ছেলেকে? দে! শিগগির দে!

ছোটমামা খুলিটা দিতে যাচ্ছেন, আবার সেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। ছোটমামার হাত ফসকে খুলিটা সজোরে গিয়ে সাধুবাবার বুকে পড়ল। সাধুবাবা চিৎ হয়ে পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করলেন,—উ হু হু! গেছি রে বাবা! গেছি!

তারপর দেখলুম, তাঁর জটার পেছনে আগুন ধরে গেছে। কারণ তিনি জ্বলন্ত ধুনির ওপর পড়ে গিয়েছিলেন। জটায় আগুনের আঁচ টের পেয়ে সাধুবাবা লাফ দিয়ে চত্বর থেকে নেমে দৌড়ে গেলেন। তারপর আবছা আঁধারে ঝপাং করে জলের শব্দ হল। বুঝলুম, সাধুবাবা আগুন নেভাতে ঝিলের জলে ঝাঁপ দিয়েছেন।

এদিকে খুলিটাও সুযোগ বুঝে গড়াতে শুরু করেছে। ছোটমামা খুলিটা ধরার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পারছিলেন না। ওটা কখনও লাফিয়ে-লাফিয়ে এগোচ্ছে, কখনও গড়িয়ে চলছে। আমরা যেখানে ছিপ ফেলেছিলুম, সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই জলের ভেতর থেকে একটা কঙ্কালের দুটো হাত ভেসে উঠল এবং খুলিটা লুফে নিয়ে আবার জলে ডুবে গেল। এতক্ষণে ছোটমামা ভয় পেয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে উঠলেন,—পুঁটু রে! আর এখানে থাকা ঠিক নয়। ছিপ তুলে নে। মোনা-ওঝা ঠিকই বলেছিল রে!

দুজনে ঝটপট ছিপ গুটিয়ে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাঁধের ওপর উঠলুম। তারপর বাঁধের পথে বাড়ি ফিরে চললুম। কিছুদূর চলার পর ছোটমামা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—সবই হল রে পুঁটু। সাধুবাবার কাছে মাছ ধরার মন্ত্রটা শেখা হল না।

মুরারিবাবুর আলমারি

মুরারিবাবুর একটা আলমারি কেনার দরকার ছিল। কাঠের আলমারি আজকাল কেউ পছন্দ করে না। স্টিলের আলমারির রেওয়াজ বেড়েছে। ওঁর বন্ধুরা পরামর্শ দিয়েছিলেন—ভালো কোম্পানির নতুন স্টিলের আলমারির যা দাম, তার চেয়ে বরং টেরেট্টি বাজার কিংবা চীনাবাজারে গিয়ে নিলামি জিনিস খুঁজে কেনো। দাম কম পড়বে। জিনিসও পাবে খাঁটি। আজকাল ভেজাল জিনিসে বাজার ছেয়ে গেছে।

মুরারিবাবুর মনে ধরেছিল কথাটা। খোঁজ নিয়ে জানলেন, ওই এলাকায় চ্যাং চুং ফুঃ কোম্পানির নিলামি কারবার আছে। ফি-রোববার সেকেলে নায়েবি আমলের আসবাবপত্র নিলাম হয়।

অতএব এক রোববার সকাল নটায় গিয়ে হাজির হলেন চ্যাং চুং ফুঃ কোম্পানির দোকানে। বিশাল দোকান। হরেকরকম বনেদি আসবাবে ভর্তি। তার মধ্যে খুঁজে-খুঁজে কোণার দিকে একটা ছাইরঙা স্টিলের আলমারি পছন্দ হল। বেশ বড় আলমারি। একটা আয়নাও লাগানো রয়েছে। দোকানের চীনা-কর্মচারী মুরারিবাবুর আগ্রহ দেখে বলল,—পছন্দ যখন হয়েছে, এক কাম করুন বাবু। বড়সাবকে গিয়ে বোলেন, দু-দশ রুপেয়া জাস্তি দিলেই আপনার হয়ে যাবে।

মুরারিবাবু অবাক হয়ে বললেন,—কেন? এটা বুঝি নিলামে বেচা হবে না?

না বাবু। —কর্মচারীটি জানাল। —এটা বাড়তি মাল আছে। দেখছেন না, সেজন্যেই এটা একধারে তফাত করে রাখা হয়েছে?

মুরারিবাবু ভাবলেন, তাই বটে। আলমারিটা সেজন্যই আলাদা রাখা আছে এবং এটার ধারে-কাছে কেউ আসছে না। কিন্তু নিলামি জিনিস না হলে যে দাম বেশি পড়ে যাবে। তাহলে নতুন কেনাই তো ভালো। বললেন,—তাহলে এটার দরকার নেই। নিলামি জিনিস কোথায় আছে দেখা যাক।

চীনা-কর্মচারী এবার ওঁর কানে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল,—আমার কথা শুনুন বাবু। এ বহুত ভালো মাল আছে। আজকাল এমন আলমারি পাবেন না কোথাও। বড়াসাবকে গিয়ে ধরুন, কম দামে মিলে যাবে।

মুরারিবাবু অবাক হলেন। ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক। বললেন,—কই, খুলে দেখাও তো, দেখি ভেতরটা কেমন?

কর্মচারীটি পকেট থেকে চাবি বের করে আলমারিটা খুলতেই ঘ্যাঁ-অ্যা-চ করে মারাত্মক আওয়াজ হল। এমন বিতিকিচ্ছিরি আওয়াজ যে, ঘরসুদ্ধ লোক চমকে উঠল। মুরারিবাবুরও পিলে চমকে ওঠার দাখিল। কর্মচারীটি একগাল হেসে বলল,—মাত ঘাবড়াইয়ে বাবু। ভালো আলমারির এটাই তো গুণ। চোর-ডাকু খুললেই আপনি জানতে পারবেন। ধরা পড়ে যাবে সঙ্গে-সঙ্গে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

আলমারিটা ওয়াড্রোবিও বটে। কাপড়জামা টাঙানোর ব্যবস্থা আছে। টাকাপয়সা, সোনাদানা রাখার লকার আছে। দলিলপত্র, ফাইল রাখার তাক আছে। ভেতরে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। যেন নেশা ধরে যায়। দেখেশুনে মুরারিবাবু যেন বড্ড মায়ায় পড়ে গেলেন আলমারিটার। ঝোঁক চেপে গেল, এটা কিনতেই হবে।

চীনা-কর্মচারীটি বলল,—পসন্দ হল তো? হবেই তা জানা কথা! এখন চলেন, বড়সাহেবের কাছে নিয়ে যাই আপনাকে।

আলমারির পাল্লা বন্ধ করতে কিন্তু একটুও শব্দ হল না। এ তো ভারি অবাক আলমারি! মুরারিবাবু খুশি হলেন। খুললে বিকট আওয়াজ হচ্ছে! হোক না। ক্ষতি কী? যখনই অন্য কেউ তাঁর অজান্তে খুলতে যাবে, তিনি টের পাবেন। তার ওপর আসল কথা, তিনি একা মানুষ। বাড়িতে থাকবার মধ্যে এক ওই গুণধর ভাগ্নে বীরু, আর ঠাকুর-কাম-ভৃত্য জটিল ওরফে জটা। দুটিই মহা ধড়িবাজ চোর। সেজন্যেই তো এই আলমারি কেনার কথা মাথায় এসেছিল। কিন্তু এবার? এবার তোরা কীভাবে চুরি-চামারি করবি দেখা যাবে। মুরারিবাবু যত একথা ভাবলেন, তত জেদ চড়ে গেল মাথায়। যত টাকা লাগুক কিনতেই হবে আলমারিটা।

পার্টিশনের আড়ালে একটা চেম্বারে তাঁকে নিয়ে গেল কর্মচারীটি। মুরারিবাবু দেখলেন, ইয়া হোঁতকা মোটা গোলগাল প্রকাণ্ড আর একজন চীনা-ভদ্রলোক বসে আছেন। একটু হেসে খুব খাতির দেখিয়ে ইংরাজিতে বললেন,—বসুন স্যার। বলুন, কী করতে পারি?

মুরারিবাবু বললেন,—ওই আলমারিটা...

কথা কেড়ে ভদ্রলোক বললেন,—বুঝেছি, বুঝেছি। বেশ তো নিয়ে যান।

বলে কী! বিনিদামে দেবে নাকি—এমনভাবে বলছে কথাটা?

মুরারিবাবু বললেন,—কিন্তু দাম-টাম কীরকম লাগবে যদি বলেন!

চীনা-ভদ্রলোক কুমড়োর মতো রাঙা ও বৃহৎ মুখে বিরাট হাসি ফুটিয়ে বললেন,—আপনার যা খুশি দেবেন! ব্যস! আমি কিচ্ছু বলব না!

সে কী!—ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন মুরারিবাবু। ঠাট্টা করছে নাকি?

—হ্যাঁ স্যার। পছন্দ যখন হয়েছে, নিয়ে যান।

তার মানেটা কী বুঝিয়ে বলবেন?—মুরারিবাবু জিগ্যেস করলেন।

এবার চীনা-ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন,—ওই আলমারির মালিক ছিলেন হো হো হুয়া নামে আমার এক বন্ধু। এখন তিনি হংকংবাসী। যাওয়ার আগে ওটা আমাকে দিয়ে বলে গেছেন যেন জিনিসটার দাম নিয়ে কারও সঙ্গে দরাদরি না করি। কেউ যদি খুব পছন্দ করে কিনতে চায়, সে হাতে তুলে যা দেবে, আমাকে নিতে হবে।

মুরারিবাবু অবাক হয়ে বললেন,—তা আমি ছাড়া আর কারুর পছন্দ হয়নি বুঝি?

ঘাড় নাড়লেন ভদ্রলোক,—হয়নি।

কেন পছন্দ হয়নি? জিনিসটা তো ভালোই মনে হল। —মুরারিবাবু বললেন।

চীনা-ভদ্রলোক বললেন,—ওই বিশ্রী আওয়াজটার জন্যে। বুঝলেন কিনা? আজকাল লোকের যেন ভারি অদ্ভুত মনোভাব। আলমারি হোক, আর মোটরগাড়ি হোক—আওয়াজ বরদাস্ত করতে পারে না। সাইলেন্সার লাগায় গাড়ির ইঞ্জিনে। বুঝলেন কিনা?

মুরারিবাবু বুঝলেন আবার বুঝতেও পারলেন না। আওয়াজের কথা বলছে কিন্তু পাড়ায় যে অষ্টপ্রহর মাইকে হিন্দি গান বাজে, তার বেলা? তখন তো দিব্যি সয় সবার। বললেন,—একটু তেল-টেল দিলেই তো আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যায়। এটা কারুর মাথায় আসেনি?

ভদ্রলোক আবার হাসলেন,—না স্যার। ও আওয়াজ দু-চার কুইন্টাল তেল ঢেলেও বন্ধ হওয়ার নয়! ওটাই তো ওর মজা। কিন্তু কে কাকে বোঝায়? তাছাড়া আলমারির এরকম আওয়াজ থাকা তো ভালোই। চোর-ডাকাত যদি...

বাধা দিয়ে মুরারিবাবু বললেন,—দেখুন। আমার যখন পছন্দ হয়েছে, জিনিসটা আমি নেব। ন্যায্য দাম দিয়েই নেব।

বলে পাঞ্জাবির ভেতর পকেট থেকে যা হাতে এল, চোখ বুজে টেবিলে রেখে দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—আশা করি, আলমারিটা এখন আমি নিয়ে যেতে পারি।

স্বচ্ছন্দে। —বলে চীনা-ভদ্রলোক ঘণ্টার বোতাম টিপলেন। একজন কর্মচারী এসে ঢুকল, তখন বললেন,—ইনি আলমারিটা কিনেছেন। যাও, কুলির ব্যবস্থা করো।

আলমারি তো পৌঁছে গেল। মুরারিবাবুর শোওয়ার ঘরে জায়গামতো দাঁড় করিয়ে চ্যাং চুং ফুঃ কোম্পানির কুলিরা চলে গেল। ভাড়া দিতে গেলেন, ওরা নিল না। ক্যারিং চার্জ কোম্পানির। বাড়তি পয়সা নিলে ওদের ছাঁটাই করে দেবে কোম্পানি। এমনই কড়া নিয়ম।

জটিল আর বীরু আলমারিটা দেখে খুব প্রশংসাই করল। মুরারিবাবু তাদের ব্যাপারটা টের পাইয়ে দিতে চাবি বের করলেন। তারপর পাল্লার হাতল ধরে টান দিলেন। অমনি মনে হল, কানের ভেতর গরম সীসে ঢুকে যাচ্ছে। বাড়িসুদ্ধ একেবারে কেঁপে উঠেছে। জটিল দুকানে হাত ঢেকে বাপ রে—বলে লাফিয়ে উঠেছে। বীরু প্রায় ভিরমি খাওয়ার দশা। সে চেঁচিয়ে উঠল,—ও মামা। এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার।

মুরারিবাবু চমকে গিয়েছিলেন। এ-বাড়ি এসে যেন আওয়াজটা তিনগুণ বেড়ে গেল! দোকানে তো এত বেশি আওয়াজ হয়নি। কিন্তু কথাটি আর বললেন না। মুচকি হাসলেন শুধু।

বীরু বলল,—মামা, অয়েলিং করা দরকার। নয়তো আর সব ফ্ল্যাটের লোক থানা-পুলিশ করে বসবে। ডিসটার্ব হবে যে!

মুরারিবাবু তাচ্ছিল্য করে বললেন,—হাতি করবে। ঘোড়া করবে। আমি কারুর ডিসটার্ব হবে বলে আলমারি খুলতে পারব না? আবদার আর কী।

বীরু আবার বলল—অয়েলিং করলেই তো হয়।

মুরারিবাবু ফ্যাঁচ করে হেসে বললেন,—বেশ তো, অয়েলিং করে দ্যাখ না তুই। যদি আওয়াজ বন্ধ হয়, তো হোক!

বীরু দৌড়ে কিচেন থেকে নারকেল তেলের শিশি নিয়ে এল। তারপর পাল্লার কবজাগুলোতে ঢেলে দিল। পাল্লা বন্ধ করে বলল,—দেখছ? আর কোনও শব্দ নেই?

মুরারিবাবু মিটিমিটি হেসে বললেন,—হুঁ। এবার খোল তো দেখি।

বীরু যেই হাতল ধরে টেনেছে, অমনি যেন আবার কানে গরম সীসে ঢুকে পড়েছে। এবার আওয়াজটা আরও বেশি। আরও বাড়ি-কাঁপানো। যেন প্লেন ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। ওদিকে সারা বাড়ি হুলুস্থুল। অন্য ফ্ল্যাটের লোকেরা বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ধারণা, ওপরতলার ছাদ বুঝি ধসে পড়েছে। সে এক হইহই কাণ্ড। চ্যাঁচামেচিতে রাস্তায় ভিড় জমে গেল দেখতে-দেখতে। কারা চেঁচিয়ে বলতে থাকল, —দমকল! পুলিশ!

মুরারিবাবু থ। একেবারে কাঠপুতুল। মুখে কথা নেই। হ্যাঁ, এজন্যেই চ্যাং চুং ফুঃ কোম্পানি আলমারিটা তাঁকে গছিয়ে দিয়েছে। সব রহস্য বোঝা গেল বটে।

ওদিকে লোকেরাও অবাক। কোথাও তো কিছু ভেঙে পড়েনি। অথচ আওয়াজটা ঠিকই শোনা গেছে। এক ফ্ল্যাটের লোকেরা অন্য ফ্ল্যাটের লোককে জিগ্যেস করে বেড়াচ্ছে,—কীসের শব্দ হল বলুন তো? মুরারিবাবুর ফ্ল্যাটেও এল কেউ-কেউ। বুদ্ধিমান জটিল দরজা থেকে বিদায় করে বলল,—প্লেন যাচ্ছিল। আবার কী?...

এই অদ্ভুত আলমারি কিনে মুরারিবাবু সমস্যায় পড়ে গেলেন। কোনও কাজেই লাগানো যাবে না যে! জিনিসপত্র রাখতে হলেই খুলতে হবে। এবং যা বোঝা যাচ্ছে খুললেই প্রতিবার আওয়াজ ক্রমশ বাড়তে থাকবে। প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বার তিনগুণ বেড়েছে। তৃতীয়বার বেড়েছে আরও তিনগুণ যেন। চতুর্থবার খুললে না জানি কী প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড হবে। তাই বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন। একটা কাজ অবশ্য হচ্ছে। চুল আঁচড়ানো আর দাড়ি কামানো। আয়নাটা খুব ভালো। পরিষ্কার প্রতিমূর্তি ফোটে। বরং চেহারা যেন সুন্দরতর দেখায়। মুরারিবাবু নিজের চেহারা সম্পর্কে এতকাল খুঁতখুঁতে ছিলেন। তাঁর নাকটা বেজায় লম্বা এবং ডগাটা থ্যাবড়া। স্বাস্থ্যও লিকলিকে। কিন্তু এখন এই আয়নার সামনে দাঁড়ালে কী চমৎকার না দেখায়।

আলমারিটা ফেরত দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু শুধু আয়নাটার খাতিরেই রেখে দিলেন!

এক রাত্রে মুরারিবাবু শুতে যাওয়ার আগে অভ্যাসমতো চুল আঁচড়াচ্ছেন। হঠাৎ চমকে উঠে দেখলেন আয়নার মধ্যে, তাঁর পিঠের কাছে একটা বেঁটে চীনা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

মুরারিবাবু সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরলেন। কিন্তু আশ্চর্য! চীনা কেন, কোনও লোকই তাঁর পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে নেই! তাহলে কি চোখের ভুল? আয়নার দিকে আবার ঘুরলেন! আর ঘুরেই চমকে উঠলেন। হ্যাঁ, দিব্যি পিঠের কাছে চীনা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে এবং মিটিমিটি হাসছে।

ভয়ে বুক টিপটিপ করে উঠল। এ যে মারাত্মক ভুতুড়ে কাণ্ড! মুরারিবাবু বরাবর সাহসী এবং জেদি মানুষ। কিন্তু ব্যাপারটা দেখে তাঁর গাঁয়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। তক্ষুনি দু-হাতে চোখমুখ ঢেকে কাঁপতে-কাঁপতে খাটে গিয়ে বসে পড়লেন।

একটু পরে ধাতস্থ হয়ে ভাবলেন, নাঃ, চোখের ভুল ছাড়া কিছু নয়। হ্যালুসিনেশান নামে একটা ব্যাপার আছে। মানুষ অনেক সময় ভুল দেখে। কারুর-কারুর ওই একটা স্থায়ী মানসিক ব্যাধি। তাঁর সেই ব্যাধি-ট্যাধি হয়নি তো?

তা কেন হবে? দিব্যি সুস্থ মানুষ। কোনও রোগ-বালাই নেই। মাথাও ধরে না। ঘুমও ভালো হয়। খিদে হয়।

মুরারিবাবু আবার সাহস করে আয়নার সামনে গেলেন। তারপর তাকালেন। ওরে বাবা! এবার যে আরও সাংঘাতিক ব্যাপার। সেই বেঁটে চীনা লোকটির গলার কাছটা কাটা এবং গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। অথচ সে কেমন মিটিমিটি হেসে তাকিয়ে আছে। আর সহ্য করতে পারলেন না মুরারিবাবু! পরিত্রাহি আর্তনাদ করে উঠলেন,—খুন! খুন! খুন!

সে-রাতেও খুব হইহই কাণ্ড হয়েছিল। বীরু ও জটিল ভেবেছিল, মুরারিবাবুকে ডাকাতে বুঝি খুন করেছে। পাড়াসুদ্ধু লোক জড়ো হয়েছিল। পুলিশও এসেছিল। কিন্তু কোথায় খুন—ডাকাতই বা কোথায়! মুরারিবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন আলমারিটার সামনে। ডাক্তারবাবু এসে ওষুধ দিলে জ্ঞান ফিরল। চোখ খুলেই বললেন,—আলমারি হটাও।

পরের দিন টেম্পো ভাড়া করে আলমারিটা নিয়ে গেলেন চ্যাং চুং ফুঃ কোম্পানির দোকানে। সেই চীনা-কর্মচারীটি একগাল হেসে বলল,—আসুন বাবু! এত দেরি হল যে?

মুরারিবাবু তেতো হয়ে বললেন...কীসের দেরি?

—এর আগে যারা নিয়ে গেছেন পরদিনই ফেরত এনেছেন। আপনি বাবুজি পাঁচদিন পরে আনলেন যে?

আমার খুশি! —বলে মুরারিবাবু আলমারিটা আগের জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করে চলে আসছেন—চীনা-কর্মচারী তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে দরজা অবধি এল, ফিসফিস করে জানাল,—জিনিস ভালো। তবে বড্ড গোলমাল করে। হো হো হুয়া সাহেবের আলমারি। ডাকাতেরা ওঁকে খুন করে ওর মধ্যে ভরে রেখে গিয়েছিল। একবছর পরে তালা ভেঙে তবে ব্যাপারটা জানা যায়। মরচে ধরে গিয়ে খুব আওয়াজ হয়েছিল খোলার সময়। পালিশ করে সব ঠিকঠাক হয়েছে। শুধু আওয়াজটা বন্ধ করা যায়নি। আচ্ছা বাবু, আবার আসবেন। নমস্কার!...

শ্যামখুড়োর কুটির

সেই যারা বাংলা মুল্লুকের পাড়াগাঁয়ে রাতবিরেতের অন্ধকারে নিরিবিলি জায়গায় আলো জ্বেলে কীসব খুঁজে বেড়ায়, এই মার্কিন মুল্লুকেও এসেও তাদের দেখা পেয়ে যাব ভাবতেও পারিনি।

তফাতটা শুধু দেখলুম ভাষার। সেই একইরকম তিনটে আলো নিয়ে তিনটি ছায়ামূর্তি জলার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাকি স্বরে একজন বলল,—এখানেই তো থাকার কথা। গেল কোথায়?

অন্যজন বলল,—ভালো করে খুঁজে দ্যাখ না।

তৃতীয়জন বলল,—কেউ মেরে দেয়নি তো?

ভাষাটা ইংরেজি। এমনিতে বেশির ভাগ মার্কিন একটু নাকি স্বরে কথা বলে। এরা তো ভূত। গলার স্বর বেজায় রকমের খোনা।

আমার সঙ্গী বব তেজি ছোকরা। ভূত বিশ্বাস করে না। সে বলল,—একটু অপেক্ষা করো। ওদের ডেকে আনি। মনে হচ্ছে, গাড়িটা ঠেলতে হবে। উনষাট বছর বয়সের এই বুড়োগাড়ির পক্ষে এমনটা হবেই।

উঁচু হাইওয়ের ডান ঘেঁষে আমাদের গাড়িটা দাঁড় করানো। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। কনকনে হাওয়া বইছে। ঠান্ডায় হিম হয়ে গেছি গাড়ি থেকে নেমেই। দূরে—বহু দূরে আলোর ফুটকি দেখা যাচ্ছে। হাইওয়েতে কয়েক ফার্লং অন্তর 'ল্যাম্পপোস্ট' যদিও রয়েছে, আমরা থেমেছি দুই ল্যাম্পপোস্টের মাঝামাঝি জায়গায়।

ইচ্ছে করে কি কেউ থামে? একেই বলে, যেখানে ভূতের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। বব হাইওয়ের ধারে ঢালু জমির দিকে পা বাড়াচ্ছে দেখে পিছু ডেকে বললুম,—বব! বব! কথা শোনো!

বব থেমে বলল,—কী হল?

—যাচ্ছ কোথায় তুমি? একটা কথা বলছি, শোনো।

নিচের দিকে আবছাভাবে একটা জলা দেখা যাচ্ছে। নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পড়েছে। ঝিকমিক করে কাঁপছে। সেখানে তিনটে আলো ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। সেদিকে দেখিয়ে বব বলল,—ওদের ডেকে আনি। তুমি কি একা ঠেলতে পারবে ভাবছ? তুমি তো বাতাসেই উড়ে যাচ্ছ দেখছি।

বব হাসছিল। বললুম,—বব! ওরা কারা, কী ভাবছ তুমি?

বব সেদিকে তাকিয়ে বলল,—এখানে একটা গরুর খোঁয়াড় আছে দেখেছি! ওরা খোঁয়াড়েরই লোক হবে! না হলে খামার বাড়ির চাষাভুষো।

দুপা এগিয়ে চাপা গলায় বললুম,—ওরা কী বলাবলি করছিল আমার কানে এসেছে বব।

এবার বব একটু চমকাল বুঝি। সেও গলা চেপে বলল,—আমাদের ওপর ওরা হামলা করবে বলছিল নাকি? দ্যাখো, হাইওয়েতে এমন হামলা প্রায়ই হয়। তবে আমাদের কাছে দামি কিছু তো নেই। তাছাড়া আমার কাছে একটা অটোমেটিক রিভলভার আছে। ভেবো না।

বললুম,—না না! আমার ধারণা, ওরা হয়তো মানুষ নয় বব!

বব অবাক হয়ে বলল,—মানুষ নয় মানে? তবে ওরা কী?

—দ্যাখো বব, তাহলে তোমায় অনেক গল্প বলতে হয়। ঠান্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে ব্যস্তভাবে বললুম। —বরং হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে থেকেই আমরা কোনও গাড়ি থামিয়ে সাহায্য চাইব।

বব রাস্তার দুদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখে নিয়ে বলল,—আশ্চর্য তো! এখন কোনও দিক থেকেই গাড়ি আসছে না! এটা এক আন্ত রাজ্য হাইওয়ে। চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ির বিরাম থাকে না। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন?

—সেজন্যেই তো বলছি, গতিক ভালো নয়। এসো, আপাতত গাড়ির ভেতর ঢুকে সিগারেট টানি। ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না।

বলে আমি গাড়িতে ঢুকে বসলুম। বব কিন্তু এল না। বলল,—এদিকে লোকগুলোও চলে যাচ্ছে যে! হ্যাভেরি, তোমার কথার নিকুচি করেছে। বোসো, এক্ষুনি আসছি।

সে দৌড়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেল। নিচে জলার ধারে আলো তিনটে ওদিকে উঁচুতে উঠে এগিয়ে যাচ্ছে কালো টিলার মতো উঁচু জায়গার দিকে। একটু পরে কিন্তু তিনটে আলোই মিলিয়ে গেল। তখন বব ফিরে এসে বলল,—ব্যাটাচ্ছেলেদের অত করে ডাকলুম। শুনতেই পেল না। দ্যাখো দিকি, কী মুশকিলে পড়া গেল! ওহে, একবার বেরিয়ে একটু ঠেলে দাও না, দেখি কী হয়। এসো এসো।

অগত্যা বেরোতে হল। বব একপাশে দাঁড়িয়ে ঠেলতে-ঠেলতে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল, অন্যদিকে আমি কাঁধ লাগালুম। কিন্তু গাড়ি কান্নার মতো শব্দ করতে থাকল শুধু। স্টার্ট নিল না। এই সেকেলে ১৯২১ সালের মডেল ভিনটেজ গাড়িটা তবু মায়াবশে বব ছাড়তে নারাজ।

হতাশ হয়ে বব অন্ধকারে সেই কালো টিলাটার দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সময় দেখলুম, এবার তিনটে নয়, মোটে একটা আলো নেমে আসছে জলার দিকে। আলোটা জলাঅব্দি এসে একবার থামল। তারপর আমাদের দিকে উঠতে থাকল। অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। কিন্তু বব নেচে উঠল প্রায়। সে জোর গলায় ডেকে বলল,—ওহে লোকটা, আরও একটু পা চালিয়ে এসো দিকি! বড্ড বিপদে পড়েছি আমরা।

আলোটা ঢালু জায়গায় থেমে গেল। তারপর খনখনে গলায় জিগ্যেস করল,—কে তোমরা? হয়েছেটা কী?

বব বলল,—গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না; ঠেলে দিলে বোধহয় নেবে।

—আমার সময় নেই। কর্তার কুকুরের লেজ হারিয়ে গেছে। খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—কী হারিয়েছে বললে?

লেজ।—বলে আলোওয়ালা ছায়ামূর্তিটা গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা পেরুতে থাকল।

বব হাসতে-হাসতে বলল,—তুমি তো ভারি রসিক লোক দেখছি!

আলোওয়ালা বলল,—রসিকতা কী বলছ? প্রাণ নিয়ে টানাটানি! কর্তার যা মেজাজ। জিমের লেজ খুঁজে না আনলে চাকরি চলে যাবে।

আলোওয়ালা রাস্তার ওধারে গিয়ে মাঠে নামল। বব বলল,—উঁহু উঁহু। এভাবে রাত কাটানোর মানে হয় না। তুমি অপেক্ষা করো, আমি ওর কর্তার কাছে গিয়ে সাহায্য চাই।

আমি তো ভুক্তভোগী যাকে বলে। বাংলার পাড়াগাঁয়ে একবার ঠিক এমন আলোওয়ালাদের পাল্লায় পড়ে যা ভুগেছিলাম কহতব্য নয়। এটা তো বিদেশবিভুঁই। একা এখানে থাকি, আর যে আলোওয়ালাটা সদ্য ওধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাকে বাগে পেয়ে ঘাড় মটকাবে আর-কী! তাই বললুম,—চলো বব। তোমার সঙ্গে আমিও যাই!

বব খুশি হয়ে বলল,—এসো।

মানে একটা ভরসা হচ্ছে দুজন একসঙ্গে থাকলে ওরা সুবিধা করতে পারবে না। তাছাড়া ববের গায়ে অসুরের জোর আছে। পকেটে রিভলভারও আছে, রিভলভারের গুলিতে ওদের ক্ষতি কিছু না হোক, আমরা অন্তত মনে সাহস পাব। রাতবিরেতে ভয় পেলে আওয়াজ একটা মোক্ষম দাওয়াই কিনা। সেজন্যই নিয়ম আছে ভয় পেলে জোরে গান গাইতে হয় কিংবা আপন মনে কথা বলতে হয়। সাহস ছাড়া ভূতপেতকে হারানোর আর কোনও উপায় নেই। ভয় পেয়েছি টের পেলেই ওরা ঘাড়টি মটকে দেবে। কাজেই ভূতের পাল্লায় পড়লেই হাবভাবে দেখাতে হবে তুমি ভীষণ সাহসী। তাহলে উল্টে ভূতই ভয় পেয়ে পালাবে।

জলার ধার দিয়ে গিয়ে নরম ঘাসে ঢাকা টিলায় উঠতে-উঠতে বললুম,—রিভলবারটা তৈরি রেখো কিন্তু। কিছু বলা যায় না।

বব বলল,—না না। এরা চাষাভূষা লোক। বড্ড গোবেচারা।

—বব, কুকুরের লেজ খোঁজাখুঁজির ব্যাপারটা নিয়ে তোমার মনে সন্দেহ জাগছে না?

—ওটা তো রসিকতা। তুমি মার্কিন চাষাভূষাদের হালচাল জানো না। ওরা ভারি রসিক।

—যে-কর্তার কথা বললে, সে রসিক না হতেও পারে।

চলো তো দেখি লোকটা কেমন।—বলে বব জগিংয়ের ভঙ্গিতে টিলাটা বেয়ে উঠতে থাকল।

আমার হাঁপ ধরে যাওয়ার দাখিল। তবে শিগগির থামতে হল আমাদের সামনে ঘন গাছপালা। একফালি পথ খুঁজে পেলুম। পথ ধরে একটু এগুলে কুকুরের ডাক শোনা গেল।

কুকুরের ডাকটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছিল আমার। ভূতদের কুকুর থাকতে পারে। কিন্তু তারা কখন ডাকে বলে শুনিনি। যতো এগোচ্ছি, কুকুরটার হাঁকডাক তত বেড়ে যাচ্ছে। সামনে আবছা একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কোনও আলো নেই। এমন তো হওয়ার কথা নয়। এদেশে বিদ্যুৎ ছাড়া চলে না! শুধু আলো নয়, হাজার রকমের দরকারি কাজে বিদ্যুৎ লাগে।

বব বলল,—ভারি অদ্ভুত তো। মনে হচ্ছে বাড়ির ভেতর কুকুরটাকে বেঁধে রেখে বাড়ির লোকেরা কোথায় বেরিয়েছে। আলো নেই কেন?

এবার ফিসফিস করে বললুম,—বব। সেজন্যেই তো তখন বলছিলুম, এরা মানুষ নয়।

বব আমার কথা শুনে হেসে উঠল। —তখন থেকে তুমি মানুষ নয় মানুষ নয় করছ কেন বলো তো?

আসল কথাটা বলতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ বাড়ির সবগুলো আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। কুকুরের ডাকটাও থেমে গেল। সামনে সুন্দর একটা কাঠের বাড়ি দেখতে পেলুম। ছোট্ট লনে একটা ফুলবাগিচাও দেখলুম। বব দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় উঠল এবং দরজায় নক করল। আমি লনে দাঁড়িয়ে আলো-অন্ধকারে চোখ বুলিয়ে বিপজ্জনক কিছু আছে কিনা খুঁজতে থাকলুম।

দরজা ফাঁক করে এক বুড়ো ভদ্রলোক উঁকি মেরে বললেন,—কী চাই?

বব সবিনয়ে বলল,—দেখুন, আমরা আসছিলাম সিডার র‍্যাপিড এয়ারপোর্ট থেকে। এক বন্ধুকে প্লেনে তুলতে গিয়েছিলুম। ফেরার পথে গাড়িটা বিগড়ে গেছে।

বুড়ো নির্বিকার মুখে বললেন,—তা আমি কী করতে পারি?

—দয়া করে যদি আপনার লোকদের একটু বলেন—

ভদ্রলোক বললেন,—আমার লোকেরা সবাই এখন কাজে বেরিয়েছে।

রাগী বব খাপ্পা হয়ে বলল,—কুকুরের লেজ খুঁজতে বুঝি?

আশ্চর্য, ভদ্রলোক খিকখিক করে হাসলেন,—তাহলে তো জানোই দেখছি। আমার জিমের ওই এক দোষ বুঝলে? বেড়াতে গিয়ে একটা না একটা কিছু ফেলে আসবেই! প্রত্যেক দিন! আজ তো লেজ ফেলে এসেছে। কাল এসেছিল সামনের বাঁ ঠ্যাংটা ফেলে। হতভাগা খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাড়ি ফিরেছিল। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেল একটা ওক গাছের মাথায়।

বব রাগ চেপে বলল,—উড়ে গিয়ে আটকে ছিল বুঝি?

না না।—বুড়ো খুব হাসলেন। দুষ্টু বাজপাখির কাজ। ভাগ্যিস, পরদিন খাবে বলে বাসায় রেখে দিয়েছিল। নইলে জিম খোঁড়া হয়ে থাকত।

বলেই বুড়োর চোখ পড়ল আমার দিকে। বললেন,—ওটা কে?

চটপট বললুম,—আমি ভারতের লোক। এদেশে বেড়াতে এসেছি।

দরজাটা পুরো খুলে ভদ্রলোক বেরুলেন। মস্ত আলখাল্লার মতো কালো ওভারকোট গায়ে চাপানো। লম্বাটে চেহারা! নাকটা অসম্ভব খাড়া আর লম্বা।

কোটরাগত ছোট্ট দুটো চোখ। ভুরু, চুল,দাড়ি সব সাদা। হাত বাড়িয়ে বললেন,—স্বাগত, সুস্বাগত। তুমি ভারতের লোক! এসো এসো। ভেতরে এসো। কী সৌভাগ্য আমার, এতকাল পরে একজন ভারতের লোক পাওয়া গেল। তোমায় আমার বড্ড দরকার!

বব তো হতভম্ব। কিন্তু বাইরের কনকনে ঠান্ডায় ততক্ষণে রক্ত যেন জমে গেছে। ভূত হোক, আর প্রেতই হোক, ঘরের ভেতর ঢোকাটাই এখন জরুরি।

ভেতরটা সেকেলে আসবাবে ঠাসা! একপাশে ফায়ারপ্লেসও রয়েছে সাবেকি রীতিতে! কানট্রি এলাকায় মার্কিনদের ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা সত্ত্বেও শখ করে ওরা সেকালের মতো ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালে এবং সেখানে বসে গল্পস্বল্প করে।

বব গুম হয়ে বসে রইল। ভদ্রলোক বললেন,—আমার নাম শ্যাম বানভিল। এই এলাকায় লোকে আমায় আংকল শ্যাম—শ্যাম খুড়ো বলে ডাকে। হুম! আগে কফি খাও। পরে কথাবার্তা হবে!

দুধ চিনি ছাড়া কালো কফি খেতে আমি ততদিনে অভ্যস্ত। কিন্তু মুখে দিয়েই বুঝেছি, গণ্ডগোল আছে। রুমাল বের করে মুখ মোছার ছলে তরল পদার্থটুকু পাচার করে দিলুম। তারপর আড়-চোখে দেখি বব কাপ থেকে বাঁ হাতের দুই আঙুলে সরু কী একটা টেনে তুলল। তুলে বলল,—এটা কী শ্যামখুড়ো? বাজ পাখিটার আঙুল নাকি?

শ্যামখুড়ো চোখ বুজে দুলতে-দুলতে বললেন,—না, না, ঘাসফড়িং।

বব বলল,—চিনে পাখির বাসার ঝোল রান্না করে খায় শুনেছি। ঘাসফড়িং সেদ্ধ করে কফি খাওয়ার কথা জানা ছিল না। আশা করি ডিনারে আপনি ছুঁচোর রোস্ট এবং প্যাঁচার পালকের স্যালাড খেয়েছেন?

শ্যামখুড়ো খিকখিক করে হেসে বললেন,—তোমাদের আমি ডিনার খাওয়াতে পারতুম। তুমি ঠিকই ধরেছ।

বাঁচা গেল। মার্কিনিরা রাতের খাওয়া সূর্য ডোবার সঙ্গে-সঙ্গে খেয়ে নেয়। কাজেই আমি ও বব শ্যামখুড়োর কাছে যদি ওই সময় আসতুম, কী হতো ভেবে শিউরে উঠলুম। বব কফির কাপটা রেখে দিয়েছে ততক্ষণে। খুড়ো আপন খেয়ালে বসে বসে দুলছেন। নইলে নিশ্চয় আপত্তি করতেন এবং গিলতে বাধ্য করতেন। দেখাদেখি আমিও কাপটা রেখে দিলুম।

এই সময় একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে খুড়োর পায়ের কাছে বসল। অবাক হয়ে দেখলাম, তার লেজটা পুরোপুরি বাদ। লেজের জায়গায় একটা গর্ত-মতো রয়েছে। কুকুরটার জ্বলজ্বলে চোখ। সেই চোখে আমায় দেখছে দেখে ভীষণ ভড়কে গেলুম। কিন্তু ভড়কালে চলবে না। সাহস চাই, প্রচুর সাহস।

বব কুকুরটাকে দেখে বলল,—খুড়ো আশাকরি জিমকে কুকুরের স্বাভাবিক খাদ্য খাওয়ান?

শ্যামখুড়ো জবাব দেবার আগেই জিম করল কী, যেন ববকে দেখাবার জন্য

মুখ বাড়িয়ে ফায়ারপ্লেস থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো কামড়ে নিল। তারপর মুখ কাত করে হাড় চিবুনোর ভঙ্গিতে চিবুতে শুরু করল। অঙ্গারের কুচি চিড়বিড় করে ছিটকে পড়তে থাকল।

এতক্ষণে বব ভীষণ চমকে উঠল এবং তার চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। শ্যামখুড়োর চোখে পড়লে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন,—আঃ, জিম! খায় না, ছিঃ খায় না! বদহজম হবে। তখন সেদিনকার মতো ঘোড়ার নাদির গুলি গিলতে হবে।

জিম বারণ মানল। হয়তো ঘোড়ার নাদির গুলি গিলতে হবে বলেই।

এবার শ্যামখুড়ো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—হুম! তোমার সঙ্গে কতাবার্তা শুরু করা যাক। হ্যাঁ হে, তোমরা ভারতীয়রা নাকি অনেক রকম গুপ্তবিদ্যা জানো—মানে, অকাল্টের কথাই বলছি। একটু নমুনা দেখাও না আমায়?

—খুড়োমশাই, আমি তো কিছু জানি না। করুণ মুখভঙ্গি করে বললুম। আড়চোখে লক্ষ করলুম, ববের ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি ফুটেছে। আমার অবস্থা দেখেই হয়তো বা।

শ্যামখুড়ো বললেন,—জানিনে বললে ছাড়ছিনে বাপু। বলি, আপত্তিটা কীসের? বিদ্যা তো অপরের কাছে জাহির করার জন্যই! বিদ্যা জেনে কি কেউ ঘরে চুপচাপ মুখ বুজে বসে থাকে? কই, ঝাড়ো একখানা নমুনা। ধরো, শূন্যে মাটি ছাড়া হয় বসা—কিংবা জ্বলন্ত আগুনে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকা। যে-কোনওটা।

বেগতিক দেখে বব বলল,—বরং তোমার তাসের ম্যাজিকটা দেখাতে পারো খুড়োকে।

খুড়ো ভুরু কুঁচকে বলল,—ম্যাজিক? ম্যাজিক কে দেখতে চেয়েছে ছোকরা?

তেজী বব বলল,—সবই তো ম্যাজিক। ওই যে অকাল্ট না ফকাল্ট না গুপ্তবিদ্যার কথা বললেন, তা স্রেফ ম্যাজিক ছাড়া কী? একটু আগে আপনার জিমের আগুন খাওয়াটাও তাই। আপনি আসলে একজন ম্যাজিশিয়ান। তা কি বুঝিনি?

—কী বললে? কী বললে? শ্যামখুড়ো রাগের চোটে সটান উঠে দাঁড়ালেন।

—আপনি ম্যাজিশিয়ান। বব অকুতোভয়ে বলল।

আমি ববের দিকে বারবার চোখ টিপছি। এ বিপদের সময় তর্ক করতে নেই। গোঁয়ার বব আমার দিকে তাকাচ্ছেই না। এদিকে শ্যামখুড়ো দাঁত কিড়মিড় করে তাকিয়ে আছেন। গুলি-গুলি চোখ দুটো থেকে দেখতে পাচ্ছি, স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে। তবু হাঁদারাম বব কিছু আঁচ করছে না।

হঠাৎ লিকলিকে আঙুল তুলে খুড়ো চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন,—বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও!

যাচ্ছি।—বলে বব উঠে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

আমি উঠতে যাচ্ছি, খুড়ো আমার কাঁধ চেপে বসিয়ে দিলেন। সারা গা হিম হয়ে গেল। কিন্তু খুড়োর মুখে মিঠে হাসি ফুটেছে তক্ষুনি। বুড়ো আঙুল তুলে ববের

উদ্দেশে বললেন,—কিস্যু জানে না ও ছোকরা। কখনও ওর সঙ্গে আর মিশো না। তুমি আমার কাছে থেকে যাও।

মৃদু আপত্তি করে বললুম,—পরে সময় করে আসব খুড়ো! এখন বরং আমায় যেতে দিন।

এই ঠান্ডায় কোথায় যাবে বাপু? —শ্যামখুড়ো সস্নেহে বললেন,—পাশের ঘরে আরামে ঘুমোতে পারবে। যাকগে, যা নিয়ে কথা হচ্ছিল। কই, শূন্যে বসে থাকাটাই একটু দেখাও।

অগত্যা বললুম,—যখন তখন এ বিদ্যা প্রকাশ করতে নেই খুড়ো। শাস্ত্রে নিষেধ আছে। তিতি-নক্ষত্র এসব দেখে তবে না। পাঁজি দেখে দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে।

খুড়ো বললেন,—তাই বুঝি? ঠিক আছে। তাহলে ওই তো আগুন রয়েছে। অন্তত আগুনে পিঠ রেখে শোয়াটা একবার দেখাও। ওঠো, দেরি কোরো না। টম ডিক হ্যারি এক্ষুনি এসে পড়বে। ওরা এলে আমার অন্য সব কাজকর্ম আছে। ফুরসত পাব না। ওঠো, ওঠো।

আগুনটাও এসময় ফায়ারপ্লেসে কেন কে জানে, দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। আঁতকে উঠলুম। শ্যামখুড়ো লিকলিকে আঙুলে আমাকে খোঁচাতে শুরু করেছেন। পাঁজি তিথি-নক্ষত্রের কথা তুলব কী, ক্রমাগত পাঁজরে ও পেটে খোঁচা খেয়ে কাতুকুতু লাগছে। হি-হি করে হাসি পেয়ে গেল শেষ অব্দি। তখন শ্যামখুড়োও হি-হি করে হাসতে-হাসতে কাতুকুতু বাড়িয়ে দিলেন।

কাতুকুতুর চোটে ফায়ারপ্লেসে গিয়ে ছিটকে পড়ি আর কী, হঠাৎ হইহই করে দরজা দিয়ে তিনটে লোক ঢুকল। তিনজনের হাতেই তিনটে অদ্ভুত লণ্ঠন। হ্যাঁ, এরাই জলার ধারের সেই তারা। শ্যামখুড়ো আমায় ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—পাওয়া গেল?

টম হ্যারি ডিক তুমুল কোলাহল করে জবাব দিল,—পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!

শ্যামখুড়ো বেজায় খুশিতে নাচতে-নাচতে বললেন,—কোথায় পেলি?

ওরা কোরাস গাওয়ার ভঙ্গিতে বলল,—ভোঁদরের গর্তে।

—কাল ব্যাটাকে দেখব। এখন আয় তোরা, জিমকে ধর। লেজটা পরিয়ে দিই।

চারজনে জিমকে নিয়ে ব্যস্ত হল! আর সেই সুযোগে আমি ফুড়ুত করে কেটে পড়লুম দরজা গলিয়ে। তারপর দৌড়, দৌড়, দৌড়। অন্ধকারে কতবার ঠোক্কর খেলুম। রাস্তায় গড়িয়ে পড়লুম। শিশিরে কাদায় পোশাকের অবস্থা যা হল, বলার নয়।

হাইওয়েতে পৌঁছে ভাগ্যিস গাড়িটা পাওয়া গেল। ভেতরে বব নির্বিকার ঘুমোচ্ছিল। ঘুমজড়ানো গলায় বলল,—শুয়ে পড়ো। সকাল অব্দি উপায় নেই।

হাইওয়েতে পুলিশের টহলদারি আছে। শেষরাতে তাদের ডাকে ঘুম ভেঙেছিল। গাড়ির অবস্থা দেখে তাদের অফিসারববকে বলেছিল,—এই ভিনটেজ মালটা ভাগাড়ে

ফেলে দিয়ে নতুন একটা কেনো। বব তাতে রাজি। তাদের গাড়িতেই আমাদের লিফট দিয়েছিল।

পথে বব হঠাৎ জিগ্যেস করেছিল,—গাড়ি খারাপ হওয়া জায়গাটার ওখানে টিলার ওপর কে থাকে বলুন তো? ভারী অদ্ভুত লোক।

অফিসার চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন,—গাঁজা খাও নাকি?

বব খাপ্পা। —সিগারেট খাওয়া নিশ্চয় গাঁজা খাওয়া নয়।

অফিসার একটু হেসে বলেছিলেন,—ও জায়গাটার নাম আংকল স্যামস কেবিন। শ্যামখুড়োর কুটির। বিখ্যাত বই আংকল টমস কেবিনের অনুকরণ। ওখানে শ্যাম নামে একটা লোক থাকত। ভাঙা বাড়িটার সামনে তার কবর দেখেছি। ফলকে মৃত্যুসাল লেখা আছে ১৮৭৫।

বব আমার দিকে চোখ টিপে, কেন কে জানে, শুধু মুচকি হেসেছিল। আমি হাসিনি। ফোঁস করে বড় রকমের একটা নিশ্বাস ফেলেছিলুম। কারণ এই নিয়ে দুবার ফাঁড়া গেছে। একবার বাংলামুল্লুকে, আর এবার মার্কিনমুল্লুকে। তফাতটা শুধু ভাষার।...

বাঁচা-মরা

অনেক বছর পরে গ্রামে যাচ্ছি। ট্রেন লেট করেছিল। স্টেশনে নেমে দেখি শেষ বাস চলে গেছে রাত ন'টায়। এখন বাজছে প্রায় দশটা। গ্রাম ছয় মাইল দূরে। কী করব ভেবে পেলুম না।

কয়েকটা সাইকেল রিকশো দাঁড়িয়েছিল। তাদের সাধাসাধি করলুম। এত রাতে কেউ অত দূরে যেতে রাজি হল না। তখন হতাশ হয়ে একটা চায়ের দোকানে গেলুম চা খেতে।

এমনসময় রোগা হাড়গিলে চেহারার হাফপেন্টুল আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা লোক এসে হঠাৎ বলল,—স্যার কি রিকশো খুঁজছিলেন? কোথায় যাবেন?

—হ্যাঁ। যাব দোমোহানী।

—আসুন তবে। নিয়ে যাই। চণ্ডীতলার একজন পেসেঞ্জার পেয়েছি। পথে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। ওই দেখুন আমার রিকশো। আনন্দে লাফিয়ে উঠলুম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলুম, একটু তফাতে গাছতলায় একটা রিকশো দাঁড়িয়ে আছে। তাতে একজন লোক গুটিসুটি বসে আছে। গাছের পাতার ফাঁকে কুচিকুচি আলো পড়েছে মাছের আঁশের মতো। পাঞ্জাবি-ধুতিপরা লোকটাকে প্রৌঢ় বলে মনে হল। কোলে একটা ব্যাগও আছে। চুপচাপ বসে আছে।

শিগগির চা খেয়ে আসুন। —বলে রিকশোওলা চলে গেল। ভাড়ার কথা তোলার ইচ্ছে হল না। যা চায় দেব। এমন বিশ্রি অবস্থায় কখনও পড়িনি। আর

স্টেশনটা এমন অখাদ্য জায়গায়, বাজার বা বসতি মাইলটাক দূরে। সেখানে গিয়েও যে রাতের আশ্রয় পাব, ভরসা নেই।

চা-ওলা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এতক্ষণে বলল,—স্যার, ওহিদের রিকশোয় যাবেন না। বরং ওই সিংহবাহিনীর মন্দিরে যান। ধর্মশালা আছে।

আমি জানি, হিন্দু মন্দিরে অথবা ধর্মশালায় আমাকে থাকতে হলে জাত ভাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সে মিথ্যাচারিতা সম্ভব নয়। তাই বললুম—থাক। কিন্তু ওর রিকশোয় গেলে ক্ষতি কী বলুন তো?

চা-ওলা চাপা গলায় বলল,—আপনি নতুন লোক বলেই বলছি। ওহিদ ওর রিকশোয় মড়া বয়।

হেসে বললুম,—মড়া বয়? আমি ভাবলাম বুঝি চোর-ডাকাত!

—না না। লোক খুব ভালো। তবে দোষের মধ্যে ব্যাটা রিকশোয় মড়া বয়। তাই চেনা-জানা কেউ ওর রিকশোয় চাপে না। চা-ওলা ফের ষড়যন্ত্রসংকুল গলায় বলল,—রাত বিরেতে মড়াবওয়া রিকশোয় চাপতে নেই। আমি একবার ভারি বিপদে পড়েছিলুম জানেন? আসছিলুম মেয়ের শ্বশুরবাড়ি সেই হরেকেষ্টপুর থেকে। বেয়ানের সঙ্গে একটুখানি কথা কাটাকাটি হয়েছিল! তাই...

ওহিদ রিকশোওলা এসে তাড়া লাগাল,—আসুন স্যার। রাত বেড়ে যাচ্ছে। তক্ষুনি উঠে পড়লুম। চা-ওলা খুব জমিয়ে নিশ্চয় ভূতের গল্প বলতে চাইছিল। বাধা পেয়ে গোমড়ামুখে বসে রইল।

আমার সঙ্গী ভদ্রলোক চোখ বুজে বসে আছে। মনে হল, ঘুমোচ্ছেন। অনেকের এ অভ্যাস থাকে। তাছাড়া যেচে পড়ে কারও সঙ্গে আলাপ করার স্বভাব আমার নেই। রিকশো ধীরেসুস্থে চলেছে। ওহিদ রিকশোওলা তেমন শক্তসমর্থ জোয়ান নয়, তা ওর গঠন দেখেই টের পেয়েছিলুম।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ উঠল। হালকা জ্যোৎস্না ছড়াল পৃথিবীতে। এসব সময়ে এই নির্জন রাতের পথে স্বভাবত ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতা এসে যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয় সজাগ রাখা দরকার। না, ভূতের ভয় দেখিয়েছে বলে নয়, নেহাত চোর-ডাকাতের ভয়েই। ভাবলুম, রিকশোওলার সঙ্গে গল্প করা যাক। তাই বললুম—ওহে, তোমার নাম বুঝি ওহিদ?

রিকশোওলা জবাব দিল,—হ্যাঁ, স্যার।

—তুমি থাকো কোথায়?

—আজ্ঞে, হরিণমারা-গোপপাড়ায়। ইস্টিশনের ওপাশেই আমাদের গাঁ-বলে সে আকাশের দিকে মুখ তুলে হাঁ করে দম নিল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে চাঁদ দেখে ফিরে বলল,—বড় গাঁ, স্যার। ইস্কুল-পোস্টাপিস-থানা-হাসপাতাল সবই আছে।

এরপর সে তার গ্রাম সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিবরণ দিতে থাকল। লোকটির প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে গেল।

এই করে প্রায় মাইলটাক আসা গেল। তারপর বেমক্কা হাসতে-হাসতে বলে বসলুম,—হ্যাঁ, তুমি নাকি এই রিকশোয় মড়া বও?

ওহিদ প্যাডেল থামিয়ে আমার দিকে ঘুরে ফ্যাঁচ করে অদ্ভুত হেসে বলল—নেত্যদা বলল বুঝি? নেত্যদাটা ভারি দুষ্টু। আমার প্যাসেঞ্জারকে ভাঙচি দেয় খালি। কী আর বলব বলুন? এক জায়গায় আড্ডা দিই। তাসটা-আরটা খেলি। বলতে গেলে বন্ধু মানুষ। তা স্যার, ইচ্ছে হলে চলুন আমার গাড়িতে। না ইচ্ছে হলে নেমে যান। ভেবে দেখুন এখনও।

সর্বনাশ! বলে কী? ব্যস্তভাবে বললুম—না, না। মড়া বও তাতে কী হয়েছে?

ওহিদ প্যাডেলে আস্তে চাপ দিয়ে বলল—ইস্টিশনের পেছনে মা গঙ্গা। নানা জায়গার মড়া যায় সেখানে। আমি মড়া বই। দোষ কী বলুন? তিনগুণ ভাড়া পাই। বইব না কেন? জ্যান্ত প্যাসেঞ্জার কি আমায় স্বগগে নিয়ে যাবে?

—ঠিকই তো। বরং মড়া বইলে অনেক পুণ্যি! মড়ারা তো স্বর্গের পথেই পাড়ি জমায়। আগে থেকে চেনা-জানা থাকা ভালো। নেহাৎ পাপ করে থাকলে তাদের কেউ-কেউ স্বর্গে ঢুকতে পায় না। নরকে বেঁধে নিয়ে যায়!

ওহিদ আমার কথায় খুশি হল!—তাহলেই দেখুন! তবে আসল কথা কী জানেন স্যার? মড়া বওয়া সহজ কাজ নয়। সবাই এটা পারে না। ইস্টিশনের যত রিকশোওলা আছে, কারুর কি এ সাধ্যি হতো? হ্যাঁ, পারলে তো সবাই বইত। তিনগুণ বেশি পয়সা পেত। কিন্তু মুরোদে কুলোয় না বলেই হিংসে করে আমায়।

—তাই বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মড়া পেসেঞ্জার নিয়ে রিকশোর প্যাডেল ঘোরানো সোজা নয়। শালারা কি ভেতরে-ভেতরে চেষ্টা করেনি কেউ? সব জানি বাবা। পারেই নি। একবার গোবর্ধন রেতের বেলায় চুপি-চুপি মড়া চাপিয়েছিল। পরদিন সকালে দেখি, রিকশো নয়নাজুলির জলে উলটে পড়ে আছে মড়া সুদ্ধ। সে এক কেলেঙ্কারি।

ওহিদ খুব হাসতে লাগল। আমি বললুম,—গোবর্ধনের কী হল?

—গোবর্ধন বেগতিক বুঝে রিকশোর সিট থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছিল। তাই রক্ষে। তো সেই থেকে সে মড়া দেখলে সরে যায় তফাতে।

—তা ওহে ওহিদ, তুমি কীসের জোরে মড়া বইতে পারো বলো তো শুনি?

—ওহিদ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একটু পরে বলল,—আমি নিজেই এক মড়া।

—তার মানে?

—মড়া বইকী। কারণ, আমাকে একবার জানঘরে দিয়েছিল।

—জানঘর! সে আবার কী?

—বলতে গেলে সে বড্ড দুঃখের কথা স্যার। আমার পেটে শূলের ব্যামো হয়েছিল। সদর হাসপাতালে ভর্তি হলুম। দেখে থাকবেন। হাসপাতালের একধারে একটা আলাদা ঘর থাকে। রুগি মারা যাবে টের পেলে কিংবা মারা গেলে সেই ঘরে রেখে আসে। তাকে বলে জানঘর। তো আমাকে সেই জানঘরে রেখে এসেছিল ডাক্তারবাবু।

—বলো কী? তারপর?—ডাক্তারবাবু আমার নাড়ি খুঁজে পায়নি। খাবি খেতে-খেতে মারা পড়েছিলুম।

—অ্যাঁ! সর্বনাশ!

—আজ্ঞে খোদার কসম। তো রোজ সকালে বউ খোঁজ নিতে যায় আর আমায় গালমন্দ করে আসে। এভাবে হাসপাতালে পড়ে থাকলে সংসারী লোকের চলে? ছেলেপুলে উপোস করে মরছে যে! বউ ভারি চটে গিয়েছিল। রোজ এসে বলত—মিনসের সব চালাকি! রিকশো টানতে আলস্যি। তাই হাসপাতালে এসে মিছিমিছি পড়ে আছে। টাইমে-টাইমে দিব্যি পেটপুরে খেতে পাচ্ছে। বউ রোজ গিয়ে গালাগালি করত। আমায় জানঘরে দেওয়া শুনে বউ আরও চটে গেল। বাড়ি থেকে একটা মুড়ো ঝাঁটা এনে জানঘরের দরজায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলল,—ন্যাকামির আর জায়গা পাওনি? ওঠো, ওঠো বলছি। পড়ে আছো আর এখানে আমরা উপোস করে মরছি। না ওঠো তো, পিঠের চামড়া ঝাঁঝরা করে দেব। এই বলে যেই ঝাঁটা তুলেছে, আমি স্যার তড়াক করে উঠে পড়েছি।

—সর্বনাশ!

—সর্বনাশ বলে সর্বনাশ! আমার বউকে তো স্যার দেখেননি।

—তারপর কী হল?

—দেখতেই পাচ্ছেন। রিকশোয় প্যাডেল ঘোরাচ্ছি। সে হাঁ করে দম নিয়ে ফের চাঁদটা দেখার পর বলল,—আমি জানঘর থেকে পালিয়ে আসা মড়া, স্যার। আমি কেন মড়ার ভয় পাব বলুন?

সে ফ্যাঁচ করে অদ্ভুত হাসল এবার। এতক্ষণে তার মুখের একটা পাশ, একটা চোখ অব্দি দেখতে পেলুম ফিকে জ্যোৎস্নায়। নীল ঝকঝকে ওই চোখ কি জ্যান্ত মানুষের? আমার গা ছমছম করল।

এই সময় হঠাৎ দেখি, আমার সঙ্গী যাত্রীটিও এতক্ষণে একটু নড়লেন এবং গলার ভেতর খিকখিক করে হেসে উঠলেন। চোখও খুললেন।

ভয়ে ভয়ে বললুম,—কী হল মশাই? হাসছেন কেন?

ভদ্রলোক ভারি গলায় বললেন,—কে জ্যান্ত কে মড়া বোঝা ভারি কঠিন। এই আমায় দেখছেন, বলুন তো আমি জ্যান্ত না মড়া?

—মড়ারা কথা বলে না। আপনি তো দিব্যি কথা বলছেন?

—বলে মশাই, বলে। আপনি জানেন না, সে আলাদা কথা। বলে ভদ্রলোক ফের খিকখিক করে হাসতে থাকলেন।

পাগল নাকি? বললুম—নিজেকে বুঝি আপনি মড়া ভাবেন?

—ভাবব কী মশাই? আমি যে সত্যি-সত্যি মড়া!

—বলেন কী?

—হুঁউ! ওই যে ওহিদ বলল, সে জানঘর থেকে পালিয়ে এসেছিল বউয়ের ঝাঁটার ভয়ে। আমিও আজ জানঘর থেকে পালিয়ে এসেছি জানেন?

—আপনিও কি বউয়ের ভয়ে পালিয়ে এসেছেন?

ভদ্রলোক জোরে ঘাড় নেড়ে বললেন—নাঃ! আমার মশাই বউটউ নেই।

—তাহলে?

—ডাক্তারবাবুর ভয়ে। মশাই সবে মারা গেছি—ডাক্তারবাবু কিনা ইয়াবড় ছুরি বাগিয়ে আমাকে টুকরো-টুকরো করে কাটার ফন্দি এঁটেছেন।

—পোস্টমর্টেম বলুন।

—ঠিক বলেছেন। তো যেই ছুরিটা আমার বুকের দিকে এনেছেন, অমনি একলাফে উঠে ডাক্তারবাবুকে ধাক্কা মেরে হটালুম। কারা চেঁচাল, ধর ধর। পালাচ্ছে, মড়া পালাচ্ছে। আমি ততক্ষণে পগার পার। বাপস, আর ভুলেও হাসপাতালে নয়।

ভদ্রলোক খিকখিক করে ফের হাসলেন। ওহিদ সায় দিয়ে বলল,—কখনও নয়। ভাগ্যিস, মারা গিয়েছিলুম বলেই না উচিত শিক্ষেটা হল।

ভদ্রলোক হাসি থামিয়ে আমার দিকে ঘুরে বললেন,—যাকগে। এবার আপনারটা শোনা যাক।

—আমার কী?

—লজ্জা কীসের মশাই? লুকোছাপা করে আর কী লাভ বলুন? এখানে তো কোনও জ্যান্ত মানুষ নেই। প্রাণ খুলে বলে ফেলুন, আপনি কীভাবে...

—কী মুশকিল! আমি হাসপাতালেও যাইনি। আপনাদের সেই জানঘর কিংবা লাসকাটা ঘরেও আমায় ঢোকানো হয়নি। আমি যাচ্ছি অনেক বছর পরে জন্মভূমি দেখতে।

ভদ্রলোক ধমক দিলেন,—চালাকি হচ্ছে? আমরা মড়া চিনি না? কী রে ওহিদ, বল না বাবা!

ওহিদ ফ্যাঁচ করে হাসল। —স্যারকে দেখেই চিনেছিলুম। নইলে কেনই বা নিজে গিয়ে সাধব?

রেগে গিয়ে বললুম,—আমি মড়া নই, জ্যান্ত মানুষ। নাড়িটা টিপে দেখুন না।

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন,—হ্যাঁরে ওহিদ, তাহলে কি ভুল করেছিস বাবা?

ওহিদ জোর গলায় বলল,—আমার ভুল হতেই পারে না। এতকাল মড়া ঘাঁটছি।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বললেন—দেখি, আপনার নাড়ি দেখি। বলে খপ করে আমার হাতের কব্জি ধরে ফেলতেই টের পেলুম, কী ঠান্ডা বরফের মতো ওঁর হাতটা। আর চোখের ওই দৃষ্টি—আবছা জ্যোৎস্নায় জ্বলজলে নীল দুই চোখের দৃষ্টি।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলন্ত রিকশো থেকে লাফ দিলুম। আছাড় খেয়েই উঠে পড়লুম! তারপর দিগ্বিদিক না দেখে দৌড়-দৌড়। পেছনে ওরা চেঁচাতে থাকল—ধর ধর। পালাল পালাল।

স্টেশনের আলো লক্ষ করে দৌড়াচ্ছিলুম। হাঁফাতে-হাঁফাতে যখন সেই চায়ের দোকানে পৌঁছলুম, বিজ্ঞ চা-ওলা হেসে বলল,—জানতুম। তখন নিষেধ করলুম,—শুনলেন না। সোজা ধর্মশালায় চলে যান। সকালে রওনা হবেন।

অন্ধকারে রাতবিরেতে

কেকরাডিহি যেতে হলে ভামপুর জংশনে নেমে অন্য ট্রেনে চাপতে হবে। কিন্তু ভামপুর পৌঁছতেই রাত এগারোটা বেজে গেল। ট্রেন ঘণ্টাছয়েক লেট। খোঁজ নিয়ে জানলুম, কেকরাডিহি প্যাসেঞ্জার রাত ন'টায় ছেড়ে গেছে। পরের ট্রেন সেই ভোর সাড়ে-পাঁচটার আগে নয়।

কনকনে ঠান্ডার রাত। এরই মধ্যে জংশন স্টেশন একেবারে ঝিম মেরে গেছে। তাছাড়া, তেমন কিছু বড় জংশনও নয়। লোকজনের ভিড় এমনিতে কম। চায়ের দোকানি ঘুমঘুম গলায় পরামর্শ দিল,—পাঁচ লম্বর পেলাটফরমে কেকরাডিহির টেরেন রেডি আছে। চোলিয়ে যান। আরামসে জুত করুন।

শুনে তো লাফিয়ে উঠলুম আনন্দে। ওভারব্রিজ হয়ে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেখি, সত্যি তাই। ইঞ্জিনবিহীন একটা ট্রেন কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্ল্যাটফর্মে জন মানুষটি নেই। মাথার ওপর ছাউনি বলতেও কিছু নেই। একফালি চাঁদ নজরে পড়ল, শীতে তার চেহারাও খুব করুণ।

কিন্তু যে কামরার দরজা খুলতে যাই, সেটাই ভেতর থেকে আটকানো। জানলাগুলোও বন্ধ। বুঝলুম ভেতরে বুদ্ধিমান লোকগুলো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রচুর লোক জমে উঠেছে! দরজা খুলে তা বরবাদ করার ইচ্ছে নেই কারুর। অবশ্য চোর-ডাকাতের ভয়ও একটা কারণ হতে পারে। দরজা টানাটানি করে কোথাও কোনও সাড়া পেলুম না।

হন্যে হয়ে শেষদিকটায় গিয়ে শেষ চেষ্টা করলুম। তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। চ্যাঁচামেচি করে বললুম,—দরজায় বোমা মেরে উড়িয়ে দেব বলে দিচ্ছি। আমার কাছে বোমা আছে কিন্তু!

এই শাসানিতেই যেন কাজ হল। একটা জানালা একটু খুলে গেল। তারপর ভারি গলায় কে বলল,—কী আছে বললেন?

কথাটা চেপে গিয়ে বললুম,—আহা, দরজাটা খুলুন না। ঠান্ডায় জমে গেলুম যে!

ভেতরের লোকটি বলল,—বোমা না কী বলছিলেন যেন?

আরে না, না। —হাসবার চেষ্টা করে বললুম,—ওটা কথার কথা। দয়া করে দরজাটা খুলে দিন।

—মাথা খারাপ মশাই? বোমাওয়ালা লোককে ঢুকিয়ে শেষে বিপদে পড়ি আর কী! বোমা মারতে হয়, অন্য কামরায় গিয়ে মারুন। আমি ঝামেলা ভালোবাসি না।

লোকটা জানালার পাল্লা নামিয়ে দিল দমাস শব্দে। অদ্ভুত লোক তো! রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে কী করব ভাবছি, সেই সময় গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখলুম। এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় গুনগুনিয়ে গান গেয়ে

কেউ আমারই মতো এক বগি থেকে আরেক বগি পর্যন্ত টুঁ মেরে বেড়াচ্ছে বুঝি। মিটমিটে আলোয় লোকটির চেহারা নজরে এল। ঢ্যাঙা, হনুমান-টুপিপরা লোক। গায়ে আস্ত কম্বল জড়ানো। লম্বা বিরাট একটা নাক ঠেলে বেরিয়েছে মুখ থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল আমাকে দেখে। তারপর খি-খি করে হাসল। —ঢোকার ছিদ্র পেলেন না বুঝি? মশাই, এ লাইনের ব্যাপারই এরকম। সেজন্য সূচ হয়ে ঢুকতে হয়। তারপর দরকার হলে ফাল হয়ে বেরুন না কেন?

কথার মানে কিছু বুঝলুম না। পাগল-টাগল নয় তো? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বলল,—আপনি দেখছি একেবারে কচি খোকা! বুঝলেন না কথাটা?

ঠান্ডার রাত। জনহীন প্ল্যাটফর্মে পাগলকে ঘাঁটানো উচিত হবে না। বললুম,—বুঝলুম বইকী!

কচু বুঝেছেন! এই দেখুন, সুচ হয়ে কেমন করে ঢুকতে হয়। —বলে লোকটার সামনেকার একটা জানালা খামচে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওপরে ওঠাল।

তারপর আমাকে হকচকিয়ে দিল বলা যায়। জানালায় গরাদ আছে। অথচ কী করে সে তার অতবড় শরীরটা নিয়ে ভেতরে গলিয়ে গেল কে জানে! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কিন্তু তারপরেই ভেতরে গণ্ডগোল বেধে গেছে। আগের লোকটা চেঁচিয়ে উঠেছে খ্যানখেনে গলায়,—এ কী মশাই! এ কী করছেন? একি! একি! আরে...

এবং কামরার দরজা প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল। সম্ভবত আগের লোকটাই বোঁচকাবুঁচকি-বিছানাপত্র নিয়ে একলাফে নিচে এসে পড়ল। তারপর দুদ্দাড় শব্দ করে ওভারব্রিজের সিঁড়ির দিকে দৌড়ুল।

দেখলুম, একটা বালিশ ছিটকে পড়েছে প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু আর ফিরেও তাকাল না এদিকে। এবার সুচ-হওয়া লোকটিকে দেখতে পেলুম দরজায়। খিকখিক করে হেসে বলল,—বেজায় ভয় পেয়ে গেছে। যাক গে, ভালোই হল। আসুন, আসুন। এক্ষুনি আবার কেউ এসে হাজির হবে। আর শুনুন, ওই বালিশটা কুড়িয়ে নিয়ে আসুন। আরামে শুতে পারবেন।

বালিশটা কুড়িয়ে নিলুম। ঠিকই বলেছে। বালিশটা শোয়ার পক্ষে আরামদায়কই হবে। এর মালিক যে আর এদিকে এ-রাতে পা বাড়াবে না, সেটা বোঝাই যায়। ব্যাপারটা যাই হোক, ভারি হাস্যকর তো বটেই।

কামরার ভেতরটা ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। লোকটা দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে ছিটকিনি নামিয়ে আটকে দিল। দেশলাই জ্বেলে একটা খালি বার্থে বসে পড়লুম। লম্বানেকো লোকটা বসল পাশের বার্থে! তারপর আগের মতো খিকখিক করে হেসে বলল,—খুব জব্দ হয়েছে। একা পুরো একটা কামরা দখল করে বসে ছিল ব্যাটাচ্ছেলে!

আমিও একচোট হেসে বললুম,—ডাকাত ভেবেই পালিয়েছে, বুঝলেন!

—উঁহু, ডাকাত ভাবেনি। অন্য কিছু ভেবে থাকবে।

—কিন্তু আপনি গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকলেন কী করে বলুন তো?

—কিচ্ছু কঠিন নয়। সে আপনিও পারেন। তবে তার আগে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে।

আগ্রহ দেখিয়ে বললুম,—কী কষ্ট?

লোকটা অন্ধকারে অদ্ভুত শব্দে হাই তুলে বলল,—যাকগে ওসব কথা। বললেনও কি আপনি সে কষ্ট করবেন?

—কেন করব না? অমন সরু ফাঁক গলিয়ে ঘরে ঢোকাটা যে ম্যাজিক মশাই। আমার ধারণা, আপনি একজন ম্যাজিশিয়ান।

—তা বলতে পারেন। তবে আমার এখন ঘুম পাচ্ছে।

অন্ধকারে নড়াচড়ার শব্দ হল। বুঝলুম ম্যাজিশিয়ান লোকটা শুয়ে পড়ল। বালিশটা পেয়ে আমার ভালোই হয়েছে। আমিও শুয়ে পড়লুম। কিন্তু অন্ধকারটা অসহ্য লাগছিল। দম আটকে যাওয়ার দাখিল। তা ছাড়া, বদ্ধ জায়গায় শোওয়ারও অভ্যাস নেই। তাই একটু পরে উঠে পড়লুম। মাথার কাছের জানালাটা যেই ওঠাতে গেছি, লোকটা হাঁ-হাঁ করে উঠল। —করেন কী, করেন কী। সূচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুনোর মতো লোকের অভাব নেই বুঝতে পারছেন না? অসুবিধেটা কীসের?'

—দেখুন, বদ্ধ ঘরে আমার দম আটকে যায়। বরং একটু ফাঁক করে...

কথা কেড়ে লোকটা খাপ্পা মেজাজে বলল,—ধ্যাতমশাই! বললুম না? আবার কে এসে ঢুকবে, তখন আমারই ঝামেলা হবে। আপনার আর কী! বন্ধ করুন বলছি।

অগত্যা ফের শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুমের দফারফা হয়ে গেছে। বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে অস্বস্তি, তার ওপর প্রচণ্ড হিমকাঠ পিঠের তলায়। সঙ্গে গরম চাদরও নেই। প্যান্ট-কোট হিমে বরফ হয়ে গেছে। পাশের লোকটার গায়ে কম্বল। তাই আরামে ঘুমোচ্ছে। নাকও ডাকছে।

কতক্ষণ পরে চুপিচুপি উঠে বসলুম। হাত বাড়িয়ে মাথার কাছের জানালার পাল্লাটা প্রায় নিঃশব্দে ঠেলে ইঞ্চি-দুই ফাঁক করে রাখলুম। তারপর শুয়ে পড়লুম ফের। এবার বদ্ধ ঘরের সেই অস্বস্তিটা কেটে গেল।

হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কখন। হঠাৎ কী একটা দুদ্দাড় শব্দে উঠে বসলুম দুড়মুড় করে। কামরা আগের মতো ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। জানালার সেই ফাঁকটা আর নেই। কিন্তু ভেতরে একটা ধস্তাধস্তি বেধেছে যেন। কে, কে—বলে চেঁচিয়ে উঠে দেশলাই হাতড়াতে থাকলুম। খুঁজে পাওয়া গেল না। ওদিকে দরজাটা দমাস করে খুলে গেল। বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। কে যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমার পাশের বার্থে কেউ এসে বসল। বললুম,—কী ব্যাপার বলুন তো?

—কিছু না। আপনি শুয়ে পড়ুন। কেকরাডিহি লাইনে এমন হয়েই থাকে।

কণ্ঠস্বর শুনে একটু চমকে উঠলুম। পাশের বার্থের লোকটার গলার স্বর ছিল একটু খ্যানখেনে। এটা কেমন গুরুগম্ভীর যেন। দেশলাইটা খুঁজে পাওয়া গেল এতক্ষণে। সিগারেট ধরানোর ছলে কাঠি জ্বেলে সেই মিটমিটে আলোয় যাকে দেখলুম, সে অন্য

লোক। তবে তার গায়ের কম্বলটা আগের লোকেরই মনে হচ্ছে। এ লোকটার নাক বেজায় চ্যাপ্টা। তাছাড়া, মুখে একরাশ গোঁফদাড়ি। মাথার টুপিটাও অন্য রকম। গম্ভীর স্বরে বলল,—কী দেখছেন?

অবাক হয়ে বললুম,—আগের ভদ্রলোক কোথায় গেলেন বলুন তো?

—কেন? আমাকে কি সঙ্গী হিসেবে পছন্দ হচ্ছে না?

—না না—মানে, বলছিলুম কী, আপনিও কি জানালার ফাঁক গলিয়ে ঢুকেছেন?

—ঠিক তাই। বুঝলেন না? যা ঠান্ডা পড়েছে!

—তা পড়েছে। কিন্তু আপনিও দেখছি একজন ম্যাজিশিয়ান।

—তা বলতেও পারেন।

—আগের ভদ্রলোক কোথায় গেলেন?

হ্যা হ্যা করে হেসে নতুন সঙ্গী বলল,—বেজায় ভয় পেয়ে পালিয়েছে। ব্যাটাচ্ছেলে কাতুকুতুতে ওস্তাদ। কিন্তু আমি কী করি জানেন তো? কামড়ে দিই। আপনি?

আমি? আমি কিছুই পারি না।—বলে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। সিগারেটের আগুনে ঘড়ির কাঁটা দেখে নিলুম। দুটো পাঁচ। আর ঘণ্টাতিনেক এসব উপদ্রব সহ্য করে কাটাতে পারলে আর চিন্তা নেই। ঘুম আর এসে কাজ নেই।

পাশের নতুন সঙ্গীর কিন্তু নড়াচড়ার শব্দ নেই। শুয়ে পড়লে টের পেতুম। তাই একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ওই যে বলল কামড়ে দেওয়ার স্বভাব আছে! হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে দেবে না তো? ভাব করার জন্যে বললুম,—কী? শুতে ইচ্ছে করছে না?

প্রকাণ্ড হাই তোলার শব্দ করে বলল,—নাঃ। আপনি ঘুমোন।

—ঘুম আসছে কই? বদ্ধ ঘরে আমার দম আটকে যায়। সম্ভবত, জানালা খুললে আপনারও আপত্তি হবে। কাজেই...

—না, না। আপত্তির কারণটা বুঝলেন না? আবার কেউ ঢুকে গণ্ডগোল বাধাবে যে।

—আগের ভদ্রলোক বলছিলেন, জানালার গরাদ গলিয়ে ঢোকা শিখতে হলে নাকি একটু কষ্ট করতে হবে। কিন্তু কষ্টটা কী, সেটা চেপে গেলেন। আপনি বলতে পারেন ব্যাপারটা কী?

—খুব পারি। তবে আপনি ভয় পাবেন যে!

—মোটেও না। দেখুন না, আমি কি ভয় পেয়েছি?

হ্যা হ্যা করে হাসল সে। —যাক ওসব কথা। আপনার সিগারেট খাওয়া দেখে লোভ হচ্ছে। একটা সিগারেট দিন, টানি।

সিগারেট দিয়ে দেশলাই-কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দিতে গিয়ে আবার চমকে উঠলুম। আরে, এ তো সেই গোফঁদাড়িওলা লোকটা নয়। কুমড়োর মতো মুখ, চকচকে টাক—এ আবার কখন এল?

কিন্তু তক্ষুনি গণ্ডগোল বেধে গেল। পাশ থেকে কে চেঁচামেচি করে বলল,—এই মশাই। আমার সিগারেট আপনি টানছেন যে। জিগ্যেস করুন তো ওঁকে, কে সিগারেট চাইল।

ফস করে আবার কাঠি জ্বাললুম দেখি, গোঁফদাড়িওলা লোকটি কুমড়োমুখো লোকটির পাশে বসে আছে। তার মুখে-চোখে রাগ ঠিকরে বেরুচ্ছে। ঘাবড়ে গিয়ে বললুম,—কী মুশকিল। আপনি আবার কীভাবে ঢুকলেন?

নতুন লোকটি অদ্ভুত হেসে বলল,—আমি আগে থেকেই ছিলুম। অনেকক্ষণ থেকে সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছিলুম। সাহস করে আসতে পারছিলুম না। এ ভদ্রলোকের যে কামড়ে দেওয়া অভ্যেস।

গোঁফদাড়ি হেঁড়ে গলায় বলল,—এবার যদি কামড়ে দিই।

—সিগারেটের ছ্যাঁকা দেব। আসুন না কামড়াতে।

বিবাদ মিটিয়ে দিতে বললুম,—আহা, ঠান্ডার রাতে কামড়া-কামড়ি ভালো কাজ নয়। নিন, আপনিও একটা সিগারেট নিন।

আমি আবার পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। চোখ দুটো পাশের বার্থের দিকে। দুটো সিগারেট জ্বলজ্বল করে জ্বলছে অন্ধকারে। এবার কেন কে জানে, ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে যাচ্ছিল। তারপর কখন সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছি।

হইহট্টগোলে সেই ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখি কামরা জুড়ে একদঙ্গল লোক। বোঁচকাবুঁচকিও কম নেই। এখন আলো জ্বলছে। জানালাগুলো হাট করে খোলা এই রে! সর্বনাশ হয়েছে তাহলে। গরাদ গলিয়েই পিলপিল করে এরা বুঝি ঢুকে পড়েছে। ধুড়মুড় করে উঠে বসলুম। অমনি খালি জায়গা পেয়ে একদল লোক হইহই করে এসে বসে পড়ল। দুজনকে সিগারেট দিয়ে সামলেছি, এতজনকে কীভাবে সামলাব ভেবে খুব ভয় পেয়ে গেলুম।

কিন্তু তারপর চোখ গেল দরজার দিকে। দরজা খোলা। অতএব এরা তারা নয়। তাদের তন্নতন্ন করে খুঁজে পেলুম না। তারা কোথায় গেল, গোঁফদাড়ি এবং কুমড়ো—অর্থাৎ সেই অন্ধকারের ম্যাজিশিয়ানরা?

আমার মাথার তলা থেকে বালিশটাও উধাও। যাক গে, একটা অভিজ্ঞতা হল তাহলে। টিকিটের ঘণ্টা দিচ্ছিল। পাঁচটা বাজে।

কেকরাডিহির দণ্ডীবাবা

কে বলরাম বলল,—যখন-তখন গেলেই হল না মাঠান! বারবেলা তিথি নক্ষত্র বলে কথা আছে না? ঠিক সময় গেলে তবে দর্শন পাবেন।

রাঙা পিসিমা মুখ ভার করে বললেন,—যখনই বলি, তোর খালি ওই এক কথা। এদিকে রোগ বাড়তে-বাড়তে মাথায় ঠেকেছে। কখন একটা কিছু সর্বনাশ হয়ে

গেলেই হল। বাড়ির লোকের আর কী? আমার মরার পথ তাকিয়েই আছে সবাই। হাড় জুড়ুবে সব্বাইকার!

এমন কথা শুনে আর চুপ করে থাকা যায় না। বললুম,—ও কী বলছেন পিসিমা। চলুন, আজই আপনাকে নিয়ে বেরুব।

কেবলরাম মাথা চুলকোতে-চুলকোতে মুখ বেজার করে বেরিয়ে গেল। পিসিমা আশ্বস্ত হয়ে লাঠি ঠুক ঠুক করে নিজের ঘরে গেলেন। কোণার দিকে চেয়ারে বসে ভবভূতি চুরুট টানছিলেন আর পুরোনো কাগজ পড়ছিলেন। এবার বললেন,—কারও অসুখ-বিসুখ করেছে মনে হচ্ছে?

বললুম,—আবার কার? রাঙা পিসিমার।

—কী অসুখ?

—বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

—ধুস! লক্ষণ-টক্ষণগুলো কী?

—এই ধরুন, রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় না। যেটুকু হয়, সেটুকু নাকি ভয়ঙ্কর স্বপ্নে ভরা। কখনও দেখেন, রাক্ষস আসছে হাঁ করে তেড়ে। কখনও দেখেন, সাতটা ভালুক এসে দাঁত বের করে বেজায় ঝগড়াঝাঁটি করছে। এইসব আর কী!

ভবভূতি একটু হেসে বললেন,—ও কিছু না। বদহজম। হজমি ওষুধ খাইয়ে দিও।

বিরক্ত হয়ে বললুম,—হজমি ওষুধ! গিয়ে দেখুন না ঘরভর্তি খালি নানারকম হজমি ওষুধের শিশি।

ভবভূতি চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—তোমার পিসিমার বয়স হয়েছে তো! এ বয়সে অমন হয়েই থাকে। আমার বারাসতের মাসিমার অবস্থা দেখলে তো চমকে উঠতে। বেশ বসে আছেন। হেসে কথা বলছেন। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠতেন, কী রে বংশীবদন? চল্লি কোথায়? জিগ্যেস করলে বলতেন, ওই আমাদের ঘুঘুডাঙার বংশী। বড় ভালো ছেলে ছিল। আহা! সাপের কামড়ে এই বয়সেই বেচারা মারা পড়ল।

ভবভূতি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন,—তা পিসিমাকে কোথাও নিয়ে যাবে বুঝি? কোনও বড় ডাক্তারের সন্ধান পেয়েছ?

ভবভূতিবাবু লোকটিই এমন। কান করে কিছু শোনে না। বললুম,—পেয়েছি।

—কোথায় শুনি?

—কেকরাডিহিতে।

—কেকরাডিহি? সে আবার কোথায় হে?

—কেবলরামের দেশ।

ভবভূতি নাক সিঁটকে বললেন,—হুঃ! নিশ্চয় বেহদ্দ পাড়াগাঁ। তোমাদের কেবলচন্দ্রটিকে দেখলেই বোঝা যায়, তার দেশটা কেমন। তা সেখানে বুঝি কোনো ওঝাটোঝার খবর পেয়েছ?

—কতকটা তাই জ্যাঠামশাই। তবে তিনি মানুষ নন।

ভবভূতি চমকে উঠে বললেন,—অ্যাঁ! মানুষ নন! তবে কী

—পক্ষী।

পক্ষী! মানে পাখি? —ভবভূতি খিকখিক করে হাসতে লাগলেন। —পাখি করবে মানুষের চিকিৎসা! ওই ব্যাটা কেবলচন্দ্রটা বলেছে বুঝি? যেও না হে, মারা পড়বে।

গম্ভীর হয়ে বললুম,—না জ্যাঠামশাই! ব্যাপারটা বলি শুনুন। কেকরাডিহি গ্রামের কাছে একটা পোড়ো মাঠ আছে নাকি। সেখানে মাঝে-মাঝে একটা দাঁড়কাক আসে কোত্থেকে। মানুষের ভাষায় কথা বলে। রোগিদের রোগের কথা শুনে ওষুধ দেয়। কীভাবে খেতে হবে, তাও বলে দেয়।

ভবভূতি আরও হেসে বললেন,—দাঁড়কাকটার সঙ্গে একটা ওষুধের বাকসোও থাকে বুঝি?

—না, না। কথাটা শুনুন আগে। রোগের কথা আঁতিপাতি জিগ্যেস করে দাঁড়কাকটা উড়ে যায়। চক্কর মেরে কোত্থেকে ঠোঁটে করে একটা শেকড়বাকড় নিয়ে আসে।

ভবভূতির চুরুট নিভে গিয়েছিল! ফের দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে ঠোঁটে চুরুট থাকা অবস্থায় বললেন,—গাঁজা! তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—গুল! শেষে বললেন,—বেঘোরে মারা পড়বে। যেও না।

তারপর যেন খাপ্পা হয়েই বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু দুপুরবেলা যখন গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছি সবে, দেখি ভবভূতি সেজেগুজে হন্তদন্ত হয়ে হাজির। মাথায় ফেল্ট টুপি, গায়ে বুশশার্ট, পরনে ব্রিচেসের মতো আঁটো প্যান্ট, পায়ে হান্টিং বুট এবং কাঁধে কিটব্যাগ, পিঠে বন্দুক। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে একগাল হেসে বললেন,—চলো, আমিও যাই সঙ্গে। অনেকদিন শিকার-টিকার করিনি। হাতটা সুড়সুড় করছে।

রাঙাপিসিমা খুশি হয়ে বললেন,—ভবদাকে পেয়ে মনে জোর এল। পাড়াগাঁয়ে আজকাল বড্ড নাকি ডাকাতের উপদ্রব।

ভবভূতি নাদুস-নুদুস ভুঁড়িওয়ালা প্রকাণ্ড মানুষ—কিন্তু বেজায় বেঁটে। আমার পাশে বসে বললেন,—ক্যাবলা, পেছনে যা। কেবল পেছনে পিসিমার কাছে গিয়ে বসল। তারপর ভবভূতি বললেন,—হ্যাঁ রে কেবলচন্দ্র, তোদের ওখানে বাঘ-টাঘ নেই?

কেবলরাম একগাল হেসে বলল,—নেই কী, তাই বলুন ছার।

'ছার' শুনে রাঙাপিসিমা খিকখিক করে হেসে উঠলেন। আমার ভালোই লাগল। অনেককাল পিসিমাকে হাসতে দেখিনি। ভবভূতি বললেন,—বাঘ আছে বলছিস? কিন্তু বাঘ মারা আজকাল যে বেআইনি। বাঘ মারব না। বরং দু-চারটে পাখিটাখি মারব।

কেবলরাম ভয় পাওয়া গলায় বলল,—কক্ষনো ও কাজ করবেন না ছার! দণ্ডীবাবা খেপে যাবেন। শাপ দেবেন। শাপে কী হবে জানেন ছার?

ভবভূতি গোঁফ পাকিয়ে বললেন,—কী হবে শুনি!

—মাথার সব চুল উড়ে যাবে।

ভবভূতি নিজের মাথার প্রকাণ্ড টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—ধুস! আমার তো চুলই নেই! পেছনে কয়েকগাছা আছে—যায় তো তাও যাক। ক্ষতি কীসের?

আমাদের গাড়ি শহর ছাড়িয়ে নদীর ব্রিজে পৌঁছল। তারপর ফাঁকা রাস্তা একেবারে। সারা পথ ভবভূতি কেবলরামের সঙ্গে রসিকতা করতে-করতে চললেন। পিসিমা খুব হাসলেন। তার ফলে কেকরাডিহির দণ্ডীবাবার প্রতি আমার ভক্তিটা ক্রমশ বেড়ে গেল। এই হাসিখুশিটা খুব শুভ লক্ষণ বইকী।

মাইল দশেক চলার পর কেবলরাম বলল,—এবার কাঁচা রাস্তা দাদাবাবু!

কাঁচা মানে কাঁচা। জীবনে এমন অখাদ্য রাস্তায় কখনও গাড়ি চালাইনি। ভয় হচ্ছিল, গাড়ি না বিগড়ে যায়। আরও মাইল চারেক এগিয়ে পড়ল বাঁদিকে একটা বিশাল ডাঙাজমি। ঘুটিং কাঁকড় যত, তত ছোটবড় পাথরের টুকরো। বাংলা বিহারের সীমান্ত এলাকা এটা। কেবলরাম চেঁচিয়ে উঠল,—এইখানে! এইখানে! গাড়ি থামালুম।

কেবলরাম মাঠের ওধারে একটা গ্রাম দেখিয়ে বলল,—ওই হল গে কেকরাডিহি, দাদাবাবু। আর এই হল গে দণ্ডীবাবার থান।

ভবভূতি বললেন,—থান? কোথায় থান?

একটা বাজপড়া ন্যাড়া তালগাছ দেখিয়ে কেবলরাম টিপ করে প্রণাম করল। রাঙাপিসিমাও তার দেখাদেখি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। ন্যাড়া তালগাছের পেছনে একটা মস্ত বড় পাথর রয়েছে। কেবলরাম বলল,—বাবার ভোগ রাখতে হবে ওই পাথরটার ওপর। আর বাবা উড়ে এসে বসবেন ওই মুড়ো তালগাছটার মাথায়। এসে যখনই কা-কা করে ডাকবেন তখন ওনাকে সব বলতে হবে।

ভবভূতি বললেন,—বাবার ভোগটা কী হে কেবলচন্দ্র?

—আজ্ঞে ইঁদুর। মরা হলে চলবে না। জ্যান্ত চাই। লেজে সুতো বেঁধে পাথরটার ওপর রাখতে হবে। পালাতে পারবে না। সুতোটায় এক টুকরো পাথর চাপা দিয়ে রাখলেই চলবে।

পিসিমা ব্যাগ থেকে পাঁচটা টাকা বের করে বললেন,—তুই তাহলে শিগগির ইঁদুর নিয়ে আয় বাবা।

কেবলরাম টাকাটা ফতুয়ার পকেটে ঢুকিয়ে বলল,—আপনি থানের সামনে গে বসুন পিসিমা। হাতজোড় করে চোখ বুজে বসে থাকবেন। ভাগ্যে দর্শন থাকলে পাবেন—নইলে পাবেন না। আমার কোনও দোষ নেই। বলেছিলুম, বারবেলা তিথি নক্ষত্র দেখে আসতে হবে।

পিসিমা বললেন,—তুই যেন শিগগির ভোগ নিয়ে আসবি। দেরি করিসনে বাবা!

কেবল যেতে-যেতে বলল,—যাব আর আসব। নেতাইদার ঘরে ইঁদুর পোষা আছে না? লোকেরা হরদম কিনে এনে ভোগ দিচ্ছে বাবাকে।

সে চলে গেলে পিসিমা লাঠি ঠুকঠুক করে ন্যাড়া তালগাছটার গুঁড়ির কাছে গিয়ে করজোড়ে বসে পড়লেন। ভবভূতি চারদিকটা দেখে নিয়ে বললেন,—দেখি, কোথাও শিকার পাই-টাই নাকি।

উনি বন্দুক বাগিয়ে সামনে ছোটবড় পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গ্রীষ্মের বিকেল। কিন্তু খোলামেলা জায়গা বলে হু-হু করে বাতাস বইছে। গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। দৃষ্টি তালগাছের মাথার দিকে। উঁহু—মাথাই নেই তালগাছটার। একেবারে কবন্ধ। এখন শুধু ভাবনা, কেবলরাম ভোগ আনবার আগে বাবা এসে পড়লে পিসিমা কীভাবে ঠেকিয়ে রাখবেন।

একটু আনমনা হয়েছিলাম। হঠাৎ কানে এল ভরাট গম্ভীর গলার ডাক,—গা গা গা! তাকিয়ে দেখি তালগাছের বাজপড়া ডগায় কখন এসে গেছে এক দাঁড়কাক। পেল্লায় চেহারা। আর সে কী ডাক! কা কা নয়—একেবারে গা গা গাও গাও!

পিসিমা নিশ্চয় গাও গাও শুনেই ভজন গাইতে শুরু করেছেন। ভারি মিঠে গলা তো রাঙাপিসিমার! উনি যে এত সুন্দর গান গাইতে পারেন, জানতুম না তো!

দণ্ডীবাবা মুগ্ধভাবে বসে গান শুনছেন মনে হল। কিন্তু কেবলরাম আসছে না কেন? বাবা যদি রাগ করে চলে যান? পিসিমা যেন ওঁকে ঠেকিয়ে রাখতেই ভজন লম্বা করে চলেছেন। পিসিমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে বলতে হয়। যখনই দম নিতে থামছেন, দণ্ডীবাবা ডেকে উঠছেন,—গা গা! গাও গাও!

এক সময় পা টিপেটিপে কেবলরাম এসে পড়ল। তার হাতে মোটা সুতোয় বাঁধা তিনটে নেংটি ইঁদুর ঝুলছে অথবা দুলছে। সুতো বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কেবলরামের ঝাঁকুনি খেয়ে ফের লম্বা হয়ে পা ছুঁড়ছে। লেজ নাচাচ্ছে।

সে ভক্তিভরে সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে পিসিমার কাছে ভোগ পৌঁছে দিতে গেল। এখন একটাই সমস্যা। পিসিমার ইঁদুর-আরশোলাতে বড্ড ভয়। কেবলরাম অবশ্য সেটা জানে। কিন্তু পিসিমার কাছাকাছি ভোগ রাখলে পিসিমা কতটা সামলাতে পারবেন জানি না। উত্তেজনায়-উদ্বেগে তাকিয়ে রইলুম।

ইঁদুর তিনটে দেখামাত্র পিসিমার গান থেমে গেল। তিনি ইশারায় কেবলরামকে দূরে ওগুলো রাখতে বলছেন এবং সেই সঙ্গে হাঁউমাউ করে দণ্ডীবাবার উদ্দেশে বলছেন,—ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর স্বপ্ন বাবা! বড়-বড় রাক্ষস-খোক্কস! হাঁ করে গিলতে আসে। আর একটা কালো কুচ্ছিত পেত্নি বাবা, সাদা থানের কাপড় পরে আমাকে ভেংচি কাটে। গাল দেয়। আমি কোনও দোষ করিনি বাবা, তবু আমাকে গালমন্দ করে। শোনো বাবা, একটা-দুটো নয়—সাত-সাতটা ভালুক এসে নাচে। আমার দম আটকে যায় বাবা!

দণ্ডীবাবা ডানা চুলকোচ্ছেন ঠোঁট দিয়ে। তারপর হঠাৎ ওপাশে ঘুরে কী যেন দেখতে থাকলেন। এবার ইঁদুর তিনটে দেখিয়ে মরিয়া হয়ে কেবলরাম চেঁচাল,—ইদিকে দেখুন বাবা! ভোগ এনেছি আপনার!

কিন্তু বাবার মনে কী ছিল, হঠাৎ উড়ে চলে গেলেন। পিসিমা করুণ মুখে বললেন,—বাবা যে ভোগ ফেলে চলে গেলেন কেবলরাম। তাহলে আমার কী হবে?

কেবলরাম বলল,—কিছু ভাববেন না। ভোগ থানে ছেড়ে দিচ্ছি। বাবা যখন খুশি ফিরে এসে খাবেন। চলুন, এখন আর বসে থেকে লাভ নেই।

—আমার অসুখের ওষুধ যে দিয়ে গেলেন না?

—ওই তো ওষুধ আপনার মাথায়!

পিসিমা ঝটপট মাথায় হাত দিতেই পেয়ে গেলেন কিছু। সঙ্গে-সঙ্গে আঁচলে বাঁধলেন। কেবলরাম ইঁদুরগুলো ছেড়ে দিল পাথরের ওপর। পিসিমা গাড়ির কাছে এলে বললুম,—ওষুধটা দেখি, পিসিমা!

পিসিমা বললেন,—এখন দেখতে নেই। পরে দেখিস। ও কেবল, ভবদাকে ডাক।

এই সময় ভবভূতির সাড়া পাওয়া গেল বন্দুকের আওয়াজে। নিশ্চয় পাখিটাখি মারলেন। কেবল ওঁকে ডাকতে গেল।

একটু পরে ফিরলেন দুজনে। দুজনেরই মুখ গম্ভীর। কিন্তু শিকার কই? জিগ্যেস করলে ভবভূতি শ্বাস ছেড়ে শুধু বললেন,—খুঁজে পেলুম না। যা পাথর চারদিকে! যাকগে! খামোকা একটা গুলি খরচ হল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আবার কাঁচা রাস্তায় নড়চড় করতে-করতে গাড়িটা এগোল কষ্টেসৃষ্টে।

পিসিমা ওষুধটা দেখিয়েছিলেন। শুকনো এক টুকরো কাঠি—কিংবা শেকড়, বুঝতে পারিনি। সেটা হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে কেবলরামের নির্দেশ মতো রোজ সূচের ডগায় একবিন্দু তুলে জলের সঙ্গে খেতেন পিসিমা। আশ্চর্য ব্যাপার। আর রাক্ষস, ভাল্লুক বা পেত্নিটা এসে জ্বালাত না। দিব্যি ঘুমোতেন। সবসময় হাসিখুশি মেজাজ।

একদিন ভবভূতি এসে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে চলে যাওয়ার পর কেবলরাম বলেছিল,—ভবছারের মাথাটা দেখেছেন? পেছনে গোটাকতক চুল ছিল, তাও আর নেই! হুঁ—হুঁ বাবা, শাপ বলে কথা!

জিগ্যেস করেছিলাম,—কীসের শাপ? কে শাপ দিল ওঁকে?

আবার কে? দণ্ডীবাবা! —কেবলরাম গলা চেপে বলেছিল। —বলতে বারণ করেছিলেন দুটো টাকা দিয়ে। তাই বলিনি। কিন্তু টাকা শোধ হয়ে গেছে অ্যাদ্দিনে। এবার বলে দিই দাদাবাবু ভবছার সেদিন কেকরাডিহির দণ্ডীবাবাকে গুলি করে মেরেছেন, জানেন?

—অ্যাঁ! বলিস কী রে?

—হ্যাঁ—দাদাবাবু। গিয়ে দেখি এই কাণ্ড। দণ্ডীবাবা পড়ে রয়েছেন গুলি খেয়ে। আর ভবছার মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে আমি হায়-হায় করে উঠলুম। তখন উনি বলেন কী, পানকৌড়ি উড়ে যাচ্ছে ভেবে গুলি করেছিলুম রে! তুই দুটো টাকা নে—কাকেও যেন বলিস নে।

বলেছিলুম,—চেপে যা। আমায় যা বললি, বললি। কখনও পিসিমা যেন না শোনেন।

বুদ্ধিমান কেবলরাম কথাটা পিসিমাকে বলেনি আজও। তবে একথা সত্যি যে ভবভূতির মাথায় আর একগাছিও চুল নেই। কেকরাডিহির দণ্ডীবাবার অভিশাপ ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে?

অদলবদল

রোজ ভোরবেলা পার্কে কিছুক্ষণ বেড়ানো হরিপদবাবুর অনেককালের অভ্যাস। পার্কটা বেশ বড়। কিন্তু হাঁটাচলার পর একটুখানি যে বসবেন কোথাও, তার উপায় নেই। এখানে-ওখানে যত বেঞ্চ আছে, কখন সবগুলো ভর্তি হয়ে গেছে। ঘাসে বসারও বিপদ আছে। ছেলেপুলেদের যা পাঁয়তারা, কে কখন ঘাড়ে এসে পড়ে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে বড় বিপদ ওদের ফুটবল। যেন কামানের গোলা।

তিতিবিরক্ত হরিপদ অগত্যা নিরিবিলি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বকুল গাছটার দিকে যান। বকুলতলায় এক টুকরো কালো পাথর পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, কখন পাথরটাও দখল হয়ে গেছে। হোঁতকা-মোটা, মাথায় টাক আর মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চ্যাপ্টা নাক, কুতকুতে চোখ নিয়ে একটা লোক আরামে বসে আছে।

যেদিনই যান, দেখেন তাঁর যাওয়ার আগে কখন লোকটা বকুলতলার আসনটা দখল করে ফেলেছে।

জায়গাটা যে এমন কিছু সুন্দর তাও নয়। একটু নিরিবিলি এই যা। ওদিকটায় বলের ঘা খাওয়া রিস্কও নেই। তবে ওখানে বসে আর কিছু না হোক, রেলগাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। রেলগাড়ি দেখতে ভালোই লাগে হরিপদবাবুর। মনে-মনে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক চলে যাওয়া যায়। কু-ঝিক-ঝিক...কু-ঝিক-ঝিক! কখনও রেলগাড়ির চাকা ছড়া বলে, টিকিটবাবুর কত টাকা! টিকিটবাবুর কত টাকা! টিকিট বাবুর কত টাকা! ছেলেবেলার কত কথা মনে পড়ে যায়।

শেষে জেদ চড়ে গেল হরিপদবাবুর। আগেভাগে গিয়ে পার্কের বকুলতলার পাথুরে আসনটা তাঁর দখল করা চাই-ই। সেদিন ভোরের আগে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিকঠিক চারটে। আবছা আঁধার লেগে আছে ঘরবাড়ির গায়ে। পার্কে কুয়াশা জড়িয়ে রয়েছে। রাস্তায় কদাচিৎ চাপা গরগর শব্দে চলে যাচ্ছে একটা করে মোটরগাড়ি—তখনও হেডলাইট জ্বলছে। হরিপদবাবু পার্কে ঢুকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। বকুলতলা ঝুপসি হয়ে আছে আঁধারে - কুয়াশায়। ঘাসে শিশির চকচক করছে। পাথরটা খালি পড়ে আছে। হরিপদবাবু সিংহাসন দখল করার আনন্দে বসে পড়লেন তার ওপর। পাথরটা ঠান্ডা বটে, তাতে কিছু আসে

যায় না। হরিপদবাবু খুশিতে বসে দুই পা দোলাতে থাকলেন। এমন-কী গুনগুন করে গানও গাইতে লাগলেন।

আস্তে-আস্তে কালচে রং ধূসর হতে থাকল। তারপর সাদা হল। একজন-দুজন করে লোক এসে পার্কে ভিড় করল। কেউ ধুকুর-ধুকুর দৌড়চ্ছে। কেউ যোগব্যায়ামেও বসে গেছে। কেউ কুকুর নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেঞ্চগুলোতে বুড়োরা এসে বসে পড়েছে। তারপর ছেলেপুলেদের পাঁয়তারা শুরু হয়েছে ফুটবল নিয়ে। হরিপদ বাবু তেমনি নিরিবিলি বকুলতলায় গুনগুন করছেন আর ঠ্যাং দোলাচ্ছেন।

কতক্ষণ পরে আনমনে মাথায় হাত বুলোতে গিয়েই চমকে উঠলেন। এ কী! তাঁর মাথাভর্তি একরাশ পাকা চুল ছিল। চুল কোথায় গেল?

বারবার হাত ঘষেও চুলের পাত্তা পেলেন না। চামড়ায় হাত ঠেকছে। তার মানে, হঠাৎ তাঁর মাথায় টাক পড়ে গেল নাকি অবাক হয়ে মাথায় আঙুল ঠুকলেন। আরও চমকে গেলেন। সর্বনাশ! তাঁর মাথাভর্তি টাক যে!

তারপর হাত গালে ঘষে ঘাবড়ে গেলেন। প্রতিদিন দাড়ি কাটা অভ্যাস। পার্ক থেকে ফিরেই দাড়ি কাটেন। কালও কেটেছেন। চব্বিশ ঘণ্টায় এত দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল গজানো অসম্ভব। অথচ গজিয়েছে।

প্রচণ্ড আঁতকে উঠে হরিপদবাবু টের পেলেন, তাঁর গায়ের ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি আঁটো হয়ে গেছে। চটিজুতোয় পা দুটো আর ঢুকছে না। এ তো ভারি সাঙঘাতিক ব্যাপার! আঙুল ফুলে কলাগাছ ব্যাপার কি একেই বলে?

হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছেন হরিপদবাবু। এমন সময় লাঠি ঠুকঠুক করে এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন,—ভোম্বলবাবু যে! আছেন কেমন? বহুদিন তো দেখাশোনাও নেই। বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন বুঝি?

হরিপদবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন,—ভোম্বলবাবু কে মশাই? আমি হরিপদ তালুকদার।

ভদ্রলোক খিকখিক করে হাসলেন—চিরকাল থিয়েটারে অ্যাকটিং করে অভ্যাসটা এখনও ছাড়েননি দেখছি ভোম্বলবাবু! তা ইয়ে, আপনার জামাইবাবাজির খবর কী? শুনেছিলুম, পুলিশে নাকি...

হরিপদ তেড়ে উঠে বললেন,—কী যা তা বলছেন মশাই? আমার মেয়েই নেই তো জামাই।

আহা, ওতে লজ্জার কী আছে ভোম্বলবাবু? —ভদ্রলোক বললেন। পুলিশ কাউকে ধরলেই তো সে চোর হয়ে যায় না। আদালত আছে কী করতে?

হরিপদবাবু আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁর জামাই নেই। যদি দৈবাৎ থাকতও, তাকে চুরির দায়ে পুলিশ ধরত—ভাবতেও মাথায় খুন চড়ে যায়। কথা না বাড়িয়ে তক্ষুনি হন্তদন্ত হয়ে কেটে পড়লেন। ভদ্রলোক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

পার্ক থেকে বেরুবার মুখে আরেক ভদ্রলোক তাঁকে দেখে বলে উঠলেন,— আরে ভোম্বলদা যে!

হরিপদবাবু কটমট করে তাকিয়ে জোরে হাঁটতে থাকলেন। পেছনে ভদ্রলোক তখন বলছেন,—হল কী ভোম্বলদা? আরে শোনো শোনো!

কোনওদিকে না তাকিয়ে হরিপদবাবু গলিরাস্তায় পৌঁছলেন। তারপর নিজের বাড়ির দরজায় কলিংবেলের বোতাম টিপলেন। ততক্ষণে আরও টের পেয়েছেন, তাঁর গায়ে প্রচণ্ড জোরও এসে গেছে। কিন্তু বুকটা টিপ-টিপ করে কাঁপছে। একটা দারুণ গণ্ডগোল নিশ্চয় ঘটে গেছে।

দরজা খুলে তাঁর প্রিয় চাকর-কাম-রাঁধুনি হরু গম্ভীরমুখে বলল,—কাকে চাই?

হরিপদবাবু গর্জে উঠলেন এবার,—কাকে চাই কী রে ব্যাটাচ্ছেলে? ভাঙ খেয়েছ সাতসকালে? তারপর হারুকে ঠেলে ঘরে ঢুকে গেলেন।

হারু হই-চই করে উঠল,—আচ্ছা ভদ্রলোক তো মশাই আপনি! গায়ের জোরে পরের বাড়ি ঢুকে পড়লেন যে বড়? আরে! ও কী! কোথায় যাচ্ছেন?

হরিপদ সটান নিজের শোওয়ার ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড আঁতকে দেখলেন, রোজ পার্কের বকুলতলায় পাথরটার ওপর যে লোকটাকে বসে থাকতে দেখেছেন সেই লোকটাই বটে। হরিপদবাবু তার শরীটা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন! কিন্তু তাঁর নিজের শরীরটা কোথায় গেল, সেটাই সমস্যা। আর ছ্যা ছ্যা, এমন বিচ্ছিরি নাক থাকতে আছে মানুষের?

হরু ততক্ষণে পাড়া মাথায় করে চেঁচাচ্ছে,—ডাকাত! ডাকাত পড়েছে! এমন জোর করে শোওয়ার ঘরে ঢোকে যে, সে নিশ্চয় ডাকাত। হরিপদবাবু আয়নার সামনে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না। পার্কে বেড়াতে গেলেন হরিপদবাবু হয়ে, ফিরে এলেন কোন হতচ্ছাড়া ভোম্বলবাবুটি হয়ে—যিনি নাকি একসময় থিয়েটারে অ্যাকটিং করতেন এবং যাঁর জামাই লোকটা চোর না হয়ে যায় না! এ কী সর্বনেশে কাণ্ড রে বাবা!

কিন্তু তার চেয়ে সর্বনেশে কাণ্ড যে ঘটতে চলেছে, ঠাহর হল পাড়ায় লোকের হট্টগোলে। বাড়ির দরজায় ওরা চেঁচাচ্ছে,—কই ডাকাত? কোথায় ডাকাত? ধর ব্যাটাকে! মার-মার! কেউ বলছে,—যাসনে, যাসনে! ভোজালি আছে। পুলিশ ডাক! তার মধ্যে হরু এন্তার চেঁচাচ্ছে,—সব লুঠ হয়ে গেল যে! ওরে বাবা! এতক্ষণে সব লুঠ করে ফেললে রে!

সাহসী ছেলেরা লাঠিসোটা নিয়ে বাড়ি ঢুকছে টের পেয়েই হরিপদবাবুর বুদ্ধি খুলে গেল। দড়াম করে দরজায় খিল এঁটে দিলেন। দরজার বাইরে ছেলেগুলো হল্লা করছে। কেউ ধাক্কাও দিচ্ছে দরজায়। হরিপদবাবু ভেতর থেকে শাসিয়ে বললেন,—সাবধান! আমার কাছে বোমা আছে। উড়িয়ে দেব!

ছেলেগুলো ভয় পেয়ে গেল। বয়স্করা বললেন,—ওরে! সরে আয়! সরে আয়! পুলিশে খবর গেছে।

পুলিশের কথা শুনে হরিপদবাবুর বুকের ভেতর কাঁপুনি বেড়ে গেল। তখন

ঘরের ভেতর থেকে করুণ স্বরে ডাকলেন,—হরু! ওরে বাবা হারাধন! আমি তোর মনিব হরিপদ তালুকদার। সত্যি বলছি!

হরু বলল,—চালাকি হচ্ছে? আমার মনিবকে আমি চিনিনে? ওইরকম চেহারা নাকি ওনার? ওইরকম হেঁড়ে গলা নাকি? ছ্যা-ছ্যা, যেন নিমতলার আস্ত পিচেশ!

গণ্ডগোল একটু থেমেছে। সবাই পুলিশের প্রতীক্ষা করছে। হরিপদবাবুর গলা আবার শোনা গেল ভেতর থেকে,—সত্যি বলছি আমি হরিপদ তালুকদার। দোহাই তোমাদের, এখন পুলিশ-টুলিশ ডেকো না! ও বাবা হারাধন! ওদের বুঝিয়ে বল্ না একটু। আমিই তোর কর্তাবাবু রে!

হারু তেড়েমেড়ে বলল,—বলবটা কী মশাই! হরিপদবাবুর বাড়ি সেই এতটুকুন বাচ্চা বয়েস থেকে কাজ করছি। আমি কর্তাবাবুকে চিনিনে? থামুন, দারোগাবাবুকে আসতে দিন!

বলতে-বলতে এসে গেলেন দারোগাবাবু। পেল্লায় গোঁফের ডগায় পাক খাইয়ে বললেন,—কই? কোথায় ডাকাত?

সবাই একগলায় বলে উঠল,—ওই ঘরের ভেতর স্যার!

দারোগাবাবু হাঁক মেরে বললেন,—গিরধর সিং! দরওয়াজা তোড়ো! জলদি তোড়ো!

শুনেই হরিপদবাবু হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকতে যাচ্ছেন, টাকে খাটের একটা ধার জোরে লাগল। উঃ করে ককিয়ে উঠলেন।

তারপর দেখলেন, প্রচণ্ড অবাক হয়েই দেখলেন, পড়ে গেছেন শিশিরভেজা ঘাসে এবং বকুলতলার সেই পাথরটাতে ঠোক্কর লেগেছে মাথায়। বেশ জোরেই লেগেছে।

এই সময় কেউ বলে উঠল,—আহা! লাগল নাকি।

তাকিয়ে দেখে অবাক হরিপদ তালুকদার। সেই টাকওয়ালা লোকটা, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল—রোজ যে এই পাথরের আসনটা দখল করে বসে থাকে এবং যে কিছুক্ষণ আগে তাঁকে সর্বনাশের মুখে ফেলে দিয়েছিল।

লোকটা হাসতে-হাসতে বলল,—ওখানে বসলেই কিন্তু ঘুম পায়। বুঝলেন?

হরিপদবাবু মনে-মনে বললেন, বুঝেছি। তার মানে পাথরটা দখল করার জন্য রাত চারটেয় শেষ ঘুম বরবাদ করার শাস্তিটা ভালোই পেয়েছেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—মশায়ের নাম কি ভোম্বলবাবু?

—আজ্ঞে না। আমার নাম হরিপদ চাকলাদার।

শুনেই হরিপদবাবু হন-হন করে কেটে পড়লেন। আর কক্ষনো এ ভুতুড়ে পার্কে এত ভোরে বেড়াতে আসবেন না। বাড়ির কাছাকাছি হতে হঠাৎ মনে হল, নামটা কী হরিপদ চাকলাদার বলল, না তালুকদার বলল? চাকলাদার না তালুকদার? তালুকদার না চাকলাদার?

তালুকদার হলে বেটাচ্ছেলে আমার মতোই বিপদে পড়তে পারে। এই ভেবে হরিপদ শেষে খিকখিক করে হেসে উঠলেন।

জটায়ুর পালক

সেদিন খুব মন দিয়ে একটা বই পড়ছি, পায়ে কুট করে যেন পিঁপড়ে কামড়াল। পা আলগোছে নাড়া দিয়ে ফের বইয়ের পাতায় ডুবে রইলাম। ভারি জমাটি গোয়েন্দা কাহিনি। গোয়েন্দা অফিসারকে বেঁধে ডাকাতরা বস্তায় ভরছে। এক্ষুনি সমুদ্রে ফেলে দেবে। কী হয় কী হয় অবস্থা। উত্তেজনায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে।

ফের কুটুস করে যেন পিঁপড়ের কামড়। এবার যেন ডেঁয়ো পিঁপড়ে। বিরক্ত হয়ে থাপ্পড় মারতে গিয়ে দেখি, শ্রীমান ডন টেবিলের তলায় বসে এই কম্মটি করছে।

খপ করে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তাকে বের করলুম। তারপর গর্জে বললুম,—তবে রে বাঁদর ছেলে! গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি!

ডন কাঁচুমাচু মুখে বলল,—অত যে ডাকলুম, তুমি তো শুনতেই পেলে না!

—তাই বলে তুই চিমটি কাটবি হতভাগা?

তোমার সঙ্গে যে আমার ভীষণ দরকার মামা! —ডন মুখে-চোখে কাকুতি-মিনতি ফুটিয়ে বলল,—সত্যি বলছি, দারুণ দরকার!

ডনের দরকারে আমার সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। কারণ, তাহলে আর বইটি পড়াই হয়ে উঠবে না। পিঁপড়ের কামড় দিয়ে সবে তার জ্বালাতনের নমুনা শুরু। এরপর জানলা দিয়ে আস্ত ইটের টুকরো এসে পড়ারও চান্স আছে। যা বিচ্ছু ছেলে!

তাই বললুম,—ঝটপট বলে ফেল তাহলে। দেরি কোরো না। দেখ না আমি এখন ব্যস্ত।

ডন তার পিঠের দিকের জামার ভেতর থেকে কী একটা টেনে বের করল। অবাক হয়ে দেখি, আন্দাজ ফুটখানেক লম্বা একটা সাদা-কালোয় চকরা-বকরা পালক। জানলা দিয়ে উপচে আসা শেষবেলার রোদ্দুরে পালকটাতে ফিনফিনে সবুজ রঙও ঝিলমিলিয়ে উঠল একবার। ডন বলল,—বলো তো মামা, এটা কোন পাখির পালক?

পালকটাও ওর হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললুম,—ঠিক বুঝতে পারছি না। সারস জাতীয় কোনও পাখির পালক হয়তো। এ তুই কোথায় পেলি রে?

ডন মুখ টিপে হাসল। —বলতে পারলে না তো! মামা, তুমি রামায়ণের গল্প পড়োনি?

—রামায়ণের সঙ্গে এটার কী সম্পর্ক?

ডন ফিসফিস করে বলল,—রাবণরাজা সীতাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সেই যে একটা পাখি এসে রাবণরাজার মাথায় ঠুকরে দিল আর মুকুট পড়ে গেল—তখন রাবণরাজা মারল তলোয়ারের কোপ। এক কোপে পাখিটার ডানা কেটে গেল। কী যেন নাম পাখিটার, বলো না মামা? পেটে আসছে, মুখে আসছে না...

হাসতে-হাসতে বললুম,—হুঁ—জটায়ু পক্ষী।

—পক্ষী না মামা, পাখি!

—বেশ তাই হল।

স্বীকার করে নিলুম। নইলে কথা বাড়বে। ডনটা যা তক্কবাজ—তো, তুই কি বলতে চাস, এটা সেই জটায়ুর পালক—মানে, রাবণের তলোয়ারের কোপে যেটা কাটা পড়েছিল?

ডন রহস্যের ভঙ্গি করে বলল,—ঠিক বলেছ। সেজন্যই তো তোমার কাছে এলাম।

—ঠিক আছে। এখন যাও, আমি ব্যস্ত!

ডন গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে বলল,—ধুস! এখনও আমার দরকারটা বলাই হয়নি। তুমি জিগ্যেস করো পালকটা কোথায় পেলুম!

তারপর সে আমার জিগ্যেস করার আগেই বলতে শুরু করল,—পালকটা পেয়েছিল হারু-গয়লা—ওই যার খাটাল আছে শিবমন্দিরের পেছনে। কোথায় পেল জানো? তার একটা গরু বেজায় দুষ্টু। চরতে-চরতে নদীর ওপারে চলে গিয়েছিল। গরুটাকে খুঁজতে গিয়ে হারু পালকটা পেয়েছে।

—বুঝলুম। এবার এসো।

ডন গ্রাহ্য করল না। বলল,—এই পালকটা যদি সুতো দিয়ে পিঠে বাঁধো মামা, তাহলে তুমি দিব্যি পাখির মতো উড়তে পারবে। দাও না মামা খানিকটা সুতো!

জানি, সুতো যেভাবে হোক জোগাড় করে দিতেই হবে। নইলে রেহাই পাব না। কাজেই উঠতে হল। পাশের ঘরে ডনের দাদা শ্রীমান টমের ঘুড়ির লাটাই থেকে খানিকটা সুতো ছিঁড়ে আনতেই হল। টম এখন ক্রিকেট খেলতে গেছে। বাড়ি থাকলে কাজটা কঠিনই হতো।

ডন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল,—পালকটা পিঠে বেঁধে দাও মামা। শক্ত করে বাঁধবে যেন। নইলে যদি খুলে যায়, পড়ে ছাতু হয়ে যাব।

কষে বেঁধে দিলুম ওর ডান কাঁধের কাছে পালকটা। তারপর ডন বলল,—এবার দেখ মামা, আমি উড়ে চললুম, রেডি! ওয়ান...টু...থ্রি...

সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন আমি ফের গোয়েন্দা কাহিনি পাতায় চোখ রাখলুম।...

ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এতদূর গড়াবে ভাবতে পারিনি। সন্ধ্যার মুখে টম ফিরে এসে যেভাবেই হোক টের পেল যে, তার লাটাইয়ের সুতো ছেঁড়া হয়েছে। খুব লম্ফঝম্প করে সে ডনকে খুঁজে বেড়াল। আলমারির পেছন, টেবিলের তলা, এমন-কী খাটের তলা খুঁজে ডনকে পিট্টি দেওয়ার তাল করল। কিন্তু কোথায় ডন? দিদি চেঁচামেচি করেও ছেলেকে শান্ত করতে পারলেন না। শেষে ওদের বাবার নামে শাসালেন। জামাইবাবু মফস্বল শহরের উকিল। কোর্ট থেকে ফিরে কোন ক্লাবে যেন দাবা খেলতে যান। ফেরেন রাত নটার পরে।

বেগতিক দেখে বললুম,—টম! তোর সুতো ইঁদুরে ছিঁড়েছে। বাড়িতে কত ইঁদুর দেখতে পাসনে? থাম কালই একডজন বেড়াল এনে রাখব।

টম শান্ত হয়ে পড়তে বসল। এবার আমিই ডনকে খুঁজতে থাকলুম। টমের ভয়েই ডন নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে। বাড়ির চারধারে সবজি ও ফুলফলের বাগান। জ্যোৎস্না ফুটেছে। বাগানে গিয়ে চাপা গলায় ডাকলুম,—ডন! ও ডন! বেরিয়ে আয়। অল ক্লিয়ার! তোর ভয় নেই। চলে আয়!

কিন্তু কোনও সাড়া পেলুম না। তাহলে কি পাশের বাড়ি ওর বন্ধুদের কাছে আছে? গিয়ে দেখি, সেখানেও নেই! গেল কোথায় ও? কাছাকাছি আরও কয়েকটা বাড়ি খোঁজাখুঁজি করলুম। কোথাও নেই। এবার একটু ভয় পেয়ে গেলুম। বাড়ি ফেরার মুখে নিশ্চয় টমের চেঁচামেচি শুনে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু কোথায়?

হঠাৎ মনে পড়ল নাদুবাবুর ছেলে ন্যাড়ার সঙ্গে ডনকে ঘুরে বেড়াতে দেখি। নিশ্চয় ন্যাড়ার কাছে আছে ও। নাদুবাবুর বাড়ি নদীর ধারে খেলার মাঠের কাছে। সেখানে গিয়ে দেখি, ন্যাড়া তুম্বো মুখ করে পড়তে বসেছে। নাদুবাবু গম্ভীর গলায় ওকে মুখস্থ করাচ্ছেন,—ক মূর্ধন্য ষয়ে টয়ে কষ্ট! জোরে-জোরে বল ক মূর্ধন্য ষয়ে... আমাকে দেখে মুখ নামিয়ে চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন,—কে হ্যা?

—আমি জ্যাঠামশাই! ন্যাড়ার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

ন্যাড়ার সঙ্গে? —খুব অবাক হয়ে নাদু সিঙ্গি অনেকটা হাঁ করে ফেললেন,—নেড়ুর সঙ্গে তোমার কী?

ঝটপট বললুম,—মানে ডনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই...

খাপ্পা হয়ে সিঙ্গিমশাই বললেন,—বোলো না! ওই পাজি হতচ্ছাড়া ছেলেটার কথা আমায় বলতে এসো না?

—আজ্ঞে না জ্যাঠামশাই! আপনাকে বলতে আসিনি। ন্যাড়াকে জিগ্যেস করতে এসেছি।

—নেড়ু কিচ্ছু জানে না। দেখছ না এখনও পড়তে বসেছে? ওকে ডিসটার্ব কোরো না।

ন্যাড়া বইয়ের পাতায় চোখ রেখে পড়া মুখস্থ করার সুরে বলে দিল,—ডন জটায়ুর পালক পেয়েছে। ডন মাঠে উড়ে চলে গেল।

মাঠে! মানে খেলার মাঠে? —উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করলুম। কিন্তু ও নেড়ু! উড়ে চলে গেল কী বলছ?

নাদুবাবু গর্জে উঠলেন, 'হয়েছে, হয়েছে। আর কোনও কথা নয়। কাজ নেই কম্ম নেই, রোজ খালি ডন ডন ডন। ডন ডন ডন ডন! হুঁ! উড়ে যাবে না তো কি হেঁটে যাবে? ভাগ্নের পিঠে ডানা গজিয়েছে যে। এবার চাঁদে গিয়ে বসে থাকবে।

হনহন করে খেলার মাঠে চলে গেলুম। তারপর যত জোরে পারি গলা ছেড়ে ডাকলুম,—ডন! ডন! আচমকা একটা গাধা বিকট চেঁচিয়ে সাড়া দিল। পিলে চমকানো ডাক। আকাশে টোল-খাওয়া চকচকে চাঁদ যেন মজা পেয়ে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল। ঘাসে ভরা মাঠে জ্যোৎস্না ঝলমল করছিল। মাঠের শেষে নদীর ধারে পোড়ো

মন্দির ঘিরে একটা জঙ্গল। সেদিক থেকে ভেসে এল পেঁচার ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও চেঁচানি। অমঙ্গলের ডাক! বুক কাঁপতে লাগল। ডনের কোনও বিপদ হয়নি তো?

এই রাতবিরেতে জঙ্গলটার দিকে পা বাড়াতে গা ছমছম করছিল। ভূত না থাকলেও ভূতের ভয়টা থাকে। কিন্তু ডন বেচারার জন্য তখন ভূতের সঙ্গে লড়াই করতেও তৈরি আছি। জঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে গলা ছেড়ে ফের ডাকলুম,—ডন! ডন!

এবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কান্না-জড়ানো গলায় কেউ চিঁ-চিঁ করে সাড়া দিল যেন। আরও খানিকটা এগিয়ে ডাকলুম,—ডন! তুই কোথায়?

মাথার ওপর থেকে করুণ সুরে ডন বলল,—এই যে এখানে মামা!

—সর্বনাশ! তুই গাছের ডালে কেন রে?

নামতে পারছিনে মামা! —ডন ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল।

রেগেমেগে ভেংচি কেটে বললুম,—নামতে পাঁরছিনে মাঁমা! হতভাগা ছেলে! গাছে উঠতে গেলি কেন? উঠলি যদি নামতেই বা পারলিনে কেন?

ডন কান্না থামিয়ে বলল,—আমি কি গাছে চড়তে পারি? জটায়ু পাখির পালক আমায় উড়িয়ে এনেছে না?

হাসতে হাসতে বললুম,—উড়ে-উড়ে নামলিনে কেন তাহলে?

গাছের ডালে লেগে পালকটা ভেঙে গেল যে! —ডন আবার চিক্কুর ছেড়ে কেঁদে উঠল।

—কই লাফ দে। তোকে ধরে ফেলব।

—পারব না।

—চেষ্টা কর বাঁদর! রেডি! ওয়ান...টু...থ্রি...

ডন মরিয়া হয়ে লাফ দিল এবং তাকে ধরে ফেললুম। তারপর ছায়াঢাকা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসতে-আসতে হঠাৎ মাথায় এল, তাই তো! ডন গাছটাতে চড়তে পারল কেমন করে? চড়তে পারলে নামতে পারাটা কি কঠিন হতো? বরং চড়াটাই কঠিন, নামাটা সোজা।

আমার গা শিউরে উঠল। তাহলে কি সত্যি পালকটার কোনও আশ্চর্য ক্ষমতা আছে? মাঠে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে বললুম,—দেখি পালকটা!

সত্যি পালকটা ভেঙে গেছে। পস্তানি হল, পালকটা না ভাঙলে একবার আমি নিজে পরখ করে দেখতুম। কিন্তু কী আর করা যাবে!

হাঁটতে-হাঁটতে বললুম,—হ্যাঁরে বোকা! গাছ থেকে যে নামতে পারছিলিনে, চেঁচিয়ে কাউকে ডাকলিনে কেন? বুদ্ধি করে আমি না এলে সারা রাত্তির তোকে গাছের ডালে থাকতে হতো।

ডন এবার ফিক করে হাসল,—জানো মামা, রামু-ধোপা ওর গাধার পিঠে কাপড় চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে যেই ডেকেছি, ও রামুকাকা! আমায় নামিয়ে দেবে? অমনি রামু রাম-রাম বলতে-বলতে গাধাটাকে ডাকিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমি সন্ধ্যাবেলা গাছ থেকে ডেকেছি তো ভেবেছে ভূত! হি-হি-হি!

ডন খুব হাসতে লাগল। কথাটা কিন্তু ঠিক। ভাগ্যিস ডন আমার ভাগ্নে এবং তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। নইলে অন্য কেউ ওই পোড়ো মন্দিরের জঙ্গল থেকে ডাকলে আমিও বেজায় ভয় পেতুম না কি?

ডনকে সুতোর ব্যাপারে টমের কথাটা বললুম। তখন ডন বলল,—সুতোগুলো খুল দাও মামা। শিগগির!

সুতো খুলে ফেলে দিলুম। ভাঙা পালকটা হাতে নিয়ে ফের আমার গা শিরশির করতে থাকল। বললুম,—পালকটা তাহলে সত্যি জটায়ুর! হারুর কাছে কত দিয়ে কিনেছিলি রে?

ডন আবার ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। জ্যোৎস্নায় ওর সাদা সরু দাঁতগুলো ঝিমিক করছিল। বললুম,—হাসছিস যে?

ডন জবাব দিল না। গুলতির মতো হঠাৎ বোঁও করে ছুটে গেল। অদ্ভুত ছেলে তো! এমন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পালকটার ওপর একটুও মায়া করল না দেখে অবাক লাগছিল।

কিন্তু হাসল কেন অমন করে? ভাঙা পালকটা পকেটে ভরে খুব ভাবতে-ভাবতে বাড়ির দিকে চললাম। হুঁ, ব্যাপারটা ভাববার মতো।...

অলৌকিক আধুলি রহস্য

ইদানীং রোজ ভোরবেলা জগিং শুরু করেছি। আমাদের এই ছোট শহরে অত সকালে রাস্তাঘাট একেবারে নিরিবিলি হয়ে থাকে। তাতে শীতকাল। খেলার মাঠ পেরিয়ে নদীর ধার অব্দি গিয়ে বাড়ি ফিরতে এক কিলোমিটার দৌড় হয়ে যায়। গা ঘেমে ওঠে।

আমার ভাগ্নে শ্রীমান ডন টের পেয়ে একদিন বলল,—চোরটাকে ধরতে পেরেছিলেন মামা?

চোর? কোথায় চোর? —আকাশ থেকে পড়লুম। আমি তো জগিং করছিলুম, হতভাগা! চোর কোথায় দেখলি?

ডন আকাশ থেকে পড়ল,—জগিং! ও মামা, জগিং মানে কী? তুমি তো দৌড়চ্ছিলে।

গম্ভীর হয়ে বললুম,—জগিং মানে দৌড়-ব্যায়াম। এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। খিদে বাড়ে। জম্পেশ রকমের ঘুম হয়।

ডন খুশি হয়ে বলল,—আমিও জগিং করব, মামা।

—বেশ তো। ভোর ছয়টায় ঘুম থেকে উঠিস। তোর তো সাতটার আগে ঘুমই ভাঙে না।

পরদিন অবশ্য ওকে বিছানা থেকে টেনেই ওঠাতে হল। কিন্তু অতটুকু ছেলে। খেলার মাঠ অব্দি গিয়ে 'ধুস' বলে নেতিয়ে বসল! আমি হাসতে-হাসতে ধুকুর-ধুকুর দৌড়ে নদীর ধারে রোজকার টারগেট পোড়োমন্দির চক্কর দিলুম। তারপর খেলার মাঠে এসে দেখি, ডন। ফের পুরোদমে শুরু করেছে। মনে-মনে বললুম,—ভালো! বাহাদুর ছেলে!

তারপর টের পেলুম ব্যাপারটা। ডন আসলে পাড়ার সেই বদরাগী নেড়ি কুকুরটাকে উচিত শিক্ষা দিতে চলেছে। তার হাতে আধলা ইট। কুকুরটা লেজ গুটিয়ে ঝিলের ধারে রামু-ধোপার গাধার পেটের তলা দিয়ে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইতে বুঝি গাধাটা অপমানিত বোধ করে চার ঠ্যাং তুলে লাফ দিল। তখন শ্রীমান বেগতিক দেখে থমকে দাঁড়াল। কাছে গিয়ে বললুম,—খুব হয়েছে। তোমার দ্বারা জগিং হবে না। বাড়ি এসো।

ডন ফিক করে হেসে বলল,—তখন অমন বসে পড়লুম কেন বলো তো মামা?

—দৌড়ুতে পারছিলে না বলে।

ডন বলল,—যাঃ! সেজন্যে নাকি! একটা আধুলি পড়ে ছিল যে ওখানে।

সে আধুলিটা দেখাল। চকচকে নতুন আধুলি। বললুম, —কার পড়ে-টড়ে গেছে আর কী? ওটা দিয়ে যদি ফের ঘুড়ি কেনার মতলব করিস, গাঁট্টা লাগাব বলে দিচ্ছি। গাছে ঘুড়ি আটকাবে আর আমাকে গাছে চড়তে হবে—কক্ষনো না।

ডন মনমরা হয়ে বলল,—তাহলে কী করব বলো না মামা?

—বরং কোনও ভিখিরিকে দান করে দিস। পুণ্যি হবে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলুম শীতের রোদে রাস্তার মোড়ে সেই অন্ধ ভিখিরিটা বসে আছে—রোজই থাকে। ডনকে ইশারা করলে সে গম্ভীর মুখে আধুলিটা ভিখিরির মগে ঠকাস করে ফেলে দিয়ে এল। বোঝা যাচ্ছিল, আধুলিটা নিয়ে তার কোনও মতলব ছিল।

সন্ধ্যায় এক কাপ চা নিয়ে আরাম করে বসে একটা গোয়েন্দা গল্পের পাতায় চোখ রেখেছি, ডন এসে বলল,—মামা, ও মামা! দ্যাখো দ্যাখো—সেই আধুলিটা না?

ডনের হাতে একটা আধুলি ছিল। সেটা কুড়িয়ে-পাওয়া আধুলিটার মতোই নতুন এবং চকচকে বটে। বললুম,—সেই আধুলিটা, কী বলছিস? এটা তুই তো ঠকাস করে ভিখিরির মগে ফেললি সকালে?

ডন চোখ বড় করে বলল,—অবাক, মামা অবাক! পিসিমা একটা টাকা দিয়েছিল আমাকে, জানো তো? টাকাটা নিয়ে গেলুম হাবুবাবুর দোকানে খাতা কিনতে। এই দ্যাখো খাতাটা।

সে খাতাটা দেখাল। বিশ্বাস করে বললুম,—আধুলিটা বুঝি হাবুবাবু দিলেন?

ডন চাপা গলায় বলল,—দিলেন তো! ও মামা, এটা সেই আধুলিটা—সত্যি বলছি, দ্যাখো না ভালো করে । ঠিক সেইটে। কুড়িয়ে পেতে কতক্ষণ ধরে দেখেছিলুম না? সেই লাল ফুটকিটা পর্যন্ত। দেখতে পাচ্ছ?

তর্ক করে লাভ নেই ওর সঙ্গে। ঝামেলা বাড়বে। হাত বাড়িয়ে বললুম,—ওটা আমায় দে। তার বদলে তোকে আট আনা দিচ্ছি।

ডন একপা পিছিয়ে বলল,—উঁহু! এটা দিয়ে আমি ম্যাজিক করব না বুঝি?

—বেশ, তাই করিস। যা এখন!

ডন বলল,—তুমি বিশ্বাস করলে না তো? ঠিক আছে। কাল ভোরবেলা জগিং করবার সময় ফের এটা ভিখিরিকে দেব। দেখবে, ফের ঘুরে আসবে আমার হাতে।

পরদিন ওকে ঘুম থেকে ওঠাতে হল না। আমাকেই বরং ওই ওঠালে। মামা-ভাগ্নে মিলে ঠান্ডা হিমে ভোরবেলায় ধুকুর-ধুকুর দৌড় শুরু করলুম। আজ ওর খাতিরে একটু আস্তে। নদীর ধারে পোড়োমন্দির ঘুরে খেলার মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছে লক্ষ করলুম ডনটা একটুও কাবু হয়নি। রহস্যটা কী?

মোড়ের অন্ধ-ভিখিরিকে দেখে আধুলিটার কথা মনে পড়ল। বললুম,—হ্যাঁরে, আধুলিটা ওকে দিবি বলেছিলি যে?

দিচ্ছি। —বলে ডন ভিখিরির কাছে গেল।

ঠকাস শব্দ এবং ভিখিরির আশীর্বাদ শুনে বুঝলুম, মুদ্রাটি যথাস্থানে গেছে।

এদিন ছিল রবিবার। ডন একদফা পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছিল। এগারোটা নাগাদ তার পায়ের ধুপধুপ আওয়াজ শুনলুম। তারপর এক চিক্কুর,—মামা! মামা! ম্যাজিক, মামা, ম্যাজিক। তারপর হাঁফাতে-হাঁফাতে ঘরে ঢুকে সে বলল,—বলেছিলুম না! এই এই দ্যাখো।

ওর হাতে সেই আধুলিটার মতোই চকচকে নতুন আধুলি দেখে হাসতে-হাসতে বললুম,—চালাকি? কোত্থেকে নতুন একটা আধুলি এনে বলছ সেইটে?

ডন কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল,—তোমার দিব্যি, মামা! মা পান কিনতে পাঠিয়েছিল। পানওয়ালা এটা দিল। সে আমার হাতে ওটা গুঁজে দিল। তুমি দেখে রাখো না! এই লাল ফুটকিটা দেখছ—ওইটা দেখেই চিনতে পারছি!

—ঠিক আছে। আমার কাছে থাক এটা। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখবখন!

ডন ছোঁ মেরে আধুলিটা তুলে নিয়ে ছিটকে সরে গেল। রাগী মুখ করে বলল,—দিচ্ছি তোমায়! অত করে মার কাছে বকুনি খেয়ে এটা ফিরে পেলুম। এ দিয়ে ম্যাজিক করব।

পরদিন ভোরে জগিং করতে গিয়ে নদীর ধারে পোড়োমন্দির চক্কর দিচ্ছি, হঠাৎ খেয়াল হল শ্রীমান সঙ্গে নেই। ঘুরে দেখি অনেকটা দূরে খেলার মাঠে ছোট্টটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেতেই ভ্যাঁ করে বলল,—আধুলিটা হারিয়ে গেছে মামা!

রাগ করে বললুম,—বেশ হয়েছে হতভাগা ছেলে! আধুলি হাতে নিয়ে কেউ দৌড়ায়?

ডন আমাকে খামচে ধরে থামাল। তারপর চোখ মুছতে-মুছতে বলল,—খুঁজে দাও না মামা। আমার ম্যাজিক করা হবে না যে!

ঘাসে শিশির চকচক করছে। সূর্যটা সবে বিছানা থেকে উঠে বসে হাই তুলছে।

পিটপিটে চাউনি। তার ওপর উত্তরে হাওয়ার ঠান্ডা হিম দুষ্টুমি। এমন সময় একটা আধুলি খুঁজে বের করা বড় কষ্টসাধ্য কাজ। ডনের খাতিরে তবু অনেক কষ্ট করতে হল। কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। ডনকে বললুম,—ঠিক এখানেই পড়েছে তার মানে কী? অন্য কোথাও ফেলেছিস তাহলে।

ডন জোরের সঙ্গে বলল,—এখানেই!

কিন্তু প্রচণ্ড খুঁজেও আধুলিটা পাওয়া গেল না। কাজেই আমাদের পায়ের শব্দে রাস্তার মোড়ের অন্ধ-ভিখিরি নড়েচড়ে বসলেও তার মগে ঠকাস করে সেই মিঠে শব্দটা বাজল না। বেচারা নিশ্চয় খুব মনমরা হয়ে গেল।

মনমরা হয়ে রইল শ্রীমানও। শরীর খারাপ বলে স্কুলে গেল না। বিকেল নাগাদ ভাবলুম ছেলেটাকে চাঙ্গা করা উচিত। আমার ডাক শুনে ডন চোখ পিটপিট করতে-করতে ঘরে ঢুকল। তারপর নিজের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকিয়ে বলল,—কী?

ওকে টেনে আদর করে বললুম, 'যা হওয়ার হয়ে গেছে! ও নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই। চল, বাইরে কিছুক্ষণ ঘুরে আসি। মন ভালো হয়ে যাবে।

ডন ঘাড় গোঁজ করে বলল,—যাব—একটা আধুলি দাও, নতুন আধুলি না হলে নেব না কিন্তু।

আধুলি? —চিন্তিত হয়ে বললুম। আধুলি যদি না থাকে, সিকি হলে চলবে না?

ডন ঠোঁটের কোণায় কেমন একটু হাসল,—তোমার টেবিলের ড্রয়ার খুঁজে দ্যাখো না।

টেবিলের ড্রয়ারে খুচরো পয়সা রাখি, একথা সত্য। ডনের এ খবর জানা থাকার কথা নয়—এ বাড়ির কারুরই নয়। খুঁজতে গিয়ে পেয়েও গেলুম একটা আধুলি। এবং চকচকে আনকোরা আধুলিটা। ডনের তর সইল না, খপ করে কেড়ে নিল। তারপর উল্টে-পাল্টে দেখতে-দেখতে আচমকা এক চিল-চিক্কুর ছাড়ল,—মামা, ও মামা! ম্যাজিক, মামা, ম্যাজিক!

অবাক হয়ে বললুম,—কী রে?

সেই লাল ফুটকিটা। —ডন নাচতে-নাচতে বলল,—আমার আধুলি। আমার আধুলি। দ্যাখো, দ্যাখো!

হাঁ করে তাকিয়ে ছিলুম। ওর হাত থেকে আধুলিটা নিয়ে আরও অবাক হলুম। এ কী! সত্যি সেই লাল ফুটকিওয়ালা আধুলিটা যে! কোথায় পেলুম এটা—কার, কিছুতেই মনে পড়ল না। কিন্তু জিনিসটা যে অলৌকিক এতে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

আর এত ঠিক, এই পড়ে পাওয়া অলৌকিক আধুলি যখন ডনকে ভালোবেসে ফেলেছে, তবে ডন এটা মোড়ের অন্ধ-ভিখিরিকে দিক কিংবা হারিয়ে ফেলুক, আবার তার কাছে এ-হাত সেহাত ঘুরে ফিরে আসবেই। নিজেকে চেনাবার জন্যে কপালে একটা লাল ফুটকি তো থাকবেই। সুতরাং ডন দৌড়ে বেরিয়ে গেলে ওর দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। এমন ভাগ্নের মামা হওয়াটাও তো কম গর্বের কথা নয়।

চোরাবালির চোর

ছোটমামার মাথায় বড়-বড় চুল। চুল নয়, যেন সজারুর কাঁটা। রকমারি শ্যাম্পু ঘষেও ছোটমামা তাঁর ওই নচ্ছার চুলগুলোকে বাগ মানাতে পারছিলেন না। শেষে বাবা পরামর্শ দিলেন,—তার চেয়ে ন্যাড়া হচ্ছ না কেন ভায়া?

ছোটমামা মুখে কিছু না বললেও ভেতরে-ভেতরে রেগে টাই হয়ে যেতেন। কদিন পরে দেখি, ছোটমামা স্নানের পর একটা শিশি থেকে লাল রঙের একটা তরল পদার্থ ঢেলে চুলে ঘষছেন। জিগ্যেস করলাম,—গন্ধতেল নাকি ছোটমামা?

ছোটমামা গম্ভীর মুখে বললেন,—কবরেজি আরক।

আরক থেকে কেমন যেন একটা বিদঘুটে গন্ধ বেরুচ্ছিল। মাথায় ঘষার পর ছোটমামা একটা বাঁকাচোরা কাঠের গড়নের অদ্ভুত চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াতে শুরু করলেন। তারপর অবাক হয়ে দেখলাম, ছোটমামার খাড়া চুলগুলো নেতিয়ে মাথায় সেঁটে গেল। ছোটমামা আয়নার দিকে চেয়ে নিজের মাথা দেখতে-দেখতে বাঁকাহাসি হেসে বললেন,—তোর বাবাকে এবার ডাক! ন্যাড়া হতে বলছিলেন না আমায়? হুঁঃ!

বললাম,—আরকটা না হয় কবরেজি। এই চিরুনিটা কোথায় পেলেন ছোটমামা? এও কি কবরেজি চিরুনি!

ছোটমামা খুশিমুখে বললেন,—নাড়ুবাবু কবরেজকে চিনিস তো? ওই যে মোড়ের মাথায় আয়ুর্বেদ ভবন।

ছোটমামার চুলের একটা হিল্লে হওয়ায় বাড়ির সবাই খুশি। বাড়িতে অসুখবিসুখ কারও নেই—অথচ একটা লোক সবসময় রোগীর মতো মুখ করুণ করে বেড়াচ্ছে। থেকে-থেকে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। এই দেখে কার না খারাপ লাগে? এখন ছোটমামার মুখ আর করুণ নয়। সবসময় হাসিখুশি।

কিন্তু ক'দিন পরেই ছোটমামার সেই কবরেজি চিরুনিটা হারিয়ে গেল। ড্রয়ার, তাক, আলমারি, বিছানা তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না। ছোটমামার মুখের চেহারা আবার করুণ হয়ে গেল। ঠাকুমা বললেন,—এ তাহলে শিঙ্গিদের হুলোবেড়ালের কাজ। ওর জ্বালায় কিছু থাকবার জো নেই। আমার জর্দার কৌটোটা সেদিন নিয়ে পালাচ্ছিল দেখলে না?

ঠাকুরদা বললেন,—হুলোর পক্ষে জর্দা খাওয়া অসম্ভব নয়। গন্ধটা যে মিঠে। তাই বলে চিরুনি কি করবে ব্যাটাচ্ছেলে?

ঠাকুমা বললেন,—কেন? হুলোর গায়ের লোমগুলো দেখনি? নান্টুর চুলের চেয়ে খাড়া।

মা বললেন,—উঁহু—বেড়াল নয়, কাক। সেদিন সাবানকৌটো নিয়ে পালিয়েছিল।

আম গাছের ডগায় ওর বাসা থেকে খোকাকে দিয়ে পেড়ে আনালাম। তাই না রে খোকা?

খোকা, মানে আমি, সায় দিয়ে বললাম,—কাকেরা কি সাবান মাখে মা?

মা বললেন,—কিছু বলা যায় না।

আমি বললাম,—তাহলে কাকটা বেজায় বোকা। কৌটোয় তো সাবান ছিল না!

এইসব আলোচনা চলছে, ছোটমামা গম্ভীরমুখে শুনছেন! হঠাৎ আমাকে বললেন,—আমার সঙ্গে একবার আয় তো পুঁটু। বলেই আমার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে গেলেন।

ছোটমামার কথার অবাধ্য হওয়া কঠিন আমার পক্ষে, পুঁটু নামটা যতই অপছন্দ হোক না কেন। রাস্তায় যেতে-যেতে জিগ্যেস করলাম,—কবরেজ মশায়ের কাছে যাবেন তো ছোটমামা?

ছোটমামা বললেন,—গিয়েছিলাম তো। নাড়ুকবরেজ বললেন, ওই একখানাই ছিল। আর পাওয়া যাবে না। এ তো যে-সে চিরুনি নয়। কামরূপকামাক্ষায় পাহাড়ি জঙ্গলে যে ডাকিনীরা থাকে, তাদের চিরুনি। বুঝলি পুঁটু? ডাকিনিদের চুল তো সহজ চুল নয়। খেজুর-কাঁটা দেখেছিস? সেইরকম।

কথা বলতে-বলতে ছোটমামা খেলার মাঠের দিকে ঘুরলেন। আমি বললাম,—মামা এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

ছোটমামা চাপাগলায় বললেন,—আমার চিরুনি কে চুরি করেছে, বুঝতে পেরেছি। তাকে হাতেনাতে ধরব, আয়।

আমার বুক ঢিপঢিপ করল। বললাম,—ও ছোটমামা, তার চেয়ে থানায় গেলেই তো ভাল হতো।

ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন,—তা মন্দ বলিসনি। ব্যাটাচ্ছেলে যদি ছুরিটুরি বের করে, বিপদ হবে। চল বরং থানাতেই যাই।

থানার দিকে যেতে-যেতে জিগ্যেস করলাম,—কিন্তু চোরটা কে ছোটমামা? কোথায় থাকে?

ছোটমামা বললেন,—কোথায় থাকে তা কি জানি? ওই নদীর ধারে ওকে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে দেখি।

—কেমন করে জানলেন, সে আপনার চিরুনি চুরি করেছে?

আমার কথায় ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন,—তোর খালি প্রশ্ন করা অভ্যেস। কেমন করে জানলেন? লোকটার মাথায় যে আমার মতো চুল—বরং আমার চেয়ে আরও খোঁচা-খোঁচা। যেন পেরেক।

বুঝলাম, তাহলে ছোটমামা ঠিকই ধরেছেন।

আমাদের এই ছোট্ট শহরে বংকুবাবু দারোগার খুব নামডাক। বিশেষ করে আমার বাবার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব আছে। ছেলেবেলায় নাকি বাবার ক্লাসফ্রেন্ড ছিলেন। সেই খাতিরে মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়িতেও আসেন। সব শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুজে

ভাবলেন। তারপর বললেন,—হুম! কেমন চেহারা বললেন যেন? রোগা ঢ্যাঙা, পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথার চুল পেরেকের মতো?

ছোটমামা বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়?

—আজ্ঞে।

—রোজ সন্ধ্যার একটু আগে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বংকুদারোগা দুলতে-দুলতে বললেন,—হুম বুঝেছি। চোরাবালির গোবিন্দ।

ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন,—চোরাবালি মানে?

মিটিমিটি হেসে বংকুদারোগা বললেন,—এই চোরের সঙ্গে চোরাবালির সম্পর্ক আছে—খুব গূঢ় সম্পর্ক। আপনি ভাববেন না। দেখছি ব্যাটাচ্ছেলেকে। তবে কী জানেন? বড্ড ফিচেল।

ছোটমামা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন,—দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলবেন স্যার?

বংকুদারোগা বললেন,—বুঝলেন না? ওই নদীতে একজায়গায় চোরাবালি আছে জানেন না?

এবার আমি বললাম,—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও ছোটমামা, সেই যে অনেকটা জায়গা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা আছে—লেখা আছে ঃ সাবধান। আর...

ছোটোমামা নড়ে বসলেন,—আর একটা মড়ার খুলি আঁকা নোটিশ ঝোলানো আছে। দেখেছি বটে।

বংকুদারোগা বললেন,—গোবিন্দ আমার তাড়া খেয়ে কিছুদিন শ্মশানবটের কোটরে লুকিয়ে থাকত। টের পেয়ে হানা দিলাম। কী ধুরন্ধর চোর মশাই! মড়া সেজে একটা খাটিয়ার তালাই জড়িয়ে শুয়েছিল। এদিকে আসল মড়াটাকে খাটিয়ার তলায় লুকিয়ে রেখেছে। যারা মড়া পোড়াতে এসেছে, তারা বটতলায় এসে মুড়ি খাচ্ছে, লক্ষও করেনি। রাতটাও ছিল যে অমাবস্যা।

বংকুদারোগা একটিপ নস্য নিয়ে ফের বললেন,—মড়া পোড়াতে গিয়ে ধরা পড়ল ব্যাপারটা। গোবিন্দ তখন দৌড়ুচ্ছে। অন্ধকারে দৌড়ুতে-দৌড়ুতে পড়েছে একেবারে চোরাবালির ওপর। তখন ওখানে কাঁটাতারের বেড়া ছিল না। শুধু একটা নোটিশ লটকানো ছিল।

ছোটমামা বললেন,—সর্বনাশ! চোরাবালিতে পড়ে তো তলিয়ে যাওয়ার কথা।

—হুঁ-উ, তলিয়ে গেল বইকী গোবিন্দচোর।

আমি বললাম,—তারপর কে টেনে তুলল ওকে?

বংকুবাবু হাসলেন,—তুলবে কী করে? আমি যখন পৌঁছলাম, তখন বালিতে তার মুন্ডুটা দেখা যাচ্ছে। টর্চ জ্বেলে রেখেছিলাম। এক মিনিটের মধ্যে মুন্ডুটাও তলিয়ে গেল। তারপর যেমন বালি, তেমনি। বোঝবার উপায় নেই।

ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন,—তাহলে তো গোবিন্দ বেঁচে নেই।

নেই। আবার আছেও। —বংকুদারোগা গম্ভীর হয়ে বললেন। কথায় বলে না? অভ্যেস যায় না মলে। আমার মুশকিল কী হয়েছে জানেন নান্টুবাবু? তাড়া করলেই ব্যাটাচ্ছেলে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ঝাঁপ দেয়। চোরাবালির ভেতর আড্ডা এখন। ওর খুব নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। এখন ওকে ধরাই কঠিন। তবে যদি ওকে মাঝপথে পাকড়াও করতে পারা যায়। তাহলেই সুবিধে হয়। দেখা যাক, আপনি ভাববেন না।...

থানা থেকে ফেরার পথে ছোটমামা বললেন,—তুই বংকুদারোগার কথা বিশ্বাস করলি পুটু? আসলে আজকাল পুলিশই এরকম। মনবোঝানো দুটো কথা বলে বিদায় করতে পারলে বেঁচে যায়। তোদের এই বংকুদারোগা দেখছি, আরও এককাঠি সরেস। গুলতাপ্পির রাজা। মানুষ মরে ভূত হতেই পারে। তাই বলে চোর মরেও কি চোর থেকে যায় কখনও? ভূত ঘাড় মটকাতে পারে বটে, চুরি করতে যাবে কোন দুঃখে?

বললাম,—কেন ছোটমামা? ভূতের মাথায় পেরেকের মতো চুল থাকলে...

ছোটমামা খাপ্পা হয়ে বললেন,—থাম তো। আজ ওবেলায় আমি নিজেই চিরুনিচোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলব। সেজন্যই তো নদীর ধারে ওৎ পাততে যাচ্ছিলাম। খামোকা তোর কথায় থানায় গেলাম।

বেলা পড়ে এলে ছোটমামা আমাকে নিয়ে বেরুলেন আবার। ছোটমামা প্যান্টের পকেটে একটা দড়ি নিয়েছেন। আর আমাকে দিয়েছেন একটা কাগজ কাটা ছুরি। নদীর ধারে শ্মশানবটের কাছে গিয়ে চাপা গলায় বললেন,—আমি ওকে ধরে ফেলব, আর তুই ছুরি বের করে চেঁচিয়ে বলবি, একটু নড়লেই পেট ফাঁসিয়ে দেব— সাবধান!

এই বলে আমাকে রিহার্সাল দিইয়ে ছাড়লেন,—বলত শুনি, কেমন করে চোখ কটমটিয়ে বলবি?

অগত্যা ছোটমামার জেদে আমাকে ছুরি বাগিয়ে চিক্কুর ছেড়ে বলতে হল,— একটু নড়েছ কি পেট ফাঁসিয়ে দেব—সাবধান।

উঁহু—সাবধানটা হবে আরও জোরে। এমনি করে। —বলে ছোটমামা বিকট গর্জালেন, সা—ব—ধা—ন।

বারকতক বলার পর উনি খুশি হলেন। হুঁ—ঠিক হয়েছে। বুঝলি পুটু? ভালোয়-ভালোয় যদি কাজটা করে ফেলতে পারি, তোকে এক প্যাকেট লজেন্স দেব।

শ্মশানবটের এদিকটা নিঃঝুম। শ্মশানে আজ কেউ মড়া পোড়াতে আসেনি। নদীতে ধু-ধু চড়া পড়েছে। দেখতে-দেখতে সূর্য ডুবে গেল। আলো কমে এল। সেই সময় ছোটমামা হঠাৎ আমাকে খামচে দিয়ে ফিস-ফিস করে বললেন,—চলে আয়! ওই দ্যাখ, ব্যাটাচ্ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

চমকে উঠে দেখি, নদীর বালিতে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ঝোপঝাড়ের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম। পাড়ের নিচে একফালি জল তিরতির করে বয়ে হচ্ছে। তার ওধারে বালির চড়া ওপার অবধি ছড়িয়ে রয়েছে। কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম, আরে! লোকটা ছোটমামার সেই চিরুনিটা দিয়ে সত্যি সত্যি চুল আঁচড়াচ্ছে যে!

ছোটমামা দড়ি বের করে চলে আয় বলেই নিচে ঝাঁপ দিলেন। আমিও ওঁকে অনুসরণ করলাম। জলটুকু পেরিয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম,—একপা নড়ছে কি মরেছ, সা—ব—ধা—ন!

ছোটমামা ফুঁসে উঠে বললেন,—ভ্যাট! দিলে সব ভেস্তে। এখন নয়, এখন নয়।

গোবিন্দ কিংবা যেই হোক, সে ঘুরে আমাদের দেখল তারপর দৌড়ুতে শুরু করল। ছোটমামা,—তবে রে ব্যাটা চোর, যাবি কোথায়—বলে দৌড়ুলেন তার পেছনে। আমিও।

তখনও দিনের আলো আছে, তবে খানিকটা আবছা হয়ে গেছে। কালো মূর্তিটাকে ছোটমামা প্রায় ধরে ফেলেন এমন অবস্থা। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। সামনে সেই কাঁটাতারের বেড়া। একটা সাইনবোর্ড লটকানো আছে। তাতে একটা মড়ার খুলি।

হতভম্ব হয়ে দেখলাম, লোকটা বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে চলে গেল। তারপর ধীরসুস্থে বালিতে তলিয়ে যেতে থাকল। কালো মুখের সাদা দাঁতে সে নিঃশব্দে হাসছে দেখে ছোটমামা ভেংচি কেটে বললেন লজ্জা করে না হাসতে ব্যাটাচ্ছেলে চোর কোথাকার? ভালো চাও তো চিরুনিটা দাও বলছি!' ছোটমামা আমার হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে চ্যাচামেচি করে বললেন,—ছুরি ছুড়ব বলে দিচ্ছি! চিরুনি দাও আমার। দেবে না? তবে রে! ওয়ান—টু—থ্রি।

গোবিন্দচোর হাত্তেরি বলে চিরুনি ছুড়ে দিল। সেটা ঘ্যাস করে ছোটমামার পায়ের সামনে বালিতে বিঁধে গেল কাস্তের মতো। চিরুনিটা তুলে ছোটমামা সম্ভবত শাসাতে যাচ্ছিলেন, তখন গোবিন্দের মন্ডুটাও তলিয়ে গেল।

আমি বেজায় ভয় পেয়ে গেলাম,—ও ছোটমামা! আর এখানে নয়। বড্ড ভয় করছে যে!

ছোটমামা বললেন,—ভয় তো আমারও করছে। দাঁড়া, আগে চুলগুলো ঠিক করে নিই! তারপর যাচ্ছি।...

পি-থ্রি বুড়ো

আমার ভাগ্নে ডন মহা ধড়িবাজ বিচ্ছু ছেলে। একেকসময় তার মাথায় একেকটা খেয়াল গজিয়ে ওঠে আর তার ধাক্কায় আমাকেই ভুগতে হয় শেষপর্যন্ত। দুদিন থেকে দেখছি, শ্রীমানের মাথায় ঘুড়ি ওড়ানোর খেয়াল চেপেছে। ভয় হল ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে দৈবাৎ কিছু বিপদ না বাধিয়ে ফেলে।

কিন্তু ডনকে বারণ করা বৃথা। বারণ করলে তো আরও বেশি করেই তা করবে আর বাড়িসুদ্ধ লোককে দুর্ভাবনায় ভোগাবে।

সকালে জুতসই একখানা ভূতের গল্প লিখব বলে টেবিলে হুমড়ি খেয়ে বসে কলম বাগিয়ে ধরেছি সেই সময় ডন এসে কাগজে তার খুদে থাবা রাখল। বিরক্ত হয়ে বললুম,—আঃ, কী হচ্ছে ডন।

ডন মুখে কিছু বলল না। অন্য হাতে খালি চোখ কচলাতে থাকল। এটাই তার কান্নাকাটি। অগত্যা গল্প লেখার চেষ্টা বাতিল করে কাগজ কলম যথাস্থানে রেখে বললুম,—প্রবলেম কী রে?

ডন আস্তে বলল,—ঘুড়ি।

ঘুড়ি! —খাপ্পা হয়ে বললুম। আমি কি পয়সার গাছ? কালই তো ঘুড়ির পয়সা দিলুম।

ডন বলল,—ছিঁড়ে নিচ্ছে যে!

ছিড়ে নিচ্ছে? কে ছিঁড়ে নিচ্ছে তোর ঘুড়ি? খুব তম্বি করে বললুম। চালাকি করিসনে ডন। ওড়াতে না জানলে তো ঘুড়ি ছিঁড়বেই। ইলেকট্রিক তারে লেগে ছিঁড়বে। আন্টেনায় লেগে ছিঁড়বে। গাছের ডালে লেগে ছিঁড়বে।

ডন একটু চটে গিয়ে বলল,—ইচ্ছে করে ছিঁড়ে নিচ্ছে যে। আমি বুঝি ঘুড়ি ওড়াতে জানিনে?

—কে ছিঁড়ে নিচ্ছে?

—পি-থ্রি বুড়ো।

অবাক হয়ে বললুম,—পি-থ্রি বুড়ো! সে আবার কে রে? সে কেন তোর ঘুড়ি ছিঁড়ে নেবে? সে গাছ না পাখি? অ্যান্টেনা না ইলেকট্রিক তার?

ডন আমার হাত খিমচে দিয়ে বলল, —মামা! তুমি বড্ড বাজে বকো। ইংকিদের তেতলার ছাদে একটা ঘর আছে না?

হুঁ—আছে। —বলেই আমার মনে পড়ে এবং হেসে ফেললুম। ও! তুই পি-থ্রি লেখা বিজ্ঞাপনের বোর্ডটার কথা বলছিস? তাই বল।

ডন আরেকটা খিমচি কেটে বলল,—ভ্যাট! ওখানে একটা বুড়ো লোক থাকে, তার কথা বলছি। যেমনি ঘুড়িটা ইংকিদের তেতলার ছাদের কাছে যাবে, লোকটা খপ করে ছিঁড়ে নেবে।। ওত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, বুঝলে মামা? এই করে আমার পাঁচটা ঘুড়ি গচ্চা গেল। বলে সে আবার চোখ কচলাতে থাকল।

ওর কথা শুনে লোকটার ওপর রাগ হল। কী আশ্চর্য! ছোট্ট ছেলেটা মনের সুখে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, ওর তা সইছে না? ছিঁড়ে নিচ্ছে বদমাইসি করে! উঠে বললুম, —কই চল তো দেখি।

ডন বলল,—খালি-খালি দেখবে কেমন করে? ঘুড়ি কিনে দাও, আমি ওড়াব—তবে তো দেখতে পাবে।

ওর যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। হাতে-নাতে না দেখে কীভাবে লোকটাকে দোষি সাব্যস্ত করব? বলতে গেলে তো আমাকেই পাঁচকথা শুনিয়ে ছাড়বে।

কাজেই ডনকে ঘুড়ির পয়সা দিলুম। সে চিক্কুর ছেড়ে বলে গেল,—তুমি ছাদে গিয়ে ওয়েট করো মামা! আমি এক্ষুনি আসছি।

ছাদে গিয়ে দেখলুম, ডনের লাটাই পড়ে আছে। ছেঁড়া সুতো গুটিয়ে রাখতে ভোলেনি। ইংকিদের ছাদটা দেখতে লাগলুম। তেতলায় ছাদের কোণায় অ্যাজবেস্টস চাপানো একটা ছোট্ট ঘর। তার মাথায় পি-থ্রি বিজ্ঞাপনের বোর্ড আটকানো। ওদিকের বড় রাস্তা থেকে ওটা চোখে পড়ে। এ বাড়ির আর ওবাড়ির মাঝখানে একটা ডোবা, মোষের খাটাল, টালির ঘর গোটাকতক, আর কিছু গাছ-গাছালি। ডোবার পাড় দিয়ে গলির রাস্তাটা গিয়ে বড়রাস্তায় মিশেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ রেখেও ওই ছাদের আনাচে-কানাচে জনপ্রাণীটি দেখলুম না। তবে একটা কাক কী একটা জিনিস মুখে করে কার্নিসে গিয়ে বসেই যেন তাড়া খেয়ে উড়ে গেল। তাহলে বুড়ো লোকটি সম্ভবত ঘরের ভেতরেই আছে।

ডন ধুপধুপ শব্দে সিঁড়ি বেয়ে ঘুড়ি হাতে এসে গেল। বললুম,—কই, এবার ওড়া তো, দেখি কে তোর ঘুড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছে!

ইংকিদের বাড়িটা উত্তর-পূর্ব কোণে। বাতাসের গতিও ওই দিকে। তাই ডনের ঘুড়ি কয়েক মিনিটের মধ্যে পি-থ্রি বোর্ডের কাছে পৌঁছে গেল। ছোট্ট ঘরটার ওপর অন্তত বিশফুট উঁচুতে ঘুড়িটা পাক খাচ্ছিল। হঠাৎ দেখি, ঘরের জানালা দিয়ে একটা হাত বেরুল। তারপর খপ করে সুতো ধরে ফেলল। ডন আকাশ—চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল,—মামা! মামা!

আমিও বাজখাঁই চেঁচিয়ে উঠলুম,—এই! এই!

কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। হাতটা ঘুড়ির সুতো ছিঁড়ে দিব্যি ঘুড়িটাকে নামিয়ে এবং টেনে জানালায় ঢোকাল। রাগে খাপ্পা হয়ে বললুম,—আয় তো দেখি। মজা দেখিয়ে ছাড়ছি ব্যাটাচ্ছেলেকে।

ইংকিরা বাড়ির নিচের তলাটা এক মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীকে ভাড়া দিয়েছে। তিনি নিচের ঘরগুলোকে গোডাউন করেছেন। দোতলায় থাকে ইংকিরা। গিয়ে দেখলুম, নিচের তলায় তালাচাবি ঝুলছে। দোতলায় উঠে দেখলুম, সেখানেও তালাচাবি। ইংকিরা নেই। তেতলায় ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, আর কপাটে লেখা আছে, কুকুর আছে, সাবধান।

কুকুরকে আমি বেজায় ভয় পাই। কিন্তু কুকুরটার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে সোজা ছাদে উঠে গেলুম। তারপর সেই ছোট্ট ঘরের সামনে গিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়ালুম। ঘরটার দরজার কপাট আটকানো আছে বটে, কিন্তু কপাটদুটো ভাঙা এবং দুটো কপাটই দুপাশে হেলে পড়েছে। মধ্যিখানে মাকড়সার জাল! উঁকি মেরে দেখি, ভেতরে, রাজ্যের ভাঙাচোরা আসবাব ছড়ানো। জানলার কপাটও ভাঙা। সেখানেও উঁকি মেরে দেখলুম। ও ঘরে কোনও জনমানুষ বাস করে না।

কিন্তু তার চেয়ে অবাক কাণ্ড সদ্য ছিঁড়ে নেওয়া ঘুড়িটা সুদ্ধু ডনের মোট ছ'খানা ঘুড়িই ভেতরে ভাঙাচোরা আসবাবের ওপর পড়ে রয়েছে।

কিছু বোঝা গেল না ব্যাপারটা। চাপা গলায় ডনকে বললুম,—দরজার ফাঁক গলিয়ে তুই ঢুকে যা। ঘুড়িগুলো তো আগে উদ্ধার করা যাক।

ডন দরজার ভাঙা কপাটের ফাঁকে দিব্যি গলে গেল। তারপর ছ'খানা ঘুড়িই উদ্ধার করে হাসিমুখে বেরিয়ে এল।

তবে তার চেহারাটি এবার ভূতের মতোই হয়েছে। ঝুলকালি মেখে সে এক বিচ্ছিরি অবস্থা। দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তেতলার ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসেছি, এমন সময় দরজা খুলে গেল। এক বেঁটে গোলগাল চেহারার ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন,—কী চাই?

কুকুরের ভয়ে চলে আসতে পারলে বাঁচি। তাই ঝটপট বললুম,—ছাদে ঘুড়ি আটকে ছিল তাই—

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন,—আপনারা ছাদে গিয়েছিলেন? আপনাদের সাহস তো কম নয় মশাই!

কাঁচুমাচু মুখে বললুম,—না—না। অন্য কোনও মতলবে যাইনি। দেখছেন না? এই ঘুড়িগুলো আমার ভাগ্নের।

ভদ্রলোক ফিক করে হেসে বললেন,—খুব বেঁচে এসেছেন মশাই! ভাগ্যিস মামা-ভাগ্নে মিলে দুজনে ছিলেন তাই, একা গেলে এতক্ষণে মড়া হয়ে পড়ে থাকতেন?

—সে কি! কেন বলুন তো?

এই সময় এতক্ষণ পরে কুকুরের গর্জন শোনা গেল ভেতরে। ভদ্রলোক একবার ঘুরে কুকুরটার উদ্দেশে বললেন,—চুপ কর টার্জান! এরা মানুষ!

বলে আমাদের দিকে ঘুরলেন হাসিমুখে,—আর কখনও ছাদে যাবেন না। আর খোকা, তুমিও সাবধান। ঘুড়ি ছিঁড়েছে তোমার ভাগ্যি। বাগে পেলে মুন্ডুটি ছিঁড়ে নিত যা পাজি ব্যাটাচ্ছেলে।

বললাম,—আপনি কার কথা বলছেন?

—যে ঘুড়ি ছিঁড়ে নেয়।

—কে সে?

ভদ্রলোক খাপ্পা হয়ে বললেন,—ধুর মশাই! কুকুর পুষেছি কেন তাও বুঝলেন না? যাকগে আমার কী? সাবধান করে দিলুম। ঠেলা টের পাবেন কথা না শুনলে।

ডনের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলুম, সে ঘুড়ি ওড়াবে আর আমি আগে থেকে গিয়ে ইংকিদের ছাদে ওত পেতে থাকব। লোকটিকে ডন অবশ্য দেখেছে। সে নাকি এক বুড়ো। যাইহোক তার মুখোমুখি একটু বোঝাপড়া করে নিতেই হবে। ভূতের গল্প লিখি বটে। কিন্তু ভূত বিশ্বাস করি না। দেখাই যাক না, সত্যি-সত্যি ভূত আছে নাকি এবং তার ব্যাপার-স্যাপারই বা কী। বেগতিক দেখলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব বরং। দিন দুপুরে ভূতের পক্ষে ঘুড়ি ছিঁড়ে নেওয়া সম্ভব হলেও আমার মুন্ডু ছিঁড়ে নিতে সাহস পাবে বলে মনে হয় না।

চুপি -চুপি গিয়ে ছাদের ঘরটার দেয়াল ঘেঁষে বসে রইলুম। ডনের ঘুড়িটা

তরতর করে এগিয়ে আসছিল। ঘরটার মাথায় পৌঁছুতেই দেখি জানালার ফাঁক গলিয়ে একটা হাত বেরুচ্ছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। কিন্তু হাতটা কিছুতেই ঘুড়ির সুতোর নাগাল পেল না। ডনও মহা ধড়িবাজ ছেলে। ধরতে গেলেই ঘুড়িটা পাক খাইয়ে নাগাল থেকে সরিয়ে নিচ্চে।

একটু পরে দরজার কপাটের ফাঁক গলিয়ে সত্যিই এক বুড়ো ঢ্যাঙা গড়নের লোক বেরুলো। একটু শুঁটকো চেহারা কোথাও দেখিনি। তাকে দেখে দূরের ছাদ থেকে ডন চিক্কুর ছাড়ছিল,—মামা! মামা! বেরিয়েছে।

আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম,—এই যে মশাই।

অমনি বুড়ো লোকটি চমকে উঠল। সে আমাকে দেখার আশাই করেনি। দেখামাত্র জিভ কেটে 'সরি' বলে সুড়ুৎ করে কপাটের ফাঁক গলিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজার সামনে গিয়ে বললুম,—শুনুন! শুনুন! আপনার সঙ্গে কথা আছে।

কিন্তু আর কোনও সাড়াই পেলুম না। উঁকি মেরেও তাকে আর দেখতে পেলুম না। তবে দেয়ালের কোনায় একটা প্রকাণ্ড টিকটিকি কুতকুতে নীল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখামাত্র আবার বুকটা ধড়াস করে উঠল। আর এক মুহূর্ত ওখানে থাকার সাহস হল না। সবেগে পালিয়ে এলুম।

যাই হোক, তারপর আর ডনের ঘুড়ি ছেঁড়া যায়নি। পি-থ্রি বুড়ো নিশ্চয় বড্ড লজ্জা পেয়েছিল। তাই আমি বা ডন আর ওকে নিয়ে মাথা ঘামাইনি।...

নিঝুম রাতের আতঙ্ক

স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে একগাল হেসে গজপতি আঙুল তুলে বললেন,—ওই যে জঙ্গলমতো জায়গা দেখতে পাচ্ছ, ওখানেই। সূর্য ডুবতে চলেছে, শিগগির পৌঁছতে হবে কিন্তু।

ভবভূতি ট্রেনটা চলে না-যাওয়া অবধি কোনও কথা বললেন না। গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠোঁটের কোনায় সেই অবিশ্বাসের বাঁকা হাসিটা এখনও রেখে দিয়েছেন অবশ্য। ট্রেনটা দূরের বাঁকে গাছপালার আড়ালে মিশে গেলে তখন বললেন,—ইয়ে, একটুখানি চা পেলে ভালো হত।

চা!—গজপতি হাসলেন। চারপাশে তাকিয়ে দেখ তো, এখানে চায়ের দোকান দূরের কথা, আমরা বাদে জনমনিষ্যি আর দেখতে পাচ্ছো নাকি?

ভবভূতি দেখলেন। তাই বটে। প্ল্যাটফর্ম খাঁ-খাঁ। শুধু এই স্টেশনঘর—তার মানে একটা টিনের গুমটিঘরের মতো, তা ছাড়া আর কোনও ঘরবাড়িও নেই। গাছপালা-ঝোপজঙ্গল নিঝুম হয়ে ঘিরে আছে স্টেশনটা। কেমন যেন থমথমে অস্বস্তিকর হাবভাব।

তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল ঝোপের আড়ালে দুজন লোক হনহন করে চলে যাচ্ছে। অমনি ভবভূতি বলে উঠলেন,—ওই তো দুজন লোক।

গজপতি তা দেখে নিয়ে বললেন,—হুঁ, এই স্টেশনেরই লোক। স্টেশনমাস্টার আর পয়েন্টসম্যান। কিন্তু ওরা পালাচ্ছে।

পালাচ্ছে, মানে? ভবভূতি অবাক!

স্টেশনে থাকতে চায় না। —গজপতি জানালেন। রেলের কোয়ার্টার পর্যন্ত এখানে তৈরি করা সম্ভব হয়নি। করেছে খানিকটা দূরে। ওরা এখন পালিয়ে সেই কোয়ার্টারে ঢুকবে। পরের ট্রেন আসার সময় হলে স্টেশনে আসবে। ফের পালাবে।

অবিশ্বাসী ভবভূতি বললেন,—তাহলে এই স্টেশনঘরটা তৈরি হল কীভাবে শুনি?

সে অনেক হাঙ্গামা করে হয়েছিল। সায়েব ইঞ্জিনিয়াররা এসে বানিয়েছিল। ওরা খুব ডানপিটে ছিল বলেই পেরেছে। —গজপতি পা বাড়িয়ে ফের বললেন,—আর ট্রেনটা কেমন ঝটপট একটু দাঁড়িয়েই তক্ষুনি লেজ তুলে কেটে পড়ল, দেখলে না? তুমি ঠাহর করলে দেখতে, ড্রাইভার-ফায়ারম্যান-গার্ডসায়েব—এমন কি যাত্রীরাও এ স্টেশনে এসে চোখ বুজে থাকে। ওই সিগন্যাল পেরুলে তখন চোখ খোলে।

আমরা কিন্তু চোখ বুজে নেই। —ভবভূতি বাঁকা হাসিটা আরও একটু লম্বা করে দিলেন।

গজপতি বললেন,—আমাদের ক্ষতি হওয়ার কারণ নেই বলেই চোখ খুলে রেখেছি। তুমি নিশ্চিন্তে থেকো, আমাদের গায়ে আঁচড় লাগা দূরে থাক, আমাদের উঁকিঝুঁকি মেরে ওরা দেখতে সাহসও পাবে না। কারণ এত বড় প্রজেক্টের চার্জে আছে আমার ভাগ্নে ভূতনাথ। ভূতনাথকে ওরা কী ভয় যে পায়!

প্রজেক্ট। অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে 'প্রকল্প'। এই প্রকল্পের কথা শুনে ভবভূতি কলকাতায় গজপতির ড্রয়িংরুমে যতটা জোরে হেসেছিলেন, এখানে পৌঁছে ততটা পারলেন না। খুকখুক শব্দ হল মাত্র। গজপতির পিছনে-পিছনে রেললাইন বরাবর এগোতে থাকলেন। সূর্য গাছপালার আড়ালে অস্ত যাচ্ছে। আশ্বিন মাস। ঘন সবুজ চেকনাই দেওয়া সেইসব গাছপালার গায়ে নীলচে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। পাখপাখালি তুমুল হল্লা করছে। ভবভূতি টের পেলেন, কেমন যেন অস্বস্তি তাঁকে পেয়ে বসছে ক্রমশ। হলেও হতে পারে কিংবা থাকলেও থাকতে পারে গোছের ভাবনা মগজে সুড়সুড় করে বেড়াচ্ছে। বারবার এদিক-ওদিক দেখতে-দেখতে যাচ্ছেন।

এই প্রকল্পের কথাটা উঠেছিল সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের কথায়। গতকাল সন্ধ্যায় জোর বৃষ্টি নেমেছিল। রাস্তায় একহাঁটু জল জমে গিয়েছিল। তার সঙ্গে লোডশেডিং। গজপতির ড্রয়িংরুমে মোমবাতির আলোয় বাঘ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ভবভূতি যৌবনে দুর্দান্ত শিকারি ছিলেন। তাই ওঁর সব কথায় বাঘ আসবেই। ওঁর আপশোস, বাঘ মেরে বড্ড ভুল করেছেন এতকাল। এখন বাঘবংশ দেশ থেকে লোপ পেতে বসেছে। তাই

সুন্দরবনে বাঘ প্রকল্প করে সরকার একটা কাজের মতো কাজ করেছেন। বেচারিরা শান্তিতে ওখানে খেয়েপরে বাঁচুক আর বংশবৃদ্ধি করুক।

সেই কথার জের টেনে গজপতি বলেছিলেন—আর ভূতবংশের কথাটা ভাবো ভায়া! আজকাল আর তত ভূত কেউ দেখতে পায়? ভূতেরাও তো লোপ পেতে বসেছে। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি...

বাধা দিয়ে ভবভূতি বলেছিলেন,—ভূত! তুমি ভূত বিশ্বাস করো?

—আলবাত করি। গজপতি দৃঢ়ভাবে জবাব দিয়েছিলেন। সেই তো বলতে যাচ্ছি! হাত তুলে ভবভূতি বলেছিলেন,—উঁহু, শুনব না! সব গুল। ভূত নেই।

নেই! গজপতি ফুঁসে উঠেছিলেন। —আলবাত আছে। চলো, এক্ষুনি চলো—আছে না নেই টের পাইয়ে দিচ্ছি।

কোথায় যাব শুনি? —ভবভূতি হাসতে-হাসতে বলেছিলেন। কোনও পোড়ো বাড়িতে, নয়তো শ্মশানে—এই তো? আমি ওসব জায়গা চষে ফেলেছি একসময়। ভূতের টিকিও দেখিনি।

গজপতি রেগে গিয়েছিলেন,—ঠিক জায়গায় গেলে তো দেখবে। তাছাড়া বললুম তো, আজকাল আর তত ভূত নেই। আগে যেমন পাড়াগাঁয়ে যখন-তখন বাঘ দেখা যেত এখন কি যায়? যায় না। আর তুমিই তো বললে, বাঘবংশ লোপ পাচ্ছে বলে সুন্দরবনে বাঘ প্রকল্প করা হয়েছে।

—হয়েছে। প্রকল্প না বলে বলো, বাঘেদের অভয়ারণ্য।

—হুঁ, ঠিক তাই বলতে যাচ্ছিলুম তোমায়। শুনবে, না খালি গোঁ ধরবে। রামচন্দ্রপুর নামে স্টেশন আছে শুনেছ কখনও? শোননি।

ভবভূতি বাঁকা হেসে বলেছিলেন,—না শুনিনি। তা হয়েছে কী?

—রামচন্দ্রপুরে ঠিক তোমার সুন্দরবনের বাঘেদের অভয়ারণ্যের মতো ভূতেদেরও বংশরক্ষার জন্য অভয়ারণ্য করা হয়েছে জানো? আর তার প্রজেক্ট অফিসার কে জানো?

—জানি না। কারণ এমন প্রজেক্টের কথা কস্মিনকালে শুনিনি।

গজপতি গর্জে বলেছিলেন,—তুমি যা জানো না বা শোননি, তা নিয়ে তক্কো করতে এসো না। রামচন্দ্রপুর ভূত প্রকল্পের চার্জে যে অফিসার আছে, তার নাম ভূতনাথ; আমার আপন ভাগ্নে। সে রীতিমতো মেক্সিকোতে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে ভূতের ব্যাপরে।

ভবভূতি অবাক হয়ে বলেছিলেন,—বলো কী!

—হ্যাঁ। মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূততত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়। আমাদের ভূতো সেই ডিগ্রি পেয়ে এখন ভারতের নামকরা ঘোস্ট-এক্সপার্ট অর্থাৎ ভূত-বিশেষজ্ঞ হয়েছে। গতবছর যখন রামচন্দ্রপুর ঘোস্ট প্রজেক্ট—থুড়ি, ভূতেদের অভয়ারণ্য চালু হল, তখন তার উদ্বোধন করেছিলেন কে জানো তো? ভূত বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী মিসেস এস সি হাড়মটমটিয়া।

ভবভূতি আরও অবাক,—এমন সরকারি দপ্তরের নাম তো শুনিনি! আর এস সি হাড়মটমটিয়া...উঁহু, শুনিনি।

গজপতির উল্লাস দেখে কে,—এই তো! কিছু খবর রাখো না। রাখবে কী করে? সারাজীবন তো বনবাদাড়ে বাঘের লেজ ফলো করেই কাটালে। শুনে রাখো, এমন দপ্তর একটা আছে। তবে গোপনীয় দপ্তর। তাই কেউ জানে না। আমার ভাগ্নের খাতিরেই আমি জেনেছি।

হুঁ। তাহলে ওই মন্ত্রীমহোদয়ার পুরো নাম বুঝি মিসেস শাঁকচুন্নী হাড়মটমটিয়া? ভবভূতি ফের হেসে উঠেছিলেন।

গজপতির আবার রাগ হয়েছিল। বলেছিলেন,—ঠিক আছে। কালই আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ো। রামচন্দ্রপুর ভূতারণ্যে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখবে। এও বুঝবে, স্টেশনের নাম রামচন্দ্রপুর রাখার কারণই বা কী?

—কী কারণ শুনি?

—ওটা ভূতারণ্যের বর্ডার। রাম শব্দে ভূতেরা জব্দ। বুঝলে না? পাছে অভয়ারণ্য বা ভূত প্রকেল্পর দু-একটা পাজি ভূত এলাকা ছাড়িয়ে বাইরে গাঁ-গেরামে গিয়ে হানা দেয়, তাই ওই ব্যবস্থা। তোমার সোঁদরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের দু-একটা বাঘ কি এমন করে না মাঝে-মাঝে?

রেল লাইনের ধারে-ধারে কিছুটা এগিয়ে ডানদিকে সরু একফালি রাস্তায় নামলেন গজপতি। সামনে একটা ছোট্ট নদী দেখা যাচ্ছিল। তার ওপর কাঠের পোল আছে। সেই পোলে পৌঁছবার পর বললেন,—এবার আমরা ভূতেদের অভয়ারণ্যের এলাকায় ঢুকছি। ওই দেখ, কাঠের ফলকে দেখা আছে ঃ 'রামচন্দ্রপুর ভূত প্রকল্প'। দেখতে পাচ্ছ তো?

ভবভূতি থমকে গেলেন। মুখের বাঁকা হাসিটা মিলিয়ে গেল। কাঠের ফলকটার সামনে দাঁড়িয়ে চশমা খুলে চোখ দুটো মুছে নিলেন। তারপর চশমার কাচ ভালোভাবে মুছে হেঁট হলেন। কিন্তু না। বড়-বড় হরফে সত্যি লেখা আছে ঃ রামচন্দ্রপুর ভূত প্রকল্প। এবং তলায় ব্রাকেটের মধ্যে ঃ তেরটি প্রজাতির ভূতের অভয়ারণ্য। তার পাশে আরেকটা বড় ফলকে নোটিশ ঃ

সাবধান, কেহ উহাদের উত্ত্যক্ত করিবেন না। ঘাড় মটকাইয়া দিলে সরকার দায়ী হইবেন না। তবে কেহ-কেহ আদর করিয়া উহাদের কিছু খাওয়াইতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু নিচের এই তালিকার খাদ্যগুলি ছাড়া আর কোনও প্রকার খাদ্য খাওয়াইবেন না। জরিমানা করা হইবে।

ভবভূতি একটু ঝুঁকে খাদ্য তালিকায় ঝটপট চোখ বুলিয়ে নিলেন। (১) দুধ (২) রসগোল্লা। (৩) হাড়গোড় (৪) শুকনো গোবর (৫) খাঁটি সরিষার তৈল (৬) পাকা কলা (৭) টিকটিকির ডিম ও লেজ (৮) নানারকম মাছ (সিঙ্গি বাদে) (৯) আরশোলার ঠ্যাং...

গজপতি ওঁর পিঠে হাত রেখে চাপাস্বরে বললেন,—দেরি হয়ে যাচ্ছে। সন্ধে হয়ে গেল। আমার ভাগ্নের অফিসে গিয়ে ওসব জেনে নেবে। এসো।

ভবভূতি গুম হয়ে গেছেন। মুখে রা-বাক্যি নেই। তার ওপর গজপতির একরকম চাপা গলায় কথা বলা শুনে তাঁর গা ছমছম করছে এবার।

দুধারে ঘন ঝোপজঙ্গল, মাঝখানে একফালি পিচের পথ। কিছুটা চলার পর বড়-বড় গাছের জঙ্গল দেখা গেল। তার মধ্যে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। গজপতি তেমনি চাপাগলায় বললেন,—ওই যে শ্রীমানের অফিস। মানে আমার ভাগ্নের।

ভবভূতি এখন মোটামুটি অনেকটা বিশ্বাস করে ফেলেছেন। খুঁতখুতে গলায় বললেন,—ওদের জন্যে কিছু খাবার আনা উচিত ছিল।

গজপতি ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন,—চুপ! খাবারের নাম করো না। এক্ষুনি পিছু নেবে। সেবার আমি কী বিপদেই না পড়েছিলুম এসে।

—পিছু নিয়েছিল নাকি?

—হুঁউ। ওই অফিস অব্দি পিছনে খালি বলে,—কী এনেছিস, দিঁয়ে যাঁ।

—বলো কী! আচ্ছা, ওরা নাকিস্বরে কথা বলে কেন বলো তো?

—নাক নেই যে! কংকালের মুন্ডু দেখনি? নাক আছে?

—ঠিক বলেছ। নাকের জায়গায় গর্ত আছে বটে!

এই সময় আলো অনেক কমেছে। ভবভূতি অস্বস্তিতে হাঁটছেন। আর অনবরত এদিক-ওদিক চাইছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল সামনে বাঁদিকে একটা গাছের প্রকাণ্ড মরা ও শুকনো ডালে কালোরঙের এবং দেখতে কতকটা হনুমানের মতো, কী যেন বসে আছে। তারপর সেই অদ্ভুত প্রাণীটা বারকতক আপন খেয়ালে উল্লুকের মতোই শুকনো ডালটা ধরে চরকিঘোরা হয়ে ঘুরল। ভবভূতি শিউরে উঠে বললেন,—ওটা কী?

গজপতি দেখেই চাপাস্বরে বললেন,—বলো রাম রাম রাম রাম—

ভবভূতি আওড়াতে শুরু করলেন,—রাম রাম রাম রাম রাম—

সাবধানে পা টিপেটিপে জায়গাটা পেরিয়ে গিয়ে গজপতি জানালেন,—এই প্রজাতির নাম 'গেছো'। এরা গাছে থাকে। এদের বড্ড বদ অভ্যেস। টুপটাপ করে ঢিল ছোড়ে। মাথা ন্যাড়া দেখলে তো আর রক্ষে নেই।

রাস্তাটা ডাইনে ঘুরছে এবার। সামনে গেট দেখা যাচ্ছে। তার ওপাশে বাংলো মতো একটা বাড়ি। গেটের কাছাকাছি যেতেই ভবভূতি দেখলেন, আচমকা কী একটা ঢ্যাঙা লিকলিকে মূর্তি সটান ঝোপ ঠেলে রাস্তায় এল এবং তাদের সামনে একটু তফাতে দাড়িয়ে গেল। ভবভূতি ফিসফিস করে উঠলেন,—গজু! ওটা কী?

গজপতি দাঁড়িয়ে গেছেন। তেমনি ফিসফিসিয়ে বললেন,—এই সেরেছে। কিছু খাবার আনা উচিত ছিল। তাই তো! অন্তত একটুখানি শুকনো গোবর...

মুখের কথা মুখেই থাকল গজপতির, সেই মূর্তিই হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করে বেজায় হেসে উঠল। ভবভূতি বিড়বিড় করতে থাকলে,—ট্রাম ট্রাম ট্রাম ট্রাম...

তারপর টের পেলেন রামের বদলে ট্রাম বলছেন। তক্ষুনি শুধরে নিয়ে রামনাম শুরু করলেন। আর গজপতি বিকট চেঁচিয়ে আর্তনাদের সুরে বলে উঠলেন—ও ভূতো-ও-ও, ভূতো রে-এ-এ! তোর ঘটোৎকচকে সামলে নে! বেরিয়ে পড়েছে-এ-এ!

বাংলো বাড়ি থেকে আলো হাতে বেরিয়ে কে সাড়া দিল,—কোন বেটারে? নাম ধরে ডাকছিস! স্পর্ধা তো কম নয়।

গজপতি বললেন,—বাবা ভূতো, আমি—আমি তোর মামা গজপতি।

আলো হাতে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল একটা লোক। তাকে দেখে রাস্তা আটকে দাঁড়ানো সেই মূর্তিটা একলাফে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ আচমকা যেন ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল। গজপতি ফিসফিস করে জানালেন,—পাহাড়ি দেশের ভূত, বুঝলে তো? তারপর ভবভূতির হাত ধরে পা বাড়িয়ে বললেন,—বাবা ভূতো, তোকে খবর দিয়ে আসতে পারিনি। এদিকে ট্রেনটাও লেট করেছিল।

গেট খুলে ডঃ ভূতনাথ বললেন,—মামা নাকি? আসুন, আসুন! কী সৌভাগ্য। উনি কে?

—আমার বন্ধু ভবভূতি পতিতুণ্ডু। তোকে এনার কথা বলেছি, মনে নেই হয়তো। ইনি একসময় নামকরা শিকারি ছিলেন। আর ভবভূতি এ হচ্ছে সেই ডঃ ভূতনাথ পাত্র।

ডঃ ভূতনাথ নমস্কার করে বললেন,—আসুন, আসুন! কী সৌভাগ্য!...

বাংলোঘরের মধ্যে একটা হ্যাজাগ জ্বলছে। লণ্ঠনটার দম কমিয়ে বারান্দায় রেখে ডঃ ভূতনাথ ওঁদের নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। কোনার টেবিলে একটা কালো বেঁটে মোটাসোটা হাঁড়িমুখো লোক খাতায় কী সব লেখালেখি করছিল। একবার মুখ তুলে দেখল। ভবভূতির গা শিরশির করে উঠল লোকটাকে দেখে। মানুষ বটে তো? কেমন যেন ভুতুড়ে চেহারা।

পাশের ঘরের দরজা খুলে ডঃ ভূতনাথ বললেন—এক মিনিট। মোমবাতিটা জ্বেলে নিই।

ভবভূতি বললেন,—লোডশেডিং বুঝি?

না। এখানে ইলেকট্রিসিটির বালাই নেই। কেন নেই, পরে বলবখন। —বলে ভূতনাথ মোমবাতি জ্বেলে দিলেন। ডাকলেন,—আসুন মামা! আপনারা ভেতরে এসে বসুন। আমি চায়ের জোগাড় করি।

ঘরটা বেশ বড়। ভবভূতি ও গজপতি আরাম করে বসলেন। ডঃ ভূতনাথ বাইরে চলে গেলেন। বাইরে তাঁর গলা শোনা গেল। কাকে ডাকাডাকি করছেন।

গজপতি বললেন,—ইলেকট্রিসিটি কেন নেই জানো? ভূতদের ওই আলো সয় না। লণ্ঠন, হ্যাজাক অব্দি বড়জোর সয়। ওই ইলেকট্রিসিটির জ্বালায় তো ভূতবংশ লোপ পেতে বসেছে।

ভবভূতি দমে গেছেন এখন। সায় দিয়ে মাথাটা নাড়লেন শুধু। তারপর বারবার জানলার দিকে তাকাতে থাকলেন। বলা যায় না, কখন কী বিতিকিচ্ছিরি ভুতুড়ে চেহারা জানলায় উঁকি দিয়ে ওইরকম একখানা পিলে-চমকানো হাসি হাসবে হয়তো। মনে হচ্চে, রাইফেলটা আনলে ভালো হতো। কিন্তু রাইফেল কি এরা ছুড়তে দিত? তার চেয়ে বড় কথা রাইফেলের গুলি ভূতের গায়ে লাগত কি না তাই বা কে জানে। কখনও তো পরীক্ষার সুযোগ পাননি।...

কিছুক্ষণ পরে চা খেতে-খেতে ভবভূতি এই অভয়ারণ্যের ভূতবৃত্তান্ত বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন।

গজপতির ভাগ্নে ডঃ ভূতনাথ পাত্র অমায়িক মানুষ। রোগা সিড়িঙে চেহারা। গায়ের রং কুচকুচে কালো। চুলগুলো ছোট এবং সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। গোঁফটাও তাই। এই শরতের ভ্যাপসা গরমেও স্যুট-টাই পরে আছেন। গজপতির চোখ নাচছে অনবরত। যেন বলতে চাইছেন, দেখছ তো—আমি কেমন ভাগ্নের মামা? ভাগ্নে পাকা সায়েব।

ডাঃ ভূতনাথ বলেছিলেন—আপনি তো শিকারি মিঃ পতিতুণ্ডু। আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন ভালো। আপনার যেমন বন্যপ্রাণী—বিশেষ করে বাঘের ব্যাপারে তীব্র কৌতূহল ছিল বললেন—আমারও ছেলেবেলা থেকে ভূতের ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহ ছিল। যাই হোক, হঠাৎ একদিন কাগজে দেখলুম মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূততত্ত্বে গবেষণার জন্যে সেখানকার সরকার বৃত্তি দিচ্ছেন। অমনি কপাল ঠুকে দরখাস্ত করে দিলুম। ইন্টারভিউয়ে ডাক পড়ল। পাস করে গেলুম। তারপর তো দেখতেই পাচ্ছেন। শুনেও থাকবেন। সাগ্রহে ভবভূতি বললেন,—শুনেছি। কিন্তু এই প্রকল্প কীভাবে ভূত এনে জড়ো করেছ, সেই কথা বলো তো বাবা, শুনি।

ডঃ ভূতনাথ একটু হেসে বললেন,—সে অনেক হাঙ্গামা। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল—কেউ কোথাও ভূতের খোঁজ পেলে জানান, পুরস্কৃত করা হবে। বিস্তর চিঠি এসেও ছিল। কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় গিয়ে দেখি, মিথ্যে ভোগাচ্ছে। তবে কিছু জায়গায়—যেমন ধরুন, কলকাতার পুরোনো কয়েকটা বাড়ির ছাদ, চিলেকোঠা, সিঁড়ি হাতড়ে তিনরকম প্রজাতির ভূত পেয়েছিলুম। এরা সবাই কিন্তু মানুষ ভূত। কেউ আত্মহত্যা করে ভূত হয়েছে। কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কেউ খুন হয়ে মরেছে।

গজপতি বললেন,—ভালোভাবে না বোঝালে ভবভূতি বুঝতে পারবে না।

—তাহলে শুনুন। ভূতজাতি মূলত তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত। মানুষভূত অর্থাৎ যাকে বলা হয় প্রেত। আর প্রকৃত ভূত—যারা মানুষ বা কোনও জন্তুর অশরীরী আত্মা নয়। স্রেফ ভূত। তৃতীয় উপজাতি হচ্ছে প্রাণীজ ভূত অর্থাৎ মানুষ বাদে অন্যান্য প্রাণী মরে যে ভূতের জন্ম। যেমন ধরুন, গরু মরে যে ভূত হয়েছে, তার নাম 'গোদানো'।

ভবভূতি আরও কৌতূহলী হয়ে বললেন,—সবরকম ভূতই তো এখানে রয়েছে?

ভূতনাথ বললেন,—হুঁউ। তবে সবসময় দেখা পাওয়া মুশকিল। আপনি তো সুন্দরবন অভয়ারণ্যে গেছেন। ক-বার বাঘ দেখতে পেয়েছেন, বলুন?

ভবভূতি সায় দিয়ে বললেন,—আমি শিকারি। ও কি নতুন কথা আমার কাছে?

শুনুন গ্রামাঞ্চলে কীভাবে ভূত খুঁজে এনেছি। গ্রামে খবরের কাগজ কজন পড়ে? তাই ট্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। তার ফলে অসংখ্য জায়গা থেকে নানারকম ভূতের খোঁজ পাওয়া গেল। যেমন ধরুন, বীরভূমের একটা দিঘির এক কোনায় শাঁকচুন্নীর খোঁজ পেলুম। তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম।

—কিন্তু ওদের ধরে আনলে কীভাবে?

ডঃ ভূতনাথ একটু হেসে বললেন,—খুবই সোজা, খুবই সোজা। শুধু জানতে হয়, কোন প্রজাতির ভূতের কী খাদ্য। ব্যস! বীরভূমের সেই শাঁকচুন্নীর আড্ডায় একরাত্রি গিয়ে বসে রইলাম। ওর প্রধান খাদ্য মাছ। মাছ দেখে তক্ষুনি ওর নোলায় জল ঝরতে লাগল। ঘোমটার ফাঁকে বলল,—এঁকটা মাঁছ দেঁ নাঁ ভাঁই। আমি অমনি উঠে চলতে শুরু করলুম। সারাপথ ও পেছনে চাইতে-চাইতে আসে, আর আমি বলি—আর একটু গিয়ে দেব, চলে আয়! ব্যস! এই করে এখানে নিয়ে এলুম। এখানে পুকুর বানিয়ে অঢেল মাছ ছেড়েছি। শাঁকচুন্নীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যা খাওয়ার খাচ্ছে। বাকিটা আমরা কলকাতায় চালান দিচ্ছি।

এই শুনে গজপতি মন্তব্য করলেন,—সেইসব মাছই তো কলকাতার বাজারে বিক্রি হচ্ছে। স্বাদেই বোঝা যায়। শাঁকচুন্নীরা শুঁকে ফেলে দেয়, তাই ওরকম। বুঝলে তো?

ভবভূতি বললেন,—আচ্ছা বাবা ভূতনাথ! দুধ রসগোল্লা, পাকা কলা এসব সুখাদ্য কোন ভূতে খায়?

—ভূত নয় ভূতিনী বলুন। এরা প্রেত উপজাতির অন্তর্গত। অর্থাৎ কোনও পেটুক মেয়ে মরে ভূত হয়েছে।

যেই কথাটা বলা, অমনি জানালার বাইরে থেকে খ্যানখ্যানে গলায় কে বলে উঠল,—কীঁ, কীঁ কীঁ বঁললি? শুঁধু মেয়েঁরাই ওঁসব খাঁয়?

ভবভূতি আঁতকে উঠে দেখলেন,—নির্ঘাৎ ভূতিনীই বটে, চুলের যা ছিরি—তার পরনে শাড়ি, কতরকম গয়নাও পরা, জানালায় দাঁড়িয়ে চোখ কটকটিয়ে তাকিয়ে আছে।

ডঃ ভূতনাথ ধমক দিয়ে বললেন,—পেঁচোর মা! এখন চলে যাও তো এখান থেকে! আমরা কথা বলছি, দেখছ না? কিছু বলার থাকলে পরে এসো। না হয়, দরখাস্ত কোরো।

ভূতিনী জিভ বের করে, কেন কে জানে ভবভূতির দিকেই ভেংচি কেটে সরে গেল। গজপতি খিকখিক করে হেসে বললেন,—পেঁচোর মা সেবার আমাকে বাগবাজারের রসগোল্লা আনতে বলেছিল। ভুলে গেছে নিজেই।

পেঁচোর মা! মানে? —ভবভূতি জিগ্যেস করলেন। জবাবটা দিলেন ডঃ ভূতনাথ। ওর ছেলে পেঁচোও যে ভূত। তার মানে, প্রেত। ট্রেনে চাপা পড়ে মারা গেছে।

ভবভূতি বললেন—আচ্ছা বাবা ভূতনাথ, এত যে ভূত রেখেছ অভয়ারণ্যে, তুমি কিংবা তোমার কর্মচারীরা কেউ কখনও বিপদে পড়োনি তো ?

ডঃ ভূতনাথ বললেন—নাঃ। বুঝতে পারছেন না? বেছে বেছে কর্মচারী রাখা হয়েছে। রীতিমতো ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। ভূত নিয়ে কাজ করা তো সহজ নয়!

এই সময় ভবভূতির মনে হল তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে কী যেন ঢুকেছে। ঘুরেই আঁতকে উঠলেন। চেয়ারের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে একটা বছর নয়-দশ বয়সের ছেলে—কিন্তু সত্যি কি ছেলে?

তাঁর পকেটে একটা কালো কুচকুচে লিকলিকে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াচ্ছে। ভবভূতি কাঁপতে-কাঁপতে বললেন,—কে, কে?

ডঃ ভূতনাথ ধমকে দিলেন,—অ্যাই পেঁচো! কী হচ্ছে?

শ্রীমান পেঁচো বলল,—চঁকোলেঁট খুঁজছি ভুঁতুমাঁমা!

হাত বের কর বলছি! বের করে নে হাত! —ডঃ ভূতনাথ উঠে দাঁড়ালেন। ছিঃ! ওই নোংরা হাত তুই কোন আক্কেলে পকেটে ঢোকালি? মুখে চাইলেই পারতিস!

পেঁচো হিঁ-হিঁ করে হেসে হাত বের করে নিল। তারপর চেয়ারের পেছন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভবভূতির গলায় দুহাত আঁকড়ে আব্দার-গলায় বলল,—এঁকটা চঁকোলেঁট দাঁও নাঁ দাঁদু। সেই সঙ্গে বেজায়রকম কাতুকুতুও দিতে থাকল।

কী প্রচণ্ড ঠান্ডা হাত! ভবভূতির দম আটকে যাচ্ছে। ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে গোঁ গোঁ করতে-করতে শেষপর্যন্ত ভূতোর মতোই হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁক হিঁক করে হেসে উঠলেন।

ভবভূতি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর উঠে বসলেন। দেখলেন নিজের ঘরে শুয়ে আছেন। ঘরে সকালের রোদ ঢুকেছে। তাঁর নাতি রুনু বলল,—ও দাদু, এখনও ঘুমোচ্ছ তুমি? আমি কখন উঠেছি।

ভবভূতি আগে ভালোভাবে দেখে নিলেন রুনু, না পেঁচো। তারপর শুধু বললেন,—হুঁ।

—ও দাদু, একটা চকোলেট দাও না।

ভবভূতি চমকে উঠলেন,—এও যে চকোলেট চায়!

কিন্তু না, মনের ভুল। স্বপ্নই দেখছিলেন বটে। কাল সন্ধ্যায় গজপতির সঙ্গে ভূত নিয়ে বেজায় তর্ক হয়েছিল, মনে পড়ছে।

ডাকিনীতলার বুড়ো যখ

আমাদের বাড়ির পিছনে একটা বাগান, তারপর ধূ-ধূ মাঠ। মাঠের মধ্যিখানে ছিল একটা বটগাছ। গাঁয়ের লোক বলত ডাকিনীতলা।

ডাকিনীতলা, তার মানে ওই ধূ-ধু তেপান্তরের একলা দাঁড়ানো বটগাছটার দিকে দুপুরবেলা তাকিয়ে থাকতুম যদি ডাকিনীটাকে দেখতে পাওয়া যায়। রোদ্দুর চনমন করত মাঠে। জন নেই, মানুষ নেই। খাঁ-খাঁ চারদিক। কথায় বলে, ঠিকঠাক দুক্কুর বেলা, ভূতপেরেতে মারে ঢেলা। দুপুরবেলায় ভূতপ্রেত-ডাকিনীরা পাড়া-গাঁয়ের গাছগুলিতে ওঁৎ পেতে থাকে কিনা। একলা-দোকলা গাছতলায় যেই গেছ, টুপটাপ ঢিল পড়বে গায়ে। ঢিলও দেখতে পাবে না তুমি, কে ঢিল ছুড়ল তাকেও দেখবে না। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

অতদূর থেকে একটা ছোট্ট ছেলেকে ডাকিনীতলার ডাকিনী ঢিল ছুড়ে মারবে, সেই গায়ের জোর ডাকিনীটার নিশ্চয় ছিল না। বটতলায় গেলে তো!

কিন্তু ওরা নাকি সবই দেখতে পায়। যতদূরেই থাকো, চোখে পড়বেই। একদিন হয়েছে কী, দুপুরবেলা রোজ যেমন বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে দূরে ডাকিনীতলার দিকে তাকিয়ে থাকি—সেইরকম তাকিয়ে আছি, হঠাৎ চোখ পড়ল হাজরা-মশায়ের ছেলে নীলু হাফপেন্টুল পরে খালি গায়ে মাঠের দিকে চলছে। নীলু আমার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। ক্লাসের সবচেয়ে ভীতু ছেলে—আবার তেমনি বেহদ্দ গোবেচারা। তাই তাকে অমন হনহন করে ডাকিনীতলার দিকে যেতে দেখে খুব অবাক হয়ে গেলুম। এই রে! নির্ঘাৎ ও মরবে। যেই যাবে কাছাকাছি ডাকিনীটা ওর গলা মটকে রক্ত চুষে খাবে।

হাঁ করে তাকিয়ে ওর কাণ্ড দেখছি, এমন সময় আমাদের কুকুর ভুলো এসে আমার পা শুঁকে লেজ নেড়ে কেঁউ-কেঁউ করে উঠল। ভুলোর মতো তেজি কুকুর গাঁয়ে আর দুটো নেই। ওর গায়ের গন্ধ পেলেই মাঠের শেয়ালগুলো লেজ গুটিয়ে তল্লাট ছেড়ে পালায়। একবার এক ভালুকওলা এসেছে ভালুকের নাচ দেখাতে। ভুলো সেই নাচুনে ভালুকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে ফেলে আর কী! অনেক কষ্টে ছাড়ানো হয়েছিল তাকে। অথচ কুকুর ভালুক দেখলে কী যে ভয় পায়, সবাই জানে।

ভুলোকে দেখে আমার সাহস বেড়ে গেল। ওর গলায় হাত বুলিয়ে বললুম,—এই ভুলো! আমার সঙ্গে যাবি?

ভুলো লেজ নেড়ে সায় দিয়ে বলল—হুঁউ।

ভালুক যদি জব্দ হয়, ভুলোর পাল্লায় পড়ে ডাকিনীও নিশ্চয় জব্দ হবে। অতএব তখুনি মাঠের দিকে চলতে থাকলুম। ভুলো আমার সঙ্গে চলল, কখনও পিছনে, কখনও এপাশে-ওপাশে সে ছুটোছুটি করে এগোচ্ছিল। এদিকে সারাক্ষণ আমার চোখ রয়েছে, নীলুর দিকে। একটু পরেই দেখলুম, নীলু বটতলায় পৌঁছে গেল। কিন্তু তারপর ছায়ার আড়ালে তাকে এতদূর থেকে আর দেখা যাচ্ছিল না। আমার মাথায় তখন অনেক ভাবনা জেগেছে। এভাবে নীলু ওখানে গেল কেন? ডাকিনীটা কি গাঁয়ে এসে ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের ডেরায় মারতে নিয়ে গেল? সর্বনাশ তাহলে তো ওকে বাঁচাতেই হবে।

ভুলো যখন সঙ্গে আছে তখন আমার ভয় নেই। আমি জোরে হাঁটতে থাকলুম। নির্ঘাৎ বোকা নীলু ডাকিনীর পাল্লায় পড়ে গেছে।

বটতলার কাছাকাছি যেতে না যেতে ভুলো লেজ তুলে আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে হঠাৎ লম্বা একটানা 'ঘেউ-উ' ঝাড়ল। এইতে আমার বুক একটু কেঁপে উঠল। মামার কাছে শুনেছি, জীবজন্তুরা ভূতপ্রেত ডাকিনী সবাইকে দেখতে পায়। তার মানে, আমরা যাদের দেখি না, ওরা তাদের দিব্যি দেখতে পায়। এমনকি দেখেছি, পাঁচিলের ওপাশে অচেনা মানুষ এলে ভুলো তাও টের পায় এবং বেজায় হাঁকডাক শুরু করে। রাতের আঁধারেও তো ভুলো দেখতে পায়—অথচ আমাদের আলো চাই-ই।

কাজেই ভুলো নিশ্চয় একটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাচ্ছে। ভয়ে-ভয়ে বললুম,—ভুলো! কিছু দেখতে পাচ্ছিস নাকি?

ভুলো আমার দিকে ঘুরে লেজ নেড়ে কুকুরের ভাষায় বলল,—হুঁউ। তারপর সে আচমকা বটতলার দিকে দৌড়াতে থাকল। দেখাদেখি, আমিও সঙ্গ নিলুম। তারপর বটতলার কাছে গিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ডাকলুম,—নীলু! নীলু!

বটতলায় কখনও ওর আগে যাইনি। কী প্রকাণ্ড গাছ! চারপাশে অনেক ঝুরি নেমেছে। গুঁড়িটাও পেল্লায় মোটা। শেকড়-বাকড় ছড়ানো রয়েছে অগুনতি। শনশন করে বাতাস বইছে। বটের পাতা কাঁপছে। ভুলো মাটি শুঁকে ঘুরঘুর করছিল। নীলুর কোনও সাড়া পেলুম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মনে হল বাতাসের সুরে কে যেন গান গেয়ে কিছু বলছে। গা শিউরে উঠল। আবার ডাকলুম,—নীলু! নীলু! কিন্তু কোনও সাড়া পেলুম না।

এই সময় ভুলো মুখ তুলে আবার একখানা লম্বা 'ঘেউ-উ' ঝাড়ল। তারপর দৌড়ে গাছের ওপাশে চলে গেল। তখন আমিও গেলুম।

গিয়ে যা দেখলুম, থ বনে দাঁড়াতে হল। এক বুড়ো বসে রয়েছে। তার পাশেই একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটলি। একটা লাঠি। তার সামনে মাটিতে বসে আছে নীলু। বুড়ো লোকটা চোখ বুজে যেন ধ্যান করছে। তার গায়ে একটা তালিমারা ফতুয়া—খুব নোংরা সেটা। মাথায় একটা পাগড়ি। তার কানে বড়-বড় তামার আংটি ঝুলছে। গলায় একটা মস্ত চাঁদির চাকতি আছে।

এইবার মনে পড়ে গেল—আরে! এ তো সেই ম্যাজিসিয়ান! সেদিন আমাদের পাড়ায় ম্যাজিক দেখাচ্ছিল। আমি আরও অবাক হয়ে গেলুম।

নীলু এতক্ষণ আমাকে দেখেও যেন দেখছিল না। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাকে চুপ করতে ইশারা করল। তারপর চোখ নাচিয়ে তেমনি ইশারায় ম্যাজিসিয়ানকে দেখিয়ে তার পাশে বসতে বলল।

নীলুর পাশে গিয়ে বসে পড়লাম। ভুলো এসে আমার পাশে একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে আবার কোথায় চলে গেল।

একটু পড়ে বুড়ো ম্যাজিসিয়ান চোখ খুলল। বিড়বিড় করে কী অস্পষ্ট মন্ত্র পড়ল যেন। তারপর একটু ঝুঁকে নীলু ও আমার ওপর তিনবার ফুঁ দিন। ভয়ে বুক কাঁপল। এমন কেন করল ও?

তারপর লোকটা একটু হেসে মিঠে গলায় বলল,—এ ছেলেটি কে বাবা?

নীলু বলল,—আমাদের পাড়ায় থাকে। বিজু, তোর নাম বল।

ম্যাজিসিয়ান হাত তুলে বলল—থাক-থাক। বিজু তো? ব্যস, ওতেই হবে।

নীলু বলল,—বিজু, তোকে কিন্তু দুটো টাকা দিতে হবে। আমিও দিয়েছি।

বললুম,—দেব। কিন্তু এখন যে নেই রে!

ম্যাজিসিয়ান বলল,—আচ্ছা, আচ্ছা এবার শোন বাবা, আমি যা করার সব করে দিয়েছি। এখন তোমাদের কী করতে হবে, বলছি। আমি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ

পরে এই গাছ থেকে একটা লাল টুকটুকে ফল পড়বে। সেই ফলটি দুজনে ভাগ করে খাবে। খেলেই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তখন দেখবে, আমার মতো একজন বুড়ো মানুষ এই গাছের গোড়ায় মাটি ঠেলে বেরোচ্ছে। তাকে তোমরা দুজনে টেনে তুলবে। এতে সে খুশি হবে তোমাদের ওপর। তখন বলবে—কী চাই? তোমরা বলবে—তুমি যদি যখ হও, তাহলে তোমার টাকাগুলো দাও। অনেক টাকা, বাবা! শুধু টাকা নয়—কত সোনাদানা পেয়ে যাবে।

নীলু ঘাড় নাড়ল। ম্যাজিসিয়ান বলল,—তাহলে আমি চলি। কেমন?

নীলুর দেখাদেখি আমিও ঘাড় নাড়লুম। সে পুঁটলিটা কাঁধে নিয়ে ছড়ি হাতে উঠল। তারপর আচমকা হনহন করে প্রায় দৌড়তে শুরু করল। এইতে ভুলো কেন যে খেপে গেল কে জানে, দেখলুম—ভুলো চেঁচাতে-চেঁচাতে তার পেছন-পেছন দৌড়াচ্ছে। আমার ভয় হল, ম্যাজিসিয়ান রেগে যায় যদি! ভুলোকে সে নির্ঘাৎ মন্ত্রের জোরে মেরে ফেলবে। আমি চেঁচিয়ে ডাকতে থাকলুম,—ভুলো! ভুলো! ফিরে আয়!

আমার ডাক শুনে ভুলো থমকে দাঁড়াল। আর এগোল না। কিন্তু ফিরেও এল না। ওখানে দাঁড়িয়ে ম্যাজিসিয়ানের উদ্দেশে রাগ দেখাতে থাকল।

নীলু চোখ নাচিয়ে বলল,—তুই কী করে জানলি রে?

বললুম,—তোকে আসতে দেখলুম যে। কিন্তু ম্যাজিসিয়ানকে কোথায় পেলি?

নীলু বলল,—আজ সকাল বেলা রাস্তায় দেখা হয়েছিল। ও বলল, দুটো টাকা দিলে যখের ধন পাইয়ে দেবে। ঠাকুমার ঝাঁপি থেকে মেরে দিলুম দুটো টাকা! ওকে দিলুম। ও বলল,—ঠিক দুপুরবেলা ডাকিনীতলায় চলে এসো। এবার বুঝলি তো?

বুঝলাম—কিন্তু আমি যে ওকে টাকা দিইনি। যখের ধনের ভাগ আমি পাব তো নীলু?

নীলু গম্ভীর হয়ে একটু ভেবে বলল,—যখবুড়োকে জিগ্যেস করব। যদি বলে, তুইও পাবি—তাহলে পাবি। জানিস তো, যখের ধন সকলের সয় না। যাকগে—আর কথাটথা নয়। চুপচাপ বসে পড়ি আয়। ফলটা কখন পড়বে কে জানে!

আমরা আর কথা না বলে গাছের গুঁড়ির কাছে চুপচাপ বসে পড়লুম।...

দুজনে বসে আছি তো আছি—ফল পড়ার নাম নেই। ভুলো আপন মনে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কখনও গাছের দিকে তাকিয়ে লেজ নেড়ে যেন ডাকিনীটাকেই ধমক দিচ্ছে।

কিন্তু ফল পড়ছে কোথায়? দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। তখনও ফল পড়ল না। বটগাছে রাজ্যের পাখি এসে ততক্ষণে জড়ো হয়েছে। তারা জোর চেঁচামেচি শুরু করেছে। ভুলো এইতে আরও খেপে গেছে। চোখ গেল গাছের গুঁড়ির ওপরে একটা মোটা ডালের দিকে।

যা দেখলুম, আমার চুল ভয়ে খাড়া হয়ে গেল। ওরে বাবা! ও কে? নিশ্চয় ডাকিনীতলার সেই বুড়ো যখটা চুপচাপ বসে আছে। পিটপিট করে আমাদের দেখছে। চেঁচিয়ে উঠলুম,—নীলুরে!

নীলুও দেখতে পেয়েছিল। তার মুখে কথা নেই।

ভুলো কিন্তু ভয় পায়নি। সে এবার বিরাট গর্জন করে গাছের গুঁড়ি বেয়ে ওঠার ভঙ্গিতে লম্ফঝম্ফ শুরু করল। নখের আঁচড়ে গুঁড়িতে দাগ পড়তে থাকল। সাদা আঠা দুধের মতো বেরিয়ে এল। তারপরই ওপর থেকে আওয়াজ হল—'উঁ-উঁ-প'!

অমনি আমি দৌড়তে থাকলুম। সোজা নাক বরাবর দৌড়লুম। কতবার আছাড় খেলুম, কত জায়গায় ছিঁড়ে গেল। তারপর দেখলুম, ভুলোও আমার সঙ্গে চলে এসেছে। পেছন থেকে নীলুর চেঁচানি শুনলুম,—বিজু! বিজু! পালাসনে।

ঘুরে দেখি, সে দৌড়ে আসছে। তখন সাহস করে দাঁড়ালুম। কাছে এসে নীলু বলল—তুই বড্ড ভীতু! ওটা হনুমান।

—অ্যাঁ! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলুম ওর দিকে।

নীলু বলল,—ধুর বোকা। হনুমান দেখিসনি কখনও? হনুমান দেখেই ভয় পেয়ে গেলি?

তখন মনে পড়ল, হ্যাঁ—হনুমানই উঁ-উঁ-প করে ডাকে বটে। কিন্তু অমন জায়গায় হনুমানকে কি হনুমান বলে মনে হয় কখনও? মনে তখন কিনা সেই বুড়ো যখটার ভাবনা। কাজেই হনুমান দেখেই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি।

তবে বলা যায় না, বুড়ো যখটা হনুমানের চেহারা নিয়ে আমাদের দেখা দিতেও তো পারে? কথাটা নীলুকে বললে সে তখুনি মেনে নিল। তাও পারে বইকী। ফেরার পথে কানে এল, ডাকিনীতলায় সেই যখ কিংবা হনুমান ব্যাটা যেন আমাদের অমন করে চলে আসায় বেজায় রেগে গেছে। উঁ-উঁ-প খ্যাঁকোর খ্যাঁক! উঁপ খ্যাঁকোর খ্যাঁক! খুব হাঁকডাক চালিয়ে যাচ্ছে।

নীলু বলল,—চল সন্ধে অব্দি বসে থেকে দেখি ফল পড়ে নাকি।

বললুম,—পাগল! তুই যাবি তো যা।

—যখের ধনের ভাগ নিবিনে?

নাঃ! —বলে ভুলোকে শিস দিয়ে ডাকলুম।

আসল ভূতের গল্প

ভূতের গল্পও তো অনেকেই শুনেছে। কিন্তু দেখেছে ক'জন? যারা দেখেছে বলে, তারা কিন্তু নকল ভূতই দেখেছে। আসল ভূত কি দেখা দেয়?

বলবে, ভূতের আবার আসল-নকল আছে নাকি? আলবাৎ আছে। যেমন ধরো, দুপুর রাত্রে পাঁচিলের ধারে হঠাৎ দেখলে ঘোমটা পরে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে ঘরে ঢুকলে। তখন বাবা গিয়ে দেখলেন, খেন্তিপিসি

দিনে কাপড় শুকোতে দিয়েছিলেন তারে। তোলা হয়নি। বাতাস বইছিল জোরে। কাপড়টা উড়ে গিয়ে জবাগাছের মাথায় জড়িয়ে গেছে। আর তাই দেখে হঠাৎ ভূত-ভূত ভেবে বসে আছ।

এই হল নকল ভূত। নকল ভূত আমিও কি কম দেখেছি? কিন্তু সে-গল্প শুনেও লাভ নেই। আমার বোকামি ধরা পড়বে। তোমরাও হেসে খুন হবে। নিজের বোকামির কথা কি কেউ বলতে চায়?

আমি একবার একটা আসল ভূত দেখেছিলুম। একেবারে নির্ভেজাল আদি অকৃত্রিম ভূত। সেই ভূতের গায়ে অনায়াসে 'বিশুদ্ধ এবং টাটকা' বলে লেবেল এঁটে দেওয়া যায়।

কিন্তু এখন যেমন সহজে বলে যাচ্ছি, আসল ভূতটা দেখার সময়ে মোটেও ব্যাপারটা সহজ ঠেকেনি। ওরে বাবা! সে বড় গোলমেলে ব্যাপার। আর সেই দৃশ্য মনে পড়লে আজও গায়ের রক্ত ঠান্ডা হয়ে যায়।

তখন আমার বয়স মোটে বারো বছর। পড়ি ক্লাস এইটে। আমাদের স্কুলটা ছিল দুটো গাঁয়ের মধ্যিখানের মাঠে একেবারে নিরিবিলি জায়গায়। চারপাশে বড়-বড় গাছ আর ঝোপঝাড় ছিল। পিছনের পুকুরপাড়ে কল্কে ফুলের জঙ্গল ছিল। তার মাঝখানে ছিল মুক্তকেশীর মন্দির। ভাঙাচোরা কতকালের পুরোনো মন্দির। সাপের ভয়ে ওদিকটায় ছেলেরা খুব কমই যেত।

আমার এক সহপাঠী ছিল, তার নাম পোদো। কালো কুচকুচে চেহারা। বলিষ্ঠ গড়ন। খেলাধুলোয় খুব ঝোঁক ছিল তার। কিন্তু পড়াশুনায় তেমন কিছু নয়। কোনওরকমে টেনেটুনে পাস করে যেত।

আমার সঙ্গে পোদোর ভাব হওয়ার কারণ, ক্লাসে মাস্টারমশাই পড়া জিগ্যেস করলে আমি ওকে ফিসফিস করে বলে দিতুম। পরীক্ষার সময় তো কথাই নেই। আমার খাতা থেকে টুকতে দিতুম। এতে আমারও লাভ ছিল। কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হলে পোদো আমার পক্ষ নিত।

তখন পাড়াগাঁয়ে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রব ছিল। মহামারীর মতো গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্ছিল এই রোগে। বার্ষিক পরীক্ষার কয়েকদিন আগে বেচারা পোদো ম্যালেরিয়ায় ভুগে মারা গেল। আমি একেবারে একা হয়ে গেলুম যেন। মন ভেঙে গেল। পড়াশুনো যা করেছিলুম সব ভুলে গেলুম যেন।

ইংরেজি আর বাংলা পরীক্ষা তো কোনওরকমে দিলুম। তৃতীয় দিনে ভূগোল আর সংস্কৃত। ভূগোলও মোটামুটি হল। কিন্তু সংস্কৃতের প্রশ্ন দেখে চড়কগাছ। একে তো পণ্ডিতমশাইয়ের ক্লাসে বরাবর ফাঁকি দিয়েছি, তার ওপর এই দেবভাষার ব্যাকরণ ব্যাপারটা আমার কাছে প্রচণ্ড হেঁয়ালি ঠেকেছে বরাবর। তখন শীতের বিকেল নেমেছে। স্কুলের পেছনের গাছপালায় ঘন ছায়ায় ঘরের ভেতরটা আবছা হয়ে এসেছে। তখন তো গাঁয়ে বিদ্যুৎ ছিল না।

আমি জানালার পাশের সিটে বসেছিলুম। প্রশ্নপত্র নিয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি। হঠাৎ চোখের কোনা দিয়ে দেখলুম, হ্যাঁ—সেই পোদোই বটে, পরনে খাকি হাফ প্যান্ট, গায়ে ময়লা একটা শার্ট, জানালার বাইরে ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করছে।

প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর কী! ভয়ে নয়—আনন্দে। কিন্তু তক্ষুনি মনে-পড়ে গেল, পোদো তো মারা গেছে। আর অমনি সারা শরীর হিম হয়ে গেল। ভয়ে চোখ বুঝে ফেললুম।

সংস্কৃতের পরীক্ষা। পণ্ডিতমশাই নিজেই গার্ড দিচ্ছিলেন ঘরে। বললেন—ও কী রে তপু। ধ্যান করছিস নাকি? অ্যাঁ?

চোখ খুলে কাঁচুমাচু মুখে বললুম,—পো-পো-পোদো স্যার।

পোদো? পোদোর জন্য শোকপ্রকাশ করছিস? অ্যাঁ? —এই বলে পণ্ডিতমশাই আকর্ণ হাসতে লাগলেন। ঘরসুদ্ধ ছেলেরাও আমার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি শুরু করল।

পণ্ডিতমশাই তারপর হাসি থামিয়ে গর্জে বললেন,—বন্ধুর জন্যে শোকপ্রকাশ পরে হবে। বুঝেছ?

পণ্ডিতমশাই কিন্তু ভীষণ রাগী মানুষ। দেয়ালে মাথা ঠুকে দিতেন। নয়তো কান ধরে মার্চ করাতেন। এমনি সব শাস্তি দিতেন আমাদের। তাই আর ওঁনাকে কিছু বলার সাহস হল না। লেখার ভান করলুম।

কিন্তু মনে অস্বস্তি। আবার একটু পরে চোখের কোনা দিয়ে জানালার বাইরে তাকালুম। কী আশ্চর্য। পোদোই তো! ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এবং চোখ টিপে আমাকে ইশারা করছে। এবার স্পষ্ট দেখলুম, তার হাতে একটা কাগজ। কাগজের দিকে ইশারা করে সে কিছু বলতে চাইছে যেন।

কাঁপতে-কাঁপতে বললুম,—পো-পো-পোদো স্যা-স্যার!

পণ্ডিতমশাই এবার সোজা আমার কাছে এসে বাজপড়ার মতো আওয়াজ দিলেন,—রসিকতা হচ্ছে? রসিকতা? পাষণ্ড! অনঢান! বলীবর্দ!

তখন গলা শুকিয়ে গেছে। বোবায় ধরেছে যেন। অতিকষ্টে বললুম,—জ-জল স্যার!

ক্লাসে ছাত্রদের জল খাওয়ানোর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বাইরে টিউবেলে গিয়ে খেয়ে আসতে হতো। টিউবেলটা ছিল খেলার মাঠের এককোনায়। পণ্ডিমশাই দাঁত খিঁচিয়ে বললেন,—জল খাবে তো পোদো-পোদো করছ কেন মূর্খ? যাও—গিয়ে জল খেয়ে এসো।

বাইরে গেলুম। কোথাও কেউ নেই। পরীক্ষার সময় আজকালকার মতো গার্জেনরা তখন স্কুলের আনাচে-কানাচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন না।

ভয়ে-ভয়ে টিউবলের কাছে গিয়ে সেই ঝোপটার দিকে তাকালুম। নাঃ। কেউ নেই তো ওখানে। একহাতে টিউবেলের হাতল চেপে অন্যহাতে জল খাওয়া

ভারি কঠিন। হঠাৎ মনে হল হাতলটায় কেউ চাপ দিচ্ছে। গলগল করে জল পড়তেও দেখলুম। জলের তেষ্টা এত বেশি যে অত কিছু লক্ষ না করে জল খেতে থাকলুম।

জল খাওয়ার পর ভয়টা অনেকটা কেটে গেল। তখন মনে হল, নেহাত চোখের ভুল। সেই সময় চোখ গেল মুক্তকেশীর মন্দিরের দিকে। অমনি আবার বুক কেঁপে উঠল। কী অবাক। পোদো মন্দিরের বারান্দা থেকে হাত ইশারা করে ডাকছে।

মনে হল, তাহলে নিশ্চয় পোদো একেবারে মারা পড়েনি। তার মানে, শ্মশানে গিয়ে যেভাবেই হোক বেঁচে উঠেছিল—কিংবা কোনও সাধুর দয়ায় প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। আমাদের খবরটা কোনও কারণে জানানো হয়নি।

ছেলেমানুষের বুদ্ধিতে এভাবেই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করলুম। মরিয়া হয়ে মন্দিরের জঙ্গলে ঢুকে পড়লুম।

সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে বললুম,—পোদো! তুই বেঁচে আছিস?

পোদো ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় চুপ করতে বলল। তারপর বারান্দার ওপর থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ ফেলে দিল। কাগজটা খুলে দেখি, সংস্কৃতের প্রশ্নের কতকগুলো উত্তর লেখা রয়েছে। ঠিক এগুলোই আমার জানা ছিল না।

কাগজে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা উত্তরগুলো প্রাণপণে মুখস্ত করতে থাকলুম। পোদোর বাঁচা-মরা ব্যাপারটা তখন মাথায় আর নেই, পরীক্ষা বলে কথা।

একটু পরেই আচমকা কে আমার কান ধরে ফেলল। অমনি আঁতকে উঠে দেখি পণ্ডিতমশাই।

পণ্ডিতমশাই চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন,—ওরে হতচ্ছাড়া তস্কর। ওরে কূটবুদ্ধি কুষ্মাণ্ড! পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়ে এখন এমনি করে চুরির রাস্তা ধরেছ?

কাঁদোকাঁদো স্বরে বললুম,—না স্যা-স্যার। পো-পো-পো...

চোপরাও! স্তব্ধ হও তস্কর বালক! —পণ্ডিতমশাই আমাকে সেই কাগজটা শুদ্ধু হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন।...

ক্লাস এইটে ফেল করেছিলুম সেবার—সেই ওই পোদোর ভূতের জন্যেই। কিন্তু কেউ কি সেকথা বিশ্বাস করল? বাবা বলেছিলেন—পড়াশুনা করবে না। তাই টুকলিফাই ছাড়া উপায় ছিল না। ধরা পড়ে বেচারা পোদোর ঘাড়ে চাপাচ্ছে!

কিন্তু কাকে বোঝাব, ব্যাপারটা কত সত্যি। আমি বলেছিলুম—কিন্তু হাতের লেখাটা তো আমার নয়! পোদোর লেখা ওটা। মিলিয়ে দেখ না।

শুনে দাদা বলেছিলেন,—হতভাগা। অসুখের আগে পোদো তোর কাছে সংস্কৃতের মানে বইটা নিয়ে গিয়েছিল না? আমি দেখেছি, বইটা ফেরত আনার পর ওটার মধ্যে পোদোর হাতে লেখা একটা কাগজ ছিল। চালাকি করিস নে!

আমি কিন্তু দেখিইনি কোনও কাগজ। যাক গে, যা হওয়ার হয়েছে। এই গল্পটা অ্যাদ্দিন কাকেও বলিনি। বললেই বলবে, টুকলিফাই করে ভূতের ঘাড়ে দেওয়া হচ্ছে। মহা ধড়িবাজ ছেলেরে বাবা!

বকুলগাছের লোকটা

এ আমার ছেলেবেলার কাহিনি। ইচ্ছে হলে বিশ্বাস না করতেও পারো কেউ! কিন্তু সত্যি ঘটেছিল।

এক শীতের সকালে পুবের বারান্দায় ঝলমলে রোদ্দুর খেলছে। আমি আমার বোন ইলু সতরঞ্চি পেতে বসে খুব চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করছি। কদিন বাদেই বার্ষিক পরীক্ষা কি না! তার ওপর মেজকাকা বলে দিয়েছেন, যত জোরে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করবি, তত ভালো রেজাল্ট হবে। ইলু তো গলা ভেঙে ফেলল উৎসাহের চোটে। কিছুক্ষণ পরে শুনি, ফ্যাঁস-ফ্যাঁস আওয়াজ বেরুচ্ছে বেচারির গলা থেকে। সে মাঝে-মাঝে বই থেকে মুখ তুলে করুণ চোখে তাকিয়ে যেন মেজকাকাকেই খুঁজছে।

মেজকাকার পাত্তা নেই। আমি বললুম,—ইলু, বরং জল খেয়ে আয়!

ইলু ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল,—যদি মেজকাকু এসে পড়েন!

—তুই ঝটপট খেয়ে আয় গে না! আমি বলব মা ইলুকে ডেকেছেন।

এই শুনে ইলু জল খেতে গেল ভেতরে। আমি আবার চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করেছি, মোগল সম্রাট আকবর...মোগল সম্রাট আকবর...,' সেই সময় কোত্থেকে হেঁড়ে গলায় কে বলে উঠল,—কী পড়া হচ্ছে খোকাবাবু?

আমাদের বাড়ির এদিকটায় বাগান। বাগানের ওপাশে ধানখেত। সবে পাকা ধান কেটে নিয়েছে চাষিরা। সেদিকে দূরে ঘন নীল কুয়াশা ভাসছে, যেন বুড়ো মাঠ আলোয়ান গায়ে দিয়ে এখন ঘুম-ঘুম চোখে তাকিয়ে আছে। বারান্দা থেকে কয়েক মিটার তফাতে আছে একটা ঝাঁকড়া বকুলগাছ। মনে হল, আওয়াজটা এসেছে ওই থেকেই। তাই মুখ তুলে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। খুঁজছি কে কথা বলল।

হঠাৎ দেখি, বকুলগাছ থেকে হনুমানের মতো ধুপ করে নিচে লাফিয়ে পড়ল একটা বেঁটে নাদুসনুদুস গড়নের লোক। হাঁটু অব্দি পরা ধুতি, খালি গা, কুচকুচে কালো রং। বুকের ওপর দিয়ে একটা পৈতে ঝুলছে। তার মাথার কাঁচাপাকা চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, খোঁচাখোঁচা হয়ে আছে। টিকিতে ফুল গোঁজা। তার গোঁফগুলোও সেইরকম বিচ্ছিরি। হাতে একটা হুঁকোও আছে। পায়ে খড়ম আছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল। তারপর এগিয়ে আসতে লাগল। আমি তো অবাক। হাঁ করে তাকিয়ে আছি। নাকে ভুর-ভুর করে তামাকের মিঠে গন্ধ ভেসে আসছে। আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই ঠিক এমন সুগন্ধি তামাক খেতেন।

কিন্তু বকুলগাছে এমন হুঁকো খাওয়া বিদঘুটে চেহারার লোক থাকাটা যদি বা মেনে নেওয়া যায়, তার এভাবে পড়া-ডিস্টার্ব করতে আসাটা মোটেও উচিত হয়নি। মেজকাকা থাকলে নিশ্চয় আপত্তি করতেন।

সে হুঁকোয় গুড়ুক-গুড়ুক আওয়াজ করে টান দিতে-দিতে আমার একটু তফাতে

পা ঝুলিয়ে বসল। তারপর হুঁকো নামিয়ে বাঁ-হাতে ধরে রেখে বলল,—কী? ওটা কী পড়া হচ্ছে?

গম্ভীর মুখে জবাব দিলুম,—ইতিহাস।

এই শুনে সে খিকখিক করে হেসে উঠল,—ইতিহাস? সে আবার কেমন হাঁস খোকা? অ্যাঁ? ঢের-ঢের হাঁসের নাম শুনেছি। ইতিহাস নামে কোনও হাঁসের কথা তো শুনিনি!

কী বোকা লোক রে বাবা! হাসি পেল,—বললুম, না, না, হাঁস নয়। ইতিহাস।

লোকটা বলল,—সেই তো বলছি গো! পাতিহাঁস, এলেহাঁস, বেলেহাঁস, জলহাঁস, রাজহাঁস, বুনোহাঁস—কত রকম হাঁস আছে। সেসব ছেড়ে ওই উদ্ভুটে ইতিহাঁস নিয়ে পড়াটা সুবিধের নয়। বরং ওই যে কী বলে পাতাল হাঁস—নাকি হাঁসপাতাল—সেটাও মন্দ নয়!

এবার একটু রাগ হল। বললুম,—তুমি কিস্যু বোঝো না!

বুঝি না? আমি বুঝি না? লোকটাও চটে গিয়ে মুখখানা তুম্বো করে ফেলল! আমি বুঝি না তো কে বোঝে শুনি? কোথায় থাকে তোমার ইতিহাঁস?

বইয়ের পাতা দেখিয়ে বললুম,—এই তো এখানে থাকে।

সে আবার ফিক করে হাসল,—ওই শুকনো খসখসে বইয়ের পাতায় ইতিহাঁস থাকে? বলছ কী খোকা! খায় কী? এখানে তো দেখছি জলটল একফোঁটা নেই। সাঁতার কাটছেই বা কেমন করে?

বুঝলুম, বকুলগাছের এই হুঁকোখোর লোকটা একটি মুখ্যু। লেখাপড়াই জানে না। তাই ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বললুম,—ইতিহাঁস নয়, ইতিহাস। এর মানে কী জানো?

সে আপত্তি করে বলল,—আমাকে মানে বোঝাতে এসো না! বিস্তর হাঁস দেখে-দেখে বুড়ো হয়ে গেলুম। দিনরাতে ঝাঁকে-ঝাঁকে ডানা শনশন করে কত হাঁস আসছে-যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। কত রকম গানও গায়, জানো? শোনো। বলে সে হেঁড়ে গলায় গুনগুন করে গেয়ে উঠল :

তেপান্তরের মধ্যিখানে
মস্ত একটা বিল আছে
কলমিদামে শালুক পানায়
কত যে ফুল ফুটতাছে
শামুক বুড়ো চিংড়িবুড়ি
বড় সুখে রোদ পোহায়
যে যাবি ভাই আয় রে সাথে
শনশনিয়ে আয় রে আয়—

গানটা কেমন ঘুমঘুম সুরে ভরা। শুনতে-শুনতে হাই ওঠে। ঢুলুনি চাপে। শীতের লম্বা রাতের বেজায় লম্বা ঘুমের পর এই মিঠে রোদের সক্কালবেলায় আবার ঘুমিয়ে পড়াটা বিপজ্জনক। মেজকাকা এসে টের পেলেই চুল খামচে ধরবেন।

গান শেষ করে লোকটা চোখ নাচিয়ে বলল,—দারুণ গান, তাই না? বলে সে আবার গুড়ুক আওয়াজ করে হুঁকো টানতে থাকল।

আমি ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে বললুম,—গানটা ভালো লাগল। তবে বড্ড ঘুম পায় যে। ওগো লোকটা, তুমি বরং রাতের শোওয়ার সময় এসো। এখন যাও। পড়ায় ডিসটার্ব কোরো না। মেজকাকা বকবেন।

—কে তোমার মেজকাকা? ঢ্যাঙা রোগামতো ছোকরাটা বুঝি?

—চুপ! ও কথা বোলো না। মেজকাকাকে রোগা বললে আগুন হয়ে ওঠেন। মেজকাকার একটা কুকুর আছে, জানো তো? তার নাম কালু। কালুকে—

এ পর্যন্ত শুনেই লোকটা যেন চমকে উঠল। চাপা গলায় জিগ্যেস করল,—কালু এখন বাড়িতে আছে নাকি?

বললুম,—মনে হচ্ছে না। থাকলে এতক্ষণ তোমাকে—

—ওরে বাবা! বোলো না, বোলো না!

ওকে ভয় পেতে দেখে খুব মজা লাগল। বললুম,—তাই তো বলছি, পড়ায় ডিসটার্ব না করে তুমি কেটে পড়ো। এক্ষুণি কালু এসে পড়তে পারে। বোধহয় মেজকাকার সঙ্গে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে।

লোকটা উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল,—তাহলে আসি। আমার কথা কাকেও বোলো না যেন। পরে সময়মতো এসে তোমাকে আরও হাঁসের গান শোনাব। ইচ্ছে করলে দেখতে যেতেও পারও হাঁসেরা কোথায় থাকে! কিন্তু তাই বলে সেখানে তোমার ওই ইতিহাঁস দেখতে পাবে ভেবো না। তোমার পড়ার বইতে মিথ্যে লিখেছে! বরং ওই যে কী বলে পাতালহাঁস বা হাঁসপাতাল সত্যি হলেও হতে পারে!

এই বলে সে খড়ম পায়ে চাপা খটখট শব্দ তুলে বকলুগাছে দিব্যি চড়ে গেল এবং ঝাঁকড়া ডালপালার মধ্যে অদৃশ্য হল। আমি অবাক হয়ে বসে রইলুম। আমাদের বাগানের বকুলগাছটাতে এমন কেউ থাকে তা তো শুনিনি। বাবা মা মেজকাকা সেজকাকা ছোটকাকা কেউই বলেনি?

ইলু এতক্ষণে এসে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল,—কী রে বিশু? কী দেখছিস অমন করে? সেই লেজঝোলা পাখিটা?

উঁহু, বকুলগাছের লোকটা পই-পই করে বারণ করেছে। কাকেও ওর কথা বলব না।

—কী রে বিলু? বলছিস না যে! বারবার জিগ্যেস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে না বুঝি?

ইলুকে পাত্তা না দিয়ে আবার পড়া শুরু করলুম : মোগলসম্রাট আকবর মোগলসম্রাট আকবর—ইতিহাস না—পাতিহাঁস, এলেহাঁস, বেলেহাঁস, রাজহাঁস পুষতে ভালোবাসতেন। তাই তিনি—

ইলু অবাক হয়ে বলল,—কী পড়ছিস রে। দাঁড়া মেজকাকা আসুক—

বকুলগাছের লোকটার কথা আমি কাকেও বলিনি। সেই যে ওর সঙ্গে আমার

আলাপ হয়ে গেল, তারপর কতবার এই বারান্দা কিংবা বাগানে একলা হলেই সে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। কতরকম মজার-মজার গল্প শুনিয়েছে। কত আজব ছড়া!

কিন্তু মুশকিল বাধাচ্ছিল মেজকাকার কুকুর কালু। বেশ দুজনে কথা বলছি, হঠাৎ কালুটা কোথায় ঘেউ-ঘেউ করে ওঠে, অমনি লোকটা বকুলগাছে লুকিয়ে পড়ে। কালুটা মহাপাজি। গাছটা চক্কর দিয়ে ওপরে মুখ তুলে কতক্ষণ ঘেউ-ঘেউ করে। আমি ওকে তাড়াতে গেলে দাঁত বের করে আমাকেই কামড়াতে আসে। আমি ঢিল ছুঁড়ে তাড়াই।

একদিন বিকেলে স্কুল থেকে শেষ পরীক্ষা দিয়ে ফিরে বাগানে একলা দাঁড়িয়ে ওর একটা গল্প শুনছি। গল্পটা দারুণ মজার। আমাদের গাঁয়ের এক শাকতোলানী বুড়ি গেছে তেপান্তরের মাঠের মধ্যিখানে সেই হাঁসচরা বিলে। বুড়িটা ছিল বড্ড কুঁদুলী। লোকে বলত পাড়াকুঁদুলী। কারণ, পাড়ার লোকের সঙ্গে হুট করতেই কোঁদল জুড়ে দিত।

সেই পাড়াকুঁদুলী বুড়ি আপন মনে হাঁসচরা বিলে কলমি শাক তুলছে। তার স্বভাব যাবে কোথায়? একটা শামুকের শুঁড়ে ওর ঠ্যাঙে সুড়সুড়ি লেগেছে বলে বুড়ি তার সঙ্গে কোঁদল জুড়ে দিয়েছে।

বুড়ি নেচে নেচে ছড়া গেয়ে কোঁদল করছে :

তোর মুণ্ডু খাই, তোর কত্তাবাবার খাই।
কড়মড়িয়ে খাই আমি মড়মড়িয়ে খাই।
খেয়েদেয়ে ড্যাঙডেঙিয়ে নাতির বাড়ি যাই—

এদিকে হয়েছে কী, জলার ধারে থাকে এক শাঁকচুন্নী। সেও পেত্নিপাড়ার নামকরা কুঁদুলী। শাঁখ, গুগলি, কাঁদা আর শামুক তার খাদ্য। এ বুড়ি যেমন পেটের জ্বালায় শাক তুলতে গেছে সেই শাঁকচুন্নীও তেমনি পেটের জ্বালায় গুগলি, শামুক খুঁজতে গেছে। শাকতোলানীর গলা পেয়ে সে ট্যাঙস-ট্যাঙস করে সেখানে হাজির হয়েছে। হয়ে বলেছে,—কী কী কী?

ব্যস! দুই কুঁদুলীতে লেগে গেছে তুমুল কোঁদল। কেউ থামবার নয়। পরস্পর আঙুল তুলে পরস্পরকে শাসাচ্ছে। সে কী চিলচ্যাঁচানি! সে কী নাচনকোদন!

হেন সময়ে জলার হাঁসদের রাজার কানে গেছে সেই খবর। হাঁসের রাজা রাজহাঁস খাপ্পা হয়ে বলল :

'প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁকোর প্যাঁক—
শিগগির গে দ্যাখ তো
কারা দেখায় জাক রে
কাট তাদের নাক
তবু না থামে যদি,
কাটিস চুল আর দুকানের লতি

প্যাঁক প্যাঁকোর প্যাঁক

শিগগির দ্যাখ তো।।...'

হুকুম পেয়েই জলার যত পাতিহাঁস বেলেহাঁস শনশনিয়ে ডানা কাঁপিয়ে ঝাঁকেঝাঁকে আসতে লেগেছে। আকাশ-বাতাসে হুলুস্থুল। জলার জল ঢেউয়ে তোলপাড়। তারপর কিনা...

আচমকা ঘেউ-ঘেউ! ঘেউ-ঘেউ! বাড়ির ভেতর থেকে হতচ্ছাড়া কালুটা বেরিয়ে বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়ল এবং তাকে দেখেই আমার বকুলগাছের হুঁকোখেকো বন্ধুবেচারা এক লাফে গাছে চড়ে অদৃশ্য হল। তার হুঁকোটা পড়ে গেল হাত ফসকে। কলকে উল্টে ছাই পড়ল গড়িয়ে। আগুনের ফুলকি উঠল চিড়বিড়িয়ে। বগবগ করে একটু জলও হুঁকোর খোলের ফুটো থেকে গড়িয়ে পড়ল।

কালু চেঁচামেচি করে গাছ চক্কর দিচ্ছে। এমন সময় মেজকাকা বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। এসেই কালুকে ধমক দিয়ে বললেন,—শাট আপ! শাট আপ!

কালু থামবার পাত্র নয়। সে মেজকাকুর কাছে এসে হাঁটুর কাছে মুখ তুলে কেঁউমেঁউ করে কী বলল। তারপর আবার দৌড়ে গেল গাছতলায়।

এবার মেজকাকা সন্দেহাকুল চোখে গাছটা দেখতে-দেখতে বললেন,—গাছে হনুমান আছে নাকি রে বিলু?

বললুম,—না মেজকাকু । কালু একটা কাঠবেড়ালি দেখেছে।

হঠাৎ গাছতলায় উল্টে থাকা হুঁকোটার দিকে চোখ গেল মেজকাকার। হুঁকোটা তুলে নিয়ে অবাক হয়ে বললেন,—এ কার হুঁকো রে বিলু?

—আমি তো জানিনে মেজকাকু।

মেজকাকু ধমক দিয়ে বললেন—জানো না? এখনও কলকের আগুন রয়েছে। কে হুঁকো খাচ্ছিল বল হতভাগা?

—জানিনে মেজকাকু।

আলবাৎ জানিস!—বলে হুঁকোটা তুলে ভুড়ুক-ভুড়ুক করে কয়েকটা টান মেরে মেজকাকা ফুরফুর করে ধোঁয়া উড়িয়ে দিলেন। বাঃ। এ তো ভারি সুগন্ধি তামাক!

—ও মেজকাকু! ছ্যা-ছ্যা! তুমি হুঁকো খাচ্ছ? বলে দেব বাবাকে?

মেজকাকু চোখ টিপে বললেন,—চুপ। লেবেনচুস দেব। তারপর মনের আনন্দে হুঁকো খেতে থাকলেন। ততক্ষণে কালু মেজকাকার কাছে ফিরে এসে মুখ তুলে তামাকের গন্ধ শুঁকছে। কালুর মুখটা বেজায় গম্ভীর। চোখে সন্দেহের চাউনি।

তারপর কালু আমার কাছে এসে বেজায় ধমক দিল বারতিনেক। আমি অবিকল মেজকাকার গলায় বললুম,—শাট আপ কালু। শাট আপ।

কালু যেন কুকুরের ভাষায় পাল্টা ধমক দিয়ে বলল,—চালাকি কোরো না বিলু। সব বুঝতে পেরেছি আমি। তারপর সে কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করে লেজ তুলে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

মেজকাকা তারিয়ে-তারিয়ে হুঁকো খাওয়ার পর চাপাস্বরে বললেন,—এই বিলু, আরও দুটো লেবেনচুস দেব। বল না, কার হুঁকো এটা?

বলব, না বলব না ভাবছি—হঠাৎ বিদঘুটে ব্যাপার ঘটে গেল। ততক্ষণে শীতের বেলা ফুরিয়ে এসেছে। বাগানে আর একটুও দিনের আলো নেই। আবছায়া ঘনিয়েছে। গাছগুলো গায়ে কুয়াশার চাদর টেনে নিয়েছে। সেই ধূসর কুয়াশা আর আবছা অন্ধকারে বকুলগাছটা থেকে একটা মস্ত লম্বা কালো হাত বেরিয়ে খপ করে মেজকাকার হাত থেকে হুঁকোটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

অমনি মেজকাকা আঁতকে উঠে গোঁ-গোঁ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

আর আমিও এতদিন পরে এতক্ষণে ঝটপট বুঝে নিয়েছি, বকুল গাছের বন্ধুটি খুব সহজ লোক নয়। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছি সঙ্গে-সঙ্গে।

আমার চেঁচামেচিতে বাবা বেরিয়ে এলেন। মা এলেন। আর সব কাকারা এলেন। সে এক হুলুস্থুলুস ব্যাপার। আলো আন! জল আন! পাখা আন!

পরদিন সকালে বুধু ওঝাকে ডেকে আনা হল। সে নাকি ভূতপ্রেতের যম। লোকে বলে বুধু ওস্তাদ। সে মেজকাকাকে খুব ঝাঁড়ফুঁক করে বলল,—বলুন, নেই।

মেজকাকা মিনমিনে স্বরে বললে,—নেই।

তারপর বুধু গাছটার চারপাশে ঘুরে দেখে-শুনে বাবাকে বলল,—বড়বাবু! এই গাছটা আজই কেটে ফেলুন। এ গাছে ব্রহ্মদত্যি আছে।

বাবা ভয় পেয়ে বললেন,—বলো কী হে ওস্তাদ!

আজ্ঞে হ্যাঁ বড়বাবু। —বলে বুধু আমার দিকে যেন চোখে তাকিয়ে ফের বলল,—আমার মনে হচ্ছে, খোকাবাবুর দিকেও নজর পড়েছে ওনার। কেমন যেন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে! হুঁ—খোকাবাবুর চোখে ব্রহ্মদত্যিমশাইকে দেখতে পাচ্ছি। ওই তো হুঁকো টানছে গুড়ুক গুড়ুক করে।

মা সভয়ে আমাকে টেনে নিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ। খোকা কিছুদিন থেকে ভালো করে খাচ্ছেটাচ্ছে না। খালি বকুলতলায় মন পড়ে থাকে। কী যেন ভাবে আর বিড়বিড় করে কথা বলে।

আমি বললুম,—ভ্যাট। আমার কিস্যু হয়নি।

বুধু আমার বুকে তার কড়ে আঙুল ছুঁইয়ে বিড়বিড় করে কী মন্ত্র পড়ল। তারপর ঘুরে বকুলগাছটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ধমক দিল,—যা, যা! ভাগ!—

সেদিন দুপুরে দেখি, মকবুল কাঠুরেকে ডেকে আনা হয়েছে। সে কুডুল দিয়ে গাছটার কাছে যেতেই আমি কান্নাকাটি জুড়ে দিলুম। মেজকাকা আমাকে থাপ্পড় তুলে ধমক দিলেন,—শাট আপ! শাট আপ!

আমার চোখের সামনে নিষ্ঠুর মকবুল কাঠুরে গাছটার গোড়ায় কোপ মারতে শুরু করল। দুঃখে-রাগে আমি অস্থির। কিছুক্ষণের মধ্যেই অত সুন্দর বকুলগাছটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। মকবুল দাঁত বের করে হেসে বলল,—এবার শীতের রোদ্দুর অনেকটা পাবেন বাবুমশাই। এখানে ফুলের গাছ লাগাবেন। দেখবেন, রাঙা-রাঙা ফুল ফুটবে।

ঘুঘুডাঙার ব্রহ্মদৈত্য

ভূতের স্বপ্ন তো সবাই দেখে! তাই বলে কি ভূত বিশ্বাস করতে হবে? এই হচ্ছে ভবভূতিবাবুর স্পষ্ট কথা। তিনি যৌবনে দুর্দান্ত শিকারি ছিলেন। বনে জঙ্গলে পোড়ো-বাংলোয় ঘুরেছেন। কোথায় ভূত?

তাঁর বন্ধু গজপতি গোঁ ধরলেন,—আজকাল এই ভিড়-হল্লা-আলো আর যন্তরের ঠেলায় বেচারি ভূতেরা থাকবে কোথায়? তাই মানুষের স্বপ্নে গিয়ে আড্ডা নিয়েছে। গজপতি আরও বলেন, উপায়টা কী? মানুষের হাতে আজকাল কতরকম জব্বর অস্ত্রশস্ত্র। অ্যাটমবোমা, হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা। তার ওপর কতরকম সাংঘাতিক ওষুধপত্র বেরিয়েছে। তাই ভূতেরা মানুষের স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গিয়ে নিরাপদে কাটাচ্ছে। স্বপ্নে মানুষ তো একেবারে অসহায় বুঝলে না?

ভবভূতি তা মানতে রাজি নন।

বলেন,—হ্যাঁ, একথা সত্যি, সুন্দরবন বাঘ প্রকল্পের মতো রামচন্দ্রপুর ভূত প্রকল্পের এক অদ্ভুত অভয়ারণ্যের স্বপ্নে ভ্রমণ করে এসেছি। কিন্তু স্বপ্ন ইজ স্বপ্ন। অর্থাৎ স্বপ্ন জিনিসটা জলজ্যান্ত মিথ্যে। যাকে পদ্যে বলে, 'আপন মনের মাধুরী'।

মাধুরী? —বলে গজপতি চোখ কটমট করে তাকান। —মাধুরী বলছ?

গজপতিকে অমন করে তাকাতে দেখে ভবভূতি বাঁকা হেসে বলেন,—আলবাত মাধুরী।

গজপতি বলেন,—মাধুরীকে তুমি চেনো?

ভবভূতি অবাক,—কী কথায় কী বলেন—তার মানে?

—মাধুরী ছিলেন আমার পিসতুতো দিদি। তাঁর বিয়ে হয়েছিল ঘুঘুডাঙায়! জামাইবাবু ছিলেন রেলের গার্ড। অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। তারপর—

কিস্যু বুঝলাম না। —ভবভূতি বাধা দিয়ে বলেন।

বিরক্ত গজপতি বলেন,—কথা শেষ করতে দেবে তো? খালি তক্ক আর তক্ক। ঘুঘুডাঙা রেল ইয়ার্ডের ওদিকে এক একর জায়গায় একটা বাড়ি ছিল জামাইবাবুর। পৈতৃক বাড়ি। ওর মৃত্যুর পর সেই বিশাল বাড়িতে একা মাধুরীদিদি থাকতেন।

ভবভূতি খিক-খিক করে বলেন—আর থাকতেন তোমার জামাইবাবু, অর্থাৎ ভূত।

গজপতি রীতিমতো গর্জন করে বলেন,—না ব্রহ্মদৈত্য!

ব্রহ্মদৈত্য! —ভবভূতি তাজ্জব হয়ে যান।

—হ্যাঁ। উঠোনের কোনায় একটা বেলগাছ। সেই গাছ থেকে সে মাঝে-মাঝে রাতদুপুরে প্রায়ই উঠোনে পায়চারি করতে নামত। মাধুরীদি জেগে থাকলে বলতেন,—কী গো! গরম লাগছে বুঝি? ব্রহ্মদৈত্য বলত,—না গো! আজ সন্ধেবেলা একটা ভোজ ছিল। খাওয়াটা বেজায় রকমের হয়ে গেছে। তাই হজম করার তালে আছি। তো

তখন মাদুরীদিদি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে হজমের গুলি দিতে ডাকছেন,—নাও গো! টুক করে গিলে ফেলে এক গেলাস জল খেও। সব হজম হয়ে যাবে। ব্রহ্মদৈত্য মস্ত লম্বা কালো হাতখানা জানলা অবধি বাড়িয়ে দিত। হাতে কাঁড়ি-কাঁড়ি লোম।

ভবভূতি আরও হেসে বলেন,—তুমি দেখেছ?

না দেখেছি তো কি বানিয়ে বলছি? —গজপতি গম্ভীরমুখে বলেন। —আমার বয়েস বারো-তেরো হবে। ক্লাস এইটে পড়ি। মাধুরীদির ছেলেপুলে ছিল না বলে আমাকে মাঝে-মাঝে নিয়ে যেতেন। খাটে শুয়ে পিটপিট করে তাকিয়ে ওইসব কাণ্ডকারখানা দেখতুম। বলতুম,—ও কে দিদি, যাকে হজমি গুলি দিলে? মাধুরীদি বলতেন,—চুপ, চুপ। বলতে নেই।

ভবভূতি বলেন,—সে বাড়িটা এখনও নিশ্চয়ই আছে?

—হুঁ আছে। মাধুরীদি অবশ্য বেঁচে নেই।

—বাড়িতে কে থাকে এখন?

এবার গজপতি বাঁকা হেসে বলেন,—যাবে নাকি? বাড়িটা খালি পড়ে আছে। হানাবাড়ি হয়ে গেছে। কতবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হল কাগজে। সস্তায় বেচে দিতে চেয়েছিল মাধুরীদির বড় জায়ের ছেলে ত্রিলোচন। সে-ই এখন বাড়ির মালিক। কিন্তু বাড়ির বদনাম শুনে সবাই পিছিয়ে যায়। তাই বাড়িটা তেমনি খালি পড়ে আছে।

ভবভূতি বলেন,—বাড়িটা আমি কিনব।

—বলো কী?

—হ্যাঁ। কিছুদিন থেকে আমি নিরিবিলি জায়গায় একটা বাড়ি খুঁজছি। ইচ্ছে আছে, সেখানে একা থাকব এবং কিছু এক্সপেরিমেন্ট করব।

—কীসের এক্সপেরিমেন্ট, শুনি।

ভবভূতি ফের নিজস্ব বাঁকা হাসিটা হেসে বলেন,—নিশ্চয় ভূত নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট নয়, কুকুর নিয়ে।

গজপতি প্রায় আকাশ থেকে পড়ার মতো বলেন,—কুকুর নিয়ে মানে?

—তোমাকে বলিনি। কিছুদিন থেকে আমি কুকুর নিয়ে একটু-আধটু গবেষণা করছি। আমার গবেষণার বিষয় হচ্ছে, কুকুরের ভাষা। ওদের যে নিজস্ব ভাষা আছে, তাতে কোনও ভুল নেই, সেই ভাষা আমার শেখা চাই-ই।

গজপতি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকার পর বলেন,—তা হঠাৎ এই আজগুবি ব্যাপারটা তোমার মাথায় চাপল কেন শুনি?

ভবভূতি গম্ভীরমুখে বলেন,—তুমি তো সারাজীবন খালি আইনের প্রকাণ্ড কেতাব পড়েই কাটালে! আদালত আর জজসায়েব ছাড়া কিস্যু বোঝোও না।

কৌতূহলী গজপতি বলেন,—আহা, বুঝিয়ে বলো না একটু!

—বললেও বুঝবে কী? তুমি তো ঋগ্বেদ পড়োনি। সরমা ছিলেন কুকুরদের মা। সরমার ছেলেমেয়েদের নাম তাই সারমেয়। দেবতাধিপতি ইন্দ্র সরমাকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন—

গজপতি বাধা দিয়ে বলেন,—আহা হলটা কী তাতে?

ভবভূতি চটেমটে বলেন,—হল তোমার মাথা আর মুন্ডু! সে যুগে কুকুররাই দূতের কাজ করত বুঝতে পারছ না? তাদের যদি ভাষা না থাকবে তাহলে তাদের দূত করা হল কেন? তাছাড়া ঋগ্বেদের আরেক জায়গায় আছে, একদল কুকুর কোরাস গাইছে। ভাষা না থাকলে—

ফের গজপতি বাধা দিয়ে খিক-খিক করে হেসে বলেন,—হুঁ, এখন আমাদের পাড়ায় রাতদুপুরে কুকুরেরা কোরাস গায়। বাপস! সে কী কোরাস!

ভবভূতির এবার গর্জনের পালা,—তুমি মূর্খ! শাস্ত্রজ্ঞানহীন নিতান্ত ইয়ে। নইলে মহাভারতে মহাপ্রস্থান পর্বে স্বর্গপথে যুধিষ্ঠিরের পেছন-পেছন কুকুর যাওয়ার কারণটাও তুমি বুঝতে! বলো তো, কেন কুকুর পেছন-পেছন যাচ্ছিল?

কুকুর এখনও পেছন-পেছন যায়। সেদিন আমি কিলোটাক পাঁঠার মাংস কিনে আনছি, একটা কুকুর পিছু ধরেছিল—গজপতি হাসতে-হাসতে বলেন, নিশ্চয় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পাঁঠার মাংস ছিল। স্বর্গে তো জীবহত্যা নিষেধ। তাই মর্ত থেকে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

ভবভূতির পক্ষে এটা অসহ্য। রেগেমেগে বেরিয়ে গেলেন তক্ষুনি। গজপতির পরে হুঁশ হল। তখন বেরিয়ে গিয়ে আদুরে স্বরে ডাকে,—ভবী! ভব! ও ভবা!

কোথায় ভবভূতি! তাঁর মান্ধাতার আমলের খনখনে বিলিতি গাড়ির লেজের ডগাটুকু মোড়ে একবারের জন্যে দেখতে পেলেন গজপতি।

খুব রেগেছে। তা রাগুক—গজপতি মনে-মনে বললেন। একটু পরে জল হয়ে যাবে। দুই বন্ধুর এমন রাগারাগি দৈনিক পাঁচ-সাতবার হয়। আবার মিল হতেও দেরি হয় না!

তবে অন্যবারে রাগ পড়তে ভবভূতির যতটা সময় লাগে, এবার লেগেছিল তারও কম।

এর এক নম্বর কারণ, গজপতির পিসতুতো দিদির সেই হানাবাড়ি কেনার ইচ্ছে!

দুই নম্বর কারণ, ভবভূতি ভূত বিশ্বাস করেন না। গজপতির কাছে প্রমাণ করতে চাইছিলেন, ভূত বলতে কিস্যু নেই। সুতরাং গজপতি মিথ্যুক।

তিন নম্বর কারণ, ভবভূতির কুকুর নিয়ে নিরিবিলি গবেষণা!

বাড়িটার মালিক ত্রিলোচন থাকে হাজারিবাগে। ভবভূতির তর সইছিল না। গজপতিকে বলে টেলিগ্রাম করিয়ে তাকে কলকাতায় আনালেন এবং রাতারাতি বাড়িটা কিনে ফেললেন! সস্তায় কিনলেন বলা যায়। ত্রিলোচন যা পেল, তাই লাভ। ঘুঘুডাঙা রেল ইয়ার্ডের ওদিকে কোন ভদ্রলোক গিয়ে বাস করতে চাইবেন? রেল ইয়ার্ডে হরদম ট্রেন, মালগাড়ি আর ইঞ্জিনের বিকট বাজখাঁই চ্যাঁচামেচি, তার ওপর ভূত ওরফে ব্রহ্মদৈত্যের গুজব। তবে হ্যাঁ, কারখানার জন্যে কেউ কিনতেও পারতেন। কিন্তু ত্রিলোচনের কাকিমা মাধুরীদেবী নাকি বলে গিয়েছিলেন,—কলকারখানা হলে উনি অর্থাৎ ব্রহ্মদৈত্য-মশাই রিফিউজি হয়ে যাবেন। খবরদার বাবা তিলু, এই কম্মটি কোরো না! ওতে পাপ তো হবেই, তার ওপর উনি রেগে গিয়ে তোমাদের পিছনে লাগবেন।

তিলু বা ত্রিলোচন গজপতির মতো ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী। এছাড়া সে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার করে। ব্রহ্মদৈত্য-মশাইয়ের চেহারার যা বর্ণনা শুনেছে সে, তাতে তার হাজারিবাগে ছোট্ট বাড়িটার ওপর তিনি গিয়ে একখানা পা রাখলেই পৌরাণিক গল্পের সেই তিনপেয়ে বামনাবতারের বলিরাজার মাথায় পা চাপানোর ব্যাপারটাই ঘটে যাবে। অর্থাৎ চিঁড়েচ্যাপটা যাকে বলে।

যাই হোক, বাড়ি তো কিনে ফেললেন ভবভূতি। খুব পছন্দসই বাড়ি। কতকটা সেকালের কুঠিবাড়ির গড়ন। একতলা এবং উঁচু ছাদ। সাত-আট পাশাপাশি ঘর আছে। তার সঙ্গেই স্নানঘর, রান্নাঘর ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। বাড়ির চারদিকে লম্বা-চওড়া প্রচুর জায়গা। গাছপালা আছে। ঝোপঝাড় গজিয়ে জঙ্গল হয়ে আছে। চারদিকের পাঁচিল যথেষ্ট উঁচু। একদিকে মস্ত গেট, অন্যদিকে খিড়কির দরজা। গেটের সামনে খোয়াঢাকা অনেককালের অব্যবহৃত রাস্তা আছে একফালি। সেটা গিয়ে মিশেছে রেল ইয়ার্ডের কাছে চওড়া রাস্তার সঙ্গে। সেইদিকে একটু এগোলে ঘুঘুডাঙা রেলস্টেশন।

বিশাল উঠোনর কোনায় পাঁচিল ঘেঁষে সেই প্রকাণ্ড বেলগাছটা দেখতে পেলেন ভবভূতি। আনন্দে নেচে উঠলেন।

না, ব্রহ্মদৈত্যের জন্যে নয়। গাছটা ইয়া মোটা, বেলে ভর্তি। ভবভূতি বেলের সরবত পেলে আর কিছু খেতে চান না। একগাল হেসে গজপতিকে বললেন,—গজু, প্রতিদিন বেলের সরবতের নেমন্তন্ন রইল। এলেই পাবে।

গজপতি মুখে হ্যাঁ বললেন বটে, কিন্তু মনে-মনে বললেন—

—মাথা খারাপ? বেলের সরবতের জন্যে রোজ ট্রেনে চেপে ব্রহ্মদৈত্যর আখড়ায় আসব? আমি তো ভবুর মতো পাগল নই। ওই বেলে হাত দিলে ব্রহ্মদৈত্য-মশাই খড়মপেটা করবে না?

ভবভূতিকে গৃহস্থ করতে এসেছিলেন সেই প্রথমদিন। তারপর আর তিনি আসেননি। তবে দৈনিক একটা করে চিঠি লেখেন। লিখেই আশা করেন, এ চিঠির জবাব ভবভূতির বদলে তাঁর রাঁধুনি-কাম-চাকর নরহরিই লিখবে। বড় দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—কর্তাবাবু গতরাতে বেলতলায় পটল তুলেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মদৈত্য তাঁর ঘাড়টি মটকে দিয়েছে।

কিন্তু কোথায় কী? দিব্যি ভবভূতিরই জবাব আসে। নিজের হাতে লেখা। প্রিয় গজু, তুমি কি সম্প্রতি ন্যাড়া হইয়াছ? নতুবা আসিতেছ না কেন? প্রচুর বেল পাকিয়াছে। তোমার ব্রহ্মদৈত্য ভদ্রলোকটি বেজায় ভদ্র। তাঁহার সঙ্গে ভাব জমিয়াছে। তিনি ন্যাড়া বলিয়াই কদাচ বেলতলায় অবতরণ করেন না। মগডালে বসিয়া পাকা বেল পাড়িয়া দেন। আমি লম্বা বাঁশের ডগায় বাঁধিয়া অ্যালুমিনিয়ামের জগভর্তি সরবত পাঠাই। তিনি সরবত পান করিয়া জগটি নামাইয়া দেন। হ্যাঁ—গতকাল লিখিতে ভুলিয়াছি, তিনি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। বলিলেন, আহা! বালকটিকে দেখিলে বড় আনন্দ পাইতাম। ...

এই চিঠি পেয়ে গজপতি রেগে লাল,—চালাকি? ঠাট্টা করা হয়েছে 'বালক'

বলে? আমার বয়স পঁয়ষট্টি হয়ে গেল। আমাকে বালক বলা হচ্ছে? আমার গাল টিপলে দুধ বেরোয়, না আমি এখনও দুধুভাতু খাই যে আমাকে বালক বলেছে?

একটু পরে রাগ পড়ে গেল। না, হয়তো ঠিকই লিখেছে। ব্রহ্মদৈত্য-মশাই আমাকে সেই ছেলেবয়সে দেখেছেন। তাই বালক বলাটা স্বাভাবিক। হয়তো সত্যি-সত্যি ভবভূতি ওনার দর্শন পেয়েছে। এবং পেয়ে এতদিনে ভূতপ্রেতে বিশ্বাসও হয়েছে।

তাহলে ভয়ের কথা, ব্রহ্মদৈত্য এখনও মনে রেখেছেন গজপতিকে? ওরে বাবা, এ যে সাংঘাতিক কথা। আজই কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসতে হবে। হে মা কালী, যেন 'বেলগাছিয়াবাসী' কালো কুচকুচে, সর্বাঙ্গে লোমওয়ালা এবং খড়ম-পরা ভদ্রলোকটি আমাকে ভুলে যান। ওনার স্মৃতিভ্রংশ করিয়ে দাও মা!

না ভুললেই বিপদ। হয়তো ভবভূতিই তাঁকে প্ররোচিত করবেন গজপতির বাড়ি আসতে এবং তিনি নিছক স্নেহ-প্রদর্শনেই খড়ম পায়ে খট-খট করে রাতদুপুরে হাজির হয়ে হেঁড়ে গলায় ডেকে বলবেন,—গঁজু! কেমন আঁছিস বাঁবা?

গজপতি আঁতকে উঠে তক্ষুনি কালীঘাট ছোটেন—

ওদিকে ভবভূতি চমৎকার কাটাচ্ছেন ঘুঘুডাঙার বাড়িতে।

বাড়ির নাম দিয়েছেন—সরমা। ঋগ্বেদের সেই কুক্কুর জননী সরমা। তলায় ব্র্যাকেটে ইংরেজিতে লেখা আছে ঃ 'দি ডগ রিসার্চ সেন্টার।'

পূর্ব-দক্ষিণের একটা ঘরে থাকেন ভবভূতি। তাঁর পাশের ঘরে নরহরি ঠাকুর। তার ওপাশে রান্নাঘর। উত্তর পশ্চিমের মস্ত ঘরে রেখেছে পাঁচটা অ্যালসেশিয়ান, দুটো গ্রেহাউন্ড, তিনটে টেরিয়ার, আর সাতটা দিশি কুত্তা। এই সাতটা দিশি কুত্তার মধ্যে দুটো বাঘা, দুটো খেঁকি আর বাকি তিনটে নেড়ি। রীতিমতো আন্তর্জাতিক বাহিনী।

কদিনের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার ডেকে এনে ওই ঘরটা সাউন্ড প্রুফ করে নিয়েছেন। তার ফলে যতই চ্যাঁচামেচি করুক, বাইরে থেকে একটুও শোনা যাবে না।

মোট সতেরোটা কুকুরের জন্যে সতেরেটা কাঠের খাঁচাঘর আছে। সামনে লোহার গরাদ। চিড়িয়াখানায় যেমন বাঘের খাঁচা দেখা যায়, ঠিক তেমনি।

দেখাশোনা, খাওয়ানো, স্নান করানো—সবকিছুর ভার ভবভূতি নিজে নিয়েছেন। নরহরি কুকুর দেখলেই উল্টোদিকে দৌড়ায়। তাই পারতপক্ষে এ ঘরে ঢোকে না। ভবভূতি একটা প্রকাণ্ড নোটবইতে দুবেলা কুকুরগুলোর হাবভাব টুকে রাখনে। টেপ রেকর্ডারে টেপ চালিয়ে শোনেন! গম্ভীর মুখে ভাবনা-চিন্তা করেন। লেখেন। রীতিমতো গবেষণা কিনা!—

বেশ চলছিল এই রকম। রাতে কুকুরশালায় টেপরেকর্ডার চালিয়ে রাখছিলেন এবং সকালে নিয়ে এসে বাজিয়ে শুনছিলেন। নোট করছিলেন কোনও বৈশিষ্ট্য আছে নাকি। জীবজন্তুর ভাষা শেখা তো সহজ কথা নয়। টেপের একটা জায়গা বারবার বাজিয়ে শুনে তবে না কিছু বোঝা যাবে!

হঠাৎ একদিন সকালে টেপ বাজিয়ে শুনতে-শুনতে ভবভূতি অবাক হলেন।

টেপে সতেরোটা কুকুরের নানান হাঁকডাক অন্যদিন যেমন শোনেন, তেমনি

শুনতে পাচ্ছিলেন। তারপর কী একটা ঘটল। আচমকা ওরা চুপ করে গেছে। কোনও ডাক নেই! না ঘড়ঘড়, গরগর, গাঁগোঁ, খ্যাঁক-খ্যাঁক, ঘেউঘেউ, কিংবা ভ্যাকভ্যাক। হঠাৎ বেড়ালের মতো যেন মিউ গোছের নরম ডাক ডেকেই সবাই থেমে গেছে। গেছে তো গেছেই।

তারপর একটা কেমন শনশন শব্দে হল। তারপর ঘট ঘটাং!

তারপর খট খট, খট খট, খট খট—

শব্দটা ক্রমে ক্ষীণ থেকে জোরালো হয়ে বাজতে থাকল টেপে। তারপর থেমে গেল। কীসের শব্দ হতে পারে?

তারপর চকচক চকাম-চকাম—কুকুরগুলো খাওয়ার সময় যেমন শব্দ করে, সেইরকম! বেশ তালে-তালে শব্দগুলো বাজছে। ভোজের আসরে শেষপাতে চাটনির সময় চোখ বুজলে যেমন শোনা যায়। এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! কুকুরগুলোর তো এত রাতে কিছু খাওয়ার কথা নয়! খাবে যে, তা পাবেটা কোথায়?

অথচ শোনা যাচ্ছে, গত রাতে (হিসেব মতো তখন প্রায় বারোটা) ওরা খুব খাচ্ছে। খাচ্ছেটা কী? চাটনি? অসম্ভব। কুকুর তো চাটনি খায় না। চেটেপুটে খায় অবশ্য। কিন্তু চাটবেই বা কী? নিজের-নিজের লেজ? মনে হয় না তা। ভবভূতি কুকুরের লেজ চেটে না দেখলেও জানেন, মোটেও সুস্বাদু নয়।

ভবভূতি টেপ বন্ধ করে কুকুরশালায় ঢুকলেন। তাঁকে দেখে কুকুরগুলো কিন্তু অদ্ভুত আচরণ শুরু করল! ঘণ্টাটাক আগে এ ঘরে ঢুকেছেন! খাইয়েছেন। টেপ রেকর্ডারটা তুলে নিয়ে গেছেন। তখন ওরা স্বাভাবিক ছিল। অথচ এখন ওঁকে দেখে প্রত্যেকটা কুকুর গরগর করে উঠেছে। কুকুরের ভাষা এতদিনে যতটা বুঝেছেন, ওদের এই শব্দে রীতিমতো রাগ আছে। সবচেয়ে বেশি আদরের অ্যালসেশিয়ানটার খাঁচার সামনে যেতেই সে দাঁত বের করে কামড়াতে এল। গ্রেহাউন্ড দুটো শরীর লম্বা করে গাঁ-গাঁ করতে থাকল।

তারপরই প্রত্যেকটি খাঁচায় প্রত্যেকটি কুকুর লাফালাফি জুড়ে দিল। যেন খাঁচা ভেঙে ফেলবে। তাঁকে পেলে যেন ওরা টুকরো-টুকরো করে খেয়ে ফেলবে। সে কী হিংস্র হাঁকরানি!

ভবভূতি বিলিতিগুলোকে ইংরিজিতে এবং দেশিগুলোকে বাংলায় তর্জন-গর্জন সহকারে ধমক লাগালেন। একটা লাঠি নিয়ে এসে খুব ঠোকাঠুকি করলেন খাঁচার সামনে। কিন্তু কেউ ভয় পেল না বরং আরও খেপে গেল। ভবভূতির কানে তালা ধরে যাচ্ছিল ওদের চ্যাঁচামেচিতে।

· হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন কিছুক্ষণের জন্যে। এমন তো করে না ওরা। ব্যাপার কী?

অসহ্য লাগলে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। খুব রাগ হয়েছে। বেইমান নেমকহারাম! এত যত্ন করে রাখা হয়েছে! রোজ কাঁড়িকাঁড়ি দুধ, মাংস এইসব খাওয়ানো হচ্ছে। আর তার বদলে এই ব্যবহার!

রোস, আজ সারাদিন খাওয়া বন্ধ।

নিজের ঘরে ফিরে আবার টেপ বাজিয়ে রাতের রেকর্ড হওয়া শব্দগুলো শুনতে থাকলেন ভবভূতি। এই খট খট খট খট শব্দটা কীসের হতে পারে?

হঠাৎ চমকে উঠলেন। তাহলে কি ওটা খড়মের শব্দ?

অর্থাৎ বেলগাছের ব্রহ্মদৈত্য?

তাহলে কি সত্যি ব্রহ্মদৈত্য বলে কিছু আছে? এবং সেই ব্রহ্মদৈত্যই কি কুকুরগুলোকে রাতে কিছু খাইয়ে বশ করে ফেলেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে?

অথচ সকালে যখন দুধ-পাঁউরুটি খাওয়াতে গেলেন, তখন ওরা শান্তভাবে ছিল। এর মানে কী?

ভবভূতির মনে হল, নেহাত খাবার লোভে তখন জন্তুগুলো তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেনি। নেমকহারাম লোভী স্বার্থপর!

ভবভূতি যত ভাবলেন ব্যাপারটা, বিচলিত বোধ করলেন। ঠিক আছে, আজ রাতে তিনি জেগে থেকে পাহারা দেবেন। নরহরিকে সঙ্গে নেবেন। এ রহস্যের ফর্দাফাই না করলেই চলে না।

নরহরিকে ডেকে সব খুলে বললে তার মুখ যেন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাকে ওই বেলগাছের ব্যাপারটা এতদিন বলেননি। এটাকে যে হানাবাড়ি বলত লোকে, তাও জানে না সে। কেমন করে জানবে? সে বাঁকুড়ার লোক। ভবভূতির জামাই তাকে শ্বশুরের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জামাই ওখানে রোডস দফতরের ইঞ্জিনিয়ার। শ্বশুরমশায়ের নানান উদ্ভট বাতিকের কথা জানেন তিনি। কেমন লোক পছন্দ হবে তাও জানেন। ভবভূতির কোনও কথায় না করবে না এবং কোনও ব্যাপারে অবাক হবে না—এমন লোক চাই। সেদিক থেকে নরহরি উৎকৃষ্ট। সবেতেই মুন্ডু কাত করে বলে,—ইয়েস স্যার!

কর্তাবাবুর কথার বিরুদ্ধে অন্য কথা বলার জো নেই। সে মুখে সায় দিল। বরং জাঁক দেখিয়ে বলল,—বেহ্মদত্যির টিকি আর টাক দুই-ই কেড়ে নেব স্যার।

খুশি হয়ে ভবভূতি বললেন,—একখানা মোটা লাঠি জোগাড় করে রাখো। আর একটা বস্তায় পাটকেল রাখো। টিকি আর টাক কাড়তে গিয়ে মামলায় পড়বে হে! গবু-উকিল তাক করে বসে আছে ওদিকে।

ওদিকে কুকুরগুলো উপোস করছে। করুক। ভবভূতি রাতের খাওয়া শেষ করে নরহরিকে সঙ্গে নিয়ে চুপিচুপি ওপাশের দরজায় বের হলেন। জ্যোৎস্না রাত। সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বেলগাছটার একটু তফাতে একটা জঙ্গল হয়ে যাওয়া জবাগাছের আড়ালে দুজনে ওৎ পেতে বসে রইলেন। সঙ্গে একটা বন্দুকও নিয়েছেন। লাঠি আর পাটকেলের বস্তাও আছে।

বসে আছেন তো আছেন। সব নিস্তব্ধ। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। মাঝে-

মাঝে পশ্চিমের রেলইয়ার্ড থেকে রেলগাড়ির শব্দ কিংবা হুইসেল শোনা যাচ্ছে। আবার সব চুপ। হেমন্তকাল। শিশিরে ঘাস-গাছপালা ভিজে জবজব করছে। হাল্কা কুয়াশা জমেছে গাছপালায়। কিছুক্ষণ পরে বেলগাছ থেকে একটা পেঁচা ডাকল—ক্র্যাঁও! ক্র্যাঁও! ক্র্যাঁও!

তারপর মনে হল বেলগাছটায় হঠাৎ ঘূর্ণি হাওয়া এসেছে। শনশন করে ডালপালা নড়ছে। তারপরই ভবভূতি দেখতে পেলেন, ঠিক মগডালে কালো প্রকাণ্ড একটা মানুষের মতো কে উঠে দাঁড়াল এবং চাঁদের দিকে তাকিয়ে যেন হাই তুলে বারতিনেক বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর সাহায্যে তুড়ি দিল।

তারপর হেঁড়ে এবং চাপাগলায় সেই মূর্তিটা বলে উঠল,—হরি হে দীনবন্ধু। পার করো হে ভবসিন্ধু।...তারা! ব্রহ্মময়ী মা গো! জগদম্বা বলো মন হে! জগদম্বা বলো!

নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না ভবভূতি। তাঁর পিছনে বসে নরহরি ঠকঠক করে কাঁপছে। তাকে চিমটি কেটে সাবধান করে দিলেন এবার।

একটু পরে মূর্তিটা গাছের ডগা থেকে লাফ দিয়ে নামল। মাটি কেঁপে উঠল যেন। জ্যোৎস্নায় এলে স্পষ্ট দেখা গেল, তার পরনে কোঁচা করে পরা খাটো ধুতি, খালি গা, বুকে পৈতে রয়েছে। মাথার চুল ছোট করে কাটা। একটা প্রকাণ্ড টিকি আছে।

হ্যাঁ, খড়মের শব্দ হচ্ছে। খট খট খট খট! ভবভূতি দেখলেন, সে তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছে। শিউরে উঠলেন। কিন্তু তিনি এক সময়কার শিকারি মানুষ। এমনিভাবে বন্দুক হাতে কতবার গহন অরণ্যে বাঘের এলাকায় রাত কাটিয়েছেন। এ কিছু নতুন ব্যাপার নয় তাঁর কাছে। দেখা যাক।

অবশ্য এবার বাঘ নয়, ব্রহ্মদৈত্য এই যা।

ব্রহ্মদৈত্যকে কাছে থেকে ভালো করে দেখবেন বলে চুপচাপ বসে আছেন ভবভূতি। নরহরির সাড়া নেই। চোখ বুজে ফেলেছে। নাকি ভিরমি গেল, ভবভূতির ঘুরে দেখার সময় নেই।

ব্রহ্মদৈত্য এসে ভবভূতির মাথার ওপর জবাগাছ থেকে টুপ করে একটা জবাফুল পেড়ে নিল। নিয়ে টিকিতে বোঁটাটা গিঁট দিয়ে বাঁধল। কী বোটকা গন্ধ। ভবভূতির অসহ্য লাগল। নাকে আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন। আর এতক্ষণে দেখলেন, ব্রহ্মদৈত্যের হাতে একটা হাঁড়ি রয়েছে। তারপর দেখলেন ব্রহ্মদৈত্য তাঁর কুকুরশালার দিকেই চলেছে। খড়মের শব্দ হচ্ছে খট খট খটাং! হাঁড়িতে কী থাকতে পারে? তাছাড়া ও ঘরে ঢুকবেই-বা কীভাবে? ভেবেই পেলেন না ভবভূতি।

কুকুরশালার বাইরে দরজার কাছে গিয়ে ব্রহ্মদৈত্য হেঁড়ে গলায় ফের বলে উঠল,—হরি হে দীনবন্ধু! পার করো হে ভবসিন্ধু।...তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী মা গো!... জগদম্বা বলো মন হে, জগদম্বা বলো!

তারপর যেন তিনবার তুড়ি দিল সে। অমনি অবাক কাণ্ড! দরজা খুলে গেল।

তখন ব্রহ্মদৈত্য হাঁড়িটা উঁচু করে ধরে যেই ঢুকতে যাচ্ছে, ভবভূতি আর সহ্য করতে পারলেন না। গর্জে উঠলেন,—খবরদার!

সঙ্গে-সঙ্গে আকাশমুখো বন্দুক তুলে ছুড়লেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন,—নরহরি! ঢিল ছোড়ো! লাঠি চার্জ করো! এক হাতে ঢিল, অন্য হাত লাঠি!

ঘুরে দেখেন, কোথায় নরহরি? কেউ নেই পিছনে। পাটকেলের বস্তা আর লাঠিটা পড়ে আছে। রাগে ভবভূতি বস্তাটা কাঁধে ঝুলিয়ে এবং লাঠি ও বন্দুক বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ালেন।

এই অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে ফাঁকায় দাঁড়ালেন। ওদিকে ব্রহ্মদৈত্য তখন দরজা থেকে কেটে পড়েছে। খড়ম পায়ে দৌড়ে আবার বেলগাছটার দিকে তাকে যেতে দেখলেন ভবভূতি।

একলাফে বেলগাছে উঠে পড়েছে ব্রহ্মদৈত্য।

ভবভূতি বস্তা নামিয়ে গাছের দিকে পাটকেল ছুড়তে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে গর্জাতে থাকলেন,—গেট ডাউন! গেট ডাউন রাস্কেল! নেমে এসো বলছি!

বস্তার পাটকেল শেষ হয়ে আসছে, এমন সময় গাছ থেকে ব্রহ্মদৈত্য করুণ স্বরে বলে উঠল,—ভব! ভবী! ভবী! ভবু! আর ঢিল ছুড়ো না ভাই! মাইরি, মরে যাব!

ভবভূতি চমকে উঠলেন।

গলাটা এতক্ষণে চেনা মনে হচ্ছে। দৌড়ে গাছতলায় গিয়ে বললেন,—কে? কে তুমি?

আবার করুণস্বরে জবাব এল—আমি, আমি। উ হু হু হু! গেছিরে বাবা।

কে আমি? নেমে এসো বলছি! নইলে এবার লাঠিপেটা করব!—বলে ভবভূতি সেই ইয়া মোটা লাঠিটা বাগিয়ে ধরল।

ব্রহ্মদৈত্য কান্নার সুরে বলল,—নামতে পারছি না। তোমার ঢিল লেগে হাঁটুর বাতটা হঠাৎ চাগিয়ে উঠেছে! উহু হু হু!

এতক্ষণে ভবভূতির সংশয় ঘুচল। লাঠি ও বন্দুক মাটিতে রেখে হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে হো-হো, করে হেসে বললেন,—রোসো। হাত বাড়াও। ধরে নামাচ্ছি।

ব্রহ্মদৈত্য গুঁড়ির ওপরে বসে আছে। হাত বাড়িয়ে দিল। ভবভূতি তার হাত ধরে সাবধানে নামতে সাহায্য করলেন।

নেমেই ব্রহ্মদৈত্য হাঁটুর ব্যথা ভুলে চেঁচিয়ে উঠল,—এই সেরেছে। হাঁড়িটা পড়ে আছে যে। সর্বনাশ! নির্ঘাৎ ব্যাটা এতক্ষণে অর্ধেক সাবাড় করেছে।

বলে সে কুকুরশালার দরজার দিকে দৌড়ল। ভবভূতিও তার সঙ্গে দৌড়েছেন।

গিয়ে দেখেন, ব্রহ্মদৈত্য নরহরির কাঁধ আঁকড়ে ধরেছেন, আর নরহরি হাঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। টানাটানিতে তাকে নাড়ানো যাচ্ছে না। ভবভূতি দেখেশুনে গম্ভীর হয়ে বললেন,—রসগোল্লা নাকি?

—হ্যাঁ। পাক্কা তিন কিলো মাল। ব্যাটা সব সাবাড় করে ফেললে দেখছ না? এ যে আস্ত রাক্ষস!

বেশ করেছে। —ভবভূতি রেগে বললেন।

ব্রহ্মদৈত্য বলল,—ইয়ার্কি? ওর জন্যে এনেছিলুম নাকি?

ভবভূতি গর্জে উঠলেন,—তোমার নামে মামলা করব! তুমি আমার কুকুরগুলোকে রসগোল্লা খাইয়ে আমারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছ। সকাল হতে দাও। দেখাচ্ছি মজা। সটান ঘুঘুডাঙা আদালতে গিয়ে তোমার নামে মামলা করব।

ব্রহ্মদৈত্য হাসল,—হুঁ! আমাকে মামলার ভয় দেখাচ্ছ। আমি চল্লিশ বছর ওকালতি করেছি জানো না বুঝি?

হ্যাঁ, তাও বটে। ভবভূতি ভড়কে গেলেন। বললেন,—তাই বলো, তো এই বুড়ো বয়সে কেলেঙ্কারি করতে তোমার লজ্জা হল না? ছিঃ!

কীসের লজ্জা? —ব্রহ্মদৈত্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ স্বয়ং গজপতি বাঁকা হেসে বললেন। তুমি যে ব্রহ্মদৈত্য মানো না। এবার মানলে তো?

ভবভূতি পাল্টা বাঁকা হেসে বললেন,—হুঁ, মানলুম। তবে যাও, এখন চান করে গায়ের কালো কালিগুলো ধুয়ে এসো। নইলে তোমায় বিছানায় শুতে দেব ভেবেছ? ছ্যা-ছ্যা!

নরহরি ঠাকুর হাঁড়ি শেষ করে এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—আসুন গো। টিউবেল থেকে জল টিপে দিই। চান করবেন। আমারও তেষ্টা পেয়েছে।...

এই ঘটনায় দুটো ফল হল। এক ঃ নরহরি গোপনে গজপতির চক্রান্তে যোগ দিয়েছিল এবং কুকুরশালার চাবিও চুরি করে ওকে দিয়েছিল বলে তার এখানকার চাকরি গেল। সে অবশ্য গজপতির বাড়ি ফের চাকরি পেল। তাই কথা ছিল গজপতির সঙ্গে।

দুই ঃ ভবভূতিকে কুকুরগুলোর জন্যে দৈনিক তিন কিলো করে রসগোল্লার ব্যবস্থা করতে হল। রসগোল্লার মজা ওরা পেয়ে গেছে। একদিন না পেলে ভবভূতির বিরুদ্ধে সেদিনের মতো প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখায়।

ভবভূতি নতুন লোক বহাল করেছেন। তার নাম কালীপদ। ডাক নাম কালো। বছর বিশ-বাইশ বয়সের এক ছোকরা। ভারি অমায়িক এবং বিশ্বাসী। তাকে কুকুরগুলো বেশ পছন্দ করে ফেলেছে। এটা ভবভূতির বাড়তি লাভ বলা যায়।

আর গজপতির সঙ্গে সম্পর্ক? এবার চিড় খেয়েছে সত্যি-সত্যি। গজপতির সঙ্গে রীতিমতো ঝগড়া হয়ে গেছে ভবভূতির। ব্রহ্মদৈত্য আছে তা প্রমাণের জন্যে যে এমন কাণ্ড করতে পারে, সে কি মানুষ? সে নিজেই ভূত। অতএব ভূতে-মানুষে কি বন্ধুত্ব হয়? কিংবা হয়ে গেলেও তা বেশিদিন টেঁকে?

ভবভূতি মন দিয়ে কুকুরের ভাষা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যান। গজপতিকে মন থেকে একেবারে মুছেই ফেলেন।

কিন্তু মাঝে-মাঝে হঠাৎ মনে হয়, আচ্ছা—বেলগাছে যদি গজপতির বদলে সে রাতে সত্যি-সত্যি ব্রহ্মদৈত্যকেই দেখতে পেতেন, তাহলে কী ঘটত? একটু শিরশির করে শরীর। বিশেষ করে কোনও-কোনও রাতে লনে পায়চারি করতে-করতে বেলগাছটার দিকে তাকালে যেন মনে হয় কেউ ওর মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে। বাগে পেলেই ঘাড় মটকাবে। তখন ভবভূতি বন্দুকটা নিয়ে এসে খামোকা আকাশে একটা গুলি ছোড়েন। সেই আওয়াজে ভয় পেয়ে বেলগাছের পেঁচাটা চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে উড়ে পালায়।

ততদিনে কুকুরের ভাষা নিয়ে গবেষণায় অনেকটা এগিয়েছেন ভবভূতি। ইয়া মোটা লাল কাপড়ে বাঁধানো খেরোর খাতায় কুকুরের ডাকগুলো টুকেছেন এবং তার পাশে বাংলা অনুবাদও করে ফেলেছেন।

এমনকী ওদের সঙ্গে ইদানীং ওদের ভাষাতেই কথা বলার চেষ্টা করছেন।

অ্যালসেশিয়ানের খাঁচার সামনে গিয়ে বলেন,—গররর গঁঃ। অর্থাৎ কেমন আছো হে?

সে জবাব দেয়,—গর গররর গ্যাঁ। ভালোই আছি। তবে খাঁচায় আটকে থাকাটা ভালো মনে হচ্ছে না।

ভবভূতি একটু হেসে বলেন,—ঘঃ ঘঃ। ঠিক আছে। শিগগির ছেড়ে দেব।

টেরিয়ার দুটো তাঁকে দেখে বলে—ঘেঃ ঘেঃ। ছেড়ে দাও না ব্রাদার!

ভবভূতি বললেন,—ঘঁঃ। সবুর, সবুর। দেব বইকী।

গ্রেহাউন্ড ভারি রাগী। বলে—খ্যাঁ খ্যাঁ খ্যাঁঃ খুঁঃ। ছেড়ে দাও, নয়তো ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

ভবভূতি বলেন,—চুঃ চুঃ। সোনা ছেলে, লক্ষ্মীছেলে। রাগ করে না।

দিশি কুকুর বাঘা, খেঁকি এবং নেড়ি তাঁকে দেখে চ্যাঁচামেচি করে বলে,—ভৌ ভৌ ভেউ ভু-উ-উ-উ। কেন আটকে রেখেছ। আমাদের কষ্ট হচ্ছে না বুঝি?

ভবভূতি জবাব দেন,—ঘেউ ঘেউ ঘেক ঘেক ঘুঃ? বেশি চেঁচিও না তো বাপু! সময় হলেই ছাড়ব।

নতুন রাঁধুনি-কাম-চাকর কালীপদ ব্যাপার-স্যাপার দেখে হতভম্ব। আজকাল কর্তাবাবু আপনমনে ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন আর কুকুরের মতো ডাকেন। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না তো?

সেদিন কালীপদ গেছে চা নিয়ে। ভবভূতি বই পড়তে-পড়তে বললেন,—গেঃ গেঃ! ঘেউ-উ-উ-উ!

কালীপদ হতভম্ব হয়ে বলেন,—কী বলছেন স্যার?

ভবভূতি একটু হেসে বললেন,—তাইতো! তুমি এ ভাষা জানো না বটে। শোন কালীপদ, আমি কুকুরের ভাষায় দিব্যি কথা বলতে পারি। একটা বই লিখব ভাবছি। ওটা পড়লে সবাই এ ভাষা শিখে নেবে। তা শোনো, তুমি বরং আমার কাছে রোজ এ ভাষাটা শিখতে থাকো। বেশি কথা খরচ করতে হবে না। একটুও ক্লান্ত হবে না কথা বলতে। কত সহজে একটা শব্দে অনেক বেশি কথা বলা যায় জানো?

কালীপদ ছেলেটি ভারি সরল। বলল,—তাহলে আজই শেখাতে শুরু করুন স্যার।

ব্যাস, ভবভূতি ওকে নিয়ে পড়লেন। রোজ দু-ঘণ্টা করে মনোযোগী ছাত্রের মতো সে কর্তাবাবুর কাছে বসে কুকুরের ভাষা শেখে। রান্নাঘরে গিয়ে আপনমনে অভ্যাস করে। জিভ তালুতে ঠেকিয়ে কীভাবে-কীভাবে ঘেউ করতে হয়, সহজেই রপ্ত করে নেয়। রান্নাঘর থেকে অনেক সময় তার সেই ঘেউ শোনা যায়। ভবভূতি তাঁর ঘর থেকে সাড়া দিয়ে বলেন,—ঘেউ ঘেউ ঘোঃ। বাঃ বহুত আচ্ছা। ঠিক হচ্ছে।

কিছুদিন পরে দেখা গেল, দুজনে আর মানুষের ভাষায় কথা বলছেন না। স্রেফ কুকুরের ভাষায় কথা চলছে।

কারণ ভাষাশিক্ষার তাই নিয়ম! যেমন কিনা ইংরাজি স্কুলে যারা পড়ে, তাদের সবসময় ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। তাছাড়া সেই যে একটা কথা আছে—যদি ইংরেজি শিখতে চাও, তাহলে ইংরেজিতে কথা বলো, ইংরেজিতে স্বপ্নও দেখো।

কুকুরের ভাষায় আজকাল দুজনে স্বপ্ন দেখতেও চেষ্টা করেন বইকী?

আর এই ভাষার নামও খুঁজে পেয়েছেন ভবভূতি। শ্বানভাষা। শ্ব হল কিনা কুকুর। তাদের ভাষার নাম শ্বান ভাষা।

যে গোয়ালা রোজ সরমা অর্থাৎ ভবভূতিবাবুর বাড়িতে দুধ দিতে যায়, সে অবাক হয়ে শোনে, ভবভূতি বলছেন,—ঘৌ ঘৌ ঘঃ?

কালীপদ জবাব দিচ্ছে,—ঘরররর ঘ্যাঃ।

—ভেঁক ভেঁক।

—ভেউ—উ—উ।

—গ্যাঁঃ গঁ গ্যাঁও!

—গ্যাঁ—অ্যাঁ অ্যাঁ।

গোয়ালা কালীপদকে চুপিচুপি বলে,—ব্যাপারটা কী ভাই কালীপদ?

কালীপদ মুচকি হেসে বলে,—গরগরর! ঘেউ!

গোয়ালা বেচারা ঘাবড়ে যায়। বাইরে ব্যাপারটা রটায় সে। তাই সরমার গেটে কৌতূহলী লোকেরা ভিড় জমায়। বিরক্ত ভবভূতি তাড়া করে বলেন,—ঘররর ঘেঁউ ঘেঁউ। ঘ্যাঁ।

লোকেরা ভাবে নির্ঘাৎ পাগল এই ভদ্রলোক। তারা হো-হো করে হাসে এবং ভেংচি কেটে কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করতে থাকে। তখন ভবভূতি বন্দুক বের করেন। তারা পালিয়ে যায়।

এই খবর গিয়েছিল গজপতির কাছে। শুনে গজপতি তো ভাবনায় পড়ে গেলেন। হাজার হলেও তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু ভবভূতি। বুড়ো বয়সে হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়াটা মোটেও কাজের কথা নয়।

বুদ্ধি খাটিয়ে একদিন গজপতি এক সর্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে নিয়ে ঘুঘুডাঙায় হাজির হলেন। ইনি কুকুর সম্পর্কেও জ্ঞানী। হন্ডুরাসে তিনবছর কুকুরবিদ্যা শিখে এসেছেন।

সরমার গেটে গিয়ে ডাকলেন,—ভব! ভবী! ভবী! আছো নাকি ভায়া?

ভবভূতি কিন্তু গজপতির জন্যে মনে-মনে ছটফট করছেন। আহা, কত কালের বন্ধুত্ব। তার ওপর এমন শ্বান ভাষায় তাঁর কৃতিত্ব গজপতির কাছে জাহির না করলে কি চলে?

গজপতির ওপর সব রাগ ভুলে হাসিমুখে গেটে গিয়ে সম্ভাষণ করলেন,—গররর গরর।

গজপতি ডাক্তারবাবুকে চিমটি কেটে দিলেন। অর্থাৎ দেখছেন এবং শুনছেন তো? ডাক্তার মুচকি হেসে ফিসফিস করে বললেন,—এই রোগের নাম কুকুরামি। দেখেছি হন্ডুরাসে অনেকেরই আছে।

গজপতিকে গেট খুলে ভবভূতি ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—গঁঃ গঁঃ।

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন,—ঘঁ-গ-অ-অ। ঘ্যাঁ!

গজপতি অবাক। আরও অবাক হলেন ঘরে গিয়ে। ডাক্তার ভদ্রলোকও ভবভূতির মতো পাগল হয়ে গেলেন নাকি?

ভবভূতি আর ডাক্তার কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ গর-গর করে যাচ্ছেন সমানে। সেই সময় কালীপদ চা নিয়ে এসে বলল,—ভৌ ভৌ ভঃ।

গজপতির এতক্ষণে রাগ হল। আর রাগের চোটে ভেংচি কেটে বলে উঠলেন,—ভৌ ভৌ ভ্যাঁও।

অমনি কালীপদ তাঁর পায়ের ধুলো নিল। আর ভবভূতি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে একগাল হেসে বলে উঠলেন,—ঘঁররর গররর গঁঃ।

এবার অসহ্য লাগল গজপতির। বললেন—কী ব্যাপার বলো তো ভায়া ভব? তোমরা সবাই কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করছ কেন?

ভবভূতি মুচকি হেসে তাঁর খেরোর খাতাটি সামনে খুলে ধরলেন।

চোখ বুলিয়ে গজপতি সব টের পেলেন এতক্ষণে। একের পর এক পাতা উল্টে গোটাটা দেখে নিলেন। তারপর হাসিমুখে ভবভূতির দিকে তাকিয়ে বললেন,—ঘঁউউ! ঘঁ!

গজপতির সঙ্গে ভবভূতির আবার ভাব হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে গজপতি প্রায়ই সরমাতে বন্ধুর কাছে এক-এক বেলা কাটিয়ে যান এবং 'শ্বান' ভাষায় কথাবার্তা বলেন। আর সেই কুকুর বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকের নাম ডাঃ লম্বোদয় হোড়। সংক্ষেপে ডাঃ এল হাউর। তাঁকে মোটা মাইনেতে বহাল করেছেন ভবভূতি। কুকুরগুলোর মাথাধরা, কান কটকট, পেট-ফাঁপা চিকিৎসা করতেন ভবভূতি। এখন ডাঃ হাউর তা করেন। উনি হন্ডুরাসী পদ্ধতিতেই চিকিৎসাটা করেন। তাঁরই পরামর্শে কুকুর বাহিনীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তারা খাঁচায় এতদিন বাস করে অভ্যস্ত হয়েছে। তাই বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে চায় না। খাঁচায় গিয়ে ঢোকে। বাইরে যতক্ষণ থাকে, চুপচাপ উদাস চোখে শুধু আকাশ দেখে আর হাই তোলে। এতে একটা দারুণ রকমের কাজ হয়েছে। লোকেরা এই বাড়িটা পাগলাগারদ ভেবে পাগল দেখবার জন্যে ইদানীং গেটের

পাশে উঁকিঝুঁকি মারত। এখন বাড়ির ত্রিসীমানায় এলেই সতেরটা কুকুর নিজ-নিজ কণ্ঠস্বরে গর্জন করে ওঠে। আর গ্রেহাউন্ড কী সাংঘাতিক কুকুর, সবাই জানে।

আর কেউ বাড়ির আনাচে-কানাচে আসতে সাহস পায় না। বিকেলে দেখা যায় ভবভূতি আর ডাঃ হাউর সতেরোটা দেশি-বিদেশি কুকুর নিয়ে বাড়ির বিশাল প্রাঙ্গণে বেরিয়েছেন এবং কুকুরগুলোকে হা-ডু-ডু খেলা শেখাচ্ছেন। বিদেশি কুকুরগুলো দিব্যি হা-ডু-ডু হাঁকতে পারে। কিন্তু দিশি-বাঘা-নেড়ি-খেঁকিরা ওই ইংরিজি বলতেই পারে না। তারা দিশি ভাষাতেই বলে—চু কিট কিট কিট।...

সূর্য ডুবে যায় গাছপালার আড়ালে। ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা আসে। তখন ডাঃ হাউর কুকুরদের নিয়ে কুকুরশালায় ঢোকেন। আর ভবভূতি চুপচাপ পায়চারি করেন কতক্ষণ। চারদিকে নিঝুম। মনে কত কী আশা জেগে ওঠে। এবার নোবেল প্রাইজ ঠেকায় কে!

সেদিন সন্ধ্যায় ভবভূতি একা পায়চারি করছেন। মনে একটা নতুন ভাবনা গজিয়েছে। কুকুরগুলোকে রাষ্ট্রভাষা শেখালে কেমন হয়? অন্য ভাষার চাইতে ওটা খুব তাড়াতাড়ি শেখারই কথা। একটু রাগিয়ে দিয়ে শেখাতে শুরু করলেই ঝটপট শিখে নেবে। রাগ হলেই তো মুখ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা বেরিয়ে যায়।

আনমনে হাঁটতে-হাঁটতে সেই বেলতলায় গেছেন ভবভূতি। হঠাৎ মাথার ওপরে ডালপালার আড়াল থেকে কে ভারী গলায় বলে উঠল,—ঘররররর ঘুঁ-উ।

চমকে উঠলেন ভবভূতি। কথাটার মানে,—কী ভায়া? ঘুরে বেড়াচ্ছ নাকি।

অন্ধকারে ভবভূতি কাকেও দেখতে পেলেন না। বললেন,—গঁঃ গঁঃ ঘেউ-উ। কে হে তুমি? গাছে কী করছ?

জবাব এল,—ঘ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁক ঘররররর...

কী? —ভবভূতি খাপ্পা। বলছে কিনা, আমি যাই করি, তাতে তোমার কী হে! ভবভূতির বেলগাছে বসে ভবভূতিকেই চোখ রাঙাচ্ছে—তাও এই রাতবিরেতে? —তিনি রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠলেন মানুষের ভাষাতেই। এবং রাগ হলে বাঙালি ভদ্রলোক যা করেন, তাই করলেন—অর্থাৎ—গেট ডাউন। গেট ডাউন ইউ ব্লাডি ফুল।

অমনি ধপ করে তাঁর সামনে কে লাফিয়ে পড়ল। অন্ধকার গাঢ় হয়নি ততটা। আবছা দেখলেন, বেঁটেখাটো মোটাসোটা একটা লোক। খালি গা। পরনে খাটো ধুতি কোঁচা করে পরা। পায়ে যেন খড়মও আছে। গলায় পৈতেও ঝকমক করছে।

অবিকল সেই জ্যোৎস্নারাতে ব্রহ্মদৈত্যবেশী গজপতির মতো।

তাহলে আবার নির্ঘাৎ গজপতি রসিকতা করতে বেলগাছে চেপেছিলেন। এই ভেবে ভবভূতি হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন,—গজু, তুই মাইরি আস্ত ভূত!

ভূত!—বেলগাছের লোকটা ঘুসি তুলে বলল,—তুমি ভূত! তোমার চোদ্দপুরুষ ভূত! আর গজু বলছ, সেই গজু-টজকে আমি চিনি না!

ভবভূতি বললেন,—দেখো গজু, বাড়াবাড়ি কোরো না। গায়ে জল ঢেলে দেব বলছি!

—কেন? জল ঢালবে কেন?

—তোমার গায়ের কালো পেন্ট ধুয়ে যাবে সেদিনকার মতো।

—সেদিনকার মতো? কী বলছ! আমি আজ এক বছর কাশী-গয়া করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। সদ্য কাল সন্ধেবেলা ফিরেছি। ফিরেই তোমার কীর্তিকলাপ দেখছি।

ভবভূতি অবাক হয়ে গেছেন। বললেন,—তুমি গজু নও?

বেঁটে মূর্তিটা জোরে বনবন করে লাটিমের মতো টিকিসমেত ঘুরপাক খেয়ে বলল,—না না না কভি নাহি!

—আলবাত গজপতি তুমি! চলো, আলোয় চলো! পরীক্ষা করে দেখব।

—আমার আলোয় যাওয়া বারণ আছে। যাব না। পরীক্ষা করে দেখতে হয়, এখানেই দেখো।

—ঠিক আছে। আগে এক বালতি জল আনি।

—সে কী! কেন, কেন?

—তোমার গায়ে কালো পেন্ট ধুতে হবে না? তখন তোমার ফর্সা রং বেরিয়ে পড়বে।

ভবভূতি পা বাড়াচ্ছিলেন, মূর্তিটা পিছু ডাকল,—শোনো, শোনো। বলছিলুম কী, জল না ঢাললে হয় না? বড্ড ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। মাইরি, শীতে জমে যাব। তুমি বরং কাছে এসে আমাকে টিপে দেখো! আমি তোমার গজু না টজু, সহজে বুঝতে পারবে।

ভবভূতি সটান গিয়ে ওর গোঁফ খামচে ধরলেন। মূর্তিটা চ্যাঁচামেচি করে বলল,—ওরে বাবা রে! গেছি রে! গেছি রে! ছাড়ো ছাড়ো! উঃ হু হু হু!

তাইতো! গজপতির তো গোঁফ নেই। সে রাতে নকল গোঁফ পরেছিলেন। কিন্তু এর গোঁফটা দেখা যাচ্ছে আসল। তার চেয়ে বড় কথা, আজ সকালে গজপতি এসেছিলেন। গোঁফ পরিষ্কার কামানো ছিল। সন্ধ্যার মধ্যে এমন পেল্লায় গোঁফ গজাতে পারে না তাঁর। তাহলে এ গজপতি নয়, অন্য কেউ।

ভবভূতি গোঁফ ছেড়ে চুল ধরতে গেলেন। ধরা গেল না। ছোট-ছোট চুল যেন পেরেকের ডগার মতো। হাতে বিঁধতেই ভবভূতি হাত সরিয়ে নিলেন। গম্ভীর গলায় বললেন,—তাহলে তুমি কে শুনি?

মূর্তিটিও তাঁর মতো গম্ভীরগলায় জবাব দিল,—আমার নাম বলা বারণ। তাছাড়া বললেই তুমি ভিরমি খাবে। কাজেই চেপে যাও।

—ইয়ার্কি? পুলিশে দেব তোমাকে। কেন তুমি আমার বাড়িতে ঢুকেছ?

—তোমার বাড়ি? তোমার বাড়িতে ঢুকলুম কোথায়? আমি তো গাছে ছিলুম।

—গাছটাও যে আমার।

—তোমার গাছ মানে? আজ তিনশো বছর এই গাছ আমার দখলে! আমি এই গাছে থেকে বুড়ো হয়ে গেলুম! আর তুমি বলছ আমার গাছ?

গাছে থাকো! এই বেলগাছে? —রাগের মধ্যে ভবভূতি হেসে ফেললেন।

মূর্তিটি বলল,—এতে হাসির কী আছে? যার যেখানে বাসা। তুমি মানুষ, তাই বাড়িতে থাকো। আমি ইয়ে, তাই বেলগাছে থাকি।

—ইয়ে মানে? তুমি কি ব্রহ্মদত্যি?

খবরদার নাম ধরে বলবে না! জানো না কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বললে রেগে যায়? ব্রহ্মদত্যিকে ব্রহ্মদত্যি বললে রাগ হবে—ভীষণ রাগ—বলে সে দাঁত কিড়মিড় করে রাগটা দেখিয়ে দিল। টিকিটা কাঠির মতো সোজা দাঁড়িয়ে রইল।

ভবভূতি এবার একটু সংশয়ান্বিত হয়ে বললেন,—তাহলে বলছ, তুমিই এই বেলগাছের ব্রহ্মদত্যি?

—আলবাত। আদি, আসল এবং অকৃত্রিম ব্রহ্মদত্যি। এতটুকু ভেজাল নেই।

—বিশ্বাস করি না। আজকাল সবকিছুতেই ভেজাল।

—তাহলে প্রমাণ চাও?

—হুঁউ। চাই।

—বলো, কী প্রমাণ চাও?

—তুমি যদি আসল ব্রহ্মদত্যি, তাহলে...তাহলে...

কথায় বাধা পড়ল। গাড়িবারান্দা থেকে ডাঃ হাউরের গলা শোনা গেল,—কার সঙ্গে কথা বলছেন ভবভূতিবাবু?

অমনি মূর্তিটা একলাফে গাছের ডালে উঠে পড়ল। ফিসফিস করে বলল,—এই? ওকে বোলো না মাইরি! ডাক্তার-টাক্তার দেখলেই আমার বড্ড বুক কাঁপে। ওরা যে ইনজেকশান দেয়!

ভবভূতি হাসি চেপে ডঃ হাউরকে বললেন,—ও কিছু না। আপনি বরং কালীপদকে কড়া করে কফি বানাতে বলুন। ঠান্ডা পড়েছে বেশ।

তাহলে আর শিশিরে ঘুরবেন না। —বলে ডাঃ হাউর ভেতরে ঢুকে গেলেন।

ভবভূতি বললেন,—কই হে ব্রহ্মদত্যি-মশাই, নেমে এসো!

—ডাক্তার আর আসবে না তো?

—না, না। তুমি নেমে এসো। উনি ডাক্তারও বটেন, ডক্টর-ও বটেন! কাজেই ভয় নেই।

ব্রহ্মদত্যি নেমে এল আবার। তারপর বলল—যাকগে। যেজন্যে তোমায় দেখা দিয়েছি, বলি! এতক্ষণ খালি বাজে বকবক কথা হল। ভবভূতিভায়া, তোমায় বন্ধু বলেই মেনে নিয়েছি! তো কথাটা হচ্ছে—আমায় শ্বানভাষাটা শেখাবে?

—নিশ্চয় শেখাব। ইতিমধ্যে শুনে-শুনে তো তুমি কিছু শিখেই ফেলেছ।

—হুঁউ। ভেউ উ-উ গ র র র র।

—উঁহু। ভেউ-উ-উ-উ গঁর র র র। জিভ তালুতে ঠেকিয়ে উচ্চারণ করো।

—ভেউ-উ-উ-উ গঁর র র র র র।...

পরদিন গজপতি এসেছেন বন্ধুসকাশে। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়াটা ভালোই হয়েছে। ভবভূতি ভাতঘুম দিচ্ছেন অভ্যাসমতো। ডাঃ হাউরও পাশের ঘরে নাক

ডাকছে। কালীপদর তো সবসময়ে ঢুলুনি। সুযোগ পেলেই ঘুমিয়ে নেয়। সে শ্বান ভাষায় নাক ডাকছে—গঁ র র র র গোঁ!

গজপতির দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই। বেরিয়ে গিয়ে রোদে দাঁড়িয়েছেন। সবে শীত পড়েছে। বেশ আরাম লাগে।

হঠাৎ কানে এল, বেলগাছ থেকে কে সুর ধরে আওড়াচ্ছে ঃ

গর র র মানে এসো এসো—
ভেউ মানে কে রে?
ঘেঁউ মানে খবরদার—
যাব নাকি তেড়ে?
খ্যাঁক মানে কামড়াব
ভ্যাঁক মানে যাঃ।
আঁউ মানে পেটে ব্যথা—
কিছু খাব না...

গজপতি পা টিপে-টিপে এগোলেন। নিশ্চয়ই ভবভূতির কোনও ছাত্র শ্বান ভাষায় পড়া মুখস্থ করছে। পরীক্ষার সময় ছাত্ররা নিরিবিলিতে এমনি করেই তো মুখস্থ করে। গজপতি বেলতলায় গিয়ে মুখ তুলে দেখলেন, ঘন ডাল ও পাতার আড়ালে কালো কুচকুচে একটি বেঁটেখাটো টিকিওয়ালা মূর্তি আপনমনে বসে পড়াশুনো করছে। গজপতি বললেন,—কে হে তুমি? গাছের ডালে বসে ও কী মুখস্থ করছ?

মূর্তিটা পাতা সরিয়ে গজপতিকে দেখেই ফিক করে হাসল। তারপর হনুমানের মতো সড়-সড় করে নেমে এসে বলল,—গজু না তুমি? সেই অ্যাটুকুন দেখেছি—ওরে বাবা! কত বড় হয়েছ তুমি? কত বুড়ো হয়েছ! সেই যে তোমার দিদি রাতের বেলা জানালায় দাঁড়িয়ে পান চিবুতে-চিবুতে আমার সঙ্গে গল্পগুজব করত—আর তুমি বিছানায় শুনে টুক-টুক করে তাকিয়ে দেখতে। সে কি আজকের কথা? এসো গজু, তোমায় আদর করি। ওরে আমার গজু ছোনারে! তোমার চুল কেন পাকল? ওরে গজু রে গজু রে!...

গজপতি ততক্ষণে গেটের কাছে। গেট বন্ধ! তখন পাঁচিলে উঠে পড়লেন কোনওরকমে। তারপর লাফ দিলেন। তারপর পড়ি-কি-মরি করে দৌড়! একদৌড়ে ঘুঘুডাঙা স্টেশনে। আর এ জীবনে ও বাড়িতে নয় বাপস!

ব্রহ্মদত্যি দুঃখিত মনে বেলগাছে উঠে আবার পড়ায় মন দিল।

গজপতি আর সত্যিই আসেন না ঘুঘুডাঙায় ভবভূতির সরমা ভবনে। ভবভূতি, ডাঃ হাউর আর কালীপদ, আর সতেরোটা কুকুর, আর বেলগাছের...ব্রহ্মদত্যিমশাই দিব্যি কাটাচ্ছে। কুকুরগুলো আজকাল মানুষের ভাষায় কথা বলতেও পারে নাকি। তোমরা কেউ ইচ্ছে করলেই ঘুঘুডাঙায় হাজির হতে পারো। তবে সাবধান, ব্রহ্মদত্যি-মশায়ের জন্য সন্দেশ নিয়ে যেতে ভুলো না। নয়তো বেলগাছ থেকে শ্বানভাষায় গর্জন শুনবে,—ঘেঁউ গঁর র র র!...

ছক্কামিয়ার টমটম

এ মুলুকে রাতবিরেতে বাস ফেল করলে ছক্কামিয়ার টমটম ছাড়া আর উপায় ছিল না। ঝড়-বৃষ্টি হোক, মহাপ্রলয় হোক, রাতের বেলা ভীমপুর গদাইতলা দশমাইল পিচের সড়কে যদি কষ্ট করে একটু দাঁড়িয়ে থাকা যায়, ছক্কামিয়ার টমটমের দেখা মিলবেই মিলবে। অন্ধকারে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে প্রথমে ঠাহর হবে এক চিলতে টিমটিমে আলো। তারপর আলোটা এগিয়ে আসবে আর মেঘের ডাকাডাকি যতই থাক, কানে বাজবে অদ্ভুত এক আওয়াজ টং লং...টং লং...টং লং। বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ চোখে পড়বে কালো এক এক্কাগাড়ি—তেরপলের চৌকা একটা টোপর চাপানো। সামনে কালো এক মূর্তি আর নড়বড় করে দৌড়নো এক টাট্টু!

মুখে কিছু বলার দরকার নেই। ছক্কামিয়ার টমটম সওয়ারি দেখামাত্র থেমে যাবে। তখন একলাফে পেছনের তেরপল সরিয়ে চৌকা টোপরে ঢুকলেই নিশ্চিন্ত। আবার টলতে-টলতে চলতে থাকবে ছক্কামিয়ার টমটম—টং...লং...টং লং।

টমটম কথাটা এসেছে ইংরেজি 'ট্যান্ডেম' থেকে—যে গাড়ির সামনে কয়েক সার ঘোড়া যেত। কিন্তু ভীমপুরের ছক্কামিয়ার এক্কাগাড়ির ঘোড়া মোটে এক। তবু আদর করে লোকে নাম দিয়েছিল টমটম।

ছক্কামিয়ার চেহারাটি কিন্তু ভারি বদরাগী। ঢ্যাঙা, টিঙটিঙে রোগা, একটু কুঁজো গড়ন। লম্বাটে মুখের বাঁকানো নাকের তলায় পেল্লায় গোঁফ। চামড়ার রং রোদপোড়া তামাটে।

তেমনি তার টাট্টুও। যেমন মনিব, তেমনি ঘোড়া, হাড় জিরজিরে লম্বাটে গড়ন। ঠ্যাং চতুষ্টয় যেন চারখানি কাঠি। মাথাটা দেখে সময়-সময় ঠাহর করা কঠিন, এই প্রাণীটি সিঙ্গি, না প্রকৃত একটি ঘোড়া। হ্রেষাধ্বনি করলেই পিলে চমকে ওঠে। ভীমপুর বাজারের তাবৎ-তাবৎ নেড়িকুকুর দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায় লেজ গুটিয়ে।

লোকে আজকাল রাস্তা চলতে বাস-রিকশোই পছন্দ করে। ছক্কা মিয়ার টমটম চড়লে হাড়মাংস দলা পাকাতে থাকে বলেও না, কালের রেওয়াজ আসলে।

কিন্তু ওই যে বলেছি, রাতবিরেতে বাস ফেল করলে তখন উপায়? ছক্কামিয়া এটা বোঝে এবং দিনে তার টমটমের বাহনটিকে নিয়ে বনজঙ্গল বা ঝিলে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। রাতের বেলা ছোট্ট বাজারের চৌরাস্তায় শিরীষ গাছের তলায় ঘাপটি পেতে বসে থাকে। পাশেই টমটম রেডি।

সেবার পুজোর সময় কলকাতা থেকে ছোটমামার সঙ্গে আসছি। মাঝপথে একখানে ট্রেন দাঁড়িয়ে রইল তো রইল। আর নড়ার নাম নেই। ব্যাপার কী? না—আগের স্টেশনে মালগাড়ি বেলাইন। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। তারপর যখন ট্রেনের চাকা গড়াল, ছোটমামা বেজারমুখে বললেন,—বরাতে আমার হতচ্ছাড়া ছক্কামিয়ার টমটম আছে। বাপস!

ওই টমটমে কখনও চাপিনি। তাই কথাটা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। বললুম,—খুব মজা হবে, তাই না ছোটমামা?

ছোটমামা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন,—মজা হবে! বুঝবে ঠ্যালাটা'খন।

ঠ্যালাটা কীসের বুঝলাম না আগেভাগে। দেখলাম, ছোটমামা ট্রেনের জানলা দিয়ে মুন্ডু বাড়িয়ে বারবার যেন আকাশ দেখছেন। একটু পরে বললেন,—খুব ঝড়বৃষ্টি হবে! কার মুখ দেখে যে বেরিয়েছিলাম। বড়দা অত করে বললেন, তবু থামলুম না। ছ্যা-ছ্যা, আমার কী আক্কেল!

ভীমপুর স্টেশনে যখন নামলুম, তখনও কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির পাত্তা নেই। রাত একটা বেজে গেছে। বাজার নিশুতি। চৌমাথায় শিরীষতলায় গিয়ে দেখি, ছক্কামিয়ার টমটম দাঁড়িয়ে আছে। বলা-কওয়া নেই, দরদস্তুর নেই, ছোটমামা টমটমের পেছনদিকে তেরপল তুলে ঢুকে ডাকলেন,—হাঁ করে দেখছিস কী? উঠে আয়। এখুনি একগাদা লোক এসে ভালো জায়গা দখল করে ফেলবে যে।

ভেতরে খড়ের পুরু গাদার ওপর তেরপল পাতা। কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ। অন্ধকারও বটে। যেন এক গুহায় ঢুকেছি। সামনে সরে গিয়ে ছোটমামা পরদাটা ফাঁক করে রাখলেন। একটু পরে আরও জনাদুই লোক ভেতরে ঢুকে পড়ল। সে এক ঠাসাঠাসি অবস্থা।

আর তারপরই আচমকা চিক্কুর ছেড়ে মেঘ ডাকল এবং শনশন করে এসে গেল একটা জোরালো হাওয়া। ছোটমামা বললেন,—ওই যা বলেছিলুম। হল তো?

ছক্কামিয়া সামনের আসন থেকে ঘোষণা করল,—আরাম করে বসুন বাবুমশাইরা! এবার রওনা দিই। তার ঘোড়াটাও মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চি হিঁ হিঁ ডাক ছেড়ে যখন পা বাড়াল, তখন টের পেলাম কেন ছোটমামা বাপস বলে মুখখানা তুম্বো করেছিলেন।

সত্যি 'বাপস! হাড়গোড় মড়মড়িয়ে ভেঙে যাওয়ার দাখিল। বাইরে হাওয়ার হইচই মেঘের হাঁকডাক যত বাড়ছে, ছক্কামিয়ার ঘোড়াটাও তত যেন তেজি হয়ে উঠছে। একটু পরেই চড়বড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা টোপরের তেরপলে পড়তে শুরু করল। ছোটমামা ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিলেন। আমি তখন অবাক। ছক্কামিয়া বাইরে বসে চাবুক হাঁকাচ্ছে। ওর বৃষ্টির ছাট লাগবে না?

রাস্তাটা ঘুরে রেল লাইন পেরুলে দুধারে বিশাল আদিগন্ত মাঠ। ফাঁকা জায়গায় ঝড়-বৃষ্টিটা মিয়ার টমটমকে বেশ বাগে পেল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি উল্টে গিয়ে রাস্তার ধারের গভীর খালে নাকানিচোবানি খাবে! আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে সেও ভাববার কথা।

কিন্তু আশ্চর্য, টমটম সমান তালে নড়বড়িয়ে টলতে-টলতে চলছে। মাঝে-মাঝে ঝড়-বৃষ্টির শব্দের ভেতর শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত এক শব্দ—টংলং—টংলং—টংলং। কখনও ছক্কামিয়ার টাট্টুঘোড়া বিকট চিঁ-হিঁ করে চেঁচিয়ে উঠছে। তারিফ করে আমার পেছন থেকে এক সওয়ারি বলে উঠলেন,—পক্ষীরাজের বাচ্চা!

এতক্ষণে তেরপলের টোপর থেকে ফুটো দিয়ে জল চোঁয়াতে থাকল। সওয়ারিরা নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সরবে কোথায়? বেহদ্দ ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছিল জামা-কাপড়। একসময় ছোটমামা হঠাৎ বাজখাঁই চেঁচিয়ে বললেন,—আঃ! হচ্ছে কী, হচ্ছে কী মশাই? আমার ওপর পড়ছেন কেন?

—আপনার ওপর আমি পড়লুম, না আপনি আমার ওপর পড়লেন?

—কী বাজে কথা বলছেন? আমায় ঠান্ডা করে দিয়ে আবার তক্ক? আপনি মানুষ, না বরফ?

—আমি বরফ? আপনিই তো বরফ। ইস। কী ঠান্ডা! হাড় অবধি জমে গেল দেখছেন না!

আমার পিছনের সওয়ারি চাপা খিকিখিক করে হেসে আমার কানের ওপর বলল,—ঝগড়া বেধে গেছে। বরাবর হয়, বুঝলেন তো মশাই? ছক্কামিয়ার টমটমের এই নিয়ম। খিক্-খিক্-খিক্-খিক্।

এমন বিদঘুটে হাসি কখনও শুনিনি। কিন্তু এঁর শ্বাস-প্রশ্বাসেও যে বরফের মতো হিম। বললুম,—ইস। একটু সরে বসুন না। বড্ড ঠান্ডা করে যে!

লোকটা ভারি অদ্ভুত! সে ওই বিদঘুটে খিক-খিক-খিক হাসতে-হাসতে আরও যেন ঠেসে ধরল আমাকে। চেঁচিয়ে উঠলাম,—ছোটমামা! ছোটমামা!

কিন্তু ছোটমামার কোনও সাড়া পেলাম না। টোপরের ভেতরটা ঘন অন্ধকার। ফের ডাকলুম—ছোটমামা! কোথায় তুমি?

লোকটা সেই খিকখিক হাসির মধ্যে বলল,—আর ছোটমামা বড়মামা! মামারা এখন রাস্তায় পড়ে কুস্তি করছে।

হতভম্ব হয়ে হাত বাড়িয়ে ছোটমামাকে খুঁজলুম। সুটকেসটা হাতে ঠেকল। কিন্তু সত্যিই ছোটমামা নেই। তারপর পেছনের দিকে চোখ পড়ল। ওদিককার পরদাটা যেন ফর্দাফাঁই। বৃষ্টির ছাঁট এসে ঢুকছে। আমি প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বললাম,—ছক্কামিয়া। ছক্কামিয়া! গাড়ি থামাও! গাড়ি থামাও!

পেছনের সওয়ারি ফের সেই বিদঘুটে হাসি হেসে উঠল। এবার আমি সামনের পরদা ঠেলে সরিয়ে ছক্কা মিয়ার ভেজা জামা খামচে ধরলুম। —গাড়ি থামাও গাড়ি থামাও বলছি!

এতক্ষণে যেন ছক্কামিয়া আমার কথা শুনতে পেল। ঘুরে বলল,—কী হয়েছে বাবুমশাই?

ছোটমামা পড়ে গেছেন কোথায়।

ছক্কামিয়া বলল,—বালাই ষাট। পড়বেন কোথায়? ঠিকই আছেন, খুঁজে দেখুন না।

—নেই। তুমি গাড়ি থামাবে কি না বলো!

সামনে একটা মন্দির আছে। সেখানে থামাব। —ছক্কামিয়া চাবুক মেরে

ঘোড়াটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে বলল,—যেখানে-সেখানে থামলে ঝড়-বৃষ্টিতে কষ্ট পাবেন বাবুমশাই। বুঝলেন না? ওইখানে থামিয়ে আপনার ছোটমামাকে খুঁজবেন বরঞ্চ।

মন্দিরের আটচালার সামনে গাড়ি দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে আমি ছক্কামিয়ার পাশ দিয়ে লাফ দিলাম। তারপর আটচালায় ঢুকে পড়লাম। বুদ্ধি করে ছোটমামার সুটকেস আর আমার কিটব্যাগটাও দু-হাতে নিয়েছিলাম।

কিন্তু আটচালায় ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে দেখলুম, ছক্কামিয়ার টমটম বৃষ্টির মধ্যে আচমকা গড়াতে শুরু করেছে। ঘোড়াটা চিঁ-হিঁ ডাক ডেকে তেমনি নড়বড়ে পায়ে দৌড়তে লেগেছে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। মুখে কথাটি পর্যন্ত আর ফুটল না। ভারি অদ্ভুত লোক তো ছক্কামিয়া।

এখন ঝড়টা প্রায় কমে এসেছে। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। নির্জন আটচালায় দাঁড়িয়ে আছি। প্যান্ট-শার্ট ভিজে চপচপ করছে। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা আর কী!

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুতের আলোয় দেখি, কে যেন আসছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম,—কে-কে?

ছোটমামার সাড়া এল,—অন্তু নাকি রে?

আমি কাঁদ-কাঁদ গলায় বললুম,—হ্যাঁ! তোমার কী হয়েছিল ছোটমামা? ছোটমামা আটচালায় ঢুকে বললেন,—কী হবে আবার। যা হওয়ার, তাই হয়েছিল। তবে ব্যাটাকে এবার যা জব্দ করেছি, আর কক্ষনও ছক্কামিয়ার টমটমে ভুলেও চড়তে আসবে না।

—ছোটমামা আমার কাছে সুটকেস দেখে খুশি হয়ে বললেন,—জানতুম, তুই ঠিকই নেমে পড়ে আমার অপেক্ষা করবি কোথাও।

—কিন্তু লোকটা কোথায় রইল?

হাসলেন ছোটমামা,—ওকে তুই লোক বলছিস এখনও? ওটা কি লোক নাকি?

—তবে কে?

—বুঝলিনে? ওর ঘাড়ে একটা চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দে, তাহলে বুঝবি। থাকগে, এখন রাতবিরেতে ও নিয়ে আলোচনা করতে নেই। ব্যাপারটা কী জানিস অন্তু? রাতবিরেতে অমন দু-একজন সওয়ারি ছক্কামিয়ার টমটমে উড়ে পড়বে। তারপর কী করবে জানিস? অন্ধকারে ঘাড় মটকানোর তাল করবে। যেই টের পেয়েছি আমার পেছনের লোকটার মতলব কী, অমনি ওকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যাটা পড়বার সময় অ্যায়সা হ্যাঁচকা টান মেরেছে যে আমিও ওর সঙ্গে তেরপলের ফাঁক দিয়ে নিচে পড়েছি।

—তারপর? তারপর ছোটমামা?

তারপর আর কী? ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় কুংফু-জুডো যা সব অ্যাদ্দিন কষ্ট করে শিখেছি, চালিয়ে গেলুম। এক প্যাঁচে ওকে এমন করে ছুড়লুম যে একেবারে বিশ ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়ল। এতক্ষণ কোনও বাজ পড়া ন্যাড়া গাছের ডগায় বসে হিঁপিয়ে-হিঁপিয়ে কাঁদছে। —ছোটমামা হাসতে-হাসতে গায়ের জামা খুলে নিঙড়ে

নিলেন। তারপর বললেন,—ঘণ্টা তিন কাটাতে পারলেই ফার্স্ট বাস পেয়ে যাব। জামাটা নিঙড়ে নে। ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে মাথা মুছে ফেল। বাপস!

আমি শুধু ভাবছিলুম, তাহলে আমার পেছনকার সেই সওয়ারিও কি লোক নয়, সেই লোকটিও কি আমার ঘাড় মটকানোর তালে ছিল? অন্য লোকটার মতো?

আমার মুখ দিয়ে ছোটমামার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে গেল,—বাপস!...

ছক্কামিয়ার টমটমে তারপর ভুলেও চাপার কথা ভাবতুম না। কিন্তু বছর দশেক পরে, যখন কিনা আমি পুরোপুরি সাবালক, একরাতে ভীমপুর স্টেশনে নেমে শুনলুম লাস্ট বাস চলে গেছে।

স্টেশনবাজার তখন নিঃঝুম। সময়টা শীতের। আকাশে একটুকরো চাঁদও আছে। কিন্তু কুয়াশার ভেতর তার দশা বেজায় করুণ। একটা চায়ের দোকান খোলা ছিল। শীতের রাত বারোটায় চা-ওলা সবে ঝাঁপ ফেলার জোগাড় করছিল, আমাকে দেখে বুঝি তার দয়া হল। এক কাপ চা খাইয়ে দিল। শেষে বলল,—বাবুমশাই তাহলে যাবেন কীসে গদাইতলা?

—কীসে আর যাব? বরং দেখি যদি ওয়েটিং-রুমে রাতটা কাটানো যায়।

চা-ওলা মুচকি হেসে বলল,—ছক্কামিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।

ছক্কামিয়ার টমটমের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম! সেবার ঝড়-বৃষ্টি ছিল কম। ছোটমামাও বড় গপ্পের মানুষ ছিলেন।

হনহন করে চৌমাথায় চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, শিরীষতলায় আগুন জ্বেলে বসে আছে সেই আদি অকৃত্রিম ছক্কামিয়া। পাশেই তার টমটম তৈরি। ঘোড়াটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। শীত বাঁচাতে তার পিঠে একটুকরো চটের জামা। বললুম,—গদাইতলা যাবে নাকি ছক্কামিয়া?

ছক্কামিয়া ইশারায় টমটমে চড়তে বলল।

আজ আর কোনও সওয়ারি এল না দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। টমটম তেমনি নড়বড় করে চলতে শুরু করল। ঘোড়াটাও বিকট চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাকতে ভুলল না। অবিকল সব আগের মতোই আছে। এমন কী ছক্কামিয়ার পেল্লায় গোঁফটারও ভোল বদলায়নি। আর সেই অদ্ভুত ঘণ্টার শব্দ, টংলং—টংলং—টংলং!

কনকনে ঠান্ডা হাওয়া তেরপলের ঘেরাটোপের ছ্যাঁদা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে উত্যক্ত করছিল। জড়সড় হয়ে কোনা ঘেঁষে রইলুম। সামনেকার মোটা ছ্যাঁদা দিয়ে বাইরে কুয়াশামাখানো জ্যোৎস্নায় ঝিমধরা মাঠঘাট চোখে পড়ছিল। গাছগুলো আগাপাস্তলা কুয়াশার আলোয়ান চাপিয়েছে; আর মাথায় পড়েছে কুয়াশার টুপি। টুকরো চাঁদখানা ছেঁড়া ঘুড়ির মতো একটা ন্যাড়া তালগাছের ঘাড়ে আটকে গেছে দেখতে পাচ্ছিলুম।

মাইলটাক চলার পর রাস্তার ধার থেকে কে বাজখাঁই হাঁক ছাড়ল,—রোকো, রোকো! অমনি টমটম থেমে গেল। ঘোড়াটাও স্বভাবমতো সামনে দু-ঠ্যাং তুলে

একখানা চিঁ-হিঁ ছাড়ল। তারপর ছক্কামিয়ার গলা শুনলুম,—দারোগাবাবু নাকি? সেলাম, সেলাম।

মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিশাল এক ওভারকোট পরা মূর্তি। সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোনও এক দারোগাবাবু। বললেন,—রোসো। সাইকেলখানা তুলে দিলেন। তারপর যখন টোপরের ভেতরে ঢুকলেন, মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। ঢুকেই আমাকে টের পেয়ে চমকানো গলায় বলে উঠলেন,—কে? কে?

বললুম,—আমি।

আমি? আমি মানুষের নাম হয় নাকি? —বলে দারোগাবাবু টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিলেন। নামধাম বলতেই হল। পুলিশের লোক বলে কথা। সব শুনে উনি বললেন,—আমি আপনাদের গদাইতলা থানার চার্জে। কিন্তু আপনাকে কখনও দেখিনি।

বেগতিক দেখে বললুম,—কলকাতায় আছি বহুকাল। তাই দেখেননি। তা আপনার নামটা জানতে পারি স্যার?

—বংকুবিহারী রায়।

আসামী ধরতে বেরিয়েছিলেন বুঝি? —ওঁকে খুশি করার জন্যই বললুম।

বংকু দারোগা জলগম্ভীর স্বরে বললেন,—হুম্! ব্যাটা এক দাগি বেগুনচোর ভীষণ ভোগাচ্ছে। আজ একটা বেগুনক্ষেতে দুজন সেপাই নিয়ে ওত পেতেছিলুম। তাড়া খেয়ে সটান একটা তালগাছের ডগায় উঠে গেল। তাকে আর নামাতে পারলুম না। তখন সেপাই দুজনকে তালগাছের গোড়ায় বসিয়ে রেখে এলুম। আসতে-আসতে হঠাৎ সাইকেলের বেয়াদপি।

দাগি বেগুনচোর এই শীতকালে সারারাত তালগাছের ডগায় বসে আছে! কিন্তু তার জন্য নয়, হতভাগা সেপাই দুজনের কথা ভেবে আমার উদ্বেগ হচ্ছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—আহা!

আহা মানে? —আমাকে ফের টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধ নজরে দেখে বঙ্কু দারোগা বললেন,—হুম! আপনি মশাই এই মড়া-বওয়া গাড়িতে এতরাতে চাপলেন যে! আপনি জানেন, আজকাল সওয়ারি জোটে না বলে ছক্কামিয়া মড়া বয়ে নিয়ে যায় গঙ্গার ঘাটে!

বলেন কী! তাহলে তো ভয়ের কথা। —অবাক হয়ে বললুম, সত্যি ভয়ের কথা। আগে জানলে—কথা কেড়ে বঙ্কু দারোগা বললেন,—হয়তো জেনেশুনেই চেপেছেন। কিচ্ছু বলা যায় না।

—কেন এ কথা বলছেন?

—বলছি আপনার চেহারা দেখে। এমন শুঁটকো রোগা চিপসে বাসি মড়ার মতো লোক সচরাচর দেখা যায় না কিনা।

এবার আমার খুব রাগ হল,—কী বলতে চান আপনি?

—রাত-বিরেতে আজকাল ছক্কা মিয়ার টমটমে কে জ্যান্ত, কে মড়া বোঝা যায় না। মশাই!

হাত বাড়িয়ে বললুম,—এই আমার হাত! পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আমি মড়া না জ্যান্ত!

বঙ্কু দারোগা আমার হাত সরিয়ে দিলেন জোরে,—বাপস! এ তো বেজায় ঠান্ডা?

—ঠান্ডা হবে না? শীতের রাতে এই মাঠের মধ্যে হাত কি গরম থাকবে?

—না মশাই। এমন রাতে বিস্তর সিঁদেল চোরের হাত পাকড়েছি। তারা কেউ এমন ঠান্ডা ছিল না।

—কী? আমায় সিঁদেল চোর বললেন!

বংকু দারোগা গলাটা ভেতরে নিয়ে বললেন,—সিঁদেল চোরের ভূত হতেও পারেন। কিচ্ছু বলা যায় না। তখন আহা বলা শুনেই সন্দেহ জেগেছে।

আর সহ্য হল না। খাপ্পা হয়ে চ্যাঁচালুম,—পুলিশ হোন, আর যাই হোন আপনাকে অমি সাবধান করে দিচ্ছি মশাই।

দারোগাবাবু ফের মুখের ওপর টর্চ জ্বেলে বললেন,—উঁ হুঁ হুঁ। বড্ড এগিয়ে এসেছেন। সরে বসুন! সরে বসুন বলছি!

মুখের ওপর টর্চের আলো কারই বা সহ্য হয়! টর্চ নেভান—বলে টর্চটা ঠেলে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলুম। টর্চটা নিভে গেল। এবং কোথায় ছিটকে পড়ল। কিন্তু এটাই বোধহয় ভুল হল। আর বঙ্কু দারোগা বিকট গলায় ভূত! ভূত! —বলে চিক্কুর ছেড়ে আমাকে এক রামধাক্কা মারলেন। টোপরের একাপাশের জরাজীর্ণ তেরপলের ওপর কাত হয়ে পড়লুম। তেরপলটা ফরফর করে ছিঁড়ে গেল। এবং টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলুম। কানের পাশ দিয়ে চাকা গড়িয়ে গেল প্রচণ্ড বেগে। পলকের জন্য দেখলুম কুয়াশা-ভরা নীলচে জ্যোৎস্নায় কালো টমটম দূরে সরে যাচ্ছে। ভেসে আসছে অদ্ভুত এক শব্দ টংলং—টংলং—টংলং!

ভাগ্যিস, রোডস দফতরের লোকেরা রাস্তা মেরামতের জন্য কিনারায় বালির গাদা রেখেছিল। আঘাত টের পেলুম না। সামনে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। লোকেরা লণ্ঠন-লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরিয়ে এল। তখন ঘটনাটা তাদের আগাগোড়া বলতে হল।

কিন্তু সব শুনে ওরা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। একজন বলল,—কী বলছেন বাবু? ছক্কামিয়ার টমটম পেলেন কোথায়? কাল ভীমপুরের কাছেই একটা ট্রাকের ধাক্কায় ছক্কামিয়া আর তার ঘোড়াটা মারা পড়েছে যে! ভাগ্যিস, টমটমে একটা মড়া ছিল শুধু। সঙ্গের লোকেরা বাসে চেপে গঙ্গার ধারে গিয়েছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড দেখুন, মড়াটা একেবারে আস্ত ছিল। তুলে নিয়ে গিয়ে ভালোয়-ভালোয় চিতেয় তুলতে পেরেছে।

বঙ্কু দারোগার ওপর সব রাগ সঙ্গে-সঙ্গে ঘুচে গেল। বরং উনি আমাকে বাঁচিয়েই দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওঁর নিজের ভাগ্যে কী ঘটল কে জানে! আহা বেচারা!

কী ঘটল, তার পরদিন শুনলাম। বঙ্গুবাবু তখন হাসপাতালে। লোকে বলছে,

আসামী ধরতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে কোমড়ের হাত ভেঙেছে। সাইকেলও অক্ষত নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো আমি জানি। তবে যাই হোক, আমার ওপর যেটুকু ফাঁড়া গেছে, তার জন্য দায়ী স্টেশনবাজারের সেই ধড়িবাজ চা-ওলা। কেমন হেসে বলেছিল ছক্কামিয়ার টমটমেও যেতে পারেন। সব জেনে-শুনেও কী অদ্ভুত রসিকতা।

অবশ্য এমনও হতে পারে, সে বলেছিল,—ছক্কামিয়ার টমটমেও যেতে পারতেন। আমিও হয়তো ভুল শুনেছিলুম। ক্রিয়াপদের গোলমাল স্রেফ!—

হাওয়া-বাতাস

সেবার পুজোর সময় আমার মামাবাড়ির ছোট-বড় সবাই মিলে হিমালয়ে ভ্রমণে গেলে বাড়ি পাহারার দায়িত্ব পড়েছিল আমার কাঁধে। অবশ্য আমি একা নই, বাড়ির পুরোনো কাজের লোক রামলালও ছিল। লোকটা রাঁধুনি হিসেবে খাসা। দুজনে মনের আনন্দে যথেচ্ছ খেতুম আর ক্যারাম পিটতুম। শুধু রাতের বেলাটা—

সে কথা বলতেই এই গল্প।

বাড়িটা শহরতলি এলাকায়। একেবারে সুনসান নির্জন আর গাছপালা, পুকুর-ডোবাও প্রচুর। মনেই হবে না শহরের নাকের ডগায় এমন পাড়াগেঁয়ে পরিবেশ থাকতে পারে। তাছাড়া খুব পুরোনো আমলের বাড়ি। চারদিকে বাগান, পুকুর, একটা বাঁশবন পর্যন্ত।

রামলালের বয়স হলেও শরীরখানা এখনও জোয়ানের মতো তাগড়াই। বোঝা যায়, এক সময় রীতিমতো ব্যায়ামবীর ছিল। আর এমন মানুষ কাছে থাকলে পরিবেশ যাই হোক, কোনওরকম ভয়-ভাবনা থাকার কথা নয়। চোর-ডাকাতের সামনে রামলাল গোঁফে তা দিয়ে দাঁড়ালেই লেজ তুলে পালিয়ে যেতে পথ পাবে না।

হ্যাঁ, প্রথমদিন সে কথাই মনে হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যার মুখে বাইরে গেট বন্ধ করতে গিয়ে যখন রামলাল আমাকে ডেকে বলল,—দাদাবাবু, আপনি একটু দাঁড়ান তো এখানে, আমার কেমন ডর লাগছে,—তখনই আঁচ করলুম, লোকটাকে যতটা সাহসী ভেবেছিলুম, ততটা হয়তো নয়।

গেট বন্ধ করে ঝটপট ঘরে ঢুকে রামলাল একটু হেসে বলল,—চোর, গুণ্ডা, ডাকু—তাদের সঙ্গে একহাত লড়া যায় দাদাবাবু! কিন্তু হাওয়া-বাতাসের সঙ্গে তো লড়া যায় না!

অবাক হয়ে বললুম,—তার মানে? ও রামলাল, হাওয়া-বাতাস ব্যাপারটা কী?

রামলাল চোখ টিপে বলল,—সে আছে। কর্তাবাবু যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, ততক্ষণ কোনও ঝামেলা হয় না। রাতবিরেতে উনি বাড়ি না থাকলে ব্যাটা পেয়ে বসে!

কেমন অস্বস্তি হয় ওর কথাটা শুনে। বললুম,—কার কথা বলছ, খুলে বলো তো রামলাল?

রামলাল ফের চোখ টিপে বলল,—আছেন তো! মালুম হয়ে যাবে।

হয়তো মালুম খানিকটা হল কিছুক্ষণ পরেই। দোতালার একটা ঘরে বসে ফের একদফা চা খেতে-খেতে একটা গোয়েন্দা-উপন্যাস সবে খুলেছি। রামলাল নিচের তলায় কিচেনে রাতের জন্য রান্না করছে এবং মাঝে-মাঝে তার হেঁড়ে গলার গানও শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ একটা বাতাস উঠল শনশনিয়ে। বাগানের দিকে যেন হুলুস্থুল শুরু হল। তারপর বাঁশবন থেকে বিচ্ছিরি ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ শোনা যেতে লাগল। ঘরের জানালার কপাটগুলো খটখট করে নড়তে থাকল। আর সেই সময় গেল আলো নিভে। সারা এলাকা অন্ধকার হয়ে গেল দেখে বুঝলুম লোডশেডিং। কিন্তু ততক্ষণে রামলালের গানটা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর সিঁড়িতে ধুপধাপ-দুদ্দাড় শব্দ করে সে এসে হাজির হল। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—কিচেনে হ্যারিকেন ছিল। খুঁজে পেলুম না। শিগগির মোম জ্বালুন দাদাবাবু!

টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে মোমবাতি বের করে জ্বেলে নিলুম। আশ্চর্য, বাতাসটা আর নেই। বললুম,—কী ব্যাপার রামলাল? তুমি কি ভয় পেয়েছ?

রামলাল কাঁচুমাচু মুখে হাসল। বলল,—পাইনি, আবার পেয়েছিও। বুঝলেন না দাদাবাবু? হাওয়া-বাতাসের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল। দেখুন না, গালটা এখনও বরফ হয়ে আছে। হাওয়া-বাতাসের চড় বলে কথা।

বিরক্ত হয়ে বললুম,—ধ্যাত্তেরি, তোমার হাওয়া-বাতাসের নিকুচি করেছে। তুমি কী বলতে চাইছ, বুজতে পারছি না!

রামলাল তেমনি চোখ টিপে রহস্যময় হেসে বলল,—আছেন যখন এ বাড়িতে, সব মালুম হয়ে যাবে। এখন কৃপা করে একটু কিচেনে এসে বসুন দাদাবাবু। ব্যাটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।

ওর কথা শুনে এবং ভাবভঙ্গি দেখে অস্বস্তি বেড়ে গিয়েছিল। তবে লোকটা গায়ে-গতরে যেমন, সাহসের বেলায় মোটেও তেমনটি নয় তাহলে। রান্না ও খাওয়া শেষ হলে ওপরের ঘরে শুতে এলুম। আমিই ওকে এ ঘরে শুতে বলতুম, কিন্তু কিছু বলার আগে রামলাল নিজেই অনুরোধ করল, আমার ঘরেই মেঝেতে শুতে পারলে রাতে ঘুমটা তার হবে। নইলে নাকি ওই হাওয়া-বাতাস তাকে ঘুমোতেই দেবে না।

বাতাসের কি প্রাণ আছে? বাতাস কীভাবে এবং কেন মানুষকে জ্বালাতন করবে আমি ভেবেই পাচ্ছিলুম না। ততক্ষণে আলো এসেছে। মেঝেয় শতরঞ্চির ওপর চাদর পেতে রামলাল নাক ডাকতে শুরু করেছে। ভিন্ন জায়গায় আমার সহজে ঘুম আসে না। তাছাড়া ওই অস্বস্তি। বিছানায় শুয়ে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় গোয়েন্দা-উপন্যাসটা পড়ার চেষ্টা করছি। এমন সময় আবার সেই উটকো বাতাসটা বাগানের দিকে শনশনিয়ে উঠল। তারপর জানালা খটখটিয়ে ঘুরে ঢুকল। জোরে ফ্যান চালিয়ে দিয়েছিলুম মশার অত্যাচারে। ভাবলুম, ভালোই হল, বাইরের এই হতচ্ছাড়া বাতাসটা এসে মশাগুলোর দফা-রফা করুক।

কিন্তু ফের সেই লোডশেডিং। তারপর বাঁশবনের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজের মধ্যে ক্রমশ যেন যন্ত্রণাকাতর মানুষের গোঙানি শুনতে পেলুম। কে যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ককিয়ে-ককিয়ে কাঁদছে। আমার গায়ে কাঁটা দিল। এ কখনও কানের ভুল নয়। তাছাড়া ঘরের ভেতর বাতাসটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চারদিকে বাইরে এবং ভেতরে প্রচণ্ড হুলুস্থুল চলছে। আমি কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম। উঠে জানালা বন্ধ করার সাহসও হল না।

তারপর আচমকা নিচের তলায় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা পড়ে গেল শুনলুম। পড়ার বিকট ঝনঝন শব্দে বুঝি প্রকাণ্ড একটা কাচ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। ডাকলুম,—রামলাল! রামলাল! ওঠ, শিগগির ওঠ তো!

অবাক হয়ে দেখি, রামলাল কখন জেগে গেছে। সে ভারী গলায় বলল,—চুপসে শুয়ে থাকুন দাদাবাবু। ও কিছু না!

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম,—কী বলছ তুমি? নিশ্চয় নিচের কোনও ঘরের জানালা খুলে গেছে! ছবিটবি পড়ে ভেঙে গেছে।

রামলাল বলল,—ও হাওয়া-বাতাসের কাণ্ড দাদাবাবু! চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

খাপ্পা হয়ে বললুম,—নিকুচি করেছে তোমার হাওয়া-বাতাসের! মামাবাবু এসে যদি দেখেন, এভাবে আমরা বাড়ি পাহারা দিয়েছি, তোমারও চাকরি যাবে, আমিও মুখ দেখাতে পারব না। ওঠো, চলো দেখি কী ভাঙল।

রমলাল অন্ধকারে বলল,—আপনি গিয়ে দেখুন দাদাবাবু। আমি যাব না।

রাগ হলে মানুষের সাহস বাড়ে। বালিশের পাশ থেকে টর্চ নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলুম! সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় টের পেলুম বাতাসটা হঠাৎ থেমে গেছে।

বাতাস বলা আর উচিত হবে না। একে ঝড় বলাই ভালো। শরৎকালে এমন ক্ষণিক ঝড় ভারি অদ্ভুত বটে! বছরের এসময়টা ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টিও হয় এবং তা একনাগাড়ে কয়েকদিন থাকে। কিন্তু এই আচমকা ঝড়ের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক মিনিট। তাছাড়া এককোঁটা বৃষ্টি নেই। আকাশ সারাদিন প্রায় নির্মেঘ ছিল। রাতেও তাই। আকাশভরা তারা ঝকমক করছে দেখছি। নিচের তলায় পৌঁছে মনে পড়ল, যাঃ! চাবির গোছাটা আনতে ভুলে গেছি। মামাবাবু সব চাবির ডুপ্লিকেট দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন প্রতিদিন সব ঘর যেন রামলালকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নিই। পরিচ্ছন্নতার বড় বাতিক ওঁর।

টর্চের আলো বসার ঘরের দরজায় পড়তেই চমকে উঠলুম! দরজা হাট করে খোলা। মরিয়া হয়ে ভেতরে ঢুকে গেলুম। যা ভেবেছি তাই। ঘরের দেয়ালে প্রকাণ্ড সব বিদেশি পেন্টিং টাঙানো ছিল। দাদামশাইয়ের মস্ত একটা ছবি ছিল। মহাপুরুষদের ছবি ছিল খানকতক। একটাও দেয়ালে আর নেই। মুখ থুবড়ে নিচে পড়ে খান-খান হয়ে গেছে সব কাচ। ফ্রেম পর্যন্ত ভেঙে গেছে।

আরও অদ্ভুত ব্যাপার, সারা ঘরে যেন হুলুস্থুল লড়াই করেছে কারা। সোফাগুলো

উল্টে পড়েছে। ডিভানটা কাত হয়ে রয়েছে। বইয়ের দুটো আলমারি টানাটানি করে স্থানচ্যুত করেছে কারা।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছি ব্যাপার দেখে। অবশ্য আঙুল টর্চের বোতাম থেকে সরে যেতেই অন্ধকার ঘিরে ফেলল এবং তখন সচেতন হয়ে আবার বোতাম টিপলুম।

উজ্জ্বল এক ঝলক আলো কোণের দিকে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে আমার হৃৎপিন্ডে রক্ত ছলকে উঠল। সারা শরীর হিম হয়ে গেল যেন। কোণের মেঝে ও দেয়ালে চাপচাপ রক্ত—টাটকা রক্ত জ্বলজ্বল করছে।

আর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার বা ব্যাপারটা ভালো করে দেখার সাহস হল না। তক্ষুনি ঘুরে কাঁপতে-কাঁপতে এবং টলতে-টলতে প্রায় দৌড়ে চললুম।

সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে টর্চটাও গেল বিগড়ে। চেঁচিয়ে উঠলুম,—রামলাল! রামলাল!

রামলাল মোমহাতে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বলল,—কী হল দাদাবাবু?

ভাঙা গলায় অতি কষ্টে বললুম,—নিচের ঘরে কাকে খুন করা হয়েছে।

রামলাল আশ্চর্য, ফিক করে হাসল। আগের ভঙ্গিতে বলল,—ও কিছু না। হাওয়া-বাতাসের কাজ। চলে আসুন, দাদাবাবু।...

সমস্ত ব্যাপারটা অস্বাভাবিক এবং ভয়ঙ্কর। কিন্তু সকালে দুরুদুরু বুকে নিচের সেই ঘরে গিয়ে আমি অবাক হয়ে দেখি, রাতের সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়ের এতটুকু চিহ্ন নেই কোথাও! কোথাও একফোঁটা রক্ত কেন, এতটুকু লাল দাগ পর্যন্ত নেই।

তাহলে কি ব্যাপারটা নিছক দুঃস্বপ্ন?

মোটেও না। একই স্বপ্ন দুজনে তো একসঙ্গে দেখা অসম্ভব। তাছাড়া রামলাল বলল,—কর্তাবাবু বাড়ি না থাকলে এমনটা হয়। বাড়ির ছোটবড় সবাই তা জানে। তাই রাতের ঘটনা নিয়ে আপনার মতো কেউ মাথা খারাপ করে না।

শরতের উজ্জ্বল রোদে বাড়ি এবং পরিবেশ কী সুন্দর দেখাচ্ছিল। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল রাতের ঘটনাগুলো। দিনমানে হাওয়া নেই। কেমন একটা গুমোট ভাব। বিকেল অবধি রামলালের সঙ্গে সেই বসার ঘরে ক্যারাম খেললুম। তারপর রোদ কমে আসার সঙ্গে-সঙ্গে অস্বস্তি জেগে উঠল। রাত হলেই এই বাড়িটা জেগে উঠবে। তাকে জাগিয়ে তুলবে এসে এক অদ্ভুত ঝোড়ো-হাওয়া। বড় অবিশ্বাস্য লাগে।

এ রাতে শোওয়ার সময় মনে-মনে ঠিক করেছিলুম যা কিছু ঘটুক রামলালের মতো নির্বিকার থাকব। রামলাল যথারীতি নাক ডাকিয়ে ঘুমতে শুরু করল। কিন্তু আমি জানি ঘটনা শুরু হলে সে জেগে যাবে। যথারীতি লোডশেডিং চলছে। বাইরে চারদিকে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। যেন মঞ্চের পরদা ওঠার প্রতীক্ষায় স্থাবরজঙ্গম রুদ্ধশ্বাসে রয়েছে। রাত দশটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে আবার বাগানের দিকে শনশন শব্দ শুনতে পেলুম। অমনি একটা জেদ এসে গেল। নিচের ঘরটাতে কাল রাতে এক হত্যাকাণ্ডের শেষ দৃশ্যে উপস্থিত হয়ে ছিলুম, আজ গোড়া থেকে উপস্থিত থাকার ইচ্ছে পেয়ে বসল।

পাছে রামলাল বাধা দেয়, তাই টর্চ নিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেলুম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ততক্ষণে সেই অদ্ভুত রহস্যময় ঝোড়ো-বাতাস হুলুস্থুল বাধিয়েছে এসে। সিঁড়িতে পা রাখা দায়। ঝড়ের ধাক্কায় টাল খাচ্ছি শুধু।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমেই আলো ফেললুম বসার ঘরের দরজায়। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না, যা দেখলুম। ঘরের দরজাটা পুরোনো এবং প্রকাণ্ড। মচমচ খটাং-খট শব্দে দুটো কপাট খুলে গেল। বাতাসটা শনশন করে ঢুকে গেল তক্ষুনি। ভেতরে তোলপাড় শুরু হল।

এক লাফে নেমে ঘরে ঢুকে পড়লুম। টর্চের আলোয় কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভেসে উঠল পাতা চাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাসে বেঁটে একটা শরীর—মানুষেরই শরীর। পরনে প্যান্টশার্ট আর মাথার টুপিও যেন আছে। সে একটা ছবি টেনে নামাচ্ছিল। আমার দিকে ঘুরল। মুখটা যেন চীনাদের মতো। সেই মুহূর্তে টর্চটা বিগড়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলুম,—রামলাল! রামলাল!

তারপর টের পেলুম অসম্ভব ঠান্ডা হিম দুই হাতে কেউ আমার গলা টিপে ধরেছে। জ্ঞান হারানোর মুহূর্তেও রামলালকে ডাকার চেষ্টা করছিলুম...

জ্ঞান হলে দেখি রামলালের বিষণ্ণ মুখ। সে আস্তে-আস্তে বলল,—শরীর ঠিক হয়েছে তো দাদাবাবু?

প্রথমে ঘড়ি দেখে নিলুম। বারোটা পঁচিশ বাজে। ঘরে উজ্জ্বল আলো। বিদ্যুৎ এসে গেছে। শরীর খুব ক্লান্ত। গলায় সেই ঠান্ডা স্পর্শটা এখনও লেগে আছে। দুঃস্বপ্ন নয়, যা ঘটেছে, সবই সত্যি তাহলে।

ব্যাপারটা রামলালকে বলতে যাচ্ছিলুম, সে বাধা দিয়ে বলল,—চুপসে নিদ করুন দাদাবাবু! বুঝলেন তো, হাওয়া-বাতাসের ব্যাপারটা কী! এ বাড়ি কর্তামশাই কেনার পর প্রথম-প্রথম আমি খুব লড়ার চেষ্টা করেছিলুম। পারিনি। তবে কর্তামশাইও এ বাড়িতে আর থাকতে চান না! বলে গেছেন, ফিরে এসে বেচে দেবেন।

বললুম,—নিচের ঘরে একজন চীনা আমার গলা টিপে ধরেছিল।

রামলাল,—চীনা নয় দাদাবাবু! জাপানি! শুনেছি ব্রিটিশ আমলে জাপানের সঙ্গে লড়াই বাধলে লোকটা নিজের পেটে ছোরা মেরে আত্মহত্যা করেছিল। এ বাড়িটা ছিল তারই। তবে ব্রিটিশ সোলজাররা এসে লাশটাও বাঁশবনে ফেলে দিয়েছিল। তখনও নাকি ধড়ে প্রাণটা ছিল। এখনও রাত-বিরেতে বাঁশবনে শুয়ে কাঁদে।

চমকে উঠে বললুম,—তাহলে সেই রক্তই দেখেছি। হারাকিরির রক্ত!

হাই তুলে রামলাল বলল,—ছেড়ে দিন। আপনাকে বলেছিলুম দাদাবাবু, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না! হাওয়া-বাতাস থেকে গা বাঁচিয়ে চললে কোনও ক্ষতি হবে না। লড়তে গেলেই যত ঝামেলা! বুঝলেন তো?

বুঝলুম। জাপানি ভদ্রলোক হারাকিরি করে মারা গেছেন বটে, এখনও ব্রিটিশদের ওপর রাগটা মেটেনি। ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, এদেশ ছেড়ে ব্রিটিশরা কতকাল আগে চলে গেছে। আমার বিশ্বাস, সেটা বুঝলেই উনি স্বদেশে চলে যাবেন।...

মানুষ-ভূতের গল্প

আলোরানি হেরিকেনের দম কমিয়ে শুয়ে পড়তেই ঘুমের ফাঁদে আটকে যাচ্ছিল প্রায়, এমন সময়ে বাড়ির পেছনে খিড়কির দিকে কাঁপা-কাঁপা গলায় সন্দেহজনক ডাকাডাকি,—ঘনশ্যাম, ঘনশ্যাম। ঘনা রে।

এক ঝটকায় ফাঁদ ছিঁড়ে উঠে বসল আলোরানি। বাইরে বারান্দার খানিকটা দরমা ঘেরা কুঠুরি। শাশুড়ি তারাদাসীর ডেরা সেখানে। তার ভয়কাতুরে চাপা ধমক শোনা যাচ্ছিল,—যা। যা। ধুস-ধুস।

বয়স বাড়লে ঘুম কমে। কানও খর হয়। গাছগাছালি থেকে পাতা খসে পড়লেও শাসায়।

আলোরানি হ্যারিকেনের দম বাড়িয়ে চমকানো গলায় বলল,—বাবার গলা মনে হচ্ছে যেন?

এবার খ্যা-খ্যা করে হাসতে লাগল ঘনশ্যাম,—ছাড়ো তো। কোন শালা রাতদুপুরে মস্করা করতে এসেছে।

সেই সময় আবার শোনা গেল,—ও ঘনা। ঘনা রে।

ঘনশ্যাম এবার লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। হাড়জ্বালানে মামলাবাজ বলে গাঁয়ে তার বাবার খুব বদনাম ছিল। আড়ালে তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশাও করা হতো। কিন্তু আর তো লোকটা বেঁচে নেই। তা ছাড়া, বাবা খারাপ হতে পারে, ঘনশ্যাম মোটেও খারাপ নয়। কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। বাবার রেখে যাওয়া মামলা-মোকদ্দমা নিয়েও তার মাথাব্যথা নেই। অন্যপক্ষ এই এক মাসেই ঝটপট একতরফা ডিক্রি পেয়ে যাচ্ছে। ঘনশ্যাম লাঠিহাতে বেরুল। পেছনে হ্যারিকেন হাতে তার বউ আলোরানি। তারাদাসী দরমা এবং তেরপলের ভেতর থেকে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল,—স্বভাব যায় না মলে। সকালে গেনুকে খবর দিস বরং।

গেনু ভূতের বদ্যি। ঘনশ্যাম মায়ের মুখে গেনুর নাম শুনে একটু ভড়কে গেল বটে; কিন্তু ফের করুণস্বরে 'ঘনা রে' শুনে লাঠি বাগিয়ে হাঁক ছাড়ল,—কোন শালা রে?

খিড়কির দরজার বাইরে থেকে অবিকল বটকেষ্টর গলা শোনা গেল,—আমি যে, আমি। খামোকা শালা-সমন্দি না করে দুয়োর খুলবি না কি? শীতে অবস্থা কাহিল একেবারে।

ঘনশ্যাম হকচকিয়ে গিয়েছিল। আলোরানি ঠোঁট কামড়ে ধরে কী ভাবছিল। তার হাতে হ্যারিকেন। হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে খিড়কির দরজা খুলে দিল এবং যে লোকটি বাড়ি ঢুকল, সে অবিকল বটকেষ্ট।

সেই ময়লা ফতুয়া, খাটো ধুতি, কাঁচাপাকা গোঁফ, কাঁধে ব্যাগ। চোখে তেমনই জ্বলজ্বলে চাউনি, চালাক-চালাক ঝিলিক।

ঘনশ্যাম প্রচণ্ড আতঙ্কের চোটেই লাঠি তুলেছিল। বটকেষ্ট খপ করে ধরে ফেলে খাপ্পা মেজাজে বলল,—হতচ্ছাড়া বাঁদর, বাবার মাথায় লাঠি তুলতে হাত কাঁপল না? তখন থেকে ডেকে-ডেকে গলা ভেঙে গেল, আবার বাড়ি ঢুকতেই লাঠি। মারব গালে এক থাপ্পড়।

ঘনশ্যাম লাঠি ছেড়ে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। সেই আদি অকৃত্রিম বাবা মনে হচ্ছে, কিন্তু—

সে ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলে উঠল,—ধুস শালা। তাহলে ধারদেনা করে কার বডি পুড়িয়ে এলাম?

বটকেষ্ট থমকে দাঁড়িয়ে বলল,—পুড়িয়ে এলি মানে?

ঘনশ্যাম গুম হয়ে বলল,—বেড খালি দেখে খোঁজ করলাম। বলল, মগগে গিয়ে দেখুন।

বটকেষ্ট হতভম্ব হয়ে বলল,—মগগে গিয়ে আমাকে দেখেছিস?

তাই তো মনে হল। —ঘনশ্যাম মিনমিনে স্বরে বলল,—হাসপাতালের লোকেরাও বলল। তাছাড়া বডি ফুলে ঢোল!

বটকেষ্ট এতক্ষণে একটু হাসল,—আর বলিসনে। হাসপাতালের যা খাবার। গত জন্মের ভাত উঠে আসে পেট থেকে। কাঁহাতক আর সহ্য হয়। শেষে কেটে পড়লাম।

আলোরানি মুখ টিপে হাসছিল। গৃহবধূর গলায় বলল,—গরম জল করে দিই, হাত-মুখ ধুয়ে নিন। তারপর শ্বশুরের পায়ে টিপ করে প্রণামও ঠুকল।

বটকেষ্ট আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলল,—আগে এক কাপ চা। রায়পুরে খগেনের বাড়ি খ্যাঁট দিয়ে বেরিয়েছি। বলে ছেলের দিকে ঘুরল। —মাথা ন্যাড়া করেছিলি দেখছি। তার মানে, বাপের ছেরাদ্দও করেছিস। হাঁদারাম।

তারাদাসী তার ডেরায় চুপচাপ ছিল। হঠাৎ তার ফোঁপানি শোনা গেল। আলোরানি বলল,—আঃ। চুপ করুন তো। রাত-দুপুরে কেলেঙ্কারি করবেন না।

বউমার তাড়ায় তারাদাসী থেমে গেল। ঘনশ্যাম গুম হয়ে বলল,—কেলেঙ্কারি হবেই, সকালে গাঁসুদ্ধু হইচই পড়ে যাবে। তুমি মাইরি খালি ঝামেলা বাড়াও—কোনও মানে হয়? হাসপাতালে ভালো লাগল না তো বাড়ি চলে আসবে। তা নয়, এক মাস নিপাত্তা। এদিকে কোন শালার বডির মুখে আগুন দিয়ে—ধুস!

বটকেষ্ট আস্তে বলল,—চেপে থাক দিনকতক। কাকপক্ষীটিও যেন টের না পায়। বলে সে বারান্দায় উঠল। বিধবা স্ত্রীর উদ্দেশে ফিক করে হেসে বলল,—কী? গোঁসাঘরে খিল দিলে নাকি? যা-যা বলতাম, ঠিক-ঠাক মিলে গেছে তো? বলেছিলাম না ঘনা ঘরে ঢুকবে আর তোমাকে এই পায়রার খোপে ঢোকাবে?

ঘনশ্যাম ফুঁসে উঠল,—না জেনে খামোকা যা-তা বোলো না। মা নিজেই বলল, তোরা ঘরে থাক। আমাকে বাইরে দে।

মামলায়-মামলায় প্রায় সর্বস্বান্ত বটকেষ্ট বউমা আর ছেলের জন্য বারান্দায় এই ঘেরাটোপের ব্যবস্থা করেছিল! আশা ছিল, হরেনের সঙ্গে টুকরো জমি নিয়ে মামলায় তার জয় হবে এবং তাই বেচে পাশে একখানা ঘর তুলবে। কিন্তু হাকিমের অভাবে আদালতে নাকি মামলার পাহাড় জমে উঠেছে।

বটকেষ্ট হ্যারিকেনটা তুলে তেরপলের পরদা ফাঁক করে তার বিধবাকে দেখতে গেল। কিন্তু তারাদাসী লেপমুড়ি দিয়েছে। বটকেষ্ট খ্যা-খ্যা করে বলল,—ঢং। বিধবা হয়েছে তো বিধবা হয়েই থাকো। ছেরাদ্দ-হাওয়া লোকের বউ। যাগযজ্ঞ করে গন্ডাকতক বামুন খাইয়ে আবার বিয়ের পিড়িতে বসতে হবে, জানো তো? বউমা, আমাকে এখানেই বিছানা করে দিও!

ঘনশ্যাম পিতৃভক্তিতে গদ্গদ হয়ে বলল,—না, না। তুমি ঘরে শোবে। আমরা বরং এখানেই শোব। এখনও তত শীত পড়েনি!—

সকালে শাশুড়ির সাড়াশব্দ না পেয়ে আলোরানি তেরপলের পরদা তুলেছিল। তারাদাসীর বিছানা খালি। বাড়ির আনাচেকানাচে ঘুরেও পাত্তা পেল না। গাঁয়ের একটেরে বাড়ি। পড়শিদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এল আলোরানি। কেউ দেখেনি তারাদাসীকে। তখন উদ্বিগ্ন ঘনশ্যাম বেরুল মায়ের খোঁজে।

কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে সে গম্ভীরমুখে বলল,—জগা বলল, ভোরের বাসে মাকে চাপতে দেখেছে। বাবাকে মাইরি কী বলব? খালি ঝামেলা বাড়ানো স্বভাব।

ঘরের ভেতর তক্তপোশে বসে বটকেষ্ট চা খাচ্ছিল এবং পুরোনো পোকায় কাটা দলিল-পরচা দেখছিল। ছেলের কথা কানে যেতেই চাপাগলায় ডাকল,—ঘনা। শুনে যা।

ঘনশ্যাম বারান্দায় উঠে বলল,—বলো।

তোর মা কেটে পড়েছে তো? —বটকেষ্ট বাঁকা হাসল। —জগা বলল না কোন বাসে চাপতে দেখেছে?

—সাঁইথের বাসে। কেন?

বটকেষ্ট তারিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল,—আমি ভাবছিলাম হাসপাতালে গিয়ে ঢুকবে নাকি! সাঁইথে যাওয়া মানে রোঘোর বাড়ি। যত্নআত্যি পাবে। তোর মায়ের কিছু-কিছু ব্যাপারে বেশ টনটনে বুদ্ধি। আয়, বোস এখানে।

ঘনশ্যাম অনিচ্ছার ভঙ্গিতে বসল। সিন্দুক থেকে এসব পোকায় কাটা কাগজপত্তর বের করে খুঁটিয়ে দেখা তার মামলাবাজ বাবার বরাবরকার অভ্যাস। মুখ তেতো করে বলল,—আবার ওই মড়া ঘাঁটতে বসেছ?

স্বভাব যায় না মলে। —বটকেষ্ট ফিক করে হাসল। —তোর মা কাল রাত্তিরে বেশ বলছিল। তোর মায়ের কথাটা মনে ধরার মতো। তুই ছেরাদ্দ করে ন্যাড়া হয়েছিস। তোর মা শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছে বিধবা হয়েছে। তার মানে, আমি এখন মরা মানুষই বটে। কাজেই চেপে যা।

চাপবটা কী? —ঘনশ্যাম জানতে চাইল। বটকেষ্ট জ্বলজ্বলে চোখে ঝিলিক তুলে বলল,—কাল রাত্তিরে বললাম কী তোকে? আমি যে বেঁচেবত্তে আছি, একেবারে চেপে যা।

—হুঁ, তারপর?

—তেঁতুলতলার জমিতে একখানা ঝান্ডা পুঁতে দিয়ে আয়।

ঘনশ্যাম জোরে মাথা নেড়ে বলল,—তোমার মাথা খারাপ? হন্নাদা আমার বডি ফেলে দেবে। কলাই বুনে কাঁটার বেড়া দিয়ে রেখেছে—নিজে গিয়ে দেখে এসো গে না।

বটকেষ্ট একটু ভেবে বলল,—কাঁটার বেড়া দিয়েছে নাকি? যাচ্চলে। মামলা এখনও ঝুলে আছে। মগের মুলুক পড়ে গেছে দেখছি। তোর বাধা দেওয়া উচিত ছিল।

ঘনশ্যাম চটে গেল,—তুমি গিয়ে ঝান্ডা পুঁতে দিয়ে দেখো না, কী হয়। হন্নাদা এখন গাঁয়ের মাথা হয়েছে। পঞ্চায়েতের মেম্বার। এসব আমার দ্বারা হবে না।

তুই একটা অকম্মা। —বটকেষ্টও চটল। —তোরই ভালোর জন্য চিন্তা ভাবনা করে বাড়ি ফিরে এলাম। নইলে অ্যদ্দিন গয়া-কাশী-মথুরা করে দিব্যি ঘুরে বেড়াতাম। সংসারে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল, জানিস?

ঘনশ্যাম আঙুল খুঁটতে থাকল।

বটকেষ্ট চাপাগলায় বলল,—বউমা! শোনো তো!

আলোরানি মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকল। সে বারান্দা থেকে কান করে সব শুনছিল। বলল,—কাকে কী বলছেন? সেদিন তালপুকুরের মাছ ধরে সব্বাই যে-যার ভাগ নিয়ে বাড়ি ঢুকল। মাঝখান থেকে আমি চ্যাঁচামেচি করে গলা ভাঙলাম। আপনার ছেলে উল্টে আমাকে বকাঝকা করে ঠেলতে-ঠেলতে—

বাজে কথা বোলো না। —ঘনশ্যাম বাধা দিয়ে বলল,—মেয়েছেলে—অপমান করে বসলে খুব ভালো হতো? চারটে পুঁটিমাছের জন্য ঝামেলার মানে হয় না।

পুঁটি নয় বাবা! —আলোরানি শ্বশুরকে হাত তুলে মাছের সাইজ দেখাল। —এত-এত বড় পোনা।

বটকেষ্ট গলার ভেতর বলল,—এক আনার শরিক আমি। আচ্ছা দেখছি। ফিরে যখন এসেছি, একটা এসপার-ওসপার না করে ছাড়ছি না।

আলোরানি শ্বশুরের সায় পেয়ে উৎসাহে বলল,—জানেন বাবা? হাসপাতালের ব্যাপারটাতেও আমার সন্দেহ হয়েছিল। যত বলি, কাকে দেখতে কাকে দেখেছ, তত বলে, আমাকে বাবা চেনাচ্ছ?

বটকেষ্ট অভিমানী শ্বাস ফেলে বলল,—আমাকে যদি চিনবে, তাহলে এ অবস্থা হয়? যাকগে। বউমা তোমাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই। ঘনার দ্বারা কিস্যু হবে না।

আলোরানি ঝটপট বলল,—ঝান্ডা পুঁততে হবে তো? পুঁতে আসব। আমি সব পারি—আপনি কিছু ভাববেন না।

ঘনশ্যাম নড়ে উঠল,—মারা পড়বে বলে দিচ্ছি। মেয়েছেলের এত সাহস ভালো নয়। শালা হন্নাদাটা বড্ড ঢ্যামনা!

খপ করে তার কান ধরে বটকেষ্ট ঝাঁকুনি দিল,—চো-ও-প! কাল রাত্তির থেকে শুনছি আমার মুখের সামনে খালি শালা-টালা মুখখিস্তি। এক মাস আমি ছিলাম না, তাতেই এই? সত্যি-সত্যি মলে মুখ থেকে নাদি বেরুবে হতচ্ছাড়ার।

ঘনশ্যামের পিতৃভক্তির মূল কারণ, ছোটবেলা থেকেই তার কাছে বাবা একটা বিপজ্জনক সাংঘাতিক জিনিস। তাছাড়া বটকেষ্টর একসময় গাঁয়ে প্রচণ্ড দাপটও ছিল। বউয়ের সামনে কান ধরায় অপমানের চোটে ঘনশ্যাম শেষপর্যন্ত কী আর করে, খি-খি করে হাসতে লাগল।

আলোরানি একটু লজ্জা পেয়েছিল অবশ্য। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘনশ্যাম বলল,—খুব হয়েছে। কান ছাড়ো, বেরুব।

কান ছাড়ার সময় শেষ ঝাঁকুনি দিয়ে বটকেষ্ট বলল,—যেখানে যাবি যা। তোর আশা কখনও করিনি, করবও না। কিন্তু সাবধান, আমার কথা চেপে রাখবি। চাউর করলেই কী হবে, জানিস?

উঠে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যাম বলল,—বাড়ি থেকে বের করে দেবে তো? দিও।

না,—বটকেষ্ট শক্তমুখে বলল। —তাহলে সত্যি-সত্যি মরব।

ঘনশ্যাম একটু অবাক হয়ে বলল,—তার মানে?

মাথার ওপরকার কড়িকাঠ দেখিয়ে বটকেষ্ট বলল,—ওখান থেকে ঝুলব, বুঝতে পারছিস তো? এতহাত জিভ বের করে ঝুলে থাকব।

ঘনশ্যাম ভয় পেয়ে জিভ কেটে বলল,—ধুস! খালি, আজেবাজে কথা।...

বটকেষ্টর মরার খবর পেয়ে হরেন নিশ্চিন্ত হয়েছিল। টুকরো জমিটা নিয়ে জ্ঞাতি বটকেষ্টর সঙ্গে তিন বছর মামলা চলছিল। জমিটার তিনদিকে আগাছার জঙ্গল, একদিকে কয়েকটা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ। তার ওধারে একটা পুকুর। ভাদ্রমাসের ধান তুলতে থানাপুলিশ হয়ে গেছে। সেই ফৌজদারি মামলাও ঝুলছে আদালতে। আশ্বিনে হঠাৎ কী অসুখে ভুগে বটকেষ্ট শহরের হাসপাতালে গেল এবং মারাও পড়ল। শ্রাদ্ধে দয়া করে হরেন ঘনশ্যামকে কিছু নগদ টাকাকড়িও দিয়েছে। শর্ত হল, ঘনশ্যাম আদালতে যাবে না। তারপর হরেন জমিটাতে কলাই বুনে দিয়েছে। সারের জোরে দেখতে-দেখতে ঝাঁপালো সবুজ হয়ে উঠেছে জমিটা। গরুছাগলের বড় উপদ্রব এদিকটাতে। তাই কাঁটাঝোপের বেড়া দিয়েছে। এবেলা-ওবেলা এসে একবার করে দেখে যায় হরেন। তার কাছে খুব গর্বের জিনিস এই মাটিটুকু।

বিকেলে বাসরাস্তার ধারে গজার দোকানে হরেন চা খাচ্ছিল। সেই সময় তার মেয়ে পাত্তি হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে খবর দিল,—বাবা! শিগগির এসো। তেঁতুলতলার কলাইয়ের খেতে ঘনাকাকার বউ ঝান্ডা পুঁতেছে।

ঝান্ডা পোঁতার ব্যাপারটা পাড়াগাঁয়ে ইদানীং রীতিমতো ঘটনা! কিন্তু হরেনের বিশ্বাসই হল না। ঘনশ্যাম তার বাবার মতো নয়। কোনও ঝামেলায় থাকে না। তবে তার বউটা একটু তেজি, একথা ঠিকই। তাই বলে তার ঝান্ডা পোঁতার সাহস হবে, এটা অবিশ্বাস্য এবং সেও কিনা হরেনের দখল করা কলাইবোনা জমিতে?

হরেন বলল,—যা!

সত্যি বাবা! —পাত্তি চোখ বড় করে বলল, মা দেখেছে। আমি দেখলাম। মা বলল, শিগগির তোর বাবাকে খবর দে।

হরেন হ্যা-হ্যা করে হেসে বলল,—বাড়ি যা দিকি। কাজ নেই কম্ম নেই, খালি পাড়া-বেড়ানো। ঝান্ডা পুঁতেছে তো কী হয়েছে? বাড়ি যাওয়ার সময় উপড়ে ফেলে দিয়ে যাব।

পাত্তি মনমরা হয়ে চলে গেল। জগা বলল,—পেছনে লোক জুটিয়েছে হরেন! নইলে ঘনার বউয়ের এত সাহস হতো না।

হরেন চটে গিয়ে বলল,—তুমিও মাইরি যেন কী! লোক জোটাবে! এত সস্তা? লোক জোটাতে হলে মালকড়ি দরকার। ঘনার হাঁড়ির অবস্থা ঢনঢন। কালই দেখবে মুনিশ খাটতে নেমেছে।

জগা বলল,—তোমার বেপাট্টির লোক হলেই জুটবে। আজকাল তো এরকমই হয়েছে।

গোঁ ধরে হরেন বলল,—বেপাট্টি? এ গাঁয়ে আমার বেপাট্টি হবে কোন শালা? সবগুলোকে তো দেখলাম। পায়ের তলায় এসে মুন্ডু কাত করেছে। মরা মানুষের নিন্দে করতে নেই—বটকেষ্ট সম্পক্কে জ্যাঠাও ছিল বটে, তবে সেও গেছে সব ঠান্ডাও হয়েছে।

জগা কথা বাড়াল না। চায়ের দোকানে এ সময়টা খদ্দেরের ভিড় বেড়ে যায়।

চা শেষ করে হরেন উঠল। কিছুক্ষণ দোনামনা করে রাস্তার নয়ানজুলির দিকে ঘুরল। শর্টকাটে যাওয়ার পথে বাধা নয়ানজুলির জল। শেষ বেলায় আলোর গায়ে কুয়াশার ছাপ পড়েছে। এখান থেকে তেঁতুলতলার জমিটা দেখা যায় না। অনেকটা ঘুরে বাঁধের ওপর দিয়ে মাঠে নামল হরেন। গাঁয়ের শেষ দিকটায় ঘন গাছগাছালি। জমিটার কাছাকাছি যেতে দিনের আলো কমে এল আরও।

তেঁতুলতলা পৌঁছেই চোখ জ্বলে গেল হরেনের। সত্যিই কলাইয়ের জমির মাঝখানে পোঁতা কঞ্চিতে লটকানো এক ঝান্ডা। খুঁজতে-খুঁজতে একখানে কাঁটার বেড়া ওপড়ানোও চোখে পড়ল। হরেন হুঙ্কার দিল,—তবে রে হতচ্ছাড়ি। হুঙ্কারের লক্ষ্য ঘনশ্যামের বউ।

তারপর সে মসমস করে জমিতে ঢুকে ঝান্ডা ওপড়াল। কঞ্চিটা দুমড়ে-মুচড়ে এবং কাপড়ের ফালিটা ফালাকাটা করে ছুড়ে ফেলল জমির বাইরে। আগের মতো কাঁটার বেড়ার ওপড়ানো অংশটা কোনওরকমে আটকে সে তেঁতুলতলায় উঠে এল। রাগী চোখে তাকিয়ে রইল জমিটার দিকে।

ঠিক এই সময়ে তেঁতুলগাছের ওপর থেকে কেউ ডাকল,—হন্না নাকি রে! ও হন্না!

হরেন ভীষণ চমকে উঠেছিল। মাথার ওপরকার ঘন ডালপালার ভেতর থেকে চেনা—খুবই চেনা গলায় কেউ তাকে ডাকছে। হরেন মুখ তুলতেই আবছা আঁধারে একটা মূর্তিও দেখল, একটু ওপরে মোটা একটা ডালে বসে দুটো ঠ্যাং দোলাচ্ছে। হরেন কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল,—কে-কে?

বটকেষ্ট দুটো ঠ্যাং দোলাতে-দোলাতে বলল,—ন্যাকা, চিনেও চিনতে পারছিস না—কে-কে করছিস? সোজা ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। তারপর ঘাড়টি মটকে দেব। আর কখনও যদি এই জমির তল্লাটে দেখেছি তো—

হরেন বনবাদাড় ভেঙে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

একটু পরে বটকেষ্ট চাপাগলায় ডাকল,—বউমা! মইটা নিয়ে এসো। নামি।

আলোরানি একটু তফাতে হাল্কা একটা মই নিয়ে আড়ালে বসে ছিল। এসে শ্বশুরকে গাছ থেকে নামাল। বটকেষ্ট খি-খি করে হেসে বলল,—খুব জব্দ হয়ে গেছে হন্না। চলো, এখনই এখান থেকে কেটে পড়া ভালো।...

একটু রাত করে ঘনশ্যাম ফিরল। মুখটা গম্ভীর। বউকে দেখে বলল,—বাবা কী যে ঝামেলা করে মাইরি! সন্ধেবেলা হন্নাদা তেঁতুলগাছে নাকি বাবাকে দেখেছিল। বাড়ি ফিরে অজ্ঞান হয়ে যায়। শেষে একদঙ্গল লোক লাটিসোটা টর্চ হ্যাজাক নিয়ে তেঁতুলতলায় খুব খোঁজাখুঁজি করেছে। খবর শুনেই লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আমি তো ভয়ে সারা। একটা কিছু সন্দ করে আমাদের বাড়ি এলেই কেলেঙ্কারি হতো।

আলোরানি নির্বিকার মুখে বলল,—হতো না।

হতো না মানে? —ঘনশ্যাম ফুঁসে উঠল, এসেই বাবাকে দেখতে পেত। তারপর—

—বাবা তখনই চলে গেছেন।

ঘনশ্যাম অবাক হয়ে বলল,—সে কী!

—রায়পুরে রাত্তিরে থাকবেন। সকালে ওখান থেকে সাঁইথে চলে যাবেন।

আলোরানি মুখ টিপে হাসছিল। ঘনশ্যাম একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল,—মা যদি ছোটমামার বাড়ি গিয়ে থাকে আর বাবা সেখানে হাজির হয়, আবার এক ঝামেলা।

আলোরানি বলল,—কীসের ঝামেলা।

ধুস! বোঝো না কিছু। —ঘনশ্যাম বিরক্ত হয়ে বলল, মা তো বিধবা হয়ে আছে এখনও।

আলোরানি হাসতে লাগল,—সে তুমি ভেবো না। তোমার মা সব শাড়ি-গয়না গুছিয়ে নিয়েই গেছেন। কিচ্ছু খুঁজে পাইনি ওঁর ঘরে। আর শাঁখা-সিঁদুর? বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।...

গেছোবাবার বৃত্তান্ত

ঝিলের ধারে বসে ছোটমামা মুগ্ধচোখে চাঁদ দেখতে-দেখতে বলছিলেন,—আচ্ছা পুঁটু, সত্যি করে বল তো, ওই চাঁদে আমেরিকানরা হেঁটেছে, বিশ্বাস হয়? অসম্ভব পুঁটু, অসম্ভব। কবি লিখেছেন, এমন চাঁদের আলোয় মরি যদি সেও ভালো সে-মরণ স্বর্গসমান...

ঠিক এই সময়ই বাঁ-দিকে কোথাও আবছা খসখস-মচমচ শব্দ শুনতে পেলাম। ভাঙা শিবমন্দির ফুঁড়ে মস্ত বটগাছ। হাওয়া-বাতাস বন্ধ। সন্দেহজনক শব্দটা সেই গাছের ভেতর থেকে ভেসে এল।

গা ছমছম করতে থাকল। সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম। ছোটমামাকে ইদানীং পদ্যে পেয়েছে। চাঁদ, ফুল, পাখি প্রজাপতি নিয়ে শখানেক পদ্য লিখে ফেলেছেন। কিন্তু নিছক লিখেও যেন ওঁর তৃপ্তি নেই, জিনিসগুলো অর্থাৎ ফুল, পাখি, প্রজাপতি, নেড়ে-ঘেঁটে দেখতে বেজায় তৎপর। এদিনই সকালে একটা প্রজাপতির পেছনে যেভাবে ছুটোছুটি করছিলেন! যাই হোক, তাতেও আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমাকে নিয়ে টানাটানিতেই আমি অস্থির। নিরিবিলি শুনশান ঝিলের ধরে ভাঙা মন্দির নিয়ে কত ভুতুড়ে গল্প চালু আছে। দিনদুপুরেই সেদিকটাতে পারতপক্ষে কেউ পা বাড়ায় না। এখন তো সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। জ্যোৎস্নায় চারদিকে যেন একশো ভূত। তার ওপর হঠাৎ বটগাছটটা থেকে ওইসব শব্দ।

ভয়ে-ভয়ে বললুম,—ছোটমামা, এবার বাড়ি ফেরা যাক।

ছোটমামা চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করছিলেন। একটু রেগে গিয়ে বললেন,—দিলি তো পদ্যটা নষ্ট করে। বেশ একটা লাইন এসেছিল!

তখনই ধুপ করে শব্দ হল এবং চমকে উঠে দেখলুম, বটতলার চকরা-বকরা আলোছায়ায় কালো কী একটা পড়ল। তারপর সেটা চার পায়ে হেঁটে ফাঁকা জায়গায় গেল, সেখানে ঝলমলে জ্যোৎস্না। হনুমানই হবে তাহলে।

কিন্তু হঠাৎ প্রাণীটা দু-পায়ে সিধে হল এবং সোজা আমাদের দিকে হেঁটে এল। ছোটমামাকে আঁকড়ে ধরেছিলুম সঙ্গে-সঙ্গে। ছোটমামা পুঁটে—বলে হাঁক ছেড়েই চুপ করে গেলেন। এবার তিনিও প্রাণীটিকে দেখতে পেয়েছিলেন।

প্রাণীটি আমাদের অবাক করে বলে উঠল,—কী রে? ভয় পেয়েছিস নাকি? পাসনে। আমি সেই গেছোবাবা।

মানুষের গলায় কথা শুনে ছোটমামার সাহস ফিরে তো এলই, পদ্যের লাইনে বাধা পড়ায় ভেতর-ভেতর খাপ্পা হয়েও ছিলেন। তেড়েমেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—গেছোবাবা মানে?

গেছোবাবা খি-খি করে হেসে বলল,—সে কী রে? আমার কথা শুনিসনি? আমি গেছোবাবা, গাছে-গাছে থাকি। গাছেই আমার বসবাস। তবে তোরা আজকালকার

ছেলে, আমায় চিনবিই বা কী করে? চিনত তোদের ঠাকুরদা, তাদের ঠাকুরদা, তস্য-তস্য ঠাকুরদা! ওরে বয়েসটা তো কম হল না। সেই যেবার লর্ড ক্লাইভ পলাশির যুদ্ধ জিতে তোদের এই টাউনে ঢুকল...

ওয়েট! ওয়েট!—ছোটমামা থামিয়ে দিলেন।—পলাশির যুদ্ধ? মানে...সেভেনটিন ফিফটি সেভেন! তার মানে তুমি বলতে চাও, তোমার বয়স...পুঁটে, হিসাব কর তো।

গেছোবাবা বলল,—খামোকা ছেলেটাকে আঁক কষিয়ে হবেটা কী? তোরা এই যে আমার দর্শন পেলি, সেই তোদের বাপের ভাগ্যি। গড় কর এক্ষুনি! গড় কর!

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গড় করতে যাচ্ছি, ছোটমামা আমার চুল খামচে ধরে আটকালেন। বললেন,—ওয়েট, ওয়েট। যাচাই করে নিই। ওহে গেছোবাবা, তুমি এতকাল বেঁচে আছো বলতে চাও? ফ্রম এইটিনথ সেঞ্চুরি। অমৃত খেয়েছিলে নাকি?

ছোটমামার বাঁকা হাসি শুনে গেছোবাবা বলল,—খেলেও খেয়েছি, না খেলেও না খেয়েছি।

ছোটমামা চার্জ করলেন,—হেঁয়ালি ছাড়। কে তুমি? নাম কী?

নাম একটা ছিল বটে! ভুলে গেছি। —গেছোবাবা মাথা চুলকে বলল, গাছে বসত করতে গিয়ে গেছোবাবা নাম পেয়েছিলুম। তখনকার লোকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত। যে গাছে থাকতুম, তার তলায় খাবার রেখে যেত। আজকাল কী যে হয়েছে। লোকে আমাকে ভুলেই গেছে রে! বড় দুঃখ হয়।

লতাপাতা খাই। কখনও ফলমাকড়টা খাই। —এই বলে গেছোবাবা পাশের একটা ঝোপ থেকে লতা-পাতা ছিঁড়ে চিবোতে শুরু করল। চিবোতে-চিবোতে বলল, —এগুলো একটু তিতকুটে। তবে মোটের ওপর মন্দ না। তোরাও খা না! খেয়ে দ্যাখ!

ছোটমামা কয়েক পা এগিয়ে গেলেন! বুঝলুম, গেছোবাবা সত্যিসত্যি পাতা খাচ্ছে কি না দেখতে গেলেন। আমি অবাক হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম। ছোটমামা বললেন,—কী অদ্ভুত! তুমি যে দেখছি সত্যিই পাতা খাচ্ছ। ওহে গেছোবাবা, এগুলো খেয়ে তোমার বদহজম হয় না?

হলে হয়, না হলেও না হয়—গেছোবাবা ঢেকুর তুলে বলল। তা অত কথায় কাজ কী তোদের? বড় ভাগ্যে দর্শন পেলি। এবার গড় করে চলে যা। নইলে অমঙ্গল হবে।

ছোটমামা ফের চার্জ করলেন,—কী অমঙ্গল হবে, শুনি?

গেছোবাবা বলল,—পুলিশ ধরবে। জানিস তো? বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আর পুলিশে ছুঁলে আঠারো দুগুণে ছত্রিশ। নে, গড় কর। গড় কর!

গেছোবাবা নিজের পা দেখতে থাকল লম্বা হাতে। চেহারাও লম্বা। জ্যোৎস্নায় ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সন্ন্যেসীদের মতো ঝাকড়-মাকড় চুলদাড়ি, খালি গা, পরনে কৌপিন। ছোটমামা একটু দোনোমনো করে বললেন,—খামোকা পুলিশে আমাদের ধরবে কেন? আমরা চোর না ডাকাত?

গেছোবাবা হিঁ-হিঁ শব্দ করে ভুতুড়ে হাসল। —পাঁচুকে জিগ্যেস করিস সেসব কথা। পাঁচুকে দর্শন দিয়েছিলুম। ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে গড় করেনি। তারপর আর কী! ছমাস ঘানি টানতে হয়েছিল জেলে। এক মাস পাথর ভেঙে-ভেঙে হাত দুখানায় কড়া পড়ে সে এক অবস্থা! গড় কর, গড় কর!

কথাগুলো শুনতে-শুনতে কী এক ভয়ে ঝটপট গড় করে ফেললুম। ছোটমামা একটু তফাতে, বাধা দেওয়ার সুযোগ পেলেন না। গেছোবাবা আশীর্বাদ করলেন হাত তুলে,—জিতা রহো বেটা! আর ছোটমামার কী হল, জেদ ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গেছোবাবা যেন রাগ করেই আগের মতো চার পা হল এবং ঠিক হনুমানের মতো দৌড়তে-দৌড়তে বটগাছের দিকে নিপাত্তা হয়ে গেল।

এবার ছোটমামা আরও অবাক হয়ে বললেন,—কী অদ্ভুত! মানুষ না হনুমান? তারপর আমার দিকে তেড়ে এলেন, তুই ওই হনুমানটাকে গড় করলি। রামায়ণের হনুমানজি হলে কথা ছিল। তুই কী রে পুঁটু?

এই সময় পেছনে দিক থেকে টর্চের আলো এসে পড়ল আমাদের ওপর। তারপর মাটি কাঁপিয়ে ধুপধাপ শব্দ করে কেউ এগিয়ে আসতে-আসতে গম্ভীর গলায় বলে উঠল, কারা ওখানে? কী হচ্ছে রাতবিরেতে, অ্যাঁ?

ছোটমামা সঙ্গে-সঙ্গে কেঁচো হয়ে গেলেন, বললেন,—বড়বাবু নাকি? নমস্কার, নমস্কার!

থানার দারোগা বঙ্কুবাবুর এমন অতর্কিত আবির্ভাবে আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠছিল। গেছোবাবার কথাটা তাহলে হাতেনাতে ফলতে চলেছে। লোকে বলাবলি করে, এমন ডাকসাইটে দুঁদে পুলিশ অফিসার নাকি কেউ কখনও দ্যাখেনি। চোর-ডাকাত তল্লাট ছেড়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। আমাদের ছোট্ট শহরে আজকাল প্রচুর শান্তি।

বঙ্কুবাবু প্রকাণ্ড মানুষ। টর্চ নিভিয়ে বললেন,—হুম! আপনারা এখানে কী করছেন?

ছোটমামা কাঁচুমাচু হেসে বললেন,—চাঁদ দেখছিলুম সার! দেখুন না কেমন সুন্দর চাঁদ—ফুল-মুন। এমন নিরিবিলি জায়গায় চাঁদ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। তাই...

বঙ্কুবাবু থামিয়ে দিয়ে বললেন,—চাঁদ! চাঁদের কী দেখার আছে? অ্যাঁ? নিরেট পাথর। বাতাস নেই। প্রাণ নেই। যেন শ্মশান! চালাকি ছাড়ুন!

ছোটমামা বলে উঠলেন,—আমি যে কবি, সার! পোয়েট!

পদ্য লেখেন? —বঙ্কু দারোগা অট্টহাসি হাসলেন, যেন ভূমিকম্প হতে থাকল। পদ্য লিখেই বাঙালি জাতটা উচ্ছন্নে গেছে। কখনও পদ্য লিখবেন না। আর একটু-আধটু যদি-বা লেখেন, চাঁদ-টাঁদ নয়। চাঁদে আছেটা কী মশাই? বলে আমার ওপর টর্চের আলো ফেললেন। —এটি কে?

—আমার ভাগ্নে সার! পুঁটু।

—একেও লাইন ধরিয়েছেন দেখছি! অ্যাই খোকা, কোন ক্লাসে পড়ো?

ঢোক গিলে বললুম,—ক্লাস এইট।

পড়াশোনা নেই? —বঙ্কুবাবু ধমক দিলেন। —কতগুলো পদ্য লিখেছ অঙ্কের খাতায়? আমার ভাগ্নে পুঁচকে অঙ্কের খাতায় পদ্য লিখেছিল। তাকে কী করেছিলুম জানো?

ভয় পেয়ে বললুম,—আমি পদ্য লিখিনে। ছোটমামা বললেন, বেড়াতে যাচ্ছি, তাই সঙ্গে এলুম। এসেই গেছোবাবাকে দেখে—

ছোটমামার চিমটি খেয়ে থেমে গিয়েছিলুম। বঙ্কুবাবু বললেন,—কী বললে, কী বললে? গেছোবাবা না কী যেন?

আমি বলছি স্যার। —ছোটমামা বললেন, একটা অদ্ভুত লোক সার। একটু আগে একটা লোক—জাস্ট একটা হনুমান সার!

—গাছেই নাকি থাকে। সেভেনটিন ফিফটি সেভেন—

এরপর কীভাবে এবং কী ঘটল গুছিয়ে বলতে পারব না। বঙ্কুবাবু হুইসল বাজিয়ে দিলেন। আর ধুপধাপ শব্দে একদঙ্গল কনস্টেবল এসে পড়ল কোত্থেকে। বঙ্কুবাবু ছোটমামাকে দেখিয়ে বললেন,—পাকড়ো ইসকো!

—খোকাবাবুকে নেহি। ঔর মরাধারি! তুম খোকাবুকো ঘর পঁহুচা দো!—

বাবা আমার মুখে তাঁর শ্যালকের খবর পেয়েই থানায় দৌড়েছিলেন। আমাকে ঘিরে ভিড় ঘরের ভেতর। মা, পিসিমা, দিদি, ঠাকুমা এবং শেষে ঠাকুরদা ও পিসেমশাইও চারদিক থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমাকে জেরবার করছিলেন। ছোটমামাকে কেন পুলিশে ধরল? চাঁদ দেখা কি বেআইনি? গেছোবাবার দর্শনও কি বেআইনি?

গেছোবাবার কথা বলতেই ঠাকুমা চমকে উঠে সবাইকে থামিয়ে দিলেন। কপালে ঠেকান জোড়হাত, চোখ বন্ধ, ঠোঁট কাঁপছিল। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে ঠাকুরদার দিকে তাকালেন। ঠাকুরদা আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঠাকুমা আমাকে কাছে যেতে বললেন,—আমি জানতুম! ঠিক জানতুম, বাবা ঝিলের ধারে শিবতলা তল্লাটেই আছেন। কেউ আমাকে পাত্তা দিত না।

পিসেমশাই বললেন,—এ গেছোবাবা ব্যাপারটা ঠিক মাথায় আসছে না। এটার সায়েন্টিফিক এক্সপ্লানেশন—

পিসিমা চোখ কটমট করে বললেন,—তুমি তো নাস্তিক। তোমার মাথায় অনেক কিছুই-আসে না। সায়েন্টিফিক এক্সপ্লানেশন—সবখানেই সায়েন্স খাটে না। ও মা, বলো না!

উনি ঠাকুমার দিকে তাকালে ঠাকুমা ফোকলা দাঁতে একটু করুণ হাসলেন। —তখন তোদের জন্মই হয়নি। ঝিলের ওদিকটায় সে কী জঙ্গল! দিনদুপুরে বাঘ বেরোত। সেই সময়কার কথা তো, প্রথমে দর্শন পেয়েছিল রামু-ধোপার বাবা রঘু।

ঝিলে কাপড় কাচতে যেত সে। দিনমানে ঘাসের ওপর কাপড়গুলো শুকোতে দিত। শিবতলার ছায়ায় গিয়ে বসে থাকত। তারপর...

দিদি বিরক্ত হয়ে বলল,—আগে আসল কথাটা বলো!

রঘুই প্রথম দর্শন পায়। —ঠাকুমা ভক্তিতে গদগদ হয়ে বললেন, ধুপ করে গাছ থেকে পড়লেন। রঘুকে বললেন, কী চাস বল? রঘুটা ছিল বড্ড বোকা। বলল কী, টাউনের সব কাপড় যেন কাচতে পাই!

ঘর জুড়ে হাসি ফুটল। পিসিমা বললেন,—তাই বলল রঘু? কী বুদ্ধি!

ঠাকুমা বললেন,—তবে বাবার মাহাত্ম্য রে! রঘু যে-কাপড়ই কাচত, তাই একেবারে ঝকমকে হয়ে উঠত। শেষে সোডা না সাবান না, শুধু জলে চুবোলেই ময়লা কাপড় সাফ। এদিকে গেছোবাবার খবর রটে গেছে। টাউনসুদ্ধু লোক ঝিলের জঙ্গলে যায়। শিবতলায় যায়। কেউ দর্শন পায়। কেউ পায় না। বাবা থাকেন গাছে। গাছেই স্তবটব করেন। —বলে ঠাকুরদার দিকে ঘুরলেন, বলো না, কীভাবে দর্শন পেয়ে ছিল?

ঠাকুরদা গম্ভীরমুখে বললে,—আমার ছিল শিকারের নেশা। সেবার ঝিলের জঙ্গলে একটা বাঘ বড় বেশি উপদ্রব করছিল। বন্দুক নিয়ে বাঘটা মারতে গেছি, হঠাৎ একটা গাছ থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকল। চমকে উঠে দেখি, গাছের ডালে এক সাধুবাবা। বললেন,—খবরদার বাঘ মারবিনে। বাঘটা আমার এক চেলা। তারপর কথাটা বলেই এক গাছ থেকে আর-এক গাছে, ঠিক যেন—

দিদি বলে উঠল,—টারজানের মতো! টারজানের মতো!

ঠাকুরদা তাঁর গল্পে বাধা পড়ায় খাপ্পা হয়ে ধমক দিতে যাচ্ছেন, এমনসময় বাবা তাঁর ছোটশ্যালককে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাবার মুখে হাসি। ছোটমামার তুম্বোমুখ।

বাবা বললেন,—বঙ্কুবাবুর কাণ্ড! আর ইনিও এমন বুদ্ধু যে নিজের পরিচয়ও দেননি! —ছোটমামার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকালেন বাবা, বলবি তো আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক?

—বঙ্কুদারোগা আমার চেনা লোক।

পিসেমশাই বললেন,—কিন্তু ওকে হঠাৎ অ্যারেস্ট করল কেন?

বাবা হাসতে হাসতে বললেন,—পাঁচু-চোরের ব্যাপার আর কী?

ঘরসুদ্ধু সব্বাই অবাক হয়ে একগলায় প্রশ্ন করলেন,—তার মানে? তার মানে?

কী আশ্চর্য! বাবা একটু রেগে গেলেন, কমাস আগে পাঁচু আমাদের রান্নাঘরে চুরি করতে ঢুকেছিল। হাতেনাতে ধরা পড়েছিল। ভুলে গেলে? —ঘরসুদ্ধু হাসলেন সব্বাই। সেই পাঁচু! ভাত-চোর পাঁচু!

সেই পাঁচু। —বাবা বললেন, বঙ্কুবাবুর হাতে খবর আছে, ফেরারি আসামী পাঁচু নাকি ঝিলের ওদিকে গাছে লুকিয়ে আছে। গাছে ডেরা বেঁধেছে। দৈবাৎ কেউ দেখে ফেললে বলে, আমি সেই গেছোবাবা।

মা ফোঁস করে উঠলেন,—তা নান্টুর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

বাবা ছোটমামার দিকে তাকিয়ে এবার মুচকি হাসলেন,—বঙ্কুবাবু ভেবেছিলেন, নান্টু পাঁচুর কাছে হয়তো চোরাইমাল কিনে ঝিলের ধারে ঘাপটি পেতে ছিল।

ছোটমামা রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খুব হাসাহাসি চলতে থাকল। একফাঁকে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। তারপর বাগানের দিকে ঘরটাতে গিয়ে দেখি, ছোটমামা তুম্বোমুখে বসে আছেন। এই ঘরটাতে ছোটমামা আর আমি থাকি। বললুম,—ছোটমামা। পুলিশ আপনাকে মারেনি তো?

ছোটমামা ভেংচি-কাটার ভঙ্গিতে বললেন,—অত সোজা? আমার গায়ে হাত তুললে কী হতো জানিস?

—কী হতো ছোটমামা?

ছোটমামা ভরাট গলায় বললেন,—আমি কবি। কবির গায়ে পুলিশ হাত তুললে কী হতো, তুই-ই ভাব। বাহাত্তর লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার কবি হইহই মিছিল করে এসে...হুঁ এত সোজা?

কথাটা মনে ধরল। বললুম—আচ্ছা, ছোটমামা, গেছোবাবা কি সত্যিই পাঁচু-চোর?

হ্যাঁ,—ছোটমামা বাঁকা হাসলেন। তুই তো হাদারাম। তাই একটা চোরের পায়ে গড় করলি। আমি ঠিকই টের পেয়েছিলুম বলে গড় করিনি।

কথাটা বিশ্বাস হয়নি। তা ছাড়া গেছোবাবা বলেছিল, তাকে গড় না করলে পুলিশ ধরে। ছোটমামাকে তার একটু পরেই পুলিশে ধরল। কিন্তু ছোটমামার এখন যা মুড, সে কথা বলা যাবে না। এও বলা যাবে না যে, গেছোবাবা যদি সত্যিই পাঁচু-চোর হয়, তাহলে গাছের পাতা কচমচিয়ে খায় কী করে? তার চেয়ে বড় কথা, গেছোবাবা নিজেই বলছিল, পাঁচু তাকে গড় করেনি বলে তাকে জেলে ঘানি টানতে আর পাথর ভাঙতে হয়েছিল। তাছাড়া একজন ছিঁচকে চোর পলাশির যুদ্ধ আর লর্ড ক্লাইভের কথা জানবে কী করে? চোরেরা কি ইতিহাস-বই পড়তে পারে? বড় চোর হলেও কথা ছিল, পাঁচু তো নেহাত ছিঁচকে চোর। উঁহু, তাও না—স্রেফ ভাত-চোর।...

ছোটমামার এ রাতে মন খারাপ। দিদি কতবার খেতে ডাকতে এল। বললেন, খিদে নেই। শেষে মা এলেন। সাধাসাধি করার পর ছোটমামা বললেন,—পরে খাব খন! মা রাগ করে বললেন,—রাত দশটা বাজে। আর কতক্ষণ হেঁসেল পাহারা দেব?

তখন ছোটমামা বললেন,—ঠিক আছে। টেবিলে রেখে যাও। সময়মতো খাব।

বাড়ির কাজের লোক ভুতো ছোটমামার রাতের খাবার নিয়ে এল। টেবিলে ঢাকা দিয়ে সে চলে যাচ্ছে, ছোটমামা ডাকলেন,—ভুতো শোনো।

ভুতো বিনীতভাবে বলল,—মন খারাপ করতে নেই দাদাবাবু। নতুন দারোগাবাবু লোকটা ওইরকমই। যাকে-তাকে চোর বলে ধরে হাজতে ঢোকাচ্ছেন। পাঁচু কি কম দুঃখে—বলেই সে থেমে গেল। ছোটমামা গলা চেপে বললেন,—পাঁচুকে তুমি চেনো?

খুব চিনি—ভুতো ফিক করে হাসল। এ টাউনে ওকে কে না চেনে?

—পাঁচু গাছে চড়তে পারে?

—হুঁ।

—হনুমানের মতো চার পায়ে দৌড়তে পারে?

—হুঁ।

ছোটমামা ভেংচি কাটলেন,—হুঁ! খালি হুঁ! তুমি দেখেছ কখনও?

ভুতো গেছোবাবার ভঙ্গিতে বলল,—আজ্ঞে, দেখলেও দেখেছি, না দেখলেও না দেখেছি।

এইতেই ভীষণ চটে গিয়ে ছোটমামা বললেন,—তুমিও দেখছি গেছোবাবার এক চেলা!

ভুতো তক্ষুনি কপালে দুহাত জোড় করে ঠেকিয়ে বলল,—রাতবিরেতে ও নাম মনে আনবেন না দাদাবাবু! আবার ঝামেলায় পড়বেন।

খুব হয়েছে যাও! —ছোটমামা গম্ভীরমুখে বসে পা দোলাতে থাকলেন।

আমার ঘুম পাচ্ছিল। শুয়ে পড়ব ভাবছি, হঠাৎ ছোটমামা আস্তে ডাকলেন, পুঁটে! দেখি, ছোটমামা মিটিমিটি হাসছেন।

ফিসফিস করে বললেন,—চল, বেড়িয়ে পড়া যাক। গেছোবাবা-ধরা ফাঁদ পাতব, বুঝলি? সেজন্যই চালাকি করে আমার খাবারটা এ-ঘরে আনিয়ে রাখলুম। ওঠ, দেরি করা ঠিক নয়।

এমন একটা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের লোভ সামলানো কঠিন। চুপিচুপি দুজনে বাগানের দিকের খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লুম। ছোটমামার হাতে তাঁর খাবার থালা। ঝিলের কাছাকাছি গিয়ে বললে,—ফাঁদটা বুঝতে পারছিস তো? না পারিস তো কথা নেই। চুপচাপ দেখবি, কী করি!

জ্যোৎস্নাটা এখন আরও ঝলমলে। ঝিলের ধার শিবতলার পর নবাবি আমলের ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ আর ঘন জঙ্গল। গা-ছমছম করছিল। এখানে খানিকটা খোলা ঘাসজমিতে পৌঁছে ছোটমামা দাঁড়ালেন। একটু কাশলেন। তারপর ডাকলেন,—গেছোবাবা, আছো নাকি? ও গেছোবাবা!

কিন্তু কোনও সাড়া এল না। ছোটমামা একটু গলা চড়িয়ে বললেন,—গেছোবাবা! তখন গড় করিনি তোমায়। তাই সত্যিই পুলিশে ধরেছিল। এবার দর্শন দাও, গড় করি। ও গেছোবাবা তোমার জন্য খাবারদাবার এনেছি! কাম ডাউন গেছোবাবা, কাম ডাউন!

এতক্ষণে গাছপালার ভেতর গাঢ় ছায়ায় ধুপ করে শব্দ হল। তারপর সত্যিই গেছোবাবা চায়পেয়ে প্রাণীর মতো বেরোল। খোলা জায়গায় দু-পেয়ে হয়ে প্রথমে অদ্ভুত হিঁহিঁ হাসি হাসল। তারপর বলল,—খাবার এনেছিস? দে, দে খাই। পরে গড় করিস। ওঃ কতকাল পরে মানুষের খাবার খাচ্ছি রে!

বলেই ছোটমামার হাত থেকে থালাটা কেড়ে নিয়ে খুব শব্দ করে খেতে লাগল। ছোটমামা বললেন,—এবার গড় করি?

—তা করলেও করতে পারিস, না করলেও না পারিস।

ছোটমামা গড় করে বললেন—আচ্ছা গেছোবাবা, তুমিই কি পাঁচু?

—তা বললেও বলতে পারিস, না বললেও পারিস!

—তুমি গাছে বসত করলে কেন পাঁচু—সরি গেছোবাবা?

বঙ্কুদারোগার ভয়ে। —গেছোবাবা ফোঁস করে নাকঝাড়ল খেতে-খেতে, পেটের বড় জ্বালা রে, বুঝলি তো?

—বুঝলাম। কিন্তু চুরিচামারি না করে কারও বাড়ি কাজকর্ম করলেই তো—

গেছোবাবা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল,—কাজ দিলে তো করব? একবার পেটের দায়ে একটা বদনাম রটে গেলেই কেলেঙ্কারি না? তার ওপর জেল খাটলে তো কথাই নেই।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। গেছোবাবা থালা চেটেপুটে শেষ করে চার পা হল। ঝিলের ধারে চলে গেল। ছোটমামা আর আমিও তার পিছু-পিছু দৌড়ে গেলুম। জল খেয়ে থালা রগড়ে ধুয়ে ঢেকুর তুলে গেছোবাবা বলল,—বেঁচেবর্তে থাক বাবারা! এই নে তোর থালা, বাড়ি চলে যা। নইলে নতুন দারোগাবাবুর পাল্লায় পড়ে ঝামেলা হবে।

ছোটমামা বললেন,—যাচ্ছি। কিন্তু তুমি তো মানুষ পাঁচু, সরি গেছোবাবা! তুমি এমন হনুমানের মতো দৌড়তে আর গাছে-গাছে বেড়াতে পারো কী করে?

—অভ্যেস রে, অভ্যেস। সার্কাস দেখিসনি? তাছাড়া কথায় বলে, ঠেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে চড়ে না। আমি তো মানুষ।

—বুঝলুম। কিন্তু গাছের পাতা খাও কেন?

সেও অভ্যেস। টাউনে ঢুকতে না পেলে কী করব? গাছে-গাছে ঘুরি, গাছের পাতা খাই। —বলে গেছোবাবা হাই তুলে উঠে দাঁড়াল। —বাবারা তোদের মনে বড় দয়া বাবারা। তোদের ভালো হবে। আমি যাই, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আহা! কতকাল মানুষের খাবার খাইনি রে! খাওয়ামাত্র ঢুলুনি চেপেছে।

বলে ফের একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে গেছোবাবা চার পা হল। জ্যোৎস্না পেরিয়ে গাঢ় ছায়ায় সে অদৃশ্য হয়ে গেছে ছোটমামা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—কী বুঝলি?

বললুম,—কিছু না।

তুই একটা হাঁদারাম! আয় বাড়ি ফিরি। —বলে ছোটমামা হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে কেন যেন ধরা গলায় ফের বললেন,—বড় হ। তখন সব বুঝবি। তবে বুঝলি পুঁটু, বঙ্কুবাবু তখন হয়তো ঠিকই বলছিলেন। চাঁদ-টাদ বোগাস! কী আছে চাঁদে? নিরেট পাথর। প্রাণ নেই। বাতাস নেই। শ্মশান।

ঘাড় ঘুড়িয়ে চাঁদটার দিকে একবার তাকালুম। অবিকল গেছোবাবার ভঙ্গিতে বলতে ইচ্ছে করছিল, তা হলেও হতে পারে, না হলেও না হতে পারে...

শনি-সন্ধ্যার পঞ্চভূত

আমরা উত্তর কলকাতার কজন বন্ধু মিলে একটা ক্লাব করেছিলুম। উদ্দেশ্য ছিল প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলায় চুটিয়ে আড্ডা দেব। তাস, দাবা আর ক্যারাম খেলব। সেই সঙ্গে ফিস্টিরও আয়োজন থাকবে।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল ক্লাবের নাম হবে স্যাটারডে ইভনিং ক্লাব। কিন্তু তারাপদর মধ্যে বাঙালি-বাঙালি ভাব বড্ড বেশি। তার মতে, স্বাধীন দেশে ইংরেজিপ্রীতি দাস মনোভাবের প্রতীক। সেই কবে ইংরেজ এ দেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। এখনও ইংরেজি আঁকড়ে থাকার মানে হয় না। ক্লাবের নাম হোক শনি-সন্ধ্যা ক্লাব।

শেষপর্যন্ত তাই-ই হল। এ-ও ঠিক করা হল, আমরা ছজন বন্ধু বাদে আর কাউকেই শনি-সন্ধ্যা ক্লাবের মেম্বার করব না। তারাপদ, দীপক, গোপাল, সেলিম, ব্রতীন এবং আমি এই ছজন মেম্বার। কিন্তু শুধু ক্লাব করলেই হল না, একটা ঘর চাই। দীপক সে-সমস্যার সমাধান করে দিল। গঙ্গার ধারে তার দাদামশাইয়ের একটা পুরোনো বাগানবাড়ি খালি পড়ে আছে। সেই বাড়ির হলঘরটাই আমাদের ক্লাবের ডেরা হবে।

গঙ্গার ধারে চারদিকে পাঁচিল-ঘেরা প্রায় দু-একর জায়গা। মধ্যিখানে একতলা বাড়ি। কেয়ারটেকার রঘুনাথ একটা ঘরে থাকে। পুরোনো আমলের ফলবাগান জঙ্গল হয়ে গেছে। কিছু উঁচু গাছও পরিবেশকে জঙ্গুলে করে ফেলেছে। এক রবিবার সামনের লনটা পরিষ্কার করা হল। পরের শনিবার ফিস্টি হল ধুমধাম করে। রঘুনাথ খুব খুশি। বাড়িটা এতদিন হানাবাড়ি হয়েছিল। রাতবিরেতে ভূতের অত্যাচারে নাকি তিষ্ঠোতে পারছিল না। এবার ভূতেরা ভয় পেয়ে জব্দ হয়ে যাবে। মানুষ ভূতকে যেমন ভয় পায়, ভূতও নাকি মানুষকে দেখে ভয় পায়।

রঘুনাথের কথা শুনে আমরা হাসাহাসি করেছিলাম। এমন নিরিবিলি জায়গায় একা থাকলে মাথায় খুব কল্পনাশক্তি গজায়। বিশেষ করে রাতবিরেতে ছুঁচো-ইঁদুর-আরশোলার চলাফেরা এবং গাছপালা-ঝোপঝাড়ে বাতাসের শব্দ ভুতুড়ে মনে হতেই পারে। তবে রঘুনাথকে সাহসী বলতেই হবে। তার তাগড়াই গড়ন। গায়ে জোরও আছে মনে হয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার আড্ডায় সে কিছুক্ষণ অন্তর চা জোগান দেয়। বাইরে থেকে পান-সিগারেট, আবার কখনও তেলেভাজা, মুড়ি, জিলিপি, কচুরি, সিঙাড়া যখন যা ফরমায়েশ করা হয়, সে এনে দেয়। দীপক আর সেলিম দাবা খেলতে বসে। বাকি চারজন ক্যারাম খেলি বা তাস পিটি। হইহল্লা করি। তারপর রাত দশটার যে-যার বাড়ি ফিরি।

আমরা ক্লাবের মেম্বাররা একটা শর্ত করে নিয়েছিলুম। ঝড়-বৃষ্টি হোক, রাস্তায় জল জমুক, কিংবা এলাকায় হাঙ্গামা হোক কিংবা কারফিউ জারি হোক, প্রত্যেককে শনিবার সন্ধ্যা ছটা নাগাদ ক্লাবে পৌঁছতেই হবে। না এলে একশো টাকা ফাইন। ফাইন দেওয়ার ভয়ে প্রত্যেকে শনি-সন্ধ্যায় আড্ডায় ঠিকই এসে জুটত।

ক্লাব শুরু হয়েছিল এপ্রিলে। তারপর দেখতে-দেখতে জুন মাস এসে গেল। বর্ষা শুরু হল। এক পশলা বৃষ্টিতেই রাস্তায় এক হাঁটু জল জমে যায়। একদিন বিকেলে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি বিপদ বাধাল। রাস্তায় জল ঠেলে আমার যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু ঝোড়ো-হাওয়ায় ছাতি সামলানো কঠিন। একটা রিকশাও পাওয়া গেল না। কিন্তু একশো টাকা জরিমানার ভয়ে মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বুদ্ধি করে কিটব্যাগে একপ্রস্থ প্যান্ট-শার্ট-তোয়ালে নিলুম। তারপর বাগানবাড়িতে যখন পৌঁছলুম, তখন ভিজে একসা হয়ে গেছি। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম বিকেল চারটেয়। পৌঁছতে দুঘণ্টা লেগে গেছে। রঘুনাথ একটা লণ্ঠন জ্বেলে দাঁড়িয়েছিল। বলল,—বিকেল থেকে লোডশেডিং দাদাবাবু! মনে হচ্ছে কেবিল ফল্ট। বেশি বৃষ্টি হলেই এইরকম হয়। বরাবর দেখে আসছি।

বললুম,—আর কেউ আসেনি?

রঘুনাথ বলল,—না। তবে এসে যাবেন একে-একে। আপনি বসুন। খুব ভিজে গেছেন দেখছি। এক কাজ করুন। আমি একটা শুকনো কাপড় এনে দিচ্ছি—

বললুম,—দরকার হবে না রঘুনাথ। শুকনো কাপড় সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছি। তুমি বরং এক কাপ চা খাওয়াতে পারো নাকি দেখো।

রঘুনাথ হলঘরে একটা টেবিলে লণ্ঠন রেখে চলে গেল। লণ্ঠনটা এ বাড়ির মতো পুরনো। কাচে কালি পড়েছে। আলোটা তেমন খেলছে না। মাঝে-মাঝে দপদপ করছে। নিভে গেলেই কেলেঙ্কারি। বাইরে ঝোড়ো-হাওয়া আর বৃষ্টি সমানে চলেছে। তোয়ালেতে গা মুছে শুকনো প্যান্ট-শার্ট পরে ভিজে কাপড়গুলো নিঙড়ে একট জানালার রডে কোনওরকমে ঝুলিলে রাখলুম। তারপর চেয়ারে বসে পা দুটো টেবিলে তুলে দিলুম। জুতো ভিজে ঠান্ডা হয়ে গেছে।

হ্যারিকেনের কাচে কালি বেড়ে যাচ্ছে দেখে দম কমিয়ে দিলুম। সেই সময় কেউ ঘরে ঢুকল। আবছা আলোয় দেখলুম, তারাপদ। বললুম,—কী রে? আসতে পারলি তাহলে?

তারাপদ বলল,—আসতেই হবে।

—ভিজে গেছিস তো? বুদ্ধি করে আমার মতো—

তারাপদ আমার কথার ওপর বলল,—আমি ভিজিনি।

অবাক হয়ে বললুম,—ভিজিসনি মানে? এখনও তো সমানে বৃষ্টি হচ্ছে।

তারাপদ সে-কথার জবাব না দিয়ে বলল,—এক কাপ চা চাই। রঘুনাথ কোথায়?

—রঘুনাথ আমার জন্য চা করতে গেছে। ওকে বল গিয়ে।

তারাপদ কিচেনের দিকে চলে গেল। তারপরই হ্যারিকেনটা দপদপ করতে-করতে নিভে গেল।

আমি সিগারেট খাই না।

তাই দেশলাই নেই। ডাকলুম,—রঘুনাথ! একটা দেশলাই। আলো নিভে গেছে।

রঘুনাথের কোনও সাড়া নেই। তারাপদও ফিরে আসছে না। ঘরের ভেতর গাঢ় অন্ধকার। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। সেই আলোয় মুহূর্তের জন্য দেখলুম, দরজা দিয়ে কেউ ঢুকল। বললুম,—কে?

—আমি গোপাল।

—হ্যারিকেনটা নিভে গেছে। দেশলাই জ্বাল।

গোপাল বলল,—দেশলাইটা ভিজে গেছে। জ্বলবে না। রঘুনাথ কই?

—কিচেনে চা করতে গেছে।

—আর কেউ আসেনি?

—তারাপদ এসেছে। কিচেনে গেল চায়ের কথা বলতে।

—আমারও চা খেতে ইচ্ছে করছে। রঘুনাথকে বলে আসি।

অন্ধকারে গোপালের ভিজে জুতোর মচমচ শব্দ শোনা গেল। সেই সময় বিদ্যুতের আলোয় দেখলুম আরেক মেম্বার ঢুকছে। বললুম,—কে?

সেলিমের সাড়া পেলুম,—পুঁটু নাকি? আর কেউ আসেনি?

—তারাপদ এসেছে। কিচেনে গেল চায়ের কথা বলতে।

—আমারও চা খাওয়া দরকার। বলে আসি।

অন্ধকারে ভিজে চটি-জুতোর শব্দ শুনে বুঝলুম, সেলিমও কিচেনে চলে গেল। রঘুনাথ এখনও কেন আসছে না বোঝা যায়। কেটলির জলে আরও দু-কাপ জল ঢালতে হবে তাকে। কাজেই সময় লাগবে জল গরম হতে। একসঙ্গে ছ-কাপ জল ঢাললেই তো হয়। বারবার একজন করে আসবে আর চায়ের জল গরম হবে আরও সময় লাগবে। কথাটা কিচেনে গিয়ে বলার জন্য উঠব ভাবছি, দরজায় আর এক মেম্বারকে দেখা গেল। গলা শুনে বুঝলুম, ব্রতীন। সে ডাকল,—রঘুনাথ! রঘুনাথ?

বললুম,—ব্রতীন কী করে এলি রে? ভিজিসনি?

ব্রতীন বলল,—পুঁটু নাকি? অন্ধকারে বসে আছিস দেখছি।

—লোডশেডিং। হ্যারিকেনটা নিভে গেল। দেশলাই দে।

—আর দেশলাই! ভিজে ঢোল হয়ে গেছে। হ্যাঁরে পুঁটু, আর কেউ আসেনি?

—তারাপদ, গোপাল আর সেলিম এসেছে। কিচেনে রঘুনাথকে চায়ের কথা বলতে গেছে।

ব্রতীন অন্ধকারে খ্যা-খ্যা করে হেসে বলল,—তাহলে আমিও যাই। চা খেতে ইচ্ছে করছে।

জুতোর শব্দে বুঝলুম সে-ও চলে গেল। নাঃ, এরকম করলে আর চা খাওয়াই হবে না। উঠে দাঁড়ালুম কিচেনে যাওয়ার জন্য। সেই সময় কাছাকাছি দীপকের সাড়া পেলাম,—কোথায় যাচ্ছিস পুঁটু?

চমকে উঠে বললুম,—দীপক, তুই কখন এলি? তোকে তো ঢুকতে দেখলুম না!

দীপক আমার উল্টোদিকের চেয়ার থেকে খি-খি করে হেসে বলল,—দেখবি কী করে? অন্ধকার যে!

তারপরই ব্রতীনের সাড়া পেলুম,—আমাকেও দেখতে পায়নি পুঁটু!

ওরা দুজনে হাসতে লাগল। বললুম,—হাসি পরে হবে। হ্যারিকেনটা জ্বালানো দরকার যে!

দীপক বলল,—অন্ধকার ভালো লাগছে। তাই না ব্রতীন?

ব্রতীন সায় দিয়ে বলল,—হ্যাঁ। আর অন্ধকারেই আড্ডাটা জমবে ভালো। কিন্তু চা-টা না হলে আড্ডা তো জমবে না। দেখি, রঘুনাথ চায়ের ব্যবস্থা করছে নাকি।

দীপক বলল,—চল্। আমিও যাই। পুঁটু, যাবি নাকি?

রাগ করে বললুম,—নাহ্। কখন রঘুনাথকে চায়ের কথা বলেছি। তার পাত্তা নেই। এদিকে তারাপদ, সেলিম আর গোপাল গেল তো গেলই। চায়ের নিকুচি করেছে।

ব্রতীন বলল,—আয় দীপক! পুঁটু মনে হচ্ছে রাগ করে চা খাবে না।

অন্ধকারে খসখস চটাৎ চটাৎ মসমস শব্দ হল। বুঝলুম ভেজা জুতোর শব্দ। সবাই ভিজে গেছে। ভিজতে বাধ্য। রাস্তায় এতক্ষণ এক কোমর জল না হয়ে যায় না। কিন্তু তারাপদ যে বলল সে একটুও নাকি ভেজেনি? নিশ্চয় বাস বা গাড়ি পেয়েছিল।

কিন্তু আমি বসে আছি তো আছিই। রঘুনাথের পাত্তা নেই, ওদেরও নেই। ব্যাপারটা দেখা দরকার। হলঘরের কোনার দিকের দরজা দিয়ে কিচেন-কাম-ডাইনিং রুমে যাওয়া যায়। অন্ধকারে ঠাহর করে সেই দরজার কাছে গেলুম। গিয়ে দেখি, কেরোসিন কুকার জ্বলছে। কেটলিও চাপানো আছে। সেই আলোয় আবছা দেখা গেল ডাইনিং টেবিলের পাঁচটা চেয়ারে আমার পাঁচ বন্ধু বসে আছে। একটা চেয়ার খালি। কিন্তু রঘুনাথকে দেখতে পেলুম না।

আমাকে দেখে তারাপদ ডাকল,—চলে আয় পুঁটু! বসে পড়! চা খাওয়াটা এখানেই জমবে।

বললুম,—রঘুনাথ কোথায়?

তারাপদ হ্যা-হ্যা করে হেসে বলল,—রঘুনাথ পালিয়ে গেছে।

—সে কী পালাল কেন?

—আমাকে দেখে।

অবাক হয়ে খালি চেয়ারটাতে বসে বললুম,—তোকে দেখে পালানোর কী আছে?

তারাপদ জবাব দিতে যাচ্ছিল, দীপক বলল,—চেপে যা, চেপে যা! দ্যাখ, চায়ের জল ফুটছে নাকি।

তারাপদ উঠে গিয়ে চা করতে থাকল। বললুম,—হ্যাঁ রে দীপু, চেপে যা বললি কেন?

দীপক মিটিমিটি হেসে বলল,—সেসব কথা পরে হবে'খন। চা খাওয়া যাক। বৃষ্টিটা বেশ জমেছে।

ব্রতীন বলল,—শুধু চা? তেলেভাজা-টাজা হলে ভালো হতো।

গোপাল বলল,—পরের বার হবে। আপাতত চা খেয়ে চাঙ্গা হওয়া যাক।

আমি বললুম,—একটা আলো চাই যে! এ ঘরে মোমবাতি নেই? বরং হ্যারিকেনটা নিয়ে আসা যাক।

সেলিম বলে উঠল,—না-না! এই শনি-সন্ধ্যাটা বিনি আলোতেই আড্ডা দেওয়া যাক।

ততক্ষণে তারাপদর চা তৈরি হয়ে গেছে। কাপগুলো সে প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দিল। চুমুক দিয়ে তেতো লাগল। বললুম,—বিচ্ছিরি কড়া হয়ে গেছে। তারাপদ, তুই চা করতে জানিসনে।

তারাপদ চেয়ারে বসে বলল,—কড়া চা না হলে এখন চলে?

দীপক বলল,—কুকারটা নিভিয়ে দে। খামোকা তেল খরচ করা কেন?

তারাপদ বলল,—একটু জ্বলুক না। পুটু অন্ধকার পছন্দ করে না।

কথাটা বলে সে আমার দিকে ঘুরল। হঠাৎ দেখলুম, তারাপদ নয়। প্যান্ট-শার্ট পরা একটা কঙ্কাল! চমকে উঠে অন্যদের দিকে তাকালুম। আতঙ্কে শরীর হিম হয়ে গেল। বুক ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। পাঁচটি পোশাকপরা কঙ্কাল ডাইনিং টেবিল ঘিরে চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

অমনি বিকট চেঁচিয়ে উঠলুম,—রঘুনাথ! রঘুনাথ!

কঙ্কালগুলো হিহিহিহি করে হাসতে লাগল। চেয়ার থেকে উঠে মরিয়া হয়ে হলঘরে, তারপর সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে চ্যাঁচাতে থাকলুম,—রঘুনাথ! রঘুনাথ!

বৃষ্টি সমানে ঝিরঝির করে ঝরছে। লনের ওধারে একটা গ্যারেজ ঘর আছে দেখেছি। সেখানে দীপকের দাদামশাইয়ের গাড়ি থাকত একসময়। সেখান থেকে রঘুনাথের সাড়া এল,—পালিয়ে আসুন দাদাবাবু! পালিয়ে আসুন!

দৌড়ে ঘাস ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে গ্যারেজঘরে পৌঁছলুম। আবছা রঘুনাথকে দেখা যাচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে আছে। বলল,—খুব বেঁচে গেছেন দাদাবাবু!

হাঁপাতে-হাঁপাতে বললুম,—পাঁচ-পাঁচটা ভূ-ভূ-ভূ...

চুপ! চুপ! —রঘুনাথ বলল, এই বিপদের সময় ও কথাটা বলতে নাই।

একটু ধাতস্থ হওয়ার পর বললুম,—কিন্তু এখানে আর কতক্ষণ থাকব? বৃষ্টি ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। চলো! বরং আশে-পাশের বাড়ির লোকজনের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বলি। ওদের তাড়ানো দরকার।

রঘুনাথ বলল,—ঠিক বলেছেন। কথাটা এতক্ষণ কেন যে মাথায় আসেনি! তবে আপনাকে আর কষ্ট করে বেরুতে হবে না। আপনি এখানে চুপচাপ বসে থাকুন। পাড়ার সবাই আমাকে চেনে। আমি এক্ষুনি লোক ডেকে আনি।

মুখে বললুম বটে, তাই যাও, কিন্তু একা থাকতে ভয় করছিল। রঘুনাথ চলে যাওয়ার পর ভয়টা আরাও বেড়ে গেল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি একটা কঙ্কাল চুপিচুপি এসে আমার ঘাড়টি মটকে দেবে। অবশেষে গুঁড়ি মেরে বসলুম, যাতে ওরা আমাকে এখানে দেখতে না পায়।

তারপর বসে আছি তো আছি। রঘুনাথের পাত্তা নেই। অন্ধকার আরও ঘন হয়েছে। বৃষ্টিটা অবশ্য কমে গেছে। একসময় বাড়ির দিক থেকে কাদের চাপা গলায় কথাবার্তা শোনা গেল। উঁকি মেরে দেখি, হলঘরের ভেতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। খোলা দরজা-জানালা দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো যাদের দেখা যাচ্ছে, তারা সেই পঞ্চভূত ছাড়া আর কারা হবে? একটু পরে তারাপদর ডাকাডাকি শুনতে পেলুম,—রঘুনাথ! রঘুনাথ!

সর্বনাশ! পঞ্চভূত আবার আমার বন্ধুদের রূপ ধরে নতুন কোনও মতলব ভেঁজেছে। রঘুনাথটা একেবারে অপদার্থ। পঞ্চভূতের খবর পেলে জল-কাদা ভেঙে লোকেরা মার-মার করে তেড়ে আসবেই। সে বোধহয় ঠিকভাবে কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারছে না। কিংবা লোকেরা তার কথা বিশ্বাস করছে না।

আবার চাপাগলায় কথাবার্তা, তারপর ক্যারামের গুটি চলার খটখট শব্দ শুনতে পেলুম। রোসো ব্যাটাচ্ছেলেরা রঘুনাথ এখনই এসে যাবে লোকজন নিয়ে। মেরে ভূত ভাগিয়ে দেবে।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। গ্যারেজঘর থেকে দেখতে পাচ্ছি, পঞ্চভূত ক্যারাম আর তাস খেলছে। রাগে গায়ে জ্বালা ধরে গেল। একবার দীপকের কথা শুনতে পেলুম। সে বলল,—এই ভিজে জামা-প্যান্ট নিশ্চয় পুঁটুর।

তারপরই একটা হল্লা শোনা গেল। বাগানবাড়ির গেট দিয়ে টর্চ জ্বেলে লাঠিসোটা নিয়ে একদঙ্গল লোক ঢুকেছে। তাদের আগে মার-মার বলে হাঁক ছেড়ে রঘুনাথ দৌড়ে আসছে। ভেতরে ঢুকেই চ্যাঁচাতে লাগল,—কই ভূত? মার-মার। ঠ্যাং ভেঙে দে।

সাহস পেয়ে আমিও যোগ দিলাম ওদের সঙ্গে। লন পেরিয়ে মারমুখী ভিড় হলঘরের দরজার সামনে যেতেই দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। হ্যারিকেনের আলোও গেল নিভে। এতে মারমুখী লোকগুলো আরও রেগে গিয়ে দরজায় লাথি মারতে লাগল। লাথির চোটে দরজা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। লোকগুলো—কই ভূত? মার-মার! ভূতের ঠ্যাং ভেঙে দে! বলে ঘরে ঢুকল। টর্চের আলোয় কাকেও দেখা গেল না।

একটা দল নিয়ে আমি আর রঘুনাথ কিচেনে ঢুকলুম। আর একটা দল বাড়ির চারপাশে খুঁজতে বেরুল। কিন্তু পঞ্চভূতের পাত্তা পাওয়া গেল না। কিচেনের ডাইনিং টেবিলে ছটা কাপ দেখতে পেলুম। পাঁচটা কাপে চায়ের তলানি পড়ে আছে। একটা কাপ চায়ে ভর্তি। এই কাপটা আমার।

রঘুনাথ বলল,—মানুষের ভয়ে ভূতগুলো পালিয়ে গেছে দেখছি।

একজন তাগড়াই চেহারার লোক তার লাঠিটা রঘুনাথকে দিয়ে বলল,—এটা হাতের কাছে রেখে দিও রঘুদা। আমরা যাই। ফের যদি ঝামেলা করে, খবর দিও।

বাড়ির চারদিকে যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা হলঘরে ফিরে এসে বলল, —পালিয়ে গেছে। তাদের একজন দেশলাই জ্বেলে লণ্ঠনটা ধরাল। তারপর বলল, —চলি রঘুদা! তেমন কিছু হলে আবার খবর দিও।

পাড়ার লোকগুলো চলে যাওয়ার পর রঘুনাথ বলল,—হ্যারিকেনটা নিয়ে

কিচেনে চলুন দাদাবাবু! ভূতের এঁটো কাপগুলো ধুয়ে ফেলি। তারপর দুজনে চা খাওয়া যাবে। বড্ড ধকল গেছে।

কিচেনের ডাইনিং টেবিলে হ্যারিকেন রেখে বসে আছি। রঘুনাথ বেসিনে কাপগুলো, রগড়ে-রগড়ে ধুচ্ছে। এমন সময় জানালায় কে চাপাস্বরে ডাকল, —পুঁটু! পুঁটু!

চমকে উঠে বললুম,—রঘুনাথ! লাঠি-লাঠি! আবার এসেছে ওরা।

রঘুনাথ বেসিনে কাপ রেখে লাঠি বাগিয়ে দাঁড়াল। জানালায় তারাপদর মুন্ডু দেখা গেল। সে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল,—আমরা ভূত নই। দরজা খুলে দাও, ঢুকি।

বললুম,—দরজা খুলো না রঘুনাথ। ঝামেলা করলে লাঠির গুঁতো মারো।

তারপদর পাশে দীপক, সেলিম, ব্রতীন আর গোপালের মুন্ডু দেখা গেল। মুখগুলো করুণ। দীপক বলল,—আমরা ভূত নই, রঘুনাথ! পুঁটু, তুই একটু বুঝিয়ে বল না ওকে।

বললুম,—তোমরা যে ভূত নও, তার প্রমাণ?

পাঁচ দুগুণে দশখানা হাত জানালার ভেতর গলিয়ে দিল ওরা। তারাপদ বলল, ছুঁয়ে দ্যাখ পুঁটু! ভূতের হাত হলে ঠান্ডা হিম হবে।

আমি ছুঁয়ে দেখার জন্য হাত বাড়িয়েছি, রঘুনাথ বলল,—ছোঁবেন না দাদাবাবু! বরং আমি আগে পরীক্ষা করে দেখি। যদি ভূত না হয়, রাম-রাম বলুক ওরা।

পাঁচটা মুখে করুণ সুরে উচ্চারিত হল,—রাম রাম রাম রাম রাম রাম।

রঘুনাথ এ ঘরের দরজা খুলে দিল। পাঁচজনে হুমমুড় করে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে পড়ল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দেখতে-দেখতে বললুম,—ব্যাপারটা কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু!

তারাপদ বলল,—আমরাও বুঝতে পারছি না পুঁটু! একটু আগে আমরা পাঁচজনে একটা টেম্পো ভাড়া করে চলে এলুম। এসে দেখি দরজা খোলা। কেউ কোথাও নেই। হ্যারিকেনটা জ্বেলে তাস আর ক্যারাম খেলতে-খেলতে হঠাৎ শুনি হল্লা করে কারা তেড়ে আসছে। অমনি ভয় পেয়ে হ্যারিকেন নিভিয়ে আমরা পালিয়ে গেলুম। তারপর অতিকষ্টে গাছে চড়ে গা ঢাকা দিলুম।

দীপক বলল,—ভাগ্যিস গাছের ওপর টর্চের আলো ফেলেনি ওরা।

রঘুনাথ হো-হো করে হেসে ফেলল। বলল,—বুঝেছি, বুঝেছি। আপনাদের ঢুকতে দেখে ভূত পাঁচটা পালিয়ে গিয়েছিল। মানুষ যেমন ভূত দেখে ভয় পায়, ভূতেরাও মানুষ দেখে ভয় পায়।

তারাপদ বলল,—পুঁটু, কী হয়েছিল বল তো? তুই কখন এসেছিস?

দীপক বলল,—চা খেতে-খেতে সব শুনছি। রঘুনাথ, শিগগির চা করো।

রঘুনাথ কেরোসিন কুকার ধরাল। তারপর বলল,—আজ রাত্তিরে আর বাড়ি ফিরে কাজ নেই দাদাবাবুরা। চা করে খিচুড়ির ব্যবস্থা করছি। কী বলেন?

আমরা সবাই একবাক্যে সায় দিলুম।...

জ্যোৎস্নায় মৃত্যুর ঘ্রাণ

কেকরাডিহাকে নেচারস ডেন বলা চলে।—ভদ্রলোক মিটিমিটি হেসে বললেন। অপূর্ব মনোরম জায়গা কিন্তু...উনি হঠাৎ থেমে গেলে বললুম, কিন্তু কী?

নামটা বড্ড বিচ্ছিরি। তাছাড়া...

ওঁর কথার ঢংটিও বিচ্ছিরি। একটি বাক্য বলেই যেন সাসপেন্সের আলপিন দিয়ে একটু খোঁচা। বিরক্তি চেপে বললুম,—তাছাড়া কী?

একটু চুপ করে থাকার পর ফিক করে হাসলেন—নামেই মালুম। শেক্সপিয়ার যদিও বলেছেন নামে কী আসে-যায়! যায়। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে যায়। ট্রেন তখন একটা পাহাড়ের সুড়ঙ্গে সবে ঢুকেছে। গতিও মন্থর। কামরা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল।

অন্ধকারে ওঁর কথা অবশ্য থামল না,—এই যে দেখুন, আমি যাচ্ছি চরডিহায়। ঘন জঙ্গল এলাকা। সেখানে বসতি একেবারে কম। মানুষজনও কম। একটা কাঠগোলা। কিছু গোপ, মানে যাদের গরু-মোষ-ছাগল আছে আর কী! চাষবাস কদাচিৎ। খুব সজ্জন মানুস সব। তাহলে চোর শব্দটা কেন? হুঁ, মাঝে-মাঝে বাঘের উৎপাত হয়। এখন বাঘটাকে যদি গরুচোর বলা যায়, তাহলে আর কথা নেই। চোরডিহা নামটা মানিয়ে যায়। বলে উনি সেই ঘন জমাট অন্ধকারে হা-হা অট্টহাসি হেসে উঠলেন। এমন বিকট হাসি অন্ধকারে বড় অস্বস্তিকর। গা ছমছম করে।

বললুম,—আলো জ্বালার ব্যবস্থা নেই ট্রেনে?

—মাত্র কয়েক মিনিট। এ সুড়ঙ্গটা তত কিছু লম্বা নয়। কেন? আপনার ভয় করছে নাকি?

—না। তবে অন্ধকারটর বিরক্তিকর। ট্রেনে কি ইলেকট্রিসিটি নেই?

—তাহলে কেকরাডিহায় যে বাড়িটাতে উঠবেন, সেটাও বিরক্তিকর মনে হবে।

—কেন বলুন তো?

মুনভিলায় আমিও একবার ছিলুম। ওখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। তাছাড়া বাড়িটা—বলে ফের উনি চুপ।

সাসপেন্সের খোঁচা মারা এঁর দেখছি বড্ড বদভ্যাস। বিরক্তিতে আর কিছু জানতে চাইলুম না। কিন্তু একটু অবাক হলুম। অরীন্দ্র বিদ্যুৎ না-থাকার কথাটা বলেনি। হয়তো বলতে ভুলে গেছে। অরীন্দ্র আমার বন্ধু। রীতিমতো রাজা-মহারাজা লোকের বংশধর। বিশুদ্ধ প্রকৃতিকে এনজয় করতে হলে নাকি কেকরাডিহার মতো জায়গা নেই। ওদের 'মুনভিলা' নামে বাড়িটা একটা টিলার গায়ে এবং চারদিকে প্রকৃতি! অরীন্দ্র বলেছিল এসব কথা।

ট্রেন সুড়ঙ্গ পেরুলে দিনের আলো এসে ঢুকল আবার। ভদ্রলোক তাঁর লাগেজ গোছাতে ব্যস্ত হলেন। আসানসোলে এই ট্রেনে ওঠার পর ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। উনি শিকারি। নাম প্রশান্ত সিংহ। খুব আমুদে স্বভাবের মানুষ। বলেছিলেন,—স্বয়ং

সিংহ হয়েও সিংহ-টিংহ মারার সুযোগ পাইনি মশাই! গুজরাতের গির জঙ্গলে একদঙ্গল সিংহ আছে। কিন্তু একে হাঁদা-ভোঁদা, তায় গভমেন্টের পোষ্য। তবে বাঘ মেরেছি। ত্রিপুরার জঙ্গলে একটা গুন্ডা হাতি মেরেছিলুম। কাজেই নিজেকে সিংহ ভেবে গর্বিত হই।

চোরডিহার জঙ্গলে বাঘ আছে। সম্প্রতি একটা বাঘ খুব উৎপাত করছে। তাকে মারতেই উনি যাচ্ছেন। একটা শটগান আর একটা রাইফেল দুই কাঁধে আটকে প্রকান্ড ব্যাগ হাতে উনি দরজার দিকে এগোলেন। ট্রেন চোরডিহা স্টেশনের ডাউন সিগন্যাল পেরুচ্ছিল। ঘুরে মুচকি হেসে বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন,—কেকরাডিহায় দেখা হতেও পারে। অবশ্য যদি বাঘটাকে মারতে পারি, তবেই। যাই হোক, একটু সাবধানে থাকবেন।

কথাটা শুনে চমকে উঠলুম। এবার সাসপেন্স নয়, শাসানি। কিন্তু প্রশ্ন করার সুযোগ পেলুম না। শিকারি ভদ্রলোক ট্রেন থামার সঙ্গে-সঙ্গেই নেমে প্ল্যাটফর্মে হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। ওঁর শেষ বাক্যটি অস্বস্তিকর। তাছাড়া নামেই মালুম বলতে কী বোঝায়? মন থেকে অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছিলুম—তাছাড়া বাড়িটা... মানে কী? ভূতটুত আছে বুঝি! ধুস? মনে-মনে হেসে ফেললুম। এই মহাকাশযুগে ভূত!

ট্রেনের গন্তব্য গয়া। ফার্স্ট ক্লাসে আরও দুজন যাত্রী। চেহারা হাব-ভাব দেখে ব্যবসায়ী মনে হয়েছিল। হোঁতকা গোব্দা মানুষ। দুজনেই ঢুলছিলেন। আর একটা সুড়ঙ্গ এল। আবার সেই দম আটকানো অন্ধকার এবং গা ছমছম। কিন্তু এ সুড়ঙ্গটা শেষ হচ্ছে না। বারবার ট্রেনের তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল চাপা গুমগুম শব্দ, একটানা গাঢ় অন্ধকার, এসব সুড়ঙ্গে তো আলো থাকার কথা। ভাবলুম, চোরডিহার চোরেরা এসেই বাল্‌বগুলি খুলে নিয়ে গেছে, তা শিকারি ভদ্রলোক যাই বলুন। অথবা এলাকা এখনও বিদ্যুৎ পায়নি।

পাওয়ার কথাও না। পাহাড় আর জঙ্গল, জঙ্গল আর পাহাড় দুধারে। কাছাকাছি বসতিও চোখে পড়েনি। যদি বা পড়েছে, সেও নেহাত দেহাতি গ্রাম। আদিম ধরনের ঘরবাড়ি। মানুষজনও গরিব।

কতক্ষণ পরে সুড়ঙ্গ শেষ হল। আবার একটা স্টেশন এল। নিছক হল্ট। জনমানুষহীন নিচু প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু আমাকে অবাক করে পাখির মতো আলতো পায়ে এক যুবতী উঠে এল কামরায়। ছিমছাম স্মার্ট, ফর্সা, এবং এমন ফর্সা, যার সঙ্গে পাতাচাপা ঘাসই তুলনীয়, তাই পাণ্ডুর বলা চলে। জন্ডিসের রুগি নাকি? কক্ষনও না। ছটফটে, চঞ্চল, সতেজ। কালিদাস বর্ণিত সেই 'চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভি পীনোন্নতপয়োধরা' ইত্যাদি মনে পড়ে যায়। পরনে ফিকে নীল শিফন জর্জেট শাড়ি ম্যাচিং চাইনিজ ছাঁট ব্লাউজ।

কামরা সৌন্দর্যময় সুগন্ধে ভরে গেল।

ব্যবসায়ীদ্বয়ের অবচেতনায় তার তীক্ষ্ণ বিচ্ছুরণ ঘটে থাকবে। কারণ দুজনেই চোখ খুলছেন এবং সোজা হয়ে বসলেন। জানলার দিকে ঘুরে আবার প্রকৃতি দর্শনে মন দিলুম।

—এক্সকিউজ মি!

দ্রুত ঘুরে দেখি আমি তার লক্ষ্য। ভ্যাবার মতো হেসে বললুম,—বলুন!

—আপনি কি গয়া যাবেন?

—না। কেকরাডিহা।

—বাঃ! তাহলে একজন সঙ্গী পাওয়া গেল।

—আপনি কেকরাডিহা যাচ্ছেন?

যুবতী ঠোঁটের কোণে হেসে মাথাটি একটু নাড়ল।

ব্যবসায়ীদ্বয়ের একজন বলে উঠলেন,—তো আপ ইঁহা জংলি হল্টমে কাঁহা গেয়িথি ম্যাডাম?

জেরা সা ঘুমনে।—যুবতী আমার দিকে ঘুরল।—কেকারাডিহি কেন যাচ্ছেন?

প্রশ্নটা সোজা চার্জ। যেন মহিলা দারোগা। তবু সৌন্দর্য এবং যৌবনের মর্যাদা রক্ষায় আস্তে-আস্তে বললুম,—জাস্ট্ সাইট-সিইং।

নেচার-লাভার! —যুবতী উজ্জ্বল হাসল। —বলতে পারেন, আমিও তা-ই।

—ও!

—ও কী? আমি প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিই মাঝে-মাঝে। কখনও বেরিয়ে আসি। ভয় পাই। দেয়ার ইজ সামথিং ভেরি ক্রুড ইন দা নেচার। দ্যাটস ডেঞ্জারাস। স্ট্রেঞ্জ! আপনাকে বোঝাতে পারব না।

এই দার্শনিক তত্ত্ব-টত্ত্ব শুনে একটু সম্ভ্রম জাগল। শুধু বললুম,—তাই বুঝি?

একটু হেসে বললুম,—আপনি স্কুলটিচার, নাকি অধ্যাপিকা?

—কেন এ কথা বলছেন?

এবার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ নম্র ব্যাকুলতা ছিল। যেন সেন্টিমেন্টে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। বললুম,—আপনার চিন্তাভাবনার ডেপ্‌থ দেখেই।

যুবতী হাসল,—ও নো নো! জাস্ট আ সিম্পল আইডিয়া। অ্যাসোসিয়েশন অব দা নেচার। আপনি একজন নিরক্ষর জংলি মানুষকে জিগ্যেস করুন। সেও বলবে, দা নেচার স্পিকস টু ম্যান। প্রকৃতি কথা বলে। যে কাছে থাকে, সে বোঝে।

—আপনার নামটা জানতে পারি কি?

—শিওর। পর্ণা চোধুরী।

একটু ইতস্তত করে বললুম,—কেকরাডিহার মুনভিলার চৌধুরীদের সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই তো?

—আছে।

—অরীন্দ্র চৌধুরীকে তাহলে চেনেন?

—খু-উ-ব। আমার মাততুতো দাদা।

নড়ে উঠলুম,—মাই গুডনেস! অরীন্দ্র আমার বন্ধু। আমি মুনভিলাতেই যাচ্ছি।

পর্ণা হঠাৎ ঠোঁট কামড়ে ধরল। আমার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে চাপা শ্বাস ফেলে বলল,—বাড়িটায় কেউ থাকে না আর। একজন আদিবাসী খ্রিস্টান কেয়ারটেকার রেখেছে। সে মাইনে নেয়! কিচ্ছু দেখাশোনা করে না। দূরে বসতি এরিয়ায় থাকে। আপনার অসুবিধে হবে।

—আপনাদের ফ্যামিলি...

কথা কেড়ে পর্ণা বলল,—একটা কথা, প্লিজ! কেয়ারটেকার ম্যাথু কিংবা অরুদাকে আমার কথা বলবেন না। প্লিজ, কথা দিন!

একটু অবাক হয়ে বললুম,—ঠিক আছে। কিন্তু...

—কোনও কিন্তু নয়। কথা দিন।

—দিলুম।

ব্যবসায়ীদ্বয় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে কথা শুনছিলেন আর পরস্পর চোখে-চোখে কথা বলছিলেন। বাঁকা ঠোঁট। ভাবখানা এরকম, যেন ওঁদের প্রাপ্য নাফা আমি হাতিয়ে নিয়েছি। কেকরাডিহা প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল। পর্ণা উঠে দরজার কাছে গেল এবং ট্রেন থামার আগেই পাখির মতো নেমে গেল। লাগেজ গুছিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে তাকে খুঁজলুম। দেখতে পেলুম না। ছোট্ট স্টেশন। মানুষজন কম। এদিকে-ওদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। স্টেশনের বাইরের চত্বরে কয়েকটা এক্কা আর সাইকেল রিকশা। ছোট্ট একটা বাজার।

কেয়ারটেকার ম্যাথু জেভিয়ারের থাকার কথা স্টেশনে। অরীন্দ্র চেহারার একটা বর্ণনা দিয়েছিল। রোগা, কালো, মাথায় ভীষণ সাদা চুল এবং মধ্যিখানে টাক। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, দাড়িটি নাকি কুচকুচে কালো। অরীন্দ্র বলেছিল,—ওকে মিঃ জেভিয়ার বলবি যেন। খুব কেতাদুরস্ত দিশি সাহেব, প্রাক্তন রেলকর্মী। সব সুব্যবস্থা করে দেবে খাতির দেখালে।

কিন্তু অরীন্দ্র তার মাসতুতো বোন পর্ণার কথা যেন বলল না? এতক্ষণে মনে হল, পর্ণা শিক্ষিত মেয়ে, কিন্তু একটু ছিটগ্রস্তা নির্ঘাত! হয়তো মানসিক রুগিই বা! তাই একা-একা যেখানে-সেখানে চলে যায়। জঙ্গলে ঘোরে। কিন্তু এ তো তার পক্ষে বড় বিপজ্জনক।

ফ্যামিলিতে কি ওকে শাসন করার কেউ নেই। নিশ্চয় নেই। কিংবা আছে। পর্ণা তাদের চোখের আড়ালে এভাবে ঘুরে বেড়ায়। তাই আমাকে নিষেধ করছিল।

একটা সিগারেটের দোকানের সামনে যেতেই বাঁকের মুখে সাইকেলে একজনকে দ্রুত আসতে দেখলুম। কাছাকাছি আসতেই মনে হল, ম্যাথু জেভিয়ার না হয়ে যান না। ডাকলুম,—মিঃ জেভিয়ার!

হ্যাঁ, তিনিই। রীতিমতো ভদ্রলোক এবং দিশি সায়েব। স্যুট পুরোনো হলেও স্যুট। টাইটা অবশ্য নতুন। টুপিট জীর্ণ, সাইকেল থেকে নেমে জোরালো হ্যান্ডশেক

করে বললেন,—ভেরি সরি স্যার! আপনার রুম গোছাতে একটু দেরি হয়ে গেল। রান্নার জন্য লোক খুঁজে সারা। তেমন কাউকে পেলুম না। ও নো, নো। ডোন্ট ওরি, স্যার! আমি আছি। আমি আপনার সেবা করতে পারলে ধন্য হব। তবে ভেরি লোনলি প্লেস! লোনলিনেস যাঁদের পছন্দ, তাঁরা মুনভিলাকে ভালো না বেসে পারবেন না। জাস্ট সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন!

জেভিয়ার একটু বেশি কথা বলেন, সেটা ঠিক। তবে মানুষটিকে ভালো লাগল।...

সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন! —জেভিয়ারের মুখ থেকে উচ্চারিত পুরোনো এই বিলিতি প্রবচনটি মাথার ভেতরে ধ্বনিত হয়েছিল বাড়িটাকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই। সত্যিই কি মুনভিলা প্রতীক সাইলেন্স, সুবর্ণ মৌন। জীর্ণ স্থাপত্যটি সারা ধূসর শরীরে শব্দময়। যে ভাষা আমি বুঝি না, তেমনি এক আদিম কোনও ভাষায় যেন কথা বলছে। শুনছি, বুঝতে পারছি না।

আর পর্ণা বলেছিল—পা তুললেই ঘাস গজায়। প্রকৃতি সর্বগ্রাসী।

বাড়িটার সামনের দিকটায় কবেকার মেরামতের কিছু ছাপ। পেছনদিকটা প্রকৃতি গিলে খাচ্ছে। কার্নিশে গাছ। দেয়ালে হিংস্র শেকড়-বাকড়। তারপর জঙ্গল হয়ে ওঠা লনের দিকে তাকাতেই অস্বস্তি জাগল। প্রতিটি গাছ যেন ভীষণ জৈব। ক্রূর চোখে আমাকে তাকিয়ে দেখছে।

অক্টোবরের শ্যামলা চারদিকে। সেই শ্যামলতাকে কেন যেন নির্দয় দেখাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে পেছনে কোনও আততায়ীর পায়ের শব্দ এবং মুখ ঘোরাতেই সে অশরীরী!

—স্যার!

জেভিয়ার এসে ডাকলেন।

হঠাৎ ডাকে চমকে উঠেছিলাম। জেভিয়ার বললেন,—লাঞ্চ রেডি।

তারপর একটু হাসলেন,—এনিথিং রং স্যার?

—না তো।

—আপনাকে তখন বলেছিলুম, লোনসিনেস কখনও অসহ্য হয়ে ওঠে। টেক ইট ইজি, স্যার।

—আচ্ছা মিঃ জেভিয়ার, এ বাড়িটার নাম মুনভিলা কেন?

জেভিয়ার আঙুল তুলে নিচের দিকটা দেখালেন,—জাস্ট লুক অ্যান্ড ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড! ওই ছোট্ট নদীটা, স্যার! কী দেখছেন, বলুন!

.—চন্দ্রকলার মতো। দা ক্রিসেন্ট মুন!

ঠিক তা-ই। —জেভিয়ার বিনীতভাবে বললেন, যদি দয়া করে লাঞ্চ খেয়ে নেন, ভালো হয়। —আমাকে একবার বেরুতে হবে কিছুক্ষণের জন্য।...

রান্নাটা বিলিতি ধাঁচের হলেও মন্দ নয়। খিদেও পেয়েছিল। জেভিয়ার চলে গেলে সেকেলে উঁচু খাটের ওপর শুয়ে পড়লুম। ট্রেনজার্নিতে যথেষ্ট ক্লান্ত। তারপর

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। দরজা ভেজানো ছিল। সেটা ক্যাঁচ শব্দে খুলে যাওয়ার জন্যই হয়তো ঘুমটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। তাকিয়ে রইলুম। বাইরে নরম বিকেল।

বাতাসের চাপেই কি দরজা খুলে গেছে? হু-হু করে বাতাস ঢুকছে ঘরে।

তারপরই তীব্র সেন্টের আভাস পেলুম। ট্রেনে দেখা পর্ণার সেই সৌরভ! ঝটপট উঠে বসে বললুম,—পর্ণা নাকি?

বললুম নয়, মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। অথচ একই সুগন্ধ। ঝাঁঝালো, তীক্ষ্ণ। চটিতে পা গলিয়ে এবার নিজের ইচ্ছায় ডাকলুম,—পর্ণা! পর্ণা! কারণ সে নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও এসে গেছে। খেয়ালি বা ছিটগ্রস্থ মেয়ে, তাই আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

একধারে বাথরুম, অন্য দুদিকে দরজাবন্ধ আরও ঘর। পর্ণা কি বাথরুমে এসে ঢুকেছে? বাথরুমের দরজা ভেজানো। একটু ইতস্তত করে দরজায় চাপ দিলুম। খুলে গেল। কিন্তু কেউ নেই।

অথচ ঘরভরা দুর্দান্ত সৌরভ! আর ক্রমশ, এতক্ষণে সেই সৌরভ মেয়েদের চুলের ঘ্রাণের মতো আকর্ষণ করছে। চাপা আর আকুল কণ্ঠস্বরে আবার ডাকলুম,—পর্ণা! পর্ণা! সহসা সুগন্ধটা মিলিয়ে গেল। লজ্জিত বোধ করলুম। ছি-ছি! এ কী রূপান্তর আমার মধ্যে! সমস্ত ভব্যতাকে এই জীর্ণ পুরোনো বাড়িটাই কি ঘষে তুলে ফেলতে চাইছে আমার চেতনা থেকে? প্রকৃতি কি মানুষকে নিছক জৈব করে ফেলে?

বেরিয়ে গেলুম। হাল্কা গোলাপি রোদ্দুরের গায়ে নীলাভ ধূসরতার মতো কী এক রং। হয়তো এখনই কুয়াশা ঘনিয়ে আসছে। ঢেকে দিতে চাইছে ক্রুর ও ভয়াল বৃক্ষলতাকে।

তাদের জৈবতাকে বিষাদের আড়ালে সরিয়ে ফেলতে চাইছে। বিষাদ কথাটাই মনে এল। কারণ ততক্ষণে টের পেয়েছি, বাড়িটার জীবনে অনেক স্মৃতি আছে। তাই নস্টালজিয়ার বিষাদ আছে। গেটের দিকে এগিয়ে এলুম। ঢালু ঘাসে ঢাকা জমি নিচের নদীটিতে গিয়ে মিশেছে। তীব্র স্রোতের চাপা বিষণ্ণ শব্দ কানে এল। তারপর বাঁ-দিকে কিছুটা দূরে একটা গাছের তলায় আবিষ্কার করলুম পর্ণাকে! সে জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেঁচিয়ে ডাকলুম,—পর্ণা।

পর্ণা মুখ তুলে তাকাল। কোমল রোদ্দুরে তার সুন্দর দাঁতগুলি ঝিকমিক করে উঠল। গেট খুলে ঢালু সংকীর্ণ রাস্তায় পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গে, আশ্চর্য, পর্ণা হঠাৎ গাছপালার আড়ালে উধাও হয়ে গেল! থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। তাহলে মেয়েটি সত্যি সাইকিক রুগি।

নিচে রাস্তার বাঁকে জেভিয়ারের টুপি দেখা গেল। সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে চড়াই ভাঙছেন। কাছাকাছি এসে বললেন,—গুড ইভনিং স্যার! এবং পুনশ্চ আগের মতো, এনিথিং রং?

আস্তে বললুম,—না।

চলুন। লনে চেয়ার পেতে দিচ্ছি, বসবেন বরং। সরি স্যার! ভালো চায়ের খোঁজে বেরিয়েছিলুম। হোপলেস! কেকরাডিহা ইজ গোয়িং টু ডাই ডে বাই ডে। নাথিং গুড এনিহোয়্যার। অল ফুল অফ দা এভিল! —জেভিয়ার সকৌতুকে হাসছিলেন। তারপর আমি নিচে নদীর ধারে সেই গাছটার দিকে বারবার ঘুরে তাকাচ্ছি লক্ষ করে বললেন,—ওখানে শ্মশান। আর ওই যে ছোট্ট টিলাটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটা খ্রিস্টিয়ান সিমেট্রি। আশা করি, আমাদের চার্চের ক্রুশও দেখতে পাচ্ছেন। ওই যে গাছপালার ফাঁকে।

পর্ণার কথা জিগ্যেস করতে গিয়ে পারলুম না। পর্ণা নিষেধ করেছিল বলেও না। গেটে ঢোকার মুখে আবার পিছু ফিরতেই নিচের দিকে ঝোপের আড়ালে পর্ণাকে দেখলুম। ঠোঁঠে আঙুল। ইশারায় জেভিয়ারকে দেখিয়ে হাত নেড়েছিল। তারপর আবার উধাও।...

কিছুক্ষণ পরে লনে বসে চা খাচ্ছি। জেভিয়ার এসে কুণ্ঠিত মুখে বললেন,—আমি দুঃখিত স্যার! আপনার ডিনার রেডি, রেখে যাচ্ছি। আপনাকে রাত্রে সঙ্গ দিতে পারছি না। আপনাকে একা থাকতে হবে। ও নো-নো! ডোন্ট ওরি, স্যার। আসলে আমার স্ত্রী অনেকদিন থেকে অসুস্থ। তাকে দেখাশুনোর লোক নেই।

—না-না। আমি একা থাকতে পারব! আপনি ভাববেন না।

জেভিয়ার একটু হাসলেন,—খুব পুরোনো বাড়ি। পুরোটা মেরামত হয়নি। প্লাস্টার খসে পড়ার শব্দ শুনলে ভয় পাবেন না। পেছনকার ঘরগুলিকে ছুঁচো-চামচিকেরা দখল করে ফেলেছে। রাত্রে ওরা উৎপাত করতে পারে। আর একটা কথা, কেউ ডাকলে যেন দরজা খুলবেন না।

—চোর-ডাকাত আছে নাকি?

—সে আর কোথায় নেই? তবে...এনিওয়ে, বাইরে যা কিছু ঘটুক, যেন দরজা খুলে বেরুবেন না।

—আচ্ছা মিঃ জেভিয়ার, জংলি জানোয়ার আছে নাকি ওইসব জঙ্গলে?

শেয়াল আছে। —জেভিয়ার শিশুর মতো হাসলেন, অবশ্য ওই যে নদীর ওপারে টিলা, ওখানে নাকি একটা শম্বর আছে। রাত্রে ডাক শোনা যায়। আমি কিন্তু শুনিনি স্যার!

জেভিয়ার চলে গেলেন কিচেনের দিকে। দিনশেষের ধূসরতা ঘনিয়েছে। লনের ডানদিকে বিধ্বস্ত ফোয়ারা ঘিরে প্রকাণ্ড গুল্মলতা। আবছা একটা মূর্তি ভেসে উঠল সেখানে। পর্ণা! সঙ্গে-সঙ্গে চাপাস্বরে ডাকলুম,—পর্ণা! পর্ণা! জেভিয়ার বুড়োর যেন জন্তুর কান। কিচেন থেকে সাড়া দিলেন,—জাস্ট আ মিনিট স্যার। পর্ণা মুছে গেল অমনি।...

জেভিয়ার সাইকেলে চেপে চলে যাওয়ার পর পর্ণার প্রতীক্ষায় ছটফট করছিলুম। বারান্দায় বসে বারবার টর্চের আলো ফেলছিলুম। ভাবছিলুম, এবার ওকে দেখে 'প্রকৃতিকন্যা' বলে সম্ভাষণ করব। তারপর মনে হল, সন্ধ্যার পর আর কি

ওকে বাড়ি থেকে বেরতে দেবে, অথবা বসতি থেকে দূরে এই মুনভিলায় রাতের দিকে কেনই বা সে আসবে? আমি তার প্রেমে পড়তেই পারি, সে কেন পড়তে যাবে?

নদীর ওধারে টিলার মাথায় কতক্ষণ পরে চাঁদ উঠল। কুয়াশা তার জ্যোৎস্নাকে নিষ্প্রভ করে দিল। নিচের দিকে একদল শেয়াল ডাকাডাকি করে সহসা থেমে গেল। একটা পেঁচা ক্যাঁও-ক্যাঁও শব্দ করতে-করতে মুনভিলার ওপর দিয়ে চলে গেল। ক্রমে টের পেলুম জীবজগতে সাড়া পড়ে গেছে। পোকামাকড় ডাকছে। কখনও মাথার ভেতর, কখনও পারিপার্শ্বিকে আশ্চর্য প্রাকৃতিক সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা। আর কোনও মৌন নেই, শুধু শব্দ। ধ্বনিময়তা। বৃক্ষলতা থেকে শিশির পড়ার শব্দগুলিও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু নির্জনতা বড় অসহ্য। পর্ণা যদি আসত!

আটটা বাজলে কিচেনে হ্যারিকেনের আলোয় ডিনার খেয়ে নিলুম। খাদ্যের ব্যাপারেও জেভিয়ার ব্রিটিশ ঐতিহ্যের পক্ষপাতী। তবে আমি একেবারে ভেতো বাঙালি। কাল বরং ওঁকে বলব, ডাল-ভাত আর একটুকরো মাছই আমার জন্য যথেষ্ট।

কিচেন বন্ধ করে তালা এঁটে হ্যারিকেন হাতে আমার ঘরে ফিরলুম। সিগারেট টানতে-টানতে আবার পর্ণার প্রতীক্ষা! কোথাও রাতপাখি ডাকতে থাকল। দরজা বন্ধ করে হ্যারিকেনের দম কমিয়ে খাটের তলায় রেখে শুয়ে পড়লুম। জানালাগুলি খোলা রইল। বন্ধ করলে স্বস্তি পাওয়া যেত। কিন্তু বদ্ধ ঘরে শুতে পারি না। একটা পোড়ো-বাড়িতে একা রাত কাটানো এই প্রথম। খালি গা ছমছম আর অস্বস্তি। অথচ পর্ণার কথা ভাবতেই কেন যেন মনে হচ্ছে, আমি একা নই।

মশার উপদ্রব। তাই মশারি আছে। চিত হয়ে শুয়ে যতবার অন্য কিছু ভাবতে যাচ্ছি, পর্ণা মনে এসে দাঁড়াচ্ছে। প্রকৃতিকন্যার লাবণ্য, আর সেই ঝাঁঝালো সৌরভ স্মৃতি যা সমস্ত জীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে।

কতক্ষণ পরে কোথাও কোনও ঘরের ভেতর চাপা শব্দে চমকে উঠলুম। শব্দটা ধস্তাধস্তি কিম্বা শ্বাসপ্রশ্বাসের। জেভিয়ার বলেছিলেন, যেন না বেরোই। কিন্তু শব্দটা বাড়ছে। টেবিলচেয়ার পড়ে যাওয়া, কাচ ভাঙা, শ্বাসপ্রশ্বাসটার বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। তারপর গোঙানি, ঘড়ঘড়। কী ঘটছে? হুড়মুড় করে উঠে বসলুম। ঘড়ঘড় শব্দটা মৃদু হয়ে আসছে।

আর চুপ করে থাকা অসম্ভব। চরম ধরনের আতঙ্ক মরিয়া করে তোলে খুব ভিতু মানুষকেও। তাছাড়া হঠাৎ মনে হল পর্ণা এসেছিল এবং তাকে অনুসরণ করে কোনও দুর্বৃত্ত ওর ওপর ঝাঁপ দিয়েছে। হিংস্র গর্জনের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলুম,—কে? কে?

তারপর টর্চ হাতে মশারি ঠেলে বেরিয়ে পড়লুম। ঘরের কোণায় একটা মরচে ধরা বল্লম দেখেছিলুম। বল্লমটা হাতে নিয়ে সেই শব্দটা কোন ঘরে থেকে আসছে জানতে কান পাতলুম। পেছনদিকের ঘর থেকে শব্দটা আসছে মনে হল। প্রচণ্ড জোরে

লাথি মারলুম দরজায়। কপাটে মচমচ করে উঠল। দমাদ্দম লাথির পর একটা কপাট মড়মড় করে একপাশে ঝুলে গেল। ফাঁক দিয়ে টর্চের আলো ফেলেই আমার মাথা ঘুরে গেল। রক্ত হিম হয়ে পড়ল। দম আটকে গেল।

পর্ণাই! পুরোনো আসবাবপত্রের স্তূপে হেলান দেওয়ার ভঙ্গিতে দুপাশে হাত ছড়িয়ে আছে। শ্বাসনালি ফাঁক। চাপচাপ রক্ত।

চিৎকার করতে গিয়ে দেখি, গলা থেকে স্বর বেরুচ্ছে না। তারপর সেই ঘরে সৌরভ সহসা ঝাঁপিয়ে এলে ধাতস্থ হলুম। হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরের দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় গেলুম। এখনই জেভিয়ারের কাছে যাওয়া দরকার।

কিন্তু তাঁর বাড়ি তো চিনি না।

বস্তি এলাকায় বাজারে এখনও লোক থাকা সম্ভব। বারান্দা থেকে নামছি, তখনও শরীর পাষাণভার। পা টলছে। গলা শুকনো। এখন চারদিকের কুয়াশা ঝলমলে জ্যোৎস্নায় ফর্দাফাঁই। কালো-কালো বৃক্ষলতা আবার ভয়াল জৈব হয়ে উঠেছে। নিচের নদীর জলে জ্যোৎস্না, নদীটাও হিংস্র নিষ্ঠুর হাসছে। গেটের কাছে সহসা আবছা এক মূর্তি। পর্ণার আততায়ীই বা! মরিয়া হয়ে বল্লম তুলে এগিয়ে গেলুম। পারিপার্শ্বিক নিষ্ঠুর হিংস্রতা মুহূর্তে আমাকে ভর করেছিল।

কিন্তু তার ওপর টর্চের আলো পড়তেই থমকে দাঁড়ালুম। ভুল দেখছি না তো? পর্ণা! এ তো পর্ণাই।

সে হাত তুলে চোখ আড়াল করে চাপাস্বরে বলে উঠল,—আঃ। আলো নেভান!

তাহলে শ্বাসনালি কাটা রক্তাক্ত কার শরীর দেখে এলুম? নিশ্চয় অন্য কাউকে দেখেছি। পর্ণা এগিয়ে এসে তেমনি শ্বাস-প্রশ্বাসময় কণ্ঠস্বরে আবার বলল,—এমন করে কোথায় যাচ্ছেন?

—পর্ণা! তুমি পর্ণা তাহলে...

—তাহলে? তাহলে কী? হঠাৎ থেমে গেলেন যে?

—ওই ঘরে একটা ডেডবডি। জাস্ট নাও মার্ডার্ড! অবিকল তোমার মতো একটা মেয়ে।

অবিকল আমার মতো! —পর্ণার কণ্ঠস্বরে চিড় খেল। সে তো আমিই!

—পর্ণা! আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এ হেঁয়ালির অর্থ কী?

পর্ণা আরও এগিয়ে এল। সেই তীব্র সৌরভ আবার। কিন্তু এই জ্যোৎস্নায় সৌরভের সঙ্গে আরও কী মিশে আছে। সুঘ্রাণটা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। হিংস্রতর হচ্ছে। সে শ্বাসপ্রশ্বাসময় কণ্ঠস্বরে বলল,—আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী। তুমি চর্যাপদ পড়োনি?

—পর্ণা! দোহাই তোমার, বুঝিয়ে দাও এর অর্থ কী?

—আমাকে কেউ ভালোবাসেনি। সবাই ভালবাসত আমার এই শরীরটাকে। তাই এখন এই শরীরটাই সাজিয়েগুছিয়ে সেন্ট মেখে ঘুরে বেড়াই। অথচ আমি চেয়েছিলুম, আমার আত্মাকে কেউ ভালোবাসুক।

—পর্ণা! পর্ণা তুমি...

চুপ! এখন আমি তোমার কাছে একটু ভালোবাসা চাইতে এসেছি। দেবে তুমি? —বলে সে আরও কাছে এগিয়ে এল। তারপর আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুহাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। কিন্তু কী অসহ্য হিম তার শরীর! নিষ্ঠুর হিম আর কামনায় হিংস্র শরীরের চাপে আমার দম আটকে গেল। প্রচণ্ড আতঙ্কে মাথা ঘুরে উঠল। মনে হল, অতল শূন্যে তলিয়ে যাচ্ছি।...

স্যার-স্যার! —শুনে চোখ খুলে দেখি, জেভিয়ার আমার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে একটুকরো গরম পশমি কাপড়। আমার পায়ের তলায় সেঁক দিতে দিতে বললেন,—মর্নিংয়ে এসে দেখি আপনি লনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। হোয়াট হ্যাপেন্‌ড?

মিঃ জেভিয়ার! —অতিকষ্টে বললুম, পর্ণা কে?

জেভিয়ার চমকে উঠে বললেন,—ও মাই গড। তারপর দ্রুত বুকে ক্রশ আঁকলেন। একটু পরে আস্তে বললেন,—শি ওয়াজ আ স্কুল টিচার। এই ফ্যামিলিরই মেয়ে। মুনভিলায় মায়ের সঙ্গে থাকত। হঠাৎ একরাত্রে খুন হয়ে যায়। সরি স্যার, শি ওয়াজ জাস্ট আ নটি লাভগার্ল! ওকে! ডোন্ট ওরি! আর আপনাকে এখানে থাকতে হবে না। আমি বরং অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।...

তিন নম্বর ভূত

ছোটমামার সঙ্গে রাতবিরেতে কোথাও গেলে বরাবর দেখেছি, একটা না একটা গোলমেলে ঘটনা ঘটে। গিয়েছিলাম ঝাঁপুইতলা একাদশ বনাম বাবুইহাটি ইলেভ্‌ন্ টাইগার্সের ফুটবল ম্যাচ দেখতে। ঝাঁপুইতলা বাবুইহাটিকে একখানা গোল দিতেই তুলকালাম চ্যাঁচামেচি। তারপর কেন কে জানে হাঙ্গামা বেধে গেল। যে যাকে সামনে পাচ্ছে, দুমদাম ঘুসি কিল চড় থাপ্পড় চালাচ্ছে। ছোটমামার দিকে ঘুসি তুলে একটা ষণ্ডামার্কা লোক এগিয়ে আসামাত্র ছোটমামা চেঁচিয়ে উঠলেন,—আমি না! আমি না! ওই লোকটা।

অমনি ঘুসিটা গিয়ে পড়ল অন্য একজনের পিঠে। দুজনে মারামারি বেধে গেল। সেই ফাঁকে ছোটমামা আমার হাত ধরে বললেন,—চলে আয় পুঁটু। তারপর দুজনে দৌড়ে খেলার মাঠ ছাড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলুম।

তখন ছোটমামার সে কী হাসি! বললেন,—কেমন দিয়েছি বল!

খুশি হয়ে বললুম,—দারুণ দিয়েছেন ছোটমামা!

—হেডে একটু বুদ্ধি না থাকলে আজকাল বাঁচা যায় না। বুঝলি পুঁটু?

—কেন মারামারি বাধল বলুন তো?

সেটাই তো বুঝতে পারছি না।—বলে ছোটমামা খেলার মাঠের দিকে ঘুরলেন।

খি-খি করে হেসে ফের বললেন,—মনে হচ্ছে পুলিশ এসে গেছে। চল, আমরা কেটে পড়ি। পুলিশের ব্যাপারে কিছু বলা যায় না। এদিকে আকাশে মেঘ ঘনিয়েছে। ঝড়বৃষ্টি হলেই কেলেঙ্কারি।

পিচের রাস্তায় পৌঁছেছি, সে সময় আচমকা মেঘ ডাকল। তারপর সূর্য ঢেকে গেল চাপ-চাপ কালো মেঘের তলায়। ছোটমামা বললেন,—এই সেরেছে। সত্যিই কালবোশেখির ঝড়বৃষ্টি আসছে যে! শিগগির চল, কোথাও গিয়ে মাথা বাঁচাই।

রাস্তার ওধারে গাছপালার ভেতরে একটা একতলা দালানবাড়ি দেখা যাচ্ছিল। পলেস্তরা খসে যাওয়া জরাজীর্ণ বাড়ি। কার্নিশে অশত্থচারা। সেই বাড়ির বাইরের বারান্দায় উঠে গেলাম দুজনে। সেইসময় ঝড়টা এসে পড়ল। আর সঙ্গে চড়বড় করে বৃষ্টিও।

দুজনে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালুম। বারান্দায় বৃষ্টির ছাঁট আর ঝড়ে ছেঁড়া সবুজ পাতার কুচি এসে পড়েছিল। ছোটমামা আপনমনে বললেন,—পুলিশ না এলে আমার ধারণা, মারামারিটা এখনও চলত।

বললুম,—ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও?

ছোটমামা আগের মতো বললেন,—কিছু বলা যায় না।

বারান্দাটা পশ্চিমদিকে। তাই বৃষ্টির ছাট আমাদের পা ভিজিয়ে দিচ্ছিল। এদিকে বারবার চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ আর মেঘের গর্জন। ছোটমামা দরজায় কড়া নাড়লেন এবার। কিছুক্ষণ কড়া নাড়া-ডাকাডাকির পর দরজাটা খুলে গেল। একজন বেঁটেখাটো নাদুসনুদুস ভদ্রলোককে দেখা গেল। তিনি আমাদের দেখে অমায়িক হেসে বললেন,—ইস! বড় ভিজেছেন দেখছি। আসুন, আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

ঘরের ভেতরে আবছা আঁধার। কেমন একটা পুরোনো-পুরোনো গন্ধও টের পেলাম। নড়বড়ে কয়েকটা চেয়ার, একটা টেবিল এবং একপাশে একটা তক্তপোশ। আমরা চেয়ারে বসলুম। ভদ্রলোক তক্তপোশে। তক্তাপোশটা মচমচ করে উঠল। বললেন,—নিশ্চয় ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন?

ছোটমামা বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মারামারি হয়নি আজ?

—ভীষণ মারামারি। যে যাকে সামনে পাচ্ছে পেটাচ্ছে।

ভদ্রলোক হাসতে-হাসতে বললেন,—তা তো পেটাবেই। তা না হলে ফুটবল ম্যাচ কীসে? বছর দুই আগে কেকরাডিহি আর ঘুঘুডাঙার ম্যাচে খুব মারামারি বেধে গেল। আমি তো একজনকে পেটাতে শুরু করলুম।

—বলেন কী!

—শুনুন না। যাকে পেটাচ্ছিলুম সে হঠাৎ সামনে একখানা থান ইট পেয়ে গেল। তারপর সেই ইট আমার মাথায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমি অক্কা পেলুম!

ছোটমামা আরও অবাক হয়েবললেন,—অক্কা মানে?

ভদ্রলোক আরও হেসে-হেসে বললেন,—অক্কা বোঝেন না? টেঁসে গেলুম

—টেঁসে গেলেন মানে?

—ধুর মশাই! তা-ও বোঝেন না? এই ছেলেটা যে ভয় পাবে, নইলে খোলাখুলি বলতুম। যাকগে! ঝড়বৃষ্টি দারুণ জমেছে! —বলে ভদ্রলোক দরজার বাইরে বৃষ্টি দেখতে থাকলেন। ছোটমামা আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন,—মশাইয়ের নামটা জানতে পারি?

—ঈশ্বর গোলোকপতি ঢোল।

—ঈশ্বর মানে?

গোলোকপতিবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,—খালি এর মানে ওর মানে! নামের গোড়ায় চন্দ্রবিন্দু দিলে কী হয়?

ছোটমামা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—মরা মানুষের নামের গোড়ায় চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হয়। কিন্তু আপনি তো দেখছি জ্যান্ত মানুষ।

গোলোকপতি জোরে মাথা নেড়ে সহাস্যে বললেন,—ওই যে মাথায় ইট বলছিলুম। এক ইটেই ভবনদীর পার। বুঝলেন এবার?

ছোটমামা চটে গেল,—আপনি বলতে চাইছেন যে আপনি জ্যান্ত মানুষ নন?

—ঠিক ধরেছেন, সেন্ট পারসেন্ট ঠিক।

ছোটমামা আরও চটে গিয়ে বললেন,—তার মানে আপনি ভূত?

গোলোকপতি হঠাৎ খাপ্পা হয়ে বললে,—যা-তা বলবেন না! কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বললে তাদের রাগ হয় না? আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে।

—কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত!

—আবার ভূত বলছেন? তার সঙ্গে বিচ্ছিরি একটা অদ্!

এবার আমার বুক টিপটিপ করছিল। বললুম,—ছোটমামা, বৃষ্টি কমেছে মনে হচ্ছে। চলুন এবার।

ছোটমামা ধমক দিয়ে বললেন,—চুপচাপ বসে থাক। এর একটা বিহিত না করে যাওয়া যায় না! ও মশাই, প্রমাণ করতে পারেন যে আপনি ভূত?

আবার ভূত বলা হচ্ছে? তবে রে!—বলে গোলোকপতি মুখখানা ভয়ঙ্কর করে ফেললেন। তারপর দাঁত কড়মড় করতে থাকলেন।

আমি আতঙ্কে চোখ বন্ধ করলুম। তারপর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে চোখ খুলে দেখি, ছোটমামাও নিজের মুখখানা ভয়ঙ্কর করে চোখ কটমটিয়ে এবং দাঁত কড়মড় করে গোলোকপতির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন। গোলোকপতি একের পর এক সাংঘাতিক মুখভঙ্গি করছেন। ছোটমামাও পাল্টা তা-ই করছেন। দুজনে দুজনকে ভয় দেখানোর লড়াই বেধে গেছে।

তারপর দেখি, গোলোকপতি উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত বাড়িয়ে সাংঘাতিক জান্তব গর্জন শুরু করলেন। ছোটমামাও উঠে দাঁড়িয়ে ঘ্যাও-ঘ্যাঁও শব্দ করে বললেন,—চোঁখ উঁপড়ে নেঁব।

গোলোকপতি বললেন,—ঘাঁড় মঁটকে দেঁব।

তারপর দুজনে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দে কোথাও বাজ পড়ল। ঘরের ভেতর ততক্ষণে আরও আঁধার জমেছে। তক্তপোশ, টেবিল, চেয়ার মড়মড় করার শব্দ শুনে ছিটকে দরজার বাইরে চলে গেলুম। চেঁচিয়ে উঠলুম,—ছোটমামা! ছোটমামা! কোনও সাড়া পেলাম না।

ঘরের ভেতর দুমদাম সমানে চলছে। সেই সঙ্গে ফোঁস ফোঁস ঘোঁত ঘোঁত আঃ উঃ এইসব চাপা শব্দ। কিছুক্ষণ পরে শব্দগুলো থেমে গেল। তারপর ছোটমামার সাড়া পেলুম,—পুঁটু! ও পুঁটু!

কাঁদ-কাঁদ গলায় বললুম,—এই তো এখানে।

ছোটমামা দরজার কাছে এসে বললেন,—ভয় পেয়েছিস নাকি? ভূতকে কক্ষনও ভয় পাবিনে। ভয় পেলেই ওদের সুবিধে, বুঝলি তো? ভূত যদি ভয় দেখায়, তুইও পাল্টা ভয় দেখাবি।

—লোকটা মরে যায়নি তো ছোটমামা?

লোকটা কী বলছিস! ঈশ্বর গোলোকপতি বল—ছোটমামা হাসতে-হাসতে বললেন, বাছাধনকে মেঝেয় শুইয়ে দিয়েছি। কত ভূত দেখলুম তো এই বাঁটকুল ভূত। বুঝলি পুঁটু? গোব্দা-গোব্দা হওয়ার বিপদ এই।

এই সময় বাইরে থেকে আমাদের ওপর টর্চের আলো পড়ল। কেউ বলল,—কারা ওখানে?

ছোটমামা সাড়া দিয়ে বললেন,—আমরা পাশের গ্রামে থাকি। ফুটবল ম্যাচ দেখতে এসে বিপদে পড়েছি।

টর্চ হাতে এবং ছাতি মাথায় একটা লোক এসে বারান্দায় উঠল। ঠিক গোলোকপতির মতোই বেঁটে গাব্দাগোব্দা। সে বলল, এ কি! আমার ঘরের দরজা খুলল কে? তারপর ভেতরে আলো ফেলে খাপ্পা হয়ে গেল। এসব ভাঙচুর করল কে? —বলে আমাদের দিকে প্রায়ই তেড়ে এল।

ছোটমামা ঝটপট বললেন,—ভাঙচুর করেছেন ঈশ্বর গোলোকপতি ঢোল।

—ঈশ্বর গোলোকপতি ঢোল মানে। অদ্ভুত কথা বলছেন তো! আমি গোলোকপতি ঢোল দিব্যি বেঁচেবর্তে আছি। আর আমাকে ভূত করে দিচ্ছেন?

ছোটমামা খুব অবাক হয়ে বললেন,—কী আশ্চর্য! তাহলে ওই ভদ্রলোক কে? অবিকল আপনার মতো দেখতে। দরজার খুলে আমাদের ভেতরে ডাকলেন। তারপর—

শাট আপ! চালাকি হচ্ছে? —বলে সে হেঁড়ে গলায় ডাকতে লাগল, দারোগাবাবু! দারোগাবাবু! চোর! চোর!

পিচের রাস্তার দিক থেকে সাড়া এল,—যাচ্ছি-ই-ই! ধরে থাকুন!

ছোটমামা ঝটপট বললেন,—চলে আয় পুঁটু! তারপর বারান্দা থেকে লাফ দিলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলুম। বৃষ্টি কমে গেছে। পেছনে চ্যাঁচামেচি আর টর্চের আলো। জল-কাদায় দৌড়ুতে গিয়ে আছাড় খেলুম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছোটমামাকে আর দেখতে পেলুম না। ডাকতে থাকলুম,—ছোটমামা! ছোটমামা!

ছোটমামার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু আকাশ

কালো হয়ে আছে মেঘে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। খুব শিগগির সন্ধ্যা এসে গেছে। আবছা আঁধার ক্রমে ঘন হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের পথ চিনে ফিরব কেমন করে, সেই ভাবনায় গলা শুকিয়ে গেল। মরিয়া হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আবার ডাকলুম,—ছোটমামা! ছোটমামা!

এবার কাছাকাছি কোথাও চাপাস্বরে সাড়া পাওয়া গেল,—চলে আয় পুঁটু।

সহসা আওয়াজ ফিরে পেয়ে বললুম,—আপনি কোথায়?

—এই গাছের ডগায়।

অবাক হয়ে বললুম,—গাছে কী করছেন?

—চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? তুইও উঠে আয়। পুলিশের দারোগা আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

সামনে একটা গাছ। তার ডগা থেকে ছোটমামার চাপাগলার কথা শোনা যাচ্ছিল। গাছটার কাছে গিয়ে বললুম,—ছোটমামা। আমি উঠব কেমন করে?

—এই ঠ্যাং ঝুলিয়ে দিলুম। দুহাতে চেপে ধর। আমি তোকে টেনে তুলব।

গাছের তলায় অন্ধকারটা বেশি। কিছু দেখা যাচ্ছে না। হাত বাড়িয়ে ছোটমামার ঠ্যাং খুঁজতে-খুঁজতে কী একটা হাতে ঠেকল। ওপর থেকে ছোটমামা বললেন,—চেপে ধর! ছাড়িস না যেন। ছেড়ে দিলে আছাড় খেয়ে হাড়গোড় ভাঙা দ হয়ে যাবি কিন্তু।

ঠ্যাংটা দু-হাতে চেপে ধরতেই মনে হল ভীষণ ঠান্ডা হিম বরফের জিনিস। হাত কনকন করে উঠল ঠান্ডার চোটে। সঙ্গে-সঙ্গে ছেড়ে দিলুম। ছোটমামা বললেন,—কী হল?

—আপনার পা অত ঠান্ডা কেন ছোটমামা?

—খালি কথা বানায়! ওই দ্যাখ টর্চ জ্বালিয়ে দারোগাবাবু আসছেন।

কিছু দূরে টর্চের আলো দেখতে পেলাম। জ্বলছে আর নিভছে। এদিকেই এগিয়ে আসছে লোকটা। ওপর থেকে ছোটমামা ঠান্ডা হিম ঠ্যাংটা বার-বার আমার নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দিচ্ছেন, আর ঠান্ডার চোটে আমি সরে আসছি। এতক্ষণে টর্চের আলো গাছতলায় এসে পড়ল। তারপর সেই আলোয় যা দেখলুম বুক ধড়াস করে উঠল। ছোটমামার ঠ্যাংটা মস্ত লম্বা এবং তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার, ঠ্যাংটা একটা কঙ্কালের।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলুম,—দারোগাবাবু! দারোগাবাবু!

টর্চ হাতে লোকটা বলল,—কী হল খোকা? দারোগাবাবু-দারোগাবাবু করে চেঁচাচ্ছ কেন?

লোকটা কাছাকাছি এলে বললুম,—আমার ছোটমামা সেজে এই গাছে কে যেন বসে আছে।

সে টর্চের আলোয় গাছের ওপরটা তন্নতন্ন করে দেখে বলল,—কই খোকা? কেউ তো নেই। তুমি মিছিমিছি ভয় পেয়েছ। তোমার বাড়ি কোথায়?

কাঁদ-কাঁদ মুখে বললুম,—পলাশপুর।

—চলো, আমি পলাশপুরেই যাচ্ছি।

লোকটা দারোগাবাবু নয়। কাজেই তার সঙ্গে হাঁটতে থাকলুম। একটু পরে আবার ছোটমামার সাড়া পেলুম। পুঁটু! পুঁটু! —বলে ডাকাডাকি করছেন।

টর্চের আলোয় ছোটমামাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। লোকটা বলল,—কী রকম লোক মশাই আপনি? ভাগ্নেকে ওই ভুতুড়ে জায়গায় ফেলে এসেছিলেন?

ছোটমামা বললেন,—কী রে? ভয় পেয়েছিলি নাকি?

—পাব না? একটা কঙ্কালের ঠ্যাং ঝুলিয়ে কেউ আমাকে গাছে তোলার চেষ্টা করছিল। অবিকল আপনার মতো গলায় কথা বলছিল।

ছোটমামা খাপ্পা হয়ে বললেন,—তবে রে! আয় তো দেখি সে কোন ব্যাটাচ্ছেলে?

লোকটা বলল,—খুব হয়েছে মশাই! ভূতের সঙ্গে লড়াই করার সময় পরে অনেক পাবেন। চলে আসুন। খোকাবাবুকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ছোটমামা বললেন,—ঠিক আছে। চল পুঁটু!

গ্রামে ঢুকে লোকটা বলল,—বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেব নাকি?

ছোটমামা বললেন,—না০না। এবার আমরা যেতে পারব। আপনাকে পেয়ে খুব সুবিধে হল। দিব্যি পথ চলে আসা গেল। তা মশাইয়ের বাড়ি?

—ঝাঁপুইতলা।

—নাম?

—ঈশ্বর গোলোকপতি ঢোল।

শোনামাত্র ছোটমামা চেঁচিয়ে উঠলেন,—পুঁটু! এ যে দেখছি, তিন নম্বর ভূ-ভূ-ভূ-ভয়ে দীর্ঘ উ ত।

তারপর দৌড়তে থাকলেন। আমিও দৌড়তে থাকলুম। তবে এবার রাস্তা ভুল হওয়ার কারণ নেই।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ঘুরে দেখি, আলোটা নেই এবং কুকুরগুলো প্রচণ্ড চ্যাঁচামেচি করছে। ব্যাপারটা সত্যি গোলমেলে।...

জ্যোৎস্নারাতে আপদ-বিপদ

ছোটমামার সঙ্গে পাশের গ্রামে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলুম। যাত্রার আসর যখন ভাঙল তখন অনেক রাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। ছোটমামা বললেন,—এত রাতে আর বাস পাওয়া যাবে না। আয়, বরং হাঁটাপথে শর্টকাট করি।

পিচের রাস্তা থেকে ছোটমামার পিছন-পিছন মাঠে নেমে বললুম,—পথ কোথায় ছোটমামা? আপনি যে হাঁটাপথ বলছেন?

ছোটমামা সবে গুনগুন করে কী গান ধরেছিলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন,—

দিলি তো মুডটা নষ্ট করে! হাঁটাপথ বুঝিসনে? যেখান দিয়ে তুই হাঁটবি, সেটাই হাঁটাপথ। চুপচাপ চলে আয়।

নির্জন মাঠে হু-হু করে বাতাস বইছে। এদিকে-ওদিকে দু-একটা গাছ কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শনশন শব্দে ডালপালা দুলছে। ছোটমামার গানের মুডটা ফিরে এসেছে। এবার গলা ছেড়ে গান ধরেছেন। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সুরটা চেনা ঠেকছিল। ছোটমামা তাহলে যাত্রার আসরে শোনা বিবেকের গানই গাইছেন। একটু পরে আমরা একটা দিঘির পাড়ে পৌঁছলুম! অনেকগুলো তালগাছ সেখানে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাতাগুলো অদ্ভুত শব্দে নড়ছে। হঠাৎ কে ধমক দিয়ে বলে উঠল,—কী হে ছোকরা, আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে?

কেমন খ্যানখেনে গলার স্বর। ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন,—অদ্ভুত তো! ঘর ছেড়ে দিঘির পাড়ে ঘুমোতে এসেছ। কে হে তুমি?

—আবার তুমি বলা হচ্ছে? ভারি বেয়াদপ ছোকরা দেখছি।

ছোটমামা একটু ভড়কে গিয়ে বললেন,—আপনি কোথায় ঘুমোচ্ছেন?

—তালগাছের ডগায়।

এতক্ষণে টের পেলুম, সামনে একটা তালগাছের মাথা থেকে কেউ কথা বলছে। ছোটমামা হাসতে-হাসতে বললেন,—তালগাছের ডগা কি ঘুমোনোর জায়গা? ঘুম পেলে বাড়ি গিয়ে ঘুমোন।

—এটাই তো আমার বাড়ি।

—তার মানে?

—মানে আবার কী? যাও, বিরক্ত কোরো না। আবার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

বিকট হাই তোলার শব্দ শোনা গেল। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ছোটমামা গোঁ ধরে বললেন,—এর একটা এসপার-ওসপার না করে যাব না। তালগাছের ডগায় কেউ ঘুমোতে আসে বলে তো শুনিনি। গাছের তলায় অবশ্যি অনেক মানুষকে ঘুমোতে দেখেছি। ও মশাই, শুনছেন?

—জ্বালাতন! শোনো হে ছোকরা, এখনই কেটে না পড়লে বিপদ হবে বলে দিচ্ছি।

ছোটমামার হাত ধরে টেনে বললুম,—আমার বড্ড ভয় করছে। চলুন ছোটমামা।

ছোটমামা রেগে গিয়ে বললেন,—তুই বড্ড ভিতু ছেলে দেখছি। ব্যাপারটা তোর গোলমেলে মনে হচ্ছে না? তালগাছের ডগায় কেউ ঘুমোতে আসে! লোকটা নিশ্চয় চোর। পুলিশের ভয়ে ওখানে লুকিয়ে আছে।

এবার ওপর থেকে হুঙ্কার শোনা গেল,—কী বললে! কী বললে? আমি চোর? আমি পুলিশের দারোগা বংকুবিহারী ধাড়া। আমাকে চোর বলা হচ্ছে? রোসো, দেখাচ্ছি মজা।

তালগাছের ডগায় পাতাগুলো প্রচণ্ড নড়তে লাগল। এবার ছোটমামা হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন। চাপাস্বরে বললেন,—দরকার হলে দৌড়ুতে হবে। রেডি হয়ে থাক।

দৌড়নোর দরকার হল না। বংকুবিহারী ধাড়ার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না আর। কিছুটা চলার পর ছোটমামা বললেন,—ব্যাপারটা বড্ড রহস্যজনক। বুঝলি পুঁটু? আমার ধারণা, দারোগাবাবু কোনও চোরকে ধরার জন্যে ওখানে লুকিয়ে আছেন।

ছোটমামার কথা শেষ হওয়ামাত্র কে চাপাস্বরে বলে উঠল,—কোথায় লুকিয়ে আছেন দারোগাবাবু?

চমকে উঠে দেখি, সামনে একটু তফাতে কেউ সদ্য উঠে দাঁড়াল। জ্যোৎস্নায় চেহারাটা আবছা কালো। ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন,—কে, কে?

—আজ্ঞে আমি।

—আমি মানে কী? তোমার নাম?

—নাম শুনে কী হবে? দারোগাবাবু কোথায় লুকিয়ে আছেন বলুন।

ছোটমামা কিছু বলার আগে আমি বলে দিলুম,—দিঘির পাড়ে একটা তালগাছের ডগায়।

অমনি ছায়া-কালো লোকটা বলে উঠল,—ওরে বাবা! আমি তো ওখানেই ঘুমোতে যাচ্ছিলুম। সর্বনাশ!

বলেই সে উধাও হয়ে গেল। ছোটমামা হেসে ফেললেন,—এই লোকটাই চোর। বুঝলি তো পুঁটু? একে ধরার জন্যই দারোগাবাবু ওখানে ওত পেতেছেন।

বললুম,—কিন্তু উনি তো ঘুমোচ্ছেন বললেন! নিজের বাড়িও বললেন!

—ধুর বোকা! পুলিশের কথা ওইরকমই। আসল কথাটা বললে চলে? চোর সাবধান হয়ে যাবে না?

—কিন্তু শেষপর্যন্ত চোর সাবধান হয়ে গেল তো!

ছোটমামা গুম হয়ে বললেন,—আমার কী দোষ? চোর যে এখানে লুকিয়ে আছে, জানতুম নাকি?

আবার দুজনে হাঁটতে থাকলুম। ছোটমামার গানের মুডটা চলে গেছে মনে হচ্ছিল। চুপচাপ হাঁটছেন আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। বরাবর দেখেছি, ছোটমামার সঙ্গে রাতবিরেতে বেরোলে বড্ড গোলমেলে কাণ্ড হয়। আমার গা ছমছম করছিল। ছোটমামাকে এদিক-ওদিক তাকাতে এবং কখনও হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে কান ধরে কিছু শুনতে দেখছিলুম। তারপর বললেন,—শোন পুঁটু! কথাটা মনে আছে তো? দরকার হলে দৌড়নোর জন্য রেডি থাকতে হবে।

ভয়ে-ভয়ে বললুম,—আবার দৌড়তে হবে কেন ছোটমামা?

—কিছু বলা যায় না! সামনে কালোমতো যে গাছটা দেখছিস, ওটা জটাবাবার থান। একবার এমনি রাত্তিরে জটাবাবার পাল্লায় পড়েছিলুম। ওঃ! সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড।

আরও ভয় পেয়ে বললুম,—তাহলে ওখান দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না ছোটমামা।

ছোটমামা পা বাড়িয়ে বললেন,—আয় না দেখি কী হয়। সেবার আমি একা ছিলুম। এবার দুজনে আছি। জটাবাবা আমাদের ঘাঁটাতে সাহস পাবে না!

—জটাবাবা কে ছোটমামা?

—একটা বুড়োমতো লোক। মাথায় প্রচুর জটা।

—সে ওখানে কী করে?

—বললুম না ওখানে ওর থান আছে? দিনের বেলা লোকেরা এসে ওখানে মানত করে। ঢাকঢোল বাজিয়ে জটাবাবার পুজোও দেয়। তবে দিনের বেলা জটাবাবা কাকেও দেখা দেয় না।

—দিনের বেলা জটাবাবা কোথায় থাকে?

ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন,—চুপচাপ আয় তো, জটাবাবা শুনতে পেলে কেলেঙ্কারি।

গাছটা প্রকাণ্ড। তলায় ঘন ছায়া। বাতাসে ডালপালা কেমন অদ্ভুত শব্দ করছিল। ছোটমামা আবার একটুখানি দাঁড়িয়ে গাছটাকে দেখে নিলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন,—রেডি স্টেডি, গো-ও!

ছোটমামার পিছন-পিছন গাছটার তলায় যেই গেছি, আমার মাথায় কী একটা ঠেকল। চমকে উঠে হাত তুলে দেখি, একটা পা। বারণ ভুলে চেঁচিয়ে উঠলুম,—ছোটমামা! ছোটমামা!

—ধ্যাত্তেরি! চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? বললুম চুপচাপ চলে আয়।

—একটা পা বড্ড ঠান্ডা, ছোটমামা!

—চলে আয় না হতভাগা!

আমাকে যেতে দিচ্ছে না যে? —কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললুম। বরফের মতো ঠান্ডা একটা পা আমার গলা আঁকড়ে ধরে আছে। দু-হাতে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিলুম। দম আটকে যাচ্ছিল।

ছোটমামা কাছে এসে বললেন,—কই, কোথায় পা?

—আমার গলায়।

ছোটমামা সেই ঠান্ডা ঝুলন্ত পা ধরে টানাটানি শুরু করলেন। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। খুব জোরে পায়ে চিমটি কেটে দিলুম। অমনি পা-টা গলা থেকে সড়ে গেল আর কে ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠল,—উহুহুহু! গেছি, গেছি! কী বিচ্চু ছেলে রে বাবা!

আমিও সাহস পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম,—ছোটমামা! টানুন! দুজনে টেনে নামাই জটাবাবাকে।

ছোটমামাও ততক্ষণে সাহসী হয়ে উঠেছেন। দুজনে ঠান্ডা পা ধরে টানতে থাকলুম। জটাবাবা ঠ্যাং ঝুলিয়ে ডালে বসে থাকার বিপদ টের পেল এতক্ষণে! কাকুতিমিনতি করে বলতে থাকল,—ঘাট হয়েছে বাবারা! ছেড়ে দে! উহুহুহু, বড্ড ব্যথা করছে রে!

ছোটমামা পা ছেড়ে দিলেন। আমিও ছেড়ে দিলুম। তারপর ছোটমামা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন,—কী জটাবাবা! সেবার তো আমাকে একা পেয়ে খুব ভয় দেখিয়েছিলে? এবার আর ভয় পাচ্ছি না। কই নেমে এসো। দেখি তোমার কত বুজরুকি?

গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে। ওপরের ডালে জটাবাবাকে আবছা দেখা যাচ্ছিল। পায়ে হাত বুলিয়ে 'আহা-উহ' করছে। মাথার প্রকাণ্ড জটা পুঁটুলির মতো দেখাচ্ছে। ছোটমামার চ্যালেঞ্জ শুনে কোনও জবাব দিল না! চিমটিটা খুব জোর হয়ে গেছে—তাহলে।

বললুম,—আমার ঘুম পাচ্ছে। চলুন ছোটমামা!

ছোটমামা বীরদর্পে হাঁটতে থাকলেন। বললেন,—তোর বুদ্ধি আছে পুঁটু! খুব জব্দ হয়ে গেছে জটাবাবা।

—জটাবাবার পা অত ঠান্ডা কেন ছোটমামা?

—ঠান্ডা হবে না? জটাবাবাকে তুই জ্যান্ত মানুষ ভেবেছিস নাকি?

চমকে উঠে বললুম,—জ্যান্ত মানুষ নয়? তা হলে কী?

ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন,—বাড়ি ফিরে বলব'খন। রাত-বিরেতে নিরিবিলি জায়গায় ওসব কথা বলতে নেই।

এবার ছোটমামার মনে সাহস জেগেছে। তাই যাত্রদলের বিবেকের সেই গানটা গাইতে শুরু করলেন। কিছুটা চলার পর হঠাৎ গান থামিয়ে বললেন,—ভুল হয়ে গেছে। বুঝলি পুঁটু?

—কী ভুল ছোটমামা?

ডান দিকে আঙুল তুলে ছোটমামা বললেন,—ভুল করে কঙ্কালিতলায় ঝিলের ধারে এসে পড়েছি। এখানে কোথায় একটা শ্মশান আছে যেন। বড্ড বিপদে পড়া গেল দেখছি।

একটু ভেবে নিয়ে ঝিলের ধারে-ধারে হাঁটতে শুরু করলেন। ঝিলের জল জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে কিছুটা চলার পর কারা কথা বলছে শোনা গেল। ছোটমামা বললেন,—মনে হচ্ছে, জেলেরা ঝিলে মাছ ধরতে এসেছে। আয় তো! ওদের কাছে রাস্তাটা জেনে নিই।

ঝোপঝাড়ের পর একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা ঝুপসিকালো গাছ। তার তলায় কারা বসে চাপাস্বরে কথাবার্তা বলছে! কিন্তু যেই আমরা সেখানে গেছি, লোকগুলো, ওরে বাবা! এরা আবার কারা-বলে চ্যাঁচামেচি করে দৌড়ে উধাও হয়ে গেল।

ছোটমামা বললেন,—যা বাব্বা! আমাদের দেখে ওরা ভয় পেল কেন? আমরা মানুষ না ভূ-ভূত?

গাছটার তলায় গিয়ে দেখি, কে খাটিয়ায় শুয়ে আছে। ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন,—সর্বনাশ! এখানেই তো তাহলে কঙ্কালিতলার শ্মশান। ওরা একটা মড়া পোড়াতে এসেছিল।

মড়াটা দেখে গা ছমছম করছিল। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মুখটা একপাশে কাত হয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছোটমামা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে পা বাড়িয়েছেন, সেই সময় খাটিয়া থেকে মড়াটা বলে উঠল,—চিতা সাজানো হয়েছে?

ছোটমামা বললেন,—ওরে বাবা। এ যে দেখছি জ্যান্ত মড়া! পালিয়ে আয় পুঁটু!

মড়াটা তড়াক করে উঠে বসে বলল,—পালিয়ে যাবেন না, পালিয়ে যাবেন না! একা থাকতে আমার বড্ড ভয় করবে।

পুঁটু! রেডি স্টেডি গো! —বলে ছোটমামা দৌড়তে শুরু করলেন।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছোটমামার পিছনে ছুটতে থাকলুম। কিন্তু বড্ড বিচ্ছিরি ঝোপঝাড়। কোথাও চষা খেতের মাটি গাদা হয়ে আছে! তার ওপর দৌড়নো কঠিন। বারতিনেক আছাড় খেলুম। ছোটমামা একবার থেমে পিছনে তাকিয়ে বললেন,—সর্বনাশ! মড়াটা ছুটে আসছে যে!

মড়াটার আর্তনাদ শুনতে পেলুম,—দাদা! আমাকে ফেলে যাবেন না!

আবার আমাদের দৌড়নো শরু হল। এবার এসে পৌছলুম গাছপালা ঘেরা একটা বাড়ির কাছে! ছোটমামা বললেন,—আবার ভুল হয়ে গেছে রে পুঁটু! অন্য একটা গ্রামে চলে এসেছি মনে হচ্ছে! আয় তো এদের ডাকি!

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর দরজা খুলে কে একজন বলল,—কাকে চাই?

ছোটমামা বললেন,—দেখুন, আমরা বড্ড বিপদে পড়েছি। তাই...

—বিপদটা কী আগে শুনি?

—কঙ্কালিতলার শ্মশানের ওখানে একটা মড়া ছিল। হঠাৎ সে...

লোকটা ঝটপট বলল,—থাকারই কথা। আমাদের ছোটকর্তার মড়া। তা এখনও চিতেয় ওঠেননি বুঝি?

ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন,—আমাদের ফলো করে আসছিলেন ভদ্রলোক। বলছিলেন শ্মশানে ওঁর একা থাকতে বড্ড ভয় করবে।

—মলোচ্ছাই! আমাদের লোকগুলো কোথায় গেল? তারা ছিল না?

—ছিল তো! হঠাৎ ওখানে দেখে ওরা কেন যে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল!

লোকটা খি-খি করে হেসে বলল,—তা ভয় পাওয়ারই কথা। রাতবিরেতে কাকেও চেনা কঠিন। এই তো আপনাদের দেখেও আমি দিব্যি ভয় পাচ্ছি।

ছোটমামা জোরে হাত নেড়ে বললেন,—আমরা মানুষ! মানুষ! আমাদের ভয় পাবেন কেন?

—কিছু বলা যায় না মশাই! দিনকাল যা পড়েছে। কে জানে কে কোন রূপ ধরে ঘোরে।

ছোটমামা তার দিকে এক পা এগিয়ে বললেন,—আপনি আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন। আমরা মানুষ। এই ছেলেটা আমার ভাগ্নে। আমি ওর মামা। আমরা যাত্রা দেখে বাড়ি ফিরছিলাম। রাস্তা ভুল করে এই অবস্থা। এই নিন, আমার হাতটা ঠান্ডা না গরম দেখুন। আমরা ভূত হলে হাতটা বরফের মতো ঠান্ডা হবে।

ছোটমামা হাত বাড়িয়ে আর এক পা এগোতেই লোকটা চেঁচিয়ে উঠল,—হাত সরান! হাত সরান! ওরে বাবা! হাত বাড়িয়ে ঘাড়টি ধরে মটকাবার মতলব? বড়কর্তা? বড়কর্তা! একবার আসুন তো!

হেঁড়ে গলায় বাড়ির ভেতর থেকে কেউ বলল,—কী হল রে ভূতু?

লোকটা বলল,—কারা এসে গণ্ডগোল বাধাচ্ছে।

—দরজা বন্ধ করে দে।

আমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ছোটমামা বললেন,—কোনও মানে হয়?

বললুম,—চলুন ছোটমামা! অন্য কোনও বাড়ির লোক ডেকে জিগ্যেস করে নিই।

দুজনে হাঁটতে থাকলুম। আশেপাশের আর কোনও বাড়ি নেই। ঝোপজঙ্গলে আর উঁচু-নিচু সব গাছ বাতাসে দুলছে। একটু পরে আর একটা বাড়ি দেখতে পেলুম। ছোটমামার ডাকাডাকিতে বাড়ির ভেতর থেকে কে ঘুমজড়ানো গলার সাড়া দিল,—কী হয়েছে?

ছোটমামা বললেন,—দয়া করে একটু বাইরে আসবেন?

—না বাইরে যাওয়ার সময় নেই। আমি ঘুমুচ্ছি।

ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন,—কোথায় ঘুমুচ্ছেন? এই তো দিব্যি কথা বলছেন।

—ঘুমুতে-ঘুমুতে কথা বলা আমার অভ্যাস।

—কী অদ্ভুত! আচ্ছা, ঠিক আছে। ঘুমুতে-ঘুমুতে বলুন, আমরা কনকপুর যাব কোন রাস্তায়?

—কনকপুর? সে আবার কোথায়?

—কনকপুর চেনেন না? বাসরাস্তার ধারে অত বড় গ্রাম।

—বাসরাস্তার ধারে তো কত বড়-বড় গ্রাম আছে।

ছোটমামা হতাশ ভঙ্গিতে বললেন,—ভারি বিপদে পড়া গেল দেখছি। আচ্ছা, এ গ্রামের নাম কী?

জবাব এল তেমনি ঘুমজড়ানো গলায়,—নাম একটা ছিল যেন। মনে পড়ছে না।

ছোটমামা খাপ্পা হয়ে বললেন,—আপনি দেখছি ভারি অদ্ভুত লোক। নাম ছিল মানে কী!

এবার জোরালো নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল। ছোটমামা খুব রেগে গেছেন। দরজায় দমাদ্দম লাথি মারতে শুরু করলেন। কপাট ভেঙে পড়ল মড়মড় করে। আমার ভয় করছিল ছোটমামার কাণ্ড দেখে। পাশের বাড়ির লোকেরা জেগে গিয়ে হইচই বাধায় যদি? রাতদুপুরে কারও বাড়ির দরজা ভেঙে ঢোকা কি ঠিক হচ্ছে?

কিন্তু ছোটমামা একেবারে মরিয়া। ভেতরে পা বাড়িয়ে বললেন,—আয় পুঁটু! লোকটাকে ঘুম থেকে জাগানো দরকার। ঘুমের ঘোরে মাথামুণ্ডু কী সব বলছে।

ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখলুম, একটা লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার নাক ডাকছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুমুতে পারে মানুষ? উঠোনে সাদা হয়ে জ্যোৎস্না

পড়েছে। লোকটার নাক থেকে ঘড়র-ঘড়র শব্দ হচ্ছে। ছোটমামা তার গায়ে ধাক্কা দিয়েই পিছিয়ে এলেন। বললুম,—কী হল ছোটমামা?

ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন,—ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না, পুঁটু। লোকটার গা বরফের মতো ঠান্ডা!

আঁতকে উঠে বললুম,—চলে আসুন ছোটমামা!

ছোটমামা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে রে। বরং এক কাজ করি আয়। ওই বারান্দায় দুজনে শুয়ে পড়ি। ভোরবেলা নিশ্চয় মানুষজনের দেখা পাব। তখন জিগ্যেস করে নেব।

উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে একজন ঘুমন্ত লোক, যার গা নাকি বরফের মতো ঠান্ডা এবং এই বাড়িটাও তার। এখানে ঘুমনো কি ঠিক হবে? কিন্তু ছোটমামা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন বারান্দায়। তারপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমারও খুব ঘুম পাচ্ছিল। শুয়ে পড়লুম শানবাঁধানো বারান্দায়। দুজনেই ক্লান্ত।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

ঘুম ভাঙল ছোটমামার ডাকাডাকিতে। চোখ খুলে উঠে বসলুম। তারপর খুব অবাক হয়ে গেলুম। এ কোথায় শুয়েছিলুম আমরা? ভোরের আলোয় সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা বটগাছের তলায় শুকনো ন্যাড়া মাটিতে মামা-ভাগ্নে খুব ঘুমিয়েছি। কোথাও ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। শুধু জঙ্গল।

ছোটমামা বললেন,—হাঁ করে কী দেখছিস? রাতবিরেতে বেরুলে একটু গণ্ডগোল হয়েই থাকে। চল, বাড়ি ফিরি।

হাঁটতে-হাঁটতে বললুম,—রাস্তা চিনতে পারবেন তো ছোটমামা?

ছোটমামা করুণ হেসে বললেন,—দিনের বেলা আর ভুল হবে না। আমরা কোথায় চলে এসেছিলুম জানিস? কঙ্কালিতলার জঙ্গলে। প্রবলেম হল। রাতবিরেতে কিছু চেনা যায় না। চেনা জায়গাও অচেনা হয়ে যায়।

চোর-পুলিশ

এ যেন সুকুমার রায়ের ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল, সেইরকম। ছিল তাল গাছ, হয়ে গেল বেড়াল। দুঁদে দারোগা বঙ্কুবাবু তো তাজ্জব। শুধু তাজ্জব নন, রীতিমতো হতবাক। থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন কেষ্টনগরের পুতুলটি হয়ে।

আসছিলেন কেকরাডিহি থেকে একটা তদন্ত সেরে। দুদিন আগে সেখানে দুদলে খুব মারপিট-রক্তারক্তি হয়ে গেছে। তদন্ত সারতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গের দুজন বন্দুকধারী সেপাইকে সেখানকার শান্তিরক্ষার ভার দিয়ে বঙ্কুবাবু সাইকেলে চেপে একা থানায় ফিরছিলেন। কেকরাডিহির বিশাল মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছে চাঁদ উঠেছিল। কাঁচা

রাস্তায় বড্ড ধুলো। তাই আস্তে সাইকেল চালিয়ে আসছিলেন আর অভ্যাসবশত গুনগুন করে গানও গাইছিলেন। তারপর সামনে দেখলেন একটা বাজপড়া মুন্ডুহীন ঢ্যাঙা তালগাছ। সেই সময় হঠাৎ মনে পড়ছিল, আসার পথে তো এমন কোনও তালগাছ দেখেননি! সেজন্যই একটু অবাক হয়ে সাইকেলে ব্রেক কষেছিলেন। তারপর এই অদ্ভুত ঘটনা।

তাঁর চোখের সামনে জ্যোৎস্নারাতে ওই উটকো তালগাছটা হঠাৎ খাটো হতে-হতে বেঁটে হতে-হতে মাটির ভেতর যেন সেঁধিয়ে যাচ্ছে। টর্চ আছে সঙ্গে। ঝটপট জ্বেলে দেখলেন। তালগাছটার জায়গায় একটা কালো বেড়াল নীল জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে তাঁকে দেখছে।

পুলিশকে ভূতের ভয় করতে নেই। তাছাড়া ওটা ভূত কি না সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। বঙ্কুবাবু সেজন্যেই খুব রেগে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন,—তবে রে!

কালো বেড়ালটা তবু গ্রাহ্য করল না। তার চেয়ে বিচ্ছিরি ব্যাপার, টর্চটাও গেল বিগড়ে। সুইচ টেপাটেপি করে আলো জ্বলল না! তখন সাইকেল থেকে নেমে বঙ্কুবাবু সাইকেলটা দাঁড়ি করিয়ে রেখে পিস্তল বের করলেন, পিস্তল তাক করে ট্রিগারও টানলেন। গুলি বেরুল! বিকট ফটাস আওয়াজও হল। কিন্তু বেড়ালটার গায়ে গুলি বিঁধল না। তখন আরও খাপ্পা হয়ে ফের গুলি ছুড়তে থাকলেন। পিস্তলটাতে আরেকটা গুলি। সাতটা গুলি খরচ হয়েছে, এমন সময় যেটা ছিল বেড়াল, সেটা হয়ে গেল একটা মানুষ। তারপর সেই মানুষটা খি-খি করে খুব হেসে বলে উঠল,—খামোকা গুলি খরচ করে কী লাভ দারোগাবাবু?

বঙ্কুদারোগা মানুষের কথা শুনে ভড়কে গেলেন বটে, কিন্তু মুখে সাহস করে গর্জে উঠলেন,—তুই কোন ব্যাটা রে?

—আজ্ঞে, আমি সেই পাঁচু।

বঙ্কুবাবু এতক্ষণে সঠিকভাবে বুঝতে পারলেন, তিনি ভূতের পাল্লায় পড়েছেন। তালগাছের বেড়াল হয়ে যাওয়া চোখের ভুল হতেও পারে, কিন্তু মানুষ হয়ে পাঁচুতে রূপ নেওয়াটা তো আর চোখের ভুল বলা যাবে না। তার ওপর কথাও বলছে। তার চেয়ে বড় কথা, এই পাঁচু ছিল ধড়িবাজ এক সিঁদেল চোর। সম্প্রতি রোগে ভুগে সে মারা পড়েছিল। তার সঙ্গে কেকরাডিহির মাঠে রাতবিরেতে দেখা হওয়াটা সহজ ব্যাপার নয়। বঙ্কু দারোগা মনে-মনে ঠিক করলেন, এসব ক্ষেত্রে আপস করাই ভালো। তাই তিনিও খিক-খিক করে হেসে বললেন,—তুই তাহলে পাঁচু? তা এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস তুই?

পাঁচু-চোরের ভূত অবাক হয়ে বলল,—আমাকে আপনার ভয় করছে না দারোগাবাবু?

—একটুও না। চোরকে পুলিশ কখনও ভয় করে? ভয় করলে পুলিশের চাকরি থাকে রে?

—কিন্তু ভূতকে? আমি যে মরে ভূত হয়েছি, দারোগাবাবু।

—মরলে লোকে ভূত হয়, এ আবার নতুন কথা কী? আমি মরলে আমিও ভূত হব। —বঙ্কুদারোগা খুব হেসে বললেন, তুই তো তালগাছ হয়েছিলি, তারপর বেড়াল হলি, শেষে ফের পাঁচু হয়ে গেলি। আর আমি হলে কী করব জানিস?

পাঁচুর ভূত আগ্রহ দেখিয়ে বলল,—কী করবেন শুনি?

বঙ্কুবাবু ভরাট গলায় বললেন,—কথায় আছে ঃ স্বভাব যায় না মলে। বুঝলি কিছু?

—আজ্ঞে না।

—তুই একটা হাঁদারাম! আমি সারাজীবন দারোগাগিরি করছি। চোর-ডাকাত ধরা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। আমি যখন মরব, তখন সে স্বভাব যাবে কোথায়? তোর মতো চোরদের ধরব। বেদম পিটুনি দেব। ঠ্যাংদুটো বেঁধে ওপরে ঝুলিয়ে—

কথা শেষ হওয়ার আগেই পাঁচুর ভূত চেঁচিয়ে উঠল, আরে তাই তো! তাই তো! —তারপর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বঙ্কুদারোগা কিছু বুঝতে পারলেন না। বারকতক ওকে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে ধ্যাত্তেরি বলে সাইকেলে চাপলেন। রেগেমেগে এবার জোরে প্যাডেলে চাপ দিলেন। প্রচণ্ড বেগে থানায় ফিরে চললেন।...

পাঁচুর ভূত কেন এমন করে হঠাৎ উধাও হয়েছিল, বুঝতে কয়েকটা দিন দেরি হল বঙ্কুবাবুর। সিঁদেল চোর পাঁচুর মরার পর থেকে এলাকায় চুরিচামারি, বিশেষ করে সিঁদকাটা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই রাতের পর আবার থানার লোকেরা একের পর এক এসে চুরির নালিশ করতে শুরু করল। চুরিগুলোও ভারি অদ্ভুত রকমের। সিঙ্গিমশায়ের জামাই এসেছে বলে থলে ভর্তি বাজার করে ফিরছেন। হঠাৎ থলেতে হ্যাঁচকা টান এবং ঘুরে দেখেন থলেটি শূন্যে ভেসে উধাও হয়ে গেল। বিন্দু -ঝি পুকুরঘাটে বসে থালা-বাসন মাজছে আর পেছনে রাখছে। ধোয়া শেষ করে ঘুরে দেখে বাসনকোসন নেই। এমনকী বঙ্কুবাবুর কোয়ার্টারেই এক রাত্তিরে সিঁদ। বঙ্কুবাবুর বাবা অনিদ্রার রুগি। সিঁদ কেটে চোর যেই পা দুখানা ঘরে ঢুকিয়েছে, সুইচ টিপে আলো জ্বেলে খপ করে পা দুটো ধরে ফেলেছিলেন। লিকলিকে কালো দুটো পা। কিন্তু ধরামাত্র হাত ঠান্ডায় জমে গেল। বাপস বলে ছেড়ে দিলেন। পাদুটোও সিঁদের গর্ত দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল।

এবার বঙ্কুবাবু বুঝলেন কী হচ্ছে। খুব আফসোস হতে লাগল তাঁর। কেন যে বলেছিলেন পাঁচুর ভূতকে, স্বভাব যায় না মলে, ভুলটা সেখানেই হয়েছিল। পাঁচু ছিল চোর। কিন্তু মলেও চোরের চুরির স্বভাব যায় না, পাঁচুর ভূতকে প্রকারান্তরে মনে পড়িয়ে দিয়েছিলেন বঙ্কুদারোগা।

বড় ভাবনায় পড়ে গেলেন। চোর যতক্ষণ মানুষ থাকে, তাকে শায়েস্তা করতে পুলিশ ভূতই দরকার। বঙ্কুবাবু তো পাঁচু-চোরের ভূতকে পাকড়াও করার জন্য মরে যেতে পারবেন না! বালাই ষাট। এ বয়সে তিনি মরবেন কেন? স্বয়ং মহৎ কোনও কাজের জন্য প্রাণ দিয়ে মরা যায়, নেহাত একটা ছিঁচকে চোরের জন্য প্রাণত্যাগ করার মানে হয়?

রোজ এদিকে নালিশে-নালিশে জেরবার। জেলার ওপরওয়ালারাও চুটিয়ে ফলাও করে এই তল্লাটের চুরির খবর ছাপতে শুরু করেছে। সদর থেকে পুলিশ সুপার কড়া চিঠি লিখেছেন। স্থানীয় এম. এল. এ.-মশাইও বারবার এসে শাসিয়ে যাচ্ছেন। গণতন্ত্রের যুগ। গণ দরখাস্ত দিলে বঙ্কুবাবুর চাকরি নিয়েও টানাটানি হতে পারে। বড় ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন বঙ্কুবাবু। আসল সমস্যাটা হল, এসব চুরিচামারি যে ভূতের কীর্তি সেটা তো বিশ্বাস করবে না ওপরওয়ালারা। সংবিধানে 'ভূত' বলে কোনও কথা নেই। কোনও আইনকানুনেও নেই! স্থানীয় লোকের মতে, পাঁচুর কোনও শাগরেদেরই কাজ। কিন্তু সে যে কে তাও কারুর মাথায় আসছে না।

একদিন দুপুরবেলা মনমরা হয়ে থানার পেছন দিকে নিরিবিলি একটা আমতলায় বঙ্কুবাবু দাঁড়িয়ে আছেন, সেইসময় শনশনিয়ে বাতাস উঠল। একটা ঘূর্ণি হাওয়া ধুলোবালি শুকনো পাতা উড়িয়ে গাছটাকে নাড়া দিল। চোখে ধুলো ঢোকার ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলেন বঙ্কুদারোগা। চোখ খুলে হকচকিয়ে গেলেন। সামনে একটু তফাতে আছেন তাঁর বন্ধু করালীমোহন। তিনিও এক দারোগাবাবু। অন্য একটা থানায় ছিলেন বলে জানতেন। বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই দুজনে। বঙ্কুবাবু খুব খুশি হয়ে বললেন,—আরে? করালী যে! তুমি হঠাৎ কোত্থেকে?

করালীমোহন মিটিমিটি হেসে বললেন,—শুনলাম খুব ঝামেলায় পড়েছ চুরিচামারি নিয়ে। তাই ভাবলুম গিয়ে জেনে আসি ব্যাপারটা কী।

বঙ্কুবাবু বললেন,—বলছি। কিন্তু তুমি এখন কোন থানায় আছো? খোঁজখবর পাইনে। সদরে কনফারেন্সে গিয়েও তোমাকে দেখতে পাইনে। নিশ্চয়ই অন্য জেলায় বদলি হয়ে গেছ?

করালীমোহন বললেন,—বদলি হয়েছি, সেটা ঠিক। তবে তোমার প্রবলেমটা আগে শুনি।

বঙ্কুবাবু সংক্ষেপে পাঁচুর ভূতের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে সবটাই বললেন। শোনার পর করালীমোহন হেসে অস্থির,—এই কথা? ঠিক আছে? আমি দেখেছি ব্যাটাকে।

—কী করে দেখবে? ব্যাটা তো মানুষ নয়, ভূত।

করালীমোহন হাতের বেটন নাড়া দিয়ে বললেন,—ভূতকে শায়েস্তা করতে ভূত চাই। বুঝলে তো?

—কিন্তু সেটাই তো সমস্যা। পাচ্ছিটা কোথায়?

—আছে, আছে।

করালীমোহন কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে আবার একটা ঘূর্ণি বাতাস এল মাঠের দিক থেকে। ধুলো ঢোকার ভয়ে চোখ বুঝলেন বঙ্কুবাবু। বাতাসটা চলে গেলে চোখ খুললেন। তারপর অবাক হয়ে গেলেন। করালীমোহন নেই।...

দিন দুই পরে বঙ্কু-দারোগা লক্ষ করলেন, থানায় আর একটাও চুরির নালিশ আসছে না। তারপর একদিন স্বয়ং এম. এল. এ.-মশাইও মিছিল করে এসে তাঁকে

অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। সদর থেকে পুলিশকর্তার প্রশংসার চিঠি এসে গেল। ব্যাপারটা কী?

করালীমোহন কি তাহলে ভূতের রোজা দিয়ে পাঁচুকে শায়েস্তা করে ফেলেছেন? করালীমোহন পাকা লোক বটে। তাঁর চেয়ে আরও দুঁদে দারোগা। তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। নিশ্চয়ই রোজা লাগিয়ে ব্যাটাচ্ছেলেকে টিট করে ফেলেছেন। দুচ্ছাই, কেন যে ভূতের রোজার কথাটা তাঁর মাথায় আসেনি।

তবে করালীমোহনের দৌলতে প্রমোশনের চিঠি পেয়ে গেলেন বঙ্কুবাবু। মফস্বলে শহরে একেবারে এস.ডি.পি.ও.-র পোস্টে প্রমোশন। অবিলম্বে জয়েন করতে হবে। রাত্তিরে জিনিসপত্তর বাঁধাছাদা হয়ে গেছে। ভোরবেলা রওনা দেবেন! আনন্দে ও উত্তেজনায় ঘুম আসছে না চোখে। আনন্দ প্রকাশ করতে নিরিবিলি গুনগুন করে গান গাওয়া অভ্যেস বঙ্কুবাবুর। তাই থানার প্রাঙ্গণ পেরিয়ে খেলার মাঠটাতে গিয়ে দাঁড়ালেন। তেমনি জ্যোৎস্নারাত। বাতাস বইছে। সবে গুনগুনিয়ে রবীন্দ্রসংগীত ধরেছেন, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে...এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন কালো মতো কী একটা সামনে আসছে। গানভঙ্গ হওয়ায় খাপ্পা বঙ্কুবাবু বললেন,—কে রে?

কালো মূর্তিটা দাঁড়িয়ে গেল। বলল,—আমি স্যার!

—আমি কে? কী নাম? বাড়ি কোথায়?

—স্যার, আমি সেই পাঁচু।

বঙ্কুবাবু খি-খি করে হেসে বললেন,—পাঁচু! আয়, আয়! কেমন জব্দ হয়েছিস বল।

পাঁচুর ভূতও পাল্টা হেসে বলল,—জব্দ হয়েছিলুম বটে দিন কতক।

—তার মানে?

—বুঝলেন না? করালী-দারোগার নাতি গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে ফিরে এসেছে। এখন করালীবাবু উদ্ধার হয়ে স্বর্গে চলে গেছেন। আর আমায় ঠেকায় কে? যাচ্ছিলুম হরিবাবুর বাড়ি সিঁদ কাটতে, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভাবলুম খবরটা দিয়েই যাই।

বঙ্কুবাবু চমকে উঠে বললেন,—করালীমোহনের পিণ্ডি! কী বলছিস রে? করালী মারা গিয়েছিল বলেনি তো সেদিন?

কবে মরে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। —পাঁচু-চোর বেজায় হাসতে লাগল। আপনার অবস্থা দেখে আমার পেছনে লেগেছিলেন কিছুদিন। উঃ, খুব ঠেঙিয়েছে। এখনও গা ব্যথা করছে স্যার!

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বঙ্কুবাবু বললেন,—আমার প্রমোশন হয়ে তো বড্ড ভুল হল দেখছি। তুই তো আবার লোকেদের জ্বালাতে শুরু করবি। নতুন দারোগাবাবুটির বয়স কম। ওরে পাঁচু, দোহাই তোকে, এ বেচারাকে ঝামেলায় ফেলিসনে বাবা!

পাঁচু বলল,—তা কি হয় স্যার? আপনিই তো মনে করিয়ে দিয়েছেন, স্বভাব যায় না মলে।

বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। বঙ্কুদারোগা তার উদ্দেশ্যে হুংকার ছেড়ে বললেন, —ঠিক আছে। আমায় মরতে দে। তারপর মজা দেখাচ্ছি। উইল করে যাব, যেন কেউ আমার জন্য গয়ায় পিণ্ডি না দেয়।

রাগে-দুঃখে বঙ্কুবাবুর আগের মুড নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন জায়গায় গিয়েই উকিল ডেকে উইল লিখিয়ে তবে শান্তি।

একটু উপসংহার আছে। মফস্বল শহরের বুদ্ধিমান উকিলরা বঙ্কুবাবুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, নিজের পিণ্ডিদণ্ডের ব্যবস্থা বন্ধ করার বদলে পাঁচু চোরের পিণ্ডির ব্যবস্থা করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু দুঃখের কথা, বঙ্কুবাবুর সে চেষ্টা সফল হয়নি। পাঁচুর ঝাড়েবংশে কেউ ছিল না। তাছাড়া একজন চোরের নামে পিণ্ডি দেওয়ার লোকও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যে শোনে সেই বলে, পাঁচুর নামে পিণ্ডি দিতে গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠে বসি, এদিকে আমার সর্বনাশ হয়ে যাক। আমি ওতে নেই বাবা! পিণ্ডি দেওয়ার আগেই পাঁচু ফতুর করে দেবে। ভূতের কান খুব সজাগ। নজরও কড়া।

সুতরাং বঙ্কুবাবুর পক্ষে ভূত হওয়ার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

ভুতুড়ে চশমা

নাতিকে কোলে নিয়ে আদর করতে গিয়ে মুরারিবাবুর চশমাটা গচ্চা গেল। নাতিটির সবে একটি-দুটি দাঁত গজিয়েছে। মুখের কাছে আঙুল দেখলেই খপ করে ধরে কুটুস করে কামড়ে দেয়, খিক-খিক করে হাসে।

কিন্তু দাদুর চোখ থেকে একটানে চশমা খুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলবে, ভাবা যায়? এখনই এমন বিচ্ছু, তো ভবিষ্যতে কেমন হবে আন্দাজ করে উদ্বিগ্ন হলেন মুরারিবাবু।

চশমা না থাকলে একেবারে কানা বললেই চলে। তাছাড়া চশমাটা সবে কিছুদিন আগে করিয়েছিলেন। স্টিলফ্রেমের দামি চশমা।

চশমা ভেঙেছে যে দুষ্টুটা, তার দাদা নুকুর বয়স বছর আষ্টেক। দাদুর অবস্থা দেখে দুঃখিত হয়ে বলল,—চলো দাদু, তোমাকে চশমার দোকানে নিয়ে যাই।

মুরারিবাবু বললে,—সে তো বউবাজারে। হরিকে বল, একটা ট্যাক্সি ডেকে আনুক।

হরির ভরসা করা কঠিন। ট্যাক্সি ডাকার ছলে সে মোড়ের চায়ের দোকানে ঘণ্টাদুয়েক আড্ডা দিয়ে এসে হয়তো বলবে,—কেউ আসতে চাইছে না বড়বাবু।

নুকু তা জানে বলে নিজেই বেরিয়ে গেল এবং তক্ষুনি একটা ট্যাক্সিও ডেকে আনল। মাঝে-মাঝে নুকু তার ক্ষমতা দেখিয়ে এমনি করে তাক লাগিয়ে দেয়। তবে দাদুর সঙ্গে তার যাওয়া হল না। স্কুলের সময় হয়ে আসছে।

ট্যাক্সিওয়ালার চেহারা খেঁকুটে, রোগা। মাথাটি প্রকাণ্ড। তার মধ্যিখানে কাঠির

মতো একগোছা চুল বসানো। কুতকুতে চোখ। ইয়া বড় নাক। খুব আলাপি মানুষ। পথে যেতে-যেতে বলল,—ছেলেমানুষ। বড় মুখ করে এসে বলল, দাদুর চশমা ভেঙেছে। বউবাজারে যাবেন চশমা করাতে। তা চশমা না থাকার কষ্ট আমি আমি বুঝি, সার!

মুরারিবাবু হাসলেন,—আপনার তো চশমা নেই দেখছি। কী করে বুঝলেন তাহলে?

ছিল।—ট্যাক্সিওলা বলল। —আর দরকার হয় না। গত মাসে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। ওতেই চোখ সেরে গেছে।

মুরারিবাবু অবাক হয়ে বললেন,—তার মানে?

লরির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা। বুঝলেন না? এক ধাক্কাতেই চশমা গুঁড়ো এবং চোখ পরিষ্কার। —ট্যাক্সিওলা খিক-খিক করে হাসতে লাগল। তারপর থেকে আর চশমার দরকার হয় না। এই যে আপনি চশমা ছাড়া দেখতে পাচ্ছেন না—একটা অ্যাকসিডেন্ট হলে—বুঝলেন না?

আঁতকে উঠে মুরারিবাবু বলেন,—সর্বনাশ! ওসব অলক্ষুণে কথা বলবেন না মশাই! আমার চশমাই ভালো।

ট্যাক্সিওলা বলল,—না-না। কথার কথা বলছি। তা বউবাজারে কোন দোকানে চশমা করালেন স্যার?

—ফ্রেন্ডস অপটিক্যালস। খুব নামকরা দোকান।

—আপনি ইং চুংয়ের দোকানে করান না কেন? গলির ভেতরে ছোট্ট দোকান হলে কী হবে? সস্তায় ঝটপট অত ভালো চশমা আর কেউ করতে পারে না। আধঘণ্টার মধ্যে পেয়ে যাবেন।

মুরারিবাবু একটু ভেবে বললেন,—হ্যাঁ, ফ্রেন্ডস অপটিক্যালসে বড্ড বেশি দাম নেয়। তা ইং চুংয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি?

—খুব আছে। চলুন না, দেখবেন কত অমায়িক লোক ইং চু সায়েব।

ট্যাক্সিওলা বউবাজারে একটা গলির মুখে ট্যাক্সি রেখে বলল,—আসুন, কাছেই।

ইং চুং অপটিক্যালস লেখা আছে ছোট্ট সাইনবোর্ডে। ঘুপচি একফলি ঘরের ভেতর বসে আছে একজন চীনা। কফিনের সাইজ শোকেসের ভেতরে গোটাকতক চশমা রয়েছে। মিটমিটে একটা বাল্‌ব জ্বলছে পেছনে। সরু গলিটা এমনিতেই দিনদুপুরে আঁধার হয়ে আছে।

ট্যাক্সিওলা বলে দিল,—আমাদের পড়ার লোক চুং সায়েব, বুঝলে তো? বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখলে চলবে না—ট্যাক্সি দাঁড় করানো আছে।

মুরারিবাবু খুব অবাক হয়েছিলেন। বসিয়ে রেখে আধঘণ্টার মধ্যে চশমা দেবে? অবশ্য চীনারা সব বিষয়ে দক্ষ। ওদের দেশে প্রাচীন যুগে আশ্চর্য সব বৈজ্ঞানিক কাণ্ডকারখানাও ঘটেছে। সেই প্রাচীন বিদ্যার জোরেই হয়তো চুং সায়েব আধঘণ্টার মধ্যে চশমা বানিয়ে দিলেও দিতে পারে। তবে ট্যাক্সির মিটার কিন্তু ঘুরবে এবং ভাড়ার অংক বেড়ে চলবে।

তা বাড়ুক। চটজলদি চশমা পেলে কত সুবিধে। এই ভেবে মুরারিবাবু প্রেসক্রিপশন বের করে দিলেন চুং সায়েবকে। স্টিলফ্রেমের চশমা পছন্দ, তাও বললেন। চুং সায়েব দেখে ফেরত দিয়ে বলল,—ওক্কে বাবু! ওনলি টেন মিনিটস!

বলে কী! দশ মিনিটে দেবে? —মুরারিবাবু তাকিয়ে রইলেন মুগ্ধদৃষ্টিতে। চুং সায়েব ঘরের ভেতর দিকে একটা সুড়ঙ্গ ঢুকে গেল। ট্যাক্সিওলা চোখ নামিয়ে বলল,—ম্যাজিক সার, ম্যাজিক! আমার বেলায় আধঘণ্টা লেগেছিল। আপনার মাত্র দশ মিনিট। আসলে আপনাকে খদ্দের হিসেবে মনে ধরে গেছে চুং সায়েবের।

মুরারিবাবু বললেন,—হয়তো সবরকম পাওয়ারের চশমা আগে থেকে করা থাকে! তাই—

বলা কঠিন, স্যার! —ট্যাক্সিওলা বলল। —ওই যে দেখছেন আমার মুন্ডুর মাপ। চোখের কোনা থেকে কান অবধি মেপে দেখুন—পাক্কা দশ ইঞ্চির কম নয়। এই বেখাপ্পা মাপের ফ্রেমও কি আগে থেকে করা থাকে? আসলে সার, চীনারা বহুরকম বিদ্যা জানে! বুঝলেন না?

বুঝলেন মুরারিবাবু। তাই ঠিক। প্রাচীন কোনও গুপ্তবিদ্যার জোরে চুং সায়েব ঠিক মাপের চশমা ঝটপট বানিয়ে ফেলতে পারে। তেমনি মুগ্ধচোখে ঘরের ভেতরকার সেই সুড়ঙ্গের দিতে তাকিয়ে রইলেন মুরারিবাবু।

কিছুক্ষণ পরে সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এল চুং সায়েব। একটা ডিসের ওপর রাখা, সুন্দর স্টিলফ্রেমের চশমা। মুরারিবাবুর চোখে পরিয়ে দিয়ে ছোট্ট লাল গোল একটা আয়না ধরল ওঁর মুখের সামনে। মুরারিবাবু মুখে হাসি ফুটে উঠল। অপূর্ব! চেহারা খুলে গেছে একেবারে। মাপেও ঠিক। আর পাওয়ারও ঠিক। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। বাইফোকাল চশমা। ওপরের কাচ তফাতে দেখার জন্য এবং নিচের অংশ পড়াশুনোর জন্য। চমৎকার! মানিব্যাগ বের করতেই চুং সায়েব বলল,—টোয়েন্টি রুপিজ ওনলি!

মাত্র কুড়ি টাকা! তাহলে দেখা যাচ্ছে ফ্রেন্ডস অপটিক্যালস মহা জোচ্চোর। দুশো টাকা দাম নিয়েছিল আগের চশমাটার!

টাকা মিটিয়ে অনেকবার 'থ্যাংকস' জানিয়ে নতুন চশমা পরে ট্যাক্সিতে এসে চাপলেন মুরারিবাবু। ট্যাক্সিওলা স্টার্ট দিয়ে খি-খি করে হেসে বলল,—কী বুঝলেন সার? যা বলেছিলুম, তাই হল কি না বলুন?

মুরারিবাবুও একগাল হেসে বললেন,—ভালো। খুব ভালো।

ট্যাক্সিওলা বাড়ির সামনে পৌঁছে দিয়ে বলল,—ভাড়াও দেখুন খুব বেশি ওঠেনি। মাত্র টাকা পনেরো। অন্য কেউ হলে—

ট্যাক্সিওলাকে আর কথাই বলতে দিলেন না মুরারিবাবু। একটা কুড়ি টাকার নোট গুঁজে দিলেন ওর হাতে। নমস্কার করে চলে গেল ট্যাক্সিওলা।

ট্যাক্সির নাম্বারটা দেখে রাখলেন। ডব্লিউ বি টি ৯৯৯৯। ভবিষ্যতে কখনও দেখা হলে সুবিধে হবে। বলা যায় না, বর্ষাবাদলার দিনে কোথাও গিয়ে আটকে গেছেন, কোনও ট্যাক্সি রাজি হচ্ছে না, দৈবাৎ যদি ওকে পেয়ে যান—তাঁকে না কারতে পারবে

না। বড় উপকারী ভালোমানুষ লোকটা। বাড়ির সবাই খুব তারিফ করল নতুন চশমাটার। এমনকী যে বিচ্চু চশমা ভেঙেছিল সেও দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে খিক-খিক করে হাসতে লাগল। তাই বলে আর ওর ধারেকাছে যাচ্ছেন না দাদু।

নিজের ঘরে ঢুকে এদিনকার কাগজটা নিয়ে বসলেন মুরারিবাবু। কাগজ পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিলেনও। এক সময় হঠাৎ দেখলেন, শরতের নীল ঝকঝকে আকাশে একটা ট্যাক্সি ছুটে আসছে—ছুটে আসবে কীভাবে, উড়েই আসছে এবং প্রচণ্ড বেগে তাঁর দিকে আসছে। আসতে-আসতে একেবারে জানালার কাছে। আর ট্যাক্সিওলা জানালা দিয়ে মুন্ডু বের করে আছে সেই ট্যাক্সিওলা—লম্বা নাক, প্রকাণ্ড মুন্ডু, মাথার ওপর বসানো একগোছা কাঠি-কাঠি চুল, কুতকুতে চোখ আর ঠোঁটে বিদ্‌ঘুটে হাসি...

আঁতকে উঠে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। কিন্তু এ কী! ট্যাক্সিটা যে তাঁর ঘরের ভেতর এবং সেই ট্যাক্সিওলা মুখ বাড়িয়ে হাসছে।

খবরের কাগজে চোখ রাখলেন সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু—ওরে বাবা। কাগজের ওপরও যে তাই। সেই ট্যাক্সি ও ট্যাক্সিওলা। এবার এতটুকুনটি হয়ে গেছে। পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে ট্যাক্সির নম্বর। সেই নম্বর!

ভয় পেয়ে চশমা খুলে ফেলে হাঁক দিলেন মুরারিবাবু,—হরি! ও হরি! শিগগির একবার আয় তো!

হরি এসে একগাল হেসে বলল,—লতুন চশমাখানা শুনলুম ভালোই হয়েছে বড়বাবু! পরুন একবার দেখি।

মুরারিবাবু বললেন,—হরি। একবার চশমাটা পর তো বাবা।

হরি অবাক হয়ে বলল,—কেন বড়বাবু? আমি চশমা পরব? আপনার চশমা?

—ধুর হতভাগা! যা বলছি কর। নে—পর।

জোর করে পরিয়ে দিলেন হরির চোখে। হরি বলল,—বাঃ! খুব পোস্কের চশমা! সব বড়-বড় পষ্টাপষ্টি দেখিতেছি।

—কিছু দেখতে পাচ্ছিস? জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকা।

হরি জানালার কাছে এসে আকাশের দিকে তাকাল। তারপর বলল,—উড়ে বাব্বা! একখানা ট্যাক্সি আসিতেছে যে বড়বাবু! এই! এই! চাপা দেবে যে!

বলে চশমাটা খুলে ফেলল। মুরারিবাবু উত্তেজনা ও আতঙ্ক চেপে বললেন,—এবার ঘরের ভেতরটা দ্যাখ তো হরি!

হরি ভয় পেয়েছিল। বড়বাবুর কথায় ভয়ে-ভয়ে আবার চশমা পরে ঘরের ভেতর তাকিয়ে,— সব্বোনাশ! ট্যাক্সিখানা ঘুরে ঢুকে পড়তিছে—বলে খুলে ফেলল চোখ থেকে।

মুরারিবাবু গুম হয়ে চশমা নিয়ে বললেন,—হরি! কথাটা কাউকে বলিসনে। এটা একটা ম্যাজিক চশমা বুঝলি তো?

হরিও গুম হয়ে মাথা নেড়ে নিজের কাজে চলে গেল...।

দুই

হরিকে মুরারিবাবু বললেন বটে ম্যাজিক চশমা, কিন্তু ভালোই বুঝে গেছেন এ একটা ভুতুড়ে চশমা এবং এর পেছনে কোনও চক্রান্ত আছে। তা না হলে চুং সায়েব এর ভেতরে ও ট্যাক্সিওলাকেই তার ট্যাক্সিসমেত ঢুকিয়ে দিয়েছে কেন? সেদিনই আবার যেতে হল বউবাজারে। ফ্রেন্ডস অপটিক্যালসেরই শরণাপন্ন হতে হল মুরারিবাবুকে। কিছু বেশি টাকা দিয়ে পরদিন বিকেলের মধ্যেই ডেলিভারি পাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তারপর গেলেন ইং চুং সায়েবের দোকানে।

গিয়েই কিন্তু হতবাক মুরারিবাবু। সেই গলি, সেই ঘুপচি আলো-আঁধারি ঘর, তোবড়ানো রংচটা সেই ছোট্ট সাইনবোর্ড—সবই ঠিক আছে। কিন্তু এ যে একটা চানাচুর-তেলেভাজার দোকান! এক বুড়ো কাঠখোট্টা চেহরার লোক কয়লার উনুনে প্রকাণ্ড কড়াই চাপিয়ে নাকমুখ সিঁটকে বসে আছে। কড়াইয়ের কালো তরল পদার্থটা থেকে প্রচণ্ড ঝাঁজ ছড়াচ্ছে। মুরারিবাবু অবাক হয়ে বললেন,—ওহে, এখানে চুং সায়েবের চশমার দোকান ছিল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে দোকান কোথায় উঠে গেল? লোকটা ভুরু কুঁচকে তাকাল,—কী বলছেন বাবুজি?

মুরারিবাবু সাইনবোর্ডটা দেখিয়ে বললেন,—ইং চুং সায়েবের দোকান ছিল না এটা?

লোকটা গরম তেলে বেগুনি ছেড়ে দিয়ে বলল,—তা তো জানি না বাবুজি। আমি এই দোকান করেছি পাঁচ-ছ বছর আগে।

চটে গেলেন মুরারিবাবু,—কী বাজে কথা বলছ? আজ সকালে এখান থেকে চশমা করিয়ে নিয়ে গেলুম। আর তুমি বলছ পাঁচ-ছ বছর এই দোকান করেছ? তাহলে এই সাইনবোর্ডটা কেন?

লোকটা বলল,—সাইনবোর্ড তো পাঁচ-ছ বছর ধরেই আছে। তাতে কী হয়েছে? খামোকা ঝামেলা করবেন না বাবুজি! গলির ভেতর আরও চশমার দোকান আছে। আপনি ভুল করছেন।

মুরারিবাবু জোরগলায় বললেন,—অসম্ভব। ওই তো ঘরের ভেতর সেই সুড়ঙ্গ টাও দেখতে পাচ্ছি। চালাকি কোরো না আমার সঙ্গে। নিশ্চয় ওই সুড়ঙ্গের ভেতর চুং সায়েব লুকিয়ে আছে। ওকে ডাকো।

লোকটা খাপ্পা হয়ে বলল,—আঃ! কী ঝুটঝামেলা করছেন বাবুজি! সবাইকে জিগ্যেস করুন না, এখানে কোনও চশমার দোকান ছিল কি না।

মুরারিবাবু ছড়ি তুলে সাইনবোর্ড ঠুকে বললেন,—আলবাত ছিল।

গণ্ডগোল দেখে লোক জড়ো হচ্ছিল। পাশের দোকানের এক ভদ্রলোক ব্যাপারটা শুনে বললেন,—আপনার ভুল হচ্ছে স্যার! ইং চুং সায়েবের চশমার দোকানই ছিল এটা। তবে তা ছ-সাত বছর আগের কথা। চীনা সায়েব ভালোই চশমা বানাত। একা থাকত। তারপর একরাত্রে ওকে ডাকাতরা খুন করে যায়। তারপর থেকে কিছুদিন ঘরটা খালি পড়ে ছিল। শেষে মটরবুড়ো এসে ভাজার দোকান করে।

মুরারিবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আস্তে-আস্তে চলে এলেন গলি থেকে সদর রাস্তায়। পকেটে চুং সায়েবের চশমাটা ঠিকই আছে। অথচ চুং সায়েব বেঁচে নেই! ছ-সাত বছর আগে ডাকাতরা তাঁকে খুন করে গেছে। আজ সকালে তাহলে কি কোনও অলৌকিক পদ্ধতিতে মুরারিবাবু ছ-সাত বছর পিছিয়ে গিয়েছিলেন?

খুব রহস্যময় ব্যাপার বলতে হয়। মাথামুন্ডু কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আর ওই ট্যাক্সি এবং ট্যাক্সিওলাই চশমার ভেতর ঢুকে গেল কীভাবে?

এ হেঁয়ালি উদ্ধার করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। উদ্ধার করা যেত হয়তো, যদি ট্যাক্সিওলার সঙ্গে ফের দেখা হতো।

কিন্তু ট্যাক্সিওলা যে চুং সায়েবের মতো ছ-সাত বছর আগের এক মরে যাওয়া মানুষ নয়, তাই বা কে বলল? হুঁ—সম্ভবত সেও তাই। অপঘাতে মরে যাওয়া মানুষ। তা না হলে লরির সঙ্গে তার ট্যাক্সির মুখোমুখি ধাক্কা, চশমা ভাঙা এবং চোখ সেরে যাওয়ার কথা বলছিল কেন?

শিউরে উঠলেন মুরারিবাবু। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সাহস করে আবার একবার চশমাটা বের করলেন। চোখে পরে আকাশের দিকে তাকালেন। আধমিনিট পরেই সেই দৃশ্য আবার। তেড়ে আসছে হলুদ-কালো ট্যাক্সি। জানালা দিয়ে মুন্ডু বের করা ট্যাক্সিওলা—সেই লম্বা নাক, মাথার ওপর কাঠি-কাঠি একগোছা চুল।

ঝটপট চশমাটা খুলে পকেটে ভরে রাখলেন। তারপর সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বাসে উঠে পড়লেন। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। কিন্তু উপায় কী? চারটে বাজতে না বাজতে এই অবস্থা হয়ে যায়। বয়স হয়েছে মুরারিবাবুর। চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই টের পেলেন তাঁর পাঞ্জাবির পাশ পকেটে কেউ হাত ঢোকাচ্ছে। দু-হাতে ওপরকার রড ধরে আছেন। হাত দুটো নামাবার উপায় নেই। এতটুকু নড়ারও সাধ্য নেই। সামনে-পেছনে দুপাশে লোকেরা তাঁকে ঠেসে রেখেছে। এ অবস্থায় মুখে 'পকেটমার! পকেটমার!' বলে চেঁচানো ছাড়া আর কিছু করা যায় না। কিন্তু চ্যাঁচাতে গিয়ে থামলেন মুরারিবাবু। বরং মুচকি হাসলেন।

যে পকেটমার হাত ঢোকাচ্ছে, সেই পকেটে সেই ভুতুড়ে চশমাটা ছাড়া আর কিছু নেই। নিয়ে যাক না ব্যাটা আপদ বিদায় হোক বরং। ওই বিদঘুটে জিনিসটা আবার কী ঝামেলা বাধায় বলা যায় না। কে বলতে পারে, আচমকা ট্যাক্সিটা চশমা থেকে বেরিয়ে তাকে চাপা দেবে কি না। হুঁ—সেটা হয়তো অসম্ভব নয়। যে জোরে ছুটে আসে, মনে হয় তাঁর ওপর এসে পড়ল বলে। কিংবা ছোট্টটি হয়ে চোখের ভেতর ঢুকে যেতে পারে।

পকেটমার পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে আর মুরারিবাবু এই সব কথা ভেবে খিক-খিক করে হাসছেন। পাশের লোকটা তাঁর দিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। নিশ্চয় পাগলা ভাবছে তাঁকে। ভাবুক।

কিন্তু তারপরেই কেউ চেঁচিয়ে উঠল,—তবে রে ব্যাটা! তখন থেকে দেখছি এই ভদ্রলোকের পকেটে হাত ঢোকানোর চেষ্টা করছ—

সঙ্গে-সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল চলন্ত বাসের ভেতর। একসঙ্গে অসংখ্য যাত্রী কানফাটানো গলায় চ্যাঁচাতে থাকল,—মার্! শেষ করে দে।

বাসে পকেটমার ধরা পড়লে যা হয়। সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। ভিড়ের ধাক্কায় মেয়েদের আর্তনাদ, বাচ্চাদের ভ্যাঁ—বেগতিক বুঝে ড্রাইভার বাস দাঁড় করাল।

মুরারিবাবু দেখলেন, একটা লোককে যাত্রীরা টানতে-টানতে বাস থেকে নামাচ্ছে এবং সেই লোকটাই নিশ্চয়ই তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল।

কিন্তু রাস্তায় তাকে টেনে নামাতেই মুরারিবাবু হতচকিয়ে গেলেন। পকেটমার আর কেউ নয়, সেই ট্যাক্সিওলা—লম্বা নাক, মাথার ওপর বসানো কাঠি-কাঠি চুল! মুরারিবাবু ভিড় ঠেলে নামবার চেষ্টা করে চেঁচিয়ে উঠলেন,—ওকে মারবেন না! ওকে মারবেন না!

কিন্তু এখন এসব কথা কে শোনে! রাস্তার লোকেরাও এসে জুটে গেছে। সবাই তাকে মারবার চেষ্টা করছে। ভিড় ঠেলে মুরারিবাবু কিছুতেই কাছে যেতে পারলেন না।

এই সময় বাসের কন্ডাক্টর চেঁচিয়ে বলল,—বাস ছেড়ে যাচ্ছে! ওঠবার হলে উঠে পড়ুন!

নিমেষে ভিড় শূন্য হয়ে গেল। এ বাস ছেড়ে দিলে আবার কখন পাবে, তার ভরসা নেই। মুরারিবাবু তাকিয়ে রইলেন। কই? কোথায় গেল সেই ট্যাক্সিওলা—যাকে পকেটমার বলে লোকেরা বেদম পিটুনি দিচ্ছিল?

তন্নতন্ন করে খুঁজে আর তাকে দেখতেই পেলেন না মুরারিবাবু। কোন ফাঁকে কেটে পড়েছে সে। তবে শুধু ওইটুকু পরিষ্কার বোঝা গেল, লোকটা চশমাটা হাতানোর তালে আছে। নিশ্চয়ই কোনও কারণে সে চশমাটা মুরারিবাবুর কাছে থাকা আর ঠিক মনে করছে না।

হুঁ—রহস্য আরও জট পাকিয়ে গেল তাহলে। মুরারিবাবু ভাবনায় গুম হয়ে গেলেন। তারপর বাসটা স্টার্ট সম্বিৎ ফিরল। রোখ। রোখ—বলে চেঁচিয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু তক্ষুনি থমকে দাঁড়ালেন। কোন সাহসে আবার বাসে চাপতে যাচ্ছেন—ভিড়ের মধ্যে?...

তিন

সেদিনই অনেক রাতে আরও একটা ঘটনা ঘটল। মুরারিবাবুর রাত জেগে বই পড়ার অভ্যাস। কিন্তু চশমার অভাবে বই পড়া হল না। অথচ ঘুমও আসতে চাইল না। তাই বলে চুং সায়েবের চশমা পরে বই পড়ার সাহস ছিল না। বইয়ের পাতায় দেখবেন শুধু একটা রহস্যময় ট্যাক্সি! বই পড়া তো যায় না এভাবে।

শুয়ে ছিলেন চুপচাপ। চশমা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছিলেন। অগত্যা। সেই সময় ফোন বাজল। রাত বারোটায় কে ফোন করছে? হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে বললেন,—হ্যালো! কাকে চাই?

—আপনি কি মুরারিমোহন সাঁতরা?

—হ্যাঁ। কে বলছেন আপনি?

—আমি তারাপদ বকসী। নমস্কার স্যার!

—আপনাকে তো চিনতে পারলুম না ঠিক।

—সে কী সার! আজ সকালেই তো আপনাকে ট্যাক্সি করে চুং সায়েবের দোকানে—

মুরারিবাবু নড়ে উঠলেন,—আরে শুনুন, শুনুন!

—শোনার আগে আমার কথাটা বলে নিই স্যার!

উত্তেজনা চেপে মুরারিবাবু বললেন,—হুঁ—বলুন।

—চুং সায়েব কেলেঙ্কারি করেছে। আজ সকালে আপনাকে চশমা তৈরি করে দেওয়ার পর দুপুরবেলা আমার সঙ্গে এক জায়গায় হঠাৎ দেখা। হাসতে-হাসতে বলল কী—সেই বুড়োবাবুর চশমার ভেতর আমাকে ট্যাক্সি সমেত ঢুকিয়ে দিয়েছে। শুনে তো আমি ভাবনায় পড়ে গেলুম। বুড়োবাবু—মানে আপনি যদি ব্যাপারটা পুলিশের কানে তোলেন—বুঝলেন তো সার?

—কিছু বুঝলাম না।

—তাহলে গোড়ার কথাটা খুলে বলি, স্যার!

—বলুন। সেটাই শুনতে চাই।

—বছর ছয়েক আগে এক রাত্তিরে ভবানীপুরে প্যাসেঞ্জার নামিয়ে খালি ট্যাক্সি নিয়ে শ্যামবাজারে ফিরে আসছি, চৌরঙ্গীতে চারজন লোক দাঁড় করিয়ে বলল, শ্যামবাজার যাবে। খুশি হয়ে ওঠালুম তাদের। কিন্তু তখন কী জানতুম ওদের কী মতলব? বলল, বউবাজার হয়ে একটা কাজ সেরে ওদের যেতে হবে। তাই বউবাজারের দিকে চললুম। চুং সায়েবের দোকানের গলির মুখে আমাকে ট্যাক্সি দাঁড় করাতে বলল! তিনজন নেমে গেল। একজন আমার পেছন থেকে ছুরি দেখিয়ে বলল, চুপ। যা, বলব, করবে। 'টুঁ' করলে মারা পড়বে। বুঝলেন তো স্যার?

—হুঁ। ওরা চুং সায়েবের দোকানে ডাকাতি করেছিল। তারপর চুং সায়েবকে খুন করে—

—ট্যাক্সিতে ফিরে এল। প্রাণের ভয়ে একটা কথা বলতে পারলুম না। বুঝলেন না?

—আহা বুঝতে পেরেছি। তারপর?

—তারপর স্যার লোকগুলো হুকুম দিলে স্পিড বাড়াও। বাধ্য হয়ে স্পিড বাড়ালুম। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে যেই পৌঁছেছি, আচমকা একটা লরি এসে পড়ল মুখোমুখি। আর ব্যস! বুঝলেন তো স্যার?

—বুঝলুম। আপনি অক্কা গেলেন?

—একেবারেই!

—তার মানে আপনি ভূত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছেন?

—হেঁ-হেঁ—লজ্জা পাই স্যার, ভূত বললে।

—ভূত বললে লজ্জা পান, কিন্তু বাসে উঠে আমার পকেটে হাত ঢোকাতে লজ্জা পান না!

—ধরা পড়ার ভয়ে স্যার! পুলিশ—বুঝলেন না? পুলিশ এখনও খুঁজছে আমাকে।

—সেই পুলিশও নিশ্চয় ভূত?

—ঠিক ধরেছেন স্যার! তাই বলছিলুম, দয়া করে যদি চশমাটা আমাকে দেন, খুব ভালো হয়। চুং সায়েব আমাকে আর জড়াতে পারবে না ডাকাতি কেসে। পুলিশও প্রমাণ পাবে না।

মুরারিবাবু গর্জে বললেন,—চালাকি?

—কেন স্যার?

—আপনি ভূত?

—হেঁ-হেঁ—আরা লজ্জা দেবেন না স্যার!

—শাট আপ! আপনি ভূত হয়ে আমাকে টেলিফোন করছেন রাতদুপুরে? আমি কচি খোকা?

—সে কী স্যার? বিশ্বাস করলেন না?

—না। চুং সায়েবেকে ডাকাতরা খুন করেছিল শুনে এসেছি। কিন্তু আপনি দিব্যি ট্যাক্সি করে এখনও ঘুরছেন—তার মানে, আপনি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। চুং সায়েব ভূত। তাতে আর সন্দেহ নেই। ভূত হয়ে চুং সায়েব এতদিন আপনাকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব। মশাই! আমাকে কি বুদ্ধু পেয়েছেন যে বিশ্বাস করব, ভূত হয়েও আপনি আমার পকেটে হাত ঢোকাচ্ছিলেন এবং লোকেদের হাতে যথেচ্ছ পিটুনি খাচ্ছিলেন?

—চুং সায়েবের ভূত যদি চশমা করে দিতে পারে, তাহলে আমিই বা আপনার পকেটে হাত ঢোকাতে পারি না কেন? লোকের হাতে মার খেতেই বা অসুবিধেটা কীসের স্যার?

তর্কে হেরে মুরারিবাবু বললেন,—কিন্তু আমি তো ভূত নই। আমি আপনাদের পুলিশ-ভূতকে পাচ্ছি কোথায় যে চশমাটা দেব তাদের?

—ওরা আপনার আনাচে-কানাচেই ঘুরছে স্যার! আজ সকালে আমার ট্যাক্সি করে আপনাকে যেতে দেখছে না?

মুরারিবাবু শিউরে উঠে জানালাগুলোর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন,—আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?

—যে হাসপাতালের মর্গে ছিলুম, সেই হাসপাতালের পাবলিক বুথ থেকে।

—বেশ! চলে আসুন। চশমা পেয়ে যাবেন।

আমি গোপনে যাব, স্যার! —তারাপদ বকসী চাপা গলায় বলল। গিয়ে আপনার জানালায় টোকা দেব। আপনি যেন দয়া করে জেগে থাকবেন।

—জানালা খোলা থাকে আমার ঘরে।

—এটা উচিত নয়, স্যার। বিস্তর খারাপ লোক আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় আজকাল!

—ঠিক আছে। বলছেন যখন বন্ধ করে দেব। আপনি আসুন।

ফোন রেখে মুরারিবাবুর গুম হয়ে বসে রইলেন মিনিট দুই। মুহুর্মুহু গা শিউরে উঠল। এতক্ষণ একজন ভূতের সঙ্গে কথা বলছিলেন ভেবেই।

তারপর ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে জানালাগুলো বন্ধ করে দিলেন। একটু পরে ঝমঝম করে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। বর্ষার রাত। তাছাড়া এবার বর্ষাটা বড্ড বেশি রকমের। কিন্তু তারাপদ বকসীর আসবার নাম নেই। ভুতুড়ে চশমা ভূতের হাতেই চলে যাক, তাতে ক্ষতি মাত্র গোটা পঁয়তাল্লিশ টাকা। মাঝখান থেকে চর্মচক্ষে ভূতদর্শন হয়ে গেল। মন্দ কী! এখন সবকথা জানার পর দরকার খানিকটা সাহস। ভয় পেলে চলবে না।

আবার ফোন বাজল ক্রি-ক্রিং করে। তারাপদ বকসী এ রাতে আসতে পারবে না বলবে নাকি? কে জানে, আনাচে-কানাচে পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে বলছিল!

কাঁপা-কাঁপা হাতে ফোন তুলেই বললেন,—তারাপদবাবু নাকি?

ফোনের ভেতর ভারিক্কি গলায় ভেসে এল,—আপনি কি তারাপদ বকসীর কথা বলছেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?

—বউবাজার থানা থেকে বলছি। আপনার তাহলে তারাপদর সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

—না—মানে—

—মানে-টানে আবার কী। শুনুন মুরারিবাবু! আমাদের কাছে খবর আছে, ১৯৭৮ সালের ২১শে জুলাই তারিখে বউবাজার এলাকায় ইং চুং সায়েবের দোকানে যে ডাকাতি হয়েছিল, সে ব্যাপারে আপনার কাছে একটা মূল্যবান এভিডেন্স আছে।

—বুঝেছি। চশমাটার কথা বলছেন তো?

—হ্যাঁ। শুনুন, এখনই আমরা যাচ্ছি আপনার কাছে। সাবধান, চশমাটা যেন কাউকে দেবেন না। আমরা খবর পেয়েছি, তারাপদ ওটা চুরির মতলবে ঘুরছে? আপনার কাছে চাইতেও যেতে পারে। আপনি যা ভালোমানুষ, বলা যায় না কিছু।

মুরারিবাবু বিব্রতভাবে বললেন,—আচ্ছা, আচ্ছা।

—আচ্ছা-টাচ্ছা নয়। আমরা যাচ্ছি।...

ফোন রেখে মুরারিবাবু আবার গুম হয়ে গেলেন। বেচারা তারাপদ বকসীর তো কোনও দোষ নেই। ছুরি দেখিয়ে ডাকাতরা ওকে বাধ্য করেছিল ট্যাক্সি নিয়ে যেতে! খামোকা পুলিশ হয়রান করবে ওকে।

কিন্তু তারাপদকে চশমা দিলে পুলিশ এসে তাঁকেই হয়রান করবে। কে জানে এ পুলিশ কোন পুলিশ? ভূত-পুলিশ, নাকি শুধু পুলিশ? পুলিশ বলেই মনে হচ্ছে।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে সমানে। একটা জানালা খুলেই বন্ধ করে দিলেন মুরারিবাবু। বৃষ্টির ছাট আসছে। ঘরের ভেতর টেবিল ল্যাম্প জ্বলছিল।

হঠাৎ সেটা নিভে গেল। ফ্যানও বন্ধ হয়ে গেল। লোডশেডিং।

অন্ধকারে টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে একটা মোমবাতি পাওয়া গেল। এত রাতে হরির ঘুম ভাঙানো কঠিন। একটা হ্যারিকেন হলেই ভালো হতো! মোমবাতিটা বড্ড ছোট আর লিকলিকে।

মোমবাতিটা সবে জ্বেলেছেন, বাইরে খটখট-ঝুপঝাপ জুতোর শব্দ শোন গেল। তারপর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। তাড়াহুড়ো করে দরজা খুলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন মুরারিবাবু। চেয়ারের ডগায় মাথা লাগল। বেশ জোর লাগল। ককিয়ে উঠলেন।

তারপরই কানের কাছে নুকুরের চিৎকার শুনতে পেলেন,—দাদু! দাদু!

চোখ খুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন মুরারিবাবু। তাঁর মুখের সামনে নুকু, নুকুর বাবা, নুকুর মা এবং কোলে সেই চশমা-কাড়া বিচ্চু খোকাটা, এবং হরিও দাঁত বের করে আছে।

ব্যাপারটা কী? —মুরারিবাবু মুখটা একটু তুলেই অবাক হলেন। এ কোথায় শুয়ে আছেন তিনি? এ তো হাসপাতাল বলে মনে হচ্ছে।

আর তাঁর মাথায় ব্যান্ডেজ, হাতে ব্যান্ডেজ, পায়ে ব্যান্ডেজ।

সঙ্গে-সঙ্গে মাথার ভেতরটা কেমন করে উঠল। নুকু বলল,—দাদু, চোখ খোলো। আমরা তোমাকে দেখতে এসেছি। ট্যাক্সিতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে তুমি মরে গিয়েছিলে যে?

তবে তাই। লম্বা নাক, কুতকুতে চোখ, মাথার ওপর কাঠিকাঠি চুল—একটা লোকের ট্যাক্সিতে চেপে চশমা করাতে যাচ্ছিলেন মনে পড়ছে। কিন্তু কখন অ্যাক্সিডেন্টটা হল। কিছুতেই মনে পড়ছে না। যাইহোক, ট্যাক্সিতে ওঠার পর বাকিটা তাহলে ধাক্কা খেয়ে চোখের মতোই মগজ পরিষ্কার হওয়ার ফল। সময়ের উজানে চলে গিয়েছিলেন। খিক-খিক করে হেসে উঠলেন মুরারিবাবু। তাঁকে হাসতে দেখে সবাই অবাক। উদ্বিগ্নও। পাগল হয়ে যাবেন না তো?

চার

না। আঘাত তত গুরুতর হয়নি। মাস তিনেকের মধ্যে মুরারিবাবু আগের মতো চলাফেরা করতে পারছেন। তবে ভারি আশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, বিনা চশমায় দিব্যি বইপত্র পড়তে পারছেন এবং দূরের সবকিছুই দেখতে পারছেন।

তাঁরাপদ বকসী বলেছিল বটে, এক ধাক্কাতেই চোখ পরিষ্কার। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি চেয়ে মোড় অবধি গেছেন, আচমকা লরির ধাক্কা। ট্যাক্সিওলা বেচারা নাকি মারা গেছে।

যে আগেই মরে গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার তার মরা না মরা সমান।

এরপর একদিন মুরারিবাবু রাস্তার মোড়ে গেছেন ট্যাক্সি ধরতে। ভবানীপুরে ভাগ্নে শ্রীমান মুকুলের বাড়ি যাবেন। কিন্তু বাসে বেজায় ভিড়। ট্যাক্সিও পাচ্ছেন না। হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা খালি ট্যাক্সি আসছে। হাত দেখাতেই ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেল।

অমনি মুরারিবাবু দেখলেন সেই লম্বা নাক, কুতকুতে চোখ, মাথায় কাঠি-কাঠি চুল—তাঁরাপদ বকসী আঁতকে এসে বললেন,—না, না। যাব না।

এক ভদ্রলোক ট্যাক্সির জন্য তাক করছিলেন। তিনি তক্ষুনি উঠে পড়লেন। মুরারিবাবু বারণ করার আগেই ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল। সেই নম্বর। ডব্লিউ বি টি ৯৯৯৯। যাকগে। আরেকজনের মগজ সাপ হয়ে যাবে ধাক্কা খেয়ে। এই কলকাতায় এমন কত ট্যাক্সি আর কত তাঁরাপদ বকসী কত ঘুরে বেড়াচ্ছে—সঙ্গে পুলিশ। মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তবে মুরারিবাবু কৃতজ্ঞ বইকী। এক ধাক্কায় তাঁর চোখ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর চশমাও লাগে না।...

রাতের আলাপ

রাত দশটা বাজলেই আমাদের পাড়ায় লোডশেডিং হবেই হবে। কাজেই রাতের খাওয়া শেষ করে মাদুর আর বালিশ নিয়ে খোলা ছাদে গিয়ে শুই। ঘুমটা আরামেই হয়।

এ রাতে ছাদে শুতে গিয়ে চমকে উঠলুম। ছাদের কার্নিশের কাছে কালো এক মূর্তি। সারা পাড়া আঁধার-কালো। নিশুতি রাতে শুনশান নিরিবিলি ছাদে কালো হয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকাটা কাজের কথা নয়, বাড়ির মালিক যখন আমি তখন এ ছাদও আইনত আমার।

অতএব চোর না হয়ে যায় না।

কিন্তু আজকালকার চোর আর সে গোবেচারা চোর নয়। তাদের কাছে নাকি ছুরি-বোমা-পিস্তলও থাকে। চ্যাঁচামেচিতে বিপদ। তাই ভয়ে-ভয়ে বললুম,—কে?

আমি।—চোর জবাব দিল মিনমিন গলায়। তারপর ফোঁত-ফোঁত করে দুবার নাক ঝাড়ল।

এইতে আমার একটু সাহস হল! বললুম,—আমিটা কে?

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না স্যার?

—তার মানে?

—আমার নামধাম কিছু মনে পড়ছে না!

আরও সাহস পেয়ে ধমক দিয়ে বললুম,—চালাকি হচ্ছে? অন্যের বাড়ির ছাদে উঠে—

—দয়া করে কথাটা শুনুন আমার।

—কোনও কথা শুনতে চাইনে। তুমি ছাদে উঠলে কী মতলবে?

—আজ্ঞে বিশ্বাস করুন—

চো-ও-প—চোরের হালচাল দেখে তখন আমার জোর বেড়ে গেছে। বললুম, নিশ্চয় তুমি পাইপ বেয়ে ছাদে উঠেছ চুরির মতলবে। দাঁড়াও, আমি চ্যাঁচামেচি করে লোক জড়ো করছি!

স্যার! স্যার!—সে ভাঙাগলায় প্রায় কেঁদেই ফেলল। বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করতে আসিনি। আমি কস্মিনকালে চোর নই, চোরের মাসতুতো ভাইও নই। আমি একটা গণ্ডগোলে পড়ে গেছি স্যার!

কান্নাকাটি শুনে বললুম,—সত্যি বলছ, তুমি চোর নও?

—না স্যার!

—তাহলে ছাদে উঠেছ কেন? কী ভাবে উঠেছ?

ন্যাকা! বলে কী, নামধাম মনে পড়ছে না—অন্যের বাড়ির ছাদে কীভাবে উঠে এলে, সেটাও নাকি মনে নড়ছে না। ওকে আঙুল তুলে শাসালুম। এক মিনিট সময় দিচ্ছি—আসল কথাটা ফাঁস না করলে এইসা রামচ্যাঁচানি চ্যাঁচাব যে পাড়াসুদ্ধু লোক লাঠিসোটা নিয়ে এসে তোমায় রামঠেঙানি ঠেঙাবে।

লোকটা বেজায় ঘাবড়ে গেল এবার। ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল,—ওরে বাবা! তাহলে যে আমি আবার মারা পড়ব!

একটু খটকা লাগল! বললুম,—আবার মারা পড়বে মানে? কবার মারা পড়েছ হে? অ্যাঁ?

আজ্ঞে বেশি নয়। মোটে একবার। লোকটা আবার ফোঁত-ফোঁত করে নাক ঝাড়ল। ওরে বাবা! ওই একবারেই যে কষ্ট পেয়েছি, আবার মরতে হলে—ওঃ!

ব্যাপারটা কী খুলে বলো তো বাপু! —ওর কান্নাকাটি দেখে এবং এই সন্দেহজনক কথাবার্তায় একটু ভড়কে গিয়েই বললুম!

—বুঝলেন না স্যার?

—মোটেও না।

—আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি সম্ভবত গাড়িচাপা পড়েছিলুম। আবছা মনে পড়ছে এটুকু।

—বলো কী হে? তারপর? তারপর?

—তারপর আর কী? মরে গেলুম।

· আকাশ থেকে পড়লুম একেবারে,—মরে গেলে? মরেই যদি গেলে তাহলে এখানে এসে আমার সঙ্গে কথা বলছ কী করে?

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না স্যার! এমন কী, আমি কে—

—ওয়েট, ওয়েট! তুমি বলতে চাইছ যে তুমি ভূ-ভূ-ভূ...

লোকটা চাপা গলায় বলে উঠল,—বলবেন না স্যার, বলবেন না। শুনলে ভয়

করে। ওদের ভীষণ ভয় পাই। তাছাড়া জানেন তো? কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই!

এতক্ষণে আমার গায়ে কাঁটা দিল। আস্তে বললুম,—তুমি ঠিকই বলছ। কিন্তু তুমি তো এখন ওদেরই একজন। অথচ তুমি ওদের ভয় পাচ্ছ। এতো ভারি বিদ্‌ঘুটে কথা বাপু।

—আমি যে সবে ওদের একজন হয়েছি। নতুনদের যা হয়।

আমার সন্দেহ ঘুচে গেল। তাহলে যা ভেবেছি, তাই। এখন মাথার ঠিক রাখা দরকার। চারদিক আঁধারকালো নিশুতি-নিঝুম। সাবধানে কথা বলা উচিত। বললুম,—দেখো ভাই, এক কাজ করো। তুমি বরং পাকাপাকি একটা আস্তানা করে নাও কোথাও।

—আপনার ছাদটা মন্দ নয় স্যার। বেশ নিরিবিলি।

—তোমার মাথা খারাপ? বরং ওই যে দেখছ চিনুবাবুদের চিলেকোঠা—দেখতে পাচ্ছ তো?

—ওরে বাবা! হাসপাতালের মর্গ থেকে প্রথমে তো ওখানেই গিয়েছিলুম। ওখানে যে এক বড়বাবুর আস্তানা। যেমন তুম্বো চেহারা, তেমনি গলার আওয়াজ। পিস্তল তুলে বলে, পাকড়ো! পাকড়ো!

—বুঝেছি। চিনুবাবুর বাবা। একসময় পুলিশের দারোগা ছিলেন!

—তাই মনে হল দেখে। এজন্যই বলে, স্বভাব যায় না মলে! পিস্তলটারও।

—তোমারও যায়নি মনে হচ্ছে! তুমি কী ছিলে বলো তো?

—আজ্ঞে, সেটাই তো মনে পড়ছে না।

—বাঃ! ট্যাক্সিচাপা পড়াটা মনে পড়ছে, চিনুবাবুদের চিলেকোঠায় যাওয়াটা মনে পড়ছে—আর এই আসল কথাটা মনে পড়ছে না?

—কিছু-কিছু মনে পড়ছে, কিছু-কিছু পড়ছে না। বুঝলেন না? সদ্য-সদ্য মরেছি কিনা! সব গণ্ডগোল হয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

—বেশ। এখন কী করতে চাও। তাই বলো। আমার ঘুম পাচ্ছে।

—আপনি শোন না স্যার। শুয়ে পড়ুন।

—আর তুমি!

—বসে ভাবি। ভেবে দেখি, আমি কে? তারপর একটা ঠিক করা যাবে।

আপত্তি করে বললুম,—সেটা কাজের হল না। তুমি বরং অন্য কোথাও গিয়ে ভাবো।

—আমাকে কি ভয় পাচ্ছেন স্যার?

—পাচ্ছি বইকী।

—ভয় পাবেন না দয়া করে। কারণ আমার নিজেকেই নিজের ভয় করছে!

—কেন? কেন?

বুঝলেন না? টাটকা মরেছি? এখনও ধাতস্থ হয়নি কিছু। দেখতে পাচ্ছেন না স্যার—এখনও অশরীরী পর্যন্ত হতে পারছি না। শরীরটাকে যত ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করি তত এসে পেয়ে বসছে। সেই দুঃখেই তো কাঁদছিলুম তখন।

চেষ্টা করে দেখো! —হাই তুলে বললুম। তারপর মাদুর বিছিয়ে বসলুম এতক্ষণে। যার নিজের নিজেকে ভয় করছে, তাকে আমার ভয় পাওয়ার কোনও মানে হয় না।

লোকটা বলল,—আপনি শুয়ে পড়ুন। দেখি কী করা যায়।

অগত্যা আমি শুয়ে পড়লুম। কিন্তু কাত হয়ে একটা চোখ রাখলুম ওর দিকে। লোকটা একটু পরে হঠাৎ জিমন্যাস্টিক শুরু করল। ছোটাছুটি, ডিগবাজি, শূন্যে চরকির মতো পাক খেয়ে হরেক কসরত করে একসময় থামল। সে ফোঁস করে শ্বাস ফেলতে থাকল ক্লান্ত হয়ে। বললাম, ও কী করছ হে?

—আজ্ঞে, অদৃশ্য হওয়ার চেষ্টা করছি। পারছি না।

—পারবে, পারবে। আবার শুরু কর।

—করব। কিন্তু গলা যে শুকিয়ে গেল। বড্ড তেষ্টা। দয়া করে এক গ্লাস জল খাওয়াবেন স্যার?

—খাওয়াব। কিন্তু কথা দাও, অশরীরী মানে অদৃশ্য হতে পারলে এ ছাদ ছেড়ে চলে যাবে।

—দিচ্ছি স্যার? চলে যাব কোথাও।

—শুধু দিচ্ছি বললে হবে না। দিব্যি কর।

কার নাম করব?

একটু ভেবে বললুম,—বাবা মহাদেবের নামে! উনিই তোমাদের দেবতা, জানো না?

লোকটা বাবা মহাদেবের নামে দিব্যি করলে আমি জল আনতে গেলুম।

এক গেলাস জল নিয়ে ছাদে ডাকলুম,—কই হে! জল নাও। কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে বুঝলুম, ওর চেষ্টা সফল হয়েছে। তখন জলটা নিজেই খেয়ে শুয়ে পড়লুম নিশ্চিন্তে। কিন্তু লোকটা কে? অবশ্য সকালের কাগজে দুর্ঘটনার খবরে লোকটার নাম পেয়ে যেতেও পারি।...

শর্মার বকলমে

সত্যি বলতে কি বংশীধর অধিকারীর জ্বালায় আমাকে মীর্জাপুরের অত ভালো মেসটা ছাড়তে হয়েছিল। যেই কাগজ কলম নিয়ে একটা গল্প লিখব বলে বসেছি, ভদ্রলোক এসে একগাল হেসে বলতেন,—কী লিখলেন একটু পড়ুন না শুনি! এখন লেখা হয়নি বললেও রেহাই ছিল না। খুব আগ্রহ দেখিয়ে বলতেন,—কী লিখবেন ভাবছেন, তাই বলুন না শুনি।

দিনের পর দিন এরকম জ্বালাতন। মনে-মনে যাচ্ছেতাই বিরক্ত হলেও চেপে

থাকতুম ভদ্রতার খাতিরে। বংশীধরবাবু কিন্তু অতি অমায়িক মানুষ। মাথায় টাক ছিল। গোলগাল মুখ। হাসিটা ছিল ভারি মিঠে! নাদুসনুদুস বেঁটে শরীর নিয়ে ধুপ-ধুপ শব্দ করে মেসবাড়ির এঘর থেকে ওঘরে ঘুরে বেড়াতেন। সবার সুখ-দুঃখের খোঁজ খবর নিতেন। গায়ে পড়ে উপকার করতে চাইতেন।

কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছিল না ওঁকে। তিনমাস লেগে যেত একটা ছোট গল্প লিখতে। আর আশ্চর্য ব্যাপার, কীভাবে যেন টের পেয়ে যেতেন, আমি লিখতে বসেছি। অমনি চলে আসতেন আমার কাছে। পাশে বসে মুন্ডু বাড়িয়ে বলতেন,—কই একটু পড়ুন না শুনি...

বর্ষানাগাদ নকুড় মল্লিক লেনে তিনতলা বাড়ির ছাদে একটা চিলেকোঠা গোছের ঘর খুঁজে বের করলুম। বাড়ির মালিক এক কথাতেই ভাড়া দিতে রাজি হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, বললেন,—ভাড়া যা দেওয়ার দেবেন খুশিমতো। ও নিয়ে দরাদরি করব না। আপনি মশাই লেখক মানুষ! আমি আপনার লেখার ভক্ত।

কলকাতা শহরে কোনও বাড়িওলা এমন কথা বললে কোন লেখকের না মন আনন্দে থই-থই নেচে ওঠে! তবু ভাড়ার ব্যাপারটা ঠিক করাই ভালো। অনেক বলেকয়ে পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইলুম। বাড়িওলা ভদ্রলোক তাও নেবেন না। বলেন,—বরং তিরিশ দেবেন। ওরে বাবা। আপনি একজন লেখক বলে কথা!

মেস থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে যখন ও বাড়িতে চলে যাচ্ছি, বংশীধর খুব বাধা দিয়েছিলেন। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। একটু কষ্ট হয়েছিল বইকী, অতকাল একসঙ্গে বাস করেছি।

নকুড় মল্লিক লেনের বাড়িতে গিয়ে মহানন্দে গল্প লেখা শুরু করলুম। কেউ বাধা দেওয়ার নেই। নিরিবিলি তিনতলার ওপর ছোট ঘর। এতবড় ফাঁকা ছাদ। প্রাণভরে আকাশ দেখা যায়। আর আমায় পায় কে? আকাশ না দেখতে পেলে কি মাথায় কিছু বড়-বড় ভাব আসে?

প্রথম রাতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কাগজ-কলম নিয়ে বসলুম। বসামাত্র প্লট এসে গেল। প্লটটা এই ঃ

এক শিকারি বনের মধ্যে পথ হারিয়ে অবশেষে একটা পুরোনো ভাঙাচোরা দুর্গে পৌঁছলেন। খুঁজে-খুঁজে একটা অক্ষত ঘরে ঢুকে রাত কাটানোর কথা ভাবছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা অদ্ভুত চেহারার লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে—দরজা দিয়ে নয়, দেয়াল থেকে। তার মানে দেয়ালে টাঙানো একটা ছেঁড়া ছবি থেকে। শিকারির বন্দুকে আর গুলি নেই। এদিকে ছবির লোকটা তাঁর গলা টিপতে আসছে।

শিকারিকে না বাঁচালে গল্প হবে না। কীভাবে বাঁচাব তখনও ভাবিনি। লেখাটাতো শুরু করা যাক।

সবে দুলাইন লিখেছি, আমার কাঁধের ওপর কার নিঃশ্বাস পড়ল। চমকে উঠে দেখি কী আশ্চর্য, কী অসম্ভব ব্যাপার, মীর্জাপুরের মেসের সেই বংশীধর অধিকারী পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। একগাল হেসে ঠিক তেমনি চাপাগলায় বলে উঠলেন,—কী লিখলেন, পড়ুন না শুনি!

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। ঘরের দরজা কি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলুম? নিশ্চয় মীর্জাপুর থেকে ভদ্রলোক এই বৃষ্টির মধ্যে নকুর মল্লিক লেনে হাজির হয়েছেন।

কিন্তু আমার এ ঠিকানা তো ওখানে কাউকে জানিয়ে আসিনি! উনি টের পেলেন কেমন করে?

মনের কথা চেপে ভদ্রতা করে বললুম,—আরে আসুন বংশীধরবাবু! বসুন।

বংশীধরবাবু বললেন,—কই একটু পড়ুন না শুনি।

পড়ছি, পড়ছি, সবে তো দুলাইন লিখেছি। কিন্তু আশ্চর্য আপনি এই বৃষ্টির মধ্যে—বলতে-বলতে থেমে গেলুম। বংশীধরবাবু হঠাৎ আঁতকে উঠে পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ওরে বাবা! এ ব্যাটা আবার কে? বলেই আবছায়া হয়ে গেলেন। তারপর বেমালুম অদৃশ্য!

তারপর দেখি ঢ্যাঙা রোগা এক গুঁফো ভদ্রলোক ঘরের কোণা থেকে এগিয়ে আসছেন। এঁকে দেখেই বুঝি বংশীধরবাবু ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন?

গুঁফো ভদ্রলোক চোখ কটমট করে বললেন,—কে হে ছোকরা? কী লিখলে পড়ে শোনাও তো।

খুব রাগ হল এবার। নিশ্চয় দরজা বন্ধ করতে ভুলেছি! দরজার দিকটা ছায়ার মধ্যে বলে বোঝা যাচ্ছে না। বললুম,—আপনি তো মশাই বলা-কওয়া নেই ঘরের মধ্যে হুট করে ঢুকে পড়লেন যে?

গুঁফো ভদ্রলোক হি-হি করে হাসলেন,—ইস! বিষ নেই কুলোপনা চক্কর! ভারি দুলাইন ছাইপাঁশ লিখেই ধরাকে সরা জ্ঞান করা হচ্ছে। জানো আমি কে? আমি বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক হলধর শর্মা।

শুনেই বড় লজ্জায় পড়ে গেলুম। হেঁট হয়ে পা ছোঁওয়ার চেষ্টা করে বললুম,—ক্ষমা করবেন। আপনার কত বই আমি ছেলেবেলায় পড়েছি। তা আপনি বুঝি এ বাড়িতেই থাকেন?

—এ বাড়িতে কী বলছ হে? তার আগে পড়ো কী লিখলে শুনি।

হলধর শর্মা দুপা এগিয়ে এলেন। অগত্যা পড়তেই হল। লাইনদুটো শোনার পর শর্মা মশাই বললেন,—হুঁ, শুরুটা ভালোই। তবে শিকারিকে একটা ঘোড়া দাও। বন্দুকের বদলে দাও তীর-ধনুক। জমবে ভালো।

—গল্পটা যে একালের শর্মা মশাই।

—গল্পের আবার কাল? যা বললুম লেখো। এই আমি বসলুম। পুরো লিখে ফেল। শুনে তবে যাব।

বেগতিক দেখে বললুম,—বাইরের লোকের সামনে আমার লেখা আসে না শর্মা মশাই।

শর্মা চটে বললেন,—বাইরের লোক মানে? আমি তো এ ঘরেই থাকি বললুম না?

—এঘরে আপনি থাকেন মানে? অবাক হয়ে বললুম। এঘর তো খালি পড়েছিল। আমি বাড়িওলার কাছে ভাড়া নিয়ে আজ বিকেলে এঘরে এসেছি।

—ট্রেসপাস করেছ বাপু! পরের ঘরে এসে থাকা কি ভালো? একসময় এই ঘরেই আমি থাকতুম। তবে নেহাত এসেই গেছ যখন আপত্তি করব না। বিশেষ করে তুমি নতুন লেখক। তোমায় উপদেশ দেওয়া এবং সাহায্য করাই আমার কর্তব্য। কই লিখতে শুরু করো। আটকালে বলবে। আমি বলে দেব।

কাঁচুমাচু মুখে বললুম,—সেটা কি ঠিক হবে?

হলধর শর্মা খাপ্পা হয়ে বললেন,—আলবাত ঠিক হবে। নাও—আমি ডিকটেশান দিচ্ছি, লিখে যাও।

প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিকের কথা অমান্য করি কোন মুখে? অগত্যা ডিকটেশান নিতে শুরু করলুম। গোড়ায় যে দুলাইন লিখেছিলুম, তা কেটে দিতেও হল ওঁর নির্দেশে। তারপর লিখতে-লিখতে টের পেলুম, সত্যি, এই হল পাকা হাতের রচনা। কী জমাট এই গল্পটা! ছাপা হলে হইচই পড়ে যাবে এবার।

লেখা শেষ হওয়ার পর হলধর শর্মা বললেন,—আর তোমার কষ্ট দেব না। এবার আমার প্রাতঃভ্রমণের সময় হল। তুমি বিশ্রাম করো। আবার কাল রাতে যথাসময়ে দেখা হবে।

কাগজগুলো গোছাচ্ছিলুম। গোছান শেষ করে ঘুরে দেখি শর্মা মশাই নেই। বুঝলুম, তাহলে এই বাড়িতেই কোনও ফ্ল্যাটে থাকেন। আমার সঙ্গে রসিকতা করছিলেন। কিংবা হয়তো লেখার জন্য ঘরটাও ভাড়া নিয়েছিলেন।

কিন্তু তারপর বুকটা ধড়াস করে উঠল, যখন দরজার কাছে গেলুম। এ কী! দরজা তো ভেতর থেকেই বন্ধ রয়েছে। হ্যাঁ—আমিই বন্ধ করেছিলুম, মনে পড়েছে তাহলে?

ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে বিছানায় শুয়ে পড়লুম। তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

ঘুম হওয়ার কথা নয়। একটু বেলা হলে বেরিয়ে দেখি ছাদের কোণায় দোতলার মধুবাবু ডন দিচ্ছেন। কাল বিকেলেই আলাপ হয়েছে। ডন শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—নমস্কার স্যার! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে?

বললাম,—মোটেও না মধুবাবু! সারারাত...

মধুবাবু চাপা হেসে বললেন,—শর্মামশাই জ্বালিয়েছেন বুঝি? আপনাকে খুলেই বলি স্যার, এঘরে কেউ একরাত্তিরের বেশি বাস করেন না। তাই অ্যাদ্দিন খালি পড়েছিল। আপনাকে কালই আভাস দেব ভাবছিলুম, রাগ করবেন বলে সাহস পাইনি।

ব্যাপারটা কী বলুন তো?

মধুবাবু অবাক হয়ে বললেন,—সে কী স্যার? নিজে লেখক হয়েও জানেন না? শিশুসাহিত্যিক হলধর শর্মা কবে গত হয়েছেন। সেকি আজকের কথা? বছর সাতেক তো হবেই। তখন আমি স্কুলের ছাত্র।

কী করে জানব? আমি গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছি মাস কয়েক আগে। সাহিত্যিকদের মধ্যে কে জীবিত, কে মৃত, তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। গল্প লিখি আর কাগজে পাঠাই। কোনও-কোনও লেখা ছাপাও হয়।

চুপ করে আছি দেখে মধুবাবু বললেন,—জ্বালাতন বলতে ওই এক—ডিকটেশান নিতে হবে। তা নিজেও যখন লেখেন, তখন আর অসুবিধেটা কী? দেখবেন সয়ে যাবে ক্রমশ।

শর্মারহস্য তাহলে ফাঁস হল। কিন্তু বংশীধর অধিকারী? তাঁর আবির্ভাব দরজা-আঁটা ঘরে!

মেসে খোঁজ নিয়ে জানলাম যেদিন আমি মেস ছেড়ে আসি, সেদিনই সন্ধ্যায় হার্টফেল করে মারা গেছেন। বয়স হয়েছিল ষাট।

তবে সুখের কথা হল শর্মার ভয়ে বংশীধর আর আমায় জ্বালাতে যাননি। এদিকে শর্মা রোজ রাতে ডিকটেশান দিতে-দিতে বলেন, শিগগির এবার তুমি ভালো গল্প লিখতে পারবে। এটাই শেষপর্যন্ত আমার পক্ষে আশার কথা।

বৃষ্টিরাতের আপদ-বিপদ

আমাদের গোরাচাঁদ রোডে একপশলা বৃষ্টিতেই হাঁটু জল জমে। এদিনে বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা অব্দি একটানা বৃষ্টি। খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি। রাত ন'টায় ডিউটি শেষ। বেরিয়ে দেখি, বৃষ্টি বন্ধ। কাতারে-কাতারে লোক বাস-ট্রামের অপেক্ষায় এসপ্লানেড জুড়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। ভাগ্য ভালো। একটা বাসে গোত্তা মেরে ঢুকে গেলুম। আধঘণ্টা পরে যখন গোরাচাঁদ রোডে বাস থামল, নেমেই দেখি অথৈ সাগর।

বাড়ি পর্যন্ত এত জল ঠেলে এগোতে হলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া হবে। এক রিকশোওলা পাঁচ টাকা দর হাঁকল। পাঁচমিনিটের হাঁটার রাস্তার জন্য পাঁচটাকা। দায়ে পড়ে রাজি হয়ে চেপে বসলুম। রিকশাওলা টান দেওয়ার আগে ফের বলল,—কোথায় যেন যাবেন বললেন বাবু?

—থানার কাছে।

রিকশো এগোলো। একে জল, তার ওপর লোডশেডিং। টিপটিপ করে ফের বৃষ্টি ঝরাও শুরু হয়েছে। হুড তোলা আছে। পর্দাটাও নামিয়ে দিতে হল। অন্ধকারে চারদিকে খালি ঝপাং-ঝপাং জলের শব্দ। মাঝে-মাঝে মোটর গাড়ির মৃত্যুকালীন শ্বাস টানার মতো ঘড়ঘড়ানি। একঝলক করে আলো। পর্দার ফাঁকে নোংরা নর্দমা উপচানো জলের বিদঘুটে হাসিমুখ। কিন্তু চলেছি তো চলেছি। বাড়ি সমান দূরত্ব থেকে যাচ্ছে। ভাবছি, আহা বেচারা বিকশোওলা! পেটের দায়ে এই অমানুষিক খাটুনি খাটছে। মানুষ

হয়েও জানোয়ারের মতো গাড়ি টানছে। আর আমি নবাব খাঞ্জা খাঁয়ের মতো বসে আছি। খারাপ লাগছে, অথচ উপায় কী? একটু জলে ভেজা সহ্য হয় না। সপ্তায় দুদিন স্নান করি। একটুতেই ঠান্ডা লেগে দাঁতের গোড়া ফোলে। সর্দিকাশি এসে হামলা করে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? এখনও বাড়ি পৌঁছনো যাচ্ছে না কেন? পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে কিছু ঠাহর হল না। ঘুটঘুটে আঁধার। বললুম,—কোথায় এলুম হে?

রিকশোওলা বলল,—কোথায় যাবেন বললেন, যেন বাবু?

খাপ্পা হয়ে বললুম,—থানার কাছে। কতবার বলব বলোতো?

—আচ্ছা বাবু আচ্ছা। এবারে বুঝে গেছি।

—কী উজবুক লোক রে বাবা! কোথায় যাবে বোঝেনি, অথচ দর হেঁকে বসেছে পাঁচটা টাকা। পরক্ষণে ফের মায়া হল। আহা বেচারা! পেটপুরে খেতে পায় না, তাই জলের ভেতর রিকশো টানতে কষ্ট হচ্ছে। তার ওপর রাস্তার যা অবস্থা। খানাখন্দ পায়ে-পায়ে। চাকা গড়ানো সহজ তো নয়।

কতক্ষণ পরে আবার পর্দার ফাঁকে উঁকি দিলুম। তেমনি নিরেট আঁধার। কোথাও একচিলতে আলো নেই! আঁধারে জলের ঝপাং-ঝপাং শব্দ। লোকেরা জল ভেঙে হাঁটছে। মাঝে-মাঝে রিকশোর ঠংঠং। কিন্তু তাহলেও এত দেরি হওয়া তো উচিত নয়। সন্দেহ হল, ঠিক শুনেছে কিনা রিকশোওলা—হয়তো বাড়ি ছাড়িয়ে বেনে পুকুর বাজারের কাছে এসে গেছি। তাই বললুম,—কী ব্যাপার হে? এখনও পৌঁছনো গেল না যে! ঠিক পথে যাচ্ছ তো?

রিকশোওলা বলল,—কোথায় যেন যাবেন বললেন বাবু?

যা ব্বাবা! এ যে দেখছি ভুলো মনের রাজা। খাপ্পার চূড়ান্ত হয়ে বললুম,—কতবার বলব তোমাকে? অ্যাঁ? কানে শুনতে পাওনা নাকি? থানার কাছে—এ। থা—না—র—কা—ছে—এ এ! চেঁচিয়ে ওর কানে ঢোকাতে চাইলুম। থানা বোঝো? থানা?

—আজ্ঞে। বুঝেছি।

বৃষ্টিটা বেড়ে গেল এতক্ষণে। কুঁকড়ে বসে রইলুম। আবার অন্ধকার জলে নানারকম শব্দ। ঠং-ঠং রিকশোর আর্তনাদ। খানাখন্দে চাকা আটকে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। আরও কিছুক্ষণ পরে চেঁচিয়ে বললুম,—এখনও থানার কাছে পৌঁছতে পারলে না? ব্যাপারটা কী?

—কোথায় যেন যাবেন বললেন বাবু?

আবার সেই কথা? —গর্জে বললুম, রোখ, রোখ! আমি এখানেই নামব।

—এই যে এসে পড়েছি, বাবু! একটু সবুর করুন।

—না। এখানেই নামিয়ে দাও।

রিকশোওলা রিকশো থামাল। বলল,—ওই তো পিলখানা—আলো জ্বলজ্বল করছে।

হাঁটুজলে বৃষ্টির মধ্যে নেমে ওর হাতে পাঁচটাকার নোট গুঁজে দিয়ে সামনে বাঁহাতি আলো লক্ষ করে এগিয়ে গেলুম। রিকশোওলা রিকশো ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। আর বুঝতে অসুবিধা হল না যে লোকটা কানে কম শোনে। বলছি থানার কাছে, সে শুনেছে পিলখানা'র কাছে।

কিন্তু 'পিলখানা' যে বলে গেল, সে আবার কী জিনিস? এ নাম তো কস্মিন কালে শুনিনি। বাঁ হাতের গেটের ভেতর একটা উঁচু তিনদিক খোলা দালানের চত্বরে লণ্ঠন সামনে রেখে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। মাথায় টাক। মুখে অমায়িক ভাব। জায়গাটা ঠাকুর দালান বলে মনে হয়। গেটের কাছে আমাকে দেখা মাত্র তিনি বলে উঠলেন,—কী সৌভাগ্য! আসুন আসুন!

আমি তো অবাক। ভাবলুম, নিশ্চয় চেনেন-টেনেন কোনও সূত্রে। ছাদের তলায় তো পৌঁছনো যাক। বৃষ্টিতে ভিজে একসা হয়ে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক একই ভঙ্গীতে বললেন,—বসুন রামবাবু, তখন থেকে আপনার অপেক্ষা করছি। তবে বৃষ্টিটাও বড্ড বেশি আজ। বলে হাঁক দিলেন মুখ ঘুরিয়ে, কেষ্ট! অ কেষ্ট। বড়বাবু এসেছেন রে! শিগগির চা নিয়ে আয়।

সর্বনাশ! আমাকে কোন রামবাবু ওরফে বড়বাবু ভেবে বসেছেন। রিকশোওলা কানে কালা। আর ইনি চোখে কম দেখেন নাকি? ঝটপট বললুম,—দেখুন, আপনার বোধহয় ভুল হচ্ছে। আমি রামবাবু নই। রিকশোওলা ভুল করে আমাকে থানার বদলে পিলখানায়—

কথা কেড়ে খি-খি করে হাসলেন বৃদ্ধ। না-না। ভুল করেনি। ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিয়েছে। অ কেষ্টা, চা কৈ রে?

কী মুশকিল! কথাটা শুনুন। আমি রামবাবু নই।

পেছনদিকের দরজা খুলে এক মূর্তির উদয় হল। কালো কুচকুচে গায়ের রং। লিকলিকে পাঁকাটি গড়ন। পরনে হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি। সাদা দাঁত বের করে বলল, —বড়বাবু বরাবর এইরকম বলেন। বুঝলেন দাদুমণি? বসুন, বসুন—চা খান। পরে কথা হবে।

সে এককাপ চা প্লেটসুদ্ধ এনে লাল মসৃণ মেঝেয় রাখল। তারপর সেইরকম হেসে চলে গেল। বৃদ্ধ বললেন,—বসুন। কাজের কথা সেরে নেওয়া যাক চা খেতে-খেতে।

বেগতিক দেখে বললুম,—প্লিজ শুনুন। প্রথম কথা আমি রামবাবু নই। দ্বিতীয় কথা, আমি ভুল করে পিলখানায় চলে এসেছি। রিকশোওলা—

· ভুল কীসের? পিলখানার এখন সে দিন নেই, তাই! এক সময় এখানে নবাবের তিরিশটা হাতি বাঁধা থাকত! তাই পিলখানা নাম। পিল মানে হল গিয়ে হাতি—এলিফ্যান্ট। বৃদ্ধ আবার খি-খি করে হাসলেন। এখন হাতি নেই। তার বদলে আমরা আছি। আমি, কেষ্টা, গোবর্ধন, আর ওই হরি। হরি একটু পরে আসবে। হরি না হলে জমে না! অ গোবরা, দেখে যা কে এসেছেন!

পেছনের দিকে কোত্থেকে কেউ খ্যানখেনে গলায় বলল,—কে, দাদুমণি?

বৃদ্ধ বললেন,—রামবাবুরে রামবাবু! মানে—আমাদের বড়বাবু। বুঝলি তো?

—যাচ্ছি, দাদুমণি!

ওরে অ কেষ্টা, হরিকে গিয়ে বল রামবাবু এসে গেছেন।

আমি ভাবলুম, ভুলটা যখন ভাঙছে না এঁদের, না ভাঙুক। বৃষ্টিরাতে এককাপ গরম চা ছাড়ি কেন? তারপর ব্যাপারটা কোথায় গড়ায়, দেখা যাক!

চা খেতে থাকলুম। বৃদ্ধ বললেন,—হ্যাঁ—যেজন্য খবর দিয়েছিলুম। ওর আসার আগে তার গোড়াপত্তন করা যাক। কথা হল ওই ভগলু কে নিয়ে।

—ভগলু কে?

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না। শুনেছি, ওপাশের ওই কবরখানার একটা গাছে কোত্থেকে এসে আড্ডা নিয়েছে। তা—

—গাছে? গাছে কেন?

—মাটি জুড়ে তো কবর। মুসলমানরা ওকে থাকতে দেবে কেন? ও তো হিন্দু। তাই খুব ঝগড়া হয়েছিল। শেষে রফা হয়েছে, গাছে তো আর কবর নেই। কাজেই গাছে ভগলু আস্তানা করতেই পারে।

—বেশ! তারপর?

—তা ভগলুর নাকি গাছে থেকে বৃষ্টিতে ভিজে খুব কাশি হচ্ছে। সারারাত খকখক করে কাশে। তাই আমাদের এই পিলখানায় আশ্রয় চায়। এদিকে কেষ্টাদের তাতে আপত্তি। ভগলুটা নাকি বেজায় নোংরা। ভগলু সেটা বুঝতে পেরে রোজ রাতে ঢিল ছুঁড়ছে। তিষ্ঠোনো যায় না।...

বলার সঙ্গে-সঙ্গে খুট করে একটা ঢিল পড়ল তফাতে। তিন দিক খোলা ঠাকুরদালানের মণ্ডপের মতো চত্বর। ঝটপট সরে বসলুম। বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন,—এই শুরু হল! কেষ্টা! গোবরা!

কেষ্টাকে দেখেছি। গোবরাকে দেখলুম। একটা প্রকাণ্ড কুমড়ো বললেই চলে। পরনে কেষ্টার মতোই হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি। দুজনে এসেই চত্বরের একদিকে দাঁড়িয়ে ঘুষি পাকিয়ে অন্ধকারের দিক লক্ষ করে চেঁচাতে থাকল, ভগলু দাঁতের পাটি খুলে নেব বলে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ উত্তেজিতভাবে বললেন,—দেখলেন তো স্বচক্ষে, রামবাবু? এজন্য আপনাকে ডাকা। এর বিহিত না করলে তো থাকা যায় না।

অনুমান করলুম, ওদিকটাই তাহলে কবরখানা। তার মানে ওটা গোবরা গোরস্তান এবং তার মানে আমাকে রিকশোওলা উল্টো দিকে এনে ফেলেছে। এবং তার মানে...

না। মাথা ঠিক রাখতে হবে। বললুম,—আপনারা শান্ত হোন। আমি দেখছি ব্যাটাকে!

কেষ্টা আমার কথা শুনে সাহস পেল যেন। ফের চ্যাচাল ভগলুর উদ্দেশে।

কী হচ্ছে রে ভোগলে! দাঁড়া—রামবাবু যাচ্ছে! কে সে জানিস তো? বেনে-পুকুর থানার বড়বাবু! তোকে বেঁধে গুঁতো মারতে-মারতে হাজতে নিয়ে যাবে।

অন্ধকার থেকে ভগলুর কথা ভেসে এল,—আরে যা যা! কেত্তা দারোগা হাম দেখ লিয়া। বিহার মুল্লুককা কেত্তা দারোগাভি এ ভগলুকো দেখা, তো তেরা বাঙালি দারোগাবাবু!

গোবর্ধন বলল,—শুনলেন দাদা, শুনলেন ব্যাটার আস্পর্ধার কথা?

গলা চড়িয়ে বললুম,—ভগলু! তুমকো হাম আভি অ্যারেস্ট করে গা।

যস্মিন দেশে যদাচার। যে জায়গায় এসে পড়েছি, তাতে তাল দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আমার শাসানি শুনে ভগলু তার গাছের আস্তানা থেকে হিহি করে হেসে বলল,—চলা আও না! আও বাঙালিবাবু!

বৃদ্ধ বললেন,—আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছে রামবাবু, শুনছেন তো?

বললাম,—দাঁড়ান, দেখাচ্ছি মজা ওকে।

উঠে দাঁড়িয়ে ভাবছি, ওই হচ্ছে ভেগে পড়ার মোক্ষম সুযোগ। এমন সময় অন্ধকারে কবরখানার দিকে চ্যাঁচামেচি শোনা গেল,—কেষ্টা! গোবরা! দাদুমণি! চলে এসো শিগগির! ভোগলে ব্যাটার ঠ্যাং ধরে ফেলেছি। সেই সঙ্গে ভগলুরও চ্যাঁচামেচি চলেছে,—ছোড় দে! ছোড় দে হরিয়া! হাম গির যায়ে গা! গির যানে সে হাম ফজলু খাঁকা উপরমে গিরেগা। উও কসাই আছে। হামকো জবাই করেগা।

হ্যাঁ—গাছের নিচে এক কসাই ফজলু খাঁয়ের কবর! তার ওপর পড়লে গলায় ছুরি চালিয়ে দেবে। তাই ভগলু ত্রাহি-ত্রাহি আর্তনাদ করছে। কিন্তু হরি তার ঠ্যাং ছাড়ার পাত্র নয়। এদেরও ডাকছে।

বৃদ্ধ, কেষ্টা আর গোবর্ধন ঝপাং-ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হল। লণ্ঠনটা জ্বলছে। চায়ের কাপপ্লেট পড়ে আছে। আমিও ঝাঁপ দিলুম—তবে গেটের দিকে।

বৃষ্টিটা ছেড়েছে এতক্ষণে। জল ভেঙে প্রাণপণে এগিয়ে গেলুম যেদিক থেকে এসেছি, সেই দিকে! একখানে একটা বাড়ির রোয়াকে লণ্ঠন দেখলুম। কিন্তু আর সাহস হল না তাকাতে। যদি আবার...

তেরো ভূতের কবলে

সবে চাঁদটা উঠেছে, আর তার ফিকে জ্যোৎস্নায় সার বেঁধে একদঙ্গল ছায়ামূর্তি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের কালো মুখে সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিক করছে। তারপর তারা এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসতে থাকল।

কেকরাডিহির মাঠে অনেক বছর আগে এক সন্ধ্যাবেলায় এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য

মনে পড়লে এখনও আতঙ্কে আমার শরীর হিম হয়ে যায়। কথায় বলে বারো ভূতের পাল্লায় পড়া। আমি পড়েছিলুম তেরো ভূতের পাল্লায়।

ছিপ ফেলে মাছ ধরার বাতিক তো কম দুঃখে ঘোচেনি। অমন দামি বিলিতি হুইল মুচড়ে ভেঙে ট্রেনের জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলেছিলুম। তারপর নাক কান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আর কদাচ ছিপ হাতে করব না। সেই প্রতিজ্ঞা এখনও রেখেছি। উপরন্তু মাছ কেন, আমিষ খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি। তাই বেশ নিরাপদেই আছি বলতে গেলে।

ব্যাপারটা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না জানি। কিন্তু এতদিন পরে কাগজে পড়লুম, কেকরাডিহির কাছে সেই কাকমারি ঝিলে সরকার মৎসচাষ প্রকল্প শুরু করবেন। কাজেই আগাগোড়া ছাপার হরফে সবটাই বলে দেওয়া উচিত—লোকেরা যদি সাবধান হয়। কিন্তু মাছখেকো বাঙালি পরলোকে গিয়েও মাছের জন্য ছোঁকছোঁক করে। আমার কথা শুনবে কি কেউ?

বছর-পাঁচেক আগের কথা। তখন আমার ছিপের নেশা ছিল প্রচণ্ড রকমের। আমাদের মফস্বল শহরটার আনাচে-কানাচে এমন পুকুর বা জলা ছিল না, যেখানে আমি ছিপ ফেলিনি। নেশা তুঙ্গে উঠলে তখন দূরে যাওয়া শুরু করেছিলুম। কোথায় কোন গ্রামে কার পুকুরে কীরকম মাছ আছে, তক্কে-তক্কে থেকে খবর নিতুম আর সেখানে গিয়ে হাজির হতুম।

মাছ তো বাজারে পয়সা দিয়ে কেনা যায়। আবার জাল ফেলেও মাছ ধরতে অসুবিধে নেই। কিন্তু ছিপ ফেলে মাছ ধরার কোনও তুলনা হয় না। তার চেয়ে বড় কথা, মাছ ধরার চেয়ে মাছের আশায় জলের ধারে বসে থাকার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই।

নিরিবিলি নিঝুম পরিবেশ। দামের ওপর একঠ্যাঙে সাদা বক বসে যেন ধ্যান করছে। মাছের প্রতীক্ষায় থেকে হঠাৎ কোনও তিতি-বিরক্ত মাছরাঙা চ্যাঁ-চ্যাঁ চেঁচিয়ে উঠছে। জলের ওপর তরতরিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে জলমাকড়সার ঝাঁক। টুকটুকে লাল গাংফড়িংটা ফাতনার ওপর উড়ে-উড়ে ছোঁ মারছে। তারপর ফাতনার কাছে জলের বুজকুড়ি ফুটছে। হ্যাঁ, চারে মাছ এসেছে। এত মোটা বুজকুড়ি যখন, তখন মাছটা হয়তো কিলোদশেক হবে। উত্তেজনায় রক্ত চনমন করছে। ঝুঁকে বসে ছিপটা শক্ত করে ধরেছি। ফাতনা নড়লেই মারব এক জোরাল খ্যাঁচ। তারপর...

ঠিক এই মুহূর্তে বিদঘুটে ঘটনাটা ঘটতে শুরু করেছিল। কিন্তু তখনও কিছু টের পাইনি।

তার আগের কথাটা বলে নিই।

শুনেছিলুম কেকরাডিহির ওদিকে একটা ঝিল আছে। তার নাম কাকমারি ঝিল। কাকের কথাটা কেন আসছে জানতুম না। পরে অবশ্য জেনেছিলুম। তো সেই ঝিলে নাকি আদ্যিকালের বিশাল-বিশাল সব মাছ আছে। ছিপ ফেললে তারা এসে টোপ ঠোকরায় বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ একটা মাছও গাঁথতে পারেনি বঁড়শিতে। সেই শুনে আমার জেদ চড়ে গিয়েছিল।

আশ্বিনের এক দুপুরবেলা কেকরাডিহি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পড়লুম। নেমে দেখি, ছোট্ট এক স্টেশন। খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। স্টেশনমাস্টার বয়সে প্রবীণ। আমাকে দেখে একটু হেসে বললেন,—কাকমারির ঝিলে ছিপ ফেলতে এসেছেন বুঝি? যান গিয়ে দেখুন যদি একটা গাঁথতে পারেন। তবে...

ওঁকে হঠাৎ চুপ করতে দেখে বললুম,—তবে কী?

উনি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে বললেন,—কিছু না। বলছিলুম কী, একটু সাবধানে থাকবেন।

—কেন বলুন তো? ছিনতাইয়ের ভয় আছে নাকি?

স্টেশনমাস্টার এবার কেমন যেন হাসলেন,—না-না। জঙ্গুলে জলা জায়গা। ওখানে ছিনতাইবাজরা যাবে কী আশায়? কাক। বুঝলেন? কাকের বড় উপদ্রব ওখানে। সেজন্যই তো কাকমারি ঝিল নাম হয়েছে। মাছ মারবেন, না কাক মারবেন, সেটাই প্রবলেম। যাক গে। এসেই পড়েছেন যখন, তখন আর দেরি করবেন না। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসুন ভালোয়-ভালোয়।

এই সব অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।

ভদ্রলোক স্টেশনঘরে ঢুকে গেছেন। চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলুম,—ঝিলটা কোনদিকে বলুন তো?

জানালায় মুখ বাড়িয়ে বললেন,—নাক বরাবর হেঁটে যান। আর একটা কথা। মাছ যদি গাঁথতে পারেন, আমার কিন্তু ওয়ানথার্ড পাওনা রইল। তারপর হেঁ-হেঁ করে বিদঘুটে হাসতে লাগলেন।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাক বরাবর হাঁটতে থাকলুম। রাস্তা-টাস্তা নেই। পোড়ো জমির ওপর ঘন ঘাস আর ঝোপঝাড় গজিয়ে রয়েছে। বেশ খানিকটা এগিয়ে ঝিলটা দেখা গেল। দারুণ সুন্দর পরিবেশ। জলজ গাছ আর দামে ঢাকা ঝিলটা আয়তনে প্রকাণ্ড বলা যায়। মস্ত বটগাছের তলায় মাছ ধরার ঘাটটা দেখে মনে আনন্দে নেমে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যে চার ছড়িয়ে টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে আরাম করে ছায়ায় বসে পড়লুম।

কিছুক্ষণ পরে ফাতনার কাছে বুজকুড়ি কাটতে দেখে ছিপ বাগিয়ে ধরেছি। তারপর ফাতনাটা নড়ে ওঠা মাত্র যেই খ্যাঁচ মারতে গেছি, অমনি কা-কা করে কোত্থেকে একঝাঁক কালো কুচকুচে কাক আমার মাথায় ওপর কালো চাকার মতো পাক খেতে শুরু করেছে। তাদের বিকট চ্যাঁচামেচিতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।

কাকের কথাটা পথে আসতে-আসতে ভুলেই গিয়েছিলুম। ছিপ ছেড়ে দিয়ে প্রচণ্ড খাপ্পা হয়ে পড়লুম। তারপর ঢিল কুড়িয়ে কাকগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা করলুম। এই করতে গিয়ে আমার টুপিটা পড়ে গেল! আমার মাথায় বিরাট টাক। ধড়িবাজ কাকগুলো সেই টাক লক্ষ করে ঝাঁপিয়ে আসতে থাকল। তখন মরিয়া হয়ে ছিপ তুলে বাঁই-বাঁই করে ঘোরাতে শুরু করলুম। গাছের পাতায় শেষপর্যন্ত বঁড়শি আটকে গেল বটে, কিন্তু এবার কাকগুলো জব্দ হয়ে সরে গেল। বটগাছটার মাথায় গিয়ে বসল।

আগে জানলে গোটাকতক পটকা আনতুম সঙ্গে। কী আর করা যায়। অনেক

কষ্টে পাতা থেকে বঁড়শি ছাড়িয়ে টোপ গেঁথে ঠিক জায়গায় ফেলে বসে রইলুম। কিন্তু এবার সতর্ক হয়েছি। বারবার পিছন ফিরে দেখে নিচ্ছি। কিন্তু কাকগুলো আর টুঁ করছে না। ডালপালার ভেতর কোথায় বুঝি ঘাপটি মেরে বসে আছে। কয়েক মিনিট নির্ঝঞ্ঝাট কেটে গেলে বুঝলুম, বাছাধনরা ভয় পেয়ে গেছে। দৈবাৎ বঁড়শি গেঁথে গেলে কী অবস্থা হবে, নিশ্চয় আঁচ করেছে।

ফাতনার কাছে বুজকুড়িগুলো মিলিয়ে গেছে কখন। মাছটা হয়তো ডাঙার ওপর ওই হুলুস্থুলু টের পেয়ে কেটে পড়েছে। কাকগুলোর ওপর রাগে খাপ্পা হয়ে গেলুম! তারপর খেয়াল হল, ওই যাঃ। টুপিটা কোথায় পড়েছে খুঁজে আনতে হয়। কাকের লক্ষ্যস্থল আমার এই বিরাট টাকাটাকে এখনও ঢাকিনি কোন্ আক্কেলে?

টুপিটা ঝোপের পাশে পড়ে ছিল। কুড়িয়ে মাথায় পরেছি, হঠাৎ বটতলার অন্যপাশ থেকে একটা কালো খেঁকুটে চেহারার লম্বানেকো লোক বেরিয়ে এল। পাড়াগাঁয়ের মাঠে খেতখামারে যারা কাজ করে, সম্ভবত তাদেরই কেউ। কোমরে একটুখানি ন্যাকড়া জড়ানো শুধু, বাদবাকি শরীর নগ্ন। একগাল হেসে সে বলল,—মাছ ধরতে পারলেন বাবুমশাই?

বিরক্ত হয়ে বললুম,—কই আর পারলুম? যা কাকের উপদ্রব!

লোকটা খ্যাঁ-খ্যাঁ ধরনের হাসি হেসে বলল,—বলে দেব। আর ঝামেলা করবে না—তবে কিন্তু মাছের ভাগ দিতে হবে বাবুমশাই!

—তা না হয় দেব! কিন্তু বলে দেব মানে কী? কাকগুলো কি তোমার পোষা কাক নাকি?

—আজ্ঞে কতকটা।

—কতকটা মানে?

লোকটা তার লম্বা নাকের ডগা চুলকে বলল,—অত কথায় কাজ কী বাবুমশাই? যান, বসুন গে।

ছিপের কাছে বসলুম আবার। ভাবলুম লোকটা আসলে রসিকতা করছে। বললুম,—ওহে! মাছ ধরতে পারলে তোমাকে একটা অবশ্যই দেব! তুমি দেখ, যেন কাকগুলো আর বিরক্ত না করে, বরং গাছের ডাল ভেঙে নাও একটা।

লোকটা বলল—কিছু ভাববেন না। আপনি ফাতনার দিকে চোখ রাখুন।

ফাতটানার কাছে আবার বুজকুড়ি ফুটে উঠল। ছিপ বাগিয়ে ধরলুম। ফাতনাটা নড়লেই খ্যাঁচ মারব। কিন্তু সেই সময় পেছনে বটতলায় ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ শব্দ হল এবং চেরাগলায় কারা চ্যাঁচামেচি করে দৌড়ে এল,—মাছ! মাছ! মাছ! মাছ!

ঘুরে দেখি, সেই লোকটার মতোই কালো কুচকুচে লম্বানেকো একদল লোক এসে হাজির। তারা মাছ-মাছ—বলে চ্যাঁচেমেচি করছে এবং আগের লোকটা তাদের থামাবার চেষ্টা করছে। রাগে মহাখাপ্পা হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। তারপর প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললুম,—চুপ সব। চুপ! পেয়েছ কী তোমরা? এখানে হইচই করছ কেন অত?

লোকগুলো একগলায় বলল,—মাছ, মাছ।

তেড়ে গিয়ে বললুম,—মাছ ধরতে না ধরতেই মাছ চাইতে এসেছ। ধরলে তবে তো!

আগের লোকটা বলল,—বাবুমশাই বড় ভালোমানুষ। তোরা খামোকা চ্যাঁচাচ্ছিস কেন বাপু? মাছ আগে বঁড়শিতে ধরা পড়ুক। শুনুন বাবুমশাই, আমরা মোটমাট বারোজন আছি। বেশি নয়, মাথাপিছু একটা করে টুকরো দেবেন। ব্যাস। বলে সে ঠোঁট চেটে নিল! আহা! কতকাল আমরা মাছ খাইনি!

এসব লোকের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। একে আমি একা, আর ওরা বারোজন। তাই আবার ছিপের কাছে গিয়ে বসলুম। চারের মাছটা আবার পালিয়েছে। মাছ ধরতে বসার আনন্দটাও আর নেই। স্টেশনমাস্টারও কি এজন্যই সাবধানে থাকতে বলেছিলেন?

একটু পরে ওদের দেখার জন্য পেছনে তাকালুম। অবাক হয়ে দেখলুম ধেড়ে লোকগুলো বাচ্চা ছেলেদের মতো বটগাছটার ঝুরি বেয়ে উঠছে কেউ, কেউ ডালে চড়ে বসেছে, কেউ ডাল থেকে ধুপ করে পড়ছে। আবার ঝুরি বেয়ে উঠে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে একপাল হনুমান যেন। বয়স্ক লোকেরা এমন কেন খেলে, কস্মিনকালে তো দেখিনি।

এতক্ষণে একটু খটকা লাগল। কিন্তু চারে বুজকুড়ি দেখা দিয়েছে। মাছটা টোপ না খেয়ে ছাড়বে না। ফাতনার দিকে মন না দিয়ে তারা কী করছে, তাই নিয়ে মাথা ঘামান বৃথা।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে-পরে পেছনে তাকাতে অবশ্য ভুলিনি। লোকগুলো যেন আপনমনে খেলায় মেতে রয়েছে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। ফাতনাটা একবার নড়ল মনে হল। কিন্তু দোনামনার জন্য খ্যাঁচ মারতে পারলুম না। দুপুর ঘনিয়ে বিকেলে নামল। বিকেলও ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছিল। আলো কমে এল। পেছনে বটের ঝুরি এবং ডালপালায় লোকগুলো একই ভঙ্গিতে খেলায় মেতে আছে। তারপর ওদের কথা মন থেকে ঝেঁটিয়ে ফেললুম। চুলোয় যাক ওরা। ছিপে মাছ ধরতে একাগ্রতা দরকার। মনে আশা জেগেছে, অনেক মাছ ঠিক সন্ধ্যার মুখে টোপ ধরে মোক্ষম টান দেয়—এই মাছটাও তাই করবে।

কিন্তু হাতের রেখা মুছে ফেলার মতো ধূসরতা ঘনিয়ে উঠল এবং ফাতনাটাও অস্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন হতাশ হয়ে ছিপ গুটিয়ে ফেললুম। ঝিলের জলের ওপর কুয়াশার পর্দা ঝুলছে। শূন্য ঝোলা আর ছিপটা হাতে নিয়ে ক্লান্তভাবে পা বাড়ালুম। বটতলায় আবছা আঁধার জমেছে। পোকামাকড় ডাকতে শুরু করেছে। কিন্তু লোকগুলো কোথায় গেল? ভাবলুম, মাছ গাঁথতে পারিনি লক্ষ করে ওরাও হতাশ হয়ে কেটে পড়েছে।

একটু দূরে কেকরাডিহি স্টেশনের সিগন্যাল বাতি জ্বলজ্বল করছিল। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমার ফেরার ট্রেন। ধীরেসুস্থে হাঁটছিলুম। সবে চাঁদটা বেরিয়ে এসেছে। ফিকে জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে কেকরাডিহির মাঠে। লোকগুলো এবং কাকগুলোর চেহারার

মধ্যে কেমন যেন মিল আছে—ভাবতে-ভাবতে খটকাটা বেড়ে গিয়েছিল। তারপর মনে হল, আমারই দেখারই ভুল। রোদ-বৃষ্টি-শীতে খেটে ওদের চেহারা অমন খেঁকুটে হয়ে গেছে। আর কাকের হামলাও কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এদিকে মাছের ওপর গ্রামের লোকের অমন কাঙালপনা থাকতেই পারে। সব মাছ তো শহরে চালান যাচ্ছে আজকাল। কাজেই একটা অকারণ একটা স্বাভাবিক ব্যাপারকে রহস্যময় বলে ডাকছি।

কিন্তু হঠাৎ দেখি, সামনে একদঙ্গল ছায়ামূর্তি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। থমকে দাঁড়ালুম। তাদের কালো মুখে সাদা দাঁত ঝিকমিক করছে। আতঙ্কে বোবাধরা গলায় বলে উঠলুম,—কী—কী চাই তোমাদের?

তখনকার মতো একগলায় ওরা চেঁচিয়ে উঠল,—মাঁছ-মাঁছ!

এতক্ষণে নাকি-স্বরে মাছ উচ্চারণ শুনেই শরীর হিম হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারলুম ওরা কে। ঠক-ঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে বললুম,—মাছ তো পাইনি।

একসঙ্গে ব্যাটাচ্ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল,—মিছে কঁথা। মিছে কঁথা।

কাকুতিমিনতি করে বললুম,—বিশ্বাস করো, মাছ পাইনি।

একজন বলল,—ওঁরে। ওঁরে ঝোঁলাটা কেঁড়ে নেঁ!

তারপর দেখি, ওরা এক পা করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। অমনি ঝোলাটা ছুড়ে ফেলে দিলুম। ওরা বিদঘুটে চ্যাঁচামেচি করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝোলাটার ওপর। আর সেই সুযোগে আমি দৌড় দিলুম। দৌড়-দৌড়-দৌড়! একেবারে স্টেশনে পৌঁছে সোজা স্টেশনঘরে ঢুকে পড়লুম।

টেবিলের ওপর রেলের লণ্ঠন জ্বলছে। কিন্তু স্টেশনমাস্টার কোথায় গেলেন? হাঁফাতে-হাঁফাতে তাঁকে ডাকব ভাবছি, কোণার অন্ধকার জায়গা থেকে তাঁর সাড়া পেলুম,—কী মশাই, মাছ পেলেন নাকি?

বললুম,—মাছ তো দূরের কথা, কাকমারির ঝিলে গিয়ে জোর বেঁচে গিয়েছি। উঃ! আপনি ঠিকই বলেছিলেন।

কিন্তু আমার যে মাছের ভাগ চাই! কথা দিয়েছেন। —বলে স্টেশন-মাস্টার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলেন। মুখে সেই অদ্ভুত হাসিটা। আমি মাছ খেতে ভালবাসি। মাঁছ আঁমার চাঁই!

শেষ বাক্যটি কী নাকিস্বরে উচ্চারণ করলেন? আর ঠিক সেই লম্বানেকো আজব প্রাণীগুলোর মতোই ওঁর গায়ের রং এবং উনি এক পা করে আমার দিকে এগুচ্ছেন দেখছি। এক লাফে বেরিয়ে যাব ভাবছি, হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকে হেঁড়ে গলায় গর্জন করল,—তবে রে ব্যাটা মাছখেকো! আবার তুমি আমার আপিসে ঢুকে বসে আছ?

স্টেশনমাস্টাররূপী লোকটা অমনি জানালা গলিয়ে পালিয়ে গেল। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। আসল স্টেশনমাস্টার—যাঁর সঙ্গে তখন আলাপ হয়েছিল, হাসতে-হাসতে বললেন,—ভয় পাননি তো? এই অখাদ্য স্টেশনে মশাই

এইসব ঝামেলা লেগেই আছে। দেশে মাছের বড্ড আকাল। যাকগে, বসুন। মুখ দেখেই বুঝেছি কী ঘটেছে।

যাই হোক, সেই আমার ছিপে মাছ ধরার নেশা ঘুচে গেছে তো গেছে! আসার সময় ছিপটা ভেঙে ট্রেনের জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়েছি। এখন বেশ শান্তিতেই আছি। নিরামিষ খাই-দাই।...

দারোগা, ভূত ও চোর

কৈলাসপুর থানার দারোগাবাবু ভূতনাথ পাত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল নেহাত দৈবদুর্বিপাকে। পাড়াগাঁয়ের এক রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে গিয়েছিলুম। সবে উদ্বোধন সঙ্গীত শেষ হয়েছে, হইহই-রইরই করে তেড়ে এসে গেল কালবৈশাখি। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। সে এক ধুন্ধুমার অবস্থা। মঞ্চের তেরপল উড়ে গিয়ে কোন তেপান্তরের মাঠে পড়ল কে জানে! গাঁয়ের লোকজন আর কাচ্চাবাচ্চা যে যার বাড়ি গিয়ে ঢুকল। উদ্যোক্তাদের আর খুঁজে পেলুম না। একে তো ভর সন্ধেয় অনুষ্ঠান শুরু। তার ওপর ঝড়বৃষ্টির কালো রং সন্ধ্যাটাকে বেজায় আলকাতরা করে ফেলল। ভাগ্যিস বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। মাথা বাঁচাতে দৌড়ুচ্ছিলুম দিশেহারা হয়ে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে ঘন গাছপালার ভেতর একটা বাড়ি দেখে তার বারান্দায় উঠলুম। কিন্তু বারান্দায় টেঁকা দায়। দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখি, দরজা ভাঙা। ভেতরে ঢুকে পড়লুম।

পকেটে দেশলাই ছিল। ভিজে গেছে ততক্ষণে। কোনওরকমে একটা কাঠি জ্বালিয়ে যা দেখলুম, তাতে স্বস্তি পেলুম না। মেঝেয় আবর্জনার ডাঁই, ইঁদুরের গর্ত, চামচিকের নাদি—একটা সাপের খোলস পর্যন্ত।

সর্বনাশ! বাড়িটা যে দেখছি পোড়োবাড়ি। ভূতকে যদি বা মন্তরতন্তর আওড়ে জব্দ করতে পারি, সাপকে মন্তরতন্তরে বশ করব এমন ওঝা তো আমি নই। কারণ শুনেছি সাপ কানে শোনে না। ভূত কিন্তু দিব্যি শুনতে পায়। কারণ তার আমাদের মতোই একজোড়া কান আছে—সে কান যত বিদঘুটে গড়নেরই হোক না কেন? সাপের যে কানই নেই।

মরিয়া হয়ে ওপাশের আরেকটা ভাঙা দরজা পেরিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকলুম। ফের দেশলাই জ্বেলেই দেখি একটা সাইকেল চকচক করছে। তাহলে মানুষ আছে।

কিন্তু যেই সাইকেলের মালিককে ডাকতে গেছি, দেশলাই কাঠিটাও নিভেছে হঠাৎ কেউ শক্ত হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে গর্জে বলে উঠল,—তবে রে ব্যাটা চোর!

আর্তনাদ করে উঠলুম,—আঃ! লাগছে, লাগছে! ছাড়ুন—আমি চোর নই। আমি প্রধান অতিথি।

মুখের ওপর অনেকটা উঁচু থেকে আওয়াজ এল,—কী বললে?

প্রধান অতিথি। —হাঁফাতে-হাঁফাতে বললুম। আমি এখানে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলুম।

লোকটা আমাকে ছেড়ে দিল। তারপর টর্চ জ্বেলে ভাল করে আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল,—হুম্। সেইরকমই মনে হয় বটে। মশায়ের নাম?

নাম বললে তাগড়াই উঁচু লোকটা নমস্কার করে বলল,—যাক্ গে। আলাপ করে বেজায় আনন্দ হল। আপনার এক গুণমুগ্ধ পাঠক আমি।

জিগ্যেস করলুম,—আপনার নামটা জানতে পারলে আনন্দ হত।

আমি ভূতনাথ পাত্র। কৈলাসপুর থানার চার্জে আছি।—ভূতনাথ দারোগা প্রাণখোলা হেসে বললেন। আর বলবেন না মশাই। এ গাঁয়ে এসেছিলুম একটা দাগী আসামি ধরতে। ঝড়-বৃষ্টির চোটে সে ব্যাটাকে কায়দা করতে পারলুম না। সেপাইরাও মাথা বাঁচাতে কে কোথায় কেটে পড়ল। আমিও বেগতিক দেখে এই পোড়োবাড়িতে আশ্রয় নিলুম।

ভূতনাথকে খুব অমায়িক লোক মনে হচ্ছিল। একথা-সেকথার পর জিগ্যেস করলুম,—এই পোড়োবাড়িটা কার জানেন দারোগাবাবু?

ভূতনাথ বললেন,—শুনেছি এ বাড়িটার মালিক ছিলেন কোন এক হারাধনবাবু। একা থাকতেন। তাঁকে এক রাত্তিরে ডাকাত এসে খুন করেছিল।

চমকে উঠে বললুম,—সর্বনাশ! তারপর?

ভূতনাথ বললেন,—তারপর আর কী? হারাধনবাবুর মৃত্যুর পর বাড়ির মালিকানা নিয়ে ওঁর আত্মীয়দের মধ্যে মামলা বাধে। সেই মামলা এখনও চলছে। এদিকে বাড়ির অবস্থা তো দেখছেন। শ্যাল-কুকুর, প্যাঁচা-ছুঁচো-চামচিকের আখড়া হয়ে উঠেছে। ভূত থাকাও আশ্চর্য নয়। ওই যে আপনি 'ভূতের কেত্তনে লিখেছেন, বাড়ি খালি পড়ে থাকলেই ভূতেরা এসে জোটে এবং রাত-বিরেতে কেত্তন গায়।

ভূতনাথ দারোগা হ্যাঁ-হ্যাঁ, খ্যাঁক-খ্যাঁক করে প্রচণ্ড হাসতে থাকলেন। ওদিকে বাইরে তুলকালাম ঝড়, বৃষ্টি, বাজের ডাকে—সে এক প্রলয়কাণ্ড চলছে।

হাসি থামিয়ে ভূতনাথ বললেন,—এই পোড়োবাড়িতে ভূত থাকলে সত্যি বড় মজা হত। বুঝলেন? ভূতের সঙ্গে জমিয়ে এখন আড্ডা দেওয়া যেত। কেত্তন শুনতেও আপত্তি ছিল না—যদিও কেত্তন জিনিসটা আমার ধাতে সয় না। কারণ ওতে গানের চাইতে খোল কত্তালের আওয়াজ বড্ড বেশি। আপনার কী মত?

বললুম,—ঠিকই বলেছেন। তবে কী জানেন? ভূত নিয়ে বই লিখি-টিখি বটে, কিন্তু চর্মচক্ষে ভূত দেখতে আমার আপত্তি আছে।

কেন, কেন?—ভূতনাথ খুব আগ্রহের সঙ্গে জিগ্যেস করলেন।

বইয়ের ভূতেরা মারাত্মক হয় না। সত্যিকার ভূত খুব সাংঘাতিক বলেই আমার ধারণা। তারা নাকি ঘাড় মটকে মানুষকে মেরে ফেলে। ভয়ে-ভয়ে কথাটা বলে এদিক ওদিক তাকালাম। জানালাও ভাঙা। বিদ্যুতের ঝিলিকে বাইরে উঠোন দেখা যাচ্ছে। ঘরে দারুণ অন্ধকার। ভূতনাথ টর্চ নিভিয়ে ফেলেছেন কখন।

দারোগাবাবু খিকখিক করে হেসে বললেন,—ধুর মশাই। ভূতের আবার সত্যি-মিথ্যে আছে নাকি? ভূত ইজ ভূত। ভূতকে ভয় পেতে নেই। তাছাড়া আমি পুলিশের দারোগা। আমায় দেখলেই ভূতের হৃৎকম্প হয়।

এইসময় খ্যানখেনে গলায় ভেতরের দরজার কাছে কে বলে উঠল,—কে বাপু তোমরা খালি ভূত-ভূত করছ তখন থেকে?

ভূতনাথ টর্চের বোতাম টিপলেন হয়তো, পুট-পুট আওয়াজ শুনলুম। কিন্তু আলো জ্বলল না। ভূতনাথ রেগেমেগে বললেন,—ধ্যাত্তেরি!

আমি আরেকজন মানুষের সাড়া পেয়ে প্রথম চমকালেও পরে সাহসী হয়েছি। বললুম, তুমি কে হে? সাড়া না দিয়ে ঘরে ঢোকাটা ঠিক হয়নি কিন্তু।

বিদ্যুতের আলোর ঝিলিকে রোগা একটা লোককে দেখতে পেলুম। খালি গা। ভিজেছে বলেই মনে হচ্ছিল। সে বলল,—তখন থেকে ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি আর তোমাদের কেত্তন শুনছি। আমায় ভয় পাওনা বুঝি?

ভূতনাথ খাপ্পা হয়ে বললেন,—তুমিই আস্ত ভূত। সাড়া না দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিলে কোন মতলবে? কে তুমি? বাড়ি কোথায়?

লোকটাও চটেমটে বলে উঠল,—দারোগাই হও আর যেই হও বাপু, ভদ্রতা করে কথা বলবে। ইস! বলে—কে তুমি, বাড়ি কোথায়! আমার বাড়িতে আমারই শোওয়ার ঘরে ঢুকে আমাকে ধমক দেওয়া হচ্ছে! কী স্পর্ধা।

আমার একটু সন্দেহ জাগল। বললুম,—মশায়ের নাম কি হারাধনবাবু?

—আবার কী? আমি সেই হারাধন জোয়ারদার।

আমার বুকে হাতুড়ির শব্দ হতে থাকল। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। কিন্তু ভূতনাথ দারোগা হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন,—এ ব্যাটা নির্ঘাৎ উন্মাদ। বদ্ধ পাগল। হারাধনবাবু শুনেছি মান্ধাতার আমলে ডাকাতের হাতে খুন হয়ে মারা পড়েছেন!

চোপরাও। —লোকটা গর্জে উঠল। কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ যেন। তারপর ভেংচি কেটে বলল,—ডাকাতের হাতে খুন হয়ে মারা পড়েছে—তো কী হয়েছে?

দারোগাবাবু আমাকে লক্ষ করে বললেন,—শুনছেন? শুনছেন মশাই ব্যাটার কথা?

এই? ব্যাটা-ব্যাটা কোরও না বলে দিচ্ছি! মানহানির মামলা করব। লোকটা শাসাল। আমার মাসতুতো ভাইয়ের নাতির বন্ধু এম. এল. এ। আমার ভাগ্নের সম্বন্ধীর খুড়ো এম. পি.-র প্রাইভেট সেক্রেটারি। আমার মেজদার শ্বশুর বিলেতে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাপের ক্লাসফেন্ড ছিলেন। সাবধান!

ভড়কে গিয়ে ভূতনাথ দারোগা বললেন,—আহা! ব্যাটা কি আপনাকে বলছি, বলছি আপনার ব্যবহারকে। আগে সাড়া নেই শব্দ নেই, হঠাৎ অমন করে কথা বলতে শুরু করলেন। তার ওপর বলছেন এক সৃষ্টিছাড়া কথা। যে মানুষ ডাকাতের হাতে খুন হয়, সে বেঁচে থাকে কেমন করে? বলুন না—এটা কি কেউ মানবে?

প্রচণ্ড শব্দ করে কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল। বাড়িটা কেঁপে উঠল থরথর করে। ভয় হল, ছাদ ভেঙে পড়বে না তো?

লোকটা দারোগাবাবুর কথায় একটু শান্ত হয়ে বলল,—দেখ বাপু। সত্যি বলছি, আমি মরিনি। হ্যাঁ—আমার দেহটা পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে; কিন্তু আত্মা? আত্মার তো বিনাশ নেই।

ভূতনাথ দারোগা আরও ভড়কে গিয়ে বললেন,—আপনি যদি হারাধনবাবুর আত্মা তাহলে যে-দেহ ধরে এসেছেন এবং কথা বলছেন, সেই দেহটা কোথায় পেলেন?

—চুরি করেছি।

—চুরি! আপনি তাহলে চোর! দারোগাবাবু পা বাড়াচ্ছেন। টের পেলুম অন্ধকারে। জানেন? আপনাকে তাহলে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি!

আবার ঝগড়া বাধবে দেখে বললুম,

—একটা কথা হারাধনবাবু। কার দেহ চুরি করেছেন? পাঁচু নামে একটা লোকের।

ভূতনাথ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন,—সেই দামি হারামজাদা পাঁচুর? কী কাণ্ড! আজ এক গাঁয়ে পাঁচুকেই তো পাকড়াও করতে এসেছিলুম!

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম,—ও হারাধনবাবু! পাঁচুর দেহটা যে চুরি করলেন, পাঁচুর আত্মার কী হল? তাকে কীভাবে তাড়িয়ে তার দেহ চুরি করলেন?

লোকটা তেমনি খ্যানখ্যানে গলায় হেসে বলল,—একটু আগে ব্যাটা পেঁচো পুকুরপাড়ে একটা গাছের তলায় বাজ পড়ে মারা গেছে। আমি ছিলুম সেই গাছের ডালে! যেই না পেঁচোর আত্মাটা দেহছাড়া হয়েছে, আমি সুড়ুৎ করে ওর দেহে ঢুকে পড়েছি। পেঁচোর আত্মা এখনও টের পায়নি অবিশ্যি। টের পেয়ে ঝগড়া করতে এলে না হয় ফেরত দেব। কী বলেন?

ভূতনাথ ততক্ষণে মনে -মনে বুঝি আইনের প্যাঁচ কষছিলেন। এবার বললেন, দেখুন মশাই! ভেবে দেখলুম, আমরা যখন কোনও আসামি পাকড়াও করি, তখন তার দেহটাকেই পাকড়াও করি। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, দেহটা পাঁচুর। অতএব পাঁচুর দেহকে অ্যারেস্ট করলে আইনসম্মত কাজ হয়। কই, দেখি হাত দুটো!

ভূতনাথের পকেটে নিশ্চয় হাতকড়া ছিল! অন্ধকারের মধ্যে মালুম হল, হাতকড়া নিয়ে এগোচ্ছেন। তারপর একটা ধস্তাধস্তির শব্দ শুনলুম! তারপর বিকট চেঁচিয়ে উঠলেন ভূতনাথ,—পাকড়ো! পাকড়ো! আসামি ভাগ যাতা!

বাইরে বিদ্যুতের আলোয় দেখলুম, ভূতনাথ দারোগা উঠোনে ছুটোছুটি করছেন বৃষ্টির মধ্যে। লোকটাকে দেখতে পেলুম না। একটু পরে ভূতনাথেরও পাত্তা নেই। ওঁর সাইকেলটা পড়ে রইল ঘরে।

এবার আমার ভীষণ ভয় হতে লাগল। মরিয়া হয়ে পাশের ঘরে, তারপর সেই ভাঙা দরজা দিয়ে বাইরে গেলুম। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে টলতে-টলতে কিছুটা এগিয়েছি, দেখি একদল লোক লণ্ঠন আর টর্চ নিয়ে আসছে।

আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্যোক্তারা।...

বছরখানেক পরে মফস্বলে এক আত্মীয় বাড়ি গেছি। ফেরার সময় রেলস্টেশনে

ভূতনাথ দারোগার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আরও প্রকাণ্ড হয়েছেন উনি। ভূঁড়ির বহরও বেড়েছে। একথা-সেকথার পর জিগ্যেস করলুম,—সেই পাঁচুর দেহটাকে শেষ পর্যন্ত পাকড়াও করতে পেরেছিলেন তো?

ভূতনাথ খ্যা খ্যা করে হেসে বললেন,—মনে আছে আপনার? মশাই, ব্যাটা আমার মতো ধুরন্ধর লোককেও কী রামঠকানো ঠকিয়েছিল ভাবা যায় না। বাজ পড়ে সত্যি-সত্যি পাঁচু-চোর মরেনি। কাজেই হারাধনবাবুর ভূতও তার দেহে ঢুকে ঝড়-বৃষ্টির সময় নিজের পোড়োবাড়িতে হাজির হননি। আসলে সাক্ষাৎ পাঁচুই আমাকে গণ্ডগোলে ফেলেছিল। ব্যাটা অসম্ভব ধূর্ত মশাই! আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছিল। কী স্পর্ধা।

দুই বন্ধু

আমাদের তেতলার এই ফ্ল্যাটের ঝুলবারান্দায় দাঁড়ালে বাড়িটা দেখা যায়। হাড়গোড় বের করা খুব পুরোনো একটা বাড়ি। পলেস্তারা কবে খসে গেছে। দেয়ালের ফাটলে গজিয়ে উঠেছে অশ্বত্থের চারা আর উঁচু-উঁচু ঘাস। কেউ না বললেও বুঝতে পেরেছিলুম, ওটা একটা পোড়োবাড়ি।

পোড়োবাড়িতে ভূত থাকে, তা সবাই জানে। ওই দোতলা বাড়িটার চারদিকে বস্তি এলাকা। নিচু টালির ছাদওয়ালা অজস্র ঘর আর গরু মোষের খাটাল। একটা পুকুরও আছে। সবসময় লোকজন গিজগিজ করে। প্রায়ই মাইক বাজে। মাইকের চোটে আমাদের কান ঝালাপালা।

তাই ভাবতুম, পোড়োবাড়ির ভূতগুলো টিকে আছে কীভাবে? চারপাশে এত সব লোক, এত গরুমোষ, তার ওপর সারক্ষণ দিনরাত মাইক।

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের গদাধরবাবু একজন ভূতবিশারদ। ভূতপ্রেত সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান অর্জন করেছেন সারাজীবন। করবেন না কেন? ভদ্রলোক ছিলেন জাঁদরেল দারোগা। থাকতেন মফস্বলের থানায়। চোর-ডাকাত ধরতে গাঁয়ে-গাঁয়ে রাতবিরেতে ঘুরতে হয়েছে। তার ফলে অসংখ্যবার ভূতের পাল্লায় পড়েছেন। ভূতেরাও তাঁর পাল্লায় পড়েছে। যেমন বাঘা তেঁতুল, তেমনি বুনো ওল। কত ভূতকে যে বেদম রামধোলাই দিয়েছেন, কহতব্য নয়। একবার চোর ভেবে গেরস্থবাড়িতে আনাচে-কানাচে ঘুর-ঘুর করা এক ভূতকেই পাকড়াও করে ফেলেছিলেন। থানায় নিয়ে আসার পথে তার সে কী কান্না—মাঁইরি স্যাঁর, আঁমি চোঁর নই, ভূঁত! যাঁ প্রমাণ চাঁইবেন, দেঁব। আঁমায় ছেঁড়ে দিঁন।

গদাই দারোগা বলে,—শেষ অবধি অনেক প্রমাণ আদায় করে তবে ব্যাটাকে ছেড়েছিলুম।

—কী প্রমাণ জ্যাঠামশাই?

—সে অনেক। পরে বলব'খন। ওরা ইচ্ছেমতো চেহারা ধরতে পারে। চেনা কঠিন। কলকাতার শহরে এত সব লোকের মধ্যে কত ভূত যে বেড়াচ্ছে, খবর রাখ? আমি টের পাই। কারণ, কে ভূত কে মানুষ, তার প্রমাণ আমার জানা।

পরে আর কথাটা জিগ্যেস করা হয়নি। উনিও তোলেননি। তবে এটুকু বুঝে নিয়েছিলুম, দারোগা জীবনে উনি সত্যি বড় দাপটওয়ালা পুলিশ অফিসার ছিলেন।

হ্যাঁ, ওঁকে আমি জ্যাঠামশাই বলেই ডাকি। এখন বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। প্রকাণ্ড মানুষ। চুল গোঁফ দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছে। অনেক রকম অসুখ-বিসুখে ভোগেন। সবচেয়ে কষ্টদায়ক বাঁ-হাঁটুর বাত। বাতটা বৃষ্টির সময় আর শীতকালে চাগিয়ে ওঠে। তখন লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

তো এই গদাই জ্যাঠা-ই বলেছিলেন—ওই দোতলা বাড়িটা দেখছ! ওটা একটা হানাবাড়ি। আজকাল পাড়াগাঁয়ে ভূতপ্রেতগুলোও খুব শহুরে হয়ে উঠেছে কিনা। বাড়ি খালি পেলে কথাই নেই। গতমাসে আমরা ফ্ল্যাটে তালা এঁটে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলুম। ফিরে গিয়ে টের পেলুম, একগাদা ভূত এসে আশ্রয় নিয়েছে। অনেক হাঙ্গামা করে তাড়াতে হল।

শুনে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। যদি কখনও বাইরে কোথাও যেতে হয়, কিছুতেই ফ্ল্যাট খালি রেখে যাব না। কাউকে রেখে যাব। ভূত বিশারদ গদাই জ্যাঠা অভিজ্ঞ মানুষ। ওঁর পরামর্শ কি অবহেলা করা যায়?

যাইহোক, জীর্ণ ওই দোতলা পোড়োবাড়ির ভূতগুলো সম্পর্কে গদাই জ্যাঠা অনেক খবরাখবর দিয়েছিলেন। ও বাড়ির ওপরে-নিচে মোটমাট দশখানা ঘর আছে নাকি। দশখানা ঘরে কমপক্ষে দশ ডজন ভূত বাস করে। বুড়োবুড়ি থেকে শুরু করে কাচ্চাবাচ্চা পর্যন্ত সব বয়সের ভূতই নাকি আছে। গদাই জ্যাঠা একদিন আলাপ করতে গিয়ে ব্যাজার হয়ে ফিরে এসেছেন। দারোগা ছিলেন শুনেই ভীষণ ভয় পেয়ে ওরা মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

আমি জিগ্যেস করেছিলুম,—আচ্ছা গদাই জ্যাঠা, আপনার কাছেই তো শুনেছি, ভূতেরা নিরিবিলি থাকতে ভালোবাসে। হই-হল্লা আলো এসব পছন্দ করে না। অথচ ওই বস্তি এলাকায় এত মাইকের চ্যাঁচামেচি, হই-হল্লা, ভিড়-ভাড়াক্কা! তাহলে ওরা টিকে আছে কীভাবে।?

গদাই জ্যাঠা ফিক করে হেসে বলেছিলেন,—বুঝলে না? এরা যে একেলে ভূত। এদের স্বভাব একেবারে উল্টো। এরা হই-হল্লা জেল্লাই পছন্দ করে। বিশেষ করে একেলে ভূতেরা হিন্দি ফিল্মের বড় ভক্ত। কলকাতার এত সব সিনেমাঘরে হিন্দি ফিল্ম দেখে মৌজে যারা বসে থাকে, তাদের শতকরা কতজন মানুষ আর কতজন ভূত জান?

—তা তো জানিনে জ্যাঠামশায়!

—ফর্টি পারসেন্ট। শতকরা চল্লিশজন।

—ওরে বাবা বলেন কী?

—হ্যাঁ। তাহলে খুলেই বলি। কাকেও বলো না কিন্তু।—বলে গদাধর ফিসফিস করে জানিয়েছিলেন—একদিন একটা সিনেমা হলে টিকিট কাউন্টারে বিরাট লাইন দেখে সন্দেহ হল। শুনলুম, আগের রাত থেকে পরদিন বিকেল অব্দি এই লাইন জমে আছে। একি মানুষের পক্ষে সম্ভব? তার ওপর স্বচক্ষে দেখলুম, লাইনের লোকগুলোর মধ্যে কিছু লোক দিব্যি শূন্যে উড়ে এর কাঁধ ওর মাথার ওপর দিয়ে সটান গিয়ে হাত বাড়াচ্ছে এবং টিকিট নিয়ে নাচতে-নাচতে চলে যাচ্ছে। বলো, সন্দেহ হয় কিনা?

—নিশ্চয় হয়। হওয়ারই কথা।

—হুঁ-হুঁ। আমি সেই গদাই দারোগা। ভূত-মানুষকে একঘাটে জল খাইয়ে ছেড়েছি। আমিও লাইন দিলুম।

—তারপর, তারপর?

—লাইন দিলুম শুক্কুরবার রাত বারোটায়। শনিবার রাত বারোটায় দেখি যেখানে ছিলুম, সেখানেই আছি। বলো, ব্যাপারটা ভৌতিক নয়?

—নিশ্চয় ভৌতিক।

—যাইহোক, আমিও তখন ভূতের কায়দা দেখালুম। ওদের ব্যাপার-স্যাপার সবই তো জানি।

— কী করলেন জ্যাঠামশাই? কী করলেন?

—ওদের মতো ডিগবাজি খেয়ে শুন্যে উড়লুম। তারপর এর কাঁধ ওর মাথার ওপর দিয়ে এগিয়ে টিকিটের ফোকরে হাত গলিয়ে দিলুম।

ব্যাপারটা ভাবতে হৃৎকম্প হচ্ছিল আমার। এই আড়াই কুইন্টাল শরীরের চাপে কতজনের কাঁধের হাড় আর মগজের ঘিলু চিড়িক করে দুভাগ হয়েছে কে জানে! নির্ঘাৎ পরে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হয়েছিল।

গদাধর বললেন,—সিনেমা হলে ঢুকে আরও প্রমাণ পেলুম। ভেবে দেখ, আমার ডাইনে আর বাঁয়ে দুপাশে দুই ভূত আবিষ্কার করে তখন আমি অবাক। ওরা কী করছে জান? খালি হিঁ-হিঁ করে হাসছে আর চেয়ারে মচমচিয়ে নাচছে। স্বভাব যাবে কোথায়? আর ঠিক সেই সময় আচম্বিতে লোডশেডিং।

গদাধর চুপ করলেন। দু-চোখে হাসির ঝিলিক দিচ্ছে।

বললুম,—হল অন্ধকার হয়ে গেল তো?

—হ্যাঁ। তারপর যা হওয়ার তাই হল। এমন সুযোগ ভূতেরা ছাড়বে কেন? সে এক ধুন্ধুমার বেধে গেল। অন্ধকারে নানারকম ভৌতিক আওয়াজ হতে থাকল। বেচারা মানুষগুলোর প্রাণান্ত! তাদের কারা কাতুকুকু দিচ্ছে। কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। নাক-কান খামচে দিচ্ছে। চ্যাঁচামেচিতে হুলুস্থুলু কাণ্ড!

গদাধর মাঝে-মাঝে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ চুপ করে যান। গুম হয়ে কী ভাবেন। তখন আর হাজারবার প্রশ্ন করেও জবাব পাইনে।

এই ঘটনা বলতে-বলতে উনি তেমনি চুপচাপ তুম্বোমুখে পোড়োবাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। গতিক দেখে আমি কেটে পড়েছিলুম সেদিন।...

এবার শীতটা খুব জাঁকিয়ে এসেছিল। এইতে গদাই জ্যাঠার বাঁ-হাঁটুর বাতটা খুব বেড়ে গেছে। চলাফেরা প্রায় বন্ধ। চুপচাপ শুয়ে থাকেন আর খবরের কাগজ পড়েন। কাপের পর কাপ চা খান। মাঝে-মাঝে গিয়ে দেখে আসি। ওঁর চাকর ভোঁদা বাতের জায়গায় কবরেজী তেল মালিশ করে দেয়। জানালায় রোদ্দুর পড়ে দুপুরবেলা। জ্যাঠামশাই বাতকে রোদ্দুরের ছ্যাঁকায় শায়েস্তা করেন।

একদিন গেছি, বললেন—অমু, এসো, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলুম।

—কেমন আছেন জ্যাঠামশাই?

—সে কথার জবাব না দিয়ে গদাধর জানালা দিয়ে পোড়োবাড়িটার দিকে আঙুল তুলে বললেন—অমু, এক কাণ্ড হয়েছে।

—কী হয়েছে জ্যাঠামশাই?

—তুমি কি লক্ষ করোনি?

—না তো?

—কাল থেকে ওই হানাবাড়িতে একজন ভাড়াটে এসেছে।

—বলেন কী!

—হ্যাঁ। প্রথমে ভেবেছিলুম, ভূতটুতই হবে। কিন্তু পরে সন্দেহ হল—না, মানুষ। কারণ, রোদ্দুরে রেলিঙে কাপড়-চোপড় শুকোতে দেখলুম। ভূতেরাও কাপড় শুকোতে দেয়। তবে রোদ্দুরে নয় অন্ধকারে। আমরা যেমন শীত করলে রোদ্দুরে বসি, ওরা শীত করলে অন্ধকারে বসে থাকে। তো, যা বলছিলুম শোন! আমার তো এই অবস্থা। তুমি গিয়ে আলাপ করে এসো তো ভাড়াটে ভদ্রলোকের সঙ্গে। কে উনি, কেন এ বাড়ি ভাড়া নিলেন—সব তন্নতন্ন করে জেনে আসবে কিন্তু। তোমাকে গোয়েন্দার দায়িত্ব দিলুম।

শুনে খুশিও হলুম, আবার ভয়ও লাগল। ওই ভূতের বাড়ির ত্রিসীমানায় কখনও পা বাড়াইনি!

পরে আমার ঘরে থেকে জানালা দিয়ে ভালো করে দেখে নিলাম বাড়িটা। হ্যাঁ, সত্যি একজন ভাড়াটে এসেছেন বটে। ফাটল ধরা দেয়াল আর ছাদ! তার মধ্যে কী সাহসে ভদ্রলোক বসবাস করতে এলেন ভেবে অবাক লাগল!

ভদ্রলোকের বয়স দূর থেকে যতটা আঁচ করলুম, গদাধরের প্রায় কাছাকাছি মনে হল। তবে উনি বেজায় ঢ্যাঙা এবং রোগা। অবশ্য গোঁফ আছে গদাধরের মতোই। বাতও আছে কিনা কে জানে!

সারা দুপুর ভদ্রলোকের গতিবিধি লক্ষ করে ভয়ের কিছু দেখলুম না। তখন বিকেলে ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেলুম।

বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইন নেই। নিশ্চয় ছিল এক সময়! এখন নেই। তাই দরজায় কড়া নাড়তে হল। অনেকক্ষণ জোরে কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল। ভদ্রলোক মিষ্টি হেসে বললেন,—কাকে চাই?

তবু একটু ভয়ে-ভয়ে বললুম,—আপনি নতুন এসেছেন পাড়ায়। তাই আলাপ করতে এলুম।

ভদ্রলোক খুব খুশি হয়ে বললেন,—আসুন-আসুন। এসে অব্দি বড্ড একা লাগছে মশাই! আমিও প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে হাপিত্যেশ করছি।

সেকেলে বাড়ি। এক টুকরো উঠোন আছে। রাজ্যের আবর্জনা আর জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে সেখানে। বারান্দা ঘুরে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে ভদ্রলোক বললেন,—সবে এসেছি। এখনও সাফ করতে পারিনি কিছু। আশা করি, দু-একদিনের মধ্যে বাড়িটার ভোল বদলে ফেলব!

ওপরে একটা বড় ঘরে ঢুকলাম। এই ঘরের ভেতরটা কিন্তু অক্ষত আছে। ভদ্রলোক চমৎকার সাজিয়ে ফেলেছেন। সেকেলে আসবাবপত্র সাফ করেছেন! একটা গদিআঁটা চেয়ারে বসলুম। উনি একটা আরাম কেদারায় বসলেন। তারপর আলাপ-পরিচয় শরু হল।

জানলুম, ওঁর নাম শূলপাণি চক্রবর্তী। উনিও পুলিশের দারোগা ছিলেন এবং রিটায়ার করেছেন শুনে আমি জ্যাঠার কথা তুললুম।

অমনি উনি হা-হা করে হেসে বললেন,—অ্যাঁ! বলেন কী! গদা ওই বাড়িতে থাকে? সেই গদা?

আমি অবাক।—আপনি চেনেন গদাইজ্যাঠাকে?

—আলবাত চিনি। খুব চিনি। আরে মশাই, পাশাপাশি দুই থানাতে ছিলুম শত বচ্ছর। তার ওপর ও ছেলেবেলাতেও বন্ধু ছিল। একসঙ্গে চাকরিতে ঢুকেছিলুম। প্রায় একসঙ্গে রিটায়ার করেছি। গদা বহরমপুরের ছেলে। আমিও। একেবারে পাশাপাশি বাড়ি ছিল। যাক গে, খুব খুশি হলুম। গদাকে গিয়ে বলবেন আমার কথা। কেমন আছে সে?

—হাঁটুতে বাত। খুব ভুগছেন।

আহা রে। বরাবর ওর ওই বাতের অসুখ। এদিকে আমার আবার অম্বলের ব্যামো?

—আপনাকেও জ্যাঠামশাই বলব কিন্তু।

—একশোবার বলবে বইকী বাবা। যতবার খুশি বলবে।

শূলপাণির সঙ্গে শিগগির আমার ভাব হয়ে গেল। কিন্তু অভদ্রতা হবে ভেবে এ বাড়ির দুর্নামের কথা তুলতে পারলুম না। একথা-সেকথার পর শূলপাণি হাঁক দিলেন,—খ্যাঁদা! ওরে খ্যাঁদা! বাবাজীর জন্যে চা-ফা আন! ও খ্যাঁদা! শুনতে পাচ্ছিস নে হতভাগা?

বলার সঙ্গে-সঙ্গে দরজার কাছ থেকে নাকিস্বরে কে বলে উঠল,—যাঁই স্যার!

তারপর যে মূর্তিটি ঢুকল, তাকে দেখে আমার বুক কেঁপে উঠল। কালো কুচকুচে এবং চামচিকের মতো চেহারা একটা লোক। মাথায় বুরুশের মতো চুল। বড়-বড় কান, পরনে ঢোলা হাফপেন্টুল। একটা ট্রে রেখে সে আমার দিকে জুলজুল চোখে তাকাতে-তাকাতে বেরিয়ে গেল। শূলপাণি একটু হেসে বললেন,—খ্যাঁদা খুব কাজের লোক। নাও বাবাজী, সন্দেশ খাও।

সন্দেশ থেকে কেমন ভুরভুর মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে। মুখে পুরতেই কিন্তু অবাক হলুম! সঙ্গে-সঙ্গে যেন উবে গেল। একি আজগুবি সন্দেশ রে বাবা! দিল্লিকা লাড্ডু একেই বলে না তো? চায়ের স্বাদটাও খাসা। কিন্তু গলার কাছে যেতে কী একটা ঘটে যাচ্ছে। ঢোক গিলতে গিয়ে টের পাচ্ছি, বিলকুল উবে গেছে। স্রেফ গন্ধটুকুই সার।

ওদিকে শূলপাণি তাঁর বন্ধু গদাধরের ছেলেবেলার কথা বলছেন। আমি আনমনা হয়ে আছি। ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। একটু পরেই শীতের বেলা ফুরিয়ে এল। আমি উঠি-উঠি করছি, শূলপাণি কিছুতেই ছাড়বেন না। রাতের খাওয়াটাও খেয়ে যেতে হবে। শুনে আরও অস্বস্তিতে পড়েছি।

ঘরের ভেতরটা আবছা হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। বললুম,—আলো জ্বালাবেন না জ্যাঠামশাই?

শূলপাণি বললেন,—দেখ বাবা অমু, আলো তো আমরা সব সময়ই পাচ্ছি। অন্ধকার কতটুকু পাই। বলবে, অন্ধকার প্রায় ঘণ্টা বারো থাকে। কথাটা ভুল। প্রথম কথা—অন্ধকারকে আমরা আলো জ্বেলে নিকেশ করি। তার ওপর ওই ব্যাটা চাঁদ বড় ধড়িবাজ। আকাশে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিতে ওস্তাদ! তাছাড়া মহা বিচ্ছু ওই ফুটকি-ফুটকি তারা। এদিকে জোনাকি হারামজাদাগুলোও কম যায় না। হায় রে! প্রাণভরে অন্ধকারের স্বাধ কতটুকুই বা পেলুম? তাই তো এমন বাড়িতে এসে জুটেছি।

এই সময় দরজার একপাশে এক ঘোমটা-ঢাকা স্ত্রীলোক ঠিক সেই খ্যাঁদার মতো নাকিস্বরে বলে উঠল,—ঘঁরে ঝাঁড়ু দেঁব বাবুমশাই!

শূলপাণি বললেন,—হ্যাঁ, সাফ করে দাও খ্যাঁদার মা! বাবা অমু, একটুখানি ঠ্যাং তুলে বসো এবারে। পুরনো বাড়ি। তাই সবসময় চুনবালি খসে মেঝে নোংরা হয়ে থাকছে।

দুজনে ঠ্যাং তুলে বসে আছি। খ্যাঁদার মা ঝাড়ু বুলোচ্ছে। আবছা অন্ধকারে তার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। খালি ভাবছি, ঝাড়ু দিয়ে ঘরদোর সাফ করার সময় কি সন্ধ্যেবেলা? সে তো সকালের কাজ। এ বাড়িতে যেন সন্ধ্যা হচ্ছে না, আসলে সকালই হচ্ছে। উঁহু ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না।

একটু পরে সে আমার চেয়ারের কাছে এসে ঝাড়ু বুলোতে-বুলোতে হঠাৎ ঘোমটার ফাঁকে মুখ তুলে কে জানে কেন, ফিক করে হাসল।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডে খিল ধরে গেল,—আতঙ্কে! ওরে বাবা। এ কী দেখছি। এ যে কংকালের মুখ। দাঁত বের করে আছে। দুটি চোখের গর্ত ছাড়া আর কিছু নেই। নাকের ডগাতেও একটা গর্ত। এত কাছে—প্রায় নাকের ডগায় বলে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

আর বসে থাকতে পারলুম না।

এক লাফে চেয়ার থেকে নেমে দরজা গলিয়ে দৌড়লুম। সিঁড়িতে পা হড়কে গেল। গড়াতে-গড়াতে নীচের বারান্দায় পড়লুম। ওপর থেকে শূলপাণি চ্যাঁচাচ্ছেন—অমু! অমু! পালাচ্ছ কেন? কী হল কী হল অমু? রাতে যে খাওয়ার নেমন্তন্ন তোমার!

আর খাওয়ার নিকুচি করেছে। ততক্ষণে আমি উঠোন পেরিয়ে সদর দরজায়। তারপর সেখান থেকে বস্তির গলিতে ঢুকে পড়েছি। আমাকে এভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে দেখে খাটিয়ায় বসে থাকা কয়েকজন লোক 'চোর-চোর! পাকড়ো-পাকড়ো!' বলে চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিল।

তাই শুনে এপাশ থেকে ওপাশ থেকে পিলপিল করে লোকেরা বেরুতে শুরু করছে। বেদম চ্যাঁচাচ্ছে। কিন্তু ভাগ্যিস, বস্তিটায় ইলেকট্রিক লাইন নেই এবং সন্ধেরাতেই ঘন কুয়াশা জমে উঠেছে। আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। অনেক কষ্টে আমাদের বাড়ির সামনে যখন পৌঁছেছি, তখন জ্যামাপ্যাণ্টে গোবর আর কাদা যথেচ্ছ মেখে গেছে। ছিঁড়ে ফর্দাফাইও হয়েছে। এক পাটি জুতো নেই পায়ে। কেটে-ছড়ে রক্ত বেরুচ্ছে। সটান গিয়ে প্রথমে গদাইজ্যাঠার ফ্ল্যাটের বেলের সুইচ টিপলুম। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেলুম।..

জ্ঞান হলে দেখি, গদাইজ্যাঠার বিছানায় শুয়ে আছি। সব ফ্ল্যাটের লোক জড়ো হয়েছে ঘরে। সস্নেহে বললেন,—আর ভয়ের কিছু নেই! এবার সবাই আসুন।...

কিছুক্ষণ পর ওঁকে আগাগোড়া সব জানালুম। তখন গম্ভীর হয়ে মাথা দুলিয়ে বললেন,—হুঁ। আমারই বোকামি হয়েছিল। জানি, শূলোটা মহা পাজী! এক নম্বর ফক্কড়বাজ! মরে গেলেও স্বভাব যাবে কোথায়?

হতভম্ব হয়ে বললুম,—মরে গেলেও মানে?

গদাধর বললেন,—হ্যাঁ। বছর সাতেক আগে শূলো ডাকাত ধরতে গিয়ে বোমার আঘাতে মারা পড়েছিল। বড্ড গোঁয়ার ছিল ও। তবে কি জানো, আমার ছেলেবেলার বন্ধু তো। সবসময় ওর কথা ভাবি। যাক গে, ভালোই হল। কাছাকাছি এসে জুটেছে যখন, গিয়ে আলাপ করে আসব।...

একথা শোনার পর থেকে আমি আর গদাইয়ের ছায়া মাড়াইনে।

ভূতের চেয়ে সাংঘাতিক

কুরচি নামে একটা জায়গা আছে, কস্মিনকালেও শুনিনি। কিন্তু ওই যে আমাদের টপ্পাদা, তাঁর আবার অদ্ভুত সব বাতিক। ম্যাপ খুঁজে-খুঁজে উদ্ভুট্টে সব জায়গা বের করবেন। তারপর একটা শুভক্ষণ দেখে একদিন দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়বেন। ফিরে এসে এইসা একখানা গপ্পো শোনাবেন যে আমাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবে।

আমাদের 'অজানায় অভিযান' ক্লাবের মূলে ওই টপ্পাদারই প্রেরণা ছিল। আমরা পাঁচজন কিশোর মিলে রাতারাতি ক্লাবটা গড়ে ফেলেছিলুম। টপ্পাদা তার সভাপতি হলেন। ক্লাবের উদ্দেশ্য হল, আজগুবি অচেনা সব জায়গায় বেড়াতে যাওয়া। অর্থাৎ

স্রেফ অ্যাডভেঞ্চার। প্রথমবার কোথায় যাওয়া হবে তা ঠিক করে দিলেন টপ্পাদাই এবং কুরচির কথা তাঁর কাছে এই প্রথম শুনলুম। টপ্পাদা গম্ভীর মুখে বললেন,—হ্যাঁ, কুরচিই ভালো হবে। প্রথমে ছোটখাট থেকে শুরু করা ভালো। ক্রমে-ক্রমে আরও কঠিন-কঠিন জায়গার নাম বলব।

নিরু আমাদের নেতা। বয়সে বড়। ঢ্যাঙা, একটু কুঁজো, রোগাটে গড়ন। কিন্তু দারুণ সাহসী। সে খুঁতখুঁতে করে বলল,—কুরচি। নাম শুনেই মনে হচ্ছে তেমন কিছু নয়। টপ্পাদা, বরং আরও দু-একটা জায়গার নাম বলুন।

টপ্পাদা রেগে গিয়ে বললেন,—তেমন কিছু নয়? ওরে হতভাগা! শেক্সপিয়ার পড়িসনি, তাই বলছিস! হোয়াটস ইন এ নেম? নামে কী আসে যায়? কুরচিকে অত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিস নে। মাত্র একরাত্তির ছিলুম সেখানে, তাতেই আমার যা অবস্থা হয়েছিল, বাপ্‌স্‌!

টপ্পাদা চোখ বুজে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন। যেন শিউরে উঠলেন। তবু বললুম,—কী হয়েছিল টপ্পাদা?

টপ্পাদা চোখ খুলে মিটিমিটি হেসে মাথা দোলালেন। বললেন,—উঁহু। আগে থেকে ফাঁস করব না। তাহলে তো হয়েই গেল।

অমু বলল,—জাস্ট একটু হিন্ট দিন না! মানে...ঠিক...ব্যাপারটা...

টপ্পাদা মুখ ভেংচে বললেন,—মানে...ঠিক...ব্যাপারটা কী, গেলেই টের পাবে। সাহস থাকে তো যাও, নয়তো ভ্যানর-ভ্যানর কোরও না। আমি এখন নিজের কাজে বসব।

বলে টপ্পাদা বিহারের ম্যাপটা খুলে টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। একটা ডটপেনের ডগা দিয়ে কী সব জায়গায় খোঁচাখুঁচি শুরু করলেন।

নিরু গম্ভীরমুখে বলল,—এক মিনিট ডিসটার্ব করছি টপ্পাদা!

টপ্পাদা ম্যাপে চোখে রেখে বললেন,—উঁ?

—আরেকবার ম্যাপে কুরচিটা দেখিয়ে দিন না প্লিজ!

টপ্পাদা সহাস্যে ডটপেনের ডগা একটা জায়গায় রেখে বললেন,—এই যে এখানে। ভালো করে দেখেনে আবার।

নিরুর দেখাদেখি আমরা চারজনও ঝুঁকে পড়লুম ম্যাপের ওপর। কিন্তু কুরচি বলে কোনও নামই ডটপেনের ডগায় দেখতে পেলুম না। নিরু বলল,—হুঁ বুঝেছি।

নিরু কী বুঝল কে জানে। সতু বলল,—কোথায় কুরচি? ওটা তো একটা শুঁয়োপোকা।

টপ্পাদা হো-হো হেসে উঠলেন,—ভূগোল এগজামিনে কত পেয়েছিস এবার?

সতু ভড়কে গিয়ে বলল,—সাঁইতিরিশ টপ্পাদা!

—চোপ! চালাকি হচ্ছে? ম্যাপে পাহাড়পর্বত চিনিসনে, আবার বলছিস সাঁইতিরিশ পেয়েছিস? একেবারে তিরিশ চুরি? আচ্ছা বল তো, সাঁইতিরিশের তিরিশ চুরি করলে কত থাকে?

সতু আরও ভড়কে গিয়ে বলল,—সাত।

টপ্পাদা চোখ ছানাবড়া করে বললেন,—সাত! অ্যাঁ! হাসালি রে! সাঁইতিরিশের তিরিশ গেলে সাঁই থাকে না? আমরা টপ্পাদার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠলুম। সত্যি, সতুটা একেবারে গবেট। হাসির তোড়ে সতু একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেল। আর কথাই বলল না। সাঁইতিরিশের তিরিশ গেলে সত্যি তো সাঁই পড়ে থাকে। কার সাধ্য এটা অস্বীকার করে?

নিরু বলল,—ঠিক আছে? আশীর্বাদ করুন টপ্পাদা, যেন আপনার মুখ উজ্জ্বল করতে পারি।

টপ্পাদা ধমক দিয়ে বললেন,—আমার মুখ উজ্জ্বল করে কাজ নেই। ক্লাবের মুখ উজ্জ্বল করলেই চলবে। যাও, এখন আর ডিসটার্ব কোরো না। কাজ করতে দাও।...

আমাদের কুরচি অভিযানের ব্যাপারটা এভাবেই শুরু হয়েছিল। নিরু বলেছিল,—আরে বোকা! ম্যাপে লেখা নেই বলেই তো আমরা সেখানে যাচ্ছি। ম্যাপে তো শুধু বড়-বড় জানাশোনা জায়গার নাম লেখা থাকে। সেসব জায়গায় তো রাম-শ্যাম-যদু -মধু সবাই যায়। ওতে ক্রেডিট কীসের? অজানার অভিযানে বেরুব বলেই না আমরা ক্লাব করেছি।

সবাই সায় দিয়েছিলুম। নিরু আমাদের লিডার। ব্যস এইটুকুই যথেষ্ট। ট্রেনে বার্থ রিজার্ভ থেকে শুরু করে সঙ্গে কী কী জিনিসপত্র নিতে হবে, সব ঠিক করল নিরু। আমরা চারজনে হুকুম তামিল করে গেলুম। তারপর এক শনিবার রাত নটার মেলট্রেনে আমরা সদলবলে উঠলুম। নিরু বলল,—আপাতত আর কোনও কথা নয়। চুপচাপ নিজের বার্থে শুয়ে পড়। ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেব।

ট্রেনে ঘুম ভালো হল না। অজানা জায়গায় আনন্দ যেমন, তেমনি অস্বস্তিও কম হচ্ছে না। না জানি কী বিপদ সেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে!

ভোরের দিকে বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, নিরুর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। নিরু বলল,—সামনের স্টেশনে নামতে হবে। উঠে পড় সব।

সবে শীত পড়েছে কলকাতায়। শেষরাতে ঠান্ডাটা পড়ে বেশি। কিন্তু এখানে দেখছি ঠান্ডা ভোরের দিকে অনেক বেশি। জানালা খুললে কনকনে হাওয়ায় হাড় কেঁপে উঠল। কুয়াশায় সব ঢাকা। তার মধ্যে মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। আমরা বিছানাপত্তর ঝটপট গুছিয়ে নিয়ে দরজার কাছে গেলুম।

বেশ বড় স্টেশন। কিন্তু তেমন ভিড় নেই। সতু বলল,—স্টেশনের নাম লেখা নেই রে!

· নিরু বলল,—তোকে স্টেশনের নাম নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

ধমক খেয়ে সে চুপ করে গেল। আমরা কিন্তু ঘুরে-ঘুরে স্টেশনের নাম খুঁজছিলুম। কোন স্টেশনের টিকিট কেটেছে নিরু, তাও তো জানি না। সব টিকিট ওর কাছে! চায়ের স্টলে চা খেতে-খেতে অমু সাহস করে বলল,—ঠিক স্টেশনে নেমেছি তো আমরা?

নিরুর শুধু জবাব,—হুঁ। তারপর বলল,—তোরা দাঁড়া। আবার টিকিট কাটতে হবে?

একটু পরে চা খেয়ে আমরা যে যার বোঁচকাবুঁচকি পিঠে আটকে নিয়ে স্কাউটদের মতো নিরুর পেছনে-পেছনে চললুম। ওভারব্রিজ দিয়ে অন্য একটা প্ল্যাটফর্মে গেলুম আমরা। তারপর নিরু বলল,—ট্রেন বদলাতে হবে। মিনিট পনেরোর মধ্যে ট্রেন পাওয়ার কথা। নাঃ। ওই যে আসছে। ওটাই হবে।

তবু বলল,—পৌঁছব কখন?

নিরু বলল—প্রায় নটা বেজে যাবে। টপ্পাদার কথামতো।

যাক্‌গে, বাঁচা গেল। তাহলে টপ্পাদার কাছে সব হালহদিস নিয়েই বেরিয়েছে নিরু! সে লিডার। আমরা চুপচাপ হুকুম তামিল করে যাব, ব্যাস!

এমন বিচ্ছিরি ট্রেনে কখনও চাপিনি, কামরাগুলো যেন কোন মান্ধাতার আমলে তৈরি। যেমন নোংরা, তেমনি বিদঘুটে শব্দ আর ঝাঁকুনি। ইঞ্জিনের হুইশিলও বড় মারাত্মক! কানের ভেতর গরম সিসে ঢুকে যাচ্ছে যেন। স্পিডও তেমনি ছ্যাকড়া গাড়ির মতো। ঘট ঘট ঘট্টাং...ঘট ঘট ঘট্টাং...একটানা বিরক্তিকর শব্দ। দুপাশে তখনও কুয়াশা। তাই কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কামরায় আমরা বাদে আর কেউ নেই। ঝাঁকুনির চোটে প্রচণ্ড ঘুম আসছে। সতু তো হাঁ করে ঘুমুতে শুরু করল। দেখাদেখি আমিও আর চোখ খুলে থাকতে পারলুম না।

কতক্ষণ পরে নিরুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি ফাঁকা ধুধু মাঠের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলেছে। আর কুয়াশা নেই। রোদ্দুর ঝকমক করছে। কাছে ও দূরে টিলা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গাছপালা খুব কম। পাথুরে মাটি। কোনও ফসলের চিহ্ন নেই কোথাও। কোনও বসতির চিহ্নও চোখে পড়ছে না।

নিরু তাড়া লাগাল,—রেডি, স্টেশন এসে গেল।

একটু পরে ট্রেনের গতি কমল। তারপর থামল। আমরা নেমে গেলুম জিনিসপত্তর নিয়ে, ট্রেনটা কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ছেড়ে দিল। মনে হল, আমরা ছাড়া এ ট্রেনে যেন কোনও যাত্রী নেই!

তারপর দেখি, এ কী উদ্ভুট্টে স্টেশন। আমরা ছাড়া আর কেউ ট্রেন থেকে নামেনি। আর স্টেশন বলতে একটা মালগাড়ির কামরা নিচু প্ল্যাটফর্মের একধারে দাঁড় করানো আছে। তারও দরজা বন্ধ। কোথাও কোনও লোক নেই। একেবারে খাঁ-খাঁ নিঃঝুম। তারপর আমরা হইহই করে উঠলুম। প্ল্যাটফর্মের শেষে ইংরিজি ও হিন্দীতে বোর্ডে লেখা আছে কুরচি।

সতু বলল,—কিন্তু আমরা থাকব কোথায়? কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিনে যে!

নিরু ধমকাল,—তোর আসাই উচিত হয়নি সতু! অ্যাডভেঞ্চারে বেরোতে হলে ওসব ভাবা চলে না।

সতু প্রায় কেঁদে ফেলার সুরে বলল,—কিন্তু আমরা খাব কী? আমার যে বারবার খিদে পায়।

একথায় আমরা চারজনে হেসে উঠলুম। নিরু বলল—ওরে বোকা। খাওয়ার ব্যবস্থা না করে বেরোইনি। সে তুই ভাবিস নে। চল, মার্চ করে এগোন যাক্।

মালগাড়ির কামরাটা—থুড়ি, স্টেশনঘরের পাশ দিয়ে আমরা মাঠে নামলুম। কিছুটা হাঁটার পর একটা কাঁচা রাস্তা পাওয়া গেল। নিরু বলল—ওই যে পাহাড়টা দেখছিস, টপ্পাদা বলেছেন,—ওর ওপর একটা বাংলো পাওয়া যাবে।

সন্দিগ্ধ অমু বলল,—কী করে বুঝলি ওটাই সেই পাহাড়?

নিরু তার বগলের ফাঁকে ঝোলানো কিটব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট বাইনোকুলার বের করল। বলল,—খালিচোখে দেখেই চিনেছি। তবে সার্টেন হওয়া যাক। বলে সে দূরবীন যন্ত্রটা চোখে রেখে কিছুক্ষণ দেখল। দেখে একটু হেসে বলল,—আমার আইসাইটের জোর আছে। ভাবিস কী তোরা? ওটাই বটে। টপ্পাদা বলেছিলেন, শুধু ওই পাহাড়টাতেই কিছু গাছপালা-ঝোপঝাড় আছে—বাদবাকি সব ন্যাড়া। দ্বিতীয়ত, ওটার চূড়োয় একটা পুরোনো ভাঙাচোরা মন্দির আছে। মন্দিরের দেয়ালে বটগাছ গজিয়েছে। তৃতীয়ত, বাংলোটা পাহাড়ের অন্য পিঠে, তাই দেখা না গেলেও বাংলোর পিছনে একটা উঁচু দেবদারু গাছ আছে—তার ডগায় একটা সাদা পতাকা উড়ছে। পতাকাটাই প্রথমে চোখে পড়েছিল। তোদেরও এবার চোখে পড়বে—তাকিয়ে দ্যাখ।

ঠিক তাই বটে। আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে হাঁটতে থাকলুম। শীতের রোদ্দুরে হাঁটতে বেশ আরামই হচ্ছিল। অবশ্য বাতাস সামনে থেকে জোরে বইছে। পিঠে মস্ত বোঁচকা নিয়ে একটু ঝুঁকে হাঁটতে হচ্ছিল, এই যা।

নিরু গান গেয়ে উঠল একটু পরে। আমরাও ওর সঙ্গে গলা মেলালুম। সতুও বেসুরো গলা নিয়ে যোগ দিল। মহানন্দে আমরা পাহাড়টা লক্ষ্য করে চলতে থাকলুম।

আমরা কখনও পাহাড়ে উঠিনি। প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে বাংলো। উঠতে আমরা সবাই হাঁপিয়ে পড়েছিলুম। পাহাড়ের গায়ে চারদিক ঘুরে গাড়ি ওঠার রাস্তা রয়েছে। রাস্তায় কোন কালে খোয়া এবং যৎসামান্য পিচের প্রলেপ ছিল। এখন আর নেই। ওই ঘুরপথে উঠলে ততটা কষ্ট হত না। কিন্তু তাহলে আর অভিযান কিসের? সোজা নাক বরাবর উঠে গেলুম। কিন্তু ভাগ্যিস, মাঝে-মাঝে গাছ ছিল। তাই জিরিয়ে নিচ্ছিলুম। এখন আর শীতের নামগন্ধ নেই। গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে।

অবশেষে বাংলোর উঠোনে পৌঁছনো গেল। পুরোনো বাংলো তা বোঝাই যায়। পাথরের দেওয়াল। ছাদও পাথরের টালি দিয়ে তৈরি। অমু বলল,—মনে হচ্ছে এখানে অনেককাল মানুষ আসেনি রে নিরু!

নিরু বলল,—সেজন্যেই তো এখানে এলুম।

সতু বলল,—আমার যে খিদে পেয়েছে নিরু!

নিরু ধমক দিতে গিয়ে হেসে ফেলল,—হু! দাঁড়া—দরজা খোলা যায় নাকি দেখি। কোন ব্যাটা তালা দিয়ে রেখেছে দেখছি।

বলে সে একলাফে উঁচু বারান্দায় উঠল। তারপর যেমনি তালা ধরে টেনেছে, উঠোনে আমরা যে গাছটার তলায় দাঁড়িয়েছিলুম, সেই গাছের ওপর থেকে খনখনে গলায় কে বলে উঠল,—এ বাবু! এ খোকাবাবু! তালা মাৎ টুটিয়ে। মাৎ টুটিয়ে!

আমরা আঁতকে উঠেছিলুম। তারপর দেখি ঝাঁকড়া গাছটার পাতার আড়ালে একটা লোক বসে আছে। অদ্ভুত লোক তো! এতক্ষণ বুঝি চুপচাপ সব দেখে যাচ্ছিল।

আমাদের অবাক করে সে হনুমানের মতো দিব্যি নেমে এল। পরনে ময়লা নোংরা একটা নেভি-ব্লু হাফপ্যান্ট, গায়েও তেমনি একটা ছেঁড়াখোড়া শার্ট, কাঁচা-পাকা চুলগুলো মাথায় যেন পেরেকের মতো খোঁচা-খোঁচা বসানো রয়েছে। লোকটার দুটো কানই লক্ষ করার মতো। বিরাট লম্বা কান। গোঁফও দেখার মতো। কিন্তু এত রোগা আর লম্বা মানুষ কখন দেখিনি।

আমরা ভড়কে গিয়েছি। কিন্তু সে কপালে হাত তুলে মিলিটারি কায়দায় সেলাম ঠুকে হিন্দিতে বলল,—আমাকে ডাকলেই তো দরজা খুলে দিতুম! আমার নাম রামনারাণ। এ বাংলোর চৌকিদার আমি। বলুন, কী করতে হবে।

নিরু গম্ভীর হয়ে বলল,—হু। তোমাকে অনেক কিছুই করতে হবে। আপাতত ঘর খুলে দাও। তারপর বলছি।

সে হাফপ্যান্টের পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে তালা খুলল। বিশ্রী আওয়াজ করে দরজাও খুলে গেল। আমরা ঘরে ঢুকে দেখি, যাচ্ছেতাই অবস্থা। কতকাল পরিষ্কার করা হয়নি কে জানে। ধুলোময়লায় নোংরা হয়ে আছে। আসবাব বলতে কোণার দিকে একটা লোহার খাট। তার ছোবড়ার গদিটার শোচনীয় দশা। রামনারাণ জানালাগুলো খুলে দিল। ঘরে ঢুকে বোঁটকা গন্ধ পাচ্ছিলুম। বাতাস ঢোকায় গন্ধটা কমে গেল। নিরু তাড়া দিয়ে বলল,—কী করো? মাসে-মাসে দিব্যি তো বেতন নাও! ঘরে একবার ঝাড়ুও দাওনি দেখছি! যাও, ঝাঁটা আনো! জলও এনো এক বালতি।

রামানারাণ কাঁচুমাচু হয়ে বলল,—খবর দিয়ে এলে সব ঠিক করা থাকত খোকাবাবু। আচ্ছা ঘাবড়াবেন না। আমি এখনই সাফ করে দিচ্চি সব।

সে বাংলোর টানা বারান্দা দিয়ে পিছন দিকে চলে গেল। আমি আর অমু বাইরে এসে চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখতে থাকলুম। অমু বলল,—হ্যাঁ রে বিজু রামনারাণ গাছে চড়ে কী করছিল, বল তো?

বললুম,—জ্বালানির জন্যে শুকনো কাঠ ভাঙছিল নিশ্চয়।

অমু সন্দিগ্ধ স্বরে বলল,—ভ্যাট্! ওই তো কত শুকনো কাঠ পড়ে রয়েছে। গাছে উঠতে যাবে কেন? আয় তো দেখি।

আমরা গাছটার তলায় গেলুম। গাছটা অচেনা। চ্যাপ্টা পাতা, সাদা ডাল। খুব উঁচুও বটে। তেমনি ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। বললুম—ফলটল পারছিল তাহলে।

কিন্তু ফল কোথায়? দেখছিস না শুধু পাতায় ভর্তি। অমু দেখতে-দেখতে বলল—।

হঠাৎ আমার চোখ গেল ওপরে একটা ছড়ানো মোটা ডালের দিকে। আঁতকে উঠে বললুম,—অমু! অমু! ওটা কী রে? ওই যে—দেখতে পাচ্ছিস, ঝুলছে?

অমু দেখে অবাক হয়ে বলল,—সর্বনাশ। ডাল থেকে একটা ফাঁস লাগানো

দড়ি ঝুলছে যে! ডালে দড়ি বেঁধে ও কী করছিল রে? সুইসাইড করতে যাচ্ছিল নাকি?

শিউরে উঠে বললুম,—ওরে বাবা! তাহলে তো আমরা এসে না পড়লে রামনারাণ নির্ঘাত গলায় দড়ির ফাঁস আটকাত! কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

আমরা দুজনে এইসব বলাবলি করছি, এমন সময় নিরুর চেঁচামেচি কানে এল,—তুমি আবার কে? রামনারাণ গেল কোথায়? তোমাকে দিয়ে চলবে না। রামনারাণকে ডাকো।

তাহলে রামনারাণ ছাড়া এখানে আরও একজন লোক আছে, বোঝা গেল। তার গলাও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না, কী বলছে সে। একটু পরে দেখি তপু হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এল। আমরা তার কাছে এগিয়ে গেলুম। অমু বলল,—কী হল রে?

তপু বলল,—দ্যাখ গে না! খুব গোলমেলে ব্যাপার। বলে সে বাংলোর অন্য পাশে চলে গেল।

রামনারাণের কাণ্ডটা ওকে বলার সুযোগ পেলুম না। এদিকে দেখি, রামনারাণ ওপাশ থেকে এক বালতি জল আর ঝাড়ু নিয়ে আসছে। যে মানুষ মনের দুঃখে একটু আগে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যাচ্ছিল, তার মুখে হাসি দেখে অবাক হয়ে গেলুম। সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর চ্যাঁচামেচি বেশ বেড়ে গেল। তখন অমু বলল,—আয় তো দেখি কী ব্যাপার?

আমরা দৌড়ে গেলুম। বারান্দায় উঠে মনে হল, যেন ঘরের ভেতর মারামারি শুরু হয়ে গেছে। ভেতরে ঢুকে দেখি, নিরু মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে রামনারাণ আর অন্য একটা অচেনা লোককে সামলাচ্ছে। দুজনেই মারমুখী। অমু বলল,—কী হয়েছে রে নিরু?

নিরু হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল,—কী ঝামেলা দ্যাখ তো! রামনারাণ যাওয়ার পর কোত্থেকে এই লোকটা এসে বলছে,—কার হুকুমে বাংলোয় ঢুকেছেন আপনারা? আমি বাংলোর চৌকিদার। রামনারাণ বলে এক চৌকিদার ছিল বটে, তবে সে নাকি তার ঠাকুর্দার আমলে। এখন ও নামে কেউ নেই।...

অচেনা লোকটা বাধা দিয়ে তিরিক্ষি মেজাজে বলল,—নেই-ই তো।

অমনি রামনারাণ হুংকার দিয়ে বলল,—খবরদার! নেই মানে? আমি কে তাহলে?

অচেনা লোকটাও রামনারাণের মতো রোগা। অমনি প্রকাণ্ড গোঁফ আছে। এমনকি এর পোশাকও হুবহু এক। তফাতের মধ্যে এর একটা কানই নেই, অন্য কানটাও রামনারাণের মতো অত বড় নয়। সে রামানারাণের কথা শুনে বলল,—তুমি কে? তা বললে তো খোকাবাবুরা ভয় পাবেন। তাই বলছি, আর কথা বাড়িও না। ভালো চাও তো মানে-মানে কেটে পড়ো!

নিরু বলল,—ভয় পাব মানে? ভয় পাব কী হে?

লোকটা বাঁকা হেসে বলল,—আমার ঠাকুরদার কাছে শুনেছি, ডেভিড সাহেব

এই বাংলোর মালিক ছিলেন। তাঁর আমলে রামনারাণ বলে একজন চৌকিদার ছিল। গলায় দড়ি দিয়ে মারা গিয়েছিল সে। আর কোনও রামনারাণের কথা জানি না।

একথা শুনে অমু আর আমি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। আর রামনারাণ লাফিয়ে উঠে দাঁত কিড়মিড় করে বলল,—দ্যাখ্ রঘুপতি! এবার আমার মাথায় সত্যি খুন চড়ে যাচ্ছে। আমাকে তুই মরা মানুষ বলতে চাইছিস?

রঘুপতি মুখ ভেংচে বললে,—আলবৎ বলছি! তুই তো মড়া। গাছে ঝোলা-মড়া। কমবয়সি এসব ছেলেপুলে দেখে তাদের ভয় দেখাতে এসেছিস! লজ্জা করে না তোর?

রামনারাণ রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বলল,—ওরে রঘুপতি! আমি মড়া—আর তুই বুঝি জ্যান্ত মানুষ? দেব এবার ফাঁস করে তোর কীর্তি? দেব? দিই তাহলে?

রঘুপতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল,—দে না ফাঁস করে, দি দিবি?

রামনারাণ নিরুর দিকে তাকিয়ে বলল,—খোকাবাবু, বাঁচতে চান তো এ ব্যাটাকে তাড়ান। এ ব্যাটা গত বছর কঠিন ব্যামোয় পটল তুলেছে। এই বাংলোর পেছনের একটা ঘরে থাকত ব্যাটা। এবার বুঝেছেন তো ও কে?

আমি ও অমু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। নিরু কিন্তু ঘাবড়ে যায়নি। সে হাসতে-হাসতে বলল,—তোমরা দুজনেই তাহলে মরা মানুষ—তার মানে ভূত, এই বলছ তো?

রঘুপতি বলল,—মোটেও না, মোটেও না। ও ব্যাটা ভূত, আমি ভূত হব কোন দুঃখে খোকাবাবু? আসলে কী জানেন? ওর বড্ড খারাপ অভ্যাস। এখনও দখল ছাড়তে পারে না। কিছুদিন আগে এক বাবু এলেন, আপনাদের মতো বাঙালি, মাথায় বড় বড় চুল—বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ হবে...

নিরু বলল,—হুঁ। আমাদের টপ্পাদা।

রঘুপতি বলল,—তো সেই বাবুও এসে ওর পাল্লায় পড়লেন। গতি দেখে আমাকে আসতে হল। তারপর তো বুঝতেই পারছেন, আমাদের ঝগড়া থামাতে বাবুর হিমশিম অবস্থা। শেষে বললেন, ঠিক আছে। মীমাংসা করে দিচ্ছি।

নিরু বলল,—হুঁ, জানি। টপ্পাদা তোমাদের রেস লড়িয়ে দিলেন। যে আগে ওই ওপরকার মন্দিরের বটগাছ থেকে একটা পাতা আনতে পারবে—সে জ্যান্ত মানুষ, আর যে হেরে যাবে সে মরা মানুষ।

রামনারাণ একগাল হেসে বলল,—আমি জিতেছিলুম না? রঘুপতিটাই তো হেরে গিয়েছিল। বলেননি আপনাকে?

নিরু কী বলতে যাচ্ছে, রঘুপতি চেঁচিয়ে বলল,—বাঙালিবাবু বোকা! বোকার হদ্দ! আরে, ভূতের সঙ্গে জ্যান্ত মানুষ কখনও পারে? তাই আমি হেরে গিয়েছিলুম।

নিরু এবার রেগে গেল,—টপ্পাদা মোটেও বোকা নন। যা-তা বোলো না।

রঘুপতি বেজার হয়ে বলল,—ঠিক আছে। কে জ্যান্ত, কে মড়া বুঝুন। আমি চলে যাচ্ছি। ওই গাছে-ঝোলা রামানারাণটা যখন নিজের মূর্তি ধরবে, তখন বুঝবেন ঠ্যালা। তখন আর মাথা ভাঙলেও আমি আসব না।

বলে রঘুপতি জোরে বেরিয়ে গেল। নিরু বলল,—যত্তো সব! রামনারাণ, ঘর সাফ করো! ততক্ষণ আমরা বাইরে গিয়ে কিছু খেয়ে নিই। হ্যাঁ—জল কোথায় পাব, বলে দাও তো রামনারাণ!

রামনারণ ঝাড়ু হাতে মেঝের দিকে ঝুঁকে বলল,—বাংলো-ঘরের দক্ষিণদিকে গেলে একটা পাতালঝরনা পাবেন।

নিরু বলল,—আয় তোরা!

বেরিয়ে গিয়ে অমু বলল,—পাতালঝরনা কী রে? প্রস্রবণ নাকি?

নিরু বলল,—হুঁ! কিন্তু সতুটা কোথায় গেল? তপুই বা কোথায়?

বললুম,—তপু ওই উত্তরদিকে গেল দেখলুম একটু আগে।

নিরু বলল,—ডাক তো ওকে। আর অমু, তুই দ্যাখ তো সতু কোথায় গেল। এরা এখন থেকেই ডিসিপ্লিন ভাঙতে শুরু করেছে।

আমি ততক্ষণে মনে-মনে বেশ অস্বস্তিতে ভুগছি। গাছের দড়িটা, আর এই দিনদুপুরে ভূত-মানুষ তর্কাতর্কি, কোনও মাথামুন্ডু খুঁজে পাচ্ছিনে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে ডাকলুম,—তপু! তপু!

তপুর সাড়া এল,—এই যে এখানে!

ঝোপের শেষে উঁচু হয়ে ওঠা পাহাড়ের গা থেকে একটা প্রকাণ্ড পাথর বেরিয়ে রয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা গুহা। এবং গুহার দরজায় বসে তপু কী চিবুচ্ছে। আমাকে দেখে হাসিমুখে ডাকল হাত তুলে। কাছে গিয়ে বললুম,—কী চিবুচ্ছিস রে?

তপু পাশে বসতে ইশারা করল। বসলুম। তপু বলল,—খাবি নাকি? দারুণ টেস্টফুল জিনিস! দ্যাখ না খেয়ে।

কী বলতো? —বলে হাত বাড়ালুম।

তপুর মুঠোয় কিছু রয়েছে। সে মুঠো থেকে আমার হাতে যা দিল, আমি তক্ষুনি ছি-ছি করে ফেলে দিলুম। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। এখন এই ঠাট্টা-তামাশার মানে হয়?

তপু যেন অবাক হয়ে বলল,—ফেলে দিলি? এত কষ্ট করে খুঁজে আনলুম।

—ভ্যাট! কী বলছিস তুই? মরা পিঁপড়ে মানুষ খায়?

তপু আমাকে দারুণ অবাক করে সেই ইয়া বড় মড়া পিঁপড়েটা কুড়িয়ে নিয়ে মুখে পুরল। তারপর তৃপ্তির সঙ্গে মুড়মুড় করে চিবুতে লাগল।

আমি হতভম্ব হয়ে বললুম,—ছি-ছি! তোর কি মাথা খারাপ হল তপু? এ কী খাচ্ছিস তুই?

তপু মুঠো থেকে আঙুলের ডগায় করে আরও একটা প্রকাণ্ড মরা পিঁপড়ে মুখে চালান করে দিল। এবার আমি খুব রেগে গেলুম।—যা খুশি কর! নিরু ডাকছে। আমি চললুম। —বলে হনহন করে ওর কাছ থেকে চলে এলুম।

বাংলোর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি, রামনারাণ যত্ন করে ঘর ধুচ্ছে। দক্ষিণপাশে গিয়ে ডাকলুম,—নিরু! তোরা কোথায়?

পাহাড়ের একটু নিচের দিকে সাড়া এল,—চলে আয়, বিজু! শিগগির চলে আয়!

এদিকে ঘন জঙ্গল। মধ্যে-মধ্যে অনেক পাথর রয়েছে। কিছুটা নেমে গিয়ে দেখলুম একটা প্রস্রবণ রয়েছে। একটা চৌবাচ্চার মতো পাথরের খাদ থেকে ঝিরঝির করে জল নিচে গড়িয়ে যাচ্ছে। প্রস্রবনের ধারে বসে নিরু বনরুটি ছিঁড়ে খাচ্ছে। একটু অভিমান হল। সবাই আসার তর সইল না ওর? ও না দলের লিডার? আমি চৌবাচ্চাটার অন্য ধরে দাঁড়িয়ে বললুম,—ওরা এখনও আসেনি?

নিরু হেসে বলল,—আসছেখন। নে, খেয়ে ফেল।

চৌবাচ্চার ওধারে যেখানে সে বসে আছে, সেখান থেকে আমি যেখান দাঁড়িয়ে আছি, কমপক্ষে শতমিটার দূরত্ব তো বটেই। আমার চোখ বড়ো হয়ে গেল। নিরুর হাতটা শতমিটার লম্বা হয়ে আমার নাকের ডগায় একটা মোড়কে ভরা বনরুটি ধরেছে।

এই রুটিগুলো গতকাল আমাদের পাড়ার বেকারি থেকে কেনা। কিন্তু কথা হচ্ছে, নিরু যত লম্বাই হোক, এত দূরে ওর হাত এল কীভাবে? টের পেলুম, আমার পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে।

নিরু বলল,—নে না বাবা! কতক্ষণ ধরে থাকব?

অমনি চোখ বুঝে দৌড়তে শরু করলুম। দৌড়নো বলা ভুল। পাহাড়ে চড়াই ভাঙা কী ব্যাপার, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝানো কঠিন। দুহাত-দুপায়ে কাঠবিড়ালির মতো হাঁচড়-পাঁচড় করে এগোচ্ছিলুম আর কী!

একটু পরে বাংলোর দেখা মিলল। সমতল একটা জমিতে বাংলোটা রয়েছে এতক্ষণে বোঝা গেল। উঠোনের পাশে একটা গাছের তলায় অমুর দেখা পেলুম। সে মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠতে দেখে সে তাকাল। বলল,—কী রে তোরা। খুঁজেই পাচ্ছিনে তোদের! নিরু কোথায় গেল? তুই বা কোথায় গিয়েছিলি?

ভাবলুম, ব্যাপারটা বললে অমু নিশ্চয় হো-হো করে হেসে উঠবে। বলবে, গুল দিচ্ছি। তাই চেপে গেলুম। বললুম,—সতু কোথায়? পেলি দেখা?

অমু বলল,—অদ্ভুত ব্যাপার রে! সতু...

ওকে থামতে দেখে বললুম,—কী হল সতুর?

অমু ফিসফিস করে বলল,—অবাক কান্ড বিজু। সতুটা ওখানে একটা ঝোপের ধারে বসে কী খাচ্ছিল জানিস? ঘাস। বিশ্বাস কর বিজু। খিদেটা ওর বরাবর বেশি। তাই বলে ঘাস খাবে? আমাকে দেখে খুব লজ্জা পেয়ে গেল। বলল,—কাকেও বলিস নে। তারপর করল কী জানিস? হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে ঝোপ থেকে পাতা ছিঁড়ে খেতে লাগল। বকাবকি করে চলে এলুম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি বল?

কথাগুলো করুণ মুখে বলার পর অমু ধুপ করে বসে পড়ল। বললুম,—বসে কী হবে? উঠে আয়। ব্যাপার বড্ড গোলমেলে মনে হচ্ছে। বাংলোয় গিয়ে আলোচনা করা যাক।

অমু বলল,—আলোচনা করার কী আছে?

—আছে রে! তুই সতুকে ঘাস আর পাতা খেতে দেখলি। আমি তপুকে কী খেতে দেখলুম জানিস? ইয়া বড়-বড় মরা পিঁপড়ে। পাহাড়ি পিঁপড়ে।

অমু মুখ ভেংচে বলল,—রামো! পিঁপড়ে! ছ্যা ছ্যা! বড্ড বোকা তো তপুটা, বরং মাটি খেলেও পারত।

বলে সে পায়ের কাছ থেকে একমুঠো কাঁকড়ঘুটি-ভরা মাটি তুলে নিয়ে মুখে পুরল এবং কড়কড় করে খেতে শুরু করল।

আর সহ্য করতে পারলুম না। রেগে চেঁচিয়ে উঠলুম,—তোরা কি রাক্ষস, না ভূত? হয়েছে কী তোদের? এই নাক কান মলা—কেটে পড়ছি।

তারপর হনহন করে বাংলোয় গিয়ে ঢুকলুম। জিনিসপত্তর নিয়ে এক্ষুনি কেটে পড়া যাক দল থেকে। আগে যদি জানতাম, এরা এখানে কেউ ভূতের মতো হাত শতমিটার লম্বা করে ফেলবে, কেউ পিঁপড়ে খাবে, কেউ ঘাস, কেউ মাটি—তাহলে কে আসত এদের সঙ্গে? ফিরে গিয়ে টপ্পাদাকে সব রিপোর্ট করবখন।

ঘরে ঢুকে দেখি, কেউ নেই। রামনারাণ হোক, কিংবা গাছেঝোলা ভূতই হোক, ঘরটা চমৎকার সাফ করে রেখেছে। লোহার খাটের ছেঁড়া গদির ওপর সুন্দর একটা চাদরও বিছিয়ে দিয়েছে। বালিশও এনে রেখেছে গুনে-গুনে পাঁচটা।

পেটের খিদে ভুলে গেছি অনেক আগেই। কিন্তু এখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছি। এমন সুন্দর বিছানা দেখেই ঘুমের টান এসেছে চোখে। ধুপ করে গড়িয়ে পড়লুম।

সবে চোখ এঁটেছে, হল্লার শব্দে ঘুম ছুটে গেল। চোখ খুলে দেখি, নিরু, তপু, অমু আর সতু তর্কাতর্কি করতে-করতে ঘরে ঢুকছে। নিরু বলছে,—আলবাত দেখেছি, তুই মাটি খাচ্ছিলি।

অমু বলছে,—কিন্তু সতু যে ঘাস আর পাতা খাচ্ছিল, তার বেলা?

সতু বলছে,—হুঁ। আমি না হয় তাই খাচ্ছিলুম। বিজু কী খাচ্ছিল জিগ্যেস কর তো?

লাফিয়ে উঠলুম,—খবর্দার সতু! যা-তা বলবিনে। আমি কিছু খাইনি।

সতু বলল,—মিথ্যে বলবিনে বিজু। তুই গাছে চড়ে পাখির বাসা থেকে ডিম চুরি করে খাচ্ছিলি। আমাকেও ডাকলি না, বল্?

—কী বললি? আমি রুখে দাঁড়ালুম। মিথ্যুক তুই! মহা মিথ্যুক!

সতু দাঁত বের করে বলল,—ওর মুখ শুঁকে দেখ্! তাছাড়া ও করল কী জানিস নিরু? ডিম খেয়েও খিদে মিটলো না। তখন পাখির বাসাটা চিবুতে শুরু করল।

নিরু গম্ভীর গলায় বলল,—খুব অন্যায় করেছিস্ বিজু!

আমি রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বললুম,—আর তপু যে মরা পিঁপড়ে খাচ্ছিল! আর তুই যে শত মিটার মস্তো ভুতুড়ে হাতে আমাকে...

নিরু বাধা দিয়ে বলল,—শাট্ আপ! ডিসিপ্লিন ভাঙছিস বিজু!

তপু এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এবার একটু হেসে বলল,—বিজু কী বলল রে? আমি পিঁপড়ে খাচ্ছিলুম?

বললুম,—হ্যাঁ। খাচ্ছিলি তো! আমাকেও খেতে বলছিলি!

নিরু আবার লিডারের ব্যবহার দেখাতে যাচ্ছিল, তপু তাকে থামিয়ে দিয় বলল,—কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে।

নিরু বলল,—কীসের গোলমাল হবে। বিজুটা মিথ্যে করে আমার লম্বা হাতের কথা বলছে। এই তো আমার হাত। মেপে দ্যাখ ক মিটার।

তপু বলল,—ওয়েট, ওয়েট। শোন, গোলমাল একটা হয়েছে কোথাও। প্রথম কথা, জ্ঞানত ধর্মত বলছি,—আমি মোটেও পিঁপড়ে-টিপড়ে খাইনি। আপন-গড। মা কালীর দিব্যি। মা সরস্বতীর দিব্যি।

সতু বললে,—আমিও দিব্যি করতে পারি। স্বীকার করছি, আমার বেশি খিদে পায়, তাই বলে ঘাস-পাতা খাব কোন দুঃখে।

অমু বলল,—আমিই বা মাটি খাব কেন? বই দে, ছুঁয়ে বলছি।

আমি বললুম,—আমিও তো বলছি, পাখির ডিম বা বাসা খাওয়ার কী মানে হয়? আমি ভূত না রাক্ষস? যা ছুঁয়ে বলতে বলবি বলব।

তপু বলল,—হুঁ। আমি শুনেই বুঝতে পেরেছি, কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে।

নিরু বলল,—কিন্তু গোলমালটা কীসের?

তপু গম্ভীর হয়ে বলল,—ভৌতিক গোলমাল।

—ভৌতিক গোলমাল মানে?

এ পাহাড়টা মনে হচ্ছে ভুতুড়ে। বাংলোটাও তাই। —তপু বলতে থাকল। —আমরা পরস্পর যাদের আজেবাজে জিনিস খেতে দেখেছি। তারা সবাই ভূত। আমাদের চেহারা ধরে গোলমাল পাকাতে চেয়েছিল। কিন্তু জ্যান্ত মানুষ আমরা— আমাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা কি সহজ? নিরু, অবস্থা তো বুঝলি। তুই লিডার, এবার ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করে বল, কী করবি?

ঘরে একেবারে চুপচাপ অবস্থা। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দিনদুপুরে এমন গোলমেলে কাণ্ড দেখা যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল?

একটু পরে নিরু বলল,—টপ্পাদা কতকটা ইশারা দিয়েছিলেন বটে তবে উনি যখন ভয় পাননি, আমরাই বা ভয় পাব কেন? তোরা শোন! আমরা এখানে থাকছি। কিন্তু একটা কথা বলে দিচ্ছি, কেউ যদি কাউকে কোন বিদঘুটে কান্ড করতে দেখিস, জানবি সে ভূত। অমনি তাকে রামধোলাই দিতে শুরু করবি। এই আমার নির্দেশ। এবার চল, সবাই মিলে প্রস্রবণটা খুঁজে বের করি। স্নানটান করে খেয়ে নেওয়া যাবে।

বিকেল অব্দি তেমন কিছু ঘটল না। রামনারাণ আর রঘুপতি, তাদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। আমরা ক্লান্ত ছিলুম বলে বিকেল অব্দি জিরিয়েও নিয়েছি। খাটটা বেশ চওড়া। পাঁচজনে ঠাসাঠাসি করে শুতে অসুবিধে নেই। শীতের সময়। এভাবে শুলে আরামই লাগে। বিকেলে উঠে শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে একটা এনামেলের মগে জল ফুটিয়ে চা করা হল। চা-চিনি-দুধের কৌটো সবই ছিল।

চা খাওয়ার পর বাংলোর সামনে উঠোনে বসে আছি, হঠাৎ দেখি অমু সতুকে দুমদাম মারতে শুরু করল। সতু হাঁউমাউ করে উঠল। নিরু বলল,—কী হল রে? হলটা কী?

অমু আবার একটা কিল চালিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল,—ভূত! এ ব্যাটা ভূত! সতু না!

সতু ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল,—আমি ভূত না, সতু! মাইরি সতু! চিমটি কেটে দ্যাখ!

নিরু ছাড়িয়ে দিয়ে বলল,—ব্যাপার কী বলবি তো অমু!

অমু বলল,—ও আবার ঘাস খাচ্ছিল!

সতু কাঁদতে কাঁদতে প্রতিবাদ করল,—না রে নিরু, না। আমার অভ্যেস। আমি ঘাস ছিঁড়ে এমনি দাঁতে চিবুচ্ছিলুম,—অনেকেই তো এমন করে। অভ্যেস!

আমার আবার আঙুল কামড়ানো অভ্যেস। টের পেলাম আঙুলটা তখনও মুখে রয়েছে এবং তপু আড়চোখে তাকাচ্ছে, আর মুঠো রেডি করছে। ঝটপট আঙুল বের করে নিলুম। তপু সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল তবু। কাঁচুমাচু হেসে ফিসফিস করে বললাম,—কিছু না! অভ্যেস!

শীতের বেলা দ্রুত ফুরিয়ে এল। এমন জায়গায় রাত কাটানোর অস্বস্তি পেয়ে বসেছিল সবাইকে। তার ওপর, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। প্রত্যেকে খুব সতর্ক হয়ে গেছে। যেন বিদঘুটে কোনও কাণ্ড না করে ফেলি নিজের অজান্তেও।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে-সঙ্গে কুয়াশায় ঢেকে ফেলল পাহাড় আর এই বাংলোকে। তারপর হঠাৎ নিরু বলল,—সর্বনাশ! মস্ত ভুল হয়ে গেছে। আমাদের একটা আলো আনা উচিত ছিল।

তপু বলল,—কেন? টর্চও তো আছে প্রত্যেকের।

একটা ল্যাম্পের দরকার ছিল না? —নিরু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল। অন্তত কিছু মোমবাতি আনাও উচিত ছিল। ধুস! এমন ভুল মানুষ করে? টর্চের আলোয় রান্না করতে হলে ব্যাটারি পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।

আমরা তখন পরস্পর কাছাকাছি থাকছিলুম। ঘরে গিয়ে আরও কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করলুম। এমন সময় দেখা গেল, পাহাড়ের নিচের দিক থেকে একটা আলো উঠে আসছে। আমরা নেচে উঠলুম।

নিরু বলল,—নিশ্চয় সেই দুই ব্যাটা ভূতের একজন আসছে। হয় রামনারাণ, নয়তো রঘুপতি। একটা কথা শোন। আলোটা আমাদের সত্যি বড্ড দরকার। ওদেরকে নিয়ে কী করব? ভূতটূত নিয়ে সমস্যায় পড়ব। ওদের ঝগড়া থামাতে হবে। তার চেয়ে একটা প্ল্যান করা যাক।

অমু বলল,—বল। শুনি।

নিরু চাপা গলায় বলল,—আলোটা আগে হাতিয়ে নেব। তারপর ব্যাটাকে রামধোলাই শুরু করব সবাই মিলে। মারের চোটে ভূত ভাগানোর কথা শুনিসনি?

পাগল আর ভূত, দুটোকেই মার দিলে কাজ হয়। রেডি হ তোরা। টপ্পাদা ঠিক এমনি করেই সেবারে ওদের ভাগিয়ে দিয়েছিলেন।

লণ্ঠনটা উঠোনের ও প্রান্তে দেখা গেল। ঘন পাহাড়ি কুয়াশা। আলোর ছটা দুহাত অব্দি পৌঁছচ্ছে। দেখা গেল, একজন নয় দুজন আসছে। তার মানে রামনারাণ আর রঘুপতি দুজনেই। হয়তো নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নিয়েছে। নাকি আবার ঝগড়াঝাঁটি করতেই আসছে?

নিরু ফিসফিস করে বলল,—রেডি। তপু, তুই ওরা বারান্দায় ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে আলোটা কেড়ে নিয়ে ঘরে চলে আসবি। সতু, বিজু, অমু! তোরা আমার সঙ্গে হাত লাগাবি। কাম অন!

বারান্দায় দুজনে উঠেছে, অমু, তপু বাঘের মতো দরজা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে। তারপর হ্যাঁচটা টানে হ্যারিকেনটা কেড়ে নিয়েছে। আর আমরাও একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি ওদের ওপর। তারপর দুমদাম কিল-থাপ্পড়-চড়-ঘুষি।

দুই মূর্তি আলো কাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হকচকিয়ে গিয়েছিল। মার খাওয়ার কয়েক সেকেণ্ড পরে যেন তারা টের পেল যে তাদের বেজায় রামধোলাই দেওয়া হচ্ছে। গলা ফাটিয়ে একসঙ্গে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল,—ওরে বাবা রে! মেরে ফেললে রে! ওরে বাবা রে! এরা কারা রে!

আমার কানে একটা গলা খুব চেনা মনে হচ্ছিল। কিন্তু ভূত তো চেনা মানুষ হয়েই দেখা দেয়, দেখা দিয়েছে আমাদের।

তারপর একজন পড়ে গিয়ে চেঁচাতে থাকল,—ওরে নিরু রে! তপু-রে! বিজু-রে! অমু-সতু-রে! তোরা কোথা গেলি রে! আমায় বাঁচা রে।

তপু দৌড়ে এল আলো নিয়ে। আলোয় দেখি—সর্বনাশ! স্বয়ং টপ্পাদা সেজে এসেছে! চালাকি বুঝছিস নে?

সে আবার ঘুঁষি পাকিয়ে যেতেই টপ্পাদা আর্তস্বরে বললে,—ওরে, আমি ভূত নই! মারিসনি, আর মারিসনি। তোদের বিপদ-আপদ হবে ভেবে লোক নিয়ে এসেছি রে!

তারপর কী হল, কহতব্য নয়। টপ্পাদার পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করেও ওঁর রাগ পড়ে না,—তোদের জন্যে আমি পরের ট্রেনে কষ্ট করে এলুম। ভেবেছিলুম ডেভিড সাহেবের বাংলোয় আবার ভূতের হাতে না পড়ে। অনভিজ্ঞ ছেলেপুলে সব। তাই তিন মাইল দূরের গ্রাম থেকে চৌকিদারকে ডেকে নিয়ে আসছি, আর তোরা...উঃ!

এই লোকটাই তাহলে আসল চৌকিদার। বেচারা একটু হেসে বলল,—ছোড় দিজিয়ে বাবুজী। খোকাবাবুলোগ ডরসে মারা হ্যায়। ডর পেয়ে মাথা বিগড়িয়ে গিয়েছে। উনহিদের হাতমে মারউর বহুৎ মিঠা হ্যায়। ছোটা-ছোটা হাত, মার ভি বহুৎ ছোটা।

টপ্পাদার মুখে হাসি ফুটল। বললেন,—ঠিক আছে।

বাঁটুবাবুর টাট্টু

ঘোড়া ইজ ঘোড়া বাঁটুবাবু-ডাক্তার খাপ্পা হয়ে বললেন। এইচ ও আর এস ই হর্স; খবরদার! আর কক্ষনও আমার ঘোড়াকে টাট্টু-ফাট্টু বলবে না।

পণ্ডিতমশাই ফিক করে হেসে বললেন,—এই চতুষ্পদ বক্রগতি বামন প্রাণীটিকে যদি ঘোড়া বলতে হয়, তা হলে সিঙ্গিমশাইয়ের রামছাগলটিও ঘোড়া!

বাঁটুবাবু-ডাক্তার তেড়েমেড়ে বললেন,—তুমি পণ্ডিতমূর্খ! রামছাগলের শিং থাকে। আমার ঘোড়ার শিং আছে?

ছিল। তুমি তো ডাক্তার। অস্ত্রচিকিৎসা করে কেটে দিয়েছ। —পণ্ডিতমশাই ডিবে বের করে একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন এবং বিকট হাঁচলেন।

হয়তো হাঁচির শব্দেই ভয় পেয়ে আচমকা টাট্টু ঘোড়াটি পিঠে ডাক্তারবাবু সমেত প্রায় দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল। পণ্ডিতমশাই খিকখিক করে হাসতে লাগলেন। ভিড় করে দাঁড়িয়ে যারা তর্কাতর্কি শুনছিল, তারাও হাসতে লাগল।

বাঁটুবাবুর আসল নামটা কী, এখনও অনেকে জানে না। বেঁটে গাব্দা-গোব্দা মানুষ বলে সবাই বাঁটুডাক্তার বলে। এই গ্রামের সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিনি বদলি হয়ে এসেছেন। এলাকার অবস্থা শোচনীয়। না রাস্তাঘাট না কিচ্ছু। বিষ্টিবাদলা হলেই জলকাদা। সাইকেলও চলে না। তাই বুদ্ধি করে ডাক্তারবাবু ঘোড়াটি কিনেছেন।

গুজব আছে, দূরের পাহাড়ি মুল্লুক থেকে ঘোড়ার পিঠে জাঁতা-শিল-নোড়া চাপিয়ে এ-তল্লাটে যারা বেচতে আসে, তাদের কাছেই নাকি বাঁটুবাবু ঘোড়াটি কিনেছেন। হাড়জিরজিরে একটা টাট্টুই বটে। নড়বড় করে দৌড়য়। এ-ও শোনা যায়, টাট্টু ঘোড়াটির স্বভাব বেয়াড়া বলেই জাঁতাওয়ালারা তাকে কম দামে বেচে দিয়ে যায়। কেউ বলে পাঁচ টাকায়, কেউ বলে মাত্র দুটাকায়। আবার কেউ বলে, জাঁতাওয়ালাদের আন্ত্রিক রোগ হয়েছিল। তারই ভিজিট।

তবে এটা সত্যি, ডাক্তারবাবুর একটা ঘোড়ার খুব দরকার ছিল।

সেবার দেশে খুব আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে মানুষ মরছে। ডাক্তারবাবুর দম ফেলার ফুরসত নেই। ওই টাট্টুর পিঠে চেপে গাঁয়ে-গাঁয়ে চিকিৎসা করে বেড়াচ্ছেন। লোকে তারিফও করে, এমন ডাক্তার বহুকাল তারা দ্যাখেনি। খুব শিগগির তিনি দারুণ পপুলার হয়ে উঠেছেন এলাকায়।

বাঁটুবাবু এমনিতে হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু কেউ তাঁর ঘোড়ার বদনাম করলে বেজায় চটে যান। স্কুলের প্রাক্তন সংস্কৃতশিক্ষক পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব। পণ্ডিতমশাই বাইরে-বাইরে কাঠখোট্টা, ভেতর-ভেতর কিন্তু ভারি রসিক। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই ফিক করে হেসে বলেন,—ওহে ডাক্তার, কিঞ্চিৎ শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করো।

—সময় নেই। কলে যাচ্ছি।

আহা, শাস্ত্রবাক্য শ্রবণে পুণ্য হয়। —পণ্ডিতমশাই আকর্ণ হেসে বলেন,— দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত, মতান্তরে উচ্চৈঃশ্রবা। শিবের বাহন ষণ্ড। লক্ষ্মীর বাহন পেচক। গণেশের বাহন মূষিক। কার্তিকের বাহন ময়ূর। সরস্বতীর বাহন রাজহংস। শীতলার বাহন গর্দভ। আর বাঁটুর বাহন টাট্টু!

ডাক্তারবাবু বাঁকা হেসে বলেন,—তুমি খুব ভোজনরসিক শুনেছি। সিঙ্গিবাড়ির বুড়োসিঙ্গির শ্রাদ্ধে একশো আটখানা পান্তুয়া খেয়েছিলে। কিন্তু সাবধান! এটা আন্ত্রিকের সময়। আন্ত্রিকে ধরলে তখন, দেখছ তো? ব্যাগ খুলে প্রকাণ্ড ইঞ্জেনশন-সিরিঞ্জ বের করে দেখান।

পণ্ডিতমশাইয়ের ইঞ্জেকশনকে বড় ভয়। ঝটপট গম্ভীর হয়ে বলেন,— কিমাশ্চর্যম! আমি তো তোমার স্তুতিই করলুম! নিন্দার ছলে স্তুতি! টাট্টুপৃষ্ঠে বাঁটু। কেমন অনুপ্রাস অলঙ্কার দিলুম, ভাবো।

ডাক্তার আর-একদফা শাসিয়ে টাট্টু ছোটান। বেঁটে গোব্দা মানুষের বেঁটে, রোগা টাট্টু ঘোড়াটি নড়বড় করে 'বক্রগতি'তে অর্থাৎ এঁকেবেঁকে কী দৌড় দৌড়য়, দেখবার মতো দৃশ্য। দুষ্টু ছেলেরাও কখনও হল্লা করে দৌড়য়। তাতে বাঁটুডাক্তারের টাট্টু ভয় পেয়ে কেলেঙ্কারি বাধায়। ডাক্তার হয়তো রুগি দেখতে যাচ্ছেন কেষ্টপুরে, তাঁকে নিয়ে গিয়ে তুলল বিষ্টুপুরে।

তবে সবখানেই আন্ত্রিক রুগি। বিষ্টুপুরের লোকেরা খুশিই হয়। ডাক্তারও রুগি পেয়ে খুশি হন।

পণ্ডিতমশাই গড়নে বাঁটুবাবুর দোসর। পরনে অবশ্য খাটো ধুতি আর হাতকাটা ফতুয়া। মাথায় দেখার মতো টিকি। স্কুলে রিটায়ার করেছেন কবে। তারপর থেকে পেশা যজমানি। এ-গাঁ সে-গাঁ থেকে পুজোআর্চায় ডাক আসে। তাই তাঁরও বাহনের অভাবে বড় অসুবিধে। জলকাদা ভাঙা এ-বয়সে কষ্টকর।

বাঁটুডাক্তারের টাট্টু নিয়ে মুখে যতই রসিকতা করুন, ব্যাপারটা দেখার পর তাঁকেও ঘোড়ারোগে ধরেছিল। ভাবতেন, যেমন-তেমন একটা ঘোড়া পেলে ভালো হয়। কিন্তু ঘোড়ার যা দাম, তাঁর পক্ষে ঘোড়া কেনা সম্ভব নয়। এক ভরসা, শীতের শেষে পাহাড়ি মুলুকের জাঁতাওয়ালারা যদি আসে এবং দৈবাৎ একটা রোগাভোগা ঘোড়া কম পয়সায় পেয়ে যান, ডাক্তারবাবুর মতোই।

পেলে দানাপানি খাইয়ে তাজা করে ফেলবেন। বাঁটুবাবুর মতো মাঠে কি জলার ধারে চরে নিজের আহার নিজেকে খুঁজতে দেবেন না। ডাক্তার বড় কঞ্জুস!

তখন সদ্য শরৎকাল চলেছে। বিচ্ছিরি বিষ্টিবাদলা, জলকাদা। কবে ফাল্গুন আসবে, তখন পাহাড়ি লোকেরা এসে যাবে। আজকাল জাঁতার চল কমে গেছে। তবে শিল-নোড়ার চাহিদা আছে। পণ্ডিতমশাই প্রতীক্ষায় ছিলেন।

দেখতে-দেখতে কালীপুজো এসে গেল। প্রায় ছ'কিলোমিটার দূরে কালীপুরে এক যজমানবাড়ি আছে। পণ্ডিতমশাই তাঁদের কালীপুজোর পুরুত। প্রত্যেক বছর অবশ্য গোরুর গাড়ি পাঠায়। এবার ওই এলাকায় বন্যা হয়েছিল। রাস্তা ভেঙে-টেঙে ধুয়ে গেছে। জলকাদায় গাড়ি আসবে না।

কিন্তু লোক তো আসবে। পায়ে হেঁটেই যাবেন বরং। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল। যজমানবাড়ি থেকে লোক এল না। বংশানুক্রমে যজমান ওরা। এমন তো হওয়ার কথা নয়। বন্যায় মূর্তি গড়িয়ে পুজো না করতে পারুন, শাস্ত্রে ঘটপুজোর বিধি আছে না! গৃহদেবীর বাৎসরিক পুজো না হলেই অকল্যাণ। দিনে-দিনে পাষণ্ড, নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে লোকেরা। পণ্ডিতমশাই ভাবলেন, নির্বোধ। তাই শাস্ত্রবিধি জানে না। বরং নিজে গিয়ে ব্যবস্থা করবেন পুজোর। আজই অমাবস্যা। পণ্ডিতমশাই বেরিয়ে পড়লেন। দিন ফুরিয়ে আসছে। আর তো দেরি করা যায় না। অতখানি পথ।

. গ্রামের শেষে দিঘি। দিঘির পাড় দিয়ে পায়ে-চলা পথ। পণ্ডিতমশাই হঠাৎ দেখতে পেলেন, বাঁট্টুবাবুর টাট্টুটি জলের ধারে তখনও ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। অমনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

জলকাদা ভেঙে বাঁট্টুডাক্তার যদি কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক ওই টাট্টুর পিঠে চেপে ঘুরতে পারেন, তিনিই বা পারবেন না কেন? বেগড়বাঁই করলে ছাত্রদের যেমন কান টেনে শাস্তি দিতেন এবং আকর্ণ হেসে বলতেন, কান টানলেই মাথা আসে, মাথা এলেই বুদ্ধি আসে, তেমনি টাট্টুব্যাটার কান টেনে শায়েস্তা করবেন।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে পণ্ডিতমশাই নেমে গেলেন। হাতে একটি যষ্টি আছে। সাপখোপের ভয়, জলকাদায় আছাড় খাওয়ারও ভয়। সেজন্যই এই যষ্টি। আস্ত বাঁশের খেঁটে। এটাই ছিপটির কাজ দেবে।

ঘোড়াটিকে গুঁতো মেরে জলের ধার থেকে ওঠালেন। দেখলেন, বেশ শান্ত মেজাজের প্রাণী তো! আসলে বাঁট্টুডাক্তার খামোকা ওকে ছিপটি মারতেন বলেই অমন করে দৌড়ত।

পণ্ডিতমশাই তার গায়ে হাত রেখে আদর করে সাধুভাষায় বললেন,—বৎসে! পুর্ণ্যকর্মে গমন করিলে পুণ্যলাভ হইবে। প্রচুর চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় হেঁ-হেঁ-হেঁ...! তোমার উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় সুচিক্কন বপু হইবে, হেঁ-হেঁ-হেঁ...!

টাট্টুটি বোধ করি আনন্দে বিকট হ্রেষাধ্বনি করল, চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ... এ যাবৎ তার হ্রেষাধ্বনি শোনা যায়নি। পণ্ডিতমশাই এক লাফে তার পিঠে চাপলেন। এমন যার হাঁকডাঁক, তার গায়ে জোর আছে বইকী!

লাগাম-ছাড়া টাট্টু। আচমকা পিঠে ওজনের হেরফের টের পেয়ে থাকবে। তক্ষুনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দৌড়ল। পণ্ডিতমশাই অমনি ঝুঁকে তার গলা জড়িয়ে না ধরলে আছাড় খেতেন। সামলে নিয়ে তাকে কালীপুরমুখী করতে লাঠির গুঁতো মারলেন। টাট্টু আরও ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়ে দৌড়ল।

তারপর আর থামবার নাম নেই। আবছা আঁধার, জলকাদা ভেঙে পক্ষীরাজের মতো যেন ডানা মেলে উড়ছে। দেখতে-দেখতে আঁধার ঘনিয়ে এল। পণ্ডিতমশাই তাকে যত থামানোর জন্য গুঁতো মারেন, তত তার গতি বাড়ে। শেষে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন।

অমাবস্যার রাত্তির। ঘুটঘুটে রাত্তির। দূরে একটা আলো জুগ-জুগ করছিল।

ঘোড়াটা সেই আলোর দিকেই ছুটছে মনে হল পণ্ডিতমশাইয়ের। ততক্ষণে ঝাঁকুনিতে তাঁর কোমরে ব্যথা ধরে গেছে। হাড় মট-মট করে নড়ছে। জীবনে কখনও ঘোড়ায় চড়েননি। তাও জিন নেই ঘোড়ার পিঠে, পাদানি নেই। ঝুলন্ত পা দুখানিও জল-কাদা কাঁটাখোঁচে একেবারে বিচিত্তির। হাতের লাঠিটাও কখন গেছে পড়ে। দু-হাতে ঘোড়ার গলা আঁকড়ে উবু হয়ে আছেন পণ্ডিতমশাই।

আলোর কাছাকাছি গিয়ে বাঁটুবাবুর টাট্টুর গতি কমল।

একটা গ্রামই বটে। দুধারে ঘরবাড়ি আবছা দেখা যাচ্ছে। একটা বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলছিল। ঘোড়াটি সেখান গিয়ে থামল এবং বিকট ডাক ছাড়ল, চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ!

অমনি কারা চেঁচিয়ে উঠল,—এসে গেছেন! ডাক্তারবাবু এসে গেছেন!

তারপর চারদিকে হল্লা। একটা সাড়া পড়ে গেল। ওরে, ডাক্তারবাবু এসে গেছেন! ইঞ্জেকশন নিবি তো চলে আয়!

পণ্ডিতমশাই কথা বলার চেষ্টা করলেন। গলা শুকনো। কথা বেরোল না।

যে-বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলছিল, সেখান থেকে কেউ হেঁড়েগলায় ধমক দিল,—চো-ও-প সব! চো-ও-প!

হল্লাটা থেমে গেল। তখন সে ঘোড়ার কাছে এল। হাতের লণ্ঠন তুলে পণ্ডিতমশাইকে দেখে বলল,—ডাক্তারবাবু, আপনার ব্যাগ দেখছিনে যে?

এবার পণ্ডিতমশাই অতিকষ্টে শুধু বললেন,—জল।

লোকটা হাঁক ছাড়ল,—ওরে, জল নিয়ে আয়!

তক্ষুনি এক ঘটি জল এসে গেল। পণ্ডিতমশাই টের পেলেন জলটা বেজায় ঠান্ডা-হিম! তা হোক! ঢকঢক করে খেয়ে চোখে-মুখে ছড়িয়ে একটু সুস্থ হলেন। বললেন,—আমাকে নামাও বাবাসকল! তারপর সব বলছি।

কয়েকজন মিলে তাঁকে চ্যাংদোলা করে নামাল। মনে হল, গাঁয়ের চাষি মানুষজন দিনমান জলকাদায় মাঠে কাজ করেছে, তাই এখনও হাতগুলো জলটার মতোই ঠান্ডা-হিম।

লণ্ঠনের আলোটা খুব কম। স্পষ্ট করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। যেটুকু দেখা গেল, বারান্দাটা পাকা। বাড়িটাও পাকা ও দোতলা। কিন্তু পলেস্তারাখসা পুরোনো বাড়ি। জরাজীর্ণ অবস্থা বোঝা যায়। বারান্দাতেও ফাটল ধরেছে। লণ্ঠনধারী লোকটি ঢ্যাঙা, রোগাটে গড়ন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। প্রৌঢ় বলা চলে। মাথায় কাঁচাপাকা সিঁথে করা লম্বা চুল। ঘরে পণ্ডিতমশাইকে ঢুকিয়ে পিছু ফিরে বললেন,—ওরে, ডাক্তারবাবুর ঘোড়াটা দেখিস!

বাইরে থেকে সাড়া এল,—দেখছি বাড়ুজ্যেমশাই! ভাববেন না।

পণ্ডিতমশাই নমস্কার করে বললেন,—আপনি ব্রাহ্মণ?

পালটা নমস্কার করে তিনি বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?

পৈতে দেখিয়ে পণ্ডিতমশাই করুণ হাসলেন। বললেন,—আর বলবেন না। যাচ্ছিলুম একখানে, এসে পড়লুম আর একখানে। ওই পাষণ্ড টাট্টু...

কথা কেড়ে বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন,—শুনেছি বটে! আপনাকে না দেখলেও যেমন আপনার কথা শুনেছি, তেমনি আপনার টাট্টুর কথা শুনেছি। আপনি নাকি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি! কী সৌভাগ্য, আপনাকে পাওয়া গেল ডাক্তারবাবু!

পণ্ডিতমশাই হাত নেড়ে বললেন,—গণ্ডগোল হয়ে গেছে। গণ্ডগোল হয়ে গেছে!

কী গণ্ডগোল বলুন তো ডাক্তারবাবু? ব্যাগটা পড়ে গেছে তো? এক্ষুনি লোক পাঠাচ্ছি খুঁজতে। আপনি আগে রুগিকে দেখুন। আপনি চোখে দেখলেই আদ্ধেক সেরে যাবে। বাকি আদ্ধেক ইঞ্জেকশনে। আগে একটু জিরিয়ে নিন।

পণ্ডিতমশাই একটা নড়বড়ে চেয়ারে ধপাস করে বসে বললেন,—না-না! আপনি ভুল করছেন। আমি বাঁট্টু-ডাক্তার নই।

অদ্ভুত হেসে বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন,—তা বললে কি চলে? এলাকা জুড়ে প্রবাদবাক্য চালু হয়ে গেছে জানেন তো?

যেখানে দেখবে টাট্টু
পিঠে ডাক্তার বাঁট্টু।
ঘুরে খট-খট শব্দ
শুনে আন্ত্রিক জব্দ।।

পণ্ডিতমশাই জোরে মাথা নেড়ে বললেন,—ভুল! ভুল! আমি হলুম ভেঁটু ভটচাজ্।

বাঁড়ুজ্যেমশাই জোরে মাথা নেড়ে বললেন,—তা বললে চলে? পায়ে হেঁটে এলে বুঝতুম, বাঁট্টুবাবুর বদলে ভেঁটুবাবুই না হয় এসেছেন!

পণ্ডিতমশাই রাগ করে বললেন,—খবরদার, ভেঁটু বলবেন না!

এই সময় বাইরে কে খ্যান-খ্যান গলায় চেঁচিয়ে উঠল, বাঁড়ুজ্যেমশাই, আপনার জামাই টাট্টুর পিঠে চেপে পালিয়ে যাচ্ছেন!

বাঁড়ুজ্যেমশাই হাঁক ছাড়লেন,—ধর! ধর! ধরে আন!

আবার হল্লার শব্দ। অন্ধকারে ধাপধুপ শব্দে দৌড়োদৌড়ি। ধর! ধর! পালাল! পালাল!

পণ্ডিতমশাই বললেন,—ওই যাঃ! ঘোড়াটা।

তাঁকে থামিয়ে বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন,—ভাববেন না। এক্ষুনি ধরে ফেলবে।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী? আপনার জামাইবাবাজি অমন করে পালালেন কেন?

গম্ভীর হয়ে বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন,—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। আন্ত্রিক রোগের ভয় হয়েছে বাবাজির। পালানোর ধান্দায় আছে টের পেয়ে পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছিলুম। এই সুযোগে কেটে পড়েছে। কিন্তু যাবে কোথায়?

বলে তিনি পা বাড়ালেন ভেতরের দিকে। —কই, আসুন। আগে রুগি দেখে নিন। তারপর প্রেসক্রিপশন, ইঞ্জেকশন ওসব হবে। আসুন, আসুন!

পণ্ডিতমশাই মরিয়া হয়ে বললেন,—আমি ডাক্তার নই। যজমেনে-বামুন।

—তাতে কী? আমরাও যজমেনে বামুন ছিলুম। নইলে এই মুখ্যুদের গ্রামে কী কেউ বাস করতে আসে? আসুন? আসুন! যজমেনে বামুনেরা কি আজকাল ডাক্তার হচ্ছে না?

পণ্ডিতমশাই কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন,—কিন্তু আমি যে ডাক্তারির কিস্‌সু জানিনে!

জানার দরকার নেই। —চাপা গলায় বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, আপনাকে দেখলেই গিন্নির আন্ত্রিক সেরে যাবে। পথ তাকিয়ে শুয়ে আছেন। খালি বলেন, কই! বাঁটুল-ডাক্তার তো এলেন না! ওকে নাকি কল দিয়ে আসিনি বলে আমাকে শাসান। আমার হয়েছে জ্বালা!

ফিস-ফিস করে এসব কথা বলতে-বলতে সিঁড়িতে উঠছিলেন তিনি। একটা হাতে পণ্ডিতমশাইয়ের একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছেন। অন্য হাতে লণ্ঠন। ওপরতলার বারান্দায় উঠে পণ্ডিতমশাই বললেন,—আপনার হাতটা বিচ্ছিরি ঠান্ডা কেন বলুন তো?

বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন,—যা বিষ্টিবাদলা আর আন্ত্রিক!

—আন্ত্রিকের সঙ্গে ঠান্ডার কী সম্পর্ক?

পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে ঘুরে তিনি বললেন,—চুপ! চুপ! ওসব কথা বলতে নেই।

অন্ধকার ঘরের ভেতর প্রকাণ্ড সেকেলে খাট। তাতে গলা অবধি চাদর মুড়ি দিয়ে চিত হয়ে এক ভদ্রমহিলা শুয়ে আছেন। বাঁড়ুজ্যেমশাই লণ্ঠনটা তুলে ধরে বললেন,—ওগো, শুনছ? বাঁটুলবাবু এসেছেন!

বাঁড়ুজ্যেগিন্নি চোখ খুলে তাকালেন। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন,—নাড়ি দেখতে বলছে। দেখুন তো! নইলে কেলেঙ্কারি বাধাবেন।

পণ্ডিতমশাই নাড়ি দেখতে জানেন না। কিন্তু উপায় নেই। নাড়ি দেখার ভঙ্গিতে বাঁড়ুজ্যেগিন্নির হাতটা ধরতেই নিজের হাত হিম হয়ে গেল। কী ঠান্ডা! চোখদুটোই বা অমন নিষ্পলক কেন?

বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন,—নাড়ি টের পাচ্ছেন?

পণ্ডিতমশাই ভয়ে-ভয়ে বললেন,—পাচ্ছি, আবার পাচ্ছিও না। কিন্তু এঁর হাত দেখছি আপনার চেয়েও ঠান্ডা!

ফিক করে হেসে বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন,—তা তো হবেই। বুঝলেন না? আমার তিনদিন আগে টেঁসে গেছেন।

পণ্ডিতমশাই অবাক হয়ে বললেন,—টেঁসে গেছেন মানে? ওই তো দিব্যি তাকাচ্ছেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন।

অভ্যেস! —বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, ডাক্তার দেখলেই হাত বাড়ানো অভ্যেস। কথায় বলে অভ্যেস যায় না মলে।

—মরলে—মানে মৃত্যু হলে?

—আবার কী?

পণ্ডিতমশাই এক-পা দু-পা পিছোতে-পিছোতে বললেন,—তার মানে উনি মড়া?

বাসি। আমার চেয়েও তিনদিনের বাসি।

—সর্বনাশ!

বাঁড়ুজ্যেমশাই মুচকি হেসে বললেন,—সর্বনাশ কীসের? যতক্ষণ না আপনার ব্যাগ খুঁজে আনছে ওরা, বসুন এখানে। ততক্ষণ আপনাকে বেহালা বাজিয়ে শোনাই বসুন। বসুন! ওই দেখুন দেওয়ালে আমার বেহালা ঝুলছে। সাধে কি এমন চুল রেখেছিলুম? বেহালা বাজালে ঠিক এইরকম চুল রাখতে হয়।

পণ্ডিতমশাই কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন,—আপনি বেহালা বাজান নাকি?

বাজাতুম!—বেহালা পেড়ে নিয়ে বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, যাত্রাদলে বেহালা বাজাতুম।

—বাজাতুম! তার মানে?

—দল উঠে গেল।

—কেন? কেন?

আবার কেন? আন্ত্রিক! আন্ত্রিকে গাঁসুদ্ধু লোক—বাকি কথাটা শোনা গেল না বেহলার ক্যাঁক-কোঁ সুরে। সুরটা কেমন যেন রাতবিরেতে বাঁশবনের শব্দর মতো, অস্বস্তিকর।

ওদিকে বাঁড়ুজ্যেগিন্নির সেই হাতটা একই অবস্থায় বেরিয়ে উঁচু হয়ে আছে তো আছেই। চোখদুটো পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে। পণ্ডিতমশাই ততক্ষণে যা বোঝবার বুঝে গেছেন। যেই বাঁড়ুজ্যেমশাই বেহালা বাজাতে-বাজাতে সুরের আবেগে চোখ বুজেছেন, অমনি তিনি পা টিপে-টিপে দরজার কাছে।

বাঁড়ুজ্যেগিন্নি চিঁচিঁ করে বলে উঠলেন,—পালিয়ে যাচ্ছে যে!

বাঁড়ুজ্যেমশাই সুরে তন্ময় হয়ে আছেন। শুনতে পেলেন না। সেই সুযোগে পণ্ডিতমশাই পড়ি-কি-মরি করে বাইরে এবং সিঁড়ি দিয়ে অন্ধকারে গড়াতে-গড়াতে নিচে।

তারপর বেরিয়েই দৌড়। সেই টাট্টুর মতো দৌড়। একেবারে দিশেহারা।

একটু পরে পেছনে হল্লা শুনলেন,—ধর! ধর! পালাচ্ছে! ডাক্তার পালাচ্ছে!

অমাবস্যার রাতে পণ্ডিতমশাই রামনাম জপতে-জপতে জলকাদা ভেঙে দৌড়তে থাকলেন।...

ভোর হয়ে আসছে।

গায়ে আর এতটুকু জোর নেই পণ্ডিতমশাইয়ের। ধুতি-ফতুয়া কাদায় বিচিত্তির। চুলে কাদা, হাত-পায়ে কাদা। থপ-থপ করে পা ফেলে হাঁটছেন। মাঝে-মাঝে একটু বসে জিরিয়ে নিচ্ছেন।

দিনের আলো আরও একটু পরিষ্কার হল। কাঁচা রাস্তার দুধারে গাছ। ধানক্ষেত। একটা গাছের তলায় কেউ বসে ছিল। তাঁকে দেখামাত্র 'ওরে বাবা' বলে দৌড়নোর উপক্রম করল সে।

পণ্ডিতমশাই হাত তুলে চেঁচিয়ে বললেন,—মানুষ! মানুষ! আমি ভূত নই! মানুষ!

এক যুবক। পরনের প্যান্ট-শার্টের অবস্থা পণ্ডিতমশাইয়ের মতো। সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল,—মা কালীর দিব্যি?

পণ্ডিতমশাই বললেন,—মা কালীর দিব্যি!

যুবক সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বলল,—আসা হচ্ছে কোথা থেকে?

—বেহালা বাজিয়ে বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের বাড়ি থেকে।

ওরে বাবা! দিনের বেলা এতদূরেও লোক পাঠিয়েছে! —বলে যুবকটি আবার দৌড়নোর জন্য পা বাড়াল।

পণ্ডিতমশাই ঝটপট বললেন,—বাবাজি! তোমায় চিনেছি। তুমিই তাহলে বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের সেই পলাতক জামাই? শোনো, শোনো, আমি সত্যিই মানুষ।

—তা হলে রাম-নাম করুন।

—রাম রাম রাম রাম রাম...

বাঁড়ুজ্যের জামাই ফিক করে হেসে বলল,—থাক, থাক। বুঝেছি। তাহলে আপনিই সেই বাঁটুবাবু-ডাক্তার?

—ধুস! আমি ভেঁটু ভটচাজ। লোকে বলে পণ্ডিতমশাই। বাঁটু-ডাক্তারের টাট্টু চুরি করেই তো বিপদে পড়েছিলুম!

বিপদ তার চেয়ে আমারই বেশি, পণ্ডিতমশাই! —বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের জামাই করুণ মুখে বলল, অবস্থা বুঝুন! গাঁসুদ্ধু মড়া। আমার শ্বশুরমশাই, শাশুড়িঠাকরুন পর্যন্ত। অথচ আমাকে নড়তে দেবেন না শ্বশুরমশাই। কারণ আমি যে ঘরজামাই। আমাকে ভিটে আগলাতে হবে।

এতক্ষণে প্রাণভরে হাসতে পারলেন পণ্ডিতমশাই। বললেন,—তা বাবাজি, টাট্টুব্যাটাচ্ছেলে কোথায় গেল?

—বলা কঠিন। অন্ধকারে আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে উধাও।

—চলো, বাবাজি! কথা বলতে-বলতে এগোই।

পণ্ডিতমশাই। আমার শ্বশুরমশাই আর গাঁয়ের লোক যে ভূত হয়ে রইল?

পণ্ডিতমশাই বললেন,—ভেবো না। গয়ায় তোমাকে নিয়ে গিয়ে পিণ্ডদান করালেই হল। সব পৃথিবী ছেড়ে প্রেতলোকে চলে যাবে। কিন্তু বাবাজি, বউমাকে তো দেখলুম না?

—আমার মামাশ্বশুর গয়ায় স্টেশনমাস্টার। এখন মনে হচ্ছে, ভাগ্নির পিণ্ড দিয়েছেন। তাই আমিও আপনার বউমাকে দেখতে পাইনি।

এবার পাকারাস্তার মোড় এসে গেল। রাস্তা চিনতে পেরে পণ্ডিতমশাই

বললেন,—চলো বাবাজি! আপাতত আমার বাড়ি গিয়ে দুমুঠো খাবে। তারপর দুপুরের ট্রেনে দুজনে গয়াযাত্রা করব।

গ্রামের দিঘিতে স্নান করে জলকাদা ধুয়ে নিয়ে দুজনে ঘাটে নামলেন। নেমেই পণ্ডিতমশাইয়ের দৃষ্টি গেল ওপারের জলের ধারে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন,—ওই দ্যাখো! ওই সেই পাষণ্ড পামর চতুষ্পদ হতচ্ছাড়া! রামছাগল!

বাঁটু-ডাক্তারের সেই টাট্টুই বটে। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে গম আর ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। সবে রোদ্দুর উঠেছে। বুদ্ধিমান টাট্টু। দিব্যি চান করেও নিয়েছে।

বিবেকবধের পালা

হরিপদ মনমরা হয়ে বেড়াচ্ছে দেখে সদাশিববাবু জিগ্যেস করলেন,—কী হে হরিপদ? অসুখবিসুখ নাকি?

হরিপদ ম্লান হেসে বলল,—আজ্ঞে না।

—তাহলে অমন ব্যাজার কেন?

এ প্রশ্ন হরিপদকে সবাই করেছে। কারণ, হরিপদ খুব আমুদে হুল্লোড়বাজ মানুষ। তাকে কেউ কখনও গোমড়ামুখে বেড়াতে দেখেনি। তাছাড়া তার আরও সুনাম গানের জন্য। ভারি চমৎকার গান গাইতে পারে সে। যাত্রাদলে বিবেকের ভূমিকা তার বাঁধা। আজকাল নানা জায়গা থেকে যাত্রার আসরে বিবেক সাজার জন্য তার ডাক আসে। টাকাকড়িও ভালো পায়।

সদাশিববাবু প্রশ্ন শুনে হরিপদ একটু ইতস্তত করে বলল,—আমার বড্ড বিপদ, সদাশিবখুড়ো।

—বিপদ! কী বিপদ? কীসের বিপদ?

—বললে কি বিশ্বাস করবেন খুড়োমশাই?

আলবাত করব। কেন করব না? সদাশিববাবু বললেন,—আজ পর্যন্ত তোমায় তো কেউ অবিশ্বাস করেনি। কারণ তুমি অবিশ্বাসের কাজ করোনি। তুমি সত্যবাদী। —ভালোমানুষ। বলো, বলো! কী বিপদ তোমার! আমরা সবাই তোমায় সাহায্য করব!

সদাশিববাবু গাঁয়ের বারোয়ারি বটতলায় সারাক্ষণ বসে আড্ডা দেন। বড্ড বেশি বকবক করেন। হরিপদ মনে-মনে বিরক্ত হলেও মুখে বলল,—এ বিপদে কারুর সাহায্যে কাজ হবে বলে মনে হয় না খুড়োমশাই।

—আহা, খুলে বলোই না বাবু। তারপর বুঝব, কাজ হবে কি না।

অগত্যা হরিপদ ওঁর পাশে বসল। তারপর চাপা গলায় বলল,—আগের রাতে ময়নাডাঙায় এক আসরে বিবেক গাইতে গিয়েছিলাম। 'বভ্রুবাহন-অর্জুন' পালা, খুব

জমেছিল। তিনখানা গান গেয়ে সাজঘরে বসে আছি। পরের গান দুটো এই দৃশ্যের পরের দৃশ্যে। তো বসে থাকতে থাকতে ঢুলুনি চেপেছিল। হঠাৎ একসময়ে ঘুম ভেঙে-গেল, সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়লাম। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আসরের দিকে তাকিয়ে দেখি, শেষ দৃশ্য হচ্ছে। বভ্রুবাহন প্রাণ ফিরে পেয়ে পিতা অর্জুনের পায়ের ধুলো নিচ্ছে। আমি তো ভারি লজ্জায় পড়ে গেলাম। আরও চারখানা গান ছিল বাকি। নিশ্চয় আমাকে ওঠানোর চেষ্টা করছিল। ঘুম ভাঙেনি আমার। তখন গান বাদ দিয়েই পালা শেষ করেছে!

—তা এতে বিপদটা কী? টাকাকড়ি দেয়নি বুঝি?

হরিপদ জোরে মাথা নেড়ে বলল,—না-না। সেটাই তো গোলমেলে ব্যাপার। পালা শেষ হলে অধিকারীমশাই এসে আমার পিঠে চাপড়ে বললেন, হরিপদ। আজ মাত করে দিয়েছ ভাই! 'কারে তুই বধিস ওরে ও যে তোর আপনজন' এই গানখানা যখন গাইলে, আসরের কারুর চোখ শুকনো ছিল না। অধিকারীর কথা শুনে আমি তো অবাক।

—কেন? অবাক হলে কেন?

—ও গানটাই তো আমি গাইনি। ওটা চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের গান। আমি যখন সাজঘরে গিয়ে ঢুলছি, তখন সবে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য চলছে।

সদাশিববাবু অবাক হয়ে বললেন,—বলো কী! তাহলে বাকি গানগুলো কে গাইল?

হরিপদ কাঁদ-কাঁদ মুখে বলল,—সেটাই তো গোলমেলে ব্যাপার। সবাই দেখেছে, পালার শেষপর্যন্ত সবগুলো গান আমি গেয়েছি। অথচ আমি তো জানি, আমি মোটে খান তিনেকের বেশি গান গাইনি। তাহলে বাকি গানগুলো গাইল কে?

—ওরা বলল যে তুমি, অবিকল তুমি, একই গলা, একই ভাবভঙ্গিতে গেয়েছ?

—হ্যাঁ খুড়োমশাই।

সদাশিববাবু শিউরে উঠে বললেন,—হরিপদ, শীগগির একটা ব্যবস্থা করো। তোমার পেছনে ইয়ে লেগেছে মনে হচ্ছে।

হরিপদ ভয়ে-ভয়ে বলল,—ইয়ে মানে? সে কে খুড়োমশাই?

—বুঝতে পারছ না? এ নিশ্চয় কোনও অপদেবতার কাণ্ড।

—সর্বনাশ! তাহলে কী হবে খুড়োমশাই? সব আসরেই যদি এমন ব্যাপার হয়।

সদাশিববাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন,—ওঝা বা সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে একটা কবচের ব্যবস্থা করো। আর শোনো, আসর চলার সময় ঘুমিয়ে পড়ো না। তাহলেই সে তোমার রূপ ধরে আসরে ঢোকার সুযোগ পাবে না।

পরামর্শটা হরিপদর ভালোই লাগল। সে সিংহবাহিনীর মন্দিরে গিয়ে এক সাধুর কবচ নিয়ে এল। মন্দিরে সাধুরা প্রায়ই আসেন। কদিন থেকে চলে যান।

তারপর সে পাশের গাঁয়ের কেতু-ওঝার কাছ থেকেও একটা মাদুলি আনল। মাদুলিটা সে বাহুতে এবং সাধুর কবচ গলায় পরল কালো সুতো বেঁধে।

কদিন পরে এ গায়ের যাত্রাদল 'শ্রীদুর্গা' পালা গাইবে। হরিপদ রোজ রিহার্সালে গিয়ে গানগুলো রপ্ত করে নিল। আসরের দিন সে সবার আগেই সাজঘরে ঢুকে বসে রইল যাতে সেই অপদেবতা তার রূপ ধরে সাজতে না বসে।

বিবেকের সাজ বলতে গায়ে একটা গেরুয়া বেনিয়ান আর নামাবলী। আর কপালে তিলক। ওই যথেষ্ট। বেনিয়ান আর নামাবলীটা দখল করে রাখল হরিপদ।

পালা শুরু হতে সেই রাত দশটা বেজে গেল। কাপাসডাঙার এ দলের খুব নাম আছে। তাই লোকের ভিড় হল প্রচণ্ড। গোলমাল থামানো যায় না। দলের ম্যানেজার উমাপদ মজুমদার গতিক দেখে বললেন,—ওহে হরিপদ! তুমি বরং প্রথম দিকেই একখানা বাড়তি গান গেয়ে এসো। সেই যে শ্যামাসঙ্গীতখানা...আমার মায়ের রূপ দেখে যা...

হরিপদ বলল—ঠিক আছে। তাই হবে।

তার একটা অভ্যাস আছে বরাবর। আসরে ঢোকার আগে সাজঘরের পেছনে নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে একবার গুনগুন করে গানটা আওড়ে নেয়। সুর ঠিক করে নেয় আর কী! কথাও ঝালিয়ে নেয়, পাছে আসরে গাইতে-গাইতে গণ্ডগোল না করে ফেলে।

হরিপদ যখন সাজঘরে পেছনদিকে গুনগুন করে শ্যামাসঙ্গীতটা রপ্ত করতে গেল তখন আসরে নাচ চলছে।

সর্বনাশ! হঠাৎ গলা ধরে গেল কেন? সে তো অনেকক্ষণ জলটল খায়নি! অনেক সময় গরমের মধ্যে জল খেলে গলা ধরে যায়। তাহলে? হরিপদ দম নিয়ে ফের গানটা আওড়াতে চেষ্টা করল। ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজ বেরুল।

সে কাশল। গলা তুলে কাকেও এমনি-এমনি ডাকার চেষ্টা করল। কিন্তু আওয়াজ বেরুল না। যদি বা বেরুল তা হেঁপো রুগির মতো। ফ্যাঁসফেঁসে একটা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ মাত্র।

ওদিকে প্রথম সিন শুরু হয়েছে। সাজঘরের দিকে কে ডাকাডাকি করছে,—হরিপদ! হরিপদ কোথায় গেল! ও হরিপদ!

হরিপদর তখন শোচনীয় অবস্থা। এ কী সর্বনাশ হল তার!

সেই সময় আচমকা আসরে কেউ গান গেয়ে উঠেছে—আমার মায়ের রূপ দেখে যা— এবং সঙ্গে-সঙ্গে আসর চুপ। টুঁ শব্দটি আর নেই।

হরিপদ ঘুরে দেখে শিউরে উঠল,—হ্যাঁ, আসরে অবিকল আরেক হরিপদ তিড়িং করে নেচে গান ধরেছে তারই গলায়। হুবহু এক চেহারা, পোশাক, গলার স্বর এক। এতটুকু তফাত নেই। দেখতে-দেখতে প্রথম মুহূর্তের ভয়টা কেটে গেল হরিপদর। রাগ হল। রাগটা বাড়তে থাকল। দাঁতে-দাঁতে চেপে হরিপদ আসরের নকল হরিপদর দিকে হিংস্র চোখে তাকাল।

তারপর সে এক লাফে নির্জন অন্ধকার জায়গাটা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসরে ঢোকার পথে গিয়ে পড়ল এবং চেঁচিয়ে বলার চেষ্টা করল—ও আমি না আমি না।

গলার স্বর বেরুল না। তাকে লোকেরা ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। তার দিকে

ওদের চোখ থাকার কথা না। সবার চোখ এখন আসরে। এ কোন ব্যাটা পাগল-ছাগল আসার পণ্ড করতে চাইছে রে বাবা!

হরিপদ আছাড় খেয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ দেখল শেষ দিকটায় একটা বাড়ির বারান্দায় বসে সদাশিববাবু যাত্রা শুনছেন। মরিয়া হয়ে দৌড়ে গেল হরিপদ।

খুড়োমশাই বলে যে ডাকবে, তার উপায় তো নেই। সে সটান হুমড়ি খেয়ে পাশে বসে ওঁকে খুঁচিয়ে দিল। সদাশিববাবুর মন এখন আসরে। বিরক্ত হয়ে কনুইয়ে গুঁতো মারলেন। হরিপদ তাতে দমল না। ফের হামাগুড়ি দিয়ে ওঁর সামনে যাবার চেষ্টা করল। সদাশিববাবু এবার পাশ থেকে ছড়িটা তুলে চাপা গলায় বললেন,—কে র‍্যা? খালি ভেড়ার মতো গুঁতোচ্ছে? দেব পেটটা ফাঁসিয়ে।

হতাশ হয়ে হরিপদ লোকের পেছন ঘুরে সাজঘরের কাছে গেল, নকল হরিপদর গান শেষ। ফিরে আসছে। হরিপদ তাকে ধরে ফেলবে বলে ওৎ পেতে রইল। ভূত হোক, আর যাই হোক—হাতাহাতি করে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

নকল হরিপদ আসর থেকে এসেই লোকের পেছন দিকে নিরিবিলি অন্ধকার জায়গাটায় চলে গেল। তারপর বেনিয়ানের পকেট থেকে বিড়ি বের করে দেশলাই জ্বেলে ধরাল। টানতে থাকল।

হরিপদ পা টিপে-টিপে তার কাছে গেল। তারপর পেছন থেকে দুহাতে জাপটে ধরল। ফ্যাসফেঁসে গলায় অতি কষ্টে বলল—তবে রে ব্যাটা ঘুঘু!

নকল হরিপদ বলল—আঃ! হচ্ছেটা কী? এ কি ইয়ার্কির সময়?

এদিকে হরিপদ ওকে জাপটে ধরেই টের পেয়েছে, নকল হরিপদর গা বরফের চেয়ে হিম। সঙ্গে-সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছে। দুহাত জমে গেছে ঠান্ডায়। দাঁত ঠক-ঠক করে কাঁপছে।

নকল হরিপদ হাসতে-হাসতে সাজঘরের দিকে চলে গেল। আসল হরিপদ দেখল, কাঁপুনি থামছে না। কী শীত কী শীত! অগত্যা সে বাড়ির দিকে দৌড়ুল, এক্ষুনি লেপ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়া দরকার।

গাঁয়ের শেষ দিকটায় হরিপদর বাড়ি। পিসিমার হাতে মানুষ হয়েছে সে। বাড়িতে বলতে লোক ওই দুজন। বেলা অব্দি হরিপদ সেদিন শুয়ে আছে লেপ মুড়ি দিয়ে। পিসিমা ওঠাতে গিয়ে দেখলেন, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তাই ডাক্তার ডাকতে গেছেন।

কিছুক্ষণ পরে পিসিমার মুখে শুনেই যাত্রাদলের লোকেরা ব্যস্ত হয়ে গেল। ম্যানেজার উমাপদবাবু এলেন। সদাশিবখুড়োও এলেন।

উমাপদবাবু বললেন,—জ্বর যে হবে, তা আসরে চোখ দুটো দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, কেমন লাল দেখাচ্ছিল। তবে এ আসরে যা গান গেয়েছে হরিপদ, এবার না কলকাতা থেকে ডাক আসে।

সদাশিব ডাকলেন,—ও হরিপদ! কেমন বোধ করছ?

হরিপদ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল,—যান। আর দয়া দেখাতে হবে না! খুব চিনে ফেলেছি সবাইকে!

সদাশিববাবু অবাক। উমাপদ বললেন,—সর্ব্বনাশ! তোমার গলা ধরে গেছে দেখছি। পরশু এক আসর বায়না আছে কনকপুরে,—কী হবে?

হরিপদ তেমনি ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল,—কেন? গত রাতে যে আসর চালিয়েছে, সেই চালাবে, আপনার ভাবনা কী ম্যানেজারবাবু?

উমাপদ কী বলতে যাচ্ছিলেন, সদাশিববাবু চোখ ইশারা করলেন। তারপর বললেন,—ও হরিপদ, তাহলে কাল রাতের আসরে তুমি কখানা গান গেয়েছিলে?

হরিপদ বুড়ো-আঙুল দেখিয়ে বলল,—একখানাও না। ও-ব্যাটা সবগুলো গেয়েছে। দেখছেন না, আমার গলার অবস্থা।

সদাশিববাবু চিন্তিত মুখে বললেন,—তাহলে তো ভাবনার কথা। তোমার সত্যি বড্ড বিপদ।

উমাপদ হতভম্ব। বললেন,—ব্যাপারটা কী?

বাইরে এসো। বলছি। —বলে সদাশিববাবু উপাপদকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

সামান্য ঠান্ডা-লাগা জ্বর। দুদিনেই ছেড়ে গেল। ওষুধ খেয়ে গলা ছাড়ল। সেদিনই কনকপুরে আসর! হরিপদকে যেতেই হল। সে খানতিনেক গান কোনওরকমে গাইবে। বাকি গান বাদ।

আসর যথাসময়ে শুরু হয়েছে। উমাপদ তক্কে-তক্কে আছেন। দলের লোকও তাঁর কথামতো তৈরি আছে।

পরপর তিনখানা গান হরিপদ গেয়ে এল। তারপর তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে বিবেকের গান বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কথাটা গোপন রাখা হয়েছে নায়েবমশাই অর্থাৎ কনকপুরে যাঁরা বায়না দিয়েছেন, তাঁদের কাছে। হরিপদ গানের পর সাজঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

সেও তক্কে-তক্কে আছে তৃতীয় অঙ্কে যদি নকল হরিপদ বিবেক সেজে গাইতে ঢোকে, উমাপদ এবং তার লোকজনের সঙ্গে সেও ধুন্ধুমার বাধাবে। অর্থাৎ নকল হরিপদকে সবাই মিলে রামধোলাই দেবে। কথায় বলে, মারের চোটে ভূত পালায়। কাজেই এই ব্যবস্থা।

সেই সিনটা এসে গেল। কুচক্রী সেনাপতি ঘাতককে আদেশ দিচ্ছেন, বধ করো বধ করো এই উদ্ধত বালককে! ঘাতক খড়্গ তুলেছে। এই সময় বিবেকের গান ছিল ঃ ‘মেরো না মেরো না, ও যে শিশু অসহায়...

গানটা বাদ। তার বদলে ঘাতক বলবে, সেনাপতিমশাই। এই বালককে আমি বরং গহন অরণ্যে নিয়ে গিয়ে গোপনে বধ করি। সেনাপতি বলবেন, তাই হোক তবে।

ঘাতক খড়্গ তুলতেই হরিপদ চঞ্চল হল। বহু বছরের অভ্যাস। গলাটা ভালোই ছেড়েছে। অসুবিধে হয়নি! খামোকা গান বাদ দেওয়া কেন?

আশেপাশে নকল হরিপদ অর্থাৎ সেই বদমাশ ভূতটাকে দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং...

হরিপদ দৌড়ে আসরে ঢুকে গেয়ে উঠল—'মেরো না, মেরো না...

সঙ্গে-সঙ্গে উমাপদ ম্যানেজার ছড়ি তুলে চ্যাঁচালেন—ঢুকেছে! ঢুকেছে! মার-মার। আসরের এদিক-ওদিক থেকে কারা দৌড়ে এল। তারপর হরিপদর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই মিলে।

হরিপদ ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল,—আমি! আমি! আমি আসল হরিপদ!

কে শোনে কার কথা! কনকপুরের নায়েবমশাইরা কিংবা শ্রোতারা তো কিচ্ছু জানে না। এভাবে বেমক্কা আসর পণ্ড হচ্ছে দেখে তারা হইহই করে উঠল। আসরে ঢুকে লোকগুলোকে ধাক্কা মেরে হটাল। হরিপদ বেগতিক দেখে উঁচু তক্তাপোশের আসর থেকে গড়িয়ে ক্লারিওনেটওয়ালার কোলে পড়েছিল। সেখান থেকে একেবারে তক্তাপোশের তলায়।

বুদ্ধি করে এখানে ঢুকেছিল বলেই তেমন হাড়গোড় ভাঙেনি।

তবে সেই শেষ। হরিপদ বিবেকগিরি নাক কান মলে ছেড়েছে। সবাই জানে, আর হরিপদ বিবেক গায় না। কাজেই নকল হরিপদেরও আবির্ভাব ঘটে না কোনও আসরে। সুযোগ পায় না ঢোকার। তার চেয়ে বড় কথা, খবরটা সবাই জেনে গেছে। লোভের বশে নকল সেজে আসরে ঢুকলে কী অবস্থা হবে, টের পেয়ে গেছে সেই অপদেবতা।

কিন্তু এই নকল হরিপদটা কে? ভূত তো বটেই। কিন্তু কার আত্মা?

সদাশিববাবু অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন,—মনে হচ্ছে, এ ব্যাটা সেই বাঁকা বাউরি। বুঝলে হে হরিপদ! আমাদের ছেলেবেলায় সে-ই বিবেক গাইত। রোগে ভুগে মারা পড়েছিল। কিন্তু অভ্যেস যাবে কোথায়? তুমি নিরীহ সরল মানুষ দেখে তোমাকে অমনি করে ঠকাত। বুঝলে তো?

হরিপদ বলল,—তা আর বুঝিনি? সেইজন্যেই তো বিবেক হচ্ছি না। এবার থেকে আমি বরং ঘাতকের পার্টটাই করব।...

রাত-বিরেতে

মুরারিবাবু খুব বিপদে পড়েছেন! রাতদুপুরে বাড়ির উঠোনে টুপ-টুপ করে ঢিল পড়ে। কারা ছাদে হেঁটে বেড়ায় ধুপ-ধুপ, ধুপ-ধুপ। বেরিয়ে কিন্তু কাউকে দেখতে পান না। টর্চ জ্বেলে বাড়ির চারপাশটা বৃথা খোঁজাখুঁজি করেন। নিরিবিলি জায়গায় বাড়িটা। পাড়ার মধ্যেও নয় যে ছেলেরা দুষ্টুমি করবে। তা ছাড়া, তাজ্জব ব্যাপার, ঢিল পড়ার শব্দ পান এবং দু-একটা তাঁর টাকেও পড়ে, অথচ ঢিল দেখতে পান না।

তাহলে? এ নিশ্চয় অশরীরীদের কাজ। মুরারিবাবুর বন্ধু ফৈজুদ্দিন এ শহরের নামকরা উকিল। তিনি এসে সব শুনে বললেন,—দেখ মুরারি! আমার মনে হচ্ছে, তুমি জিনের পাল্লায় পড়েছ।

মুরারিবাবু বললেন,—জিন? সে আবার কী? সবাই তো বলছে, ভূতেরই কাণ্ড।

—উঁহু। ভূত থাকে বনবাদাড়ে, জলার ধারে, নিরিবিলি জায়গায়। পারতপক্ষে তারা মানুষের কাছে ঘেঁষে না। কারণ, মানুষ মরেই তো ভূত হয়। বেঁচে থাকার ঝক্কি কতটা, মানুষ মরার আগে হাড়ে-হাড়ে জানে। ঘেন্না ধরে যায় মনুষ্যজীবনে। কাজেই মরে ভূত হওয়ার পর কোন পাগল আর মনুষ্যজীবনের আনাচে-কানাচে আসতে চাইবে বলো।

মুরারিবাবুর মনে ধরল কথাটা। ফৈজুদ্দিন-উকিলের যুক্তির প্যাঁচে কত বাঘা-বাঘা হাকিম হার মানে। মুরারিবাবু বললেন,—হুঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু জিন কী?

ফৈজুদ্দিন খুশি হয়ে বললেন,—জিনদের ব্যাপারস্যাপার অবিকল ভূতদেরই মতো। তবে তারা একরকম প্রাণী বলতে পারো। তারা মানুষের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। এঁটোকাটা, আবর্জনা, গোবর, হাড় এইসব নোংরা জিনিস তাদের খাদ্য। ইচ্ছে করলেই তারা অদৃশ্য হতে পারে। আবার ইচ্ছে করলেই নানারকম রূপ ধরতে পারে!

—তারা থাকে কোথায়?

পোড়োবাড়িতে। চিলেকোঠায়। ছাদে। কখনও বাথরুমের ঘুলঘুলিতে। —ফৈজুদ্দিন চাপা গলায় বললেন! —আমার বাথরুমের ঘুলঘুলিতে একটা জিন ছিল। বুঝলে? রোজ চান করতে ঢুকতুম, আর ব্যাটা মুখ বাড়িয়ে আমায় ভেংচি কাটত। দুটো জুলজুলে নীল চোখ। বাপ্‌স্‌! এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

মুরারি আঁতকে উঠে বললেন,—দেখতে কেমন জিনটা! খুব ভয়ঙ্কর চেহারা নিশ্চয়?

তত কিছু না, ফৈজদ্দিন কড়ে-আঙুল দেখালেন! —এইটুকুন। একটা টিকটিকির মতো বিদঘুটে।

—তারপর? তারপর? কীভাবে সেটা তাড়ালে?

—কালা-ফরিককে ডেকে আনলুম, সে ব্যাটাকে আতরের শিশিতে পুরে পুকুরে ফেলে দিয়ে এল। তুমি কালা-ফকিরের কেরামতি তো জানো না! তাকে দেখলে জিনেরা লেজ ফেলে রেখে পালায়!

মুরারির একটু খটকা লাগল। বললেন,—পালায় যদি শিশিতে পোরে কীভাবে?

ফৈজুদ্দিন ফ্যাঁচ্ করে হাসলেন। —সেটাই তো কালা-ফকিরের কেরামতি, তুমি এক্ষুনি ওর কাছে যাও। দেখবে ফকিরসাহেব এসে তোমার বাড়ির জিনগুলোকে বস্তায় পুরে সমুদ্দুরে ফেলে দিয়ে আসবে।

মুরারি লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু ফের খটকা লাগল মনে। বললেন,—বস্তা কেন? ওই যে বললে আতরের শিশির কথা?

—বুঝলে না? তোমার বাড়ির জিন তো ঘুলঘুলির খুদে জিন নয়। একটা-

দুটোও নয়—একেবারে একগাদা। তা ছাড়া, তারা ভেংচি কাটে না, ঢিল ছোড়ে। ছাদ কাঁপিয়ে হেঁটে বেড়ায়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, তাদের সাইজ বড়। যাকগে, আদালতে যাওয়ার সময় হল। তুমি এক্ষুনি কালা-ফকিরের কাছে যাও।

ফৈজুদ্দিন ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। একটু পরে মুরারিবাবুও বেরিয়ে পড়লেন। কালা-ফকির থাকে শহরের বাইরে এক নির্জন দরগায়। নিঝুম জায়গা। কোনও পিরসাহেবের কবর আছে। ফকির সেই কবরে আগরবাতি আর সাঁজবাতি জ্বালে। কদাচিৎ ভক্তরা এসে সিন্নি আর দশ-বিশ পয়সা মানত দিয়ে যায়।

মুরারিবাবুকে দেখে কালা-ফকির চোখ পাকিয়ে বলল,—কী? জিনের পাল্লায় পড়েছ বুঝি? ভাগো, এখন আমার যাওয়ার সময় নেই।

কালো আলখেল্লাপরা পাগলাটে চেহারার ফকিরকে দেখে মুরারিবাবু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তার ওপর এই কড়া ধমক। কিন্তু উপায় নেই। খুব ভক্তি দেখিয়ে একটা টাকা ফকিরের পায়ের কাছে রেখে বিনীতভাবে বললেন,—দয়া করে একবার যেতেই হবে বাবা। রাতে ওদের অত্যাচারে ঘুম হয় না। বড্ড বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে।

ফকির টাকাটা ভালো করে দেখে নিয়ে আলখাল্লার ভেতরে চালান করে দিল। তারপর বলল,—ঠিক আছে। বাড়ি গিয়ে একটা বস্তা জোগাড় করে রাখো। সব নিশুতি হলে রেতের বেলা যাবখন।

কালা-ফকির সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত করে এল। বস্তাটা ভালো করে দেখে নিল ফুটো আছে নাকি। তারপর সেটা নিয়ে একটা অষ্টাবক্র লাঠি নাচাতে-নাচাতে সে অন্ধকার বাড়ির চারদিকে চক্কর দিতে থাকল। বিড়বিড় করে কী সব আওড়াচ্ছিল। এদিকে মুরারিবাবু, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সে ঘরের ভেতর থাকতে বলেছে। খবরদার, কেউ যেন না বেরোয়। বেরুলে বিপদ।

কতক্ষণ পরে ফকির চেঁচিয়ে ডাকল,—বেরিয়ে এসো সব। কেল্লা ফতে। সবকো পাকাড় লিয়া।

সবাই বেরিয়ে গিয়ে দেখল, কালা-ফকির বস্তার মুখটা দড়ি দিয়ে বেঁধে তার ওপর সেই বাঁকাচোরা লাঠিটা দমাদ্দম চালাচ্ছে। —বল! আর জ্বালাবি বল, কখনও ঢিল ছুড়বি?

মুরারিবাবুর স্ত্রী নরম মনের মানুষ! কাঁদ-কাঁদ মুখে বললেন,—ওগো! ফকিরসায়েবকে বারণ করো! আহা অত করে বেচারাদের মারে না! মরে যাবে যে!

ফকির একগাল হেসে বলল,—ঠিক আছে। মাঠাকরুন বলছে যখন। তো কই রাহাখরচ দাও। সমুদ্দুরে ফেলতে যাব। সমুদ্দুর কি এখানে? তেরো নদীর পারে। ট্রেনে বাসে জাহাজে কতবার চাপতে হবে, তবে না।

রাহাখরচ নিয়ে ফকির চলে গেল। বস্তা কাঁধে নিয়েই গেল। মুরারিবাবুর বড় মেয়ে বিলু চোখ বড় করে বলল,—বাবা, বাবা! বস্তার ভেতর কেমন একটা শব্দ হচ্ছিল শুনেছ।

তার মা বললেন,—চুপ, চুপ। বলতে নেই।

আজ সবাই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিথে আরও রাত হল। বাড়ি নিরাপদ। তাই উঠোনে মুরারিবাবু মহানন্দে পায়চারি করতে থাকলেন। গল্পগুজবও করলেন নানারকম। সব নিশুতি নিঝুম হয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। জোনাকি জ্বলছে গাছপালায়। সেই সময় রাত বারোটা পাঁচের ডাউন ট্রেন শিস দিতে-দিতে আসছ। রেল লাইন বাড়ির ওপাশ দিয়ে গেছে। বাড়ি থেকে উঁচুতে রেললাইন। ট্রেন গেলে উঠোন থেকেও দেখা যায়। ট্রেনের আলো ঝলসে দিয়ে যায় বাড়িটাকে। বিলুর ভাই অমু বলল,—বাবা, ফকির এই ট্রেনেই যাচ্ছে।

মুরারিবাবু বললেন,—হ্যাঁ। বে অফ বেঙ্গল যেতে হলে...

হঠাৎ তাঁর কথা থেমে গেল। লাফিয়ে উঠলেন। এ কী? ফের তাঁর মাথায় ঢিল পড়ল যে? শুধু তাই নয়, কালো-কালো আরও ঢিল উঠোনে তাঁর আশেপাশে টুপ-টুপ করে পড়ছে। ট্রেনের আলোটা সোজা এসে পড়ছে তাঁর গায়ে। মুরারিবাবু আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। মুখে কথা নেই। ট্রেন চলে গেলে ঝলসানো আলোটাও সরল। তখন মুরারির মুখে কথা এল। —ঘরে ঢোক! ঘরে ঢোক! বলে উঠোন থেকে বারান্দায় উঠলেন।

তারপর রাগে দুঃখে আতঙ্কে অস্থির হয়ে বললেন,—ব্যাটা ভণ্ড ফকির স্রেফ ঠকিয়ে গেল। ওঃ কী ভুল না করেছি!

বিলুর মা বললেন,—সে কী। কেন, কেন, ও-কথা বলছ?

এইমাত্র ঢিল পড়ল দেখলে না? আমার মাথাতেও পড়ল। —মুরারি টাকে হাত বুলোতে-বুলোতে গিয়ে ফের লাফিয়ে উঠলেন। —ওরে বাবা। আমার কানের পাশে কী যেন রয়েছে। ঢিল! ভূতুড়ে ঢিল আটকে রয়েছে।

অমু বাবার কানের পাশ থেকে কালো কী একটা খপ করে ধরে ফেলল। তারপর বলল,—ও বাবা। এটা তো চামচিকে!

অ্যাঁ। —মুরারি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। অমু চামচিকেটা ছেড়ে দিতেই থামের গায়ে আটকে গেল। কিন্তু বলা যায় না, জিনেরা কতরকম রূপ ধরে! তাই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন,—মার-মার! জুতোপেটা কর।

সেই সময় অমু বলে উঠল,—বাবা, ইউরেকা!

—ইউরেকা মানে?

অমু রহস্যভেদী গোয়েন্দার মতো ভারিক্কি চালে বলল, —মাত্র চামচিকে। স্রেফ চামচিকে বাবা! বুঝলে না? ট্রেনের আলো পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে উড়ন্ত চামচিকেগুলোর চোখ ধাঁধিয়ে যায় আর টুপ-টুপ করে পড়তে থাকে। আমরা ভাবি ঢিল পড়েছে।

মুরারিবাবু সন্দিগ্ধভাবে বললেন,—কিন্তু ছাদের ধুপধাপ শব্দ?

অমু তেমনি গম্ভীর হয়ে বলল,—শব্দ হোক না, আমি ছাদে যাব।

তার মা বললেন,—ওরে না-না। যাসনে অমু! ওই শোন কারা হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওগো কাল বরং ওঝা ডেকে আনো। মনে হচ্ছে, ওরা জিনটিন নয়, অন্য কিছু।

মুরারি সায় দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। ভূতই বটে। কালই হরিপদ ওঝার বাড়ি যাব।

ওদিকে তক্ষুনি অমু ছাদে চলে গেছে টর্চ নিয়ে। ছাদ থেকে তার গলা শোনা গেল। বাবা,—মা। ইউরেকা, এগেন ইউরেকা!

এবার সবাই উঠোনে নামলেন ভয়ে-ভয়ে! কী দস্যি ছেলেরে বাবা! মুরারি বললেন,—কী রে?

—ছুঁচো বাবা!

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ বাবা! আর কিছু না—স্রেফ ছুঁচো ডন টেনে বেড়াচ্ছে। দেখবে এসো।

মুরারি নিশ্বাস ফেলে বললেন,—হুঁ। নেমে আয়।

ছাদে রাজ্যের আবর্জনা জমে আছে। পুরোনো বাড়ি। ছুঁচোর আড্ডা হতেই পারে। রাতবিরেতে একদঙ্গল ছুঁচো ছাদে ডন টানে। গানও গায় নেচে-নেচে। তাই শব্দ হয়। বাড়িটা এবার মেরামত করে কলি ফেরানো দরকার। চামচিকে, ছুঁচো, ইঁদুর, আরশোলা টিকটিকির আড্ডা হয়ে গেছে।

আধি ভৌতিক

জগনমামা বললেন,—তাহলে বাবা ঝন্টু ততক্ষণ তুমি মামিমার সঙ্গে গল্পসল্প করো। আমি ঝটপট বাজারটা সেরে আসি।

বলে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে ডাকলেন,—কই গো। ছাতিটা দাও বরং! এই সাতসকালেই রোদ্দুরটা বড় চড়ে গেছে।

জগনমামার মাথায় এমন প্রকাণ্ড টাক আমি আশা করিনি। এতকাল পরে ওঁকে দেখে খুব হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। চেহারায় কী দারুণ অদলবদল না ঘটে গেছে! রোগা খটমটে চেহারার মানুষ ছিলেন। এখন বিশাল পিপে হয়ে উঠেছেন। মুখে এমন অশান্ত হাসিও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এই মফস্বল শহরে এখন ওঁর উকিল হিসেবে বেজায় নামডাকও হয়েছে এবং তার কারণ সম্ভবত ওঁর চেহারার এই ভোলবদল। আগে ওই শুঁটকো চেহারা আর খিটখিটে মেজাজের জন্যে মক্কেল যেমন জুটত না, তেমনি হাকিমরাও নাকি ওঁকে এজলাসে দেখলে চটে যেতেন। অবিশ্যি, সবই শোনা কথা।

এও শোনা কথা যে জগনমামার স্ত্রী আত্মহত্যাই করেছিলেন। কৌশলে কলেরায় মৃত্যু বলে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। উকিল-মানুষদের তো পেটে-পেটে বুদ্ধি।

বলে রাখা ভালো, জগনমামা কস্মিনকালে আমার মামাকুলের কেউ নন।

ছেলেবেলায় আমার বাবা-মারা যান। পাড়াগাঁয়ে সম্পত্তি রাখার নানা ঝামেলা। মামলা-মোকদ্দমার দায় সামলাতে হতো তাই মাকেই। সেই সুবাদে এই উকিল ভদ্রলোক মায়ের দাদা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমি ভেবে পেলাম না জগনমামার মতো উকিল কেন ধরেছিলেন মা! তখন আরও কত জাঁদরেল উকিল এ শহরে তো ছিল। মামলায় হেরে গেলেও দেখতাম মা ফের এই ভদ্রলোকের কাছে এসে পড়েছেন।

হয়তো এটাই মানুষের অভ্যাস। চেনা-জানা ডাক্তারের হাতে মরতেও রাজি যেমন, তেমনি উকিল-মোক্তারের বেলাও তাই।

এখন মা নেই। আমি বিষয়সম্পত্তির হাল ধরেছি। আমি সেই একই অভ্যাসে এসে জুটেছি জগন-উকিলের দরজায়। মামলায় হার-জিত-ভবিষ্যতের কথা—ছোটবেলা থেকে যাঁকে মামা বলে জানি, তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালে মনের জোর ভীষণ বেড়ে যায়।

তবে তার চেয়ে বড় কথা, জগনমামার এখন নাকি নামডাক হয়েছে। কাজেই আমার মনের জোর অনেক বেশি করেই বেড়েছে। আজ রোববার। আগের দিন ও রাত্তিরটা জগনমামার বাড়ি কুটুম্বিতা এবং শলাপরামর্শ করা যাবে বলেই আসা। আগামীকাল ফার্স্ট আওয়ারে কেস ঠোকা যাবে।

বুঝতে পারছিলাম, জগনমামা আবার বিয়ে করেছেন। তবে অবাক হচ্ছিলাম নতুন মামিমা একবারও ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না দেখে। ভেতরের বারান্দার একটা চেয়ারে আমি বসে আছি। জগনমামা ওপাশের কিচেন থেকে চা এনেছেন। চায়ের খালি কাপ প্লেট-উনি রেখে এসেছেন। মামিমার পাত্তা নেই। জগনমামা ওঁর উদ্দেশে কথাবার্তা বলছেন। কিন্তু কোনও সাড়া আসছে না।

তাই ভাবছিলুম, একটা দাম্পত্য কলহ-গোছের কিছু ঘটে থাকবে। নাকি মামিমা ঠাকুরঘরে পুজোয় বসে আছেন?

জগনমামা ছাতি চাইলেন। তবু মামিমার সাড়া এল না। তখন জগনমামা মুখে একটু বিরক্তি ফুটিয়ে উঠোন থেকে বারান্দায় উঠলেন। তারপর ছাতির খোঁজে ঘরে ঢুকলেন। ঘর থেকে ওঁর চাপা গলা শুনতে পেলাম। একটু পরে বেরিয়ে এলেন ছাতি হাতে। মুখে অশান্ত কথাবার্তা-হাসি। বললেন,—তাহলে গল্পসল্প করো তোমরা। আমি ঝটপট ফিরব।

উনি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ওদিকটায় আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শর্টকাট পায়ে চলার পথ আছে। গিয়ে উঠেছে বাজারের চওড়া রাস্তায়। এদিকটা একেবারে নিরিবিলি নিঃঝুম জায়গা। আশেপাশে বাড়ি বিশেষ নেই। গঙ্গার ধারে শহরের একপ্রান্তে এই বাড়িটার বয়স প্রাচীন। একটু তফাতে হাসপাতাল এলাকা, অন্য দিকটায় গঙ্গার পাড়ে বনজঙ্গলের সঙ্গে সাজানো ঘন বন। ভাঙন আটকাতেই ওই নিরামিষ জঙ্গল, জগনমামার ভাষায় নৈমিষারণ্য।

বাড়ি একেবারে চুপচাপ। গ্রীষ্মের এই সাতসকালে গঙ্গার দিক থেকে একটা হাওয়া এল শনশনিয়ে। হাওয়াটা খিড়কির দরজা ঠেলে উঠোনে ঢুকে বাঁই-বাঁই করে

ঘুরতে থাকল। তারপর পাঁচিলের ধারে জবা ও শিউলির ঝোপে হুলুস্থুল করে পটাপট কিছু হলুদ পাতা ছিঁড়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে গেল। এই সময় আমার মনে পড়ল যেদিকে হাওয়াটা গেল সেদিকটায় শ্মশানঘাট এবং একটু পরে সেই উঁচু বটগাছের মাথায় ঝাঁকুনি লাগল!

কিছু করার না থাকলে আমার উদ্ভট সব অনুভূতি জাগে। হঠাৎ মনে পড়ল ছেলেবেলায় দেখা মামির অর্থাৎ জগনবাবুর প্রথম স্ত্রীর কথা। আত্মহত্যা করলে মানুষ নাকি ভূত হয়। এমন নিরিবিলি বাড়িতে ভূতের পক্ষে হামলা করা ভারি সহজ। পুরোনো মামিমার ভূত নতুন মামিকে জ্বালায় না?

কে জানে কেন, এ বাড়িতে রাতে থাকতে হবে ভাবতেই এবার অস্বস্তি জাগল। ভূতে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু ভূতের ভয় আমার বেজায় রকমের।

একটু কাশলাম। ভেতরের ঘর একেবারে চুপচাপ। সিগারেট টানতে থাকলাম। জগনমামা বলছিলেন, সব সময় খালি তোদের গল্প করি। তোর মায়ের মতো মহীয়সী মেয়ে তো আর হয় না। আর এই কট্টুকুন ছিলি জানিস বাবা ঝন্টু? এই অ্যাট্টুকুন। আর কী ভীতু কী ভীতু!

এত সব যদি শুনে থাকেন ভদ্রমহিলা, তাহলে আমাকে দেখার জন্যে বেরুলেন না কেন কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না।

সিগারেট শেষ করে বাড়ি ঢুকে চমকে উঠলাম। কোথা থেকে একটা নেড়ি কুকুর ঢুকে পড়েছে যে। বারান্দায় গিয়ে ভেতরের ঘরের পর্দার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠলাম,—মামিমা! কুকুর ঢুকছে। কুকুর!

তবু সাড়া নেই দেখে দৌড়ে এলাম। কুকুরটা ঘরে ঢুকে পড়েছিল। লাথি খেয়ে কেঁউ-কেঁউ করে উঠল এবং ডিগবাজি খেতে-খেতে উঠোনে গিয়ে পড়ল। তারপর লেজ গুটিয়ে পালাল।

পর্দা তুলে উঁকি মেরে ডাকলাম, —মামিমা! কিন্তু ঘর ফাঁকা। কেউ নেই। সেকেলে পালঙ্কের ওপর জগনমামার লুঙ্গি পড়ে আছে। ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকালাম। এক গুচ্ছের স্নো-পাউডার ইত্যাদি যথারীতি সাজানো। ওপাশে আলনায় কয়েকটা শাড়ি ও সায়া পর্যন্ত! সেগুলো অত ময়লা কেন ভেবে পেলাম না।

কিন্তু ঘরে একটা মেয়েলি গন্ধ টের পাচ্ছিলুম। আবছা মনে হল, মামিমার বয়স নিশ্চয় জগনমামার তুলনায় ঢের কম। মেয়েলি গন্ধটা কি চুলের? স্নানের পর মেয়েদের চুলের এমন গন্ধ হয়! একটু লজ্জা পেলাম! এ ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। ভদ্রমহিলা ওপাশে কোথাও আছেন। এসে গেলে অপ্রস্তুতের একশেষ হবে।

বেরিয়ে আসার আগে ড্রেসিং টেবিলে রাখা ছবিটার দিকে চোখ পড়ল। পুরুষ ও মহিলার ছবি পাশাপাশি। কিন্তু চিনতে পারলাম না। শুধু দেখলাম, যুবতী মহিলাটি কেমন চোখে তাকিয়ে হাসছেন।

ঠিক এইসময় বাইরে জগনমামার সাড়া পেলাম।...বহু ভাগ্যে দুটো গলদা

পেলাম, বুঝলে? মোট দুটো। থাকগে। এতেই হবে। আর ইয়ে, শোনো—দুর ছাই! ভুলে গেলাম যে!

ঝটপট বেরিয়ে শুনলাম, মামিমার গলা,—এ অসময়ে ওদের বাড়ি না গেলে চলত না? ঝটপট ফিরে এসো তাহলে। অবিশ্যি আজ রোববার। বেলা করেই খাওয়া যাবে।

নতুন মামিমা তাহলে কিচেনে ছিলেন।

ঘুরে জগনমামা একগাল হেসে বললেন,—এই যে ঝন্টু। আলাপ হল মামিমার সঙ্গে? গল্পের রাজা! থুড়ি রাণি! রাণি আর তুমি তো বরাবর ভূতের গল্প শুনতে ভালোবাসতে! এখন অবিশ্যি বড় হয়েছ। তাহলে মন্দ লাগবে না। কী বলো।

বলে চোখ নাচালেন,—রাত্তিরে শুনবেখণ।...

বাইরের ঘরে জগনমামার ওকালতির আপিস। আজ ছুটির দিন বলে বুঝি ওঁর মুহুরিবাবু আসেননি। সেই ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। বাইরে রোদ বেড়েছে। এখনই লু হাওয়া বইতে শুরু করেছে। চারপাশে শুধু গাছপালার শনশন আর গঙ্গায় নাইতে যাওয়ার সরু গলিপথে আবর্জনার ঝড় বইছে শোঁশোঁ করে। ভেতর থেকে জগনমামার কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। নতুন মামিমার সঙ্গে অনর্গল কথা বলছেন। ভদ্রমহিলাকে ভারি অদ্ভুত বলব। সম্ভবত শুনেই যাচ্ছেন মুখ বুজে।

আর কৌতূহল সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হল। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম। জগনমামা কিচেনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে টেবিলে তরকারি কুটছেন এবং কথা বলছেন। কিচেনের দরজা সামনাসামনি। ভেতরে কেরোসিন কুকার জ্বলছে। রান্না হচ্ছে। কিন্তু নতুন মামিকে দেখা যাচ্ছে না।

মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলাম। আমার সাড়া পেয়ে জগনমামা হেসে বললেন,—এসো বাবাজি! তোমার মামিমাকে বলছিলাম, ঝন্টু তো পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বিশুদ্ধ জলবায়ু আর নির্ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ হয়েছে। এ ভূতের জায়গায় অখাদ্য কি ওর রুচবে?

বলেই ভেতরের সেই ঘরের দিকে তাকালেন।...তোমার অত কেন লজ্জা বলো তো? ঝন্টু বলতে গেলে আমার আপন ভাগনে। এসো। কই? বেশ, এসো না। ফিরে গিয়ে তোমারই বদনাম করবে! অচেনা তো নয়। সেই ছোট্ট বয়সে কতবার দেখেছ। বড় হয়েছে বলে লজ্জা! আশ্চর্য!

আপন মনে ফের গজ-গজ করতে থাকলেন।...তোমার এই একরোখামিই যত সর্বনাশের গোড়া।

আমি হকচকিয়ে গেছি ততক্ষণে। ছোট্ট বয়সে কতবার দেখেছে—এর মানে কী? তাহলে কি নতুন মামিমা আমার চেনাজানা কোনও মহিলা? জগনমামার হাবভাব দেখে কোনও কথা জিগ্যেস করতে সাহস হল না! বুঝলাম, আমার খুব পরিচিত মহিলাকেই বিয়ে করেছেন জগনমামা। এত পরিচিত যে মুখোমুখি হলে নিশ্চয়ই দুজনেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। তাই উনি দেখা দিচ্ছেন না। খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। খুঁজেই পেলাম না, তেমন কে হতে পারেন নতুন মামিমা।

দুপুরে খাওয়ার সময়ও উনি এলেন না। জগনমামার মুখ গম্ভীর। সেটা খুবই স্বাভাবিক। টেবিলে সবই সাজানো ছিল! দুজনে চুপচাপ খেলাম। খাওয়া হলে জগনমামা বললেন,—ওপরে গিয়ে ঘুমিয়ে নাও। সাড়ে পাঁচটার আগে উঠো না। গরম কমলে বরং ঘুরে এসো গঙ্গার ধারে।

লম্বা হয়ে গেল ঘুমটা। উঠে দেখি টেবিলে চা ঢাকা আছে। নতুন মামিমা এসে দিয়ে গেছেন কি? বোধহয় জগনমামাই। বাড়ির ভেতর চুপচাপ। চা জুড়িয়ে গিয়েছিল। কল্পনা করলাম, নতুন মামিমা চা রেখে গেছেন, এবং আশ্চর্য, সেই মিষ্টি মেয়েলি গন্ধটা অবিকল টের পেলাম।

দরজা ভেজিয়ে গলিরাস্তায় গঙ্গার ধারে ঘুরতে গেলাম। ঘণ্টা দুই পরে যখন ফিরে এলাম, তখন এদিকটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা। লোডশেডিং। দরজা বন্ধ থাকবে ভেবেছিলাম। কিন্তু কড়া নেড়ে সাড়া না পেয়ে ঠেলতেই দেখি, তেমনি খোলা। ভেতরে ঢুকে ডাকলাম,—জগনমামা।

সাড়া এল,—আয় ঝন্টু। এখানে আয়। উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন জগনমামা কালো মূর্তিটি হয়ে। আলো নেই বাড়িতে। বললাম,—আলো জ্বালেননি যে!

জগনমামা বললেন,—অন্ধকার ভালো লাগে। আয় এখানে আয়। কী গো! এখন তো ঝন্টু তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না, এবার কথা বলবে না কী? অ ঝন্টু, মামিমার সঙ্গে কথা বল।

ডাকলাম,—মামিমা। তারপর টের পেলাম অন্ধকার উঠোনে আবছা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি শুধু আমি আর জগনমামা। হঠাৎ কেমন গা ছমছম করে উঠল। বললাম,—জগনমামা, মামিমা কই?

এই তো! দেখতে পাচ্ছিস না? —জগনমামা অস্বাভাবিক গলায় বললেন, কই গো, ঝন্টুকে ছুঁয়ে দাও তো! আহা দাও না বাবা! বলতে গেলে আপন ভাগ্নে— ছোটবেলায় কত আদর করেছ!

অদ্ভুত হাসি হেসে জগনমামা আমার একটা হাত টেনে অন্য হাতে অন্ধকারে অদৃশ্য মামিমার হাত টানার ভঙ্গি করতেই আমার মাথা ঘুরে গেল এবং আচমকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এক লাফে বারান্দা থেকে বাইরের ঘরে—তারপর ব্যাগট্যাগের কথা ভুলে দড়াম করে দরজা খুলে গলিতে গিয়ে পড়লাম। জগনমামা যে একজন বিদেহিনী স্ত্রীলোক নিয়ে ঘর করছেন, এতে আর সন্দেহ ছিল না।

মাস দুয়েক পরে একদিন শহরে গেছি। ব্যাগটা নিয়ে আসতে তো বটেই। জগনমামার অবস্থা দেখতেও তীব্র কৌতূহল হল। নিরিবিলি জায়গায় পুরোনো জরাজীর্ণ বাড়িটা দেখে একটু গা ছমছম করছিল। কিন্তু দিন-দুপুরে আশা করি আর ভূতের ভয়টা পাব না।

দরজায় কড়া নাড়ার পর খুলল। খুলতেই আমার বুকের ভেতর রক্ত চড়াৎ করে উঠল। হাসিখুশি মিষ্টি চেহারার এক সুন্দরী মহিলা দরজার পাল্লায় হাত রেখে

দাঁড়িয়েছেন। যেই হাসিখুশি মুখে বলছেন,—কাকে চাই, অমনি আমি পিছিয়ে এসেছি। আর লাফ দিয়েই—

ইনিই যে সেই নিরাকার মামিমা, যাঁর সঙ্গে জগনমামা অনর্গল কথা বলতেন এবং যিনি আত্মহত্যা করে মারা যান, তিনি ছাড়া আর কে হতে পারেন? ভুল হয়েছে বলে আমি হনহন করে চলে এলাম, পা টলছিল। একবারও পিছু ফেরার সাহস হল না। নিরাকার আকার ধরেই সমস্যা।

কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়া রহস্যময়। তবে এটুকু মনে পড়ছে, পেছনে জগনমামার যেন চিৎকার শুনছিলাম—ঝন্টু ও ঝন্টু! চলে যাচ্ছিস কেন? তোর নতুন মামিমার সঙ্গে আলাপ করে যা! কানের ভুল হতেও তো পারে। 'নতুন' শব্দটা কি সত্যি শুনেছিলাম...?

যার যা খাদ্য

শহরের বাইরে নদীর ধারে এই বাড়িটা অনেকদিন খালি পড়েই ছিল। মুরারিবাবু চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর বাড়িটা কিনেছেন। নিরিবিলি নিঃঝুম জায়গা। গাছপালা, ঝোপজঙ্গল আনাচে-কানাচে প্রচুর। মুরারিবাবুর হই-চই পছন্দ হয় না। তাই বাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছিল।

কিন্তু বাস করতে গিয়েই ঝামেলায় পড়লেন। রাত দুপুরে উঠোনে টুপ-টুপ করে ঢিল পড়ে। ছাদে কারা হেঁটে বেড়ায় ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ। বেরিয়ে গিয়ে টর্চের আলোয় খোঁজাখুঁজি করেন। কাকেও দেখতে পান না। প্রথমে ভেবেছিলেন, দুষ্ট লোকের কাজ। তাঁকে তাড়ানোর মতলব করছে। তাই থানায় গিয়েছিলেন। দুজন পালোয়ান চেহারার সেপাই পাঠানো হয়েছিল রাতে বাড়ি পাহারা দিতে। কিন্তু তাতেও ঢিলপড়া বা ছাদে হাঁটাচলার শব্দ বন্ধ হয়নি। বরং ঘুম ভেঙে শোনেন, সেপাই দুজনে পরস্পর তুমুল ঝগড়া করেছে। এ ওকে বন্দুক তুলে শাসাচ্ছে। ব্যাপারটা কী?

বেরিয়ে গিয়ে মুরারিবাবু দুজনকে শান্ত করেছিলেন। কিন্তু কারুর রাগ পড়ে না। একজন আর একজনের দিকে আঙুল তুলে বলে,—ও আমার গোঁফ টেনেছে। আরেকজন বলে,—মিছে কথা! ও আমার কানের লতিতে কামড়ে দিয়েছে।

সেই সময় আচমকা একটা বিদঘুটে ব্যাপার ঘটে গেল। তিনজনের মাথায় তিনটে অদৃশ্য হাতের চাঁটি পড়ল। চাঁটিগুলো একেবারে বরফের মতো ঠান্ডা।

এমন চাঁটি খাওয়ার পর কি এ বাড়ির ত্রিসীমানায় থাকার হিম্মত থাকে কারুর? সেপাই দুজন সেই রাতেই রাম-রাম বলে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে পালিয়ে গিয়েছিল। মুরারিবাবুও চটপট ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটেছিলেন। টের পেয়েছিলেন ব্যাপারটা নিছক ভৌতিক।

কিন্তু এমন পছন্দসই একটা বাড়ি কিনে নেহাত ভূতের ভয়ে চলে যাওয়া কাজের কথা না। বোঝা যাচ্ছে বাড়িটা পোড়ো হয়েছিল বলে ভূতেরা এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন দখল ছাড়তে চাইছে না।

মুরারিবাবু তাই ঠিক করলেন ভূতগুলোকে তাড়াতে হবে, এ কাজ ওঝা ছাড়া আর কারুর নয়। এখানে ওখানে খোঁজাখুঁজির পর এক ওঝার নাম-ঠিকানা পাওয়া গেল।

তার নাম হরিপদ। থাকে রামনগরে। ঘুঘুডাঙা থেকে বাসে ঘণ্টা তিনেকের পথ। হরিপদর খুব নামডাক আছে নাকি। তার মন্তরটন্তরের চোটে ওই এলাকা থেকে সব ভূত পালিয়ে গেছে। বাড়ি খালি থাকলেও সেখানে বড়জোর বাদুড়, চামচিকে বা আরশোলা, টিকটিকি গিয়ে জোটে। ভূতের ঢোকার সাধ্য নেই। আহা, ঘুঘুডাঙার হরিপদ এসে থাকলে কী শান্তিতে না থাকা যেত।

অনেক ফিকির মাথায় নিয়েই মুরারিবাবু রামনগর চললেন। হরিপদকে মাইনে দিয়ে বরং কাছে রাখবেন। টুকিটাকি কাজকর্ম করবে আর থাকবে তাঁর কাছে। বরাবরের জন্য ভূতের হাতে থেকে নিশ্চিন্তে থাকা যাবে।

বাসেই খবর পেলেন, গতমাসে এই এলাকায় খুব বন্যা হয়েছিল। এখন জল নেমে গেছে। তাই ফের বাস চলাচল করছে। একটু ভাবনাও হল মুরারিবাবুর। হরিপদ বন্যায় বাড়ি ছেড়ে চলে যায়নি তো কোথাও!

রামনগরে বাস থেকে নেমে মুরারি দেখলেন, নামে নগর হলেও একেবারে অজ-পাড়াগাঁ। একফালি কাঁচা রাস্তা গ্রামে ঢুকেছে। সে রাস্তায় বিস্তর জলকাদা। একটু ঘাবড়ে গেলেন। ঘন গাছপালার মধ্যে একটা করে মাটির বাড়ি। বাড়িগুলো বন্যায় প্রায় ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। কোনওটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কোথাও লোক নেই। খাঁ-খাঁ করছে। আশ্চর্য, একটা পাখিও ডাকে না।

জুতো হাতে নিয়ে হাঁটু অবধি ধুতি গুটিয়ে মুরারিবাবু জলকাদা ভেঙে গাঁয়ে ঢুকলেন। হরিপদর বাড়ি জেনে নেওয়ার মতো কাকেও দেখতে পেলেন না। বন্যায় কি সবাই গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, এখনও ফেরেনি কেউ? কিন্তু সামনেই ভাঙা বাড়িটার কাছে গিয়ে চোখে পড়ল একটা লোক দাওয়ায় বসে হুঁকো খাচ্ছে। মুরারিবাবু খুশি হলেন। যাকগে, লোকেরা ফিরছে তাহলে।

মুরারিবাবুকে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়াল। কালো কুচকুচে গায়ের রং। চুল, গোঁফ, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি পেকে সাদা ভূত। সেলাম করে বলল,—মশাই কি রিলিফের বাবু?

মুরারিবাবু বললেন,—না। আমি এসেছি হরিপদ-ওঝার কাছে। ওর বাড়ি কোনটা বলতে পারো ভাই?

এই রাস্তায় গিয়ে বারোয়ারি বটতলা দেখবেন তার পেছনে। —বলে লোকটা একটা কাণ্ড করল। এক হাতে হুঁকো অন্য হাতে পায়ের কাছ থেকে একদলা শুকনো গোবর তুলে মুখে পুরল। বলল,—চলে যান। হোরেকে পেয়ে যাবেন।

মুরারিবাবু দুঃখিত হয়ে ভাবলেন,—আহা! বন্যার ফলে বেচারিদের বুঝি খিদের জ্বালায় কত অখাদ্য-কুখাদ্য না খেতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে শুকনো গোবর? মুরারিবাবু বললেন,—দেখো বাপু, একটা কথা বলি। আর যাই খাও, গোবর-টোবর খেও না। ওকি কেউ খায়? ছ্যা-ছ্যা!

লোকটা একগাল হেসে ফের আর এক খাবলা কুড়িয়ে চিবুতে-চিবুতে বলল,—যার যা খাদ্য বাবুমশাই! আপনার এত কথায় কাজ কী? হোরের কাছে যাচ্ছেন, তাই যান।

মুরারিবাবু বিরক্ত হয়ে পা বাড়ালেন। যার যা খাদ্য মানে কী? লোকটা পাগল নয় তো?

বারোয়ারি বটতলায় গিয়ে দেখেন, একটা রোগা-সিড়িঙ্গে চেহারার লোক বসে আছে। সেও জিগ্যেস করল,—মশাই কি রিলিফের লোক? মুরারিবাবু মাথা দোলালেন।

বোঝা যাচ্ছে, এ গাঁয়ে রিলিফ এখনও পৌঁছায়নি। ফিরে গিয়ে সরকারি অফিসে খবর দেওয়া দরকার! মুরারিবাবু বললেন,—হরিপদ ওঝার বাড়ি কোনটা ভাই?

ওই তো! যান, হোরে বাড়ি আছে। —বলে লোকটা কোঁচড় থেকে কী একটা বের করে কামড় দিল। মুড়মুড় করে চিবুতে থাকল।

মুরারিবাবু আড়চোখে দেখলেন, লোকটা সাদা একটা লম্বাটে জিনিস খাচ্ছে। শসা কি? মনে হচ্ছে যেন হাড়। কী বিদঘুটে কাণ্ড রে বাবা! আগের লোকটা শুকনো গোবর খাচ্ছিল। এ খাচ্ছে হাড়। সন্দিগ্ধভাবে পা বাড়ালেন। তারপর ভাবলেন, মানুষ তো আসলে সবই খায়। কী না খায়! সাপ ব্যাঙ কেঁচো আরশোলা—সবই খাদ্য। এমনকী চীনারা নাকি পাখির ঝোল রান্না করে খায়। আর এ তো বন্যার বিপদের সময়। খিদের চোটে যা পাবে, খাবে। এই তো সেদিন কাগজে পড়লেন, কোথায় পাহাড়ের ওপর প্লেন ভেঙে পড়েছিল। দৈবাৎ একজন যাত্রী বেঁচে যায়। সে খিদের চোটে তার শ্বশুরের আধপোড়া মাংস খেয়েছিল। শ্বশুর-জামাই একই প্লেনে যাচ্ছিল কোথায়। কাজেই বিপদের দিনে মানুষ প্রাণ বাঁচাতে সবই খায়।

হরিপদর দেখা পাওয়া গেল। দাওয়ায় বসে সেও খাচ্ছে। তবে এনামেলের থালায়। তার বউ মুরারিবাবুকে দেখে ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকল। হরিপদ বলল,—আসুন বাবুমশাই বসুন। বাড়ির কাউকে ভূতে ধরেছে তো? ঠিক আছে। যাব। খাওয়াটা সেরে নিই।

মুরারিবাবু তার পাতের দিকে তাকিয়ে বললেন,—ও সব কী খাচ্ছ হরিপদ?

হরিপদ লাজুক হেসে বলল,—আজ্ঞে, টিকটিকির লেজ, আরশোলার ঠ্যাং আর বাদুড়ের নখের ঘণ্ট। কাঁকড়ার খোলের ঝোল। আর সাপের খোলসের সঙ্গে ব্যাঙের চচ্চড়ি।

মুরারিবাবু অবাক। বললেন,—তোমাদের গাঁয়ের লোকেরা তো দেখছি খুব কষ্টে আছে।

হরিপদ বলল,—কেন, কেন?

কেউ শুকনো গোবর খাচ্ছে! কেউ হাড় খাচ্ছে! আবার তুমি দেখছি...

হরিপদ কথা কেড়ে নেন,—আজ্ঞে যার যা খাদ্য।

যার যা খাদ্য! ফের সেই কথা। মুরারিবাবুর খটকা লাগল। ঠিক সেই সময় রাস্তার দিকে অনেক লোকের কথাবার্তা শোনা গেল। অমনি হরিপদ লাফিয়ে উঠে চাপা গলায় বলল,—এসে গেছে। এসে গেছে। পালাও-পালাও। তারপর হরিপদ আর তার বউ এক দৌড়ে পেছনের জঙ্গলে গিয়ে লুকোল।

মুরারিবাবু হতভম্ব। রাস্তায় জলকাদা ভেঙে অনেক লোক আসছে। তারা মুরারিবাবুকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। মুরারিবাবুর খটকা আরও বেড়ে গেল।

একজন এগিয়ে এসে বলল,—বাবুমশাই, আপনি কে! এখানে কী করছেন?

মুরারিবাবু বলেন,—হরিপদর কাছে এসেছিলাম। তোমরা বুঝি গাঁয়ের লোক?

আপনি হরিপদর কাছে এসেছিলেন? সে তো বানের জলে ডুবে মরেছে। —লোকটা গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, আরও কতজন মারা গেছে বাবুমশাই। রামনগরে খুব বান হয়েছিল। আমরা জল নেমে গেছে কি না দেখতে এসেছি এতদিনে। আমরা সেই পলাশপুরের হাইস্কুলে আশ্রয় নিয়েছিলাম কিনা!

মুরারিবাবুর মাথা ঘুরে উঠল। হ্যাঁ, সব বোঝা যাচ্ছে এবার। যার যা খাদ্য—এ কথার মানেও বোঝা গেল। আসলে হয়েছিল কী, বন্যায় গাঁয়ের লোকেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতেই ভূতেরা এসে জুটেছিল। বাড়ি খালি থাকায় এই ঝামেলা। এখন লোকজন এসে পড়েছে। কাজেই ভূতেরা পালিয়ে যাচ্ছে।

সাহস করে ঘুঘুডাঙার বাড়িতে থাকতে পারলে সেই ভূতেরাও পালাবে একদিন। মুরারিবাবু রামনগর থেকে শেষপর্যন্ত আশা নিয়েই ফিরলেন। অভিজ্ঞতা হল। ভূতের খাদ্য কী, তাও জানতে পারলেন। অতএব বাড়ির ত্রিসীমানা থেকে শুকনো গোবর, হাড়গোড়, সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি, আরশোলা ইত্যাদি হটাতে পারলে খাদ্যের অভাবে ভূতেরাও অন্যখানে চলে যাবে। ওঝার দরকারটা কী?

কালো ঘোড়া

ব্যাপারটা নিছক স্বপ্ন, নাকি সত্যি-সত্যি ঘটেছিল, বলা কঠিন। শুধু এটুকুই বলতে পারি, এ ঘটনা আমি মোটেও বানিয়ে বলছি না। যা-যা ঘটেছিল, অবিকল তাই-তাই বর্ণনা করছি!

গত শরৎকালের কথা। তখন আমি মার্কিন মুলুকের কান্ট্রি এলাকা অর্থাৎ পাড়াগাঁয়ে এক ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে আছি। ভদ্রলোকের নাম ডঃ হেরম্যান জুট্রাম!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানিতে হিটলারের চেলারা ইহুদিদের ওপর অত্যাচার শুরু করলে ডঃ জুট্রাম আমেরিকায় পালিয়ে আসেন। কারণ ইনি ইহুদি।

এলাকার নাম মুনভিলে। মানে করলে হয়তো দাঁড়ায় চন্দ্রপুরী। আসলে নিঃঝুম কয়েকটা বনে-ঢাকা ছোট্ট টিলার ওপর একটা করে বাড়ি। হাইওয়ে থেকে কষ্টেসৃষ্টে নজরে পড়ে। চারিদিকে ছড়ানো ঢেউ খেলানো মাঠ। কোথাও ধূসর হয়ে ওঠা ভূট্টাক্ষেত, কোথাও গোরু, শুয়োর বা ঘোড়ার বাথান—চারিদিক কাঠের বেড়ায় ঘেরা।

—মুনভিলে কেন?

ডঃ জুট্রাম আমার প্রশ্ন শুনে বলেছিলেন,—ওই যে নিচের দিকে হ্রদটা দেখছ, ওটার গড়ন লক্ষ করো।

বাড়ির পূর্বে টিলাটা ফাঁকা এবং ঢালু হয়ে নেমে গেছে। তারপর হ্রদ। পুবের ঘাসে লন ও ফুলবাগিচায় দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। দেখলাম, হ্রদটা অর্ধবৃত্তাকার, তার মানে অবিকল চন্দ্রকলার মতো। বলেছিলুম,—হ্রদটার নাম হওয়া উচিত মুনলেক।

ঠিকই ধরেছ। —ডঃ জুট্রাম হেসে উঠেছিলেন। ওটার নাম মুনলেক। তবে তার চেয়েও সুখের কথা, মুনলেকের ধারে জ্যোৎস্নারাতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করলে তুমি রূপকথার রাজপুত্তুরটি হয়ে উঠবে।

হাসতে-হাসতে বলেছিলাম,—কিন্তু রাজপুত্তুরের যে একটা ঘোড়াও চাই। যেমন-তেমন ঘোড়া চলবে না, চাই একটি পক্ষীরাজ। সেই যে, যাদের ডানা আছে...

বলতে-বলতে একটু অবাক হয়ে থেমেছিলাম। ডঃ জুট্রামের লালচে মুখে হঠাৎ কেন অমন গাঢ় ছায়া। যেন হঠাৎ কী অসুখ বাধিয়ে বসেছেন। ঠোঁটদুটো কাঁপছে। চোখ নিষ্পলক।

ব্যস্ত হয়ে বলেছিলাম,—আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ডঃ জুট্রাম?

উনি তখনই ঘুম থেকে ওঠার মতো কাঁধদুটো নাড়া দিয়ে আগের হাসিটা ফিরিয়ে এনেছিলেন।...হ্যাঁ, তুমি ঘোড়ার কথা বলছিলে তাই না?

—হ্যাঁ, ডঃ জুট্রাম।

—জানো? মুনলেকের অদ্ভুত-অদ্ভুত সব গল্প আছে। তার মধ্যে ওই ঘোড়ার গল্পটা সাংঘাতিক! মাঝে-মাঝে, বিশেষ করে জ্যোৎস্নার রাতে নাকি হ্রদের জল থেকে একটা কালো ঘোড়া উঠে আসে। ঘোড়াটা নাকি প্রাচীন যুগের এক রেড ইন্ডিয়ান সর্দারের। নিছক ভুতুড়ে ব্যাপার।

বলে ডঃ জুট্রাম হাতঘড়িটা দেখে নিলেন এবং ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—কী কাণ্ড। আমাকে যে এক্ষুনি শহরে দৌড়ুতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সেমিনার আছে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

জুট্রাম পা বাড়িয়ে ফের বলেছিলেন,—যাক গে, তোমার গিয়ে কাজ নেই। পণ্ডিতি কচকচি তোমার ভালো লাগবে না। তার চেয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করো। আয়ু বাড়বে।

হাসতে-হাসতে চলে গিয়েছিলেন ডঃ জুট্রাম। একটু পরে বাড়ির দক্ষিণে বনের গড়ানে রাস্তায় ওঁর সাদা গাড়িটা নেমে যেতে দেখেছিলাম। তখন বেলা সাড়ে তিনটে। টিলার মাথায় কাঠের দোতলা বাড়িটা আরও নিঃঝুম হয়ে গেল। গাছপালা থেকে ঝিঁঝিঁপোকার বিকট হাঁকডাক শোনা যাচ্ছিল। মার্কিন ঝিঁঝিঁপোকার ডাক বড্ড বিরক্তিকর। মনে-মনে খাপ্পা হয়ে বললাম, রোসো বাছাধনরা! পাতা ঝরার দিন শুরু হলেই তোমাদের বীরত্ব কোথায় থাকে, দেখা যাবে।

ডঃ জুট্রামের প্রকাণ্ড কুকুরটার নাম রেক্স। একে কুকুরে আমার প্রচণ্ড ভয়, তাতে রেক্স আমাকে যতবার দেখে, মাতৃভাষায় গালাগালি করে। বাঁধা না থাকলে আমাকে নিশ্চয় সোজা ভারতে ফেরত পাঠিয়ে ছাড়ত। কাঁচুমাচু মুখে ডঃ জুট্রাম বলেছিলেন,—রেক্সের এই এক দোষ! বিদেশিদের দেখতে পারে না।

হাই তুলে ভয়ে-ভয়ে বারান্দায় উঠলাম। কিন্তু রেক্সের সাড়া পেলাম না। তখন দরজা খুলে বসার ঘরের ভেতর উঁকি দিলাম। সিঁড়ির পাশে কুকুরটা থাকে। সেখানে সে নেই। তাহলে ডঃ জুট্রামের লেকচার শুনতে গেছে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

দোতলায় আমার ঘর। বেলা দুটোয় লাঞ্চ খেয়েছি। বাঙালি স্বভাবে ভাতঘুম নামে আরাদায়ক একটা ব্যাপার আছে। সায়েবদের সংসর্গে সেটা বরবাদ হতে বসেছে। আজ এমন সুযোগ ছাড়া যায় না। অতএব সটান বিছানায় চিত হলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে বন্ধুবর ভাতঘুম এসে কোলাকুলি করলেন। তখন আঃ কী আনন্দ! কতদিন পরে দেখা।

কতক্ষণ পরে কার ডাকাডাকিতে চোখ খুলতে হল। তাকিয়ে দেখি, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আট-নয় বছরের একটা মেয়ে। গোলগাল পুতুল-গড়ন। একমাথা ঝাঁকড়ামাকড়া সোনালি চুল। পরনে উজ্জ্বল নীল ফ্রক। গলায় সাদা স্কার্ফ জড়ানো। মেয়েটা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

তক্ষুনি মনে পড়ে গেল, আরে তাই তো! এরই ছবি বাড়ির ওপরে-নিচে সব ঘরে দেখেছি। ওই তো এ-ঘরের দেওয়ালেও রয়েছে।

ডঃ জুট্রামকে জিগ্যেস করব ভেবেছিলাম। ভুলে গেছি।

উঠে বসে মিষ্টি হেসে বললাম,—হ্যালো।

আমার মার্কিনি সম্ভাষণের জবাবে ছোট্ট করে বলল,—হাই। কিন্তু মুখের অবাক ভাবটা ঘুচল না। ঠোঁট কামড়ে ঘরের ভেতরটা দেখে নিয়ে একটু হাসল। হেসে বলল,—তুমি নিশ্চয় বাবার অতিথি। তুমি কি বিদেশি?

সায় দিয়ে বললাম,—প্রথমে তোমার নাম বলো।

—জিনা।

তুমি নিশ্চয় শহরে থেকে পড়াশুনা করো, তাই না জিনা? —ওর সঙ্গে খাতির জমাতে বসলাম। —তা এলে কার সঙ্গে? মায়ের সঙ্গে বুঝি? চলো, তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করি।

ডঃ জুট্রাম তাঁর স্ত্রী কিংবা মেয়ের কথা কিছু বলেননি। আমিও কিছু জানতে চাইনি। কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপার জানতে চাওয়া ভদ্রতাসম্মত নয়। উঠে দাঁড়িয়েছি, জিনা বলল,—তুমি বললে না কোন দেশের লোক?

—আমি ইন্ডিয়ান।

শুনেই জিনা যেন চমকে উঠল। —তুমি ইন্ডিয়ান কিন্তু!...

—কিন্তু কী বলো তো জিনা?

তোমার মাথায় পালকের টুপি নেই। গলায় রঙিন পাথরের মালা নেই। —জিনা বলতে থাকল, তোমার বর্শা কী হল, তোমার চুল কেটে ফেলেছ কেন? তুমি এমন বেঁটে মানুষ কেন?

ওকে থামিয়ে হাসতে-হাসতে বললাম,—জিনা, জিনা! আমাকে বলতে দাও। ইন্ডিয়ান মানে আমি ইন্ডিয়া—ভারতের লোক। তুমি আমাকে রেড ইন্ডিয়ান ভেবেছ দেখছি। ভারতের নাম শোনোনি? পুবের দেশ।

জিনা কেমন যেন নিরাশ গলায় বলল,—ও! তুমি ওরিয়েন্টাল।

—ঠিক বলেছ। এবার চলো তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করি।

জিনা সে কথায় কান না দিয়ে বলল,—তুমি আমার সঙ্গে বাস্কেটবল খেলবে?

—খেলব বইকী।

এসো। —বলে সে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। তার পেছনে-পেছনে নেমে নিচের ঘরে কাকেও দেখতে পেলাম না। ঘরের ভেতর ততক্ষণে হাল্কা আঁধার জমেছে। পুবের বারান্দায় বেরিয়ে দেখি বেলা পড়ে গেছে, নীলচে কুয়াশা জড়িয়ে রয়েছে, গাছপালার মাথায় আকাশে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁসের ঝাঁক। নিচের দিকে একটু দূরে মুনলেকের জলে তখনও লালচে ছটা ছড়িয়ে আছে।

—হেই! এখানে চলে এসো।

ঘুরে দেখি লনের কোনায় বাস্কেটবল নিয়ে জিনা দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে খেলায় মেতে গেলাম। মেয়েটি বড় চঞ্চল প্রকৃতির। আমার আনাড়িপনায় খিলখিল করে হেসে উঠল। আমাকে গোহারা করে হারিয়ে ছাড়ল। আবছা আঁধার হয়ে এলে বললাম,—এই যথেষ্ট। সকালে আবার হবে। তখন তোমায় হারিয়ে দেব।

জিনা লেকের দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন যেন আনমনা।

বললাম,—জিনা-জিনা! অবিকল তোমার মতো আমার একটি মেয়ে আছে। তার নাম কী জানো? নিনা। তোমাকে একটা জিনিস দেখাব। ভারি মজার। এসো না।

সে গেট খুলে ঢালু সবুজ ঘাস ঢাকা জমি দিয়ে দৌড়তে শুরু করল। চেঁচিয়ে বললাম,—জিনা আস্তে, আস্তে। দৌড়িও না, আছাড় খাবে।

ততক্ষণে সে লেকের ধারে বালির চওড়া বিচে পৌঁছে গেছে। আমার যেতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। পৌঁছে টের পেলাম কনকনে ঠান্ডায় রক্ত জমতে শুরু

করেছে। মেয়েটা কিন্তু দিব্যি ছোটাছুটি করছে বালিতে। হঠাৎ চোখ গেল হ্রদের ওপারে টিলার মাথায়। বাঁকা এক টুকরো চাঁদ উঠেছে। তখুনি জুট্রামের গল্পটা মনে পড়ল। কেমন অস্বস্তি জাগল। বললাম,—জিনা! এবার ফেরা যাক।

জিনা জবাব দিল না। জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সেই সময় হু-হু করে একটা বাতাস এল। ঠান্ডাটা বেড়ে গেল। ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলাম। কী শীত, কী শীত! দস্যি মেয়েটার পাল্লায় পড়ে শেষ অবধি না নিমোনিয়া বাধাই।

হ্রদের জলটা কাঁপছে। আবছা জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে সারা হ্রদ। তারপর একসঙ্গে অসংখ্য বুনো হাঁস প্যাঁক-প্যাঁক করে ডেকে উঠল। তারপর যা দেখলাম সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। শীতের কথা ভুলে গেলাম। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। স্বপ্ন দেখছি না তো?

যেন জলের ওপর দিয়েই হেঁটে এল একটা কালো ঘোড়া। হ্যাঁ, জলজ্যান্ত একটা কালো ঘোড়া।

ঘোড়াটা বিচে আসতেই জিনা কী দুর্বোধ্য শব্দে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর দেখি, কালো কালো ঘোড়াটার সঙ্গে সে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। কখনও আমার সামনে দিয়ে, কখনও পিছন দিয়ে দুজনে ছোটাছুটি করতে থাকল। ঘোড়াটা আমার ওপর এসে পড়বে ভেবে আমি আতঙ্কে কাঠ। কিন্তু গলায় কী আটকে গেছে। জিনাকে বারণ করার সাধ্য নেই।

একটু পরে দেখলাম, জিনা কালো ঘোড়াটার ওপর চেপে বসেছে। ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় সারা বিচ জুড়ে খালি ঘোড়ার পায়ে চাপা শব্দ।

তারপর পেছন থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে শুনলাম। সেই সঙ্গে কুকুরের গর্জনও শুনতে পেলাম। টর্চের আলো ছড়িয়ে পড়ল আমার গায়ের ওপর। সেই আলোর ছটায় আবছা দেখলাম কালো ঘোড়াটা জিনাকে নিয়ে হ্রদের জলে নেমে যাচ্ছে। এতক্ষণে গলা দিয়ে স্বর বেরুল। চেঁচিয়ে উঠলাম—জিনা-জিনা-জিনা।

পেছনে ডঃ জুট্রাম বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল,—কাম ব্যাক। কাম ব্যাক, ইউ ফুল।

তারপর আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। রেক্স জলের ধারে দাঁড়িয়ে গরগর করছে।

ঘণ্টাখানেক পরে ফায়ারপ্লেসের সামনে দুজনে চুপচাপ বসে আছি। এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডঃ জুট্রাম বললেন,—তুমি, জিনা-জিনা বলে ডাকছিলে। তুমি কি ওকে সত্যিই দেখেছিলে? পরনে নীল ফ্রক, গলায় সাদা স্কার্ফ ছিল। তাই না?

—হ্যাঁ, আর সেই কালো ঘোড়াটাও।

কথা কেড়ে ডঃ জুট্রাম বললেন,—দশ বছর আগে জিনা মুনলেকে ডুবে মরেছে। তার একবছর পরে ওর মা রোগে ভুগে মারা যায়। আমি মুনভিলেই মরতে চাই। তাই এখানে একা পড়ে আছি। বলতে পারো ওয়েটিং ফর দি ব্ল্যাক হর্স।

মাছ ধরার আপদ-বিপদ

কথাটা উঠেছিল খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন নিয়ে। সাঁতরাগাছিতে রেল-লাইনের ধারে একটা পুকুর আছে। খুব মাছ আছে সেখানে। পুকুরের মালিক সরকারি রেল-দপ্তরের লোক। ছিপ ফেলে মাছ ধরার এমন সুযোগ নাকি আর কোথাও মিলবে না। অতএব রেলের অফিসে দশটা টাকা জমা দিয়ে সেই পুকুরে ছিপ হাতে বসে পড়া যায়।

ভাদ্র মাসের শেষ। কদিন বৃষ্টির পর আকাশ অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। শরতের কড়া রোদে ঘর-বাড়ি গাছপালা দারুণ ঝলমল করছে। পুজোর ছুটি আসতে তখনও দেরি। কিন্তু এমন হাসিখুশি দিন দেখে মনটা আগাম ছুটি নিতে চাইছে।

সেই সময় সুবিখ্যাত নান্টুমামা এসে হাজির হলেন।

মামার মাথায় টাক, মুখে ইয়াবড় গোঁফ, আর পেটে ভুঁড়ি আছে। পাছে ভুঁড়ি ওঁকে ছেড়ে পালায়, তাই চওড়া শক্ত বেল্ট টাইট করে পরে থাকেন। এসেই বললেন, —কী রে? তোরা সব খবরের কাগজ ঘিরে বসে আছিস কেন? ভোটে দাঁড়াবি নাকি? বিবৃতি দিয়েছিস? দেখি কী বলেছিস! রেশনে চালের কোটা বাড়াবার কথা বলেছিস তো?

উনি পকেট থেকে চশমা বের করে ঝুঁকে পড়লেন। তখন আমি বললুম,—না মামা, মাছ!

মাছ? আর কিছু নয়, স্রেফ মাছ? —বলে মামা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। আবার বললেন,—চাল নয়, শুধু মাছ? সে কী রে? মাছ খাবি কী দিয়ে? যাঃ!

—হ্যাঁ মামা, মাছ! খবরের কাগজে মাছ বেরিয়েছে!

—খবরের কাগজে মাছ? চালাকি হচ্ছে? মাছ তো পুকুরে থাকে!

ভুতো বলল,—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে মামা। এই দেখুন না!

মুখ তুলে বললেন,—হুঁ! সাঁতরাগাছির রেলপুকুর—তার আবার মাছ। যেতিস যদি ডাইনিতলার পেতনিদিঘিতে, দেখতিস মাছ কাকে বলে! ছিপ ফেলতে না ফেলতেই আড়াই সের থেকে সাত সের ওজনের বাঘা-বাঘা রুই উঠে এসে সিগ্রেট খেতে চাইবে!

ইতি বলল,—মাছ সিগ্রেট খায় নাকি মামা?

নান্টুমামা বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন,—খায়। তোরা দেখিসনি!

সন্তু বলল,—ডাইনিতলায় পেতনিদিঘি না কী বললেন, সেখানে বুঝি পেতনি থাকে?

—হুঁ! থাকে বইকী!

—আপনি দেখেছেন?

—দেখেছি মানে? দেখেছি, কথা বলেছি। নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি।

নান্টুমামা এলে আমাদের জোর জমে যায়। এবারও জমে গেল। ইনি ডাইনিতলার পেতনদিঘির পেতনি দেখার গল্প শোনাতে বসলেন। আমরা হাঁ করে শুনে গেলুম। গল্প শেষ হলে সন্তু বলল,—ঠিক আছে। মামা, আমাদের তাহলে পেতনিদিঘিতেই নিয়ে চলুন। মাছ ধরব, পেতনি দেখব, আবার তার বাড়ি নেমন্তন্ন খাব। কী রে, তোদের কী মত?

আমরা সবাই এক কথায় বলে উঠলুম,—হ্যাঁ-হ্যাঁ! নিয়ে চলুন।

নান্টুমামাকে চিন্তিত দেখাল। বললেন,—নিয়ে যেতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি খবর পেলুম, শ্রীমতী পেতনি দেবী বোম্বে গেছেন। সিনেমার শুটিংয়েই গেছেন। অবশ্য বলা যায় না, থেকেও যেতে পারেন সেখানে। তার চেয়ে আমরা এই সাঁতরাগাছির রেল পুকুরেই যাই বরং। সেখানে কি দু-একজন পেতনি থাকবে না? আলবাত আছে। বিজ্ঞাপনে সব লেখেনি!

অগত্যা তাই ঠিক হল। দলে বেছে-বেছে শুধু সাহসী ছেলেমেয়েদের নেওয়া হল। কারণ পেতনির মুখোমুখি হওয়া সোজা নয়। আমি, সন্তু, ভুতো, পাগলু—চারজন ছেলে। আর মেয়ে শুধু একজন—ইতি।

মামাকে নিয়ে আমরা হলুম ছজন। ছজনের জন্যে ছিপ নেওয়া হল দুখানা। একটা ছিপে মামা, আমি আর ভুতো বসব। অন্যটায় সন্তু, ইতি, পাগলু। ব্যাগ ভর্তি খাবার, ফ্লাস্কভর্তি চা নেওয়া হল। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে মামা একগাদা ফল কিনলেন। ছিপ, বঁড়শি, চার, টোপ আগের দিন নিউমার্কেটে গিয়ে কেনা হয়েছিল! রেল অফিসে টাকাও জমা দিয়ে এসেছিল সন্তু।

রোববার সকালে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। নটা নাগাদ পৌঁছলুম সাঁতরাগাছি রেলপুকুরে। রেল-লাইনের ধারেই লম্বা-চওড়া মস্ত পুকুর। বাকি তিনদিকে ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালার ঘন জঙ্গল। দেখলাম আরও অনেকে ছিপ নিয়ে এসেছে। তারা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়েছে। জঙ্গলের দিকগুলোয় লোক খুব কম। যত লোক রেল-লাইনের দিকটায়।

নান্টুমামা আমাদের দক্ষিণের জঙ্গলে ঢোকালেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটা ছিপ ফেলার মতো জায়গা পাওয়া গেল। সেখানে মামার দল বসল। তার হাত বিশেক দূরে ডাইনে একটা জায়গায় বসল সন্তুর দল। আমরা কেউ কোনও দলকেই দেখতে পাচ্ছিলুম না। ঝোপের আড়াল রয়েছে। তাতে কী? মাছ গাঁথা হলে চেঁচিয়ে জানিয়ে দেব পরস্পরকে। তাছাড়া নান্টুমামা পকেটে হুইসেল নিয়েছেন। দরকার হলে ওটা বাজিয়ে দেবেন। আয়োজন খুব পাকা করা হয়েছে।

মামা ছিপের ফাতনার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। আমার ও পাগলুর কিন্তু চোখ ব্যথা করছে। ঠায় দুপুর অবধি বসেও মাছের পাত্তা নেই। একটা বাজলে মামা কথামতো খাবারের জন্য ডাক দিলেন হুইসেল বাজিয়ে। ছিপ ফেলে রেখে সন্তুরা

এসে গেল তক্ষুনি। আমাদের ছিপের একটু তফাতে ঝোপের মধ্যে শতরঞ্চি পেতে আমরা খেতে বসলুম। টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, কলা খেতে-খেতে চাপা গলায় আমরা কথা বলছি, হঠাৎ ডানদিকে কোথাও জলের মধ্যে জোর শব্দ হল। অমনি সন্তু লাফিয়ে উঠল,—ওই রে, আমার মাছ গেঁথেছে।

নান্টুমামা বললেন,—ছিপ আটকে না রাখলে নিয়ে পালাবে রে। দেখে আয় শিগগির।

সন্তু দৌড়ে ঝোপঝাড় ভেঙে চলে গেল। আমরা খুব আশান্বিত হলুম। নির্ঘাত বড়সড় একটা মাছ গেঁথেছে ওর বঁড়শিতে।

কিন্তু সন্তু গেল তো গেলই, কোনও সাড়া নেই। আমরা অধৈর্য হয়ে পড়েছি। তখন মামা দুবার হুইসিল বাজালেন। তবু সন্তুর সাড়া এল না। এবার মামা গলা চড়িয়ে ডাকলেন,—সন্তু! সন্তু!

সন্তুর জবাব নেই।

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। ইতি উঠে দাঁড়াল। আমি দেখে আসি—বলে চলে গেল।

কিন্তু সেও গেল তো গেলই। ব্যাপারটা কী?

নান্টুমামার মুখ গম্ভীর দেখাল এতক্ষণে। বললেন,—ভুতো! তুই যা তো বাবা। দেখে আয় তো, কী হল!

ভুতো ভয়ে-ভয়ে বলল,—আ-আ-মি যাব?

নান্টুমামা খেঁকিয়ে উঠলেন,—হ্যাঁ, তুমি। তুমি না তো কি এই হুইসিলটাকে পাঠাব?

ভুতো আমাদের দিকে তাকাতে-তাকাতে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল। আশ্চর্য, দশ মিনিট অপেক্ষা করেও সে ফিরল না। তখন মামা গম্ভীরমুখে বললেন,—এবার পাগলু যা!

পাগলু নাদুস-নুদুস ছেলে। তাই হাঁটতে কষ্ট হয় মোটকা শরীর নিয়ে। সে ঝোপ ঠেলে অনেক কষ্টে এগোল। নান্টুমামাকে বেজায় ভয় করে। না গিয়ে উপায় কী?

পাগলুও যখন ফিরল না, তখন নান্টুমামা রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—তোদের মতো অকম্মা দেখা যায় না। আমি নিজেই যাচ্ছি। এই রাজু, তুই ছিপের কাছে যা! ফাতনা নড়লেই জোর খ্যাঁচ দিবি। সাবধান! এই হুইসিলটা রাখ বরং। বেগতিক দেখলে তিনবার বাজাবি। মনে থাকে যেন—তিনবার।

নান্টুমামা চলে গেলে আমি ছিপের কাছে এলুম। তারপর উঁকি মেরে সন্তুর ঘাটটা দেখার চেষ্টা করলুম। কিন্তু একটা ঝোপ জলে ঝুঁকে থাকায় কিছু দেখা গেল না। পুকুরটাও দামে ভর্তি। ওর ছিপ দেখাও সম্ভব নয়।

বসে আছি তো আছিই। ফাতনা কাঁপে না যেমন, তেমনি সন্তুদের ওখান

থেকেও কোনও সাড়া নেই। এর মধ্যে পুকুরের ওপারে দূরে রেল-লাইনে কতবার রেলগাড়ি গেল। একা চুপচাপ বসে থাকতে-থাকতে আমারও খুব রাগ হল। আশ্চর্য তো! কী এমন কাণ্ড হচ্ছে ওখানে, যে যাচ্ছে সে আর ফিরছে না?

শেষমেশ আমি উঠে দাঁড়ালুম। মামার বারণ না মেনে সন্তুদের ঘাটের দিকে এগোলুম।

ঝোপ-ঝাপ যত, গাছও তত! কাঁটায় জামাপ্যান্ট আটকে যাচ্ছিল। হাত দশেক এগিয়েছি, হঠাৎ লক্ষ করলুম সামনেই একটা ঘন ডাল-পালাওয়ালা গাছে নান্টুমামা বসে রয়েছেন। ব্যাপার কী? মামার মুখটা ওপাশে ঘোরানো। কী যেন দেখছেন। শরীরটা ঠকঠক করে কাঁপছে। ডাকতে যাচ্ছি, নান্টুমামা হঠাৎ ঘুরে আমাকে দেখেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে গাছে চড়তে ইশারা করলেন। ভুরু কুঁচকে ঘন-ঘন মাথা নাড়ছেন মামা। চোখে ভর্ৎসনার ভঙ্গি। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ওদিকে মামা সমানে ইশারা দিচ্ছেন গাছে চড়তে।

এবার বাঁ-দিকে আরেকটা গাছে চোখ গেল। চমকে উঠলুম! দেখলুম, ভুতো ডগার একটা ডালে বাঁদরের মতো বসে আছে। গোড়ার কাছে একটা মোটা ডালে পাগলুও রয়েছে। ডাইনে তাকালুম। সেদিকে একটা গাছে দেখলুম সন্তু আর ইতি চুপচাপ বসে আছে।

কী করব, ভাবছি। এমন সময় দেখি মামার গাছের তলায় ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল একটা মস্ত ভালুক।

ব্যস অমনি টের পেয়ে গেলুম। দিশেহারা হয়ে কাছেই একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়লুম। তারপর যে কসরত করে ডালে উঠলুম তা সার্কাস ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না।

ডালে উঠে নিরাপদে বসে নিচে সেই ভালুকটাকে খুঁজলুম। ব্যাটা মামার ডালের নিচেই দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে চারপায়ে। মামার নাকের ওপরে চশমাটা ঝুলছে। ভয় হল, এক্ষুনি বুঝি ভালুকের নাকেই গিয়ে পড়বে। না জানি কী ধুন্ধুমার কাণ্ড হবে তাহলে!

ভালুকটা নড়ছে না। কিন্তু ভালুক তো গাছে চড়তে পারে!

যেই কথাটা মনে হওয়া, পিলে চমকে গেল। সর্বনাশ হয়েছে! গাছে ওঠা তো ঠিক হয়নি। কিন্তু এখন নামাও যে বিপদ। মুখোমুখি পড়ে যাব যে!

কতক্ষণ এইভাবে প্রাণ হাতে নিয়ে বসে আছি ঠিক নেই। হঠাৎ জঙ্গলে বাতাস উঠল। তারপর টের পেলাম আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে। ভালুকটা চুপচাপ শুয়ে পড়েছে নান্টুমামার গাছটা নিচে। দেখতে-দেখতে আলোর রঙ ধূসর হয়ে গেল। তারপর শুরু হল বৃষ্টি, সে বৃষ্টির তুলনা নেই। মনে হল আকাশের মেঘগুলো ভেঙে পড়ছে একেবারে। ভিজে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলুম। গাছের তলায় আর জঙ্গলের সবখানে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল! অসহায় হয়ে বসে-বসে ভিজছি আর ভিজছি।

মাঝে-মাঝে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে। বুকে খিল ধরে যাচ্ছে। মনে-মনে নাক-কান মুলছি—আর কখনও মাছ ধরার নাম করব না।

বৃষ্টি একটু কমেছে সবে। কিন্তু সন্ধের অন্ধকার ঘন হয়েছে।—এমন সময় নান্টুমামার চাপা ডাক শুনতে পেলুম,—সন্তু! ইতি! পাগলু! ভুতো! সবাই নেমে আয়। ভালুকটা পালিয়েছে।

একে-একে নেমে গেলুম, চারদিকের গাছ থেকে বৃষ্টিভেজা ছটি অদ্ভুত মূর্তি। সবাই ঠকঠক করে কাঁপছি। মামা ঠান্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে বললেন,—সব পড়ে থাক। চল, আগে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিই। জঙ্গলের বাইরে নিশ্চয় ঘরবাড়ি আছে। আয়, চলে আয়।

আমরা এগোলুম। স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। বিদ্যুতের আলোয় দেখে-দেখে পা ফেলতে হচ্ছে। কতদূর যাওয়ার পর নান্টুমামা বলে উঠলেন,—সামনে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে না?

একবার বিজলি ঝলসে উঠতেই দেখলুম, তাই বটে। গাছপালার মধ্যে একটা মস্ত দালানবাড়ি হয়েছে। দৌড়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছলুম আমরা। কিন্তু আশ্চর্য, বাড়িটায় কোনও আলো নেই। কোনও লোকজন নেই।

নিশ্চয়ই পোড়ো-বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকে গেলুম। বারান্দায় উঠে দেখি, সত্যি তাই। দরজা-জানালা বলতে কিছু নেই। ভেতরে কোনও আসবাবপত্রও নেই। টর্চ পুকুরের ধারে পড়ে আছে। এবার তাই নান্টুমামা দেশলাই জ্বালালেন। সেটুকু আলোয় যা দেখলুম, আমার পিলে আবার চমকাল।

ঘরের কোনায় শুয়ে আছে—আবার কে? সেই যমের মতো ভালুকটা। আর কী? এবার আর রক্ষে নেই। পাগলু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ভুতো বলল,—মা-মা-মা মা। ভা-ভা-ভা-ভালু...

ওদিকে মামা তখন মরিয়া। বিকট চেঁচিয়ে উঠলেন,—গেট আউট! গেট আউট স্কাউন্ড্রেল! ডু ইউ নো, হু অ্যাম আই? ইউ ব্ল্যাক বিয়ার। আই অ্যাম নান্টুবাবু!

সেই সময় কার কথা শোনা গেল অন্ধকারেই, সেই ঘরের কোনা থেকে! —বাবুসাব মাৎ ঘাবড়াইয়ে। লছমী কুছ নেহি বোলে গা! বহুৎ আচ্ছা ভালু বাবুসাব!

নান্টুমামা হুঙ্কার দিয়ে বললেন,—কোন ব্যাটা রে?

—হামি ভালুকওয়ালা আছি বাবুসাব। আজ সকাল থেকে লছমী—হামার এই ভালু হারিয়ে গিস্‌লো। বিষ্টি সমোয়ে লছমীকে জঙ্গুলে দেখতে গেছল বাবুসাব। তো এখানেই লিয়ে আসল।

নান্টুমামা হো-হো করে হেসে বললেন,—ব্যাটা ভুঁত কাঁহেকো। আমরা এতক্ষণে হেসে উঠলুম। হেসেই বেঁচে উঠলুম বলা যায়। কিন্তু সাঁতরাগাছির রেল-পুকুরে তাই বলে আর কখনও মাছ ধরতে যাচ্ছি না। বাপ্‌স!

ভয়ভুতুড়ে

খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। বড় অদ্ভুত বিজ্ঞাপন।

সস্তায় ভূত কিনুন!
বাচ্চা ভূত মাত্র পঞ্চাশ পয়সা
ধেড়ে ভূত মাত্র এক টাকা
জাল ভূত নয়! একেবারে আসল ভূত!!
ভূতনাথ অ্যান্ড কোং
১/১ কালোবাজার স্ট্রিট
(লালবাজারের উল্টোদিকে)
কলকাতা

ভাগ্নে নেপাল তার মামা নকুলেশ্বরকে বলল,—ও মামা, ভূত কিনবেন? এই দেখুন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে।

নকুলেশ্বর বললেন,—তাই নাকি? দেখি, দেখি!

বিজ্ঞাপন পড়ে নকুলেশ্বর নেচে উঠলেন। তাঁর নানারকম জন্তুজানোয়ার এবং পাখি পোষার শখ আছে বরাবর। বাড়ির ছাদে আস্ত একটা চিড়িয়াখানা বানিয়ে ফেলেছেন। সেখানে এখন বাঘ-ভালুক না থাকলেও ছোট-ছোট জন্তু অনেক আছে। বাঘ-ভালুক একসময় ছিল। তাদের খোরাক জোগাতে না পেরে সার্কাস কোম্পানিকে বেচে দিয়েছিলেন। এখন আছে গোটা দুই খরগোশ, একটি হরিণের বাচ্চা, একটা খেঁকশিয়াল, একটা ভোঁদড়, দুটো বেজি আর পাঁচটা গিনিপিগ। পাখিও আছে কয়েকরকম। মামা-ভাগ্নে তাদের নিয়েই থাকেন।

নকুলেশ্বরের বরাবর সাধ ছিল, একটা ভূত রাখবেন চিড়িয়াখানায়। কিন্তু ভূত পাবেন কোথায়? ভাগ্নেকে নিয়ে কত জায়গায় ঘুরেছেন—শ্মশানে, পোড়ো-বাড়িতে, চিলেকোঠায়। ভূত পাননি। এখন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লেন দুজনে।

অনেক খুঁজে 'ভূতনাথ অ্যান্ড কোং' বের করলেন। একটা বিরাট পুরোনো বাড়ির ভেতর অনেক ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে অনেক করিডর পেরিয়ে তিনতলায় কোনার দিকে একটা ছোট্ট ঘরের দরজায় কোম্পানির নাম দেখতে পেলেন।

টুলে বেয়ারা বসেছিল। বলল,—চলিয়ে যান অন্দরমে।

বেয়ারার কালো কুচকুচে চেহারা, রোগা-পটকা গড়ন। গোঁফটা প্রকাণ্ড। নেপাল ও নকুলেশ্বর চোখাচোখি করলেন। তার মানে, বেয়ারাটা মানুষ বটে তো? বলা যায় না।

ঘরের ভেতর আলো নেই। আবছা আঁধার। ঢুকে কিছু দেখতে পেলেন না

নকুলেশ্বর। আর কেমন একটা চিমসে গন্ধ। নেপাল ফিসফিস করে বলল,—ভূতের গায়ে কেমন গন্ধ মামা। বড্ড বিচ্ছিরি।

নকুলেশ্বর বললেন,—তা তো হবেই। কিন্তু ঘরে যে কাকেও দেখতে পাচ্ছিনে।

দেশলাই জ্বালুন মামা। —নেপাল পরামর্শ দিল।

অমনি কে হেঁড়ে গলায় বলে উঠল,—উঁহু হুঁ। আলো জ্বালাবেন না। আলোয় ওদের কষ্ট হয়। এই যে, এখানে চলে আসুন।

নকুলেশ্বর বললেন,—কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে।

—দেখার দরকারটা কী? পয়সা দিন, জিনিস নিয়ে যান। বাড়ি গিয়ে কিন্তু অন্ধকারে দেখবেন।

—সে কি! না দেখে কিনব কেন মশাই!

—আপনি বোকার মতো কথা বলছেন। ভূত হল গিয়ে অন্ধকারের প্রাণী। আলোয় তারা বাঁচে না। যেমন ধরুন, আপনি ক্যামেরার ফিল্ম কিনতে গেছেন। ফিল্মের রোল থাকে কৌটোর ভেতর। কেন থাকে জানেন নিশ্চয়। ফিল্মের রোল আলোয় খুললেই নষ্ট হয়ে যায়। একেবারে সাদা হয়ে যায়। তাই না?

নকুলেশ্বর বুঝতে পেরে বললেন,—হ্যাঁ, তা যায় বটে।

—এও তেমনি। কাজেই এই ডার্করুমে ভূত বিক্রি করতে হয়। পয়সা দিন, আমি একটা কৌটো দিচ্ছি—তার মধ্যে ভূত আছে। কিন্তু আবার সাবধান করে দিচ্ছি। আলোয় খুলবেন না, ডার্করুমে রাখবেন।

—বুঝলুম। কিন্তু ওদের খেতে দিতে হবে তো?

—আলবাত দিতে হবে। অন্ধকারে কৌটো খুলে খাইয়ে দেবেন।

কী খায় ওরা জিগ্যেস করে নিন, মামা! —নেপাল পরামর্শ দিল।

অন্ধকারে লোকটা বলল,—ভূতের খাদ্যও খুব সস্তা। সকালে ও বিকেলে একগ্রাম শুকনো গোবর। খাটালে পেয়ে যাবেন। দুপুরে ও রাতে কুচোচিংড়ির মাথা। ব্যস। আর সপ্তায় একদিন এক চামচ দুধ দেবেন। অবিশ্যি একটা কাগজে ভূতের লালন-পালন সম্পর্কে সব কথা লিখে ছাপিয়ে রেখেছি। একটা দেব। ভাববেন না।

নকুলেশ্বর বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন,—ঠিক আছে। আপাতত একটা দিন। বাচ্চা ভূতই দিন। আগে ব্যাপার-স্যাপার দেখে নেব। তারপর বরং গোটাকতক কিনব।

নেপাল বলল,—বাচ্চা-ধেড়ে সবরকমই কিনব।

—কই, পঞ্চাশ পয়সা দিন তাহলে।

নকুলেশ্বর একটা আধুলি বের করে বাড়িয়ে বললেন,—নিন। অন্ধকারে একটা হাত এসে তাঁর পয়সাটা তুলে নিল এবং তক্ষুনি তাঁর হাতে একটা ছোট্ট কৌটো দিল। নকুলেশর বললেন,—এতটুকু কৌটো!

—এতটুকুই তো হবে। বাচ্চা ভূত কিনা। তা ছাড়া, আপনি নিশ্চয় জানেন, ভূতেরা ইচ্ছেমতো রূপ ধরতে পারে। প্রকাণ্ড বড় হতে পারে, আবার এতটুকুটি হতেও পারে। ওরা অদৃশ্য হতেও পারে। তাই সাবধান, কৌটোর মুখ খোলার সময় দেখবেন যেন সুড়ুৎ করে না পালায়।

নকুলেশ্বর বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ। তা আর বলতে। আচ্ছা, চলি। নমস্কার।

ভূতের কৌটো পকেটে পুরে মামা-ভাগ্নে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বেয়ারা সেলাম দিয়ে একগাল হেসে বলল,—বহুৎ বড়িয়া চিজ বাবু। এইসা চিজ কঁহি নেহি মিলেগা।

মহা আনন্দে মামা-ভাগ্নে বাড়ি ফিরলেন ভূত কিনে।

কৌটোটা টেবিলের ড্রয়ারে রইল এবং ঘরে সে রাতে আলো জ্বাললেন না নকুলেশ্বর। পরদিন ছাদের চিড়িয়াখানায় একটা ডার্করুম বানাবেন। সেখানে বাচ্চা ভূতটা থাকবে। সকালের অপেক্ষা শুধু। মিস্ত্রিকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘর বানিয়ে দেবে।

রাতদুপুরে হঠাৎ শোনেন, ড্রয়ারের ভেতর কৌটোটা খুব লাফালাফি জুড়ে দিয়েছে যেন। পাশের ঘর থেকে ভাগ্নে নেপালকে ডাকলেন। বলা যায় না, ভূত সাংঘাতিক প্রাণী—বাচ্চা হলেও তো ভূত বটে। দুজনে সাহস করে ড্রয়ার খুলতেই কৌটোটা সত্যি নড়াচড়া করে বেড়াচ্ছে টের পাওয়া গেল। নেপাল বলল,—ও মামা, আসলে ওর খিদে পেয়েছে।

নকুলেশ্বর বললেন,—শোবার আগে তো কুচোচিংড়ির মাথা খাইয়ে দিলুম। আবার খিদে?

—বাচ্চাদের বারবার খিদে পায় না বুঝি? আমার তো পায়।

—এখন আর কী দেব বলতো? আর তো কুচোচিংড়ির মাথা নেই। অনেক খুঁজে ছাইগাদা থেকে কিছু পেয়েছিলুম। বাজারে আজকাল চিংড়ি পাওয়া কঠিন। সব বিদেশে পাঠাচ্ছে কিনা।

—মামা, সকালের চায়ের দুধ রাখা আছে। এক চামচ এনে দিই বরং।

—তাই আন।

নেপাল দুধ আনলে নকুলেশ্বর কৌটোর মুখ খুললেন সাবধানে। দুধটুকু ঢেলে দিয়ে আদর করে বললেন—লক্ষ্মীসোনা। মানিক! চোঁ করে খেয়ে ফেলো তো বাবা।

তারপর বাপরে বলে লাফ দিলেন। উঁহু হু হু করে উঠলেন নকুলেশ্বর। নেপাল বলল,—কী হল, মামা? কী হল?

—উঁহু হু কামড়ে দিয়েছে আঙুলে। নে, নে, কৌটো ধর নেপাল। জ্বালা করছে বড্ড।

নেপাল কৌটো ধরে যেই কৌটোর মধ্যে হাত ঢুকিয়েছে অমনি হতচ্ছাড়াটা আবার আঙুলে কামড়ে দিল।

নেপাল কৌটো ফেলে দিয়ে বাপরে-মারে করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল।

সে এক হুলুস্থুল অবস্থা। ঠাকুর-চাকর দৌড়ে এল। বাতি জ্বালল সুইচ টিপে। দেখল মামা-ভাগ্নে আঙুল চেপে ধরে লাফালাফি করছে।

নকুলেশ্বর সেই অবস্থায় চেঁচালেন,—আলো নেভাও, আলো নেভাও।

কে নেভাবে? ঠাকুর-চাকর সবাই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময় ঘরে আওয়াজ শোনা গেল বোঁ ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ। নিশ্চয় বাচ্চা ভূতের আওয়াজ।

ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠল,—সর্বনাশ। বোলতা, বোলতা। মস্তবড় একটা বোলতা।

নকুলেশ্বর বিকৃতমুখে বললেন,—ধর্-ধর্। কৌটোয় পুরে দে। বোলতা নয়—বোলতা নয়। বোলতার রূপ ধরেছে।

বোলতা ধরে সাধ্য কার। বোলতাটা কিছুক্ষণ ওড়াওড়ি করে ঘুলঘুলিতে গিয়ে ঢুকল। তারপর তার আর সাড়া পাওয়া গেল না।

আঙুল ফুলে ঢোল মামা-ভাগ্নের। গোবিন্দ ডাক্তার এসে দেখে গিয়েছিলেন। জ্বরও হয়েছিল! ঘুলঘুলিতে খোঁজা হয়েছে। বোলতা-টোলতা ছিল না।

নকুলেশ্বর মনমরা হয়ে গিয়েছিল। আহা যদি বাসা বানিয়েও থাকত ভূতের বাচ্চাটা।

জ্বর সারলে এবং আঙুলের ফোলা কমলে ফের সেই ভূতনাথ অ্যান্ড কোং এর আপিসে গেলেন। কিন্তু কোথায় কোম্পানি। ঘরের দরজায় একটা কাঠের ফলকে লেখা আছে ঃ ভজহরি ট্রেডিং কোং লিঃ। তারা অনেক কিছু বেচে—তবে ভূতটূত নয়।

খোঁজ নিয়ে জানলেন, ভূতনাথ কোম্পানি উঠে গেছে আগের দিন। পুলিশ ঝামেলা বাধিয়েছিল।

আজকাল মামা ভাগ্নে-মিলে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন খুঁটিয়ে পড়েন। এবার ভূত বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখলে সেখানে গিয়ে ধেড়ে ভূতই কিনবেন। বাচ্চা ভূতগুলো বড্ড বাজে। হিংসুটে স্বভাব। খামোকা কামড়ে আঙুল ঢোল করে দেয়।

কৃতান্তবাবুর কাঁকুলে যাত্রা

বাস থেকে নেমে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল কৃতান্তবাবুর। ভুল জায়গায় নামিয়ে দেয়নি তো কন্ডাক্টর! পাকা রাস্তার দুধারেই ধু-ধু মাঠ। দিগন্তে ধোঁয়ার মতো যা দেখা যাচ্ছে, তা নিশ্চয় গ্রাম। কিন্তু এই প্রখর রোদ্দুরে পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছতে শরীরের অর্ধেক রক্ত ঘাম হয়ে বেরিয়ে যাবে যে।

হ্যাঁ, ঘাম হয়ে। শরীরের রক্তই যে ঘাম হয়ে বেরোয়, তাতে কৃতান্তবাবুর এখন আর কোনও সন্দেহ নেই। এই ধু-ধু মাঠ, লোক নেই, জন নেই, গাছ নেই, পালা নেই, যাকে তেপান্তর বলা হয় রূপকথায়—সেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক এমন কথাই মনে হবে মানুষের।

বৈকুণ্ঠবাবুকে না জানিয়ে এভাবে হুট করে এসে পড়াটা ভালো হয়নি। জানিয়ে এলে তিনি পাকারাস্তার মোড়ে গাড়ি-টাড়ি নিশ্চয় রাখতেন! বৈকুণ্ঠ পয়সাওলা মানুষ।

পরক্ষণে কৃতান্ত মোড়ের কাঁচারাস্তাটা দেখে ভাবলেন—হ্যাঁ, গাড়ি ঠিকই রাখত বৈকুণ্ঠ। তবে নির্ঘাৎ সেটা গরু বা মোষের গাড়ি। অবশ্য ওর জিপ থাকাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু যে কিপটে মানুষ, রিটায়ার করার পর দেশের বাড়ি গিয়ে জিপ কিনবে? তাহলেই হয়েছে।

কমাস আগে কলকাতায় দেখা হয়েছিল দুই বন্ধুর। দুজনেরই বয়স হয়েছে। চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। কৃতান্ত থাকেন বড়ছেলের কাছে। বৈকণ্ঠ গ্রামে পৈতৃক ভিটেয় গিয়ে উঠেছেন। কিছু জমিজমাও আছে। ছেলেপুলে নেই, আছে এক ভাগ্নে। সে-ই এতদিন সব দেখাশোনা করছিল। এখন মামা-ভাগ্নে মিলে নাকি উন্নত প্রথায় চাষবাস করছেন। কথায়-কথায় বৈকুণ্ঠ বলেছিলেন,—মন খারাপ করলে সোজা চলে যেও ভাই কেতো। কীভাবে যেতে হবে, বলে দিচ্ছি।

পথ ঠিকই বাতলে দিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠ। ওই তো কাঁচারাস্তা মাঠের বুকে সোজা চলে গেছে। ওই রাস্তায় তিন মাইল গেলেই বৈকুণ্ঠের গ্রাম কাঁকুলিয়া। কিন্তু বৈকুণ্ঠ সবই বলেছিলেন,—শুধু বলেননি মাঠটা অবিকল রূপকথার সেই তেপান্তর—আর এই এলাকার আকাশে সূর্যদেবও বেজায় রাগী। বাপস্! সবে তো দশটা বেজেছে, এরই মধ্যে মেজাজ কী তিরিক্ষি। কটমট করে তাকাচ্ছেন কৃতান্তের দিকে—রোস্ট করে খেয়ে ফেলবেন একেবারে।

তাও তো রূপকথার তেপান্তরে একটা গাছ ছিল শুনেছেন ছেলেবেলায়—যে গাছের ডালে বাস করত ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী।

কিন্তু এ যেন মরুভূমি। ঢেউ খেলানো ধু-ধু মাঠ, রুক্ষ নীরস হয়ে পড়ে আছে। হুঁ! সব গুল বৈকুণ্ঠের। চাষবাস না হাতি। এই পাথুরে মাটিতে এক চিলতে ঘাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেনি, শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে—আর কিনা ওঁরা মামা-ভাগ্নে নাকি ফসল ফলিয়ে মা-লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়ে গেছেন? ধুর, ধুর! বয়স হলেও বৈকুণ্ঠ এমন মিথ্যুক, ভাবা যায় না।

কৃতান্তবাবুর রাগ হচ্ছিল। কিন্তু এসে যখন পড়েছেন, এবং বুড়োমানুষ হলেও এখনও শরীরে যুবকের মতো শক্তি আছে বইকী, তখন বৈকুণ্ঠের মুখোমুখি হয়ে ঝাল না ঝেড়ে ছাড়বেন না।

অতএব কৃতান্ত মাথায় রুমাল জড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। রুমাল না জড়ালে সূর্যদেবের দাঁতের কামড় খেয়ে প্রকাণ্ড টাকের অবস্থাটা ভারি কাহিল হয়ে যাবে। কাঁধে একটা ব্যাগ ছাড়া আর কোনও বোঝা নেই। সেই রক্ষে।

সত্যি বলতে কী, এই যে এমন করে বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়ি যাচ্ছেন, তার কারণ গত রাত থেকে তাঁর মন খারাপ। বৈকুণ্ঠ বলেছিলেন,—মন খারাপ হলেই চলে যেও। আনন্দ পাবে।

মন খারাপের কারণ আর কিছুই না, চা। নেপাল নামে যে ছোকরাটিকে উমা সম্প্রতি বাসায় বহাল করেছে, সে চোরের ওস্তাদ। তিরিশ টাকা কিলোর চা কিনতে গিয়ে পনেরো টাকা কিলোর চা এনে দেবে এবং তিরিশ টাকা দরেই হিসেব দেখাবে।

আর সেই চা কুকুরও ছোঁয় না। কৃতান্তবাবুর বরাবর এই এক অভ্যাস। ভালো এবং দামি চা খাওয়া তাঁর শখ ছিল। এখন নিজে চা কিনতে যান না। তার মানে, ছেলে কিংবা বউমা তাঁকে চা কিনতে যেতে দেবে না। ওদের সম্মান যাবে নাকি!

আসলে নেপাল ওদের মাথাটি খেয়েছে। গত রাতে পার্ক থেকে বেড়িয়ে এসে অভ্যাস মতো চা চাইলেন। চা ঠিকই এল কিন্তু সে কি চা, না শুকনো কচুরিপানা-সেদ্ধ জল?

নেপালকে বকাবকি করতে গেলে উল্টে বউমা তার হয়ে সাফাই গেয়ে বলল কিনা,—আজকাল চায়ে বেজায় ভেজাল দিচ্ছে যে। নেপু কী করবে?

নেপাল হল নেপু! ন্যাপলা নয়, আদর করে 'নে-পু!' কোনও মানে হয়?

বেশ, নেপু নিয়ে তোমরা ভেঁপু বাজাও। আমি চললুম যে-দিকে দুচোখ যায়।

কৃতান্তবাবু অবশ্য টেবিলে একটা চিরকুট সবার চোখে পড়ার মতো জায়গায় রেখে এসেছেন। তাতে লিখে রেখেছেন ঃ আমাকে খুঁজিও না। পাইবে না।

বাস থেকে কাঁকুলিয়া রাস্তার এই মোড়ে নেমে একটু পস্তানি অবশ্য হয়েছিল। এতটা করা কি ঠিক হয়েছে? বড়ছেলে প্রতুল কি চুপ করে থাকবে? হাজার হলেও বাবা। বাবা নিরুদ্দেশ হলে ছেলেদের পক্ষে চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব। থানা-পুলিশ করবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে। খামোকা হয়রান হবে।

কিন্তু যা করার করে ফেলেছেন, আর পস্তিয়ে লাভ নেই। তবে যদি প্রতুল তাঁর খোঁজ পেয়ে যায় এবং মুখোমুখি এসে পড়ে—কৃতান্ত বলবেন,—হ্যাঁ, ফিরে যাব একটা শর্তে। ওই ন্যাপলাকে তাড়াতে হবে।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে কৃতান্তবাবু চলেছেন।

একটা সুবিধে, ফাঁকা মাঠ বলে হু-হু করে বাতাস বইছে। তাই রোদ্দুরটা খুব একটা কষ্ট দিচ্ছে না।

কিন্তু রাস্তা যেমন এবড়ো-খেবড়ো, তেমনি ধুলোয় ভরা। হাঁটু অবধি ধুলোয় সাদা হয়ে যাচ্ছে। একদমে এতখানি হাঁটা অভ্যেস নেই বলে ক্লান্তিও আসছে।

বৈকুণ্ঠের দেশের লোকেরা এমন গবেট যে রাস্তার ধারে একটা গাছও লাগায়নি। একেই বলে পাণ্ডববর্জিত দেশ। আর সরকারি সড়ক-দফতরই বা কী করছে? প্রতি বছর ওই যে বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়, কত ধুমধাম শুনতে পাওয়া যায়, সে সব কাঁকুলিয়া এলাকায় হয় না? আসলে তদ্বিরের লোক নেই এখানে। সরকার তো অন্তর্যামী ভগবান নন। গিয়ে সব জানাতে হবে তবে না! ছ্যা, ছ্যা, বৈকুণ্ঠের দেশের লোকেরা এখনও সেই মান্ধাতার আমলে পড়ে আছে।

কৃতান্ত তেতো মুখে এসব কথা ভাবছেন, এমন সময় আচমকা পেছনে আবছা শব্দ শুনতে পেলেন—টংলং—টংলং—টংলং।

ঘোড়ার গাড়িটা দেখামাত্র রাস্তার ধারে সরে গেলেন কৃতান্ত। মনে ক্ষীণ আশা হল, গাড়িটা থামিয়ে বলবেন নাকি, একটা লিফ্‌ট দিতে?

ঘোড়ার গাড়িটা যত কাছে আসছে, কৃতান্তবাবু কিন্তু তত অবাক। একালে

এমন অজ পাড়াগাঁয়ে ঘোড়ার গাড়ি কেন, পালকি থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু এই গাড়িটা একেবারে রাজকীয়। সোনার মতো ঝকঝক করছে। কী অপূর্ব নকশা! ঘোড়াদুটোও প্রকাণ্ড এবং সাদা রঙের। তাদের সাজও দেখবার মতো। কোচোয়ানের দিকে তাকিয়ে কৃতান্ত আরও অবাক হলেন। জরি আর মখমলের পোশাক, মাথায় বিচিত্র উষ্ণীষ!

কৃতান্ত এত অবাক হয়েছিলেন যে গাড়িটাকে হাত তুলে থামাবার কথাই ভুলে গেছেন।

কিন্তু গাড়িটা আচমকা তাঁর কাছে এসেই থেমে গেল। সাদা ঘোড়াদুটো সামনের দুই পা শূন্যে তুলে বিকট চিঁহিঁ করে উঠল।

যাকে কোচোয়ান ভেবেছিলেন, সে যে কোচোয়ান নয় বুঝতে দেরি হল না কৃতান্তের। কী সুন্দর বীরোচিত চেহারা! কী উজ্জ্বল গৌর গায়ের রং! আবার কোমরে খাপেভরা তরোয়ালও ঝুলছে।

কৃতান্ত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

এই মহাকাশযুগেও বৈকুণ্ঠবাবুর দেশের বড়লোকেরা এমন ঝলমলে সেকেলে পোশাক পরে কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বেড়ায়, ভাবলে অবাক লাগে না?

বোঝা যাচ্ছে, যে কারণেই হোক, কাঁকুলিয়া এলাকা এখনও সেই ঐতিহাসিক রাজরাজড়ার যুগেই পড়ে আছে। একে ঘোড়ার গাড়ি বলা উচিত নয়। এ তো অশ্বচালিত রথ!

কৃতান্তের শেষ অবধি ভালোই লাগল ব্যাপারটা। কথায়-কথায় লোকে আপশোস করে বলে না—হায় রে সেকাল? কৃতান্তবাবু কতবার বলেন কথাটা। অতএব, বৈকুণ্ঠবাবুর দেশে সত্যি-সত্যি জলজ্যান্ত সেকাল যদি টিকেই থাকে, সে তো খাসা! আহা, সেকালে মানুষের নাকি কত আনন্দ, সুখসুবিধে ছিল! পুকুরভরা মাছ, গোলাভরা ধান, গামলা-গামলা দুধ! এই সে পরান গয়লার নর্দমার জল মেশানো দুধ নয়, হরিণঘাটায় বোতলের সর তুলে সাদা তরল পদার্থও নয়—খাঁটি দুধ।

আর ঘি? নির্ভেজাল প্রকৃত ঘৃত। কৃতান্তের নোলায় জল এসে গেল। হায় রে! কতকাল প্রকৃত ঘৃতপক্ক লুচি আর খেতে পাওয়া যায় না। কৃতান্ত দীর্ঘশ্বাস না ফেলেও পারলেন না।

এবং মনে-মনে আনন্দে নেচেও উঠলেন। বৈকুণ্ঠের বাড়িতে প্রকৃত ঘৃতপক্ক লুচির কথা ভেবেই।

এদিকে অশ্বচালিত রথে বসে রাজপুরুষটিও তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি।

কৃতান্ত সৌজন্য দেখিয়ে করজোড়ে নমস্কার করলেন।

তখন রাজপুরুষ নমস্কার করে সংস্কৃত ভাষায় তাঁকে বললেন,—আর্য! ত্বম্ অভিনন্দতে কঃ ত্বাম্? কুত্র গচ্ছসি?

এই সেরেছে! কৃতান্তবাবু মুশকিলে পড়ে গেলেন। সেই পঞ্চাশ বছর আগে

ম্যাট্রিকে সংস্কৃত পড়েছেন। তার কি মনে আছে কিছু? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ কৌমুদীখানা হাতের কাছে থাকলে বরং চেষ্টা করা যেত।

রাজপুরুষটি মনে হচ্ছে খুবই ভদ্র। মুখের হাসিটি দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু শাস্ত্রে আছে না? শৃঙ্গী প্রাণী আর অস্ত্রধারী মনুষ্য থেকে শতহস্ত দূরে থাকা উচিত। বলা যায় না, কখন কীসে মেজাজ চড়ে যায়।

কৃতান্তবাবু ঘাবড়ে গিয়ে—না, সংস্কৃত নয়—একেবারে ইংরেজিতে বলে ফেললেন,—স্যার, আই অ্যাম কামিং ফ্রম ক্যালকাটা অ্যান্ড গোয়িং টু বৈকুণ্ঠবাবু হাউস। বাট স্যার, ভেরি হট ডে। ভেরি টায়ার্ড স্যার। ওল্ড ম্যান স্যার—

রাজপুরুষ হোহো করে হেসে ফেললেন। এবার বিশুদ্ধ বাংলায়—তার মানে সাধুভাষায় বলে উঠলেন,—বুঝিয়াছি মহাশয়! বুঝিতে পারিয়াছি। থাউক। ইংরাজি ভাষায় কথোপকথনের আবশ্যকতা নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে বাংলা ভাষায় কথা কহিতে পারেন। তবে তাহার আগে আপনি আমার রথে আরোহন করুন। পশ্চাৎ যাহা কহিবার কহিবেন।

কৃতান্তবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এবং সাবধানে ময়ূরপঙ্খী রথের পেছনদিকের পাদানি দিয়ে অনেক কষ্টে চড়ে বসলেন। রাজপুরুষ তাঁর হাত ধরে পাশে বসিয়ে মৃদু হেসে ফের বললেন,—মনে হইতেছে আপনি ক্ষুধার্ত এবং যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত। চিন্তা করিবেন না। আমার প্রাসাদে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিবেন।

কৃতান্ত খুশি হয়ে বললেন,—আপনার প্রাসাদে আতিথ্যের আমন্ত্রণ আমি কি প্রত্যাখ্যান করতে পারি কি? হে ভদ্র! সেখান হইতে কাংকুলিয়া পল্লী কতদূর বলিতে পারেন কি?

কাঁকুলিয়া সাধুভাষায় কাংকুলিয়া হওয়াই উচিত বলে মনে করলেন কৃতান্ত। রাজপুরুষ তার কথা শুনে বললেন,—কাংকুলিয়া? ওহো! বুঝিয়াছি—কাংকালিয়ার কথা বলিতেছেন।

কৃতান্ত বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাংকালিয়াই বটে।

—কাংকালিয়া আমার পিতার রাজধানী। আপনি কাহার নিকট যাইবেন?

—আজ্ঞে বৈকুণ্ঠ। তিনি আমার সুহৃদ বটেন!

—বৈকুণ্ঠ। আহা বুঝিয়াছি। শ্রেষ্ঠীপ্রবর বৈকুণ্ঠের নাম এরাজ্যে কে না জানে।—বলে রথের অশ্বকে কশাঘাত করলেন রাজপুরুষ।

রথ চলতে থাকল। ক্রমশ গতি বাড়ছিল। কিন্তু এতটুকু ঝাঁকুনি নেই। অদ্ভুত রথ বানাতে পারে এরা—ইতিহাসের দেশের লোকেরা। কৃতান্ত মনে-মনে তারিফ করছিলেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠকে শ্রেষ্ঠীপ্রবর বলছেন কেন যুবরাজ? শ্রেষ্ঠী মানে তো বণিক বা ব্যবসায়ী। বৈকুণ্ঠ কি তাহলে এখন চুটিয়ে ব্যবসা করতে নেমেছে?

দেখতে-দেখতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দিগন্তের সেই ধোঁয়াটে ব্যাপারটাতে অর্থাৎ গ্রামে এসে পড়ল। কিন্তু গ্রাম বলা কি ঠিক হচ্ছে? গাছপালার ফাঁকে সাদা-হলদে-নীল, রংবেরঙের পাকা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এ যে রীতিমতো শহর!

কিন্তু না—ইলেকট্রিক লাইন নেই। আকাশ পরিষ্কার। ঘর-বাড়িগুলোর গড়নও ছবিতে যেমনটি দেখা যায় তেমনি। আর ওই বুঝি রাজপ্রাসাদ! বিশাল তোরণ। সশস্ত্র প্রহরী। ওরে বাবা! কী পেল্লায় দানোর মতো ওদের চেহারা! মস্ত বল্লম কাঁধে। কোমরে চ্যাপ্টা খাঁড়ার মতো অদ্ভুত তরোয়াল ঝুলছে। মাথায় লোহার টুপি। ওদিকে উঁচুতে ফটকের মাথায় একদল প্রহরীর হাতে তীর-ধনুকও রয়েছে। ভুল করে শত্রু ভেবে তির ছুড়লেই হয়েছে! কৃতান্ত ভয়ে চোখ বুজলেন।

ফের যখন চোখ খুললেন, দেখলেন বিশাল এক প্রাঙ্গণে রথ ঢুকছে। প্রাঙ্গণে কত ফুলের গাছ, মর্মরমূর্তি, ফোয়ারা।

চওড়া মস্ত সিঁড়ি—উঁচু, সোপান বলাই উচিত, তার ধারে রথ থামলে একদল পরিচারক আর সশস্ত্র প্রহরী এসে অভিবাদন জানিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

যুবরাজ কৃতান্তের একটা হাত ধরে বললেন,—আর্য! গাত্রোত্থান করুন।

কৃতান্ত সাবধানে নামলেন।

সিঁড়ির ওপরদিকে চওড়া বারান্দার মতো জায়গায় বীণা বাজিয়ে কারা গান জুড়ে দিল সঙ্গে-সঙ্গে। গানের ভাষা সংস্কৃত। মলোচ্ছাই! এত সংস্কৃতের মধ্যে বাংলা নিয়ে বিপদে পড়তে হবে যে! হিন্দি হলে ততটা অসুবিধে ছিল না। আজকালকার হিন্দি তো হ্যায়-ট্যায় এসব ক্রিয়াপদ বাদ দিলে খাঁটি সংস্কৃত। এদিকে বাংলার ক্রিয়াপদ বাদ দিলে তো স্রেফ ইংরিজি। এই যেমন—আমি হাংগ্রি ফিল করছি!

কৃতান্ত সিঁড়িতে পা বাড়ালে বীণাবাদক আর বীণাবাদিকা মিলে জনা পনেরো পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুধারে দাঁড়িয়ে গান করতে লাগল।

কৃতান্ত যুবরাজের পাশাপাশি সপ্রতিভ ভঙ্গিতে অর্থাৎ কিনা স্মার্ট হয়ে, রাষ্ট্রনেতারা যেভাবে গার্ড অফ অনার ভিজিট করেন, সেইভাবে উঠে গেলেন।

সামনে কারুকার্যময় সুদৃশ্য দরজার পরদা দুদিকে টেনে ধরে দাঁড়িয়ে আছে দুজন পরিচারিকা। আর ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন পরিচারক—তার হাতে বিশাল রুপোর রেকাব, তার ওপর সোনার গেলাসে সম্ভবত সুশীতল শরবত-টরবত হবে। দেখামাত্র তৃষ্ণা বেড়ে গেল কৃতান্তবাবুর।

কিন্তু তারপরই থমকে দাঁড়ালেন।

সুশীতল পানীয় নিয়ে যে পরিচারক দাঁড়িয়ে আছে, সে আর কেউ নয়—স্বয়ং নেপাল। সেই ন্যাপলা। বউমার আদরের নেপু। নেপু না বলে নেপো বলাই ভালো। যে নেপো দই মারে। কিন্তু অসম্ভব? একই চেহারার লোক তো থাকে। কৃতান্তবাবু হাত বাড়ালেন। প্রচণ্ড তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল।

কিন্তু শরবতের গেলাস নিতে গিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ—এ ব্যাটা সেই ন্যাপলাই বটে, ফিক করে হাসল। তারপর ফিসফিস করে বলে উঠল,—কর্তাবাবু, ভালো আছেন।

অমনি ঝনঝন করে হাতের গেলাস মেঝেয় পড়ে গেল। যুবরাজ অবাক! পরিচারক, পরিচারিকারা অবাক। কৃতান্ত গর্জন করে বললেন,—ন্যাপলা! তুই এখানে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তাবাবু।

কৃতান্ত রেগে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন,—গেট আউট। গেট আউট।

কাল রাত্তিরে চায়ের নামে শুকনো কচুরিপানার শেকড়সেদ্ধ জল ফুটিয়ে খাইয়েছিল। এখন এই কাংকালিকা রাজপ্রাসাদে শরবতের নামে নির্ঘাত নর্দমার জল এনেছে। স্বভাব যাবে কোথায়? আসল শরবতটুকু খেয়ে ফেলেছে ব্যাটা। এ ভেজাল মাল।

কৃতান্তের তাড়া খেয়ে যথারীতি নেপাল গ্রাহ্যই করল না। সে মুচকি হাসতে থাকল। যুবরাজ বললেন,—কী হল আর্য? খুলিয়া বলিবেন কি?

কৃতান্ত হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন,—এই দুবৃত্ত, দুর্জন ছোকরাকে এখনই বিদায় করুন যুবরাজ। এ ব্যাটা ভেজালরাজের গুপ্তচর।

অমনি যুবরাজ ফুঁসে উঠলেন,—কী! ভেজালরাজের গুপ্তচর? আমার প্রাসাদে? সর্বনাশ! ভেজালরাজ ঝুনঝুনওয়ালা গুলঞ্চ প্রসাদ যে আমাদের শত্রু। এই কে আছো! ইহাকে বন্দি করো।

দুজন কালান্তক চেহারার প্রহরী এসে নেপালকে ধরে ফেলল। নেপাল তাও মুচকি-মুচকি হাসে যে। কৃতান্ত চেঁচিয়ে উঠলেন,—আবার হাসি হইতেছে? যুবরাজ! দেখিতে পাইতেছেন কি দুবৃর্ত্ত এখনও অম্লানবদনে হাসিতেছে?

যুবরাজ আরও রেগে হুকুম দিলেন,—উহাকে এইখানেই বধ করো। এই মুহূর্তে দুর্বৃত্তের মস্তক ছেদন করো।

ওরে বাবা! সে বড় রক্তারক্তি কাণ্ড! এখানেই মুন্ডু কাটবে? কৃতান্ত ঘাবড়ে গেলেন। চোখ বুজে ফেললেন। নেপালটা কী গাড়োল! কেন এখনও ক্ষমা চাইছে। না? দেখো দিকি, কী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এতখানি হবে, ভাবতে পারেননি কৃতান্ত।

হঠাৎ তাঁর কানে এল—হ্যাঁ বউমারই গলা, তাতে কোনও ভুল নেই।—কী হইল? কী হইয়াছে? আমার নেপু কী অপরাধ করিয়াছে শুনি?

চোখ খুলেই কৃতান্ত দেখতে পেলেন। বড়বউমাই বটে। কিন্তু এ কী বেশ! এ যে একেবারে রাজ্ঞীর পোশাক পরনে! মাথায় সোনার মুকুট পর্যন্ত। এসে যুবরাজের সামনে হাত-মুখ নেড়ে ফের বলে উঠল,—নেপু আমার পিতার দেশের ভৃত্য। উহার মস্তক ছেদন করিলে আমি পিত্রালয়ে যাত্রা করিব, বলিয়া দিতেছি —হ্যাঁ!

যুবরাজ বললেন,—কিন্তু ও যে ভেজালরাজের গুপ্তচর।

বউমা বলিল,—হাতি! ঘোড়া! তোমার শ্রেষ্ঠীরাই ভেজালরাজের গুপ্তচর!

যুবরাজ্ঞীবেশিনী বউমা আবার বলল,—এই তো আমি পাকশালা হইতে আসিতেছি। শ্রেষ্ঠীর বিপণী হইতে যে ঘৃত পাঠানো হইয়াছে, উহা ঘৃত নহে, অন্য কোনও বস্তু।

বন্দি নেপাল বলল,—ডালডাও নহে। জলহস্তীর চর্বি।

যুবরাজ গর্জন করে বললেন,—কে আছো? শ্রেষ্ঠীকে বন্দি করিয়া লইয়া আইস।

এবার যুবরাাজের মুখের দিকে তাকিয়ে কৃতান্তবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

—প্রতুল! তুই!

—হ্যাঁ পিতা।

—ওরে হতভাগা। এতক্ষণ কহিস নাই কেন? আমি যে তোকে চিনিতে পারি নাই!

বড়ছেলে আর বড়বউমা টিপ করে একসঙ্গে কৃতান্তের পায়ে প্রণাম করতেই সব রাগ জল হয়ে গেল কৃতান্তের। আশীর্বাদ করে বললেন—সুখমস্তু! চিরজীবি হও!

তারপর নেপালও প্রহরীদের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে তাঁর পায়ে একটি প্রণাম ঠুকে বলল,—অপরাধ লইবেন না কর্তামশায়! আসুন, আপনাকে উৎকৃষ্ট চা পান করাইতেছি।

এই সময় বাইরে ভেরি, তুরি, কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল। একজন দৌবারিক ঘরে ঢুকে প্রণাম করে বলল,—মহারাজ! আপনি ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া কাংকালিকার প্রজাবৃন্দ আপনার দর্শনপ্রার্থী।

কৃতান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ছ্যা-ছ্যা, এই ধুলোময়লা নোংরা পাঞ্জাবি-ধুতি পরে কি প্রজাদের দর্শন দেওয়া যায়? কাঁধের ঝোলাটা ফেলে দিয়ে বললেন,—কে আছো? আমাকে উৎকৃষ্ট রাজবেশ পরাইয়া দাও।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাণ্ড রেকাবে রাজবেশ নিয়ে পরিচারকবৃন্দ এসে দাঁড়াল। নেপাল একগাল হেসে বলল,—আমি মহারাজের মস্তকে মুকুট পরাইব।

ইচ্ছে হয়েছে তো পরাক না। নেপাল ছেলেটা তো এমনিতে খারাপ নয়। বড় মধুর মিষ্টি স্বভাব। আসলে ভেজালরাজের চেলারা জিনিসিপত্রে ভেজাল দিলে ও বেচারা করবে কী?

বাইরে তুমুল বাদ্য বাজছে। প্রজারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে। নেপাল কৃতান্তের মাথায় মুকুট পরিয়ে বলল,—এবার সুশীতল জল আনয়ন করি মহারাজ। আপনি তৃষ্ণার্ত।

দেরি হল না। নেপালচন্দ্র জলভরা সোনার গেলাস রূপোর রেকাবে রেখে সামনে তুলে ধরল। কৃতান্ত তৃষ্ণার্ত। হাত বাড়ালেন। হাতটা হঠাৎ বড় ভারী লাগছে। হ্যাঁ, লাগবেই তো। সোনা হীরে মানিক বসানো রাজপোশাক। ওজন আছে।

বাইরে প্রজার মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি দিচ্ছে—জয় মহারাজ কৃতান্তদেব। তুরি, ভেরি কাড়ানাকাড়া বাজছে। তারপর কী একটা ঘটল। ঠিক বুঝতে পারলেন না কৃতান্ত। কিন্তু গুরুতর কিছু নিশ্চয় ঘটল।

কারণ কৃতান্তবাবুর মনে হল আচমকা বুঝি আছাড় খেয়েছেন। খেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

কোথায় কী! কোথায় কাংকালিকা রাজপ্রাসাদ। কোথায় রাজপোশাক, ন্যাপলা, প্রতুল, বউমা, পরিচারক-পরিচারিকা, বীণা বাদক-বাদিকা, গায়ক-গায়িকা! কোথায় বা পেল্লায় চেহারা কালান্তক প্রহরীরা!

তবে ধু-ধু রোদ্দুরে নয়, ছায়াতেই শুয়ে আছেন। গাছটা বটগাছ। ডালে অজস্র পাখি লাল টুকটুকে বটফল ঠোকরাচ্ছে।

আর হ্যাঁ, আকাশের নিচু দিয়েই একটা এরোপ্লেন যাচ্ছে। তুরি ভেরি কাড়ানাকাড়া নয়। নিছক এরোপ্লেন।

আর কৃতান্তের পরনে ধূলিধূসর সেই পাঞ্জাবি-ধুতি, পায়ের পাম-শুজোড়া ব্যাগের তলায় রাখা আছে। ব্যাগটা দিব্যি বালিশ করে বটতলার শুকনো ঘাসে শুয়ে আছেন।

তাহলে নিছক স্বপ্নই দেখছিলেন।

দুঃখে ও রাগে মন খারাপ হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। কোনও মানে হয়? কৃতান্ত উঠে বসে হাই তুললেন। পাকারাস্তাটা দূরে দেখা যাচ্ছে। হু-হু রোদ্দুরে কাচের মতো ঝকঝক করছে।

তাহলে কাঁচারাস্তায় আনমনে হাঁটতে-হাঁটতে কখন এই বটতলায় পৌঁছে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু তেষ্টায় গলা কাঠ। এখনই জল খাওয়া দরকার। কৃতান্ত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দেখলেন, বটগাছেরই ডালে কে যেন বসে আছেন। আঁতকে উঠলেন সঙ্গে-সঙ্গে! কালো কুচকুচে একটা লোক এখানে বসে কী করছে?

ভূতপ্রেত নয় তো? কিছু বলা যায় না। বৈকুণ্ঠের এই দেশে সব সম্ভব। কাঁপা-কাঁপা গলায় কৃতান্ত বললেন,—কে? কে ওখানে?

ভূত অথবা লোকটা ঘুরে বসল। কালো মুখে সাদা দাঁত ঝকমক করছে। হাসছে না, ভয় দেখাচ্ছে?

কৃতান্ত ভয় পেয়েছেন বলেই ধমক দিতে পারলেন,—দাঁত বের করছ কেন বাবা? অ্যাঁ? হনুমানের মতো ডালেই বা বসে আছো কেন শুনি?

না, ভূত নয়। নাকিস্বরে কথা বলল না। লোকটা বলল,—আজ্ঞে, পাকা বটফল পাড়ছি।

—বটফল? খায় বুঝি?

—আজ্ঞে, পাখপাখালিতে খায়; আমি একটা পাখি পুষেছি কিনা। তার জন্যে বটফল পাড়ছি।

—তা বেশ করছ। এখানে জল আছে কোথায় বলতে পারো?

জল? এই যে এখানে একটা দিঘি আছে। —লোকটা কথা বলতে-বলতে নেমে এল গাছ থেকে। এসে করজোড়ে প্রণামও করল।—

—আপনি শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন দেখলুম। তা কোত্থেকে আসছেন বাবুমশাই? কোথায় যাবেন?

—কলকাতা থেকে। যাব কাঁকুলিয়া।

—কাঁকুলে? সে তো এখনও দু-মাইলটাক পথ বাবুমশাই।

—বলো কী হে। তা এ জায়গাটার নাম কী?

—বাজে-কাঁকুলে আজ্ঞে।

—বাজে-কাঁকুলে! সে আবার কী হে?

—আজ্ঞে বাবুমশাই, শুনেছি—কোন আমলে নাকি এখানেই আসল গেরামটা ছিল। এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। লোকে বলে বাজে-কাঁকুলে।

কৃতান্ত উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—তোমার বাড়ি কোথায়।

লোকটা জবাব দিল,—আমার বাড়ি আজ্ঞে কাঁকুলের পাশে আঁদুলে।

কী অদ্ভুত নাম সব। কাঁকুলে-আঁদুলে। ধুঁদুলে নামেও হয়তো গ্রাম আছে, বলা যায় না। কৃতান্ত মনে-মনে হেসে বললেন,—ওহে! আমাকে দিঘিটা দেখিয়ে দিয়ে এসো তো!

অমনি লোকটা হাতজোড় করে বলল,—ক্ষমা করবেন বাবুমশাই! আমি যেতে পারব না। ওই তো দেখা যাচ্ছে উঁচু পাড়—আপনি চলে যান। খুব ভালো জল আছে। টলটলে কালো জল। ঘাটও পাবেন।

কৃতান্ত একটু অবাক হয়ে বললেন,—কেন যেতে পারবে না?

লোকটা জবাব না দিয়ে আবার বটগাছে গিয়ে উঠল। অদ্ভুত লোক তো! বৈকুণ্ঠের দেশের লোক কিনা। এমনিই তো হবে। মনে-মনে গজগজ করতে-করতে কৃতান্তবাবু দিঘির পাড় লক্ষ করে এগিয়ে চললেন।

ক্ষয়াখর্বুটে ঝোপঝাড় গাছপালার জঙ্গল পেরিয়ে পাড়ে উঠে দেখলেন, প্রচুর ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি আর তার আগাছা গজিয়ে রয়েছে। ঘাটটাও পাথরে বাঁধানো। ধাপগুলো ভাঙাচোরা। শ্যাওলা জমে আছে। বিশাল দিঘিটা দামে ভর্তি। তাহলে কি এখানে ঐতিহাসিক যুগে এক সময় সত্যি-সত্যি রাজপ্রাসাদ ছিল?

সে পরে হবে। আপাতত জলতেষ্টা মেটানো যাক। সত্যি, জলটা যাকে বলে কাজলবর্ণ। স্বচ্ছ। আঁজলায় জল তুলে প্রাণভরে পান করলেন কৃতান্ত। সূর্য এখন একটু ঢলেছে। হাত-ঘড়িতে বেলা দেড়টা বাজে।

জল খেয়ে মুখ কাঁধ-হাত-পা রগড়ে ধুলেন কৃতান্ত। আঃ কী আরাম। বরং আরও কিছুক্ষণ ওই বটতলায় বিশ্রাম করে রোদের তেজ কমলে বৈকুণ্ঠের গ্রামের দিকে রওনা হবেন।

আরামে নিশ্বাস ফেলে কৃতান্ত ঘুরে সিঁড়ির ধারে পা ফেলেছেন, সেই সময় ধুপধাপ শব্দ হল সিঁড়ির ওপর দিকে। তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন কৃতান্ত।

রাত হলে কিছু বলার ছিল না। এ যে একেবারে দিনদুপুর! উজ্জ্বল রোদ্দুর।

তাছাড়া তখন না হয় ঘুমোচ্ছিলেন বটতলায়, তাই স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু এখন? এখন তো স্বপ্ন নয়। তাহলে?

ঘাটের মাথায় সার-সার দাঁড়িয়ে আছে তিন-তিনটে কঙ্কাল।

হ্যাঁ, পুরোদস্তুর কঙ্কাল।

তারপর তারা চেরা-গলায় অমানুষিক চেঁচিয়ে উঠল,—পেঁয়েছি! পেঁয়েছি! পেঁয়েছি!

তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কৃতান্তের ওপর।

কৃতান্ত টের পেলেন তাঁকে অসম্ভব ঠান্ডা হাড়ের হাতে চ্যাংদোলা করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনবরত খট্‌খট্‌-খটাখট্‌ শব্দও শোনা যাচ্ছে।

না—অজ্ঞান হলেন না। অজ্ঞান হওয়ার অভ্যাস নেই কৃতান্তের। ভয় পেলে

মানুষের অজ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক। কৃতান্ত ভয় পেয়েছেন বললে ভুল বলা হবে। কারণ, এ ব্যাপারটাও চরম মুহূর্তে স্বপ্ন বলে মেনে নিয়েছেন। এবং স্বপ্নে মুন্ডুই কাটা যাক, আর ভূতেই ঘাড় মটকাক, ক্ষতি কী?

বরং এই গরমে ঠান্ডা হাড়ের ছোঁয়ায় আরামই লাগল। কৃতান্ত চোখ বুজে থাকলেন। দেখা যাক্ না স্বপ্নটা শেষ অবধি কোথায় দাঁড়ায়।...

কিন্তু একি সত্যি-সত্যি স্বপ্ন?

কঙ্কালগুলো কৃতান্তবাবুকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে একটা ভাঙা ঘরে ঢুকল। তারপর দুম করে ফেলে দিতেই আছাড় খেলেন কৃতান্ত এবং ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলেন। অতএব এটা স্বপ্ন নয়।

আছাড় খেলেই তো স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার কথা। এতকাল কত ভীষণ সব স্বপ্ন দেখেছেন এবং আছাড়ও খেয়েছেন। তারপর দেখেছেন খাটের নিচে পড়ে গেছেন। ঘুমও ভেঙেছে।

এটা স্বপ্ন নয়। আসলে বৈকুণ্ঠবাবুর কাঁকুলিয়া গ্রামের ব্যাপারটাই এমনি বিদঘুটে। এ এক সৃষ্টিছাড়া দেশ।

কৃতান্ত আছাড় খেয়ে ব্যথায় কাতরে উঠলে কে নাকিস্বরে বলল,—লাঁগল নাঁকি ভাঁয়া?

ঘরের দেয়াল ভাঙা, ছাদও ফাটলধরা। তার ফাঁকে যেটুকু আলো আছে তাতেই কৃতান্ত অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা কঙ্কাল।

কঙ্কালের মুখে ভাঁয়া বলা সহ্য করা যায় না। কৃতান্ত দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন,—থাক, আর সিমপ্যাথি দেখাতে হবে না। কে হে তুমি? এমন করে এদের পাঠিয়ে আমাকে জবরদস্তি ধরে আনলে। একি মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি?

কঙ্কালটা হিহি করে হেসে উঠল। তারপর বলল,—সেঁ কিঁ ভাঁয়া! আঁমায় চিনতে পাঁরছ না? আঁমি বৈকুণ্ঠ।

অ্যাঁ! বলে কী ব্যাটাচ্ছেলে ভূত! বৈকুণ্ঠ এখনও দিব্যি বেঁচেবর্তে আছেন। ভাগ্নেকে গিয়ে এগ্রিকালচার ফার্ম খুলেছেন। কৃতান্ত হাত তুলে বললেন,—থাপ্পড় মারব বলে দিচ্ছি। ইয়ার্কির জায়গা পাওনি?

কঙ্কাল আবার হিহি করে হেসে উঠল। বলল,—মাঁইরি কেঁতো, তোঁমার দিঁব্যি। আঁমি তোঁমার বঁন্ধু সেঁই বোঁকা!

কৃতান্ত গোঁ ধরে বললেন,—মুখে বললে তো চলবে না। প্রমাণ চাই।

এদিকে যে তিনটে কঙ্কাল কৃতান্তবাবুকে ধরে এনেছে, তারা এতক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। এবার তাদের একজন চেঁচিয়ে উঠল,—ওঁরে বাঁবা, এঁ যেঁ প্রমাণ চাঁইছে।

আরেকজন বলল,—তাঁহলে তোঁ মুশকিল বেঁধে গেঁল রে!

তৃতীয়জন বলল,—কিঁচ্ছু নাঁ রেঁ! আঁয় আঁমরা এঁর মাঁথায় গাঁট্টা মারি। তাঁহলে প্রঁমাণ চাঁইবে না।

বৈকুণ্ঠবাবুর পরিচয় দিচ্ছিল যে কঙ্কালটা, সে বলল,—ওঁহে এবাঁর মাঁথা বাঁচাও! বলে সে হাড়ের হাতে তালি বাজিয়ে হিহি করে হাসতে লাগল।

তারপরই ভীষণ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। কৃতান্তবাবু বুড়োমানুষ হলে কী হবে? এখনও গায়ে জোর আছে। যৌবনে দস্তুতরমতো ডনবৈঠক ভাঁজতেন। ফুটবলও খেলতেন। বক্সিং, জুডো এসবেও অল্পস্বল্প হাত ছিল। ওরা হাড়ের হাতে গাঁট্টা মারতে আসার সঙ্গে-সঙ্গে এক প্যাঁচে সবাইকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। একজন তো উঁহু-হু করে ককিয়ে উঠল।

তারপর কৃতান্ত ধুন্ধুমার যুদ্ধ বাধিয়ে ফেললেন। স্রেফ ঘুসির চোটে কঙ্কালগুলোকে কোণঠাসা করে দিলেন। এমন আজব বক্সিং ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলির লড়ারও সাধ্য ছিল না।

হ্যাঁ, খটখটে হাড়ে ঘুঁষি মারলে হাত ব্যথা তো করবেই। তাই বলে কৃতান্তবাবু দমবার পাত্র নন।

দেখা গেল, ভূত বা কঙ্কালগুলো বক্সিংয়ে একেবারে আনাড়ি। ওদের রাজ্যে বক্সিং নেই সম্ভবত। কাতুকুতু আছে। ঘাড় মটকানো আছে। চোখে আঙুল দেওয়া আছে। বক্সিং নেই। অবশ্য একটু-আধটু জুডো থাকলেও থাকতে পারে।

ঘুসির চোটে শেষ অবধি জানালা-দরজা গলিয়ে চারটে কঙ্কালই পালিয়ে গেল। তারপর হাত ব্যথা করতে থাকল কৃতান্তের।

তা করুক। ভূতের সঙ্গে লড়াইতে জিতেছেন। এই গর্বে বুক ফুলিয়ে বেরুলেন।

বেরিয়ে দেখেন দিঘির ঘাটের কাছে সেই বটগাছের লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখে সে আগের মতো দাঁত বের করে হাসল।

কৃতান্ত তার কাছে গিয়ে বললেন,—হাসি কীসের? অ্যাঁ? তখন খুব তো দিঘি দেখিয়ে দিয়েই হনুমানের মতো গাছে চড়ে বসলে। ব্যাপার কী?

লোকটা চাপাগলায় এবং চোখ নাচিয়ে বলল,—ওনাদের দেখা পেলেন নাকি বাবুমশাই!...ওনাদের ভয়েই তো আমি আসিনি।

—এখন এলে যে?

—আজ্ঞে, পরে ভেবে দেখলুম আপনি বিদেশি মানুষ। একা কোনও বিপদে পড়লেন নাকি। তাই এলুম। তা বাবুমশাই, ওনারা কেউ আসেনি?

কৃতান্ত ফের ঘাটে হাত ধুতে নামছিলেন। ছ্যাঃ, কঙ্কালের গায়ের ছোঁয়া লেগেছে, স্নান করতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু বিদেশ-বিভুঁয়ে পুকুরের জলে স্নানের অভ্যাস নেই। ঠান্ডা লেগে অসুখ-বিসুখ হতে পারে। তাই হাতদুটো রগড়ে ধোবেন!

হাত ধুতে-ধুতে কৃতান্ত লোকটার কথার জবাব দিলেন। —ব্যাটারা এসেছিল হে। বুঝেছ? এলে কী হবে? হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছি।

লোকটা খুশি হয়ে বলল,—ভালো করেছেন আজ্ঞে। খুব ভালো করেছেন।

কৃতান্ত এত কাণ্ডের মধ্যেও কাঁধের ব্যাগ কিন্তু ফেলেননি। তার ভেতর থেকে

তোয়ালে বের করে হাত মুছে বললেন,—যাকগে। তোমার বাড়ি তো বৈকুণ্ঠবাবুদের পাশের গাঁয়ে বলছিলে। চলো তো আমায় রাস্তা দেখিয়ে দেবে।

—কী বললেন বাবু?

—বৈকুণ্ঠবাবু। কাঁকুলিয়ার বৈকুণ্ঠ তলাপাত্রের নাম শোনোনি?

লোকটা চোখ কপালে তুলে বলল,—বৈকুণ্ঠবাবু? মানে কাঁকুলের বোকা বাবুর কাছে যাবেন? ও বাবুমশাই, উনি যে গতকাল মারা গেলেন!

—অ্যাঁ! মারা গেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ওনার ভাগ্নেবাবুরা কাল সন্ধেবেলা ওই শ্মশানে ওনাকে পুড়িয়ে গেলেন যে! —বলে লোকটা দিঘির অন্যপাড়ে একটা ঝোপ ঝাড় ও শিমূলগাছের দিকে আঙুল তুলল।—ওই যে দেখছেন, ওটাই শ্মশান।

কৃতান্তবাবু আস্তে-আস্তে ঘাটে বসে পড়লেন। তাহলে সত্যি-সত্যি বৈকুণ্ঠের আত্মা বা ভূত কঙ্কালের রূপ ধরে দেখা দিয়েছিল তখন। তিনি প্রমাণ চেয়ে বসে খামোকা ঝামেলা বাধালেন।

আহা, বেচারা বৈকুণ্ঠকেও এন্তার ঘুসি মেরেছেন। না জানি কত ব্যথা সে পেয়েছে। বন্ধুর শোকে এবং তার ভূতের ব্যথা পাওয়ার দুঃখেও বটে, কৃতান্তবাবু কেঁদে ফেললেন,—ওরে বোকা রে। তোকে খামোকা কেন অত ঘুসি মারলুম রে।...

লোকটা সহানুভূতি দেখিয়ে বলল,—আহা! কাঁদবেন না বাবুমশাই। আমারও কান্না পাচ্ছে যে। কাকেও কাঁদতে দেখলে আমারও কান্না পায়।

তারপর সে-ও বিকট ভ্যাঁ করে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে কৃতান্তবাবু উঠে থাপ্পড় তুলে তার গালে মারলেন। —আমার বন্ধুর মরেছে এবং ভূত হয়েছে—আমি কাঁদতে পারি। তাই বলে তুই ব্যাটা কাঁদবার কে?

কিন্তু থাপ্পড় মেরেই দেখলেন—এতক্ষণে দেখলেন যে যাকে থাপ্পড় মেরেছেন, সে আর কেউ নয়, স্বয়ং নেপাল। তাঁর বউমার আদরের চাকর নেপু।

ব্যাপারটা কী—

ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়।

থাপ্পড় সত্যি তিনি নেপালচন্দ্রকেই মেরেছেন। তবে সেটা ওর গায়ে লাগেনি। লেগেছে চায়ের কাপে এবং কাপটা উল্টে গেছে। ঝনঝন শব্দ হয়েছে। বড়বউমা দৌড়ে এসেছে। নাতি-নাতনিরাও এসে পড়েছে।

নেপাল বলল,—দিলেন তো চা-টা ফেলে। অত ভালো চা সেই নিউমার্কেট থেকে খুঁজে আনলুম আপনার জন্যে। কাল সন্ধেবেলা বাজে চা খেয়ে বকাবকি করলেন বলে তক্ষুনি দৌড়েছিলুম নিউমার্কেটে। ভেবেছিলুম সকালবেলা কর্তাবাবুকে যদি ফাস্টকেলাস চা না খাওয়াতে পারি তো আমার নাম নেপালই নয়।

কৃতান্তবাবু ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

হ্যাঁ, নিজের ঘরের খাটেই সব কিছু ঘটেছে। তবে আগে এখনই টেবিলে রাখা

চিরকুটটা হাতসাফাই করা দরকার। সেই যে লেখা আছে ঃ আমাকে বৃথা খুঁজিও না। পাইবে না।' রাতে মনের দুঃখে লিখে রেখেছিলেন। ভোরবেলা কেউ ওঠার আগে কেটে পড়ার মতলব করে শুয়ে পড়েছিলেন। তারপর কত কী ঘটেছে। স্বপ্ন ভেবেছিলেন, কিংবা স্বপ্ন নয় তাও—ভেবেছিলেন এ সবই স্বপ্নের মধ্যে ভাবা।

চিরকুটটা মুঠোয় লুকিয়ে ফেলে কৃতান্ত ছেলেমানুষের মতো হাসলেন। বললেন,—কী সব স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে হাত ছুড়ে চায়ের কাপ ফেলে দিয়েছি। বুঝলে বউমা?

বউমা হাসি চেপে চলে গেল। নাতি-নাতনিরা বলল,—কী স্বপ্ন? কী স্বপ্ন দাদুভাই?

কৃতান্ত বললেন,—শুধু কি স্বপ্ন? স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন। তার ভেতর স্বপ্ন। আয়নার ভেতর আয়না। তার ভেতর যেমন আয়না। বুঝলে তো?

এই সময় বাইরের ঘরে কে চড়া গলায় বলল,—কেতোভায়া, আছো নাকি?

কৃতান্ত আশ্বস্ত হয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন,—এসো, এসো বৈকুণ্ঠ এসো। আজ রাত্রে কী হয়েছে শোনো। অদ্ভুত সব স্বপ্ন—

বৈকুণ্ঠ ঘরে ঢুকে বললেন,—পরে শুনব ওসব। কই, তুমি তো গেলে না। সন্ধেবেলা কলকাতা এসেছি। এসেই ঠিক করেছিলুম সকালে তোমার বাসায় আসব। তা এত বেলা অবধি শুয়ে থাকো আজকাল? বাতে ধরবে যে।

কৃতান্ত হাসতে-হাসতে বললেন,—আরে আগে স্বপ্নটাই শোনো না। দেখলুম, তুমি মারা গেছ—আর—

বৈকুণ্ঠবাবু হোহো করে হেসে বললেন,—এ তো আমার পক্ষে সুস্বপ্ন। কারুর মারা যাওয়ার স্বপ্ন দেখা মানেই তার আয়ু বাড়ল।

কৃতান্ত হাতের মুঠো দেখছিলেন। কিন্তু ব্যথা করছে যে? স্বপ্নে ঘুসি মারলে তো ব্যথা লাগা উচিত নয়।

অবশ্য নেপালের চায়ের কাপে হাত ছুড়েছিলেন। কিন্তু তাতে ব্যথা হওয়ার কথাই ওঠে না। তাহলে?

কৃতান্তবাবু উদ্বিগ্ন হলেন। এবার যা দেখছেন, এও আগের স্বপ্নের মধ্যে আরেকটা স্বপ্ন নয় তো? যেমন আয়নার ভেতর আয়না, তার ভেতর আবার আয়না।

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন,—কী হল ভায়া? হাতে কী হল? ব্যথা নাকি? চলো, আমার সঙ্গে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো। আমাদের কাঁকুলিয়ায় ভালো কবরেজ আছেন। চিন্তা নেই।

কৃতান্ত নিস্তেজ ভঙ্গিতে বললেন,—ও কিছু না।

তারপর আবার দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন। এও যদি স্বপ্ন হয়?

হুঁ, এটা যে স্বপ্ন নয়, তার প্রমাণ কী? আগের স্বপ্নে এই বৈকুণ্ঠের ভূত ঠিক কথাই তো বলেছিল। প্রমাণ ব্যাপারটা সত্যি বড় কঠিন। বিশেষ করে নেপাল এইমাত্র যে ভালো চা এনে দিলে দু-কাপ, তা সত্যি অপূর্ব বলেই ধাঁধা ঘুচছে না। নেপালের চা তো এত ভালো হয় না।

ও বেশি দামের চা এনেছে বলে আনে কম দামের। পয়সা মারে। তাই এমন ভালো চা যে খাওয়াবে, তা অবিশ্বাস্যই বলা যায়।

কৃতান্ত চা খেতে-খেতে বললেন,—আচ্ছা বৈকুণ্ঠ, তোমাদের কাঁকুলিয়াকে কি লোকে কাঁকুলে বলে?

বৈকুণ্ঠ বললেন,—হ্যাঁ। তুমি কেমন করে জানলে?

—আচ্ছা, একটা বাজে-কাঁকুলেও আছে কি?

—আছে। জঙ্গলমতো একটা জায়গা—

—সেখানে একটা দিঘি আছে। ভাঙা পাথুরে ঘাট আছে। দক্ষিণ পাড়ে শ্মশান আছে। পুবপাড়ে ভাঙা ঘরবাড়ি আছে। তাই না?

বৈকুণ্ঠ অবাক হয়ে বললেন,—সব ঠিক। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে?

কৃতান্ত আরও উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন,—কাঁচারাস্তার মোড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ আছে।

—আছে বইকী। খুব পুরোনো আমলের বটগাছ। পাঁচশো বছর—

—তোমাদের কাঁকুলের পাশে আঁদুল নামে একটা গ্রাম আছে?

—হুঁ, আছে। কিন্তু তুমি—

কৃতান্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন,—দেখো বৈকুণ্ঠ, আমার মনে হচ্ছে, কোনও গোলমেলে ধাঁধায় আটকে গেছি। স্বপ্নের গোলকধাঁধা বলতে পারো। কিংবা এমনও হতে পারে, আমি আর বেঁচে নেই। পরলোকে চলে এসেছি।

বৈকুণ্ঠ হোহো করে হেসে বললেন,—মাথা খারাপ! কী সব আবোল-তাবোল বলছ!

—তাহলে আমায় একটা চিমটি কাটো তো।

বৈকুণ্ঠ বললেন,—নাঃ! আমার আঙুলে জোর নেই। তবে কাতুকুতু দিতে পারি। দেব নাকি!

—তাই দাও দিকি ভায়া।

বৈকুণ্ঠের কাতুকুতু খেয়ে কৃতান্ত হিহি করে হেসে আকুল হলেন। নাঃ আর স্বপ্ন নয়। নিশ্চয়ই নয়। তাহলে ঘুম ভেঙে যেত।

কিন্তু স্বপ্নে সত্যিকার একটা জায়গা দেখলেন—এর রহস্য কী? হঠাৎ চোখ গেল বালিশের পাশে রাখা বইটার দিকে। তক্ষুনি বুঝলেন কী ঘটেছে। সব মনে পড়ল। কৃতান্তবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে নড়েচড়ে বসলেন। বাপ্‌স! জোর বাঁচা গেল।

বুঝলেন বৈকুণ্ঠও। তিনিই বইটা তুলে নিয়ে দেখে বললেন,—তাই বলো। ও'মালি সায়েবের পুরোনো জেলা গেজেটিয়ার পড়ছিলে রাত্রে? হুঁ—এই যে। আমাদের এলাকার ঐতিহাসিক বিবরণও আছে দেখছি। পাতা মুড়ে রেখেছ। বুঝলে ভাই কেতো? কাঁকুলে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জায়গা। গুপ্তযুগে একসময় এক রাজার রাজত্ব ছিল। তাঁর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। পাঁচশো বছরের অক্ষয় বটগাছ আছে। কত কী আছে। দিঘির ধারে শ্মশানটারই বয়স দুশো বছর হয়ে গেল।

বোতল যখন কোকিল হয়

সকালে থলে হাতে বাজারে যাচ্ছেন বৈকুণ্ঠবাবু! রাস্তায় অনেক দিন বাদে দেখা হল ঘোঁতনবাবুর সঙ্গে। —এই যে ঘোঁতন। কেমন আছো? অ্যাদ্দিন ছিলে কোথায় হে? অ্যাঁ? ব্যাপারটা কী? ইত্যাদি প্রশ্নসূচক বাক্যে অনর্গল জর্জরিত করতে থাকলেন ঘোঁতনবাবুকে! বৈকুণ্ঠবাবুর বরাবর এই অভ্যেস। অনর্গল কথা বলতে পারেন।

ঘোঁতনবাবু কিন্তু কোনও কথাই বলছেন না। চাউনিটা ভারি বিমর্ষ। টাক চুলকোচ্ছেন আর চুলকোচ্ছেন এবং মাঝে-মাঝে কান খাড়া করে কী শুনছেন। তখন মুখের ভাবটা বিকৃত দেখাচ্ছে।

তখন বৈকুণ্ঠবাবু তাঁর পেটে আঙুলের গুঁতো মেরে বললেন,—মুখে কি বোবায় ধরল ঘোঁতন? কথা বলছ না কেন? সব জিনিসের দাম বেড়েছে বলে বুঝি কথারও দাম বাড়াতে চাইছ?

গুঁতো খেয়েই যেন মুখে কথা ফুটল ঘোঁতনবাবুর! একটু ম্লান হেসে বললেন,—এমন সময় তুমি আমাকে জেরা করছিলে, যখন আমার জবাব দেওয়ার উপায়ই ছিল না—এখন যা জিগ্যেস করবে করো, বলছি।

অবাক হয়ে বৈকুণ্ঠবাবু বললেন,—তার মানে, এতক্ষণ তো খালি টাক চুলকোচ্ছিলে ভায়া।

ঘোঁতনবাবু চাপাগলায় বললেন,—না। তখনি আমি কোকিলের ডাক শুনছিলুম, বুঝলে? তোমার গুঁতো খেয়ে সে-ডাক থাকল।

বলো কী! —বৈকুণ্ঠবাবু হতভম্ব হয়ে বললেন,—এ হেঁয়ালির অর্থ কী ভায়া? নাকি রসিকতা করছ? তুমি তো কোনওদিনই রসিক লোক ছিলে না!

সত্যি বলছি বৈকুণ্ঠ। কোকিলের ডাক শুনছিলুম। —ঘোঁতনবাবু গম্ভীরমুখে বললেন, সেই কলেজ স্ট্রিটের মোড় থেকে ডাকতে শুরু করেছে। এই বৈঠকখানায় এসে থামল। তাও ভাগ্যিস তুমি গুঁতো মারলে, তাই। নইলে মৌলালির মোড় অবধি সমানে ডাক চালিয়ে যেত।

বৈকুণ্ঠ আকাশ থেকে পড়তে-পড়তে বললেন,—কোকিল! কার কোকিল? কীসের কোকিল? কোথায় কোকিল?

এবার ঘোঁতনবাবু বৈকুণ্ঠবাবুর একটা হাত ধরে টানলেন।—সে এক ইতিহাস ভাই বৈকুণ্ঠ। একটু নিরিবিলিতে এসো। সংক্ষেপে মোটামুটি বলছি।

বাজার করে নিয়ে গেলে রান্না হবে এবং তাই খেয়ে বৈকুণ্ঠ আপিস যাবেন। অতএব তাড়া ছিল। কিন্তু ঘোঁতনের মতো রাশভারী মানুষ কোকিল-টোকিল নিয়ে রসিকতা করবেন, এ অসম্ভব। নিশ্চয় গুরুতর এবং রহস্যময় কিছু ঘটেছে। তাই বৈকুণ্ঠ আড়চোখে হাতের ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে একটু নিরিলিতে গেলেন ওঁর সঙ্গে।

তারপর ঘোঁতনবাবু যা বললেন, তো শুনে তো আঁতকে উঠলেন। ব্যাপারটা হয়েছে এই ঃ

ইদানীং ঘোঁতন ধর্মে-কর্মে মন দিয়েছিলেন। ওঁর সেকেন্ডহ্যান্ড শিশি-বোতলের ব্যবসাটা পৈতৃক। সেই ব্যবসাতে হঠাৎ একগুচ্ছের লোকসান খেয়ে সামলে উঠতে পারেননি। মনের দুঃখে কিছুদিন নানান তীর্থে দেবসন্দর্শনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন! একদিন দক্ষিণ ভারতে এক তীর্থে পুকুরের ঘাটে শুয়ে আছেন। সেই সময়ে স্বপ্নে দেখলেন, জটাজুটধারী প্রকাণ্ড চেহারার এক সাধু এসে তাঁকে একটা বোতল দিয়ে বললেন,—এইটে নিয়ে বাড়ি চলে যা। ঘুম ভেঙে ঘোঁতন কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। একেবারে দুপুরবেলা। মন্দিরের ছায়া ঘাটে এসে পড়ছে। সে ঘাটের ধাপে ঠান্ডা ছায়ায় তিনি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

তারপর তাঁর চোখে পড়ল পায়ের কাছে নিচের ধাপে একটা বোতল গড়াতে-গড়াতে জলের দিকে যাচ্ছে। অমনি হাত বাড়িয়ে সেটাকে ধরে ফেললেন।

কালো কুচকুচে লম্বা বোতল, খালি। শুঁকে দেখলেন, ভেতরে কেমন একটা মিঠে গন্ধ। মনের জ্বালা জুড়িয়ে গেল। বারবার শুঁকলেন। শুঁকে আশ মেটে না, এমন অবস্থা।

কিন্তু হায়! তখন যদি জানতেন এই বোতলই তাঁর কাল হবে! সাধু দুষ্টুমি করে কী বিপদে না তাঁকে ফেলে দিয়েছেন।

বোতলটা পকেটস্থ করে মহানন্দে চলেছেন ঘোঁতন। মনে হচ্ছে এই পবিত্র বোতল তাঁর চিৎপুরের শিশি-বোতলের দোকানে প্রতিষ্ঠা করলেই ব্যবসা আবার হু-হু করে ফুলে উঠবে। হ্যাঁ, সোনার না হোক, আপাতত একটা চাঁদির পালঙ্ক তৈরি করে তার ওপর শ্রীশ্রীবোতল-দেবকে শুইয়ে রাখবেন এবং দুবেলা ধুপ চন্দন ফুল দিয়ে পুজো করবেন। জয় বাবা বোতলদেব। বোতলদেবায় নমঃ।

মন্দিরের গেট পেরিয়ে কয়েক পা গেছেন, হঠাৎ চমকে উঠলেন। বোতলটা নিচের ঝুল পকেটে ঢোকানো ছিল! সেটা খুব নড়াচড়া করছে। পকেটে হাত ভরতেই একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন ঘোঁতন।

একি! একি! বোতল কোথায়? হাতে যে নরম পালকের মতো কিছু ঠেকছে। ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে পকেটের ফাঁক দেখেন, বোতলটা রূপ বদলে একটা কোকিল হয়ে গেছে। ঠোঁট ফাঁক করলে তার মুখের ভেতরে লালচে জিভ এবং গলা অবধি দেখা গেল। মনে হল কোকিলটা ডাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু আঁটো জায়গায় সুবিধে করতে পারছে না। এবং সেই সময় কোকিলটা তাঁর হাতে বেজায় ঠোক্কর দিতে শুরু করল।

হাত সঙ্গে-সঙ্গে বের করে নিলেন। রক্তারক্তি হয়ে গেছে ডান হাতটা। তখন করলেন কী, পকেটের মুখ চেপে ধরে আটকে রাখলেন এবং দৌড়তে শুরু করলেন।—

যাই হোক, সেদিনই টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে কলকাতা রওনা হলেন ঘোঁতনবাবু। দুদিন দু-রাত জার্নি। কিন্তু একবারও পকেটের মুখ ফাঁক হতে দেননি। কোকিল সারাক্ষণ ছট্‌ফট্ করেছে। মরিয়া হয়ে পকেট চেপে ধরে বসে থেকেছেন ঘোঁতনবাবু। এইভাবে হাওড়া পৌঁছেছেন।

তারপর প্রথমে চিৎপুরের দোকান গিয়ে বন্ধ দরজার তালা খোলেন বাঁ-হাতে। ভেতরে ঢুকে বাঁ-হাতেই দরজা ফের আটকে সুইচ টিপে বাতি জ্বালেন। তারপর পকেট থেকে হাত সরিয়ে নেন। কিন্তু আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য! কোথায় কোকিল! সেই বোতলটাই পকেটে পোরা আছে।

তখন শ্রদ্ধা সহকারে বোতলটা দেয়ালের তাকে গণেশের পাশে বসিয়ে রাখেন। আপাতত ওখানেই সিদ্ধিদাতার পাশে থাকুন। শিগগির একটা চাঁদির পালঙ্ক এনে একটা ভালো জায়গায় প্রতিষ্ঠা করবেন। দেয়াল কেটে নতুন তাক করে নিতেই বা অসুবিধেটা কী?

সেদিনকার মতো এই। দরজা বন্ধ করে বাড়ি ফিরে গেলেন নিশ্চিন্তে। বোতলদেব যদি আবার বেখেয়ালে কোকিলদেব হয়েও ওঠেন, পালাতে পারবেন না। দরজা তো বন্ধ রইল।

এবং পরে যদি দেখেন, সত্যি আবার কোকিল রূপ ধারণ করেছেন তাহলে বরং একটা খাঁচার ব্যবস্থাই করবেন।

করতেও হল ঠিক তাই। পরদিন সকালে গিয়ে দোকান খুলছেন তখনই কানে এল ভেতরে কোকিল ডাকছে। কু-উ-উ—কু-উ-উ—কু-উ-উ। তারপর কুহু-কুহু-কুহু-কুহু-কহু-কুহু—কুক্‌কুক্‌-কুক্‌—কু-কু-কু-কু—

আর দরজা খোলা হল না। তক্ষুনি একটু দূরে একটা হার্ডওয়ার স্টোর্স থেকে মজবুত লোহার খাঁচা কিনে আনলেন। তারপর খুব সাবধানে দোকানে ঢুকেই দরজা আটকে দিলেন। সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে দেখলেন—কোকিলদেব গণেশের পাশেই বসে আছেন এবং উদাস সুরে গান গাইছেন।

পা টিপে পাশ থেকে এগিয়ে খপ করে ধরে ফেললেন তাঁকে এবং খাঁচায় ভরে নিশ্চিন্ত হলেন। খাঁচাটা টাঙিয়ে রাখলেন জায়গামতো।

হ্যাঁ, শিশি-বোতলের ব্যবসা কি আবার জমে উঠল। প্রায়ই নানান কোম্পানি থেকে সেকেন্ডহ্যান্ড শিশি-বোতলের অর্ডার আসে। এসব মাল ঘোঁতনবাবু সস্তায় কেনেন। ওই যে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে শিশি-বোতল কিনে বেড়ায় যারা, তাদের কাছ থেকে কিনে নেন। তারপর ঠিকে কাজের লোক দিয়ে সাফ করিয়ে রাখেন। তাকে, আলমারিতে, মেঝেয়, বস্তায় অজস্র শিশি-বোতল।

এ পর্যন্ত সব ভালোয়-ভালোয় চলছিল। এরপর শুরু হল গোলমেলে ব্যাপার। এক সন্ধ্যাবেলা প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে। দেখতে-দেখতে রাস্তায় জল জমে উঠল। সেই জল ঘোঁতনবাবুর 'জগদম্বা' বোতল ভাণ্ডার-এর চৌকাঠে এসে উঁকি মারল। তখন তিনি তক্তাপোশে ঠ্যাং তুলে বসলেন এবং মনে-মনে বোতলায় নমঃ, কোকিলায় নমঃ জপ শুরু করলেন। তখন বৃষ্টির জল দোকানের ভেতর ঢুকে পড়েছিল। তারপর আর বেরুবার নামগন্ধ নেই। কত কষ্টে যে তাড়ালেন কহতব্য নয়। হ্যাঁ, বোতলবাহিনীর সাহায্যেই তাড়িয়েছিলেন।

তো এদিনও সেই অবস্থা প্রায় তারপর গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো তক্ষুনি লোডশেডিং। ব্যস্! দোকানপাট, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট বিলকুল অন্ধকার। চিক্কুর হেনে বাজ ডাকছে এবং বৃষ্টি সমানে ঝমঝমিয়ে পড়ছে তো পড়ছেই। লোকজনেরা কোথায় মাথা বাঁচাতে ঢুকে পড়ছে। এসব সময় দোকানে চোর-ডাকাতের হামলার ভয় আছে। তাই ঘোঁতনবাবু যথারীতি মোমবাতি জ্বেলে দরজা বন্ধ করে বসে রইলেন।

আর সেই সময় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

খাঁচার কোকিলদেব গান গেয়ে উঠলেন, কুউ—কুউ—কুউ— কুহু কুহু...কুহু কুক্—কুক্—কু—কু—কু!

আর সঙ্গে-সঙ্গে হল কী—তাকে, আলমারিতে, বস্তায়, মেঝেয় যেখানে যত কালো বোতল ছিল, সব কোকিলের গলায় কুহু গাইতে শুরু করল।

দেখাদেখি রংবেরঙের অন্য শিশি-বোতলগুলোও নানান পাখির ডাক ডেকে উঠল। কিচির মিচির—কিচির মিচির—চু চিক্ চিক্ চিক্ চিকি চিকি চিকি—কুচ্ কুচ্—ক্রির্‌র্‌র্ ক্রু ক্রু—কিচ্ কিচ্ কিচ্—চুক্ চুক্ চুক্ চাঁকুক্ চাঁকুক্ চাঁকুক্ চ্যাঁক্ চ্যাঁক!

ঘোঁতনবাবু যেদিকে ঘোরেন, দেখতে পান ঘরভর্তি ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখপাখালি। দোয়েল, শ্যামা, শালিক, ফিঙে, ছাতার, টিয়া, চন্দনা, মৌটুসি, কাদাখোঁচা—কতরকম পাখি! আর তাদের মধ্যে গলা চড়িয়ে গান ধরেছে ওই কোকিলগুলো। গণ্ডায়-গণ্ডায় কোকিল। খাঁচার কোকিল অর্থাৎ শ্রীশ্রীবোতলদেব ওরফে শ্রীশ্রীকোকিলেশ্বর যেন টুকটুকে মুখে মুচকি হাসছেন এবং গাইছেন। বাকি কোকিলরা সুর ধরেছে।

ভয় পেয়ে এক লাফে এগিয়ে দরজা খুলে দিলেন ঘোঁতনবাবু। আর অমনি ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখপাখালি ফরফর করে দরজা দিয়ে বেরুতে শুরু করল। ঘোঁতনবাবু বেগতিক দেখে চোখ বুজে এক-পাশে সরে এলেন এবং ভয়ে বসে পড়লেন। আধমিনিটের মধ্যে ঘর খালি হয়ে গেল। শুধু রইল খাঁচায় বন্দি সেই শ্রীশ্রীকোকিলেশ্বর ওরফে শ্রীশ্রীবোতলদেব—কিংবা বোতলেশ্বর, যিনিই হোন। পালাতেন নিশ্চয়ই—কিন্তু খাঁচায় বন্দি বলেই পারলেন না।

যা হওয়ার হল। এবার বানের জল ঢুকে পুকুরের জল বেরিয়ে যাওয়া। ফতুর হয়ে গেলেন ঘোঁতনবাবু। তার ওপর জুটল এই ব্যারাম। মাথার মধ্যে যখন-তখন সেই কোকিল ডেকে ওঠে। সে কী বিচ্ছিরি ব্যাপার, অন্যে বুঝতে পারবে না। মাথার মধ্যিখানে কোকিলের ডাক নিয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে? খেতে-শুতে শান্তি নেই।

সব শোনার পর বৈকুণ্ঠবাবু দুঃখিত মুখে বললেন,—তাহলে তো বড্ড বিপদে পড়েছ ভায়া। তা সেই খাঁচার কোকিলটা এখন কোথায়?

ঘোঁতনবাবু ফিক করে হেসে বললেন,—সম্প্রতি এক মাড়োয়ারিকে বেচে দিয়েছি।

যাকগে, ভালো করেছ। আপদ গেছে। —বৈকুণ্ঠবাবু এই বলে পা বাড়ালেন।

ঘোঁতনবাবু বললেন,—আপদ গেল কোথায়? কোকিল গেল, কোকিলের ডাকটা যে গেল না। তাই যাচ্ছি মৌলালির দরগায় সিন্নি দিতে।

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন,—হ্যাঁ, তাই যাও ভায়া। কোকিলের ব্যামো ওষুধটষুধ খেয়ে সারবে না। তুমি পিরবাবার দরগায় গিয়ে সিন্নিই চড়াও।

বলে ব্যস্তভাবে হনহন করে বাজারে ঢুকলেন বৈকুণ্ঠবাবু।

অন্যদিনে দরাদরি করে খুব জমিয়ে বাজার করেন। আজ সময়ও কম। ঘোঁতনবাবুর কথা শুনতে-শুনতে বেশ খানিকটা দেরিও হয়েছে। অল্পস্বল্প কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরলেন।

তাঁর মেয়ে ইতি গতকাল বাড়ির সামনে একটা কালো বোতল কুড়িয়ে পেয়েছে। বেশ লম্বা বোতল। কেরোসিন রাখার জন্যে ইতির মা সেটা রান্নাঘরে নিয়ে গেছেন। ইতি বোতলটা ধুয়ে সাফ করার সময় বলছিল,—কেমন মিষ্টি গন্ধ মা। মধুর মতো যেন।

ওর মা বলেছিলেন,—তাহলে মধু-টধুর বোতল!

বৈকণ্ঠবাবু বলেছিলেন,—তোমার মাথা খারাপ? এমন বোতলে আজকাল মধুর কারবার করে না কেউ। সে ছিল সায়েবদের যুগে। আজকাল বেঁটে চ্যাপ্টা শিশিতে মধু ভরে বেচে। ওটা ওষুধের বোতলই বটে। কই রে ইতি, নিয়ে আয় তো শুঁকে দেখি।

হ্যাঁ, শুকেছিলেন। একবার জলভরে ধোয়া হলেও গন্ধটা যায়নি। কিন্তু মজার কথা, গন্ধটা ওষুধের বলে মনে হয়নি বৈকুণ্ঠবাবুর। সত্যি বলতে কী, এমন মনমাতানো গন্ধ জীবনে কখনও শোঁকেননি।

আজ সকালবেলায় বাজার করতে গিয়ে ঘোঁতনবাবুর কাছে বোতল ওরফে কোকিলরহস্য শুনে তাই গোলমালে পড়ে গেছেন বৈকুণ্ঠবাবু।

সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোক তো খাঁচায় ভরা একটা কোকিল কিনেছিলেন ঘোঁতনের কাছে। কিন্তু যা শোনা গেল, কোকিলটার আবার হঠাৎ-হঠাৎ বোতল হয়ে যাওয়ার স্বভাব আছে। তাই কোকিলের বদলে খাঁচায় বোতল দেখে মাড়োয়ারি ভদ্রলোক নিশ্চয় ওটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে যান এবং সেইটেই ইতি কুড়িয়ে এনেছে।

বাড়ি ঢুকে প্রথমে কিচেনের দরজায় থলেটা ধপাস করে ফেললে বৈকুণ্ঠবাবু। তারপর হন্তদন্ত হয়ে বললেন,—বোতলটা কই? বোতলটা?

ইতির মা বললেন,—কোন বোতলটা?

—সেই যে গো, কাল ইতি যেটা কুড়িয়ে আনল।

বৈকুণ্ঠবাবুর কথা শুনে ইতির মা ব্যাজার হয়ে বললেন,—তাই বলো। সে বোতল-বোতল করে পাঁচুর মাকে এইমাত্র তাড়ালুম না? ও ছাড়া আর কেউ নেয়নি। কাল সন্ধ্যাবেলা আঁচলের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। ওই তো ওখানে জলজ্যান্ত রেখে দিলুম। আজ উনুন ধরাবার জন্য টিন থেকে কেরোসিন ঢালতে গিয়ে দেখি বোতলটা নিপাত্তা। তখনই বুঝলুম কার কীর্তি!

ইতি বললে,—কাল সন্ধ্যাবেলা পাঁচুর মা যখন যাচ্ছে, ওর পেটে কী যেন লুকানো ছিল, বাবা!

তার মা ভেংচি কেটে বললেন,—লুকানো ছিল বাবা, তা তখন বলতে কী হয়েছিল ধাড়ি মেয়ে?

বৈকুণ্ঠবাবু হাত তুলে বললেন,—খুব হয়েছে, খুব হয়েছে। চেপে যাও!

চেপে যাব মানে? কী বলছ তুমি? —ইতির মা অবাক!

বৈকুণ্ঠবাবু চোখ নাচিয়ে একটু রহস্যময় হেসে বললেন,—পরে বলব'খন। সে এক অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার। যাক, শত্রু পদে-পদে। আপদ বিদেয় হয়েছে।

ইতির মা হাঁ করে তাকিয়ে থাকার পর, ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বাজারের থলে নিয়ে পড়লেন। এক্ষুনি তো আপিসের ভাত বাড়তে হবে। বৈকুণ্ঠবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সংসারের শতেক জ্বালায় মাথার মধ্যিখানে এমনিতেই এক গুচ্ছের ঝিঁঝিপোকা সারাক্ষণ ডাকে। বাড়তি করে কোকিলের ডাক ঢুকিয়ে কাজ নেই।

তার চেয়ে একটা ভাবনার ব্যাপার ছিল। ঘোঁতনের জগদম্বা বোতল ভাণ্ডারে তো শুধু শিশি-বোতল ছাড়া আর কিছু ছিল না। বৈকুণ্ঠবাবুর ঘরে কোকিলের ডাকের সঙ্গে-সঙ্গে হাড়িকুঁড়ি বাসনপত্র খাট আলমারি কাপড়চোপড় যদি রকমারি জন্তুজানোয়ার হয়ে ডাক জুড়ে দেয়! শিশি যদি পাখপাখালি হয়ে ওঠে, আলমারির বাঘ হতে কতক্ষণ। হাঁড়িগুলো হয়তো ভালুক হয়ে যাবে। বাসনকোসন ঘটিবাটি ইয়াবড় কচ্ছপ আর শামুক হয়ে উঠবে। খাটটা হাতি হয়ে চারঠ্যাং সোজা করে দাঁড়াবে। আলনাটা জেব্রা হয়ে—বাপ্‌স্!

এই সাংঘাতিক দুর্ভাবনার স্রোতে ভাসতে-ভাসতে আচমকা আঁতকে উঠলেন বৈকুণ্ঠবাবু। কোথায় যেন এইমাত্র শুনলেন—কু-উ—কু-উ—কু-উ...

যেন নয়, সত্যি। শোবার ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে স্নানের জন্যে কাপড় বদলাচ্ছেন, আর শুনছেন—কুহু কুহু কুহু কুহু কুক্ কুক্ কুক্ কুক্—কুউ কু কু—

অমনি চেরা গলায় বৈকুণ্ঠবাবু উঠলেন,—বেরোও। বেরোও!

তারপর লাফালাফি হুলুস্থুল কাণ্ড ঘরের মধ্যে। ইতির মা, ইতি দৌড়ে এল।

ইতির মা বললেন,—কী? অমন ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছ কেন? বেরোও বলছ কাকে? লাফালাফি করে তাড়াচ্ছই বা কী?

ইতি অনুমান করে বলল,—বেড়ালটাকে মা। তোমার বেড়ালটাকে।

কী? আমার বেড়াল তোমার শত্তুর? —ইতির মা রুখে দাঁড়ালেন।

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন,—আরে না, না। বেড়াল না।

—তবে কী? কুকুর?

—না। ওই শুনতে পাচ্ছ না?

বৈকুণ্ঠবাবু কান পেতে শান্তভাবে দাঁড়িয়েছেন এবার। ফের বললেন,—ওই শোনো—কুউ কুউ করে ডাকছে না? কু কু কু কু কুহু কুহু কুহু কুহু কুউ-উ-উ।

ইতির মা হেসে ফেললেন।—তাই বলো। কোকিল ডাকছে? তা অমন চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

ইতি বুদ্ধিমতীর মতো বলল,—ও বাবা, এটা যে বসন্তকাল। বইয়ে লেখা আছে বসন্তকালে কোকিল ডাকে, দেখবে, বইটা আনব?

বৈকণ্ঠবাবু উদ্বিগ্নমুখে বললেন,—কিন্তু কোকিলটা ডাকছে কোথায় দেখো তো?

ইতির মা কান পেতে শুনে বললেন,—কই, কোকিল ডাকছে না তো!

—তাহলে ওই যে কুউ কুউ কুহু—কুঃ কুঃ—

মলো ছাই। রেললাইনে ইঞ্জিন হুইসিল দিচ্ছে। কানের মাথা খেয়েছ এ বয়সেই? —বলে ইতির মা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে গিয়ে গজগজ করতে থাকলেন, —কী শুনতে কী শুনছে দেখো তো! এরপর কবে কী দেখতে কী দেখে হুলুস্থুল বাধাবে। এরই মধ্যে বাহাত্তুরে ধরে গেল মানুষটাকে।

হ্যাঁ তাই বটে। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন বৈকুণ্ঠবাবু। শেয়ালদা স্টেশনের শান্টিং ইয়ার্ডে একটা ইঞ্জিন হুইসিল দিচ্ছে। দেখে আশ্বস্ত হলেন। শুনেও তৃপ্তি পেলেন। বাথরুমে ঢুকে মনের আনন্দে ছেলেবেলার মতো বলে উঠলেন—কু-ঝিক্-কু-ঝিক্, কু-ঝিক্ ঝিক্ মিক্ মিক্ মিক্—।

একটু পরে স্নান করে খেতে বসে বললেন,—তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে বলছিলুম। শোনো কী হয়েছে। সেই ঘোঁতন চক্কোত্তিকে মনে পড়ছে? সেই যে চিৎপুরে জগদম্বা বোতল ভাণ্ডার—আমাদের ফটিকের জ্যাঠশ্বশুর।

ইতির মা পাতে গরম ডালের বাটি উপুড় করে দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ বুঝেছি। ফটিক কাল দুপুরে এসেছিল। বলল, জ্যাঠশ্বশুরের মাথার দোষ হয়েছে। ব্যবসায় লোকসান খেয়ে মনে খুব আঘাত পেয়েছিলেন। এখন নাকি খাওয়াদাওয়া ছেড়ে খালি পথে-পথে টোটো করে ঘোরেন। জোর করে ধরে আনতে হয়। শুনে খুব দুঃখ হল। অমন শান্ত আর ভদ্র স্বভাবের মানুষটা। হ্যাঁ গো, একবার গিয়ে দেখে এসো না! তোমার সঙ্গে তো খুব খাতির ছিল।

বৈকুণ্ঠবাবু এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। তাই বটে! সেইজন্যেই ঘোঁতনবাবুকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। পরম নিশ্চিন্ত হয়ে গরম ভাত গিলতে থাকলেন বৈকুণ্ঠবাবু। বাপস্, ঘোঁতন তাঁর মাথায় সেই বোতল ওরফে কোকিলটা প্রায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। পাগল আর বলে কাকে। আসলে হচ্ছে কিনা-কুঝিক্ ঝিক্—কু-ঝিক্ ঝিক্।—কু-ঝিক্ ঝিক্ আর ভুল করে শুনেই ফেলতেন, কুহু কুহু—কুউ কুউ। খুব বাঁচোয়া, বোতলের যদি বা কোকিল হয়ে যাওয়া সম্ভব, ইঞ্জিনের তা সম্ভব নয়। হুঁ, বড়জোর ইঞ্জিনের পক্ষে হাতি হয়ে যাওয়া সম্ভব বটে। তবে একটু মুশকিল আছে। বৈকুণ্ঠবাবু আনমনে ভাতের গ্রাস মুখে দিয়ে ভাবছিলেন, কোকিল মাথায় ঢুকলে মোটামুটি একটা জায়গা পেয়ে যাবে। কিন্তু হাতি? ওরে বাবা, মাথায় হাতি ঢুকে পড়লে সে কঠিন ব্যাপার! অত জায়গা কোথায়?

বৈকুণ্ঠবাবু দুরু-দুরু বুকে পাত থেকে উঠে পড়লেন। বললেন,—ইতি, পুবের জানলাগুলো ভালো করে আটকে দে তো মা। খালি দিনরাত্তির কু-ঝিক্ ঝিক্ আর কু-ঝিক্ ঝিক্।

কালো বেড়াল

এই নিয়ে পরপর তিন দিন। দিন না বলে সন্ধেবেলা বলাই উচিত। জগমোহন বেড়াতে বেরিয়ে ঠিক একই জায়গায় একটা কালো বেড়াল দেখতে পেলেন।

কালো বেড়াল এমন কিছু বিদঘুটে প্রাণী নয়। কিন্তু একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? আর জায়গাটাও তো সন্দেহজনক। গদাইবাবুর আমবাগানে। কিছুদিন আগে যেখানে মোনাই-ফকিরের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল, সেখানেই।

মোনাই-ফকিরের আস্তানা একটু দূরে অবশ্য। সে নাকি লটারিতে অনেক টাকা পেয়েছিল। তারপর ডাকাত পড়েছিল রাত্রিবেলা। সকালে দেখা গেল ফকিরের লাশ পড়ে আছে গদাইবাবুর বাগানের ধারে। ধড়ো আর মুন্ডু আলাদা। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

মোনাই-ফকির কালো আলখাল্লা পরে থাকত। মাথার টুপিও ছিল কালো। গাঁজার নেশায় সব সময় চোখদুটো রাঙা। আস্তানা বলতে একটা পুরানো বাদশাহি আমলের মুসলমান সাধুর কবরের ওপরের পাথরের একতলা ঘর। কবরের পাশেই মোনাই-ফকির খেত, ঘুমোত। ওখানেই তার সংসার আর সাধনভজন। হাটবারে লোকেরা এসে তার কাছে ওষুধ চাইত। ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে চাইত। পয়সাকড়ি দিত।

এহেন ফকিরমানুষ লোভের বশে লটারির টিকিট কিনেছিল। একেবারে নাকি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল। কমপক্ষে লাখ টাকা তো বটে। চারদিকে হইচই পড়ে গিয়েছিল এই খবরে।

কথায় বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ফকিরবেচারা প্রাণে মারা পড়ল।

জগমোহন রোজ নদীর ধার অবধি বেড়াতে যান বিকেলে। সন্ধেবেলা লাঠি ঠুকঠুক করে বাড়ি ফেরেন। ওই সব কথা ভাবতে-ভাবতেই হাঁটেন। আমবাগানের ধারে এসে একবার তাকান জায়গাটার দিকে এবং শিউরে ওঠেন। মনে হয়, আবছা আঁধারে ধড় আর মুন্ডু আলাদা রেখে ফকির শুয়ে আছে এবং মুন্ডুটা যেন মিটিমিটি হাসছে তাঁর দিকে তাকিয়ে।

অমনি জগমোহন চলার গতি বাড়ান। গলার ভেতর রামনাম দু-চারবার হয় না, এমন নয়!

তারপর এক সন্ধেয় হঠাৎ এই কালো বেড়ালের আবির্ভাব। প্রথম দিন বিশেষ গা করেননি। দ্বিতীয় দিন একটু চমকে উঠেছিলেন। তৃতীয় দিন তো ভীষণ ভড়কে গেলেন ফকিরের কালো আলখাল্লার কথা মনে পড়েই।

জগমোহন এই মফস্বল শহরের একজন রিটায়ার্ড উকিল। বয়স হয়ে গেছে। মাথার চুল তুলোর মতো সাদা। বিকেলবেলা কিছুক্ষণ নদীর ধারে পার্কে গিয়ে না

বসলে জীবন বড্ড একঘেঁয়ে লাগে। রাশভারী চেহারার মানুষটি যখন মোটাসোটা ছড়ি অর্থাৎ রীতিমতো লাঠিটি নিয়ে ঠুকঠাক করে হেঁটে যান, পথে সবাই খুব সম্ভ্রম রেখে কথা বলে।

সন্ধেবেলা গদাইবাবুর বাগানের ওদিকটায় রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট থেকে মিটমিটে আলো ছড়ায়। সেই আলোয় কালো বেড়ালের জ্বলজ্বলে হলুদ চোখজোড়া যেন জগমোহনের মনে গেঁথে গেল। সে-রাতে আর ঘুমোতেই পারলেন না। চোখ বুজলেই দেখতেন যেন কালো বেড়ালের হলুদ চোখজোড়া। আতঙ্কে রক্ত ঠান্ডা হয়ে যায় বুঝি।

পরদিন বিকেলে আর একা বেড়াতে যেতে ভরসা পেলেন না। ব্যাপারটা কাকেও যে বলবেন, তাও খুব লজ্জা করে। একসময়কার বাঘা উকিল জগমোহন বেড়ালের ভয়ে কাবু—এ বড় খিটকেলের কথা নয়? সবাই হাসাহাসি করবে, আদালতের তা-বড় তা-বড় দুঁদে হাকিমকে যিনি ভয় পেতেন না, তিনি সামান্য বিড়াল দেখে ভয়ে পেয়েছেন?

নাতি দিবু খুব ডানপিটে ছেলে। সদ্য ক্লাস নাইনে উঠেছে। এরই মধ্যে সবরকম খেলাধূলায় নাম কুড়িয়েছে। জগমোহন দিবুকে আজ সঙ্গে নিলেন। দিবু কি খেলা ছেড়ে বিকেলবেলাটা বুড়ো দারুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার ছেলে? অনেক বলেকয়ে লোভ দেখিয়ে তবে সে রাজি হল। ফেরার পথে মেধোর রেঁস্তোরায় কাটলেট কিংবা অম্বুর মিষ্টান্নভাণ্ডারে যথেচ্ছ রসমালাই খাওয়াবার কথা দিলেন জগমোহন। দিবু কাটলেট আর রসমালাইয়ের ভীষণ ভক্ত।

দিবু যখন সঙ্গে আছে, জগমোহনের তখন ভয় কীসের? এখন তিনি আলেকজান্ডার দি গ্রেট। কই এবার আয় দেখি ব্যাটা কালো বেড়াল অথবা ˆমোনাই ফকির আমার সামনে। মাথা ছাতু করে ফেলব না?

আজ পার্ক থেকে একটু দেরি করেই ফিরছিলেন জগমোহন। দিবুর সঙ্গে আদালতের গল্প করতে-করতে আসছিলেন। কোন হাকিম এজলাসে বসে ঢুলতেন, কোন হাকিম মামলার রায় পড়ার আগে জোর হেঁচে ফেলতেন, এইসব ক্যারিকেচার শুনে দিবু হেসে খুন হচ্ছিল। রাশভারী, গম্ভীর চেহারার দাদুকে এমন রসিকতা করতে শোনেনি সে।

কখন গদাইবাবুর আমবাগানের কাছে এসে পড়েছেন খেয়াল নেই। এসে যেই ডাইনে মুখ ঘুরিয়েছেন আর দেখতে পেয়েছেন সেই বিদঘুটে কালো বেড়ালটাকে। একই ভঙ্গিতে বসে আছে। তীব্র জ্বলজ্বলে হলুদ চোখ। তেমন চাউনি। আর আজ যেন গোঁফের তলায় কেমন একটা হাসিও রয়েছে।

জগমোহন অমনি লাঠি তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন,—মার। মার। মার।

দিবু অবাক হয়ে বলল,—কী হল দাদু? কী হল? কাকে মারতে যাচ্ছ?

জগমোহন হাঁপাত-হাঁপাতে লাঠি তুলে বললেন,—ওই—ওই কালো বেড়ালটাকে।

বেড়াল! —দিবু আরও অবাক। —কই, কোথায় বেড়াল?

—ওই তো! দেখতে পাচ্ছিসনে? ওই যে!

দিবু হাসতে লাগল। —তোমার চোখ খারাপ দাদু। ওটা তো একটা কালো কাঠ পড়ে রয়েছে! সে দৌড়ে গিয়ে একটুকরো কাঠে লাথি মারল।

জগমোহন দেখলেন, বেড়ালটা সত্যি কাঠ হয়ে গেছে। তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে পা বাড়ালেন। মনটা ভালো হয়ে গেল। একেই বলে রজ্জুতে সর্পভ্রম অর্থাৎ দড়িকে সাপ মনে করা। ছ্যা-ছ্যা কী লজ্জার কথা।

কিন্তু কিছুটা গিয়েই হঠাৎ মনে হল, যেন চাপাস্বরে বেড়ালটা ডাকল—মিঁউ! অমনি ঘুরলেন। ঘুরেই আঁতকে উঠলেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

সেই কালো বেড়ালটা পেছন-পেছন আসছে!

জগমোহন ফের লাঠি তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন,—মার! মার! মার!

দিবু এবার রেগে গেল! বলল,—ও দাদু! আবার কী মারতে যাচ্ছ?

জগমোহন কাঁপতে-কাঁপতে বললেন,—বেড়াল! সেই কালো বেড়াল।

—কই বেড়াল?

—ওই তো!

দিবু আরও রাগ দেখিয়ে বলল,—তোমার মুন্ডু। আমি চললুম।

কালো বেড়ালটা এখন একটু সরে গিয়ে রাস্তার পিচে বুক ঠেকিয়ে বসেছে। এ রাস্তাটা খাঁ-খাঁ নির্জন। জগমোহন প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন,—দিবু! দিবু যাসনে। কাটলেট, রসমালাই!

তখন দিবু দাঁড়াল। তারপর হাসতে-হাসতে বলল,—বেড়ালকে এত ভয় কীসের বলো তো? বেড়াল ইজ বেড়াল।

জগমোহন হাঁটেন আর বারবার পিছু ফেরেন। আশ্চর্য! কালো বেড়ালটার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব সেই একই থেকে যাচ্ছে! ভিড়ে-ভরা বড়রাস্তায় পৌঁছে অবশ্য আর তাকে দেখতে পেলেন না।

সেই রাতে জগমোহন অস্থির। চোখে ঘুম নেই।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কালো বেড়ালটাকে তিনি একা দেখতে পান, আর কেউ পায় না। দিবু দেখতে পায়নি তো!

আর তার চেয়েও বড় কথা, দিবুকেও বেড়ালটা গ্রাহ্য করল না। একবার বেমালুম কাঠে রূপান্তরিত হল।

দ্বিতীয়বার তার সামনে অদৃশ্য হয়ে রইল। শুই তাই নয়, জগমোহনকে অনুসরণ করল কতদূর।

অতএব বেড়ালটা সেই মোনাই-ফকিরের আত্মা, অর্থাৎ ভূত। হায়-হায়! এতকাল পরে এই বুড়োবয়সে জগমোহন একটা ভূতের পাল্লায় পড়লেন?

কথাটা যত ভাবছেন, আতঙ্কে রক্ত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে আর কেউ তাঁকে বাঁচাতে পারবে না। ফকিরের ভূত তাঁর গলা কামড়ে ধরবেই ধরবে।

বাড়িটা শহরের শেষপ্রান্তে। জগমোহনের ঘরের পেছনে জঙ্গুলে জায়গা খানিকটা। তার ওধারে সেই নদী! এমন জায়গায় বাড়ি করাই ভুল হয়েছিল।

তার ওপর মশারও খুব উপদ্রব বারোমাস।

তবে একটা সুবিধে হয়েছে দেখা যাচ্ছে। মশারির ভেতর শুয়ে থাকার ফলে রাতের বেলা নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারছেন। বেড়াল হোক আর ভূতপ্রেতই হোক, মশারির ভেতর ঢুকতে পারবে কি? না পারাই উচিত। কোন বইয়ে যেন পড়েছিলেন, মশারির ভেতর মানুষ খুব নিরাপদ!

দেয়ালঘড়িতে টকটক শব্দ। তারপর ঢংঢং করে রাত বারোটা বাজল। আর তারপরই জগমোহন শুনলেন, মিঁউ। অমনি চমকে মুখ তুললেন।

বাইরে অন্য পাশের রাস্তার আলো ত্যারচা হয়ে একটা জানালায় পড়েছে। আর সেখানে ফের আবির্ভূত হয়েছে সেই কালো বেড়াল। জ্বলজ্বলে হলুদ চোখ। মশারির ভেতর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গোঁফের তলায় তেমনি একটা হাসিও। হাসিটা এখন কেমন ক্রূর। কালো বেড়ালটা ফের বলল—মিঁউ।

জগমোহন ততক্ষণে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। বাঁদরের বেলায় যেমন, তেমন ভূতের বেলাতেও এক কথা। বেশি পাত্তা দিতে নেই। পাত্তা দিলেই মাথায় উঠে বসবে। ভূতকে ভয় করলেই ভূত আরও পেয়ে বসবে।

অতএব জগমোহন ভয় চেপেচুপে রেখে সোজা ভেংচি কাটলেন ভূত অর্থাৎ কালো বেড়ালকে,—মিঁউ।

কালো বেড়ালও সঙ্গে-সঙ্গে বলল,—মিঁউ! আর এতক্ষণে জগমোহন টের পেলেন, তিনি বেড়ালের ভাষা বুঝতে পেরেছেন। কী বলছে, ঠাহর হচ্ছে। কালো বেড়াল বলছে,—টাকা।

অ্যাঁ টাকা! জগমোহনের টনক নড়ল। বেড়ালের ভাষায় বলে উঠলেন,— মিঁয়াও! মিঁয়াও! টাকা? কীসের টাকা?

কালো বেড়াল বলল,—ম্যাঁও! ম্যাঁও! কেন? লটারির টাকা?

ওরে বাবা! বলে কী ব্যাটা! লটারির টাকা মানেটা কী?

জগমোহন হতভম্ব হয়ে বললেন,—মিঁই-ই! অ্যাঁ! বলো কী হে?

মিঁ-ও-ও! মিঁ-ও-ও! কেন উকিলবাবু,—আমার লটারিতে পাওনা টাকার কথা ভুলে যাচ্ছেন!

মিঁউ, মিঁউ! কী মুশকিল! তোমার লটারির টাকা তো তোমায় খুন করে ডাকাতব্যাটারা নিয়ে পালিয়েছে—জগমোহন বললেন, ও বুঝেছি। তা তুমি কি আমাকে মামলা করতে বলছ তোমার হয়ে? মলো ছাই! ডাকাতব্যাটাদের কি আমি চিনি! তুমি বরং দারোগাবাবুর কাছে যাও। তিনি তোমার টাকা উদ্ধার করে দেবেন। ও ব্যাটাদের জেলে পুরবেন। যাও দিকি বাবু দারোগার কাছে।

—ম্যাঁও-ম্যাঁও! ওকথা বললে তো চলবে না উকিলবাবু।

ম্যাঁ-অ্যাঁ-ও—চলবে না মানে? আমি তো কবে ওকালতি ছেড়ে দিয়েছি হে!

—মিঁউ মিঁউ মিঁউ। টাকা টাকা টাকা! কোনও কথা শুনব না। টাকা চাই।

জগমোহন বিব্রত হয়ে মানুষের ভাষায় বললেন,—কী আপদ! ভাগো, ভাগো বলছি। নইলে লাঠিপেটা করব।

কালো বেড়াল এবার নিজের ভাষায় তবে রে, বুড়ো! —বলে এক লাফে তাঁর মশারির ছাদে এসে পড়ল। অমনি পটাপট দড়ি ছিঁড়ে মশারি আর বেড়াল পড়ল জগমোহনের ওপর। মুহূর্তে হুলুস্থুল ঘটে গেল। জগমোহন আর্তনাদ করতে লাগলেন, বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও। মশারির ভেতর জড়িয়ে-মড়িয়ে খাটের নিচে পড়ে গেলেন। বাড়ির সবাই জেগে গেল। দরজায় ধাক্কা দিতে থাকল। কিন্তু দরজা খুলবে কে? শেষে প্রচণ্ড ধাক্কায় কপাট ভেঙে ফেলা হল। তারপর মশারি থেকে উদ্ধার করা হল জগমোহনকে।

দিবুর বাবা প্রণবেশ বললেন,—কী কাণ্ড! মশারির দড়ি ছিঁড়ল কীভাবে?

দিবুর মা অরুণা বললেন,—নিশ্চয় বেড়াল পড়েছিল। আমি তো জেগেই ছিলুম। কখন থেকে শুনছিলুম, এ ঘরে যেন বেড়াল ডাকছে। ভাবলুম, দুই বেড়ালে ঝগড়া বেধেছে।

জগমোহন অতি কষ্টে বললেন,—এক গ্লাস জল।

হ্যাঁ, কথাটা তো ঠিক। দুই বেড়ালের ঝগড়া বলা যায়। কিন্তু ঝগড়াটা টাকা নিয়ে। লটারির টাকা। ব্যাপারটা ভারি রহস্যময়। মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছেন না জগমোহন।

জল খেয়ে সুস্থ হয়ে জগমোহন বললেন,—কী বলছিলে বউমা, বেড়ালের ঝগড়া না কী?

অরুণা বললেন,—হ্যাঁ। মনে হচ্ছে দুটো বেড়াল ঝগড়া করতে-করতে আপনার মশারির ওপর পড়েছিল।

জগমোহন জোরে মাথা নেড়ে বললেন,—না। টাকা! লটারির টাকা।

তার মানে? —প্রণবেশ অবাক হয়ে বললেন,—বাবা, লটারির টাকা মানে কী?

জগমোহন ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন! তারপর হাঁটু মুড়ে খাটের তলায় ঢুকলেন। বাড়ির লোকেরা হতবাক। দিবু ঘুমজড়ানো চোখে তাকিয়ে বলল,—ও দাদু! ওখানে ঢুকছ কেন? বেড়ালের ভয়ে? হি হি হি হি।

তাই শুনে রাঁধুনি হরুঠাকুর, কাজের লোক আন্নাকালী আর চাকর নবা পরস্পর চাওয়া-চাওয়ি করে ফিকফিক করে হাসতে লাগল। অরুণা ধমক দিয়ে বললেন,—এতে হাসির কী আছে? যাও গিয়ে শুয়ে পড়ো সব। সকাল-সকাল উঠতে হবে। দেওঘরের ঠাকুরপো আসবেন না কাল? কত কাজ?

ওরা ব্যাজার মুখে যে-যার জায়গায় চলে গেল।

খাটের তলায় ঘষটানো শব্দ হচ্ছিল। জগমোহন কী একটা টেনে বের করছেন।

একটা পুরোনো সুটকেস। একদিকে ছোট্ট তালা আটকানো। সুটকেসটা টেবিলে রেখে জগমোহন বললেন,—এক্কেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। হায় ভুলো মন! মোনাই-ফকির খুন হওয়ার কদিন আগে এটা আমায় রাখতে দিয়ে গিয়েছিল। আমার মনে

হচ্ছে, ডাকাতব্যাটারা খামোকা বেচারাকে খুন করে গেল। খামোকাও হয়তো নয়, রাগে। টাকাগুলো পেলে খুন করত না। পায়নি বলেই রেগেমেগে মুন্ডু কেটে ফেলেছিল। কিন্তু দেখো, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এই সুটকেসের মধ্যে...কী ভুল! কী ভুল!

প্রণবেশ বললেন,—ও বাবা, ব্যাপারটা কি বলবেন খুলে?

জগমোহন দাঁত খিঁচিয়ে বললেন,—বলব আবার কী? মোনাই-ফকিরের টাকা। শিগগির একটা জাবির গোছা আন। তালা না খুললে ভাঙতেই হবে শেষপর্যন্ত।

মোনাই-ফকিরের আস্তানা ঘিরে জগমোহন একটা অনাথ আশ্রম বানিয়ে দিয়েছেন। অনাথ ছেলেমেয়েরা সেখানে লেখাপড়া শিখছে। কারিগরি কাজ শিখে মানুষ হচ্ছে।

মোনাইয়ের লটারির টাকা। জগমোহনও কিছু দিয়েছেন নিজের পুঁজি থেকে। আজকাল সেই অনাথ আশ্রম নিয়েই থাকেন তিনি! বাকি জীবনের জন্য একটা ভালো কাজ পেয়ে গেছেন।

আর কালো বেড়ালটা?

শেষবার দেখেছিলেন অনাথ আশ্রম উদ্বোধনের দিন। কলকাতা থেকে এক মন্ত্রীমশাই গিয়েছিলেন উদ্বোধন করতে। জগমোহন দেখেছিলেন অত ভিড়ের মধ্যে কালো বেড়ালটা দিব্যি এসে তাঁর দু-পায়ের ফাঁকে কিছুক্ষণ বসে থাকল। পা শিরশির করছিল। তবু আর ভয় পাননি জগমোহন। এমন কী যাওয়ার সময় বেড়ালটা মিঁউ বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল।

মোনাই-ফকিরের আত্মার শান্তি হয়েছে! আর জগমোহনকে জ্বালাতে আসে না।

অবশ্য জগমোহন এখন কদাচিৎ কালো বেড়াল দেখলে চমকে ওঠেন। তবে আর মার-মার বলে তাড়া করেন না। এরা তো ভূত নয়, নেহাত পাড়ার হুলো। একটু হেসে বেড়ালের ভাষায় ধমক দিয়ে শুধু বলেন, মিঁউ। অর্থাৎ তুই আবার কে রে? ভাগ-ভাগ!....

বহুপ্রকার ভূত

তখন আমি ক্লাস টেনের ছাত্র। স্কুলে সংস্কৃত পড়াতেন যিনি, তাঁকে বলা হতো পণ্ডিতমশাই। আমাদের পণ্ডিতমশাইয়ের নাম ছিল ভূতনাথ শাস্ত্রী। খুব হাসিখুশি আমুদে মানুষ ছিলেন তিনি। নিজের নাম নিয়ে রসিকতা করতেন। পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে কত সব মজার গল্প শোনাতেন। পণ্ডিতমশাই ক্লাসে এলেই আমরা আনন্দে নেচে উঠতাম।

আমাদের দুর্ভাগ্য, পণ্ডিতমশাই পুজোর ছুটিতে নিজের গ্রামে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। কী একটা অসুখে মারা গিয়েছিলেন। স্কুল খোলার পর তাঁর স্মরণে শোকসভা এবং একদিন ছুটিও দেওয়া হয়েছিল।

এরপর নতুন পণ্ডিতমশাই এলেন যিনি, তিনি একেবারে উল্টো প্রকৃতির মানুষ। এঁর নাম কার্তিকচন্দ্র শর্মা। কিন্তু দেখতে মোটেই কার্তিক নন। বদরাগী মারকুটে খিটখিটে মেজাজ। ক্লাসে এসেই উৎকট সব সংস্কৃত শব্দ আওড়ে আমাদের ভয় পাইয়ে দিতেন। কথায়-কথায় শব্দের ব্যুৎপত্তি জিগ্যেস করতেন। না পারলেই 'মর্কটদণ্ড'। তার মানে, বেঞ্চে উঠে হাঁটু ভাঁজ করে হাতদুটো ডেস্কে রেখে মর্কট বা বাঁদর সাজতে হবে।

এর চেয়ে বিচ্ছিরি ব্যাপার, ফার্স্টবয় অশোক বাদে আমাদের প্রত্যেকের একটা করে নাম দিয়েছিলেন কেলো, ন্যাড়া, পেঁচো, হাঁদা, ভোম্বল ইত্যাদি। আমাকে ডাকতেন পুঁটে বলে। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বলেই কি? কে জানে? ছোটবেলাতেই চুনোপুঁটি বলা হয়।

নতুন পণ্ডিতমশাইয়ের কিছু বাতিকও ছিল। 'স্যার' বলা নিষেধ, 'মহাশয়' বলতে হবে। তাও এক বিড়ম্বনা।

আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়ার মতো। পড়াতে-পড়াতে হঠাৎ বেরিয়ে যেতেন। কেলো মানে কালিপ্রসাদ ছিল সবচেয়ে সাহসী ছেলে। সে একদিন চুপিচুপি দেখে এসে এই রহস্যটা ফাঁস করেছিল। পণ্ডিতমশাই বোর্ডিংয়ে নিজের ঘরে জল খেতে যান। সাত্ত্বিক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ। অন্যের জল খাবেনই বা কেন? তবে ঘন-ঘন জল খাওয়ার রহস্য তখনও জানা যায়নি।

আমাদের স্কুলটা ছিল গ্রামের শেষপ্রান্তে, নদীর ধারে উঁচু জমির ওপর খুব পুরোনো স্কুল। প্রাঙ্গণের পাশে সারবন্দি বোর্ডিং-ঘর। বাইরের মাস্টারমশাই আর ছাত্ররা সেখানে থাকতেন। তার পেছনে প্রাঙ্গণে খেলার মাঠের সামনে ঝোপ-জঙ্গল। তার ওদিকে শ্মশান। সেখানে একটা বিশাল বটগাছ ছিল। একটা ভাঙাচোরা মন্দিরও ছিল। শ্মশানকালীর মন্দির।

নতুন পণ্ডিতমশাই এসে সংস্কৃতের ক্লাস শেষ পিরিয়ডে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ছুটির ঘণ্টা বেজে গেলেও আমাদের নিষ্কৃতি ছিল না। তাই শেষ পিরিয়ডের শুরুতে খড়মের খটাস্-খটাস্ শব্দ শোনামাত্র আমরা তুম্বোমুখে বই খুলতাম।

তো একদিন পণ্ডিতমশাই হন ধাতু নিয়ে বকবক করছেন, হঠাৎ পেছনের বেঞ্চ থেকে 'ভোম্বল', মানে তারাপদ 'ভূ ভূ ভূ' করে চেঁচিয়ে উঠল।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন,—আরে মূর্খ! ভূ ধাতু নহে। হন ধাতু। ভূ ধাতু আগামীকল্য পড়াইব।

ভোম্বল কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল,—ভূ-ভূত ম-মহাশয়!

পণ্ডিতমশাই সগর্জনে বললেন,—তাহা হইলে তুই-ই বল, ভূত কয় প্রকার?

ভোম্বল আরও তোতলাতে লাগল। তখন কর্মটদণ্ড দিয়ে পণ্ডিতমশাই ফার্স্টবয় অশোকের দিকে তাকালেন। অশোক বলল,—পঞ্চ প্রকার মহাশয়!

—কী, কী?

—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম মহাশয়।

—সাধু, সাধু!

বলে পণ্ডিতমশাই উঠে দাঁড়ালেন এবং অভ্যাসমতো বেরিয়ে গেলেন। জল খেতেই যে গেছেন, সেটা আমরা জানতাম। তবে প্রকৃত রহস্য বুঝতে আরও কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল।

ওঁর খড়মের শব্দ মিলিয়ে যেতেই ভোম্বল বলে উঠল,—মাইরি! ভূ-ভূ করে আমাদের ডোবাল। আগামীকল্য নয়, অদ্যই ভূ ধাতু যদি না পড়িতে হয়—সে ভেংচি কেটে ফের বলল—তু-ই ভূত!

তারপর খড়মের শব্দে সে থেমে তুম্বো হয়ে গেল। কিন্তু এবার পণ্ডিতমশায়ের চেহারা দেখে অবাক আমরা। মুখে হাসি ঝলমল করছে। ইশারায় ভোম্বলকে বসতেও বললেন। ভাবলাম ফার্স্টবয় ওঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ায় মেজাজ প্রসন্ন হয়েছে।

পণ্ডিতমশাই সহাস্যে বললেন,—কী পড়া হচ্ছিল যেন?

ফার্স্টবয় বলল,—পঞ্চভূত, মহাশয়!

পণ্ডিতমশাই আমাদের আরও অবাক করে বললেন,—মহাশয় নয়, স্যার বলবে। যে যুগের যা রীতি। তা পঞ্চভূত বললে। উঁহু! ভূত বহু প্রকার। যেমন ধরো : দ্রবীভূত, শিলীভূত, পুঞ্জীভূত ইত্যাদি-ইত্যাদি। ব্যাখ্যা করি শোনো। যে ভূত দ্রব হয়েছে অর্থাৎ গলে জল হয়েছে, সে দ্রবীভূত। যে ভূত শিলা অর্থাৎ পাথর হয়ে গেছে, সে শিলীভূত। যে ভূত ভস্ম অর্থাৎ ছাই হয়ে গেছে সে ভস্মীভূত। যে ভূত পুঞ্জ অর্থাৎ হাড়গোড় ভাঙা হয়ে দুমড়েমুচড়ে পাঁজার মতো হয়েছে, সে হল পুঞ্জীভূত। বোসো। আসছি।

বলে যথারীতি উনি আবার ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলাম। কেলো চাপাস্বরে হেডমাস্টারমশাই বকে দিয়েছেন। বুঝলি না?

এবার পণ্ডিতমশাই হন্তদন্ত ক্লাসে ঢুকলেন। কিন্তু আগের মতো কাঠের চেহারা! হুঙ্কার দিয়ে বললেন,—ভোম্বল! তোকে না মর্কটদণ্ড দিয়াছিলাম?

ভোম্বল তড়াক করে আবার বাঁদর হয়ে কাঁদ-কাঁদ মুখে বলল,—আপনিই তো স্যার...

—কী? কী? কী? ম্লেচ্ছ যাবনিক সম্বোধন। তোকে 'তালদণ্ড' দিলাম!

'তালদণ্ড' মানে বেঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের দুইকান ধরে থাকতে হবে। তালগাছকে তো এই রকমই দেখায়! ভোম্বল তালদণ্ড নিতে যাচ্ছে, ফার্স্টবয় বলে উঠল,—মহাশয়। সে মিথ্যা কহে নাই। আপনি দ্বিতীয়বার আসিয়া দ্রবীভূত, শিলীভূত, ভস্মীভূত ইত্যাদি ইত্যাদি ভূতের ব্যাখ্যাও করিলেন।

পণ্ডিতমশাইয়ের চোখদুটো জ্বলে উঠল।—কী? কী? কী? আমি দ্বিতীয়বার আসিতেছি। অথচ তুমি কহিতেছ, আমি দ্বিতীয়বার আসিয়াছিলাম! তদুপরি ওই সকল উদ্ভট ব্যাখ্যা করিয়াছি?

—হ্যাঁ মহাশয়! তদুপরি আপনি এই তৃতীয়বার আসিলেন।

অমনি পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমরা হকচকিয়ে গেছি। একটু পরে খড়মের শব্দ করতে-করতে পণ্ডিতমশাই ফিরে এলেন। মুখে আবার একরাশ হাসি। বললেন,—ভূত শ্মশানের দিকে ভাগিয়ে দিয়েছি। হুঁ, কত রকম ভূত আছে। তাই না? তবে সবার সেরা ভূত নামচোরা। কেন নামচোরা বলছি জানো? যেমন ধরো ঃ মামদো, ব্রহ্মদত্যি, জটাধারী, শাঁকচুন্নি, পেঁচো ইত্যাদি-ইত্যাদি। এদের নামে ভূত শব্দই নেই। অথচ এরাই আসল ভূত। খাঁটি ভূ—ভূ—ভূ

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ হেঁট হয়ে খড়মদুটো হাতে নিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে কি তাঁর গর্জন শুনলাম আমরা। মনে হল হুঙ্কার দিতে-দিতে কে কাকে তাড়া করছে।

কেলো বলল,—আয় তো দেখি, কী ব্যাপার! ঘনঘন মত বদলানো ভালো ঠেকছে না।

আমাদের ক্লাসরুম ছিল স্কুলবাড়ির শেষাংশে। বেরুলেই বাঁ-দিকে বোর্ডিংয়ের শেষপ্রান্ত এবং ঝোপজঙ্গল শুরু। বেরিয়ে গিয়ে চোখে পড়ল, ঝোপজঙ্গলের মধ্যে পণ্ডিতমশাইয়ের মাথা দ্রুত দূরে-দূরে সরে যাচ্ছে। হেমন্তকালের শেষবেলার রোদে কালো মাথাটি ভীষণ নড়াচড়া করছে।

সাহসী কেলোর সঙ্গে আমরা কয়েকজন দৌড়ে গেলাম। ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে গিয়ে শ্মশানতলায় পণ্ডিতমশাইকে দেখতে পেলাম। বটগাছ লক্ষ্য করে একপাটি খড়ম ছুড়ে সগর্জনে বললেন,—সাহস থাকিলে অবতরণ কর রে শাখামৃগ!

গাছের ওপরে ডালপালার আড়াল থেকে খিখি হাসি শোনা গেল শুধু। পণ্ডিতমশাই অপর খড়মটি ছুড়ে গর্জন করলেন,—দন্ত বিদীর্ণ হউক পামরের।

ওপর থেকে সেইরকম হাসির সঙ্গে কথা শোনা গেল,—একজোড়া নতুন খড়ম লাভ হল। বুঝলি কেতো? এখন আমার ভাঙা খড়মজোড়া খুঁজে নিয়ে পরগে যা! সাবধান! ঠ্যাং ভেঙে পুঞ্জীভূত হবি।

এবার পণ্ডিতমশাই আমাদের দেখতে পেলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে চিৎকার করলেন,—রণং দেহি! রণং দেহি! তোমরা হাঁ করিয়া কী দেখিতেছ? ইষ্টক নিক্ষেপ করো! ভুতোকে শীঘ্র বধ করো।

উনি ভাঙা মন্দিরের ইট কুড়িয়ে বটগাছে ছুড়তে থাকলেন। আমরাও যুদ্ধে যোগ দিলাম। এবার বটগাছের ওপর থেকে আর কোনও সাড়াশব্দ এল না। একটু পরে পণ্ডিতমশাই বললেন,—ক্ষান্ত হও! দুর্বৃত্ত এক্ষণে যথার্থই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। রণজয়ের পুরস্কারস্বরূপ তোমাদের ছুটি দিলাম। যে যাহার গৃহে প্রত্যাবর্তন করো।—

রণজয়ী পণ্ডিতমশাই সবেগে স্কুলবাড়ির দিকে চলে গেলেন। এই সময় কেলো

বলল,—ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ রে, ইট ছুড়ে দু-নম্বর পণ্ডিতমশাইকে সত্যি মেরে ফেললাম না তো?

নাড়ুগোপাল ওরফে পেঁচো বলল,—ঠিক বলেছিস। এখনই বেলা থাকতে-থাকতে খুঁজে দেখা উচিত। দরকার হলে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসব।

কেলো চিন্তিতমুখে বলল,—কিন্তু ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে।

ভোম্বল বলল,—কিছু গো...গোলমেলে নয়। তখন আমি জানালার বাইরে ভূ- ভূ-মানে পুরোনো পণ্ডিত ম-মশাইকে—ওরে বাবা! ওই দ্যা-দ্যাখ্! আবার আসছে ন-নতুন পণ্ডিতমশাই।

ঘুরে দেখি পণ্ডিতমশাই দুপাঠি খড়ম হাতে হন্তদন্ত-আবার এদিকে আসছেন। বোঝা গেল খড়মের খোঁজেই গিয়েছিলেন আসলে।

কেলো বলল,—মন্দিরের আড়ালে লুকিয়ে পড়া যাক। শিগগির! খুব রহস্যজনক ঘটনা মনে হচ্ছে।

আমরা শ্মশানকালীর মন্দিরের আড়ালে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলাম। পণ্ডিতমশাই এসে বটগাছের ওপর দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—তোর খড়ম নিয়ে আমার খড়ম ফেরত দে। ও ভুতো! ভুতো। মলো যা! সত্যি ভিরমি গেলি নাকি? ন্যাকামি করে সাড়া দিচ্ছিস না কেন?

একটু পরে সাড়া এল ডালপালার আড়াল থেকে।—খড়ম ফেরত দেব। তবে আজই তোকে স্কুল থেকে চলে যেতে হবে। ছেলেগুলোকে বড্ড কষ্ট দিচ্ছিস তুই!

পণ্ডিতমশাই বাঁকা হেসে বললেন,—কষ্ট দিচ্ছি বলেই ওরা সংস্কৃতটা ভালো করে শিখতে পারছে। তুই তো খালি গল্প করেই ওদের পরকাল ঝরঝরে করে দিয়েছিলে। তাই না আমি এই স্কুলে এলাম!

—থাম-থাম! বড়াই করিসনে! এসেছিস তো স্বভাব যায় না মলে বলেই। তোর স্বভাব যাবে কোথায়? মরে গিয়েও একই স্বভাব ছাড়তে পারলিনে হতভাগা!

—চুপ! চুপ!

—কক্ষনও চুপ করে থাকব না। তোর বাড়ি থেকে তোর হাসপাতালের ডেথ সার্টিফিকেট চুরি করে এনেছিলাম। তোর গিন্নির বাক্সে ছিল, হেডমাস্টারমশাইয়ের টেবিলে রেখে এসেছি। গিয়ে দ্যাখ না কী হুলুস্থুল হচ্ছে এতক্ষণ! ওই দ্যাখ! স্কুলের সামনে কী ভিড়! এতক্ষণ লোক চলে গেছে কেকরাডিহির হাসপাতালে।

পণ্ডিতমশাই ঘুরে দেখে নিয়েই গর্জন করলেন,—তবে রে বিশ্বাসঘাতক, আজ তোর একদিন কী আমার একদিন!

তারপর তড়াক করে এক লাফে গাছে উঠে গেলেন। এবার যেন ঝড় শুরু হল। গটগাছটার ডালপালা প্রচণ্ড নড়তে থাকল। সেইসঙ্গে অদ্ভুত ঘ্রাঁ ঘ্রাঁ ঘোঁ এইসব গর্জন। হুঙ্কার। মড়মড় করে একটা ডালও ভেঙে পড়ল। ভূঁতনাথ শাস্ত্রী এবং কার্তিকচন্দ্র শর্মার তুমুল যুদ্ধ চলছে।

কেলো বলল,—হেভি ফাইট বেধে গেছে। পালাই চল! আর এখানে থাকা ঠিক নয়। কিন্তু এবার বুঝলি তো কেন নতুন পণ্ডিতমশাই ঘনঘন জল খেতে যেতেন? জল খাওয়ার ছলে আমাদের পুরোনো পণ্ডিতমশাইকেই তাড়া করতে যেতেন। ভোম্বল ঠিক দেখেছিল।

আমরা গুঁড়ি মেরে জঙ্গলের আড়ালে দৌড়ে স্কুলবাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। স্কুলপ্রাঙ্গণে তখন সত্যি ভিড়। হেডমাস্টারমশাই একটা কাগজ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাস্টারমশাইয়ের মুখ প্রচণ্ড গম্ভীর। কেলো হাঁপাতে-হাঁপাতে গিয়ে বলল,—সত্যি দুজন ভূত স্যার! হেভি ফাইট বেধেছে।

হেডমাস্টারমশাই গম্ভীরমুখে বললেন,—এবার থেকে স্কুলে নতুন শিক্ষক নিতে হলে সাবধান হওয়া দরকার।—

মুরগিখেকো মামদো

ছোটমামার সঙ্গে কোথাও গিয়ে বাড়ি ফেরার সময় রাত্তির হলেই ভূতের পাল্লায় পড়াটা যেন অনিবার্য। তাই সেবার পাশের গাঁয়ে ঝুলনপূর্ণিমার রাসের মেলায় যাওয়ার জন্য ছোটমামা আমাকে খুব সাধাসাধি করলেও বেঁকে দাঁড়ালুম।

ছোটমামা আমাকে কলকাতায় যাত্রা, সার্কাসের বাঘ, সিংহ, প্রোফেসর ফুং চু-র ম্যাজিক আর নররাক্ষসের আস্ত মুরগিভক্ষণের অনেক সব রোমাঞ্চকর গল্প শোনালেন। তবু আমি গোঁ ধরে রইলুম। বললুম,—আমি কিছুতেই যাচ্ছি না ছোটমামা! আপনার যদি অত ইচ্ছে, আপনি একাই যান।

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে ছোটমামা বললেন,—প্রবলেম কী জানিস পুঁটু? কথায় বলে, একা না বোকা। একা হলেই মানুষ কেন যেন বোকা মনে যায়। কিন্তু তুই কেন যেতে চাচ্ছিস না খুলে বল্ তো শুনি?

অগত্যা বললুম,—আমার ভয় করে।

—ভয়? কীসের ভয়?

—ভূতের।

ছোটমামা খুব অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন,—তুই কী বলছিস পুঁটু? ভূতকে তুই ভয় পাস? তুই এত বোকা তা তো জানতুম না। ছ্যা-ছ্যা। ভূতকে তুই ভয় পাবি কী, ভূতই তো তোকে ভয় পাবে। ওরে বোকা! ভূতেরা মানুষকে ভয় পায় বলেই তো নিরিবিলি জায়গায় লুকিয়ে থাকে। তুই কি ভেবে দেখেছিস, কেন ভূতেরা পারতপক্ষে দিনের বেলা বেরোয় না? বেরুলেই যে মানুষের সামনে পড়ে যাবে।

তাই ওরা রাতবিরেতে বেরোয়। হ্যাঁ, 'ঠিক দুক্কুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা।' তার মানে, দুপুরবেলায় ভূতেরা টুপটুপ করে ঢিল ছোড়ে বটে, কিন্তু সামনে আসে না। গাছপালার আড়াল থেকেই ঢিলগুলো ছোড়ে। তাহলে ভেবে দ্যাখ—

ছোটমামার কথার ওপর বলে দিলুম,—ও আপনি যতই বলুন, আমি যাচ্ছি না।

হঠাৎ ছোটমামা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—ঠিক আছে! আয় আমরা মোনাদার বাড়ি যাই।

এতে অবিশ্যি আপত্তি করলুম না। ছোটমামার 'মোনাদা' হল মোনা-ওঝা। কেউ-কেউ তাকে মোনা-বুজরুকও বলে। সে থাকে আমাদের গাঁয়ের শেষদিকটায় গঙ্গার ধারে পুরোনো শিবমন্দিরের কাছে। মাথায় সাধুবাবাদের মতো চুড়োবাঁধা জটা। মুখভর্তি গোঁফ-দাড়ি। কপালে লাল তিলক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বাঁ-হাতের কবজিতে একটা তামার বালাও দেখেছি। সবসময় গাঁজা-ভাঙের নেশায় তার চোখদুটো টকটকে লাল হয়ে থাকে।

কিন্তু চেহারা যতই ভয় জাগানো হোক, স্বভাব বেশ অমায়িক আর হাসিখুশি মানুষ মোনা। ওপর পাটির দুটো দাঁত নেই বলেই যেন তার হাসি দেখলে হাসি পায়।

মোনা-ওঝা থাকে মন্দিরের পেছনে একটা ভাঙাচোরা ঘরে। সেখানে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ আছে। নিরিবিলি সুনসান জায়গা। নেহাত সময়টা বিকেল। তা না হলে ছোটমামার সঙ্গে এমন জায়গায় কিছুতেই আসতুম না।

ছোটমামা ডাকলেন,—মোনাদা আছো নাকি? ও মোনাদা!

মোনা ওঝা বটগাছের দিক থেকে সাড়া দিল,—কে ডাকে গো এমন অবেলায়?

ছোটমামা মুখে রহস্য ফুটিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—গোপনে তন্ত্রসাধনা করছে, বুঝলি পুঁটু? ওকে এ সময় ডিসটার্ব করাটা রিস্কি।

কিন্তু তখনই বটগাছের আড়াল থেকে মোনা-ওঝা বেরুল। তার হাতে একটা মড়ার খুলি দেখে এবার বুকটা ধড়াস করে উঠল। ছোটমামা কাঁচুমাচু মুখে বললেন,—কিছু মনে কোরো না মোনাদা। এই পুঁটুটার জন্য তোমার কাছে আসতে হল।

মোনা-ওঝা আমার দিকে লাল চোখে তাকিয়েই ফিক করে হাসল। অমনি আমার ভয়টা কেটে গেল। ওপর পাটির দুটো দাঁত না থাকায় তার হাসিটা সত্যিই হাসিয়ে ছাড়ে। ছোটমামা আমাকে ইশারায় হাসতে বারণ করলে কী হবে?

মোনা-ওঝা বলল,—ব্যস! ব্যস! পুঁটুবাবুর ওপর যে পেতনিটার নজর লেগেছিল, সে পালিয়ে গেল। ওই দ্যাখো, যাচ্ছে! সে মড়ার খুলিসুদ্ধু হাতটা তুলে দূরে স্কুলবাড়ির দিকটা দেখাল। পেতনিটা থাকে ইস্কুলের পেছনে ওই তালগাছের ডগায়। দ্যাখো, তালপাতাগুলো কেমন নড়ছে। দেখতে পাচ্ছ তো?

আমি তেমন কিছু দেখতে পেলুম না। কিন্তু ছোটমামা দেখে নিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, নড়ছে বটে। তবে মোনাদা, এর একটা স্থায়ী প্রতিকার করো। পেতনিটার নজর লাগার জন্যই পুঁটু রাতবিরেতে বড্ড ভয় পায়।

মোনা-ওঝা বলল,—একটাকা দক্ষিণে লাগবে ছোটবাবু।

পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ছোটমামা বললেন,—এই নাও। কিন্তু মোনাদা, একেবারে স্থায়ী প্রতিকার চাই। পুঁটু যেন আর রাতবিরেতে আমার সঙ্গে বেরিয়ে একটুও ভয় না পায়।

টাকাটা নিয়ে চুড়োবাঁধা জটার ভেতর গুঁজে মোনা-ওঝা বলল,—তাহলে বরঞ্চ তুমিই এই মন্তরটা শিখে নাও ছোটবাবু! ও ছোট ছেলে। ঠিকমতো মন্তরটা বলতে না পারলেই কেলেঙ্কারি। নাও, মুখস্থ করো ঃ

ভূত-পেতনি ভুতুম
দেখাং যদি পেতুম
ধরেং ধরেং খেতুম।

ছোটমামা মন্তরটা আওড়ালেন। বারকতক ট্রেনিংয়ের পর মোনা-ওঝা বলল,—ব্যস! ব্যস্! ঠিক আছে। এবার যেখানে ইচ্ছে যত রাত্তির হোক ঘোরো। পুঁটুবাবু। নির্ভয়ে চলে যাও মামাবাবুর সঙ্গে। যেখানে খুশি, যখন খুশি। সন্ধে হোক কী নিশুতি, শ্মশান কী মশান, বনবাদাড় কী পাহাড়-পর্বত, মাঠ কী ঘাট, নদী কী বিল কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক বুক ফুলিয়ে ঘোরো!

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন বৃষ্টিবাদলা হওয়াই নাকি নিয়ম। এবারকার দিনটিতে সন্ধ্যা অবধি তেমন কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। আকাশ ছিল সাফসুতরো ঝকঝকে নীল। তাই রাসের মেলায় ভিড় জমেছিল বড্ড বেশি। কলকাতার যাত্রা শেষ হতে রাত নটা বেজে গেল। আকাশে তখন ঝলমলে নিখুঁত গোল চাঁদ। আমরা ঢুকলাম নররাক্ষসের তাঁবুতে জ্যান্ত মুরগিভক্ষণ দেখতে। কারণ সার্কাস আর ম্যাজিক দুই তাঁবুতেই নাইট শোয়ের টিকিট কাটার কিউটা বেজায় লম্বা।

কিন্তু ভয়ংকর চেহারার নররাক্ষস যেই হাঁউ হাঁউ মাঁউ মাঁউ বিকট গর্জন করে মুরগির খাঁচা খুলতে গেছে, অমনি কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ার শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিল। নররাক্ষস আচমকা হকচকিয়ে গিয়েছিল হয়তো। তা না হলে ওর হাতছাড়া হয়ে মুরগিটা দর্শকের ভিড়ে এসে পড়বে কেন?

তারপর শুরু হয়ে গেল একটা হই-হট্টগোল। লোকের গায়ের ওপর জ্যান্ত মুরগি পড়াটা খুব অস্বস্তিকর ব্যাপার। সেই সঙ্গে তাঁবুটাও দমকা বাতাস আর বৃষ্টির দাপটে প্রায় ছিঁড়ে পড়ার অবস্থা। সবাই প্রাণ এবং মাথা বাঁচাতে তাঁবু ফর্দাফাঁই করে বেরুতে থাকল। আবার বাজ পড়ার শব্দ এবং চোখ ধাঁধানো আলো। ছোটমামাকে জড়িয়ে ধরেছিলুম ভাগ্যিস। নইলে এই হুলুস্থুলের ভেতর যে তাঁর আর পাত্তা পাওয়া যেতে না, সেটা আমি ভালোই জানি। টের পেলুম, ছোটমামা সামনে কোনও জিনিসে

টুঁ দেওয়ার পর সেখানটা ফাঁক হল। তখন বেরিয়ে পড়লেন। আমিও ওঁর প্যান্টের বেল্ট আঁকড়ে ধরে বাইরে চলে গেলুম।

ঝোড়োহাওয়া আর বৃষ্টিতে মেলার আলোগুলো দুলছিল। হঠাৎ একসঙ্গে সবগুলো নিভে গেল। গত গাজনের মেলাতেও এমনটি হয়েছিল। প্রাকৃতিক বিদ্যুতের ঝিলিকে চারদিকে মানুষজনকে ছোটাছুটি করে বেড়াতে দেখলুম। ছোটমামা বললেন,—ট্রান্সফরমারে বাজ পড়েছে মনে হচ্ছে। চল পুঁটু, আমরা বরং গাঁয়ের ভেতরে কোনও বাড়িতে আশ্রয় নিই। বড্ড বেশি ভিজে যাচ্ছি।

মেলা বসেছিল গাঁয়ের বাইরে খেলার মাঠে। পিচরাস্তা ডিঙিয়ে গিয়ে সামনে একটা বাড়ির বারান্দা দেখতে পেলুম। বারান্দায় উঠে এতক্ষণে ছোটমামার বেল্ট ছেড়ে দিলুম। তারপরই সেই আবছা আঁধারে কোঁকোঁ শব্দ শুনে চমকে উঠলুম।—ও কীসের শব্দ ছোটমামা?

ছোটমামা খিকখিক করে হেসে বললেন,—সেই নররাক্ষসের মুরগিটা। বুঝলি পুঁটু? ওটা ধরে এনেছি।

আঁতকে উঠে বললাম,—ও ছোটমামা! নররাক্ষসটা যদি মুরগির খোঁজে এখানে চলে আসে?

আসবে না।—বলে ছোটমামা মুরগিটার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে চুপ করাতে ব্যস্ত হলেন।

আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। বললুম,—না ছোটমামা। মুরগিটা ছেড়ে দিন। একবার যখন প্রাণে বেঁচে গেছে, একে বাঁচিয়ে রাখাই উচিত।

ছোটমামা গদগদভাবে বললেন,—বুঝতে চেষ্টা কর পুঁটু! মুরগিটা ডিম পাড়বে। একগাদা ছানা হবে। সেগুলো বড় হয়ে ডিম পাড়বে। এমনি করে রীতিমতো একটা পোলট্রি হয়ে যাবে। তাই না? একেই বলে বিনি ক্যাপিট্যালে বিজনেস! আমরা বিজনেসম্যান হব। বুঝলি তো?

বুঝলুম বটে, কিন্তু অস্বস্তিটা গেল না। খালি মনে হচ্ছিল, নররাক্ষসটা যদি মুরগির গন্ধে-গন্ধে এখানে এসে পড়ে, মোনা-ওঝার মন্তর দিয়ে কি ওকে ঠেকানো যাবে? ও তো ভূত নয়, রাক্ষস।

কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আবার পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটল। আমরা বাড়ির পথ ধরলুম। খোয়া-বিছানো পথ বলে কাদা নেই। ছোটমামা মুরগিটা বুকের কাছে যত্ন করে ধরে গুনগুনিয়ে গান গাইতে-গাইতে চলেছেন। খোলামেলা মাঠের মাঝামাঝি একটা খালপোল। সেখানে কালো হয়ে কে দাঁড়িয়ে আছে দেখে চাপাস্বরে বললুম,—ও ছোটমামা! সেই নররাক্ষসটা নয়তো?

ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললেন,—কে ওখানে?

পাল্টা চ্যালেঞ্জ শোনা গেল,—তোমরাই বা কে হে?

ছোটমামা খাপ্পা হয়ে বললেন,—আমরা যেই হই। তুমি ভূতের মতো ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?

—কী বললে? কী বললে? ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছি?

—হ্যাঁ। তা-ই তো আছো।

—আমি ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছি? মানে, তুমি 'মতো' বলছ?

—'মতো' বলছি ভদ্রতা করে। নইলে—

কালো মূর্তিটা ছোটমামার কথার ওপর বলে উঠল,—নইলে?

—নইলে ভূতই বলতুম।

—যাকগে! ভদ্রতার দরকার নেই। তুমি তা-ই বলো। 'মতো' শুনে-শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। 'মতো' কেন বলবে? মানুষকে 'মানুষের মতো' বলাটা অপমান নয়? যে যা, তাকে তাই বলা উচিত।

ছোটমামা হেসে ফেললেন।—যা বাব্বা! তুমি কি ভূত নাকি যে ভূত বলব?

—একশোবার বলবে।

—কী আশ্চর্য! তুমি ভূত?

—সেন্ট পারসেন্ট। একেবারে বিশুদ্ধ খাঁটি ভূত।

ছোটমামার মেজাজ এই ভালো, এই খারাপ। ফের রেগে গিয়ে বললেন,—তুমি যদি খাঁটি ভূত, তাহলে প্রমাণ দাও।

—কী প্রমাণ চাও বলো!

—তুমি অদৃশ্য হও।

সেটাই তো হয়েছে প্রবলেম রে ভাই!—ভূতের দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

ছোটমামা বললেন,—কী প্রবলেম?

—অদৃশ্য হতে পারছি না। মাঝে-মাঝে এটা হয়, বুঝেছ? আসলে টাটকা ভূত তো। তাই অনেক কষ্ট করে যদি বা রূপ ধরতে পারি, ঝটপট অদৃশ্য হতে পারিনে। ট্রেনিংয়ের জন্য টিচার খুঁজে বেড়াচ্ছি। পাচ্ছিনে। শুনেছিলুম, এই খালপোলে এক মামদো থাকে। সে নাকি উইকের ক্র্যাশকোর্সে ঝটপট ভ্যানিশ হওয়া শেখায়। কিন্তু কোথায় সে? তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

ছোটমামার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিলুম। ফিসফিস করে বললুম,—সেই মন্তরটা, ছোটমামা!

ছোটমামা নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলেন। বললেন,—হ্যাঁ, শোনো হে ভূতচন্দর! তোমাকে এক্ষুনি ভ্যানিশ করে দিচ্ছি।

> ভূত পেতনি ভুতুম
> দেখাং যদি পেতুম
> ধরেং ধরেং খেতুম।

ভূতটা অমনি ডিগবাজি খেতে-খেতে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছোটমামা খিকখিক

করে খুব হেসে বললেন,—আয় পুঁটু! বলেছিলুম না মোনাদার ক্ষমতার তুলনা হয় না?

সেই সময় খালপোলের নিচের দিক থেকে কেউ হেঁড়ে গলায় বলে উঠল,—কী হে ছোকরা, আমার হবু-ট্রেনিকে ভাগিয়ে দিলে? কবরখানায় ট্রেনিং দিয়ে এসে সবে দুমুঠো খেতে আসছি, আর তুমি কিনা—রোসো! দেখাচ্ছি মজা!

খালপোলের ও-মাথায় আবার একটা কালো মূর্তি দেখা গেল। এই মূর্তিটা বেশ মোটাসোটা। ছোটমামা সেই মন্তরটা পড়তে যাচ্ছেন, সে খ্যাঁখ্যাঁ করে অদ্ভুত হেসে বলল,—মোনা-বুজরুকের মন্তরে কাজ হবে না হে ছোকরা। আমি যে-সে ভূত নই, মামদো!

ছোটমামা খুব হাঁকডাক করে মন্তরটা আওড়ালেন। কিন্তু মামদোর কিছু হল না। সে তেমনি খ্যাঁখ্যাঁ করে হাসতে থাকল! তখন ফিসফিস করে বললুম,—ছোটমামা! ওকে বরং মুরগিটা দিয়ে দিন।

ছোটমামা চটে গিয়ে বললেন,—দিচ্ছি মুরগি!

মামদোর কানে যেতেই সে কয়েক পা এগিয়ে এল! —মুরগি দিচ্ছ তুমি? বাঃ। তুমি তো তাহলে বড় ভালো। দাও, দাও! আহা কতদিন মুরগি খাইনি!

ছোটমামা চ্যাঁচামেচি করে বললেন,—দেব না!

মামদো এক-পা এগিয়ে এল। তারপর লম্ফঝম্প নাচের সঙ্গে ঘ্যানঘেনে গলায় বলতে লাগল,

কেতন রোজ বাদ মুরগা খায়েগা হাম
সুরুয়া পিয়েগা হাম
হাড্ডি খায়েগা হাম।।
কুড়মুড়াকে মুড়মুড়াকে
হাড্ডি খায়েগা হাম!!

নাচের চোটে কাঠের পোল মচমচ করে কাঁপতে থাকল। সে নাচতে-নাচতে কাছে আসতেই ছোটমামা মুরগিটা খালের দিকে ছুড়ে ফেললেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, মুরগিটা কোঁ-কোঁ করতে-করতে ডানা মেলে উড়ে গেল!

আমার মামদোও জ্যোৎস্নাভরা মাঠে মুরগি ধরতে দৌড়ুল। ছোটমামা পা বাড়িয়ে বললেন,—পালিয়ে আয়, পুঁটু!

দুজনে দৌড়ুতে শুরু করলুম। অনেকটা দৌড়ুনোর পর থেমে গিয়ে ছোটমামা বললেন,—মামদো যতই চেষ্টা করুক, নররাক্ষসের মুরগি ধরতে পারবে না। তবে বলা যায় না, এতক্ষণ হয়তো নররাক্ষসও তার মুরগির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। তা যদি পড়ে, বুঝলি পুঁটু? একখানা দেখবার মতো ডুয়েল হবে বটে। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে মুরগিটা ধরে এনেছিলুম। নইলে মামদো আজ কেলেঙ্কারি করে ছাড়ত।

ছোটমামা খিকখিক করে হাসতে লাগলেন। বললুম,—আর এখানে নয় ছোটমামা! শিগগির বাড়ি চলুন।—

দাড়িবাবাদের কবলে

তাঁকে বড়রা বলতেন তোতামিয়াঁ। আমরা ছোটরা বলতুম তোতামামা। কেউ-কেউ তাঁকে বলতেন, 'জাহাজি তোতা'। কারণ তোতামামা ছিলেন জাহাজের নাবিক।

আমাদের ছোট্ট শহরে হিন্দু ও মুসলিমরা মিলেমিশে বাস করতেন। তোতামামার বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ির পাশেই। তাঁর ভাই ছিলেন দর্জি। তাঁর ডাকনাম ছিল আতামিয়াঁ। দুজনেরই আসল নাম আমার জানা ছিল না। কিন্তু তোতা-আতা দুইভাই ছিলেন একেবারে বিপরীত। যেমন মেজাজে, তেমনি চেহারায়।

তোতামামা ছিলেন লম্বা-চওড়া প্রকাণ্ড মানুষ। তেমনি প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। মাথার চুল কাঁচাপাকা। সামনের দিকে অল্প চুল। কিন্তু পেছনে একেবারে খুঁটিয়ে ছাঁটা। তবে দেখবার মতো জিনিস ছিল তাঁর গোঁফ। সূচলো বাঁকা গোঁফের ডগা। কিন্তু বিশাল সেই গোঁফ। রোজ দাড়ি কামাতেন। তাই বাবা ঠাট্টা করে বলতেন,—কী হে তোতামিয়াঁ! রোজ দাড়ি কামাও কি গোঁফকে দেখনসই করার জন্য?

তোতামামা ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হেসে বলতেন,—তুমি ঠিকই ধরেছ। তবে কী জানো? আমার জাহাজের ক্যাপ্টেন হুবার্ট সায়েব ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখেন। তাই কোনও নাবিকের দাড়ি রাখা পছন্দ করেন না। দাড়ি রাখবেন শুধু তিনি। ক্যাপ্টেন বলে কথা।

তোতামামা সারা বছর সমুদ্রে পৃথিবীর এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে জাহাজে কাটিয়ে বাড়ি ফিরতেন মাত্র একবার। কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে আবার কলকাতা ফিরে যেতেন। তারপর আবার জাহাজে পাড়ি দিতেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে। যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন পাড়ার ছোট-বড় সবার জন্য কত জিনিস নিয়ে আসতেন এবং উপহার দিতেন। আমার জন্য আনতেন রংবেরঙের ছবির বই, কালার পেনসিল, লজেন্স। আমাদের বাড়ির ভেতরে বারান্দায় বসে চা খেতে-খেতে তাঁর সমুদ্রযাত্রার অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প শোনাতেন। তাই তোতামামা এলেই আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেতুম। বাবা ও মা-ও খুশি হয়ে গল্প শুনতেন।

সেবার পুজোর আগে সন্ধ্যাবেলায় পড়তে বসেছি, এমনসময় বাইরে তোতামামার চেনা সেই ভরাট গলার ডাক শোনা গেল,—পুঁটু! ও পুঁটু!

অমনি দৌড়ে ছোট্ট উঠোন পেরিয়ে সদর দরজা খুলে দিলুম। তারপরই ভীষণ ভড়কে গেলুম। এ আবার কে? সেই দশাসই চেহারা, পরনে প্যান্ট-শার্ট, কাঁধে ব্যাগ—অথচ মুখে গোঁফ নেই এবং মাথায় চুল নেই। পুরো মাথা জুড়ে চকচকে টাক!

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি দেখে তোতামামা বললেন,—কী রে পুঁটু? চিনতে পারছিসনে? আমি তোর সেই তোতামামা?

অবাক হয়ে বললুম,—আপনার গোঁফ নেই কেন? মাথায় চুল নেই কেন তোতামামা?

ভেতরে চল। সব বলব। —বলে তোতামামা বাড়ি ঢুকলেন।

বাবা ইতিমধ্যে উঠোনে নেমে এসেছেন। তিনিও খুব অবাক হয়ে বললেন,—কী অদ্ভুত ব্যাপার! ওহে তোতামিয়াঁ! তোমার গোঁফ কোথায় গেল? মাথাজুড়ে টাক পড়ল কেন? তোমার গালই বা অমন চকচক করছে কেন?

তোতামামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ মুখে বললেন,—আর বোলো না হে! প্রাণে বেঁচে ফিরতে পেরেছি এই যথেষ্ট। বলে তিনি হাঁক দিলেন,—কই গো বোনটি? শিগগির চা দাও। তোমার হাতের চা না খেলে চাঙ্গা হব না। ট্রেন থেকে নেমেই প্রথমে এ বাড়ি ঢুকেছি।

মা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মা-ও ভীষণ অবাক। বললেন,—এ কী দাদা! তোমার এমন চেহারা হল কেন?

তোতামিয়াঁ বারান্দায় উঠে একটা চেয়ারে বসে বললেন,—আগে চা। তারপর কথা হবে। হ্যাঁ—পুঁটুর কোন ক্লাস হল এবার?

বললুম,—ক্লাস সিক্স।

বাহ! এই নে। তোর জন্য কত ইংরেজি গল্পের বই এনেছি দ্যাখ! —তোতামামা কয়েকটা রংচঙে লম্বা-চওড়া বই বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। তারপর বাবাকে বললেন,—তোমার জন্য এই সেফটি রেজার, ব্লেড আর দাড়ি কামানোর লোশন এনেছি। আর আমার বোনটির জন্য এনেছি পাপুয়া দ্বীপের আদিবাসীদের তৈরি কতরকমের গয়না। হ্যাঁ—একসেট সাবানও এনেছি।

মা তখনই চা করতে গেলেন। বাবা পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। আমি থামে হেলান দিয়ে তোতামামার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। ইনি কি সত্যি সেই তোতামামা, নাকি অন্য কেউ? কিছু বলা যায় না। আমাদের পাড়ার শেষে একটা কবরখানা আছে। কেন যেন গা ছমছম করতে লাগল।

বাবা বললেন,—দেখো ভাই তোতা! তোমার সেফটি রেজার, ব্লেড, আর এই লোশন দিয়ে দাড়ি কামিয়ে আমার অবস্থা তোমার মতো হবে না তো?

তোতামামা একটু হেসে বললেন,—আরে না-না! ওগুলো খাঁটি অস্ট্রেলিয়ায় তৈরি। ও সবের সঙ্গে আমার গোঁফ হারানো বা মাথাজুড়ে টাক গজানোর কোনও সম্পর্ক নেই।

মা শিগগির চা এনে দিয়ে মোড়ায় বসে উপহারগুলো দেখতে থাকলেন। আমি বললুম,—এবার বলুন না তোতামামা, আপনার গোঁফের কী হল? মাথায় অমন টাক পড়ল কেন?

তোতামামা আস্তেসুস্থে চা খাওয়ার পর বললেন,—সে এক সাংঘাতিক ঘটনা। বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু যা বলছি, তা কত সত্যি আমি জানি। আমার অবস্থা এমন কেন হল এবার শোনো।

তোতামামা বলতে শুরু করলেন তাঁর গোঁফ হারানো আর টাক গজানোর রোমাঞ্চকর কাহিনি।...

—আমাদের জাহাজটা যাত্রিবাহী নয়, মালবাহী ছোট জাহাজ। পৃথিবীর এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে নানা কোম্পানির নানারকম জিনিস পৌঁছে দেয়। জাহাজটার মালিক এক ব্রিটিশ কোম্পানি। জাহাজের নাম 'ভিক্‌ট্রি।

গত বছর নভেম্বরে কলকাতা থেকে হংকংয়ে মাল পৌঁছে দিয়ে আবার সেখান থেকে মাল বোঝাই করে জাপানের হোক্কাইদো দ্বীপের কাহিরা বন্দরে পৌঁছেছিলুম। কাহিরা থেকে ডিসেম্বরের শেষাশেষি আমাদের জাহাজ রওনা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন বন্দরের দিকে।

প্রশান্ত মহাসাগরের যে অঞ্চল দিয়ে আমরা ভেসে যাচ্ছিলুম, তাকে পলিনেশিয়া বলা হয়। জাহাজের গতি দক্ষিণে। বাঁ-দিকে পাপুয়া এবং নিউজিল্যান্ড, ডানদিকে অস্ট্রেলিয়া। ওখানে প্রশান্ত মহাসাগর আর তত চওড়া নয়। জানুয়ারি মাস। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল শুরু হয়েছে। উত্তর গোলার্ধে যখন শীত, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্ম!

বেশ যাচ্ছিলুম। হঠাৎ এক রাত্রে শুরু হয়ে গেল তুমুল ঝড়বৃষ্টি। ঝড়ের গতিও দক্ষিণে। কিন্তু সেই ঝড় এমন সাংঘাতিক যে, আমাদের ছোট জাহাজটার অবস্থা হল শোচনীয়। গতি নিয়ন্ত্রণ করে যে যন্ত্রটা, তার নাম রেডার। আমরা নাবিকরা বলি র‍্যাডার। পাপুয়ার পাশ ঘেঁষে যাওয়া বিপজ্জনক। কারণ সমুদ্রের তলায় ওখানে আছে কয়েকটা ডুবোপাহাড়। কিন্তু ঝড়ের দাপটে র‍্যাডার অকেজো হয়ে গিয়েছিল। ডুবোপাহাড়ের কিনারায় ধাক্কা লেগেই এই দুরবস্থা।

তারপর আর জাহাজের গতি সামাল দেওয়া গেল না। র‍্যাডার নৌকোর হালের কাজ করে। হাল ভাঙলে নৌকোর কী অবস্থা হয় ভাবো! ক্যাপ্টেন হুবার্ট বেতারে 'এস. ও. এস.' অর্থাৎ বিপদসংকেত পাঠাতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কোনও বন্দর থেকে সাড়া পাচ্ছিলেন না।

অবশেষে ঝড় যখন থামল, তখন বিপদের ওপর বিপদ, অগভীর সমুদ্রের তলায় জাহাজ গেল আটকে। ইঞ্জিনও গেল বিগড়ে। কারণ জাহাজের প্রপেলার সমুদ্রতলে চড়ার ধাক্কায় বেঁকেচুরে গিয়েছিল। জলের গভীরতা মেপে আমরা প্রমাদ গুনলুম। মাত্র বিশ ফুট গভীরতা সেখানে! ছোট জাহাজ হলেও দুশো টন মাল তো ভর্তি।

ক্যাপ্টেন হুবার্ট অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ হিসেব করছিলেন কম্পাসযন্ত্রে। তাঁর কেবিন থেকে বেরিয়ে জাহাজের মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার আর নাবিকদের ডেকে তিনি বললেন,—আমরা বিপন্ন। কারণ আমরা এসে পড়েছি সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কাছে। অক্ষাংশ ১০ ডিগ্রি এবং দ্রাঘিমাংশ ১৬০ ডিগ্রি থেকে সামান্য দূরে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই অগভীর সমুদ্রের পূর্বে এবং খুব কাছাকাছি যে দ্বীপটা আছে, তার নাম ডেভিলস আইল্যান্ড।

অর্থাৎ কিনা শয়তানের দ্বীপ! আমরা চমকে উঠেছিলুম। কারণ নাবিকজীবনে ওই জনহীন দ্বীপ সম্পর্কে অনেক ভুতুড়ে গল্প শুনেছি। ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন হুবার্ট দূরবিনে দেখে নিয়ে আবার বললেন,—হ্যাঁ। আমাদের বাঁ-দিকে একমাইল দূরে একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি। ওটাই যে শয়তানের দ্বীপ তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিছুক্ষণ পরে দিনের আলো ফুটে উঠল। খালিচোখেই দ্বীপটা দেখতে পেলুম। নাবিকদের মধ্যে বব নামে এক মার্কিন যুবক আর পরেশ রায় নামে একজন বাঙালি যুবক ছিল আমার খুব ঘনিষ্ঠ। পুঁটুর মতোই, কেন জানি না, পরেশ আমাকে বলত তোতামামা। আর বব বলত আঙ্কল টোটা। তো ববের কাছে ছিল বাইনোকুলার। সে বাইনোকুলারে দ্বীপটা দেখতে-দেখতে বলল,—শুধু জঙ্গল দেখতে পাচ্ছি আঙ্কল টোটা! গাছগুলোর চেহারা ভারি অদ্ভুত। তলায় ফার্নের ঝোপ আছে অবশ্য। আর একটা পাহাড়ও দেখতে পাচ্ছি। পাহাড় থেকে জলপ্রপাত নেমে গেছে মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যি কোনও জনমানব দূরের কথা, কোনও প্রাণী—এমনকী পাখি পর্যন্ত নেই। আশ্চর্য তো!

ববের কাছ থেকে বাইনোকুলার নিয়ে আমিও খুঁটিয়ে দেখে বললুম,—বব ঠিকই বলেছে। দ্বীপের গাছগুলোর মতো ওই রকম আজব গাছ কখনও দেখিনি। গাছগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে কটমট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। পরেশও আমার কাছে থেকে বাইনোকুলার নিয়ে দ্বীপটা দেখতে থাকল!

তোতামামা শ্বাস ছেড়ে চুপ করলেন। বাবা বললেন,—তারপর কী হল বলো!

তোতামামা একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, শেষে বেতারযন্ত্রটাও গেল বিগড়ে। এখন আমাদের একমাত্র ভরসা, যদি দূরে কোথাও কোনও জাহাজ বা মাছধরা ট্রলারের দেখা পাওয়া যায়। মাছধরা ট্রলার এই অগভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে আসে শুনেছিলুম।...

কিন্তু কোথায় কী? সাতদিন সাতরাত্রি কেটে গেল। খাদ্যের ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছিল। রেশন করে একটুকরো পাঁউরুটি আর একটুখানি জল খেয়ে কাটাচ্ছিলুম। অবশ্য নাবিকদের অনেকের কাছে মাছধরা ছিপ ছিল। সমুদ্রের মাছ কোনটা খাওয়া যায়, কোনটা বিষাক্ত বা অখাদ্য আমরা জানি। সেই মাছ পুড়িয়ে খেয়ে পেট ভরাচ্ছিলুম বটে, কিন্তু পানীয় জল? শেষে এমন অবস্থা হল, জলের অভাবে আমরা কাতর হয়ে পড়লুম।

তখন আমিই মরিয়া হয়ে ক্যাপ্টেনসায়েবকে বললুম,—স্যার! শয়তানের দ্বীপে একটা পাহাড়ে জলপ্রপাত বা ঝরনা, যা-ই হোক, আমরা দেখতে পেয়েছি। আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি শয়তানের তোয়াক্কা না করে ওই দ্বীপ থেকে পানীয় জল আনতে পারি।

ক্যাপ্টেন বললেন,—তোমার মাথাখারাপ হয়েছে টোটা? ওই দ্বীপে যারা যায়, শুনেছি তারা আর জ্যান্ত ফিরে আসে না।

তাই শুনে বব বলল,—আঙ্কল টৌটার সঙ্গে আমিও যেতে রাজি।

পরেশও বলল,—আমিও যাব। রবারের ভেলায় প্লাস্টিকের পাত্রে প্রচুর জল ভরে আনব।

দুই ভাগ্নের সাহসে আরও সাহসী হয়ে বললুম,—ক্যাপ্টেনসায়েব! আমাদের যেতে অনুমতি দিন। আমাদের চাই শুধু তিনটে আগ্নেয়াস্ত্র!

ক্যাপ্টেন একটু চিন্তাভাবনা করে বললেন,—এই অগভীর সমুদ্রে বহু দ্বীপ থেকে আদিবাসীরা মাছ ধরতে এসে আমাদের জাহাজ দেখতে পাবে। তখন তারা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। তাই আমি তোমাদের রাইফেল বা রিভলভার দিতে পারব না। বড়জোর দুটো শটগান আর দুটো করে চারটে কার্তুজ দিতে পারি। ক্যাপ্টেনের কথায় যুক্তি ছিল।

তো বব আর আমি শটগান দুটো নিলুম। পরেশ নিল ঝোপজঙ্গল কাটা একটা ভোজালি জাতীয় ছোট্ট ধারালো দা। আমরা তিনজনে রবারের ভেলায় চেপে শয়তানের দ্বীপের বালিভরা বিচে পৌঁছলুম। তারপর জল ভরার তিনটে পাত্র নিয়ে রবারের ভেলাটা টানতে-টানতে ফার্নের জঙ্গলে লুকিয়ে রাখলুম।

আগেই বলেছি, দ্বীপের গাছপালার চেহারা কেমন যেন জ্যান্ত। এসব গাছ আমি জীবনে দেখিনি। কাছাকাছি গিয়ে মনে হচ্ছিল ফিসফিস শব্দে গাছগুলো যেন আমাদের বিরুদ্ধে কী চক্রান্ত করছে। ফার্নের ঝোপ কেটে যত এগোচ্ছি পাহাড়টার দিকে, তত চমকে উঠে পিছনে তাকাচ্ছি। কেউ বা কারা যেন গোপনে বা অদৃশ্য থেকে আমাদের পিছনে হেঁটে আসছে। বব তো একবার চমকে উঠে শটগান তাক করে গুলি ছুড়তে যাচ্ছিল। ওকে আটকে না দিলে সত্যি গুলি ছুড়ত।

মিনিট কুড়ি হাঁটার পর দেখলুম, ওটা পাহাড়ি ঝরনাই বটে। প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু থেকে জলের ধারা নিচে আছড়ে পড়ে ছোট্ট একটা জলাশয় সৃষ্টি করেছে। বহু দ্বীপে এ ধরনের প্রস্রবণ আছে, সুপেয় জলের। ছোট্ট জলাশয়টা অন্তত বিশ ফুট নিচে একটা সংকীর্ণ উপত্যকায় অবস্থিত। তারপর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে। ঝোপ কেটে আমরা নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ এক অদ্ভুত—বেজায় উদ্ভুট্টে দৃশ্য দেখতে পেয়ে তিনজনই গুঁড়ি মেরে বসে পড়লুম।

ঝরনা যেখানে আছড়ে পড়ছে, তার পাশে একটা চওড়া কালো সমতল পাথর। সেই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে চারটে প্রাণী। কীরকম প্রাণী বলি।

ফুট চারেক উঁচু। তাদের সাদা গোঁফ-দাড়ি বুক ঢেকে পায়ের তলায় পৌঁছেছে। তাদের মাথার সাদা চুলও পিঠ ঢেকে পায়ের পেছনে মাটি ছুঁয়েছে। শুধু মুখের ওপরটা আর দুটো লিকলিকে হাত দেখা যাচ্ছে কাঁধ থেকে। বেজায় কালো রং। চোখগুলো যেন জ্বলছে।

ওরা কতকটা মানুষের মতো। অথচ মানুষ নয়। আমরা হতভম্ব হয়ে বসে আছি। কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। একটু পরে চারটে প্রাণীই ঝুপঝুপ করে জলাশয়ে ঝাঁপ দিল। সাঁতার কাটল কিছুক্ষণ। তারপর পাথরটাতে উঠে শরীর নাড়া

দিয়ে জল ঝেড়ে ফেলে রোদে বসল। মনে হল, ওরা দাড়ি আর চুল শুকিয়ে নিচ্ছে।

পরেশ ফিসফিস করে বলল,—তোতামামা! মনে হচ্ছে এরাই সেই বালখিল্য মুনি। মহাভারতে এদের কথা পড়েছি। ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন ক্রতু। ক্রতুর পুত্র ছিলেন বালখিল্য মুনিরা। শুধু একটা কথা মিলছে না। বালখিল্য মুনিদের সাইজ ছিল এক আঙুল লম্বা। পরেশ আমাকে বাংলায় কথাগুলো বলছিল। তাই বব চটে গিয়ে জানতে চাইল কী বলছে পরেশ? তখন পরেশ তাকে কথাগুলো যথাসাধ্য ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিল।

বব গম্ভীর হয়ে বলল,—তোমাদের ওই বই যারা লিখেছিল, তারা নিশ্চয় দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড ছিল। তাদের আঙুল কি তোমার মতো ছিল? পরেশ সায় দিল তার কথায়।

আধঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু বালখিল্যরা নড়ল না। তখন অধৈর্য হয়ে খাপ্পা বব আমি বাধা দেওয়ার আগেই শূন্যে ফায়ার করে দিল। নিচের উপত্যকায় প্রচণ্ড শব্দ হল। অমনি সেই দাড়িবাবারা—হ্যাঁ, পরে ঠাট্টা করে আমি তাদের দাড়িবাবা নাম দিয়েছিলুম—তারা চমকে গিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। তারপর কিচিরমিচির করে কী বলতে থাকল। ববকে আটকাতে পারলুম না। সে আবার শূন্যে ফায়ার করামাত্র দাড়িবাবা বা বালখিল্যরা পাহাড়ের গায়ে ঝোপজঙ্গলের ভেতর চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বব, তার পিছনে পরেশ, তার পিছনে আমি তিনটে জলের পাত্র নিয়ে দ্রুত নেমে গেলুম। সেই পাথরটা থেকে ঝরনার জল ভরতে শুরু করল বব আর পরেশ। আমি শটগান হাতে পাহারায় রইলুম।

হঠাৎ আমার মাথায় গোঁ চাপল। দুর্মতি আর কাকে বলে?

তোতামামা আবার জোরে শ্বাস ছেড়ে চুপ করলেন। বললুম,—তোতামামা! তারপর কী হল?

তোতামামা তাঁর মাথার চকচকে চামড়ায় হাত বুলিয়ে নিয়ে আবার তাঁর কাহিনি শুরু করলেন।

—হঠাৎ আমার মাথায় গোঁ চাপল। শটগানের গুলির শব্দে যারা ভয় পায়, তারা নিশ্চয় ভিতু। আমার হাতে শটগান আছে। দুটো কার্তুজ আছে। ধারালো দা আছে। তাছাড়া নাবিকজীবনে কত ভয়াবহ অবস্থায় পড়েছি। তা থেকে গায়ের জোর আর বুদ্ধির জোরে উদ্ধার পেয়েছি। এই চার ফুট দাড়ি-চুলওয়ালা দুপেয়ে প্রাণীগুলোকে ভয় পাওয়ার মানে হয় না। ওদের অন্তত একটাকে ধরে জাহাজে নিয়ে যেতে পারলে হইচই পড়ে যাবে।

আমি বব আর পরেশকে কিছু না বলেই খাড়াই বেয়ে সাবধানে উঠতে শুরু করলুম। ওরা আমাকে ডাকাডাকি করছিল। সাড়া দিলুম না। পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি গিয়ে দেখি জঙ্গলের ভিতরে সরু একটা পথ। ওই পথেই বিদঘুটে প্রাণীগুলো তাহলে

এসেছিল। কয়েক পা এগিয়ে গেছি, আচমকা দু-ধারের গাছ থেকে ঝুপঝুপ করে সেই দাড়িবাবারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন বুঝলুম, ওদের গায়ে কী সাংঘাতিক শক্তি! একজন আমার শটগান কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলল। বাকি তিনজন আমার পিঠে বসে ফরফর করে আমার জামা ছিঁড়ে ফেলে দাড়ি ঘষতে থাকল। ওহ্! সে কী সুড়সুড়ি! হাসব কী, চ্যাঁচাতে শুরু করলুম। তখন একজন হাত বাড়িয়ে আমার গোঁফসুদ্ধ মুখ চেপে ধরল। গোঁ-গোঁ করতে থাকলুম।

তারপর কী হয়েছিল মনে নেই। নিশ্চয় আতঙ্কে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলুম। কতক্ষণ পরে দেখি, বব আর পরেশ আমার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। জ্ঞান ফিরতেই বললুম,—ওরা কোথায়?

বব বলল,—তা জানি না। আমরা তোমাকে খুঁজতে এসে দেখি, এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছো তুমি। তোমার জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। পরেশ বলল,—তোমার শটগান কী হল তোতামামা?

অতিকষ্টে বললুম,—ওই জঙ্গলে ওরা ছুড়ে ফেলেছে। পরেশ জঙ্গলে খুঁজে শটগানটা কুড়িয়ে আনল। তারপর ওদের সাহায্যে অতিকষ্টে নিচে নেমে এলুম। জলের পাত্র তিনটে ঠিকই ছিল। পরেশ আর বব তিনটে পাত্র ধরাধরি করে নিয়ে চলল। আমি খাপ্পা হয়ে শটগানটা থেকে পাহাড়ের চূড়ার দিকে একটা গুলি ছুড়লুম।

কিন্তু তখনও জানতুম না এরপর কী ঘটবে।

ভেলায় চেপে জাহাজে ফিরে গেলুম। জাহাজসুদ্ধ লোক ভিড় করে দাড়িবাবা বা বালখিল্যদের গল্প শুনল। কিন্তু তারা বিশ্বাস করল না। শুধু ক্যাপ্টেন হুবার্ট বললেন, —ওটার নাম ডেভিলস আইল্যান্ড কেন তা এবার জানা গেল। বব, পরেশ আর টোটা যাদের দেখেছে, তারা সেই শয়তান। যাই হোক, টোটাকে শয়তানরা ছুঁয়েছিল। টোটাকে একটা আলাদা কেবিনে রাখতে হবে। ওর গায়ে শয়তানের ভাইরাস লেগেছে। সাবধান! কথাগুলো শুনে আমি একটু ভড়কে গেলুম। তবে পুরো একটা কেবিনে একা থাকার সুযোগ পেয়ে একটু খুশিও হয়েছিলুম।

সেদিনই বিকেলে পাপুয়া দ্বীপের একটা মাছধরা ট্রলার মাছ ধরতে এসেছিল ওই অঞ্চলে। নাবিকদের পতাকা নাড়ানো দেখে তারা আমাদের জাহাজের পাশে এসেছিল। তারপর ক্যাপ্টেনের মুখে সব কথা শুনে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন অফিসারকে ট্রলারে চাপিয়ে নিয়ে গেল।

মাঝরাতে একটা ছোট জাহাজ এসে প্রায় একমাইল উত্তরে নোঙর করেছিল। সেখান থেকে রবারের ভেলায় পালাক্রমে আমাদের জাহাজের লোকজনকে নিয়ে গেল। বাকি রইলেন শুধু ক্যাপ্টেন হুবার্ট আর আমি। ক্যাপ্টেন বললেন,—আমাদের জাহাজের সব মাল খালাস করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্রিসবেন থেকে একটা মালবাহী জাহাজ আসছে। সেটা না আসা পর্যন্ত আমাকে থাকতে হবে। আর টোটা! তোমাকে শয়তানগুলো ছুঁয়েছে। তোমাকে কারও সংস্পর্শে যেতে দেওয়া হবে না। সেই জাহাজে তুমি আমার সঙ্গে যাবে। কথা শুনে খুব মনমরা হয়ে গেলুম।

যাই হোক। কেবিনে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম শেষ রাত্রে! হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর চমকে উঠলুম। এ কী! আমার পা পর্যন্ত জঙ্গলের মতো দাড়ি গজিয়েছে কেন? লাফিয়ে উঠে বসলুম। সেই রকম লম্বা চুল আমার মাথা থেকে পায়ের পেছন দিকে লুটিয়ে পড়ল। সর্বনাশ! আমিও যে দাড়িবাবা হয় গেছি! চিৎকার করে ডাকলুম,—ক্যাপ্টেন সায়েব! ক্যাপ্টেনসায়েব! ক্যাপ্টেন হবার্ট এসেই আমাকে দেখে রিভলভার বের করেছিলেন। বললুম,—আমি আপনার সেই নাবিক টোটা স্যার! দয়া করে গুলি করে আমাকে মেরে ফেলবেন না। ক্যাপ্টেন তখন দড়াম করে কেবিনের দরজা এঁটে বাইরে থেকে বললেন,—তালা আটকে দিচ্ছি! টোটা! তুমি টুঁ শব্দটি করবে না। করলেই গুলি করে মেরে ফেলব। আর শোনো! তোমাকে দেখলে ব্রিসবেনে হইচই শুরু হয়ে যাবে। তাই গোপনে তোমাকে আমার চেনা এক জীববিজ্ঞানী এবং ডাক্তারের ল্যাবে নিয়ে যাব। সাবধান! টুঁ শব্দ নয়।

—কথা না বাড়িয়ে এবার সংক্ষেপে বলি। বোনটি! তার আগে আর এক কাপ চা চাই।

মা চা করে আনতে কিচেনে চলে গেলেন। দেখলুম, বাবা মিটিমিটি হাসছেন। তোতামামা বললেন,—বলেছিলুম বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমার মাথা, নাকের নিচেটা আর গালের অবস্থা দেখো।...

চা খেয়ে তোতামিয়াঁ তাঁর কাহিনি শুরু করলেন।

ব্রিসবেনে জীববিজ্ঞানী এবং ডাক্তার রবার্ট স্টিলারের ল্যাবে প্রায় একমাস ধরে গোপনে আমার চিকিৎসা চলেছিল। ডাঃ স্টিলার বলেছিলেন,—সলোমন আইল্যান্ড এলাকায় অনেক অদ্ভুত প্রাণী এখনও থাকতে পারে। তাদের গায়ের লোম থেকে এরকম অদ্ভুত সংক্রামক ব্যাধি হওয়া খুবই সম্ভব। যাই হোক, আমি যে লোশন তৈরি করেছি, তার ফল পাওয়া গেছে। তবে এই নাবিকবেচারার দুর্ভাগ্য, আর ওর চুল গজাবে না। গোঁফ-দাড়িও গজাবে না। এর শরীরে আর লোম পর্যন্ত গজাবে না। কিন্তু সাবধান নাবিক! তোমাকে এখনও তিনমাস আমার লোশন মেখে স্নান করতে হবে প্রতিদিন। এর মধ্যে একদিন লোশন না মাখলে কী ঘটবে তা বলতে পারছি না। কথা শুনে কোনও প্রশ্ন করতে পারিনি। ডাঃ স্টিলার ক্যাপ্টেন হবার্টের মতোই রগচটা মানুষ।

বলে তোতামামা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাবা তাঁর উপহার দেওয়া লোশন দেখিয়ে বললেন, 'ওহে তোতামিয়াঁ! এই লোশন তোমার সেই লোশন নয় তো?

অমনি তোতামিয়াঁ আগের সময়ের মতো ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হেসে বললেন,—না, না! আমার লোশন কবে ফুরিয়ে গেছে। ওটার গায়ে কী লেখা আছে দেখো না! শেভিং লোশন।

বললুম,—আচ্ছা তোতামামা! আপনি সেই ডাক্তারকে কেন বলেননি, অন্তত গোঁফ গজানোর কোনও লোশন দিন! তোতামামা! আপনার গোঁফ না থাকলে আপনাকে যে কেউ চিনতে পারবে না।

তোতামামা বললেন,—চেপে যা পুঁটু! এ শহরে কেউ যেন টের না পায় আমার গোঁফ নেই। তাহলে কেউ আমাকে গ্রাহ্য করবে না। জানিস? আমি ছোটভাইয়ের বাড়ি ঢুকিনি। চুপিচুপি সন্ধ্যাবেলা শুধু তোদের বাড়ি এসেছি। এখনই চুপিচুপি কেটে পড়ব। কলকাতা চলে যাব।

বাবা বললেন,—তা কেন? তুমি নকল গোঁফ পরে মাথায় পরচুলো চাপিয়ে নেবে।

তোতামামা হাসলেন। —তা মন্দ বলোনি। কলকাতা গিয়ে চিৎপুর থেকে যাত্রা-থিয়েটারের দোকানে গোঁফ-পরচুলো কিনে বরং ফিরে আসব। ইশ! এই সামান্য বুদ্ধিটা মাথায় কেন যে আসেনি! আসলে পুঁটুকে বইগুলো দেওয়ার জন্য আমার তর সইছিল না। হ্যাঁ—আসলে সেই দাড়িবাবারা! শয়তানগুলো আমার বুদ্ধিসুদ্ধি শেষ করে দিয়েছে।

বলে তোতামিয়াঁ ব্যাগ থেকে টুপি বের করে মাথায় চাপিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন।...

একটু পরিশিষ্ট আছে। তোতামামা সত্যি নকল গোঁফ আর পরচুলো পরে ফিরে এসেছিলেন। আমি, বাবা, মা—কেউই রটিয়ে দিইনি ব্যাপারটা। বরং খুশিই হয়েছিলুম। সেই পেল্লায় গোঁফ ছাড়া কি তোতামামা আর তোতামামা থাকেন? সুকুমার রায়ের পদ্যে পড়েছিলুম না? গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা!

মুরারিবাবুর দেখা লোকটা

শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যায় তুলকালাম বৃষ্টি। সেই সময় আড্ডাটা জমেছিল ভালো। ইতিমধ্যে গোপালবাবুর কাজের লোক কানুহরি ছাতার আড়ালে মুড়ি আর তেলেভাজা এনেছিল। বৃষ্টিতে বেচারার একেবারে কাকভেজা অবস্থা। ভিজে কাপড় বদলে নিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে সে এবার ট্রে-ভর্তি চা আনবে। ঠিক এই সময়ে মুরারিবাবু আর জিতেনবাবুর মধ্যে কী সূত্রে তর্কটা বেধে গেল অন্যেরা খেয়াল করেননি।

জিতেনবাবু বললেন,—বোগাস! আমি বলছি নেই!

মুরারিবাবু বললেন,—আমি বলছি আছে!

—সায়েন্সকে তুমি অস্বীকার করতে পারো?

—রাখো তোমার সায়েন্স! আমি স্বচক্ষে দেখেছি! আর তুমি বলছ নেই!

—তুমি ভুল দেখেছ! সাইকোলজিতে হ্যালুসিনেশন বলে একটা কথা আছে জানো? দৃষ্টিবিভ্রম।

—রাখো তোমার সাইকোলজি!

গোপালবাবু গৃহকর্তা। বন্ধুদের মধ্যে কী নিয়ে তর্ক হচ্ছে, তা না জানলে কেমন করে মিটিয়ে দেবেন? তাই তিনি বললেন,—আহা! ব্যাপারটা কী?

জিতেনবাবু বাঁকা হেসে বললেন,—ভূত! যে যুগে মানুষ চাঁদে পাড়ি দিয়েছে, মঙ্গলগ্রহে স্পেসশিপ পাঠিয়েছে, সেই যুগে মুরারি বলছে কিনা...যত্তসব উদ্ভট কথাবার্তা!

মুরারিবাবুও আরও বাঁকা হেসে বললেন,—তুমি তো কলকাতায় সারাটা জীবন কাটাচ্ছ! কখনও আমার মতো গ্রামেগঞ্জে থেকেছ? আমার মতো একলা রাত-বিরেতে নিরিবিলি জায়গায় কখনও ঘুরেছ?

নাড়ুবাবু টিপ্পনী কাটলে,—ঠিক বলেছ ভায়া। কলকাতা একটা মহানগর। সবসময় আলো, ভিড়ভাট্টা। এখানে ভূত আসবে কোন সাহসে?

কানুহরি চায়ের কাপপ্লেট ভর্তি ট্রে রেখে গেল। চা খেতে-খেতে তর্কটা ধামাচাপা পড়েছিল। কিন্তু নাড়ুবাবুই সেটা আবার খুঁচিয়ে দিলেন।—জিতেন বলছে ভূত নেই। আর মুরারি বলছে আছে। বেশ তো! মুরারিই বলুক, সে কোথায় ভূত দেখেছে!

গোপালবাবু সায় দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। বৃষ্টিটা বেশ জমে উঠেছে। মুরারি! তুমি গল্পটা বলো।

মুরারিবাবু জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—গল্প নয়। একেবারে সত্যিকার ঘটনা। বিশ্বাস করা না-করা তোমাদের ইচ্ছে।

নাড়ুবাবু বললেন—কী বলছ ভায়া? আজ অবধি তোমার মুখে একটা মিথ্যা কথা শুনিনি। তুমি বলো। শোনা যাক।

তারপর তিনি জিতেনবাবুকে বললেন,—জিতেন! তুমি কিন্তু স্পিকটি নট। চুপচাপ বসে থাকবে।

মুরারিবাবু চা শেষ করার পর বললেন,—সে প্রায় বছর পনেরো-ষোলো আগের কথা। তখন আমি সরকারি চাকরি করি। নদিয়া জেলার বাবুগঞ্জে আমার অফিস। আমার কাজ ছিল ওই অঞ্চলের গ্রামে-গ্রামে ঘুরে সরকারি সাক্ষরতা প্রকল্পে কতটা কাজ হচ্ছে, তার হিসেব নেওয়া। বাবুগঞ্জ অফিসে একটামাত্র জিপগাড়ি ছিল। সেটা ব্যবহার করতেন আমার উর্ধ্বতন অফিসার। আমি কখনও সাইকেলে, কখনও বাসে, আবার কখনও ট্রেনে চেপে বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করতুম।

নাড়ুবাবু বললেন,—আহা! ভূত দেখার ব্যাপারটা বলো!

মুরারিবাবু একটু চটে গিয়ে বললেন,—আগে ব্যাকগ্রাউন্ড না বললে তো বুঝবে না।

—ঠিক আছে। ব্যাকগ্রাউন্ড বোঝা গেল। এবার ভূতের ব্যাপারটা শোনা যাক।

মুরারিবাবু দরজার বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন,—মে মাসের মাঝামাঝি হবে। হ্যাঁ—সেদিন ছিল বুদ্ধপূর্ণিমা। বাবুগঞ্জ থেকে ট্রেনে চেপে ঝাঁপুইহাটি

নামে একটা গ্রামে গিয়েছিলুম। স্টেশনটা মাঠের মধ্যে। সেখান থেকে সাইকেলরিকশোয় গ্রামে পৌঁছলুম। তখন বেলা প্রায় বারোটা বাজে। মোটে চারটে স্টেশন দূরত্ব। ট্রেনের স্পিড কেমন তা বোঝো তাহলে! আসলে আগের বছর প্রচণ্ড বন্যা হয়েছিল। রেললাইন তখনও ঠিকমতো সারানো হয়নি।

গোপালবাবু বলে উঠলেন,—কী কাণ্ড! তোমার ভূত আসতে বড্ড দেরি হচ্ছে মুরারি!

নাড়ুবাবু টিপ্পনী কাটলেন।—সেই ট্রেনের স্পিডের মতো!

মুরারিবাবু বললেন,—ঝাঁপুইহাটির পঞ্চায়েত-কর্তার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম করলুম। বিকেলে সাক্ষরতা প্রকল্পের কাজকর্ম খাতাকলমে দেখলুম। দু-একজনকে ডেকে ব্ল্যাকবোর্ডে নাম লিখতেও বললুম। কিন্তু বুঝতে পারলুম, খাতাকলমের সঙ্গে আসল কাজের মিল নেই। কী আর করা যাবে? মুখে উপদেশ দিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল। বাবুগঞ্জ ফেরার ট্রেন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। পঞ্চায়েত-কর্তা খাতির করে আমাকে তাঁর মোটরসাইকেলে চাপিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। সাহস পেলুম না। রাস্তার যা অবস্থা!

নাড়ুবাবু গম্ভীরগলায় বললেন,—ভূত!

—এবার সেই ঘটনায় আসছি। স্টেশনে পৌঁছে খোঁজ নিলুম। ডাউন ট্রেন সময়মতো আসার গ্যারান্টি নেই। স্টেশনে কয়েকজনমাত্র যাত্রী অপেক্ষা করছিল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। খোলা জায়গা বলে উত্তাল বাতাস বইছে। প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে খালি বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরালুম।

গোপালবাবু বললেন,—তুমি সিগারেট খেতে নাকি? কী করে ছাড়লে বলো তো মুরারি?

নাড়ুবাবু গম্ভীর গলায় ফের বললেন,—ভূত!

মুরারিবাবু বললেন,—বসে আছি তো আছি। সাতটা দশ বেজে গেল। ট্রেনের পাত্তা নেই। এমন সময় একটা লোক এসে বলল,—বেঞ্চিতে একটু বসতে পারি সার? লোকটার চেহারা আবছা দেখা যাচ্ছিল। পরনে খাটো ধুতি আর হাফশার্ট। পায়ে যেমন-তেমন একটা স্যান্ডেল।

বললুম,—নিশ্চয় বসতে পারো। বেঞ্চটা তো খালি আছে। লোকটা বেঞ্চের শেষপ্রান্তে বসল। তারপর বলল,—এখন যদি আমি একটা বিড়ি খাই, কিছু মনে করবেন না তো সার! এ তো দেখছি বিনয়ের অবতার। বললুম,—তুমি বিড়ি খাবে, তাতে আমার মনে করার কী আছে?

লোকটা পকেট থেকে দেশলাই বের করে আগুন জ্বেলে বিড়ি ধরাল। ওই একটুখানি আলোয় দেখলুম, লোকটার মুখে খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি আর বাঁদিকের গাল থেকে গলা অবধি ক্ষতচিহ্ন। তার মুখটা দেখে কেন যেন একটু অস্বস্তি জাগল। তার গায়ের রঙও কুচকুচে কালো। কেউ নিশ্চয় লোকটার গাল ও গলায় চপারের কোপ মেরেছিল।

গোপালবাবু বললেন,—তাহলে লোকটা খুনখারাপিতে মরে যাওয়ার পর ভূত হয়েছিল?

মুরারিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন,—আহা, পুরোটা বলতে দাও!

নাড়ুবাবু বললেন,—হ্যাঁ, বলো।

মুরারিবাবু বললেন,—লোকটা বিড়ি টানতে-টানতে বলল,—সারের যাওয়া হবে কোথা? বিরক্ত হয়ে বললুম,—বাবুগঞ্জ। লোকটা কেমন অদ্ভুত শব্দ করে হাসল। তারপর বলল,—বাবুগঞ্জ? এ লাইনে এই এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। বাবুগঞ্জ থেকে আসবার ট্রেন পাওয়া যত সোজা, ফিরে যাওয়ার ট্রেন পাওয়া তত কঠিন। দেখুন না ট্রেন কখন আসে। এমন হতে পারে এ রাত্তিরে ট্রেন আর এলই না। অবাক হয়ে বললুম,—সে কী! সে আবার সেইরকম বিদঘুটে হেসে বলল,—এই যে আমাকে দেখছেন। রোজ ঠিক সন্ধেবেলা বাবুগঞ্জ যাব বলে স্টেশনে এসে বসে থাকি। ট্রেন আর আসে না। রেলের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে সার! এতক্ষণে সন্দেহ হল, লোকটা নিশ্চয় পাগল। তাই চুপচাপ বসে রইলুম। লোকটা বকবক করে যাচ্ছিল। ইচ্ছে হল, তাকে ধমক দিয়ে উঠে যেতে বলি। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলুম না। বলা যায় না, কোনও গুণ্ডাবদমাশ হতে পারে। আমার হাতে একটা অ্যাটাচি কেস। টাকা আছে ভেবে হয়তো সে এটা কেড়ে নিয়ে পালানোর ফিকিরে এখানে এসেছে। প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে বসা আমার উচিত হয়নি। এই ভেবে উঠে যাব ভাবছি, স্টেশনে ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজল। অমনি লোকটা বলল,—দেখছেন তো? বাবুগঞ্জের দিক থেকে ট্রেন আসছে। ওই দেখুন সিগন্যালবাতি নীল হল। লক্ষ করে দেখলুম, সত্যি তাই। লোকটা বলল,—এইজন্যে জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে সার! বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এ কী অবস্থা হয়েছে দেখুন। একটু পরে স্টেশনের কাছে কজন যাত্রীকে প্ল্যাটফর্মের সামনে যেতে দেখলুম। তারপর সত্যিই ডাউনের দিক থেকে ট্রেনের আলো দেখা গেল। তারপর ট্রেনটা হুইসল দিতে-দিতে স্টেশনে ঢুকছিল। এই সময় দেখলুম, বেঞ্চ থেকে লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপরই ঘটে গেল ভয়ংকর ঘটনা। ট্রেনটা এসে আমার সামনে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে থামবার আগেই লোকটা ইঞ্জিনের সামনে লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুরারিবাবু চুপ করলে নাড়ুবাবু বললেন,—এ তো সুইসাইড কেস। তোমার ভূত কোথায়?

জিতেনবাবু এতক্ষণে সকৌতুকে বলে উঠলেন,—সবে তো লোকটা মারা পড়ল। ভূত হতে একটু সময় লাগবে না?

মুরারিবাবু তাঁর কথা গ্রাহ্য করলেন না। তাঁকে এবার কেমন নিস্তেজ দেখাচ্ছিল। আবার একটা শ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন,—কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! অমন একটা ঘটনা ঘটে গেল। ড্রাইভারের তো চোখে পড়ার কথা। কিন্তু কোনও হইহল্লা শুনলুম না। ট্রেনটা হুইসল দিয়ে দিব্যি চলে গেল। তখন আমি আতঙ্কে, উত্তেজনায় বেঞ্চ ছেড়ে

উঠে দাঁড়িয়েছি। লোকটার রক্তাক্ত হাড়গোড়ভাঙা লাশ নিশ্চয় নিচে লাইনে পড়ে আছে। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখতেও ভয় করছে। এমন সময় রেলের একচোখো লণ্ঠন হাতে একজন খালাসিকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলুম। সে ভেবেছিল আমি বিনা টিকিটের যাত্রী। আমার কাছে এসে সে টিকিট দাবি করতেই বললুম,—আমি যাব বাবুগঞ্জ। আমার টিকিট আছে। কিন্তু এক্ষুনি একটা লোক ওইখানে ইঞ্জিনের সামনে লাফিয়ে পড়ে সুইসাইড করেছে।

সে অবাক হয়ে বলল,—সে কী? কখন?

বললুম,—গিয়ে দেখো। লাইনে তার লাশ পড়ে আছে।

খালাসিটি লণ্ঠন হাতে প্ল্যাটফর্মের নিচে লাইনে আলো ফেলে এদিক-ওদিক দেখার পর বলল,—কোথায় লাশ? আপনি টিকিট কাটেননি। তাই আজেবাজে কথা বলে কেটে পড়ার তালে আছেন! খাপ্পা হয়ে তাকে আমার টিকিট দেখালুম।

তখন সে হাসতে-হাসতে বলল,—আপনি ভুল দেখেছেন সার। মাথায় জেদ চেপে গেছে আমার। তাকে বললুম,—লাশটা ইঞ্জিনের চাকার ধাক্কায় হয়তো দূরে ছিটকে গেছে। চলো। খুঁজে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

গোপালবাবু বললেন,—লাশ দেখতে পেলে?

—নাঃ! অনেক খোঁজাখুঁজি করে লাশ তো দূরের কথা রেললাইনে রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলুম না। আতঙ্ক আর অস্বস্তিতে আমার শরীর তখন অবশ। খালাসি বলল,—ডাউন ট্রেন আসতে আজ একটু দেরি হবে সার। আগের স্টেশনে মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এবার মালগাড়ি পাস হবে। তারপর ডাউন ট্রেন আসবে।

যাই হোক, সে স্টেশনের দিকে চলে যাওয়ার পর সেখানে দাঁড়াতে আর সাহস হল না। স্টেশনের কাছাকাছি একটা বেঞ্চের উপর গাছের ছায়া পড়েছিল। সেই বেঞ্চে গিয়ে বসলুম। তারপর দেখলুম, বেঞ্চের অন্য প্রান্তে কেউ বসে আছে।

নাড়ুবাবু বলে উঠলেন,—সেই লোকটা নয় তো?

মুরারিবাবু বললেন,—হ্যাঁঃ! সেই ব্যাটাচ্ছেলে! আমি যেই বসেছি, অমনি সে সেইরকম বিদঘুটে হেসে বলল,—খালাসির সঙ্গে রেললাইনে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন সার? তখন আর ভয়-টয় নেই আমার। রাগে মাথায় আগুন ধরে গেছে। বললুম,—তুমি দেখছি একেবারে ম্যাজিশিয়ান! আমাকে ম্যাজিক দেখিয়ে ছাড়লে!

লোকটা বলল,—না সার! ম্যাজিক জানলে তো কত টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়ে যেতুম। আসলে কী জানেন সার? বাঁচতে আমার আর একটুও ইচ্ছে নেই। তাকে থামিয়ে দিয়ে বললুম,—তোমার নাম কী? বাড়ি কোথায়?

লোকটা বলল,—কিচ্ছু মনে নেই। সব ভুলে গেছি। এবার মনে হল, লোকটা সত্যিই পাগল। আর তাকে যে আপ ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছিলুম, সেটা নিশ্চয় আমার চোখের ভুল। প্রচণ্ড শব্দ করে ট্রেনটা আসছিল। এ সময় ট্রেনের দিকেই আমার মনোযোগ থাকা স্বাভাবিক। লোকটার কথা শুনে আর হঠাৎ উঠে যাওয়া দেখে ব্যাপারটা আমি কল্পনাই করেছিলুম।

জিতেনবাবু হোহো করে হেসে উঠলেন। —তাহলে কী দাঁড়াল? বলছিলুম না ভূতের ব্যাপারটা সাইকোলজিকাল। হ্যালুসিনেশন!

মুরারিবাবু গম্ভীর মুখে বললেন,—আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।

নাড়ুবাবু বললেন,—তাহলে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলো। বৃষ্টি থেমে গেছে মনে হচ্ছে। বাড়ি ফিরতে হবে।

মুরারিবাবু বললেন,—লোকটা আবার বকবক করতে থাকল। কান দিলুম না। একটু পরে দেখলুম, আপের সিগন্যাল নীল হল। স্টেশনমাস্টার বেরিয়ে এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একচোখো লণ্ঠনে নীল রঙের আলোটা নাড়তে থাকলেন। তারপর মালগাড়ির ইঞ্জিনের আলো দেখা গেল। আলোর দিকে তাকিয়ে আছি। তারপর ইঞ্জিনটা যেই কাছাকাছি এসেছে, অমনই বেঞ্চ থেকে লোকটা আগের মতো উঠে দৌড়ে গিয়ে রেললাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গোপালবাবু বললেন,—তারপর? তারপর?

—নাঃ! আমার চোখের ভুল নয়। মালগাড়িটা ধীরে-সুস্থে স্টেশন পেরিয়ে গেল। আমি তার আগেই বেঞ্চ থেকে উঠে স্টেশনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। স্টেশনের বারান্দায় কয়েকজন যাত্রী বিরক্ত হয়ে স্টেশনমাস্টারকে ঘিরে ধরে ডাউন ট্রেনের কথা জিগ্যেস করছে আর রেলদফতরের মুন্ডুপাত করছে।

নাড়ুবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন,—এই তোমার ভূত?

মুরারিবাবু বললেন,—না। শেষটুকু শোনো। তবে না বুঝবে?

—বেশ। বলো।

—বাবুগঞ্জ ফেরার ডাউন ট্রেন এল রাত প্রায় সাড়ে আটটায়। ট্রেনে ভিড় ছিল। তবে যে কম্পার্টমেন্টে উঠেছিলুম, একটা সিট পেয়ে গেলুম। ট্রেন ছাড়ল। একটা করে স্টেশন আসছে আর ভিড় একটু করে ফাঁকা হচ্ছে। বাবুগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছনোর আগে হঠাৎ দৃষ্টি গেল আমার বাঁ-দিকে একটু তফাতে। বেঞ্চের কোণে হেলান দিয়ে বসে আছে সেই লোকটা! হ্যাঁ—সে-ই বটে। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। গায়ে ছাইরঙা হাফশার্ট। পরনে খাটো ধুতি। বাঁদিকের গাল থেকে গলা পর্যন্ত দাগড়া-দাগড়া ক্ষতচিহ্ন। সে আমার দিকে এবার তাকাল। হিংস্র দৃষ্টি। চোখদুটো নিষ্পলক। আতঙ্কে আমার শরীর তখন প্রায় অবশ। দৃষ্টি সরিয়ে নিলুম। একটু পরে বাবুগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ানোমাত্র আমার পিছনের দিকের দরজা দিয়ে নেমে গেলুম।

গোপালবাবু বললেন,—হ্যাঁ। তাহলে লোকটাকে ভূতই বলতে হবে।

নাড়ুবাবু গম্ভীরমুখে বললেন,—ভূত! হান্ড্রেড পারসেন্ট ভূত!

জিতেনবাবু বাঁকা হেসে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—ওহে গোপাল! আমি একবার বাথরুমে যাব।

গোপালবাবুর বাড়িটা পুরোনো আমলের। এই বসার ঘরের সংলগ্ন বাথরুম

নেই। পিছনের দিকে এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় ফল-ফুলের গাছ আর ঝোপঝাড় আছে। বাউন্ডারি পাঁচিল ঘেঁষে একটা বাথরুম আছে। সেদিকের দরজা খুলে বেরুলেন জিতেনবাবু। গোপালবাবু বললেন,—ওই সুইচ টিপে আলো জ্বেলে নাও জিতেন।

জিতেনবাবু বললেন,—আমার আলোর দরকার নেই। তবে বৃষ্টিতে জায়গাটা পিছল হয়ে আছে। বলে তিনি ঘুরে এসে সুইচ টিপে দিলেন। তারপরই তাঁর চিৎকার শোনা গেল। —কে রে? কে ওখানে? কানুহরি? অ্যাঁ! এ কী! এ আবার কে? ওরে বাবা! কী সাংঘাতিক! গোপাল! গোপাল! গো-গো-গো-ও-ও—!

সবাই সেই দরজা দিয়ে ছুটে গেলেন। জিতেনবাবু সিঁড়ির নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি জলে-কাদায় নোংরা। ধরাধরি করে তাঁকে ঘরে এনে চোখেমুখে জল ছেটানোর পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি অতিকষ্টে বললেন,—হ্যালুসিনেশন। মানে—মুরারির দেখা অবিকল সেই লোকটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।...

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

সমস্ত ভৌতিক গল্প

বই হয়ে বেরোল এই প্রথম।
এই সংকলনের ৭৪টি
ভৌতিক গল্পে দেখা দিয়েছে
৭৪ রকম ভূত।